হুগলী জেলার ইতিহাস

নয়া-বাঙ্গলা, তীর্থ সপ্তক, মৃত্যুঞ্জয়ী কানাই, ভারতের রাষ্ট্রভাষা, মহাবিপ্লবী রাসবিহারী, বরণীয় বাঙ্গালী, বাঘা যতীন, মৃত্যুঞ্জয়ী প্রফুল্ল প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা এবং বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও 'কায়স্থ-পত্রিকা'র প্রাক্তন সম্পাদক

সুধীরকুমার মিত্র বিদ্যাবিনোদ
প্রণীত

শিশির পাবলিশিং হাউস
২২।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রকাশক :
শ্রীশিশির কুমার মিত্র, বি-এ
শিশির পাবলিশিং হাউস
২২।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ : ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৫৫

মূল্য—১৫৲ টাকা

[গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

মুদ্রাকর : শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দে
নিউ মদন প্রেস
৯৫, বেচু চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯

উৎসর্গ

"ধ্যানে তোমার রূপ দেখি গো স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি"



আমার সরল হৃদয়, উদারপ্রাণ, পরোপকারী
পরমারাধ্য, পূজ্যপাদ পিতৃদেব



স্বর্গীয় আশুতোষ মিত্রের

শ্রীচরণ উদ্দেশ্যে

সেবক—শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

"মধুর চেয়ে আছে মধুর
    সে এই আমার দেশের মাটি
আমার দেশের পথের ধূলা
    খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি।"

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ভূমিকা

ঠাকুরের অপার করুণায় হুগলী জেলার ইতিহাস পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। এই ইতিহাস প্রকাশিত হওয়ায় কেবল যে হুগলী জেলার অধুনা অখ্যাত কতকগুলি প্রাচীন স্থানের বিবরণ প্রকাশিত হইল তাহা নহে, পঙ্গুও যে ঠাকুরের কৃপায়, গিরিলঙ্ঘন করিতে পারে, তাহাও আর একবার জগৎ সমীপে প্রমাণিত হইল।

ইতিহাসের ছাত্র আমি নহি; ইতিহাসকে চিরদিন বিশ হাত দূরে রাখিয়া চলিয়াছি, তথাপি হুগলী জেলার ইতিহাস আমার হাত দিয়া যিনি লিখাইয়া লইলেন, তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাইতেছি।

বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলার সুন্দর সুন্দর ইতিহাস বর্ত্তমানে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু শিক্ষায় ও সভ্যতায় সর্ব্বাগ্রগণ্য 'মনীষার শ্রীক্ষেত্র' হুগলী জেলার কোন ভাল ইতিহাস না থাকায় বহুদিন হইতেই সে অভাব আমি অনুভব করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন এই বিষয়ে কিছুই করিতে পারি নাই। তবে আমার আশা ছিল:যে, হুগলী জেলার কোন মনীষী ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন।

১৩৫০ সালে দৌলতপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের অধিবেশনে প্রথিতনামা ঐতিহাসিক 'বিক্রমপুরের ইতিহাস'-লেখক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়, আমি হুগলী জেলার অধিবাসী শুনিয়া, আমাকে হুগলী জেলার ইতিহাস রচনা করিতে সর্ব্বপ্রথম উদ্বুদ্ধ করেন। তখন তাঁহার কথা আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেও, তিনি তথায় তিন দিন যাবৎ হুগলী জেলার ইতিহাস রচনার যে সকল উপাদান রহিয়াছে, সেই সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার হৃদয়ে গাঁথিয়া যায়।

বহুদিন পূর্ব্বে স্বর্গীয় কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের আমন্ত্রণে একবার বাঁশবেড়িয়াতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, তখন বংশবাটীর প্রাচীন মন্দিরগুলি দেখিলেও আমার মনে কোন রেখাপাত করে নাই। এইবার দৌলতপুর হইতে ফিরিয়া সপ্তগ্রাম, বংশবাটী, ত্রিবেণী প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে যাইয়া হৃদয়ে গভীর আনন্দ অনুভব করিলাম, সঙ্গে ক্যামেরা থাকায় কয়েকখানি

ছবি তুলিলাম, কিন্তু আশা যেন মিটিতে চায় না, তুই দিন পর পুনর্ব্বায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

'কলিকাতা রিভিয়ু' পত্রে রেভারেণ্ড লং সাহেব On the Banks of Bhagirathi নামক যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া, অনেক পুরাতন তথ্য অবগত হইলাম এবং শ্রদ্ধেয় যোগেন্দ্র বাবুর নির্দ্দেশে পাঠাগার হইতে কয়েকখানি প্রাচীন পুস্তক আনাইয়া তাহাও পাঠ করিলাম। হুগলী জেলার সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী প্রাচীনতম স্থান, উহাদের কতকগুলি ছবি পূর্ব্বেই আমার তোলা ছিল; পূর্ব্বোক্ত পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া বহু কষ্টে তুইটি প্রবন্ধ রচনা করিলাম, পরে সেই সচিত্র প্রবন্ধ তুইটি সাপ্তাহিক 'দেশ' ও মাসিক 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ করি।

প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া সকলেই আমাকে অনুরূপ সচিত্র প্রবন্ধ লিখিবার জন্য বিশেষ উৎসাহ দেন। চন্দননগরের প্রসিদ্ধ জননায়ক শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় একখানি পত্রে এই বিষয়ে আমাকে লেখেন :

> "আপনার প্রবন্ধগুলি আমি আগ্রহের সহিত পড়িয়া থাকি এবং আমার উহা খুব ভাল লাগে। আপনি যে ভাবে প্রবন্ধগুলি লিখিতেছেন, যদি জেলার সকল প্রসিদ্ধ স্থানের বিষয় ঐ ভাবে লেখেন, আমার বিশ্বাস, সমষ্টিগত ভাবে প্রকাশ হইলে উহা একখানি সুরচিত ইতিহাস হইবে। হুগলী জেলার এইরূপ ইতিহাসের একান্ত অভাব আছে।"

হরিহর বাবুর পত্রখানি আমায় খুবই উৎসাহিত করিল এবং ১৩৫০ সাল হইতে ১৩৫৪ সাল এই পাঁচ বৎসর প্রতি শনি ও রবিবার হুগলী জেলার গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইয়া প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করিতে যত্নবান হই এবং তাহাই আজ 'হুগলী জেলার ইতিহাস' নামে প্রকাশিত হইল।

এই পুস্তকের অংশ বিশেষ খণ্ডাকারে প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, বঙ্গশ্রী প্রবর্ত্তক, মাতৃভূমি, দেশ, কৃষক, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রভৃতি পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তকে যে সমস্ত প্রাচীন স্থানসমূহের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ প্রাচীন গ্রন্থাদি দৃষ্টে লিখিত হইয়াছে এবং যে সকল উপাদানে ইতিহাস বিরচিত হয়, তাহার অধিকাংশ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সাধারণতঃ আমাদের দেশে ইতিহাস বলিয়া যাহা প্রচলিত তাহা এতই অদ্ভুত

এবং অলৌকিক কাহিনীতে সমাচ্ছন্ন, যে তাহার মধ্য হইতে সত্য ঘটনাটি বাছিয়া লওয়া সুকঠিন; সেইজন্য বাধ্য হইয়া ইহার মধ্যে কয়েকটি কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনার অবতারণা করিয়াছি। বলা বাহুল্য যে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিকগণও উক্ত কাহিনী সত্য বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ তারকেশ্বরের রাজা বিষ্ণুদাসের জলন্ত লৌহ শাবল হস্তে ধারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে (পৃষ্ঠা ৮১৬ দ্রষ্টব্য)। হাণ্টার সাহেব এবং সরকারী গ্রন্থেও উক্ত কথা লিখিত আছে এবং আমাকেও ইতিহাসের অঙ্গ অক্ষত রাখিবার জন্য সেই কাহিনী লিখিতে হইয়াছে।

"The tradition says as proof of his innocence, Vishnu Das held in his hands a red hot iron bar without being injured in the least."

হুগলী জেলার ইতিহাস বর্ণনা করিতে যাইয়া বহু স্থলে বাঙ্গলাদেশের ইতিহাস সংক্ষেপে আমাকে বর্ণনা করিতে হইয়াছে। ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি এবং রাষ্ট্র-বিপ্লবে আমাদের হুগলী জেলার প্রভাব যে কতখানি ছিল, তাহাতে ইহা সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রাচীন কাল হইতে ইংরাজ রাজত্ব পর্য্যন্ত হুগলী জেলার মধ্যে যে সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস পৃথক পৃথক অধ্যায়ে লিখিয়াছি; কিন্তু এই সকল বিষয়ে লিখিবার এত উপাদান রহিয়াছে, যে প্রত্যেকের বিষয় এক একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ লিখিলে, তবে উহাদের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয়। উদাহরণ স্বরূপ হুগলী জেলায় ভারতবর্ষের মধ্যে যে সমস্ত প্রথম জিনিষের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিতে পারা যায়। প্রথম মুদ্রাযন্ত্র, প্রথম বাঙ্গলা হরপ, প্রথম মুদ্রিত পুস্তক, প্রথম ইংরাজী-বাঙ্গলা অভিধান, প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম কাগজের কল, প্রথম চটকল, প্রথম সাময়িক পত্র, প্রথম সংবাদ-পত্র, প্রথম বরফ-কল, প্রথম হাইকোর্টের জজ, প্রথম খৃষ্টান, প্রথম রেলওয়ে, প্রভৃতি বিষয়গুলি লইয়া অসংখ্য পুস্তক রচিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন কয়েকটি প্রাচীন রাজবংশের ইতিহাস ও কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিতের জীবনী লিখিলেও অনেকগুলি পুস্তক হয়। আমি প্রত্যেকের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে কেবল স্থূল ঘটনাগুলির উল্লেখ করিয়াছি; বিশদভাবে বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাস যাহা, হুগলী জেলার সামাজিক ইতিহাসও

তাহাই ; তবে হুগলী জেলার সামাজিক ইতিহাস পরিবর্ত্তন কি ভাবে সাধিত হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য এই স্থানের প্রাচীন গ্রন্থকারগণের পুস্তক এবং শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" হইতে তৎকালীন সময়ের ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বহু বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছি।

এই গ্রন্থে হুগলী জেলায় যে সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক স্থান-সমূহের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ পুরাতন দলিলাদি ও সরকারী কাগজপত্র দৃষ্টে লিখিত। এইরূপ বিরাট গ্রন্থ একক কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে সঙ্কলন করা কখনই সম্ভব নয় জানিয়াও, এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম এই আশায় যে, আমার জেলাবাসিগণের সহযোগিতা ও সহানুভূতি লাভে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইব না। কিন্তু আজ গভীর দুঃখের সহিত এই কথা প্রকাশ করিতেছি যে, শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এইরূপ ঔদাসীন্য আমি কখনও দেখি নাই। পত্রের জবাব দেওয়ার সৌজন্যতাটুকুও তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন। বরং অর্দ্ধশিক্ষিত ও দরিদ্র গ্রামবাসিগণ, আমি ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিবার জন্য ভ্রমণ করিতেছি শুনিয়া, আমায় তাঁহাদের অবস্থাতীত আদর আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত করেন, কিন্তু শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তিগণের আবাসে যখনই গিয়াছি, তাঁহারা আমায় সহানুভূতি দেখানো দূরে থাকুক, এইরূপ বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিয়াছেন, যে বহুবার আমি ক্ষোভে, দুঃখে ইতিহাস-সঙ্কলনের বাসনা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলাম।

এই পুস্তক রচনায় বিক্রমপুরের ডক্টর শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের নিকট নানা প্রকার উৎসাহ পাইয়াছি। তাঁহারা ভিন্ন জেলাবাসি হইয়াও এই ইতিহাসের প্রকাশ দেখিতে যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা চিরদিন আমার স্মরণ থাকিবে। আজ এই দুই জন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের নাম হুগলী জেলার ইতিহাসের সহিত সংযুক্ত করিয়া আমি ধন্য হইলাম। চন্দননগরের শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক আমার কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর তিনি আমায় যে ভাবে উৎসাহিত করেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি; এতদ্ভিন্ন এই পুস্তকের জন্য হুগলী

জেলার গ্রন্থ, গ্রন্থকার ও গ্রন্থাগারের সম্বন্ধে সুচিন্তিত অধ্যায়টি তিনি সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন এবং তল্লিখিত চন্দননগরের সচিত্র বিবরণ এই পুস্তকে প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়া আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কয়েকখানি প্রাচীন দলিল আমায় দেখাইয়াছেন, তাহার আলোকচিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। ফণীন্দ্রবাবুর নিকট আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। এই পুস্তকে যে সমস্ত আলোক-চিত্র দিয়াছি তাহার অধিকাংশই আমার আত্মীয় শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ কর কর্তৃক গৃহীত। কতকগুলি আলোকচিত্র আমি নিজে তুলিয়াছি এবং কতকগুলি শ্রীযুক্ত অমরেশচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ কর তুলিয়া দিয়াছেন। মহানাদের শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র পাল, বড-তাজপুরের মিঃ তরফদার, বৈদ্যবাটীর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীরামপুরের শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতেও দু-একখানি করিয়া ছবি প্রাপ্ত হইয়াছি। তঁহাদের প্রত্যেকের নিকট আমি ঋণী রহিলাম।

'প্রবাসী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্গশ্রী' সম্পাদক ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং 'দেশ' পত্রের সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষ, তঁহাদের পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় ব্লকগুলি আমায় এই পুস্তকে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীযুক্ত অমূল্যভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অদ্বৈত মল্ল বর্ম্মনের আনুকুল্যে উহা প্রাপ্ত হইয়াছি। বঙ্গশ্রীর ব্লকগুলির জন্য শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য আমায় যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাঁহাদের কৃত উপকারের জন্য আমি প্রত্যেকের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

এই গ্রন্থ-রচনায় বহু গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছি,যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিলেও, শম্ভুচন্দ্র দের Hooghly Past & Present, অম্বিকাচরণ গুপ্তের হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ়, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্যের হাওড়া ও হুগলীর ইতিহাস, Toynbee's Administration of the Hooghly District, Crawford's Hughli Medical Gazetteer, এবং Hunter's Statistical Account of Bengal (Hooghly District) হইতে প্রভূত সাহায্য লইয়াছি। আজ তাঁহারা জীবিত না থাকিলেও অগ্রগামী বিধায় তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। এতদ্ভিন্ন যে সকল স্বদেশবাসী ও বিদেশী গ্রন্থকারের রচনা হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, তাহাদিগকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার; এই গ্রন্থাগার হইতে বহু পুস্তক পাঠ করিয়াছি, কিন্তু যে সকল দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ পড়িবার আশা করিয়াছিলাম, তাহা পাঠ করিবার সুযোগ পাই নাই। এমন কি লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক মিঃ কে-এম-আসাদুল্লা আমার গবেষণার জন্য গ্রন্থাগারে একটু স্থান

দিতেও কার্পণ্য করেন। তিনি এই বিষয়ে আমায় যে পত্র দেন, তাহা এই স্থানে পাঠকগণের অবগতির জন্য উল্লিখিত হইল :

No 2347, Government of India.
IMPERIAL LIBRARY
Dear Sir, Calcutta the 30th July 1945.

Please refer to your letter dated the 21st. July 1945, asking for a seat in the Private Reading Room of the Library. As the Private Reading Room is primarily intended for systematic research scholars, I am afraid, you will not be alloted a seat there. All possible facilities will however, be given to you in the general Reading Room to consult the rare books referred to in your letter. You will please see the Superintendent of the Reading Room, in this connection, who will make the necessary arrangements for your studies there.

Yours faithfully,
(Sd) K. M. Assadullah
Librarian.

Sudhir Kumar Mitra Esq.
"Mitra-Cottage",
2, Kali Lane, Calcutta.

গ্রন্থাগারিকের নির্দেশ মত সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কোন ফলই পাই নাই। আমার ন্যায় শত শত দরিদ্র গবেষক সরকারী গ্রন্থাগার হইতে কেন যে, কোনপ্রকারের সাহায্য লাভে বঞ্চিত হয়, তাহা কর্ত্তৃপক্ষের দেখা কর্ত্তব্য।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সত্যচরণ ইনষ্টিটিউট ও অবৈতনিক পাঠাগার এবং কায়স্থ সভা গ্রন্থাগার হইতে কতকগুলি পুরাতন গ্রন্থ দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল; উহাদের কর্ত্তৃপক্ষগণকে আজ ধন্যবাদ দিতেছি। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়, হুগলী জেলা সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রাচীন গ্রন্থাদিতে লিখিত আছে, সেই সমস্ত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের একটি তালিকা আমায় পাঠাইয়া দিয়া, বিশেষ উপকার করেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ডাঃ নিশাপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র চন্দ্র বসু মল্লিক, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও ডাঃ ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য বহু প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল দাঁ (শ্রীরামপুর), শিল্পী শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ কর, শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার দাস (চুঁচুড়া) এবং মান্দ্রাজবাসী মিঃ নাথন (R. V. Nathan) সহযাত্রী হিসাবে হুগলী জেলার সর্ব্বত্র আমার সহিত ভ্রমণ করিয়া, আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করিয়া কোথাও তাহারা আমার সহিত এক পর্ণকুটীরে সযত্নে অভ্যর্থিত হইয়াছেন, কোথাও বা

ধনীর আবাসে রাত্রিতে থাকিবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত না পাওয়ায় ষ্টেশনে গল্প করিয়া অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়াছেন। এইরূপ সাথী ব্যতীত আমার পক্ষে ভ্রমণ করা কখনই সম্ভব হইত না। আজ ইহাদিগকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

উপকরণ সংগৃহীত হইবার পর গ্রন্থ-মুদ্রণ করাকে বর্ত্তমান সময়ে রাজসূয় যজ্ঞের তুল্য বলিতে পারা যায়। এইরূপ বিরাট গ্রন্থ প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব বিধায় হুগলী ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় এবং প্রবর্ত্তকের শ্রীযুক্ত রাধারমণ চৌধুরীর সহিত ইহার প্রকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করি। তাহারা উভয়েই ইহা প্রকাশ করিতে আগ্রহ প্রদর্শন করেন, কিন্তু বর্ত্তমানে কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য আমায় কিছুকাল ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে বলেন। আমি কিন্তু দু-একটি কারণে তাহাদের কথায় সম্মত হইতে পারি নাই। আমার পূর্ব্বে স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় হুগলী ব দক্ষিণ রাঢ়, ১ম খণ্ড, প্রকাশ করেন; কিন্তু তাহার পর আর উক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ সম্পাদক স্বর্গীয় নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শুনিয়াছি, হুগলীর একখানি ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সময়ে মুদ্রিত না হওয়ায় তিনি গতায়ু হন এবং তাহার পাণ্ডুলিপি পর্যান্ত নিখোজ হইয়াছে। হরিহর বাবু উহা সংগ্রহ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করেন, কিন্তু সমস্তই বিফল হয়। হুগলী জেলার ইতিহাস রচনাকারী আমার অগ্রগামী দুইজনের অবস্থার কথা শুনিয়া আমি একটু ভীত হই, এবং দেরি করিলে আমার জীবিতকালে এই গ্রন্থ প্রকাশ হইবে কিনা, সেই বিষয়ে আমার সংশয় হয় এবং সেই জন্যই আমি সত্বর মুদ্রণের জন্য চেষ্টা করিতে থাকি।

যে সময় আমি ইহা মুদ্রণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছি, সেই সময়ে শিশির পাবলিশিং হাউসের শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্রের সহিত আমার পরিচয় হয়। তিনি মাসিক-পত্রাদিতে আমার সচিত্র হুগলী জেলা সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি দেখিয়া ইহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি স্বয়ং একজন ঐতিহাসিক বলিয়া এই সকল মূল্যবান উপকরণ তিনি সত্বর মুদ্রণের ব্যবস্থা করিলেন এবং বলা বাহুল্য যে, তিনি ভিন্ন জেলাবাসী হইলেও হুগলী জেলার ইতিহাস প্রকাশের সুব্যবস্থা না করিলে ইহা কখনই প্রকাশিত হইত না। হুগলী জেলাবাসী প্রত্যেকে তাঁহার নাম কৃতজ্ঞচিত্তে নিশ্চয়ই স্মরণ করিবে। নিউ মদন প্রেসের শ্রীযুক্ত নিশাপতি সিংহ-রায় এবং শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্যবর্ত্তা পুস্তকখানির মুদ্রণ ও পারিপাট্য বিষয়ে আমাকে নানাপ্রকার সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদিগকেও আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমার কন্যা কুমারী পাপড়ী দেবী এবং পুত্র শ্রীমান পলাশকুমার মিত্র বহু পাণ্ডুলিপি নকল করিয়া দেয়, তাহাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি।

আমি প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা

যদি কাহারও নিকট নগণ্য বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে তিনি যেন কাঠ-বিড়ালীর সেতুবন্ধের বিষয় দয়া করিয়া স্মরণ করেন এবং ভারতের পূর্ণাঙ্গ ও বিরাট সৌধ নির্ম্মাণের ইহা একটি সোপান বলিয়া মনে করেন। এই গ্রন্থমধ্যে যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি কেহ দেখিতে পান, তাহা আমাকে জানাইলে ২য় সংস্করণে কৃতজ্ঞচিত্তে তাহা আমি সংশোধন করিয়া দিব। আমার নিবেদন—"যত দোষ ক্ষমা কর ; কিছু গুণ যদি থাকে হাতে ধর ; সবারে জানাই নমস্কার—স্নেহ প্রীতি প্রণাম আমার।"

আজ হুগলী জেলার ইতিহাস প্রকাশিত হইল বলিয়া আমি খুবই আনন্দিত, কিন্তু আমার পিতৃদেবের জন্য আমি বিশেষ ভাবে ব্যথিত ও শোকাক্রান্ত। তাঁহার উৎসাহেই আমার সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মে, এবং কলিকাতায় আজন্ম বসবাস করিলেও, তাঁহার হুগলী জেলার প্রতি গভীর অনুরাগের অংশ-বিশেষ মাত্র আমাকে বর্ত্তাইয়াছে। আজ পাঁচ বৎসর হইল তিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কথা স্মরণ হইলেই আমি শোকভারে ব্যথিত হইয়া যাই। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনি পরপার হইতে আমাকে আশীর্ব্বাদ না করিলে, এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য কখনই আমার দ্বারা সুসম্পন্ন করা সম্ভব হইত না।

পরিশেষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমি কেবল এই কথাই সবিনয়ে নিবেদন করিব :

বিপুলা পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্ত্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত না অজানা জীব, কত না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন ;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তার এক কোন।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণ বৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয়—উৎসাহে
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।

"বিশ্বম্ভর-ধাম"
জেজুর, হুগলী
১৫ই আগষ্ট ১৯৪৮

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র
৩০শে শ্রাবণ ১৩৫৫

সূচীপত্র

পঞ্চদশ অধ্যায়—পুরাতন স্থানের বিবরণ—৭৫৩—৮১৩

শুদ্ধিপত্র

	অশুদ্ধ		শুদ্ধ
৫৫ পৃষ্ঠার ৫ম লাইন	দামোদর	স্থলে	আমোদর হইতে
২২৭ পৃষ্ঠায় ছবির নাম	উইলিয়াম কেরীর	”	স্যার চার্লস উইল কিন্স
৩৭৩ পৃষ্ঠার ৬ষ্ঠ লাইন	100 years	”	1000 years
৩৭৭ পৃষ্ঠার ৯ম ”	তালহাণ্ডা	”	কুলিহাণ্ডা
৩৮২ পৃষ্ঠার ১৬ ”	unto ached	”	untouched
৫৫১ পৃষ্ঠার শেষ ”	প্রতিনিধি	”	প্রতিলিপি
৭৮০ পৃষ্ঠার ১৮ ”	প্রজাদের	”	প্রবাদের
৭৮২ পৃষ্ঠার ৬ষ্ঠ ”	এল-এম-এফ	”	এল-এম-এস
৮৭৩ পৃষ্ঠার ১৭ ”	সম্পদ	”	সংবাদ
৯২২ পৃষ্ঠার ফুট নোট	Hedeyes	”	Hedges

১৫৫ ও ১৫৬ পৃষ্ঠার পর ১৫৭ ও ১৫৮ পৃষ্ঠার পরিবর্ত্তে পুনরা ১৫৫ ও ১৫৬ পৃষ্ঠা ছাপা হইয়াছে।

চিত্র-সূচী

চিত্র পরিচিতি			পৃষ্ঠা

	চিত্র পরিচিতি		পৃষ্ঠা
৫৬।	স্যার চার্লস উইলকিন্স	...	৫৪০
৫৭।	ডাঃ উইলিয়াম কেরী	...	৫৪৪
৫৮।	ধর্ম্মপুস্তকের আখ্যাপত্র	...	৫৪৭
৫৯।	মঙ্গল-সমাচারের একটি পৃষ্ঠার চিত্র	...	৫৫০
৬০।	ধর্ম্মপুস্তকের একটি পৃষ্ঠার চিত্র	...	৫৫১
৬১।	ধর্ম্মপুস্তকের প্রতিলিপি	...	৫৫৩
৬২।	পুরাতন চন্দননগর	...	৫৫৮
৬৩।	ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রতীক	...	৫৬৪
৬৪।	চন্দননগরের সিপাহী	...	৫৬৭
৬৫।	নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির	...	৫৬৯
৬৬।	যোগীন্দ্রনাথ সেন	...	৫৭২
৬৭।	শম্ভূচন্দ্র সেবাশ্রম	...	৫৭৪
৬৮।	কানাইলাল দত্ত	...	৫৭৮
৬৯।	কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দির	...	৫৮২
৭০।	শ্রীহরিহর শেঠ	...	৫৮৮
৭১।	ভূদেব বাবু প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়	...	৫৯০
৭২।	চন্দননগরে বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলন	...	৫৯২
৭৩।	জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী	...	৫৯৩
৭৪।	ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৬১১
৭৫।	শ্রীশ্রীনিস্তারিণী কালী	...	৬১৬
৭৬।	রাজা রাজচন্দ্রের বাদশাহী সনদ	...	৬২০
৭৭।	সূর্য্য মূর্ত্তি	...	৬২৭
৭৮।	মধুসূদন গুপ্ত	...	৬২৯
৭৯।	মেডিক্যাল কলেজের সার্টিফিকেট	...	৬৩২
৮০।	কেরী সাহেবের পরামর্শ করিবার ভবন	...	৬৪২
৮১।	দিগ্‌দর্শনের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি	...	৬৪৬
৮২।	ওয়ার্ড সাহেবের সমাধি	...	৬৫০
৮৩।	সমাচার দর্পণের প্রতিলিপি	...	৬৫৪
৮৪।	শ্রীরামপুর গীর্জ্জার মধ্যস্থিত টব	...	৬৬০
৮৫।	রাধাবল্লভজীউর মন্দির	...	৬৬৪

প্রথম অধ্যায়

রাঢ়ের প্রাচীন ইতিহাস

অতি প্রাচীনকালে আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথমে আর্য্যাবর্ত্তে বাস করিয়াছিলেন। উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী হইতে দক্ষিণে সিন্ধুসঙ্গম পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম হইতে পশ্চিমে স্থলেমান পর্ব্বত পর্য্যন্ত ভূমিখণ্ড তৎকালে আর্য্যাবর্ত্ত নামে অভিহিত হইত। এই স্থান পূর্ব্বে অনার্য্যদিগের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল; কিন্তু আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিবার পর,—তাহাদিগের নিকট পরাজিত হইয়া, এই স্থানের প্রাচীন অধিবাসী অনার্য্যগণ অন্যত্র চলিয়া গেলেন। আর্য্যগণ প্রথমে যে স্থানে বসবাস করিলেন, তাহার বহির্ভূত অন্যান্য স্থানগুলিকে তাঁহারা নিষিদ্ধ ও পাপজনক বলিয়া মনে করিতেন।

বাঙ্গলাদেশ সুদূর অতীতকালে সাগরগর্ভে নিহিত ছিল, পরে মহাসমুদ্র দক্ষিণাভিমুখী হওয়ায় এই ভূমিখণ্ড সাগর হইতে উত্থিত হয়; ক্রমশঃ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পলিতে পুষ্ট হইয়া আধুনিক বাঙ্গলাদেশের কিয়দংশের পত্তন হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এই বাঙ্গলাদেশের উত্তর, দক্ষিণ-পশ্চিম, ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তে অতি প্রাচীন ভূমি আছে। চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যপ্রদেশে এবং হুগলী জেলার কুণকুণে গ্রামে 'প্রত্নপ্রস্তর যুগের' [Palaeolithic Age] পাষাণ নির্ম্মিত অস্ত্র আবিষ্কারের ফলে, প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মিঃ কগিন্ ব্রাউন অনুমান করিয়াছেন, যে খৃষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চদশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে, এই 'প্রত্ন-প্রস্তর যুগ' ইউরোপে ও বাঙ্গলায় একই সময়ে আরম্ভ হইয়াছিল.

'বঙ্গ' শব্দের প্রাচীনতম উল্লেখ সর্ব্বপ্রথম ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকে (২।১।৩) দেখিতে পাওয়া যায়।

"ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি।
বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাস্থান্যা অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি॥"

অর্থাৎ বঙ্গদেশ, মগধ এবং চের জনপদবাসিগণ—এই ত্রিবিধ প্রজাই, কি দুর্ব্বলতা, কি দুরাহার ও বহু অপত্যতায় কাক, চটক ও পারাবত সদৃশ। বঙ্গজাতি অতি প্রাচীন জাতি বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিলেও আর্য্যগণ তাহাদিগকে ঘৃণা করিতেন। এই সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—"যখন আর্য্যগণ মধ্য এসিয়া হইতে পাঞ্জাবে আসিয়া উপনীত হন, তখনও বাঙ্গলা সভ্য ছিল। আর্য্যগণ আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়া যখন এলাহাবাদ পর্য্যন্ত উপস্থিত হন, তখন বাঙ্গলার সভ্যতায় ঈর্ষা পরবশ হইয়াই তাঁহারা বাঙ্গালীকে ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য এবং ভাবাশূন্য পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।"

বর্ত্তমান বাঙ্গলাদেশ পূর্ব্বে 'বঙ্গ' ও 'রাঢ়' নামে অভিহিত হইত; জাতিতত্ত্বে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, যাযাবর 'বঙ্গ' ও 'রাঢ়' নামক অনার্য্য জাতিদের নাম হইতেই দেশবাচক বঙ্গ ও রাঢ় নামের উৎপত্তি হইয়াছে; প্রাচীনকালে বঙ্গ বলিলে কেবল পূর্ব্ব-বঙ্গকে বুঝাইত; ইহার কারণ উক্ত যাযাবর বঙ্গ নামক জাতি আর্য্যদিগের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া, হটিতে হটিতে ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে যাইয়া বসবাস করেন। বঙ্গ জাতির ন্যায় রাঢ় নামক যাযাবর অনার্য্যজাতিও হটিতে হটিতে পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করেন এবং সেইজন্য তাহাদের নামানুসারে পশ্চিম বঙ্গের নাম 'রাঢ়' হইয়াছিল।

'আইন-ই-আকবরী' প্রণেতা আবুল ফজল লিখিয়াছেন:

"বাঙ্গলা প্রাচীন বঙ্গের নামান্তর মাত্র; পুরাকালে এতদ্

অঞ্চলের রাজন্যবর্গ সমগ্র প্রদেশে দশগজ উর্দ্ধ ও বিশগজ আয়ত এক একটী 'আল' অর্থাৎ মৃত্তিকা-স্তূপ প্রস্তুত করিয়া জলপ্লাবন নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেন। বঙ্গ+আল এই দুই শব্দের যোগে বঙ্গাল শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।"

রাঢ় শব্দ সংস্কৃত 'রাষ্ট্র' শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া কেহ কেহ মতপ্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু, রাঢ় শব্দ সংস্কৃত-মূলক নহে বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন; তাঁহার মতে সাঁওতালী ভাষায় 'রাঢ়ো' নামক একটি শব্দ আছে, এবং তাহার অর্থ নদীগর্ভস্থ শৈলমালা বা পাথুরিয়া জমি। এই সাঁওতালী বা দেশ্য শব্দ হইতে রাঢ় শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।*

বঙ্গ ও রাঢ় নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহুপ্রকারের মত প্রচলিত আছে; অদ্যাবধি এই আলোচনার কোন মীমাংসা হয় নাই বলিয়া, অন্যান্য মতামতগুলি উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম। ত্রয়োবিংশ শতাব্দী হইতে বঙ্গ ও রাঢ় অর্থাৎ সমগ্র বাঙ্গলা দেশ 'বাঙ্গলা' নামে পরিচিত হইতে থাকে এবং মুসলমান রাজত্বকালে এই স্থান বাঙ্গলা নামে আখ্যাত হয়।†

খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে মাগধী ভাষায় রচিত জৈনদিগের 'আচারাঙ্গ-সূত্রে' রাঢ় শব্দের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান স্বামী ওরফে মহাবীর স্বামী রাঢ় দেশে দ্বাদশবর্ষ যাপন করিয়া বন্যজাতির মধ্যেও ধর্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত সিংহলের পালি মহাবংশে 'লার' নামে, নবম শতাব্দীতে ধর্ম্মপালের সংস্কৃত তাম্র শাসনে 'লাট' নামে এবং একাদশ শতাব্দীতে তামিল গ্রন্থভাষায় উৎকীর্ণ রাজেন্দ্র

* বিশ্বকোষ—নগেন্দ্রনাথ বসু—১৬শ ভাগ, পৃঃ ৪১৩

†The Vangas—Dr. B.C. Law, (Indian Culture, July 1934).

চোলের শৈললিপিতে 'লাঢ়' নামে পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

রাঢ় নামে অভিহিত হইবার পূর্ব্বে ভাগীরথীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত ভূমিখণ্ড 'সুহ্ম' নামে পরিচিত ছিল। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন যে "সুহ্মা-রাঢ়া" অর্থাৎ সুহ্মই রাঢ় দেশ। মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরাংশ অর্থাৎ যে স্থানে ভাগীরথী দক্ষিণ-মুখী হইয়াছেন—সেই স্থান হইতে বর্ত্তমান হাওড়া জেলা পর্য্যন্ত সমুদায় পশ্চিমাংশ 'সুহ্ম' বা 'রাঢ়' নামে প্রখ্যাত ছিল।

রামায়ণ এবং মহাভারতে বঙ্গ ও সুহ্ম নাম বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। বাল্মীকির রামায়ণ খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০০ অব্দে রচিত হইয়াছিল ; ইহাতে বঙ্গ ও সুহ্মের যে উল্লেখ আছে, তাহাতে বঙ্গ ও সুহ্মকে ছোট জাতি বলিয়া মনে হয় না। কারণ ছোট জাতি হইলে বিদেহ, মলয়, কাশী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জাতির সহিত সুহ্ম ও বঙ্গের নাম কখনই উল্লিখিত হইত না। নিম্নে রামায়ণের শ্লোকটি উদ্ধৃত হইল ঃ

"সুহ্মান মাল্যান বিদেহাংশ্চ মলয়ান কাশিকোশলান।
মগধান দন্ত-কুলাংশ্চ বঙ্গালঙ্গাংস্তথৈচ ॥"

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪০ অঃ ২৫ শ্লোক ॥

মহাভারতের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে এবং ইহার আদি, সভা, উদ্যোগ প্রভৃতি প্রত্যেক পর্ব্বেই বঙ্গ ও সুহ্মের উল্লেখ আছে। হরিবংশে এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। *

দৈত্যরাজ বলিরাজার পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে ও দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম নামে পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল

* হরিবংশ—৩১ অধ্যায়।

এবং তাহাদের নামানুসারে পরবর্ত্তীকালে অঙ্গদেশ, বঙ্গদেশ, পুণ্ড্রদেশ কলিঙ্গদেশ ও সুহ্মদেশ এই পাঁচটি রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল।

"অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মাশ্চ তে সুতা,
তেষাং দেশা সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভুবি।"

মহাভারত, আদি পর্ব্ব ১০৪।৫০

হুগলী জেলার খানাকুল নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় দীর্ঘতমা-ঋষি খৃষ্ট-পূর্ব্ব ১৬৯০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।*

মহাভারত ব্যতীত বায়ুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, মার্কেণ্ডেয়পুরাণ প্রভৃতি ভারতের প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে উক্ত পাঁচটি রাজ্যের নাম একত্রে দৃষ্ট হয়। ঐতিহাসিকগণ এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ উক্ত জনপদগুলির যে সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, বর্ত্তমান রাজসাহী ও ভাগলপুর বিভাগের সন্নিহিত স্থান, প্রাচীন অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। উত্তরে ভাগীরথী হইতে দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত কলিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং অঙ্গ ও কলিঙ্গের পূর্ব্ব প্রদেশটি বঙ্গ-রাজ্য নামে প্রখ্যাত ছিল। কানিংহাম, উইলসন প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান রাজসাহী বিভাগের উত্তর-পশ্চিমদিকের ভূমিখণ্ড অর্থাৎ অঙ্গ-রাজ্যের দক্ষিণাংশ পরবর্ত্তীকালে পুণ্ড্ররাজ্য নামে অভিহিত হইয়াছিল এবং কলিঙ্গ রাজ্যের উত্তর পূর্ব্বাংশ লইয়া সুহ্মরাজ্য গঠিত হইয়াছিল।

প্রাচীনকালে আধুনিক বাঙ্গলাদেশের সীমা কিরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা বর্ত্তমানে সঠিক নির্ণয় করা অতীব দুরূহ কার্য্য বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না; তবে এই সম্বন্ধে বহু আলোচনা ইতিপূর্ব্বে হইয়াছে এবং উক্ত আলোচনা হইতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান হুগলী, হাওড়া,

* গৌড়ের ইতিহাস—রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, পৃঃ ২

বৰ্দ্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি জেলাগুলি প্রাচীনকালে সুহ্মরাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে সুহ্মদেশের বিক্ষিপ্ত উল্লেখ ভিন্ন সুদূর অতীতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাওয়া না যাইলেও, খৃষ্টজন্মের বহু বৎসর পূর্ব্বেও এই স্থানে যে আর্য্যগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। খৃষ্টজন্মের তিনশত বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ অশোকের সাম্রাজ্য সমগ্র বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বঙ্গোপসাগরের উপকূল ও তাম্রলিপ্ত (বৰ্ত্তমান তমলুক) তখন বঙ্গদেশের দক্ষিণ সীমা ছিল এবং সুহ্মদেশ অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নন্দবংশীয় রাজাগণ বা অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত সম্ভবতঃ বঙ্গরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব তিনশত ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার পঞ্চনদ অধিকার করিয়া বিপাশা নদীর তীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাহার নিকট 'প্রাসি' (Prasi) এবং 'গঙ্গরিডয়' (Gangaridae) এই দুইটী রাজ্যের সংবাদ আসিয়াছিল। ইহার পর গ্রীকদূত মেগাস্থিনাস্ পাটলিপুত্র নগরে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সভায় আসিয়াছিলেন।

তিনি মৌর্য্য সাম্রাজ্যের রাজধানী 'প্রাসি' অর্থাৎ মগধ এবং উহার পূর্ব্বদিকে স্বাধীন 'গঙ্গরিডয' রাজ্যের কথা ও উহার রাজধানী 'গাঙ্গি'র (Gange) কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। ডিওডোরস্, মেগাস্থিনিসের অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন যে, গঙ্গানদী 'গঙ্গরিডয়' দেশের পূর্ব্ব সীমা অতিক্রম করিয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। *

গঙ্গরিডয় রাজ্য হইতেছে বঙ্গদেশ এবং ইহার রাজধানী 'গাঙ্গী' হইতেছে সপ্তগ্রাম; প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক টলেমী (Ptolemy) তৎকালে গঙ্গাতীরে ইহাই একমাত্র বাণিজ্য-প্রধান স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

* গৌড় রাজমালা, ১ম ভাগ ও বাঙ্গলার ইতিহাস, প্রথম ভাগ।

গঙ্গরিডয় বা বঙ্গদেশের রাজার অধীনে বিশ সহস্র অশ্বারোহী, দুইলক্ষ পদাতিক সৈন্য, দুই সহস্র যুদ্ধযান এবং চারিসহস্র বৃহদাকার রণহস্তি-সমূহ ছিল। সেইজন্য তাহাদের দেশ কখনও কোন বিদেশীদের দ্বারা অধিকৃত হয় নাই। কারণ অন্যান্য দেশের অধিবাসিগণ দুর্জ্জয় রণ-হস্তী দিগকে ভীষণ ভয় করিত।* নিম্নে মেগাস্থিনিসের বর্ণনা উদ্ধৃত হইল :

"Thus Alexander, the Macedonian, after conquering all Asia, did not make war upon the Gangaridai, as he did on all others, for when he had arrived with all his troops at the river Ganges and had subdued all the other Indians, he abandoned as hopeless an invasion of the Gangaridai, when he learned that they possessed four thousand elephants well trainnd and equipped."

ঐতিহাসিকগণ গঙ্গরিডয় রাজ্যকে বঙ্গ-রাজ্য † এবং উহার রাজধানীকে সপ্তগ্রাম বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সপ্তগ্রাম বা সাতগাও গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী এই ত্রিবেণী তীর্থের অনতিদূরে অবস্থিত এবং সুদূর অতীত কাল হইতে, এই স্থানটি ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধ রক্ষার একটি সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র ছিল। লেঃ কর্ণেল ক্রফোর্ড এই সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, "Satgaon (Seven villages) was one of the oldest cities of India and the ancient royal port of Bengal."‡

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্লীনী লিখিয়াছেন যে, জাহাজ সকল গোদাবরীর নিকট দিয়া কেপ-পালিমোরাস যাইত এবং ঐস্থান হইতে

---

* Mc Crindles Magasthenes, Page 34.

† Political History of Ancient India ও বিক্রমরের ইতিহাস—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

‡ Portugoose in Bengal—J. A. Compose.
Bengal Past & Present, Vol. III 1909.

কলতার আর পার টেনিনগেল ও তথা হইতে ত্রিবেণী দিয়া পাটনায় যাইত। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের সভ্যতা এই স্থানে বিদ্যমান না থাকিলেও, তাহার প্রভাব যে কিছু এই স্থানে বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত। এই সময় ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির সহিত বহু বৌদ্ধ ও জৈন এইস্থানে আসিয়া বসবাস করেন। ইহার কয়েক শতাব্দী পর খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বিজয়ী সমুদ্রগুপ্তের আমলে সমগ্র বঙ্গদেশ গুপ্ত-সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। দিল্লী নগরীর লৌহস্তম্ভের উপর ক্ষোদিত লিপিতে অঙ্কিত আছে যে, বঙ্গদেশে যুদ্ধ করিতে যাইবা সম্মিলিত শত্রুগণকে তিনি বিপর্য্যস্ত ও পরাভূত করিয়াছিলেন।

মহাকবি কালিদাস ৪৮০ হইতে ৪৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'রঘুবংশ' রচনা করেন; তিনি রঘুর দিগ্বিজয় কাহিনীতে সুহ্ম-দেশের উল্লেখ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার ভাবার্থ প্রদত্ত হইল:

বিজয়ী রঘু এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকল দেশ জয় করিতে করিতে পরিশেষে পূর্ব্বমহাসাগরের তালবন দ্বারা শ্যামবর্ণ উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। নদীবেগ যেরূপ উচ্ছৃত বৃক্ষ সকল উন্মূলিত করে, রঘুর স্বভাবও সেইরূপ জানিতে পারিয়া সুহ্ম-দেশীয় নৃপতিগণ বিনীতভাব অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিলেন।

গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংসের পর সুহ্মদেশ কিছুকালের জন্য স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রচিত 'দশকুমার চরিতে' লিখিত আছে যে, সুহ্মদেশ সেই সময়ে সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক সপ্তম শতাব্দীতে সুহ্মদেশ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন এবং উক্ত শতাব্দীর মধ্যভাগে সুহ্মরাজ্য শিলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যভুক্ত হয়। এই সময় চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সিয়াং ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত [illegible], তৎকালে [illegible] দুইটি বিভাগে বিভক্ত ছিল বলিয়া জানিতে

পারা যায়। তাহার সময়ে কর্ণসুবর্ণ বলিয়া একটী রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং তিনি তাম্রলিপ্ত হইতে কর্ণসুবর্ণ এবং কর্ণসুবর্ণ হইতে উড়িষ্যায় গমন করিয়াছিলেন। ছয়টি বিভাগে ছয়জন রাজা রাজত্ব করিতেন বলিয়া তিনি তাহার ভ্রমণ কাহিনীতে লিখিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় রাজাদের নাম তিনি উল্লেখ করেন নাই। তাহার সময়ে বঙ্গদেশ নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত ছিল:

(১) চম্পা—ভাগলপুর জেলা

(২) কাজঙ্গলা—সাঁওতাল পরগণার উত্তর-পূর্ব্ব সীমা, রাজমহলের চারিদিকের অংশ লইয়া অবস্থিত।

(৩) পুণ্ড্রবর্দ্ধন—মালদহের কতকাংশ এবং রাজসাহী ও বগুড়া জেলা।

(৪) সমতট—যশোহরের কতকাংশ, খুলনা, ফরিদপুর, ঢাকা, বাখরগঞ্জ ও ত্রিপুরা জেলা।

(৫) তাম্রলিপ্ত—চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার কতকাংশ।

(৬) কর্ণ সুবর্ণ—হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান জেলোর উত্তর ও মধ্যভাগ এবং মুর্শিদাবাদ জেলা।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণ মিশ্র রচিত 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' নাটকে রাঢ় দেশের নিম্নোক্তরূপ উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়:

"গৌড়ং রাষ্ট্রমুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়পুরী
ভূরিশ্রেষ্টিকনামধাম পরমং তত্রোত্তমো ন পিতঃ।"

উক্ত নাটকে দক্ষিণ রাঢ় স্বাধীন রাজ্য এবং উহার রাজধানী ঐশ্বর্য্যশালিনী বলিয়া বর্ণিত আছে। তৎকালে রাঢ়দেশ বলিতে সমগ্র পশ্চিম বঙ্গকে বুঝাইত এবং রাঢ়দেশ আবার উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ় —এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়

লিখিয়াছেন যে, বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণা, নদীয়া, হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশ দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল। *

দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ লিখিয়াছেন যে, গঙ্গার দুইধারে লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের দুইটি পক্ষ, গঙ্গার পশ্চিমদিকে 'রাল্' (অর্থাৎ রাঢ়) এই ধারেই লখনোর নগরী এবং পশ্চিম 'বরিন্দ' (অর্থাৎ রারেন্দ্র) নামে খ্যাত। এই ধারেই দেবকোট-নগর অবস্থিত। তিনি আরো লিখিয়াছেন যে, তৎকালে লক্ষ্মণাবতী ও তাহার চতুর্দ্দিক যাজনগর (যাজপুর বা উৎকলের উত্তরাংশ) বঙ্গ, কামরূপ ও ত্রিহুত (মিথিলা) এবং এই সকল দেশ একত্রে গৌড় নামে খ্যাত ছিল। † মিনহাজের বর্ণনা দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রাজা লক্ষ্মণসেনের সময় বর্ত্তমান বীরভুম, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, সাওতাল পরগণা এবং হুগলী জেলা ও হাওড়া জেলা রাঢ় নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ‡‡

'শক্তিসঙ্গম-তন্ত্র' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে এই রাঢ়ভূমি আবার 'অঙ্গ' নামে বর্ণিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়:

"বৈদ্যনাথং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
তাবদঙ্গাভিধো দেশো যাত্রায়াং নহি দুষ্যতে॥"

হাজার বৎসর পূর্ব্বে লিখিত 'পাণ্ডব-দিগ্বিজয়' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে রাঢ়ের বহু স্থানের নামোল্লেখ আছে কিন্তু হুগলী নামটির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা হইতে হুগলী নামটি যে সুপ্রাচীন নয় তাহাই প্রমাণিত হয়। এই সম্বন্ধে রেভারেণ্ড লং সাহেব **On the Banks of**

---

* বিশ্বকোষ, ২২শ ভাগ, পৃঃ ৬৩৫

‡ তবকাৎ-ই নাসিরি, ২০।৮

‡‡ বিশ্বকোষ, ১৬শ ভাগ পৃঃ ৪১৪

Bhagirathi নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"Hugly is a modern name given to it, since the town of Hugly rose into importance." * ঠিক কোন সময়ে যে, হুগলী নামের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহাও বর্ত্তমানে জানিতে পারা যায় না, কারণ হুগলীর যাবতীয় ব্যবসা বাণিজ্য স্মরণাতীত কাল হইতে সপ্তগ্রাম নির্ব্বাহ করিত। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন—"The best account of the origin of Hooghly, which I have seen may be found in the Appendix to the Descriptive Catalogue of Tipoo Sultan's Library No 37, but that account does not define the period, at which it was founded." †

হুগলী নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে ভাগীরথী তীরে বহু হোগলা গাছ জন্মাইত এবং সেই হোগলা গাছ হইতেই হুগলী নামটি আসিয়াছে।

"The name Hooghly is supposed to be derived from the word hoghla, the name of the coarse reeds which once abounded in the banks of the river." ‡

প্রাচীন ইংরাজী গ্রন্থাদিতে ও বিভিন্ন মানচিত্রে** হুগলী—ওগোলি, ওগলি, গোলিন, হিউগলি, হাগলে, গোলি প্রভৃতি বহু নামে উল্লিখিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়, যথাস্থানে তাহা বিবৃত হইবে।

---

* Calcutta Review, 1846, Page 401

† Stewarts History of Bengal, Page 274.

‡ Hooghly Medical Gazetteer, Page 4,

** Valentin's 'Memoirs to Van-Den-Brocke's Map, Page 158.

পূর্ব্বে শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্ম বাঙ্গলাদেশ বিভিন্ন সময়ে নানা উপায়ে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। তৎকালে প্রাদেশিক বিভাগকে "ভুক্তি" বলিত; ভুক্তিকে বর্ত্তমানে বিভাগ (অর্থাৎ Division) বলে। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান মহকুমাকে (Sub-division) 'বিষয়' এবং জেলাকে (District) 'মণ্ডল' বলা হইত। তৎকালে কতকগুলি 'বিষয়' লইয়া 'মণ্ডল' এবং কতকগুলি 'মণ্ডল' লইয়া 'ভুক্তি' হইত। কিন্তু বহু স্থানে আবার মণ্ডল ও বিষয় একই অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে।

মগধ সিংহাসনে যখন পাল রাজাগণ অধিরূঢ় ছিলেন, তখন শাসন সৌকর্য্যার্থে তাঁহাদের সাম্রাজ্যকে তিনটী বিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন—যথা শ্রীনগর ভুক্তি (বিহার প্রদেশ), তীর ভুক্তি (ত্রিহুত) ও পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি (বঙ্গদেশ)। পরবর্ত্তীকালে অন্যান্য স্থানগুলি হারাইয়া, যখন তাহারা কেবলমাত্র বঙ্গদেশ শাসন করিতেছিলেন, সেই সময় বাঙ্গলা দেশকে তাহারা তিনটী 'ভুক্তিতে' অর্থাৎ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

(১) **পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি**—ইহা চব্বিশটী মণ্ডলে বিভক্ত ছিল। যথা—ব্যাঘ্রতটী মণ্ডল, নাবা মণ্ডল, খাড়ি মণ্ডল, বরেন্দ্র মণ্ডল, সমতট মণ্ডল প্রভৃতি। খাড়িমণ্ডলের পূর্ব্বভাগ 'পূর্ব্ব খাড়িমণ্ডল' এই ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত 'পশ্চিম খাড়িমণ্ডল' বর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত ছিল।

(২) **বর্দ্ধমানভুক্তি**—ইহা চারিটী মণ্ডলে বিভক্ত ছিল এবং ইহার সীমানা পূর্ব্বে ভাগীরথী, দক্ষিণে সুবর্ণরেখা ও উত্তরে অজয় নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়, পশ্চিম খাড়ি মণ্ডল ও দণ্ডভুক্তি মণ্ডল এই ভুক্তির অন্তর্গত ছিল। উড়িষ্যা ও বাঙ্গলার মধ্যে অবস্থিত

মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ দণ্ডভুক্তি মণ্ডল বলিয়া কথিত ছিল।

(৩) কঙ্কগ্রামভুক্তি—মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলা, রাজমহল, কাঁকজোল, এবং স'াওতাল পরগণার কতকাংশ ইহার অন্তর্গত ছিল।

এই ভুক্তিগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বী এবং আভ্যন্তরীন ব্যাপারে প্রায় স্বাধীন ছিল। গ্রামের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার, জনকল্যাণ-সাধন প্রভৃতি হিতকর কাজগুলি গ্রামের প্রধান ব্যক্তি 'মোড়ল' দ্বারা অনুষ্ঠিত হইত। "বিষয়পতি", "মণ্ডলেশ্বর", উপাধিধারী রাজকর্ম্মচারীগণ পূর্ব্বোক্ত 'বিভাগগুলি' শাসন করিতেন। বিচারবিভাগ 'মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ' নামক রাজকর্ম্মচারী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত এবং ইহারা প্রত্যেকেই রাজাকে সর্ব্ব বিষয়ে সহায়তা করিতেন।

হিন্দুসমাজে নারী জাতি স্মরণাতীত কাল হইতে যথেষ্ট মর্য্যাদা লাভ করিয়া আসিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে রাণী, সেনানায়িকা, প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্রী প্রভৃতি দায়িত্ব-পূর্ণ পদেও যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। পরে স্মৃতি-কারদের কঠোর বিধি নিষেধের ফলে, নারীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতা ক্রমশঃ ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে। সমাজের অর্দ্ধাঙ্গিনী নারী জাতির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু জাতি ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও পরপদানত হইয়া পড়েন।

ইহাই সংক্ষেপে বাঙ্গলা তথা রাঢ়ের প্রাচীন ইতিহাস।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভৌমিক বিবরণ

হুগলী জেলা প্রথমে বর্দ্ধমানের অন্তর্ভুক্ত ছিল; ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে শাসন কার্য্যের সুবিধার্থে, বর্দ্ধমান জেলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং উত্তরাংশ বর্দ্ধমান এবং দক্ষিনাংশ হুগলী বলিয়া দুইটি পৃথক জেলায় ভাগ করা হয়। (Under Regulation XXXVI of 1795, Zilla Burdwan was divided into two parts, each under a separate officcr.)

মাননীয় মিঃ সি, এ, ব্রুস (Hon'ble Mr C. A. Bruce) এই জেলায় প্রথম জজ ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন এবং ১৭৯৫ হইতে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি এই জেলায় যাবতীয় শাসন কার্য্য পরিচালনা করেন।

হুগলী নামটি পোর্ত্তুগীসদের দেওয়া নাম; তৎকালে ভাগীরথী তীরে বহু হোগলা গাছ জন্মাইত এবং হোগলা হইতেই হুগলী নামের উৎপত্তি হইয়াছে। হুগলী নামের উৎপত্তি এবং বর্ত্তমান হুগলী শহরের সৃষ্টি পোর্ত্তুগীসদের দ্বারা হইয়াছে, ইহার পূর্ব্বে কেবল হুগলী জেলার নয়, সমগ্র বঙ্গদেশের যাবতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য একমাত্র সপ্তগ্রাম নির্ব্বাহ করিত। সপ্তগ্রামের পতনের পর হুগলী পোর্ত্তুগীসদের যত্নে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

হুগলী জেলার আধুনিক সীমাবেষ্টিত স্থানের পরিমাণের মধ্যে প্রাচীনকালে যে কত জন-সংখ্যা ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার বর্ত্তমানে কোন উপায় নাই; কারণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে আদমসুমারি (বা লোক-গণনা) প্রাচীনকালে কোন রাজার ইচ্ছানুসারে, কোন বিশেষ অংশের গণনা করা হইলেও, বর্ত্তমানে যেরূপ সুন্দর ভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই

কার্য্য সমাধা করা হয়, সেইরূপ ভাবে কখনও পূর্ব্বে লোকগণনা করা হয় নাই। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী-ভারত সাম্রাজ্যে সর্ব্বপ্রথম জন সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য একটি আদম-সুমারি (Census) করা হয়। তৎপরে প্রতি দশ বৎসর অন্তর বিশুদ্ধ প্রণালীতে এই কার্য্য সরকার কর্ত্তৃক নির্ব্বাহ হইতেছে।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম লোক গণনা কর হইলেও, ইহার পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীর তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথমে একবার এই জেলার সমগ্র লোক-সংখ্যা গণনা করাইয়াছিলেন।¶ তাঁহার মতে তৎকালে হুগলী জেলার লোক সংখ্যা ১৫ লক্ষ ৮ হাজার ৮ শত ৪৩ জন নির্দ্ধারিত হইয়াছিল ; তন্মধ্যে ৭০ হাজার ২৫ জন শহরের অধিবাসী ছিল (were in the town)। কিন্তু তখন সমগ্র হাওড়া জেলা এবং মেদিনীপুরের অন্তর্গত চন্দ্রকোনা ও ঘাঁটাল হুগলী জেলার মধ্যে ছিল বলিয়া, প্রকৃতপক্ষে ঠিক কত জন লোক যে, আধুনিক হুগলী সহরের অধিবাসী ছিল, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না। তবে 'আধুনিক হুগলীর অধিবাসী' বলিয়া নির্ণীত ৭০ হাজার ২৫জন লোক হাওড়া শহরের তৎকালীন জনসংখ্যা ছিল বলিয়া ডাক্তার ক্রফোর্ড সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে লোকগণনা সঠিক ভাবে ও শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত হয় নাই, সুতরাং উক্ত গণনা যে ভ্রমাত্মক * তাহা সুনিশ্চিত, অধিকন্তু ঘাঁটাল চন্দ্রকোনা ও উলুবেড়িয়া তৎকালে হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল

¶ The earliest attempt to count the inhabitants of Hughly by then Magistrate Mr. E. A. Samuells in 1837.—Hughly District Gazetteer.

* Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol III, Page 40.

এবং সীমাবেষ্টিত স্থানের পরিমাণ ২ হাজার ৫ শত ৯ বর্গ মাইল ছিল বলিয়া জানা যায়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে বলাগড়, শ্রীরামপুর, কৃষ্ণনগর ও গোঘাটে কোন থানা ছিল না; উক্ত স্থানগুলির পরিবর্তে বেনিয়াপুর, রাজাপুর (বর্ত্তমানে জগৎবল্লভপুর) রাজবলহাট, দেওয়ানগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে যথাক্রমে একটি করিয়া থানা ছিল। এতদ্ভিন্ন চুচুড়া এবং হুগলী এই দুইটি নিকটবর্তী স্থানেও তখন দুইটি থানা ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের জনসংখ্যার তালিকাটি উদ্ধৃত হইল।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের লোকসংখ্যা

	থানার নাম		লোকসংখ্যা
১।	হুগলী	...	৭০, ৫২৫
২।	বাঁশবেড়িয়া		৩০, ০৫৭
৩।	বেনিয়াপুর (ক)	...	৬০, ৮১০
৪।	পাণ্ডুয়া	...	১, ০৬, ৩২৪
৫।	ধনিয়াখালি	...	১, ৩৫, ৮৫৭
৬।	শ্রীরামপুর	...	১, ৩৫, ২৫২
৭।	হরিপাল	...	৭২, ৬৭৩
৮।	বৈদ্যবাটী (খ)	...	১, ৩১, ৯০১
৯।	কৃষ্ণনগর (গ)	...	১, ৫৭, ৭০৮
১০।	জাহানাবাদ (ঘ)	...	১, ২০, ৪৯৪
১১।	গোঘাট	...	৮৮, ৬০৪
১২।	চুঁচুড়া	...	১০, ০৭০

(ক) বর্ত্তমানে বলাগড় (খ) বর্ত্তমানে সিঙ্গুর
(গ) বর্ত্তমানে জাঙ্গিপাড়া (ঘ) বর্ত্তমানে আরামবাগ

প্রাচীন কালে হুগলী জেলা যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং এই জেলার অধিবাসিগণ যে খুব কর্ম্মঠ ছিল, তাহা টয়েনবি সাহেব, ভারত সরকারের রেকর্ডে রক্ষিত একখানি পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া (177 Volume. 20. 4. 38) তাঁহার পুস্তকে * লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উক্ত পত্র হইতে জানা যায়—"প্রতি গ্রামে অসংখ্য বড় বড় ইষ্টক-নির্ম্মিত পাকা বাড়ি এবং বাড়ীর মালিকদিগের গৃহে, বিবিধ বিদেশী সুন্দর সুন্দর আসবাব পত্র-সমূহ, তাঁহারা যে বিশেষ ধনশালী এবং কর্ম্মঠ, তাহাই নিসংশয়ে প্রমাণ করে।" নিম্নে পত্রখানি হুবহু উদ্ধৃত হইল :

"The number of brick buildings in every village, the comfortable appearance of the dwellings, and the many article of foreign manufacture which the inhabitants possess, are sufficient evidence of their being a prosperous and industrious race."

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রথম লোক গণনা করা হয় ; উক্ত গণনানুসারে হুগলী জেলার মধ্যে কৈবর্ত্ত ও বাগদি জাতির সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং কায়স্থ ও তেলী জাতির সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দেও বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে কৈবর্ত্ত ও বাগদি জাতির সংখ্যাধিক্য পরিলক্ষিত হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারিতে "কৈবর্ত্ত' জাতির মধ্যে আদি কৈবর্ত্ত ও চাষী-কৈবর্ত্তগণ 'মাহিষ্য' বলিয়া পরিচয় দেওয়ায়, রিপোর্টে দুইটি ভিন্ন জাতি বলিয়া দেখান হইয়াছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে আদি কৈবর্ত্তের সংখ্যা ১৩ হাজার ৭শত ৪০ জন এবং মাহিষ্যের সংখ্যা ১লক্ষ ৭ হাজার ৪ শত ১৬ জন। অনুরূপভাবে প্রথম আদমসুমারিতে তেলী ও কলু একত্রে ছিল, কিন্তু ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তেলী ও কলু ভিন্ন জাতি বলিয়া

বিভিন্ন জাতি

* Toynbee's "A Sketch of the Administration of the Hooghly District." Page 61.

উল্লিখিত হইলেও, তালিকাটির সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য ২২ হাজার ৬৬ জন তেলী ও ১৪ হাজার ৩ শত ১১ জন কলু একত্রিত করিয়া লিখিত হইয়াছে। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে জাতি হিসাবে কোন তালিকা প্রস্তুত না হইলেও, জনসংখ্যা পূর্ব্ববর্ত্তী সেন্সাস রিপোর্টের প্রায় সমান সমান আছে বলিয়া, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের জনসংখ্যাকে বর্ত্তমান সংখ্যা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আদমসুমারির তালিকায় যে সকল জাতির সংখ্যা পঁচিশ হাজারের অধিক, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

তুলনামূলক হিসাব

জাতি	১৮৭২ খৃঃ	১৮৮১ খৃঃ	১৮৯১ খৃঃ	১৯৩১ খৃঃ
কৈবর্ত্ত	২,৮৮,৬২১	১,৪২,৫২৬	১,৪৩,৭৮০	১,৮৮,১৫৬
বাগদি	১,৫২,৬১৮	১,৩৪,১১৫	১,৫৭,৩০৪	১,৫৬,২৪০
ব্রাহ্মণ	১,০৭,৫৩১	৭৬,২৭১	৭৪,৯৯৯	৮৪,১৭২
সদগোপ	৬৩,৭৭৪	৬১,০২১	৫৬,২৮৮	৫৪,৫২৪
গোয়ালা	৬৫,৩৬৬	৪৬,১৩৪	৩৮,৬০২	৪৩,২৮৯
কায়স্থ	৩৮,৭২২	২৫,৪৮৪	২৯,১৭৭	২৮,১৯৫
তেলী	২৯,১১২	৪৭,০৩৮	৫৪,৬০৩	৩৬,৩৭৭

কৈবর্ত্ত ও বাগদি জাতির হুগলী জেলায় বাস সম্বন্ধে ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব তাহাদিগকে আদিতে অনার্য্য জাতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। * পরবর্ত্তীকালে তাহারা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করায় হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়াছে। † জনশ্রুতি যে, মাহিষ্যগণ ৮২২ শকাব্দাতে মেদিনীপুর জেলায় প্রথম আসিয়া উক্ত জেলার

কৈবর্ত্ত ও বাগ্দী

* Hunter's Statistical Account of Bengal. Page 54.

† মেদিনীপুরের ইতিহাস—শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু,—পৃঃ ৪৫৯

অন্তর্গত তমলুক, বালিসীতা, তুরকা, সুজামুটা ও কুতবপুর নামক স্থানে, পাঁচটি স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন করে এবং পরে মেদিনীপুর জেলা হইতে তাহারা বঙ্গের অন্যান্য স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। * ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কামিং সাহেব সেন্সাস রিপোর্টে এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, ইহাদিগকে হাণ্টার সাহেবের ন্যায় অনার্য্য-বংশ-সম্ভূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহাদের সহিত এই বিষয়ে এক মত নহি।

বাগদি হুগলী জেলার আদিম অধিবাসী এবং ইহারাও মূলে অনার্য্য জাতি ছিল বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। বকডিহি পরগণাতে আদি নিবাস ছিল বলিয়া ইহাদের 'বাগদি' এই নামকরণ হয়। মেগাস্থিনাস যে 'গঙ্গরডয়' দেশের কথা খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩২৬ অব্দে উল্লেখ করিয়াছিলেন; এই বাগদিগণই সেই গঙ্গরিডয় রাজ্যের আদিম অধিবাসী ছিল।

"The Gungardae were undoubtedly Hindus, and they were mainly composed of Bagdis, who can still be identified as the original stratum of the population in the deltaic portion of the district, and who are allowed by the Hindus of pure Aryan race to represent the great aboriginal section which was admitted with the pale of Hinduism in distinction from all the rest who are classified as chuars".†

ভাগবতে সুহ্মবাসীকে পাষণ্ড বলা হইয়াছে; এই পাষণ্ড আমাদের মনে হয় বৌদ্ধগণকে না বলিয়া যাহারা 'রাঢ়' বা 'চুয়াড়' নামে অভিহিত হইত, সেই আদিম অধিবাসিগণকে বলা হইয়াছে! খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্দ্ধমান স্বামী বা মহাবীর স্বামী এই দেশের অধিবাসিগণের

* সাহিত্য প্রকাশ—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার, পৃষ্ঠা ৩৬।

† Some Historical and Ethical Aspects By W.B.Oldham. Page—19.

মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসিয়া 'চুয়াড়'গণের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, তাহার নামানুসারে 'বর্দ্ধমান' নামকরণ হইয়াছে। হুগলী জেলার নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে অদ্যাপি 'রাঢ়-চুয়াড়' বলা হয় এবং কোন ভদ্রলোক অসভ্যতা করিলে, তাহাদিগকে 'চুয়াড়ের' মত ব্যবহার বলিয়া অভিহিত করা হয়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাহার চণ্ডীকাব্যে লিখিয়াছেন :

"অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়।
কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়॥"

১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হুগলী জেলা দুইটী মহকুমায় বিভক্ত ছিল, যথা হুগলী সদর এবং শ্রীরামপুর। হুগলী সদর—হুগলী, বাঁশবেড়িয়া, বলাগড়, পাণ্ডুয়া ও ধনিয়াখালি এই পাঁচটি থানায় বিভক্ত ছিল এবং শ্রীরামপুর মহকুমা—সেওড়াফুলি, বৈদ্যবাটী, হরিপাল, কৃষ্ণনগর ও চণ্ডীতলা এই পাঁচটি থানায় বিভক্ত ছিল। জাহানাবাদ (বর্ত্তমান আরামবাগ) এবং গোঘাট থানা তৎকালে বর্দ্ধমান জেলায় এবং খানাকুল থানা হাওড়া জেলার মধ্যে ছিল। সেইজন্য উক্ত থানাগুলির ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের জনসংখ্যা বর্ত্তমান জনসংখ্যার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য, পূর্ব্বোক্ত তালিকায় যোগ করিয়া দেখান হইয়াছে।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার সীমা পরিবর্ত্তিত হয় এবং খানাকুল, জাহানাবাদ ও গোঘাট এই তিনটি থানা লইয়া 'জাহানাবাদ' বলিয়া একটি নূতন মহকুমার সৃষ্টি হয়। বাঁশবেড়িয়া হইতে থানা উঠিয়া যায় এবং পোলবা নামক স্থানে একটি নূতন থানা গঠিত হয়। বৈদ্যবাটীর থানা সিঙ্গুরে স্থানান্তরিত হয়। গয়া জেলায় জাহানাবাদ * বলিয়া একটি স্থান থাকায়,১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত "কলিকাতা

---

* Government Notification No. 36 J. D. dated 19th April, 1900.

গেজেটের" এক বিজ্ঞপ্তিতে, জাহানাবাদ মহকুমা "আরামবাগ" নামে প্রখ্যাত হয়।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলায় দশটি থানা ছিল; বর্ত্তমানে এই স্থানে আঠারটি থানা স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে "বর্দ্ধমানের জর" নামক ম্যালেরিয়া, মারাত্মক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মহামারীরূপে জেলার বহু প্রাচীন জনবহুল স্থান জনশূন্য করিয়া দেয়।* তাহার ফলে, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনায় ১ লক্ষ ৪৫ হাজারের অধিক লোক কমিয়া গিয়াছিল, দেখিতে পাওয়া যায়। ওম্যালী সাহেব এই সম্বন্ধে হুগলী ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটিয়ারে লিখিয়াছেন:

বর্দ্ধমান জর

In the nine years following the census of 1872, the population declined by no less than 13 per cent, owing mainly to the terrible epidemic of malaria fever known as 'Burdwan fever.'

সমগ্র বর্দ্ধমান বিভাগে এই মহামারীর প্রকোপ বেশী হয় বলিয়া ইহা 'বর্দ্ধমানের জর' বলিয়া খ্যাত হয়।† ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে 'বর্দ্ধমান-জরের' মহামারী রূপ শেষ হয়। এই রোগের উৎপত্তি বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর স্যার সিসিল বিডন কর্ত্তৃক ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এক 'কমিশন' নিয়োজিত হয়। উক্ত কমিশনের রিপোর্টে বর্দ্ধমান বিভাগের এক-তৃতীয়াংশ লোক, এই জরে দেহরক্ষা করে বলিয়া কোন কোন সভ্য মত প্রকাশ করেন। নিম্নে উক্ত রিপোর্টের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল:

"Dr. French who made a special enquiry into the outbreak, estimated the total mortality at about one third

* Reports of the Epidemic occurring in parts of Burdwan and Nadia Division—By Dr. J. Elliott.

† Vide Calcutta Gazette, 10th January, 1872.

of the population in the tracts attacked by the epidemic. The instances given by him show that this was no exaggeration....

* * * * *

Still more significant proof of the enormous mortality is to be found in the fact that the population in 1872 was not much in excess of the estimate formed by Mr. Bayley nearly 60 years before."

ইংরাজী ১৮৭৪ সালে বর্দ্ধমান বিভাগে এই রোগের মহামারী রূপ শেষ হয়। ইং ১৮৮১ সালের বাংলা দেশের সেন্সাস রিপোর্ট পাঠে আমরা যাহা অবগত হই,তাহা নিম্নের কয়েকটী লাইন হইতে বুঝা যাইবে।

"The year 1874 may be taken as the last year of the epidemic in this Division (Burdwan); from all quarters reports came that the fever was less fatal and less prevalent than in previous years. In 1875 the same facts were observed again, and what fever there was wanted the virulence of the epidemic, and had all the characteristics of the ordinary seasonal malarious fever of the country." (Para 148).

ইংরাজী ১৮৭২ হইতে ১৮৮১এর মধ্যে বর্দ্ধমান জেলার লোকসংখ্যা শতকরা ৬ জন এবং হুগলী জেলার লোকসংখ্যা শতকরা ১৩ জন করিয়া কমিয়া গেল। আর এই 'বর্দ্ধমান জ্বরে'র লক্ষণ উদর-জোড়া প্লীহা ও সংক্রামক জ্বর। জ্বরের লক্ষণ সম্বন্ধে হুগলী জেলার সিভিল সার্জ্জেন ক্রফোর্ড সাহেব (Lt. Col. D. G. Crawford) বলিতেছেন যে:

"In its worst phases the fever assumed a tendency to congestion of some vital organs, most commonly the brain or lungs; and among the commonest sequence were enlargement of the liver and spleen. Its chief peculiarity was the tendency to a relapse or a succession of relapses;

and in some cases, sudden and great depression of vital energy followed."

ডাক্তার জে, এলিয়ট ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ হইতে এই মহামারীর কারণ কি, সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন এবং এই ব্যাধির গতি যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, সেরূপ আর কেহ করেন নাই। তাহার রিপোর্টে হুগলী জেলার কোন স্থান হইতে এই ব্যাধি, কি ভাবে সংক্রামিত হয়, তাহার বঙ্গানুবাদ করিয়া নিম্নে উল্লিখিত হইল :

"১৮৬০ খৃষ্টাব্দের বর্ষারম্ভে এই মড়ক হালিসহর হইতে গঙ্গার পশ্চিম তীরে হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া, শিবপুর, ও ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হইল।

ত্রিবেণী হইতে ক্রমে ইহা সরস্বতী নদীর দুই তীর দিয়া পশ্চিম দিকে মগরা, সপ্তগ্রাম ও হোসেনাবাদ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিল।

তারপর ১৮৬১ ও ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাধি ত্রিবেণীর উত্তর দিকে অবস্থিত জয়পুর, বাগাটী, ও নয়াসরাই হইয়া ডুমুরদহ, সীজে, জিরেট ও বলাগড়ে দেখা দিল এবং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বলাগড় হইতে পাণ্ডুয়ায় উপস্থিত হইল ও ছয় মাসের মধ্যে বার শত লোকের জীবন-নাশ করিল।"

কমিশনের একমাত্র ভারতীয় সদস্য রাজা দিগম্বর মিত্র ব্যাধির একটি নূতন কারণ আবিষ্কার করিয়া বলেন যে, সরকার যত্রতত্র রাস্তা, বাঁধ ও রেলওয়ে লাইন প্রস্তুত করায়, জল-নিকাশের বিঘ্ন উৎপাদিত হয় এবং তাহার ফলে যে সমস্ত ভূভাগ অধিকতর আর্দ্র হইয়াছিল, সেই সকল স্থানেই এই মহামারী প্রথম আরম্ভ হয়। *

* The Epidemic Fever in Bengal.
—Hindu Patriot, 1872-73.

১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'বর্দ্ধমানের জ্বর' নামক মহামারীর জন্য হুগলী জেলার লোকসংখ্যা সাড়ে ছয় লক্ষ অর্থাৎ শতকরা ১৩জন কমিয়া যায়,তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

লোকক্ষয় ও দেশত্যাগ

যাঁহারা কোনক্রমে মহামারীর হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের জীবনীশক্তি ও সন্তান-প্রজননের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া গিয়াছিল। ইহার অব্যবহিত পরে হুগলী জেলা হইতে লোক বাসত্যাগ করিতে আরম্ভ করেন।

"The fever reduced the vitality of the survivors thus diminishing the birth rate and also forced a number of its inhabitants to leave the district for healthier locality."

এই মহামারীর পর উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ এবং যাঁহাদের অবস্থা সচ্ছল, তাঁহারা অধিকাংশই কলিকাতায় চলিয়া আসেন। ওম্যালি সাহেব এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

"The most noticeable feature of immigration from Pengal is the large proportion contributed by West Bengal. Nearly one half of the Bengali immigrants come from the Burdwan Division, Hooghly sending 48,000, Midnapore 29,000, Burdwan 21,000, and Howrah 15,000."*

বর্ত্তমানে খাস কলিকাতার সমগ্র লোকসংখ্যার মধ্যে শতকরা পঁয়ত্রিশ জন অ-বাঙ্গালী; কলিকাতায় মফঃস্বলবাসী বাঙ্গালী অপেক্ষা অ-বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ। বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলা হইতে আগত মফঃস্বলবাসীদের মধ্যে হুগলী জেলা অদ্যাপি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং এই জেলার অধিবাসীদের সংখ্যাই কলিকাতায় সর্ব্বাধিক।

---

* Census of India, 1911, Vol VI, Part I. Page—14.

মফঃস্বলের কোন্ জেলা হইতে কত লোক কলিকাতায় আসিয়াছে তাহার প্রথম দশটি জেলার হিসাব এইরূপ :

১।	হুগলী ...	৪৭,০৯২	৬।	ফরিদপুর ...	১০,৫৮৬
২।	মেদিনীপুর ...	৩৬,০৮২	৭।	যশোহর ...	৯,৫৪৮
৩।	ঢাকা ...	৩০,৪৬৫	৮।	বাখরগঞ্জ ...	৭,২:৮
৪।	বর্দ্ধমান ...	২০,৬২৭	৯।	বাঁকুড়া ...	৭,১৭৯
৫।	নদীয়া ...	১৬,২৩৫	১০।	মুর্শিদাবাদ ...	৬,১০৯

১৮৭২ খৃঃ হইতে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হুগলী জেলার মোট জনসংখ্যা এবং এক বর্গ মাইলের গড় জনসংখ্যা নিম্নোক্তরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল :

বৎসর	লোকসংখ্যা	এক বর্গ মাইলের গড়ে জনসংখ্যা
১৮৭২	১১, ৫৭, ৯০৬	৯৫৩
১৮৮১	১০, ১২, ৭৬৮	৮২৮
১৮৯১	১০, ৭৬, ৭১০	৮৮০
১৯০১	১০, ৫০, ৩৬৫	৮৮৩
১৯১১	১০, ৯০, ০৯৭	৮৮৭
১৯২১	১০, ৮০, ১৪২	৯০৯
১৯৩১	৯, ১০, ৬৬২	৮৫৯
১৯৪১	১০, ৯৪, ৮২০	৯৪৩

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ও ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে, হুগলী জেলার কোন্ থানায় কত লোক-সংখ্যা ছিল, তাহার একটি তুলনামূলক তালিকা এবং ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে, কোন্ থানার মধ্যে কতগুলি গ্রাম আছে তাহা লিখিত হইল :

থানার নাম	১৮৭২	১৯৪১	গ্রামের সংখ্যা	ইউনিয়নবোর্ডে সংখ্যা
হুগলী (বর্ত্তমানে চুঁচুড়া)	৬৭,৫৩৮	১০,৭৮৪ *	২৩	১
বংশবাটী	৪১,৩০৯	...		
বলাগড়	৬০,৯৫৫	৫২,০২৯	১৫৩	৮
পাণ্ডুয়া	৭৭,৩৩২	৮১,৭৮৯	১৭৪	১৪
ধনিয়াখালি	১,০৬,৫০১	৮৭,৯৫৬	৩২০	১২
পোলবা	...	৭৫,৫৬৭	২৭৩	১২
শ্রীরামপুর	৩৮,৪৬৩	১১,১১৪ *	২২	২
বৈদ্যবাটি	৮০,২৯১	...		
হরিপাল	১,১১,৬৮৯	৭৩,৫৩৯	২০৫	৮
কৃষ্ণনগর (বর্ত্তমানে জাঙ্গিপাড়া)	৬৯,২৮০	৬৭,০৯১	১৫২	৭
চণ্ডীতলা	৯৪,১৪১	১,২৩,১৫১	১২৮	৭
সিঙ্গুর	...	৮২,৫৫০	২৩১	৬
খানাকুল	১,৬৫,১৯২	১,২২,১৮৮	১৫২	১২
আরামবাগ	১,২৮,৯৬৯	৭৫,২০৮	১৫৪	৯
গোঘাট	১,৩৬,২৪৬	৮২,৪৭১	৩৬৭	১২
মগরা	...	১৮,০৪০	৬৯	২
ভদ্রেশ্বর	...	১০,৫২০	২৪	১
উত্তরপাড়া	...	১২,৩৯৯	৮	১
তারকেশ্বর	...	৫২,৭৯৭	১৩৮	৫
পুঁরশুড়া	...	৫৫,৬২৬	৬৪	৪

* মিউনিসিপ্যাল এলাকাভুক্ত স্থানের জনসংখ্যা পৃথকভাবে শহরের মধ্যে দেখান হইয়াছে বলিয়া, বর্ত্তমান গ্রামের জনসংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে।

হুগলী জেলার প্রতি বর্গ মাইলে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের সেনসাস রিপোর্টে ৯৪৩ জন লোক বাস করে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রতি বর্গমাইলে ৯৫৩ জন লোক বাস করিত; সুতরাং প্রায় সত্তর বৎসরের মধ্যে জেলার প্রতি মাইলে দশ জন করিয়া লোক হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই জেলার পরিমাণ ১১৬৮ বর্গ মাইল এবং শহরের পরিমাণ ৩১৮ বর্গ মাইল। আয়তনে ময়মনসিংহ জেলা বঙ্গদেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে; হুগলী জেলার আয়তন ক্ষুদ্র জেলাগুলির মধ্যে অন্যতম। ইহাকে চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের ন্যায় মনে হয় এবং ইহার আয়তন ইংলণ্ডের চুয়াল্লিশ ভাগের একভাগ। ওম্যালি সাহেব 'গেজেটিয়ারে' লিখিয়াছেন যে, ১৯১১ খৃষ্টাব্দের সেনসাস অনুযায়ী হুগলী জেলার সীমা-বেষ্টিত স্থানের পরিমাণ ১১৮৯ বর্গ মাইল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী; ইহার আয়তন 'গ্লোচেষ্টারসায়ারের' অপেক্ষা কিছু ছোট, কিন্তু ইহার জনসংখ্যা 'স্যারের' দ্বিগুণ।

"It extends over 1189 Sq. miles and at the Census of 1911 its population 10,90,097. In area it is slightly smaller than Gloucestershire, while its population is double that of Surrey."

বর্ত্তমানে হুগলী জেলায় দশটি শহর এবং লোকজন বাস করে এইরূপ গ্রামের সংখ্যা ২,৫৬৩টি আছে। শহরের ও গ্রামের লোকসংখ্যা যথাক্রমে ১০ লক্ষ ৯৪ হাজার ৮শত ২০ জন এবং ২ লক্ষ ৮২ হাজার ৯ শত ২ জন। প্রত্যেকটি শহরে মিউনিসিপ্যালিটি আছে; হুগলী সদর মহকুমার দুইটি শহর, শ্রীরামপুর মহকুমায় সাতটি শহর এবং আরামবাগ মহকুমার একটি শহর আছে। এই জেলার মধ্যে ফরাসী অধিকৃত 'চন্দননগর' নামে একটি স্বতন্ত্র শহর আছে; ইহা চুঁচুড়ার দক্ষিণদিকে ভাগীরথী তীরে অবস্থিত এবং ইহার আয়তন মাত্র চার বর্গ মাইল হইলেও, এইরূপ সুন্দর শহর বঙ্গদেশে অন্য কোন জেলার মধ্যে

নাই। ইহার সম্বন্ধে পৃথক অধ্যায়ে বিশদ ভাবে বর্ণনা করা হইবে। আয়তনের দিক দিয়া হুগলী জেলা ক্ষুদ্র হইলেও, এই স্থানে অনেকগুলি প্রাচীন শহর বিদ্যমান থাকায়, শহরের জনসংখ্যায় এই জেলা বাঙ্গলাদেশে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রথম কলিকাতা, দ্বিতীয় হাওড়া এবং তৃতীয় হুগলী। এই সম্বন্ধে সেনসাস রিপোর্টে লিখিত আছে :

"Calcutta, which is all urban, comes first followed by Howrah, which takes so high a place because its area is small and it has a large urban population. The districts which follow are Eastern Bengal districts except Hooghly, which has a large urban population."*

নিম্নে হুগলী জেলার মিউনিসিপ্যালিটিগুলির বর্ত্তমান সভাপতিগণের নাম ও প্রতিষ্ঠা-বৎসর প্রদত্ত হইল :

মিউনিসিপালিটি	প্রতিষ্ঠিত	সভাপতির নাম
হুগলী-চুঁচুড়া	১৮৬৫	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বাঁশবেড়িয়া	১৮৬৯	শ্রীরতন কুণ্ডু
চাঁপদানী	১৮৬৯	শ্রীপুলিনবন্ধু মুখোপাধ্যায়
শ্রীরামপুর	১৮৬৫	শ্রীকানাইলাল গোস্বামী
বৈদ্যবাটি	১৮৬৯	ডাঃ এ, এন, সেন
রিষড়া	১৮৮৬	শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ
কোন্নগর	১৮৮৬	মিঃ এন, ডি, বসু
উত্তরপাড়া	১৮৬৪	শ্রীঅমর মুখোপাধ্যায়
ভদ্রেশ্বর	১৮৬৯	মিঃ ডি, এল, ব্রডি
আরামবাগ	১৮৮৬	ডাঃ নির্ম্মলচন্দ্র পাল

* Census of India, 1921, Vol. V.

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এবং ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার কোন শহরে কত জনসংখ্যা ছিল, তাহার দুইটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের তালিকাটি হাণ্টার সাহেবের Statistical Account of Bengal, Vol. III নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের জনসংখ্যা

শহরের নাম	কোন্ থানার অন্তর্গত	জনসংখ্যা
১। হুগলী	হুগলী	৩৪,৭৬১
২। বলাগড়	বলাগড়	১৫,৬৩০
৩। জাহানাবাদ	জাহানাবাদ	১৩,৪০৯
৪। খানাকুল	খানাকুল	১৪,৫৩৭
৫। শ্যামবাজার	গোঘাট	১৯,৬৩৫
৬। শ্রীরামপুর	শ্রীরামপুব	২৪,৪৪০
৭। বৈদ্যবাটী	বৈদ্যবাটী	১৩,৩৫২
৮। উত্তরপাড়া	চণ্ডীতলা	৪,৩৮৯

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের জনসংখ্যা

শহরের নাম	পুরুষ	স্ত্রী
১। হুগলী-চুঁচুড়া	২৭,৬৯৫	২১,৩৮৬
২। বাঁশবেড়িয়া	১৬,৩৫০	৭,৩৫৬
৩। শ্রীরামপুব	৩৪,৪২৪	২০,৯১৬
৪। বৈদ্যবাটী	১৪,৯০৮	১০,৯১৭
৫। রিষড়া-কোন্নগর	২৪,৬৩৭	১২,৫৯৫
৬। উত্তরপাড়া	৭,৯৩৮	৫,৬৭২
৭। কোতরং	৫,৫৯০	৩,৮১১
৮। চাঁপদানী	২১,৩৪১	১০,৫২২
৯। ভদ্রেশ্বর	১৭,৫৫৯	১[illegible],১১৪
১০। আরামবাগ	৪,৭৬৬	৪,৫২৬

হুগলী জেলা অক্ষাংশ ২২° ৩৬' ও ২৩° ১৪' উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৭° ৩০' ও ৮৮° ৩০' পূর্ব্বে অবস্থিত। এই জেলার প্রাকৃতিক দৃশ্য সর্ব্বত্র একরূপ নহে; গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানগুলিতে সুন্দর সুন্দর ইষ্টকনির্ম্মিত সুরম্য ভবন, গঙ্গার তটদেশ হইতে ইষ্টক বা প্রস্তর-নির্ম্মিত শত শত সুন্দর স্নানের ঘাট, ফল-ফুল শোভিত অসংখ্য উদ্যান, বহুসংখ্যক দেব-মন্দির, এবং পাট বা কাপড়ের কলগুলি আধুনিক সভ্যতা ও বর্ত্তমান ব্যবসায়াদির পরিচয় প্রদান করিতেছে। কোথাও বা তালবৃক্ষরাজি দণ্ডায়মান, কোথাও বা বাঁশঝাড় নদীর জলের উপরে হেলিয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা প্রাচীন অশথ বা বট বৃক্ষগুলি শাখা-বিস্তার করিয়া সুদূর অতীতের পুরাতন দিনগুলির সাক্ষ্য দান করিতেছে। ছোট বড় নৌকাগুলি যাত্রী লইয়া গঙ্গার এ পার হইতে অন্য পারে গমনাগমন করিতেছে, ঘাটে নর-নারী, বালক-বালিকা স্নান ও পূজাহ্নিক করিতেছে এবং গঙ্গাতীরস্থ কল-কারখানাগুলি হইতে উৎপন্ন বিভিন্ন দ্রব্য-সম্ভার বহন করিয়া, মাল-বাহী ষ্টীমারগুলি গঙ্গাবক্ষে প্রতিনিয়ত বিচরণ করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য

গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থান হইতে একটু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, গ্রাম্য-জীবন যাপনের দৃশ্য নয়নগোচর হয়। বিবিধ ফল ও ফুলের গাছ, ধান্যের বিস্তৃত ক্ষেত্র এবং ছোট বড় পুষ্করিণী জেলার সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। Mr. L. S. S. O'Malley "হুগলী গেজেটিয়ার" নামক সরকারী গ্রন্থে হুগলী জেলাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল:—

"The district may be divided into three tracts—urban, semi-urban and rural. Broadly speaking, the urban tract consists of the narrow ripairian strip between the Hooghly on the east and the railway on the west. The French

town of Chandernagore and all the municipal towns, except Arambagh, lie in one continuous line in this strip, viz, from Tribeni southwards Bansberia, Hooghly (including Chinsura), Bhadreswar, Baidyabati, Serampore, Kotrong Uttarpara. The eighth municipality, Arambagh, is really a congeries of village and has been constituted a municipality, as being the headquarters of a sub-division rather than a place with urban characteristics."*

হুগলী জেলাকে ওম্যালী সাহেব তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ; যথা শহর, আধা-শহর এবং গ্রাম। গঙ্গাতীরস্থ স্থানগুলি ব্যবসায়ের জন্য বহু প্রাচীন কাল হইতে শ্বেতাঙ্গ বণিকদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল এবং তাহাদের ঐকান্তিক যত্নেই নদীতীরবর্ত্তী স্থানগুলি ক্রমশঃ শহরে পরিণত হয়। উদাহরণ স্বরূপ দেখাইতে পারা যায় যে, তৎকালে ইংরাজদের প্রাধান্য ছিল হুগলীতে, ওলন্দাজদিগের প্রাধান্য ছিল চুঁচুড়াতে, চন্দননগরে প্রাধান্য ছিল ফরাসীদের, ব্যাণ্ডেলে প্রাধান্য ছিল পোর্ত্তুগীসদের, শ্রীরামপুরে প্রাধান্য ছিল দিনেমারদের, রিষড়াতে প্রাধান্য ছিল গ্রীকদের, এবং ভদ্রেশ্বরে প্রাধান্য ছিল জার্ম্মান ও অষ্ট্রিয়ানদের। ভাগীরথী হইতে বর্ত্তমান রেল লাইনের দূরত্ব প্রায় দুই মাইল এবং এই রেল লাইনের নিকট দিয়া প্রাচীন গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নামক রাস্তাটি গিয়াছে। রেলওয়ে লাইন হইবার বহু পূর্ব্বে, গঙ্গা এবং এই সুন্দর রাস্তাটি—এই দুইটির সমন্বয় যে হুগলী জেলার এতগুলি শহর-নির্ম্মাণে শ্বেতাঙ্গ বণিকগণকে সহায়তা করিয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বৈদেশিক আক্রমণ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়া আসিয়াছিল সত্য, কিন্তু বৈদেশিক সম্পদ ও সভ্যতা যে জলপথে আসিয়াছিল, তাহা কে না জানে ? সেই জন্যই বিদেশী ভাবধারাকে এই জেলার অধিবাসিগণ নিজস্ব চিন্তাধারার সহিত সর্ব্বাগ্রে সামঞ্জস্য করিয়া, পরবর্ত্তীকালে সমগ্র ভারতবর্ষের পথপ্রদর্শক হইয়াছিল।

---

*Hughly District Gazetteer. Page 95.

দ্বিতীয়তঃ 'আধা-শহর' হুগলী জেলার মধ্যে যেরূপ আছে, সেইরূপ অন্যত্র আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। সামান্য একটি গ্রামে প্রাসাদোপম অট্টালিকা, সুবৃহৎ দুর্গা-পূজার দালান, সান বাঁধান বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী এবং পুরাতন সুউচ্চ দেব-মন্দিরগুলি দেখিয়াই ইংরাজ বণিকগণ বিস্মিত হইয়া লিখিয়াছিলেন '...are sufficient evidence of their being a prosperous and industrious race.' উদারহণ স্বরূপ সিঙ্গুর, শিয়াখালা, চণ্ডীতলা, জনাই, বাকসা, বেগমপুর, ঝাপড়দহ, মাকড়দহ প্রভৃতি আধা-শহরের নাম করিতে পারা যায়। এই গ্রামগুলির মধ্য দিয়া সরস্বতী নদী প্রবাহিতা; বর্তমানে ইহা ক্ষীণাঙ্গী হইলেও, পূর্ব্বোক্ত গ্রামগুলি যে উক্ত নদীর দ্বারা সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত।

তৃতীয়তঃ গ্রাম, ইহার মধ্যে আছে শবুজ ধানের ক্ষেত, পুষ্করিণীতে মাছ, ময়রার দোকানে কেবল মুড়ি-বাতাসা ও পণ্ডিত মহাশয়ের ছোট্ট পাঠশালা আর চণ্ডীমণ্ডপে পূজা-পার্ব্বণে আনন্দ উৎসব। এক কথায় বাহিরের সাহায্য ব্যতীত যেন ইহাদের দিন অবাধে চলিয়া যায়। পৃথক অধ্যায়ে যথাস্থানে বিস্তারিত ভাবে শহর, আধা-শহর ও গ্রামের বিষয় আলোচনা করিব। নিম্নে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ও ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার কোন্ মহকুমায় কতগুলি গ্রাম ও মহকুমাগুলির আয়তন এবং কত মাইল রাস্তা বর্তমানে এই স্থানে আছে, তাহা সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল :

মহকুমার নাম	আয়তন (বর্গমাইল)		গ্রামের সংখ্যা		রাস্তা (১৯৪১)	
	১৯০১	১৯৪১	১৯০১	১৯৪১	পাকা	কাঁচা
১। হুগলী সদর ...	৪৪০	৪৩৭	৯৩৯	১০১২	৭০ মাইল	৪১৪
২। শ্রীরামপুর ...	৩৪৩	৩২৯	৭৮৩	৯১৪	৫৩	৩২৯
৩। আরামবাগ ...	৪০৬	৪০৩	৬৫৮	৭৩৭	৬	৩৭৩
	১,১৮৯	১১৬৯	২৩৮০	২৬৬৩	১২৯	১১১৬

বাঙ্গলা দেশ নদীমাতৃক ; বাঙ্গলার হিন্দু সভ্যতা যে 'গাঙ্গেয় সভ্যতা' তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে সেই জন্ত পশ্চিম-বঙ্গে বহু বড় বড় হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল এবং এই স্থান হিন্দুদের আবাসভূমি ও হিন্দু-সভ্যতার পীঠস্থান ছিল। এই জেলার মধ্য দিয়া চারিটি প্রধান নদী প্রবাহিত হইয়াছে ; তাহাদের নাম ভাগীরথী, দামোদর, দ্বারকেশ্বর এবং রূপনারায়ণ।

নদ ও নদী

হুগলী জেলার পূর্ব্বদিকে **ভাগীরথী** নদীর পঞ্চাশ মাইল এই জেলার মধ্যে আছে। এই সম্বন্ধে 'গেজেটিয়ারে' লিখিত আছে :

"The Ganges has three distinct divisions, the upper sections from the point of bifurcation to its confluence with the Jalangi at Nadia, the central section from Nadia to its confluence with the Rupnarain at Hooghly point and the lower section from Hooghly point to the sea. The central section is a little more than 120 miles long of which 50 miles lie along the eastern boundary of Hooghly district."*

ভাগীরথীকে বৈদেশিক বণিকগণ হুগলী শহরের পার্শ্বে বলিয়া 'হুগলী নদী' (**Hughli River**) বলিয়া অভিহিত করিতেন। এই সম্বন্ধে বঙ্গদেশের প্রথম সাময়িক পত্র 'দিগদর্শন' নামক মাসিক-পত্রে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

"হুগলি শহর ক্ষুদ্র কিন্তু প্রাচীন পূর্ব্বে অতি বড় ছিল এখন তাহার প্রায় কিছুই নাই। পূর্ব্বে সে একটা বড় বন্দর ছিল এবং ইউরোপীয়

---

* **Hooghly District Gazetteers; Page 6.**

বাণিজ্যের তাবৎ হাঁসিল সেখানে দাখিল হইত এবং ইংলণ্ডীয়েদের বাণিজ্যের স্থান সেই স্থানে ছিল, পরে সেখান হইতে কলিকাতা হইল। ইংলণ্ডীয়েরা এ দেশের বিবরণ কিছু জানিতেন না, তাহাতে গঙ্গানদীর নাম হুগলী নদী কহিতেন।"

ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পোর্ত্তুগীস ও ওলন্দাজ নাবিকগণের দ্বারা অঙ্কিত বঙ্গদেশের কয়েকখানি পুরাতন মানচিত্র আছে; উক্ত মানচিত্রগুলি দেখিলে, গঙ্গার গতির কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ১৫৬১ খৃষ্টাব্দের গাশতল্ডির মানচিত্র এবং ১৫৫৩ হইতে ১৬১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অঙ্কিত ডি-ব্যারোর মানচিত্র দেখিলে, তৎকালীন গঙ্গার সহিত বর্ত্তমান গঙ্গার যে কত প্রভেদ, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। ভাগীরথীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় হুগলী জেলার নৈসর্গিক সীমার বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। উইলিয়মে ক্রটন বলেন যে ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী শহর গঙ্গা নদীর একটি দ্বীপ ছিল। 'বার্ণিয়ার ট্রাভেলে' প্রদত্ত একখানি মানচিত্রেও হুগলীকে একটি দ্বীপ বলিয়া দেখান আছে। ষ্টুয়ার্টের 'ডেসক্রেপটিক ক্যাটলগে' লিখিত আছে যে, পোর্ত্তুগীসগণ গঙ্গার দিক ব্যতীত অপর তিন দিকে গড়-খাত কাটিয়া, তাহা জলে পূর্ণ করিয়া রাখিত; যাহাতে অন্য কোন ব্যবসায়িবৃন্দ তাহাদের সীমানার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিতে না পারে।

রেনেল সাহেবের ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত The Hoogly River from Nuddeah to the Sea with Balasore Road শীর্ষক প্রামাণিক মানচিত্রের সহিত বর্ত্তমান ভাগীরথীর তুলনা করিলে, এই নদীর গতি যে কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। স্বর্গীয় বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র 'পুরন্দর খাঁ' নামক গ্রন্থে ভাগীরথী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার অংশবিশেষ পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল:

"যে নদীপথ দ্বারা কবিকঙ্কন চণ্ডীর শ্রীমন্ত সওদাগর পোতে গমন করিযা মগরায মহা ঝড় ও বৃষ্টিতে পড়িযাছিলেন এবং অবশেষে সমুদ্রপথ দ্বারা সিংহলে গিযাছিলেন, সে নদীর এক্ষণে চিহ্ন মাত্র নাই বলিলে অত্যুক্তি হয না। বর্ত্তমান ভাগীরথী কালীঘাট উত্তীর্ণ অনতিদূরে টালির নালায বিলুপ্ত হইযাছে। সরস্বতী ও রূপনারাযণের খাঁড়ী এক্ষণে ভাগীরথীর পরিদৃশ্যমান মুখ এবং তাহা ইংরাজ বাহাদুর কর্ত্তৃক হুগলী নামে অভিহিত হইযাছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা ভাগীরথীর মুখ নহে। প্রায চারিশত বৎসর পূর্ব্বে খিদিরপুর হইতে সাঁখরাল পর্য্যন্ত নদীর চিহ্নমাত্র ছিল না। ভাগীরথীর সহিত সরস্বতীর যোগ প্রথমতঃ একটি খাল কাটিযা সম্পাদিত হয। জলপ্রবাহে ঐ খাল ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে 'কাটি গঙ্গা' হইযাছে; 'কাটি গঙ্গা' এক্ষণে হুগলীর একাংশ।"

১৬৫৮-১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়ার ওলন্দাজ শাসনকর্ত্তা ভনডার ব্রুক (Mathews Van Der Broucke) গঙ্গা নদী জরিপ করেন এবং প্রথম পাইলট চার্ট প্রস্তুত করেন। তাহার পর ব্রেকের সময ইংরাজগণ ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে গঙ্গা জরিপ করেন এবং ইহা হইতেই 'পাইলট সার্ভিসে'র সুত্রপাত হয।

দামোদর—এই নদ ছোট নাগপুর পাহাড় হইতে বাহির হইয়া উত্তরে বর্দ্ধমান জেলার হরিবপুর ও সাহাপুর গ্রামের মধ্য দিয়া হুগলী জেলায় প্রবেশ করিযা, দক্ষিণে আমতার পার্শ্ব দিযা সাগরগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই নদ সদর ও শ্রীরামপুর মহকুমাকে আরামবাগ মহকুমার সহিত পৃথক করিয়া দিয়াছে। দামোদর নদের আঠাশ মাইল এই জেলার ভিতর আছে এবং ইহা দৈর্ঘ্যে অর্দ্ধ মাইলের উপর। দামোদরের স্বাভাবিক গতি বাঁধ দিয়া বন্ধ করিয়া দেওযায় হুগলী জেলার বহু নদী মজিয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলেই এই অঞ্চলে

ম্যালেরিয়ার * প্রাদুর্ভাব বলিয়া বহু মনীষী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাথ সাহা, দামোদরের বাঁধকে 'সয়তানী বাঁধ' আখ্যা দিয়াছেন এবং পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ যে, এই 'সয়তানী বাঁধ' তাহাও তিনি প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। হুগলী সদর এবং শ্রীরামপুর মহকুমায় দামোদরের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; বর্ত্তমান খাতে প্রবাহিত হইবার পূর্ব্বে যে স্থান দিয়া দামোদর প্রবাহিত হইত, তাহাই বর্ত্তমানে 'কাণানদী' বলিয়া খ্যাত।

দামোদর নদের উৎপত্তি ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য অঞ্চলে রাঁচি সহরের পঞ্চাশ মাইল উত্তর পূর্ব্ব, লোহারডাঙ্গার কাছাকাছি কোনও জায়গায়; সেখানকার উচ্চতা দু'হাজার ফুট। দামোদর দৈর্ঘে ৩৩৭ মাইল। ইহার একটি শাখা কলিকাতার তিরিশ মাইল দক্ষিণে জেমস ও মেরি স্তাণ্ডস্ বা গাদ্দাড়া নামক বিখ্যাত চোরাবালি কেন্দ্রের কাছে মিলিত হইয়াছে। অপর একটি শাখা কোলাঘাটের কাছে রূপনারায়ণ নদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। যে শাখাটি ভাগীরথীতে পড়িয়াছে, তাহার নাম কাণা-দামোদর; নামেতেই প্রকাশ যে নদীর তেজ এখন কতখানি।

ছোট নাগপুরে দামোদরের প্রাকৃতিক শোভা অপূর্ব্ব। রাঁচি অথবা হাজারীবাগ হইতে অনেকেই দামোদর ও ভেড়ানদীর সঙ্গমস্থান রাজ-রূপার অপরূপ দৃশ্য দেখিয়াছেন; শ্রাবণ ভাদ্র মাসে বর্দ্ধমান সহরের কাছে উচ্ছৃঙ্খল দামোদরের শোভাও অনেকে দেখিয়াছেন, আবার কাণানদীর বিগত যৌবনের শোভাও অনেকে দেখিয়াছেন। যে কয়টি নদী দামোদরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রধান হইল. মুনিয়া ও বরাকর। কথায় আছে—

"জুরে, মুনে, বরাকর
তিন নিয়ে দামোদর।"

* Malaria and Agriculture By Dr. Bentley, Page 49

বরাকরের সঙ্গে আবার উত্রী মিশিয়াছে। দুইশত মাইল অর্থাৎ রাণীগঞ্জ পর্যন্ত, দামোদর পাহাড়ী নদী, পাড় পাথুরে, নদীর গতিপথ গভীর ও স্রোতরেখার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। উৎস-মুখ হইতে কিছুদূর পর্য্যন্ত নদীর নিম্নগামী ঢাল প্রতি মাইলে আট ফিট, কিন্তু রাণীগঞ্জের কাছে ঢাল প্রতি মাইলে তিন ফিট, তারপর হইতে ঢাল আরও কম। বর্ষাকালে নদী যখন ফুলিয়া উঠে তখন স্রোতের সঙ্গে আসে বালি আর পলি। নদীর ঢাল খুব কম অথবা নাই বলিলেই চলে, সেইজন্য এই বালি আর পলি ক্রমশঃ তলায় পড়ায় নদীর গতিপথকে উঁচু করিয়া দিতেছে। বেশীর ভাগ তলানি পড়ে দামোদর যেখানে ভাগীরথী অথবা রূপনারায়ণের সঙ্গে মিশিয়াছে, সেখানে এই দুইটি নদীর প্রবল স্রোতে প্রতিহত হইয়া এই বালি আর পলি প্রচুর পরিমাণে জমে। ফলে এই অঞ্চলে ব-দ্বীপের সৃষ্টি হইতেছে, আর নদী কেবলই তাহার গতিপথ পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছে।

১৭৭০ সালের আগে দামোদরের প্রধান স্রোত ছিল অন্য রকম। তখন নদী বর্দ্ধমান সহরের কিছু দক্ষিণ হইতে বাঁ-দিকে বাঁকিয়া একেবারে ভাগীরথীতে পড়িত, কলিকাতা হইতে পঞ্চাশ মাইল উত্তরে কালনার কাছে। নদীর ঢাল কম বলিয়া হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলায় ইহার গতি মন্দ, তদুপরি আবার নীচে তলানি পড়ায়, স্রোত আরও কমিতেছে। সেইজন্য বর্ষাকালে জল যখন বেশী হয়, নদী তখন তাহার গতিপথ, পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করে। গত ১৯৪৩ সালে ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ঐ বৎসর দামোদরে বন্যা হয়। একথা অনেকেরই স্মরণ আছে, কারণ রেল লাইন ভাঙ্গিয়া যাওয়ার জন্য অনেককে ঘোরাপথে উত্তর ভারতে যাইতে হইত। সেবার বাঁধ ভাঙ্গিয়াছিল শক্তিগড় রেল ষ্টেশনের কিছু দূরে মাণিকহাটী নামক গ্রামের সন্নিকটে। এই বন্যার জল যে পথে বহিয়া ভাগীরথীর সঙ্গে কালনার কাছে মিশিয়াছিল, অনেকের

মতে তাহাই হইতেছে দামোদর নদের প্রাচীন গতিপথ। বাস্তবিক এই বন্যার স্রোত এমনই ছিল যে, মনে হইত যেন একটি নদী এইখান দিয়া বহিয়া গিয়াছে। বন্যার জল যখন সরিল তখন দেখা গেল যে, বন্যার গতি-পথ বালিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে আর উভয় পার্শ্বের জমি অপেক্ষা এই গতি-পথটাই নীচু; হঠাৎ যেন নদীর সমস্ত জল শুকাইয়া গিয়াছে। যাই হোক ইহার ফলে রেল কোম্পানীকে বহু ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় এবং বন্যা-প্লাবিত অঞ্চলের জমি প্রচুর বালিতে চাপা পড়ায় চাষের অযোগ্য হইয়া যায়। সেখানে এখন প্রচুর কাশগাছ জন্মায়। শরৎকালে ফুল ফুটিলে মনে হয় নদী যেন কাশ ফুলের নদী। বিমান হইতে হয়ত সত্যিকারের নদী বলিয়া মনে হইতে পারে।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে নদী, হঠাৎ হয়ত কোনো গভীর বন্যার ফলে, একেবারে দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়া যায়। কিন্তু পুরানো দামোদরের একটি ক্ষীণধারা রহিয়া গেল, যা কুন্তী নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া, ভাগীরথীতে মিশিত। এই ক্ষীণ ধারাটিকে লোকে কানাসোণার খাল বলিত; সম্ভবতঃ কলিকাতার বন্দর বাঁচাইবার জন্য ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে কাণাসোণার উৎসমুখ বাঁধ দিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে মরিল ঐ অঞ্চলে প্রবাহিত কয়েকটি নদীর সঙ্গে বেহুলা ও গাঙ্গুর; আর মরিতে বসিয়াছে বাঁকা নদী। এই কাণাসোণা বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলে হুগলী জেলা আজ অন্ধ হইতে বসিয়াছে।

দ্বারকেশ্বর নদী মানভূম জেলা হইতে বহির্গত হইয়া বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার মধ্য দিয়া হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আরামবাগ থানা ও গোঘাট থানার মধ্য দিয়া ইহা মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমায় রূপনারায়ণ নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহাও বহু স্থানে সীমা পরিবর্ত্তন করিয়াছে এবং ইহারও পূর্ব্ব-খাত 'কাণানদী' বলিয়া বিখ্যাত।

রূপনারায়ণ নদী হুগলী জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমা দিয়া বহু মাইল ব্যাপিয়া চলিয়া গিয়াছে। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে ডি-ব্যারোর মানচিত্রে রূপনারায়ণ গঙ্গা নামে উল্লিখিত হইয়াছে। * ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ভ্যানডেন ব্রুকের মানচিত্রে ভাগীরথীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত কোন নদীর নাম লিখিত নাই ; উক্ত নদীগুলি ১ম,২য়,৩য় প্রভৃতি ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই নির্দ্দেশমত রূপনারায়ণ ৩য় নামে উল্লিখিত আছে। রেনেল সাহেব সর্ব্বপ্রথম ইহাকে রূপনারায়ণ বলিয়া তাহার মানচিত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। নাবিকগণ ভ্রমক্রমে ইহাকে "পুরাতন গঙ্গা" বলিয়া লিখিয়াছেন, ইহাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। রূপনারায়ণ হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার মধ্যে অবস্থিত ; এই জেলার দ্বারকেশ্বর নদী ও মেদিনীপুর জেলার শিলাই নদী একসঙ্গে মিশিয়া খানাকুল থানার অন্তর্গত বন্দর নামক স্থানে রূপনারায়ণ নাম ধরিয়াছে ও জেলার পশ্চিম দিক দিয়া বহিয়া ভাগীরথীতে পড়িয়াছে।

হুগলী জেলার ছোট নদীগুলির মধ্যে সরস্বতী নদীর নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইহা ত্রিবেণী হইতে সপ্তগ্রামের নিম্ন দিয়া আদমজুড়, আমতা, তমলুকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। শিবপুরের বোটানিকেল গার্ডেনের কিছু নিচে সাঁকরাইল গ্রামের নিকট ইহা ভাগীরথার সহিত পুনঃমিলিত হইয়াছে। চারিশত বৎসর পূর্ব্বেও ইহার বিশাল বক্ষে বাণিজ্যতরীগুলি দেশবিদেশের রত্ন-রাজি, সপ্তগ্রামে বহন করিয়া আনিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপীয় লেখকগণ ইহাকে 'সাঁতগা রিভার' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা তৎকালে গঙ্গার ন্যায় গভীর ছিল বলিয়া ডি-ব্যারোর মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

"The maps also agree wite Abul Fazel's statement in the Ain, that at Tribeny there are three branches, one of the Saraswati, on which Satgaon lies, the other the Ganga,

* Medinipore District Gazetteers Pp—8.

now called the Hugly and the third the Jam or Jabuna (Jamuna). De-Barro's and Balev's map show thet hree branches of almost equal thickness, the Saraswati passing Satgaon and Chowna (Chaumuhi in Hugly district north) and the Jamuna flowing westward to Borhan in the 24 Parganas." *

পূর্ব্বে ভাগীরথীর প্রধান স্রোত সরস্বতী নদী দিয়া প্রবাহিত হইত, সেই জন্য এই নদী খুব বিপুলকায়া ও বেগবতী ছিল। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দের পর ভাগীরথীর গতি পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হওয়ায়, সরস্বতীর জল-প্রবাহ ভাগীরথীকে আশ্রয় করিল এবং তাহার ফল স্বরূপ এই নদী ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইল। এই নদী মজিয়া যাওয়ায়, ইহার শাখা-প্রশাখা গুলিও মজিয়া, পশ্চিম বঙ্গের যে সমস্ত অঞ্চল জনবহুল ও সমৃদ্ধিশালী ছিল, আজ তাহা জনশূন্য এবং ম্যালেরিয়ায় অধ্যুষিত সামান্য স্থানে পরিণত হইয়াছে। স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এই নদীটিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংস্কার করিয়া, ডাঃ বেণ্টলীর মতানুযায়ী ম্যালেরিয়া, কৃষির অবনতি ও দারিদ্র বিতাড়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্গীয় সরকার তখন অর্থের অজুহাতে এই অঞ্চলকে বাঁচাইবার কোন চেষ্টাই করেন নাই।

মহাভারতে লিখিত আছে যে সরস্বতী-সঙ্গমে চৈত্র মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীর দিনে ব্রহ্মাদি দেবগণ, তপোধন ও মহর্ষিগণ আগমন করেন। সরস্বতী নদীতে স্নান করিলে বহুতর সুবর্ণ লাভ হয় এবং তীর্থ সেবী সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। † সেইজন্য বহু প্রাচীন কাল হইতে এই স্থানে স্নান করা, এক মহা পুণ্যজনক ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত।

* J. A. S. Bengal, Vol XLII, 1878, Pp—214.

† মহাভারত—বনপর্ব্ব—৮২। ২৫—২৭

প্রাচীন কালে গঙ্গা, সরস্বতীর একাংশ ছিল বলিয়া রেনেল সাহেব মত প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে তাহার উক্তি উদ্ধৃত হইল :

I suspect that its then course after passing Satgong was by way of Adampore, Oompta and Tamlook and the river called the old Ganges was a part of its course, and received that name, while the circumstance of the change was fresh in the memory of the people. The appearance of the country between Satgong and Taml ook countenances such an opinion. *

কানা-নদী বর্ত্তমানে ঠিক সরস্বতী নদীর দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন কালে কৃষ্ণনগরের পশ্চিমে রত্নাকর (বর্ত্তমান নাম রড়া-নদী) নামে একটি বড় নদী ছিল ; উহার তীরে ঘণ্টেশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত। "ঘণ্টেশ্বরশ্চ দেবেশী রত্নাকর নদীতটে" বলিয়া 'মহালিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে' লিখিত আছে। কিংবদন্তী যে, অভিরাম গোস্বামীর অভিশাপে রত্নাকর নদীর তেজ কমিয়া গিয়া কানানদী নামে খ্যাত হয়। এই সম্বন্ধে 'শ্রীঅভিরাম লীলামৃত' নামক গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদে যাহা লিখিত আছে, তাহা উদ্ধৃত হইল :

"এতেক লাগিয়া শীঘ্র করেন গমন।
স্নান লাগি নদীতে গেলেন তখন ॥
রত্নাকর নদী সেই সদা প্রবাহিত।
গোঁসাই এর কৌপীন সেই হরে আচম্বিত ॥
ক্রোধেতে গোঁসাই তারে দিল অভিশাপ।
করপুটে রত্নাকর করে যে বিলাপ ॥

* Renell's Memoir, Page 57

না জানি করিনু দোষ ক্ষমহ আমারে।
সাধ্য আছে কার তব বাক্য খণ্ডিবারে॥
স্তব-স্তুতি করি বহু করিলা বিনয়।
তবে অভিরাম পুন বলেন তাহায়॥
অন্ধ হয়া থাক তিন শত বৎসর।
পরে এক চক্ষু পাবে তুমি রত্নাকর॥"

প্রাচীন কালের প্রসিদ্ধ প্রত্যেক নদীগুলির অবস্থা বর্ত্তমানে প্রায় একপ্রকার বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। হুগলী জেলার বিশেষ করিয়া সদর ও শ্রীরামপুর মহকুমার মজা নদীগুলিকে আশু সংস্কার না করিলে এই স্থানের কল্যাণ কখনও হইতে পারে না।

ছোট ছোট নদীগুলি জেলার পশ্চিমদিক হইতে আসিয়া গঙ্গাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। গঙ্গার পশ্চিম দিকে চড়া পড়িয়া যাওয়ায় ছোট নদীগুলির প্রবাহ বহুস্থানে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বেহুলা, কানা নদী, কুন্তী এবং বৈদ্যবাটীর খাল, শ্রীরামপুরের খাল, বালী খাল, প্রভৃতির জল-প্রবাহ গঙ্গাতে মিলিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন জেলার মধ্যে আরো কয়েকটি খাল আছে; কিন্তু তাহাও মজিয়া গিয়াছে, বর্ষা ব্যতীত এইগুলিতে আজ আর জল দেখিতে পাওয়া যায় না এবং স্থানে স্থানে খালের গর্ত্তের মধ্যে, বেশ চাষ আবাদ হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়।

গঙ্গার বহু স্থানে দুই তিন মাইল ব্যাপী চড়া পড়িয়াছে; তন্মধ্যে ত্রিবেণী, নয়াসরাই, জিরাট, বলাগড়, গুপ্তিপাড়া ও চাকদার নিকটবর্ত্তী চড়াগুলি দ্বীপের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। এই চড়াতে বর্ত্তমানে বসতি হইয়াছে এবং প্রচুর ধান, পটল, তরমুজ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ১২৬২ সালে স্বর্গীয় যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী ভারতের সমস্ত তীর্থগুলি পর্য্যটন করেন; তিনি লিখিয়াছেন—"অনেক ধনাঢ্য মনুষ্য শান্তিপুর গুপ্তিপাড়াতে আছে। সকল সুভদ্রগ্রাম। প্রায় দুই ক্রোশ মধ্যে, এক ক্রোশ এক

চড়া হইয়াছে। দুই দিকে দুই গঙ্গার প্রবাহ। শান্তিপুরের নীচের গঙ্গা হইয়া মাথাভাঙ্গার মোহনা দিয়া যাইতে হয়। এই গুপ্তিপাড়ার নীচে চড়াতে আহারাদি করিয়া ২ ক্রোশ আসিয়া গুপ্তিপাড়ার বাজারের ঘাটে সন্ধ্যার পূর্ব্বে লাগান করিয়া থাকা গেল।" *

দামোদর—এই নদী বাঁকুড়া জেলা হইতে আসিয়া হুগলী জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। ইহা গড়মান্দারণ দিয়া বহিয়া মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমায় দ্বারকেশ্বরে মিলিত হইয়াছে।

বেহুলা নদী—বর্দ্ধমান জেলা হইতে বাহির হইয়া বর্দ্ধমান জেলার কালনা মহকুমার অন্তর্গত বৈদ্যপুরের নিম্নে এই জেলায় ঢুকিয়াছে। ওখানে বেহুলার প্রবাহ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উত্তরভাগ সোমড়ার নিকটে হুগলী নদীতে পড়িয়াছে এবং দক্ষিণভাগ এই জেলার মধ্য দিয়া আসিয়া মগরা খালে পড়িয়াছে।

কুন্তী নদী—বর্দ্ধমান জেলায় দামোদর নদ হইতে বহির্গত হইয়া হুগলী নদীতে পড়িয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০ মাইল।

মুণ্ডেশ্বরী—ইহা বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রায়না থানায় অবস্থিত বেগুয় হানা হইতে বাহির হইয়াছে এবং খানাকুল থানার অন্তর্গত পানসিউলীতে রূপনারায়ণের সহিত মিলিত হইয়াছে।

ওম্যালী সাহেব লিখিয়াছেন "The district is mainly the product of rivers and is still watered, drained and partially changed by them" †

জেলার চারিটি প্রধান নদী ব্যতীত বহু ছোট ছোট নদী বা খাল এই স্থানে আছে। সাধারণতঃ ছোট নদীগুলি উত্তর হইতে দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিক হইতে আসিয়া ভাগীরথীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ছোট নদীর

* তীর্থ-ভ্রমণ—যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী। পৃষ্ঠা—৫৬৬

† Hooghly District Gazetteers.

মধ্যে কৌশিকী, কান্তল, কাণা দামোদর, মাদারিয়া, বিশিয়া বা সাঙ্কিভাঙ্গা, কাণা দারকেশ্বর, স'াকরা, ঝুমঝুমি, তারাজুলি প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই সমস্ত ছোট ছোট নদীগুলি অধিকাংশই হাজিয়া মজিয়া যাওয়ায় হুগলী জেলার বহু স্থান অস্বাস্থ্যকর ও ম্যালেরিয়ার দ্বারা অধ্যুষিত হইয়া বসবাসের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে। বাঁধ, সেতু, রাস্তা প্রভৃতি নির্ব্বোধের মত নির্ম্মাণ করিয়া এই ছোট ছোট নদীগুলির স্বাভাবিক জল নিষ্কাশনের পথ রুদ্ধ করিবার জন্যই নদী নালাগুলি নষ্ট হইয়া বহু স্থান লোক-বসতির অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায় দ্বারা ছোট নদী ও খাল-গুলির সংস্কার এবং জল-সেচের দ্বারা প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে অদূর ভবিষ্যতে কেবল হুগলী জেলা নয় সমগ্র পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গ শ্মশানে পরিণত হইবে।* পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে বহু উন্নত লোক-সমাজ ও তাহাদের সভ্যতা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে বিলুপ্ত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়; অন্য স্থানের কথা ছাড়িয়া দিলাম, এই জেলার মধ্যে সপ্তগ্রাম, যাহা ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ও অন্যতম প্রধান শহর বলিয়া পরিগণিত ছিল, আজ সেই শহরে মাত্র পনের খানির বেশী কুটির দৃষ্ট হয় না।

আদমসুমারির রিপোর্ট হইতে পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের কিরূপ দ্রুত লোক ক্ষয় হইতেছে তাহা পর পৃষ্ঠার তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে।

এই জেলাগুলিতে ৪০ বৎসরে শতকরা পাঁচজন বৃদ্ধি হইয়াছে; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি ও ত্রিপুরার হিসাব দেখিলে শতকরা পঁচিশ জন বৃদ্ধি হইয়াছে দেখা যায়।

---

* প্রফুল্লকুমার সরকারের 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু'—পৃঃ ৪৬ (২য় সংস্করণ)

† নয়া-বাঙ্গলা—শ্রীসুধীরকুমার মিত্র, পৃষ্ঠা ১৩৪

১৯০১ হইতে—১৯৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

		কর্ষিত ভূমির হ্রাস (শতকরা)	ম্যালেরিয়ার প্রকোপ	লোকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি
১।	হুগলী ...	৪৫	৪৬.৬	+৬.২
২।	বর্দ্ধমান ...	৪০	৫০.৪	+৩.৭
৩।	নদীয়া ...	৭	৫৭.৫	+৮.১
৪।	মুর্শিদাবাদ...	১৪	৪১.৭	+২২.৯
৫।	যশোহর ...	৩১	৪৮.২	—৭.২

হুগলী জেলার খাল

শ্রীরামপুর খাল—এই খাল শ্রীরামপুর মহকুমা ও হুগলী সদর মহকুমার পশ্চিম দিক দিয়া বহিয়া হুগলী নদীতে আসিয়াছে।

বৈদ্যবাটী খাল—শ্রীরামপুর মহকুমার পশ্চিম অংশ দিয়া আসিয়া ভাগীরথীর সহিত মিশিয়াছে।

বালী খাল—বালী ও উত্তরপাড়ার মধ্য দিয়া বহিয়া আসিয়া ভাগীরথীতে পড়িয়াছে। ইহা প্রায় ৮ মাইল।

বলরামপুর খাল—ইহা দ্বারকেশ্বর নদী হইতে বাহির হইয়া কাণা নদীতে পড়িয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ মাইল।

অরোরো খাল—রামচন্দ্রপুর হইতে বহির্গত হইয়া লাঙ্গুলপাড়া পর্য্যন্ত আসিয়াছে। ইহা প্রায় ৭ মাইল দীর্ঘ।

মাদারিয়া খাল—এই খাল চাঁপাডাঙ্গার উত্তর হইতে বাহির হইয়া হাওড়া জেলার অন্তর্গত আমতার কিছু দূরে দামোদরে পতিত হইয়াছে।

রণ খাল—খানাকুল থানার এলেকায় রাজহাটি গ্রামে রণ নামে বহু পুরাতন ও অতি গভীর জলবিশিষ্ট একটি খাল আছে।

বিল

হুগলী জেলার ডানকুনী বিল বিখ্যাত। ইহা ছাড়া থানাকুল থানার অন্তর্গত রাধাকৃষ্ণপুরের হাঁদাই বিল, নন্দনপুরের বিল প্রভৃতি কয়েকটি বিল উল্লেখযোগ্য।

হুগলী জেলার পথ

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার মধ্যে নিম্নলিখিত সাতটি ভাল রাস্তা ছিল বলিয়া টয়েনবি সাহেব লিখিয়াছেন। (১) বালী হইতে কালনা. তৎপরে মুর্শিদাবাদ, (২) গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, (৩) বেনারস রোড, (৪) গৌরহাটির ঘাট হইতে হরিপাল দিয়া দ্বারহাটা, (৫) বর্দ্ধমান হইতে মেদিনীপুর, (৬) সিঙ্গুর হইতে হুগলী, (৭) হুগলী হইতে ভাস্তাড়া (পোলবা দিয়া)। পূর্ব্বে জেলের কয়েদী দিয়া রাস্তা মেরামত করা হইত; ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে কয়েদী দিয়া কাজ করান একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট লিখিয়াছিলেন :

"There is not a single road in the district which a European vehicle could traverse, while the number-assable for hackeries in the rains are lamentably few."

নিম্নে হুগলী জেলার কয়েকটি প্রসিদ্ধ রাস্তার নাম উল্লিখিত হইল :

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড—এই রাস্তা হাওড়া হইতে বাহির হইয়া এই জেলার মধ্য দিয়া পাঞ্জাব পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তার মাত্র ৩৩ মাইল এই জেলায় আছে; ইহা সরকারী রাস্তা।

অহল্যাবাঈ রোড—বহু পুরাতন রাস্তা। মহারাণী অহল্যাবাঈ

কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ইহা হাওড়া হইতে আসিয়া চণ্ডীতলা, শিয়াখালা, হরিপাল, চাঁপাডাঙ্গা ও আরামবাগ ছাড়িয়া কাণী পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহাও সরকারী রাস্তা।

চুঁচুড়া খানপুর রোড্—ধনিয়াখালি পর্য্যন্ত প্রায় ১৫ মাইল গিয়াছে।

মগরা খানপুর রোড্—মগরা হইতে খানপুর পর্য্যন্ত প্রায় ১২ মাইল গিয়াছে।

হুগলী মাজিনান রোড্—হুগলী হইতে মাজিনান পর্য্যন্ত প্রায় ১৯ মাইল।

পাণ্ডুয়া কালনা রোড্—পাণ্ডুয়া হইতে ইঁচুরা হইয়া কালনা পর্য্যন্ত প্রায় ১৩ মাইল।

বৈঁচি দশঘরা রোড্—বৈঁচি হইতে ধনিয়াখালি পর্য্যন্ত প্রায় ১৯ মাইল।

ধনিয়াখালি হরিপাল রোড্—ধনিয়াখালি হইতে হরিপাল পর্য্যন্ত প্রায় ১০ মাইল দীর্ঘ।

পাণ্ডুয়া কল্যাণপুর রোড্—পাণ্ডুয়া হইতে কল্যাণপুর পর্য্যন্ত প্রায় ৮ মাইল দীর্ঘ।

চন্দননগর ভোলা রোড্—চন্দননগর হইতে ভোলা পর্য্যন্ত প্রায় ১২ মাইল গিয়াছে।

হুগলী সাতগা রোড—হুগলী হইতে সাতগা পর্য্যন্ত প্রায় ৪ মাইল গিয়াছে।

রামনাথপুর হরাল রোড্—রামনাথপুর হইতে হরাল পর্য্যন্ত প্রায় ১০ মাইল গিয়াছে।

ত্রিবেণী গুপ্তিপাড়া রোড—ত্রিবেণী হইতে গুপ্তিপাড়া পর্য্যন্ত প্রায় ১৭ মাইল।

ইঁচুরা বলাগড় রোড্—ইঁচুরা হইতে বলাগড় পর্য্যন্ত ৭ মাইল।

ডুমুরদহ বলাগড় রোড্—ডুমুরদহ হইতে বলাগড় পর্য্যন্ত ৭ মাইল।

শিয়া আলাসীন রোড্—শিয়া হইতে মালিপাড়া হইয়া আলাসীন পর্য্যন্ত ৯ মাইল।

বৈঁচি বৈদ্যপুর রোড্—বৈঁচি হইতে বৈদ্যপুর পর্য্যন্ত প্রায় ৫ মাইল।

সোমড়া ডুমুরদহ রোড—সোমড়া হইতে ডুমুরদহ পর্য্যন্ত ১০ মাইল রাস্তা।

শ্রীরামপুর মহকুমা

বৈদ্যবাটী তারকেশ্বর রোড্—বৈদ্যবাটী হইতে তারকেশ্বর পর্য্যন্ত ২১॥০ মাইল।

নবগ্রাম চাড়পুর রোড্—নবগ্রাম হইতে চাড়পুর পর্য্যন্ত ১৩॥০ মাইল।

জেজুর-সাতঘরা রোড—জেজুর হইতে সাতঘরা পর্য্যন্ত ১ মাইল।

ভদ্রেশ্বর জনাই রোড্—ভদ্রেশ্বর হইতে নসিবপুর হইয়া জনাই পর্য্যন্ত ১৩ মাইল।

কোন্নগর কৃষ্ণরামপুর রোড্—কোন্নগর হইতে কৃষ্ণরামপুর পর্য্যন্ত প্রায় ৯॥০ মাইল।

উত্তরপাড়া কালিপুর রোড্—উত্তরপাড়া হইতে কালিপুর পর্য্যন্ত ৪॥০ মাইল।

আঁটপুর সীতাপুর রোড্—আঁটপুর হইতে সীতাপুর পর্য্যন্ত ৭॥০ মাইল।

গঙ্গাধরপুর নবাবপুর রোড্—গঙ্গাধরপুর হইতে নবাবপুর পর্য্যন্ত প্রায় ৮ মাইল।

গজা রাজবলহাট রোড্—গজা হইতে বারহাটা হইয়া রাজবলহাট পর্য্যন্ত প্রায় ৮ মাইল।

সিঙ্গুর মশাট রোড্—সিঙ্গুর হইতে মশাট প্রায় ৭ মাইল।

হরিপাল জগজীবনপুর রোড—হরিপাল হইতে জগজীবনপুর পর্য্যন্ত ৩॥০ মাইল।

মশাট খিতপুর রোড্—মশাট হইতে খিতপুর পর্য্যন্ত ৬ মাইল।

তারকেশ্বর চাঁপাডাঙ্গা রোড্—তারকেশ্বর হইতে চাঁপাডাঙ্গা পর্য্যন্ত ৪॥০ মাইল।

জেজুর-হড়া রোড—জেজুর হইতে হড়া পর্য্যন্ত ৪ মাইল।

আরামবাগ মহকুমা

আরামবাগ নইসরাই রোড্—আরামবাগ হইতে নইসরাই পর্য্যন্ত ৬ মাইল।

আরামবাগ উদরাজপুর রোড্—আরামবাগ হইতে উদরাজপুর পর্য্যন্ত ৭॥০ মাইল।

আরামবাগ তেঁতুলমুড়ি রোড্—আরামবাগ হইতে তেঁতুলমুড়ি পর্য্যন্ত ১৭॥০ মাইল।

আরামবাগ তিরল রোড্—আরামবাগ হইতে তিরল পর্য্যন্ত প্রায় ৫ মাইল।

আরামবাগ আরাণ্ডি রোড্—আরামবাগ হইতে আরাণ্ডি পর্য্যন্ত ৬॥০ মাইল।

আরামবাগ বন্দর রোড্—আরামবাগ হইতে বন্দর পর্য্যন্ত ১৪ মাইল।

গোঘাট কুমারগঞ্জ রোড—গোঘাট হইতে কুমারগঞ্জ পর্য্যন্ত ৭॥০ মাইল।

উচানল মেদিনীপুর রোড—উচানল হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত প্রায় ১৫ মাইল।

সুরুল গোঘাট রোড্—সুরুল হইতে গোঘাট পর্য্যন্ত ৪ মাইল।

মায়াপুর জগৎপুর রোড—মায়াপুর হইতে খানাকুল হইয়া জগৎপুর পর্য্যন্ত ৭॥০ মাইল।

এতদ্ভিন্ন জেলার মধ্যে সাড়ে সাত শত মাইল পাকা রাস্তা এবং পাঁচশত মাইল কাঁচা রাস্তা আছে। সদর ও শ্রীরামপুর মহকুমার রাস্তাঘাট কিঞ্চিৎ ভাল হইলেও, আরামবাগ মহকুমার অবস্থা দেখিলে এই স্থানের অধিবাসিগণ যে বিংশ শতাব্দীতে বাস করিতেছেন, মন তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহে না।

সম্প্রতি কলিকাতাবাসী আরামবাগের অধিবাসিবৃন্দ আরামবাগ মহকুমার পথঘাটের উন্নতিকল্পে কয়েকটি সভা করিয়াছেন এবং আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে এই স্থানের যাতায়াতের পথগুলি হয়ত সুগম হইবে।

———

তৃতীয় অধ্যায়

প্রকৃতি পরিচয়

হুগলী জেলা নদী-মাতৃক হইলেও ইহার ভূভাগ সর্ব্বত্র সমতল নহে; এবং ইহার উত্তর ও পূর্ব্ব অংশে শীত ও গ্রীষ্মের আধিক্য একটু বেশী এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশে শীত ও গ্রীষ্ম অল্প অনুভূত হয়। গঙ্গার তীরবর্ত্তী স্থানগুলি বিশেষ স্বাস্থ্যকর, কিন্তু বর্ত্তমানে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত গঙ্গার তীরে বড় বড় মিল ও কারখানা স্থাপিত হওয়ায়, এই অঞ্চলের আবহাওয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক খারাপ হইয়াছে। প্রাচীন কালে এই স্থান বিশেষ স্বাস্থ্যকর ছিল বলিয়া বঙ্গের রাজা-রাজড়াগণের সপ্তগ্রামেই বাসস্থান ছিল। উইলফোর্ড সাহেব লিখিয়াছেন—**Saptagram is a famous place of worship and has formerly the residence of the Kings of the country.** কিন্তু প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে এই অঞ্চলের জল বায়ু ক্রমশঃ খারাপ হইতে আরম্ভ হয় এবং বর্ত্তমানে ম্যালেরিয়ার প্রধান আকর বলিয়া পরিগণিত।

জলবায়ু

হুগলী জেলা কি বরাবরই ম্যালেরিয়ার দ্বারা অধ্যুষিত ছিল? না হুগলীবাসী চিরকালই এইরূপ দুর্ব্বল ও রোগগ্রস্ত ছিল? হিন্দু রাজত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও, মুসলমানদের আমলেও দেখিতে পাই যে, সারা ভারতে বাঙ্গলার বায়ু ও বাঙ্গলার জল অতুলনীয় ছিল। এমন কি বঙ্গদেশে সেই সময় বর্ষা ঋতুও স্নিগ্ধ ও স্বাস্থ্যকর ছিল। এই সম্বন্ধে আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী'তে লিখিয়াছেন:

"The whole extent of this vast Empire is unequalled for the excellence of its waters, salubrity of air, mild-

ness of climate and the temperate constitution of the natives. Every part is cultivated and full of inhabitants, so that you can not travel the distance of a *cos* (two miles) without seeing towns and villages and meeting with good water. Even in the depth of water, the earth and the trees are covered with verdure and in the rainy season, which in many parts commences in June and continues till September, the airs are so lightfully pleasant that it gives youthful vigour to old age."

ভাগীরথী তীরবর্ত্তী স্থানসমূহ, যাহা বর্ত্তমানে ম্যালেরিয়ার প্রধান আকর, তাহা বাঙ্গলার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অংশ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল বলিয়া বেণ্টলী সাহেবও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। * বেশী দিনের কথা নয়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেও বর্ত্তমান ম্যালেরিয়া জর্জ্জরিত ব্যাণ্ডেল তখন "Sweet Bandel" বলিয়া অভিহিত হইত এবং সাহেবগণ উক্ত স্থানে স্বাস্থ্য-সঞ্চয়ের জন্য যাইতেন। এই সম্বন্ধে "কলিকাতা গেজেটে" প্রকাশিত একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"Each other place is hot as hell,
When breezes fan you at Bandel,
Had I ten houses all I'd sell
And live entirely at Bandel."

বর্ত্তমানে ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত স্থানগুলি দেখিয়া হয়ত অনেকে বিশ্বাস করিবেন না যে, তদানীন্তন ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদের অসুখ করিলে, তাহারা বর্দ্ধমানে হাওয়া বদলাইতে যাইতেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও স্বাস্থ্যলাভার্থে বর্দ্ধমানে যাইতেন। পরে সেখানে ম্যালেরিয়া দেখা দেওয়ায়, তিনি কার্ম্মাটারে যাইতে আরম্ভ করেন।

* Report on Malaria in Bengal.

"Before 1862 the district was noted for its healthiness, and the town of Burdwan particularly was regarded as a sanitarium."*

শত বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালীর শরীরে বল ছিল, স্বাস্থ্য ভাল ছিল, এখনকার মত তখন কেহ রোগগ্রস্ত ছিল না। ভারতের বড়লাট লর্ড মিণ্টো সেই সময়ের বাঙ্গালীদের দেখিয়া লিখিয়াছেন :

"I never saw so handsome a race. They are much superior to the Madras people whose form I admired also. Those were slender. These are tall, muscular, athletic figures, perfectly shaped and with the finest cost of countenance and features."

সার উইলিয়াম উইলকক্স বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার, নদী-বিজ্ঞান তিনি খুব ভাল বোঝেন। মিশর সরকারের সেচ-বিভাগে তিনি অনেক দিন চাকুরি করিয়াছেন। নীল নদের বুকের উপর বিখ্যাত আসুয়ান বাঁধের পরিকল্পনা ও নির্ম্মাণ কার্য্য উভয়েরই তদারক তিনি সম্পন্ন করেন। এই বাঁধের জন্যই নীল নদকে আজ শাসনে রাখা সম্ভব হইয়াছে ও সেই অঞ্চলের তুলার চাষ ও উৎপাদন অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। নদী-বিজ্ঞান বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সার উইলিয়াম উইলকক্সকে ১৯২৮ সালে আমন্ত্রণ করিয়া আনেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি ১৮৫০ সালের পূর্ব্বে অর্থাৎ ঐ সময় হইতে মাত্র আশী বৎসর পূর্ব্বের বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার এক সুন্দর চিত্র, তাহার শ্রোতাদের সামনে তুলিয়া ধরেন। সেই সময়কার বিভিন্ন ভ্রমণকারীর লিপি হইতে উদ্ধৃত করিয়া তিনি প্রমাণ করেন যে, সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গলার এই অঞ্চল ছিল কৃষিতে প্রথম, আর ইহার পরেই স্থান হইল মান্দ্রাজ প্রদেশের তাঞ্জোরের।

* Burdwan District Gazetteers, Page—78.

তখন নদীতে বাঁধ ছিল না, একটা সুবিধা এই ছিল যে, এখনকার স্থায় তখনকার বন্যা কোনো নির্দ্দিষ্ট স্থানের বাঁধ ভাঙ্গিয়া সমস্ত বন্যার জল সেইস্থান দিয়া বাধা বিপত্তি তুচ্ছ পূর্ব্বক উদ্দাম স্রোতে নির্গত হইয়া, সমস্ত কিছু খড়কুটার মতো ভাসাইয়া লইয়া যাইত না। তখন বন্যা আসিত বিস্তৃত স্থান জুড়িয়া, বহু দেশে সেই বন্যার জল ছড়াইয়া পড়িত ও সমস্ত জমিতে পলি পড়িত, আর বন্যার জল কোনো এক জায়গায় আবদ্ধ থাকিয়া অহেতুক জলা ভূমির সৃষ্টি করিত না। আর এই বানের জল ছোটখাটো নদীগুলিকে পুষ্ট করিত, যার অভাবে এখন সে সমস্ত নদী অদৃশ্য হইয়াছে। যেবার বর্ষায় নদীতে আশানুরূপ জল আসিত না অথবা বৃষ্টি কম হইত, সেথায় চাষীরা নদীর পাড় কাটিয়া নিজেদের জমিতে জল লইয়া আসিত। তাহারা নদীর সঙ্গে সুখে দুঃখে বাস করিত, কিন্তু লাভের ভাগটা তখন ছিল কেবল মানুষের প্রাপ্য।

তারপর তৈয়ারী হইল রেল লাইন। এই রেল লাইন রক্ষা করিবার জন্য নদীর ধারে পড়িল উঁচু রেলপথ ও একটা বাঁধ, আর মাঝে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড তো ছিলই। অতএব পর পর তিনটি বাঁধ পড়িল। দামোদর উপত্যকার অধিবাসীরা এতদিন যে জলের সুবিধা ভোগ করিতেছিল তাহা বন্ধ হইয়া গেল ; তথাপি লোকে বাঁধ কাটিয়া জমিতে জল আনিত, কিন্তু ১৮৫৫ সাল হইতে সরকার নিজে বাঁধের কর্ত্তৃত্বভার লইয়া এই রকম বাঁধ কাটিয়া জল আনা, আইনানুসারে অপরাধমূলক ও দণ্ডনীয় বলিয়া নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। দামোদর উপত্যকার অধিবাসীদের যত কিছু দুর্দ্দশা এই সময় হইতেই আরম্ভ হইল। প্রথম প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা দিল ম্যালেরিয়া। গ্রামের পর গ্রাম শ্মশানে পরিণত হইতে লাগিল। ম্যালেরিয়ার জন্য যতই ভাল ঔষধ থাকুক, এই অঞ্চলে ম্যালেরিয়া অপ্রতিহত-ভাবেই রাজত্ব করিতেছে। দরিদ্র চাষী ক্রমশঃ দরিদ্র হইতেছে। একে অন্নাভাব তাহার উপর ঔষধ কিনিবার পয়সাই বা কোথা হইতে আসিবে ?

হুগলী জেলায় জলবায়ু ঋতু বিশেষে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে এই স্থানের চরম দুরবস্থা হয় বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। শীতকালে এই জেলার অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর থাকে। অতি বৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টির জন্য প্রায়ই শস্যাদি বিনষ্ট হইয়া দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ৮৯.৯৩" ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হওয়ায় জেলার শস্যাদি ভাল হইয়াছিল; কিন্তু ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ৫৫.৩' ইঞ্চি বৃষ্টি হওয়ায় এবং ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ৬৩ ৮৫" ইঞ্চি বৃষ্টি হওয়ায় জেলার শস্য একপ্রকার বিনষ্ট হইয়া যায়। বর্ত্তমানে বর্ষার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আমেরিকা জাপান ও রাশিয়ার ন্যায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেচের বন্দোবস্ত করিয়া চাষের উন্নতি না করিলে আমাদের দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। প্রতিবৎসর যে ঠিক সময়ে বৃষ্টি হইবে তাহার কোন নিয়ম নাই, অধিকন্তু গড়পড়তা বৃষ্টিপাত দেখিয়া চাষের ভালমন্দ বিচার করা যায় না। কারণ এমন বৎসর গিয়াছে, যে আবাদের সময় বৃষ্টি ঠিক হইল না; কিন্তু একদিনে এত বৃষ্টি হইল যে রাস্তাঘাট ডুবিয়া গেল। সেরূপ বৃষ্টিতে চাষের কোন সুবিধা হয় না। উদাহরণ স্বরূপ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের একদিন ২০' ৫০" ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয় এবং একদিনের বারিপাত হিসাবে ইহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক (বা রেকর্ড) বলা যাইতে পারে; কিন্তু উক্ত বৎসর শস্য আদৌ ভাল হয় নাই।

শত বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশের আবহাওয়ার বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে; পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমান কালের হাওয়া অনেক শুষ্ক হইয়াছে। সেইজন্য পূর্ব্বের ন্যায় আর বৃষ্টি হয় না, অধিকন্তু জলকষ্ট পশ্চিমবঙ্গে একপ্রকার দেশব্যাপী আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বের ন্যায় কালবৈশাখীর ঝড় বর্ত্তমানে আর হয় না। * বনজঙ্গল ধ্বংস করিবার ফলেই যে

* The Climate, National and Economic Influence of Forests by J. Nisbet.

পশ্চিমবঙ্গে জলাভাব ও তজ্জনিত কৃষি ও স্বাস্থ্যহানি প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিতেছে, তাহা বোধ হয় কেহই আজ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

"In the early part of British rule, forests were rapidly destroyed." *

নিম্নে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হুগলী জেলায় বৃষ্টিপাতের তালিকা Sketch of the Administration of the Hoogly District নামক গ্রন্থ হইতে প্রদত্ত হইল :

হুগলী জেলায় বৃষ্টিপাতের তালিকা

খৃষ্টাব্দ	বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি হিসাবে)	খৃষ্টাব্দ	বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি হিসাবে)	খৃষ্টাব্দ	বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি হিসাবে)
১৮৭০	৫৮'০২	১৮৮০	৫৪'৮৭	১৮৯০	৫৫'০৭
১৮৭১	৭৬'৭৯	১৮৮১	৬২'৭৭	১৮৯১	৪৫'৮৫
১৮৭২	৫১'০০	১৮৮২	৫৬'৯০	১৮৯২	৪১'৩১
১৮৭৩	৩৯'৬৩	১৮৮৩	৫৬'২৬	১৮৯৩	৬৯'৪৭
১৮৭৪	৩৯'৩৭	১৮৮৪	৪৬'৫২	১৮৯৪	৪৩'৮২
১৮৭৫	৫২'৯৯	১৮৮৫	৭২'৭৯	১৮৯৫	৪৩'১৮
১৮৭৬	৪০'৭২	১৮৮৬	৫৯'৮৯	১৮৯৬	৪৩'৬১
১৮৭৭	৫৬'৩৭	১৮৮৭	৪৮'৬০	১৮৯৭	৬৮'৮২
১৮৭৮	৮৯'৩০	১৮৮৮	৭২'৪৭	১৮৯৮	৫২'৮৭
১৮৭৯	৪২'৫৩	১৮৮৯	৪০'২৭	১৮৯৯	৭২'৩১
				১৯০০	৭১'৮৭

* * Production in India, Page 41.

এই সম্বন্ধে ডাঃ ভোয়েলকার যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহাও উদ্ধৃত হইল :

"There is reason to believe that the climate was not formally what it now is, but that the spread of cultivation accompanied, as it has been, by the wholesale and reckless denudation of forests and wooded tracts without reservation of land to afford wood or grazing, has done much to render the climate what it now is." *

তারপর ভাগীরথী তীরবর্ত্তী স্থানসমূহ, যাহা একসময়ে সর্ব্বপ্রধান স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল, সেগুলিও কলকারখানা বৃদ্ধি হওয়ায় অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পানীয় জলের আধার 'গঙ্গাজল', বর্ত্তমানে আর "মনোহারী মুরারী চরণচ্যুতম্" নহে; হরিদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া কানপুর, এলাহাবাদ, কাশী, পাটনা প্রভৃতি বড় বড় সহরের মল, মূত্র, আবর্জ্জনা এবং উভয়তীরস্থ শত শত কারখানার 'সেপটিকট্যাঙ্ক' হইতে আগত ময়লা জল, গঙ্গাস্রোতে বঙ্গবাসীর জন্ত নামিয়া আসিতেছে, আর গঙ্গাতীরস্থ অধিবাসিগণ উক্ত জল পান করিয়া পীড়া, মহামারীর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শমন-সদনে চলিয়া যাইতেছেন। ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে এই ধরণের অত্যাচার গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানের অধিবাসিগণকে কখনও সহ্য করিতে হয় নাই, এ কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।

অস্বাস্থ্যকর জলাশয়, বিল, দীঘি, পুষ্করিণী প্রভৃতি বহুদিনের অযত্নে মজিয়া যাওয়ায় তাহাতে নানাপ্রকার দাম, শৈবাল, ও জলা উদ্ভিদ উৎপন্ন হইত এবং গ্রীষ্মকালে পূর্ব্বোক্ত জলাশয়ের জল একবারে শুকাইয়া যাইলে দাম, শৈবাল প্রভৃতি পচিয়া অস্বাস্থ্যকর গন্ধের সৃষ্টির দ্বারা হুগলী

* Report on the Improvement of Indian Agriculture.

জেলার আবহাওয়া অস্বাস্থ্যকর করিয়া দিয়াছে। পূর্ব্বে নদীগুলি দিয়া সারা বৎসর জল প্রবাহিত হইত বলিয়া গ্রামের ছোট ছোট পুষ্করিণীগুলি একেবারে শুকাইয়া যাইত না, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার ব্যতিক্রম হওয়ায় স্থানীয় জল ও বায়ু উভয়ই বিদূষিত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজ সরকার তাঁহাদের ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য যত্রতত্র রাস্তা, বাঁধ ও রেলওয়ে লাইন প্রস্তুত করায় এবং জেলার জমিদারবর্গ মৎস্য-ব্যবসায়ের জন্য ও ধানের ক্ষেত্রগুলিতে জল ধরিয়া রাখিবার জন্য বাঁধ দিয়া ছোট নদী ও খালের মুখগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়ায়, হুগলী জেলার আর্দ্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই স্থান ম্যালেরিয়া প্রভৃতির আবাসভূমি হইয়াছে।

স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্র (ফিভার কমিশনের একমাত্র ভারতীয় সদস্য) এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

"The mischief has been chiefly committed by roads, railways and embankments, not because as such but because they happened to cross the drainage levels of villages. In many instances the mischief has been likewise done by khals or other natural channels of drainage having been dammed up by zamindars or their Raiyots for purpose of fishery or for retaining monsoon water on their elevated rice lands." *

হুগলী জেলায় ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে পুষ্করিণী শুকাইয়া যাওয়ায় পানীয় জলের জন্য গ্রামবাসিগণকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়। যে স্থানে মিউনিসিপালিটি আছে, সেখানে বিশেষ কোন অসুবিধা নাই ; কিন্তু গ্রামে জলাভাবে গ্রামবাসিগণের অশেষ কষ্ট অনুভূত হয়। সম্প্রতি হুগলী জেলা বোর্ড, জেলার বিভিন্ন স্থানে দশহাজারের উপর

* The Hindu Patriot. 1872-73. Pp—13-14.

নলকূপ নির্ম্মাণ করিয়া অধিবাসীদিগের কষ্টের খানিকটা লাঘব করিয়াছেন। * নলকূপ প্রতিষ্ঠা হওয়ায় কলেরা প্রভৃতি ব্যাধিরও প্রকোপ অনেকাংশে হ্রাস হইয়াছে বলিতে পারা যায়।

হুগলী জেলায় নানারূপ পশুপক্ষী সরীসৃপ ও মৎস্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এই জেলার বহুস্থান জঙ্গলাকীর্ণ ছিল বলিয়া বিবিধ বন্য জন্তু এইস্থানে বসবাস করিত। ষ্ট্রাভারিনাস (Stavorinus)

পশু, পক্ষী ও সরীসৃপ

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলা পরিভ্রমণ করিয়া লিখিয়াছেন যে, ব্যাঘ্র এই অঞ্চলে যথেষ্ট দৃষ্ট হয় এবং তাহারা সময় সময় বহির্গত হইয়া অধিবাসীদের আক্রমণ করে। বন্য মহিষও তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন :

"Tigers are very numerous in the woods and often sally out into the inhabited places ; there are likewise a vast number of wild buffaloes in the woods."

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের "ইণ্ডিয়া গেজেটে" চুঁচুড়ার নিকটে চারিটি ব্যাঘ্র শীকার করিয়া মারা হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। (**four tigers were killed near Chinsura in 1784**). ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের পর এই স্থানে আর কোন ব্যাঘ্র দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

"The last report of a tiger being seen here in 1830"†

সম্প্রতি হুগলী জেলায় ব্যাঘ্র শিকার সম্বন্ধে একটি সংবাদ "দৈনিক বসুমতী" পত্রে (২৪শে পৌষ ১৩৫৪) এবং "আনন্দবাজার পত্রিকায়" প্রকাশিত হইয়াছিল।

---

* Administration Report of the Hooghly District Board, 1942-43 Pp—37.

† Bengal Past & Present Vol. III. 1909.

সংবাদটি এইরূপ :

"গত ৬ই জানুয়ারী মঙ্গলবার হুগলী জেলার অন্তর্গত পাঁচপাড়া গ্রামের শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায় অসীম সাহসের সহিত এক নরঘাতক বাঘ শিকার করিয়াছেন। বাঘটি এক চাষীকে আক্রমণ করিয়াছিল। শৈলেন বাবু সেই অবস্থায় একাকী বাঘটিকে গুলি করিয়া লোকটির প্রাণরক্ষা করেন। বাঘটি দৈর্ঘ্যে ৭ হাত। আক্রান্ত ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। শৈলেন বাবু বলেন যে, সরকার অথবা জেলাবোর্ড বা ইউনিয়ন বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষ যদি ঐ ব্যক্তিকে মাসিক কিছু অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তিনি তাহা নিজ কার্য্যের পুরস্কার বলিয়া মনে করিবেন।"

বন্য মহিষ ও বন্য শূকর এই স্থানে যথেষ্ট ছিল। সেই জন্য গ্রামবাসিগণ বনাকীর্ণ গ্রাম্যপথে ভ্রমণ করিবার সময় লাঠি, বল্লম, খোঁচ প্রভৃতি নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যাইত। হিংস্র জন্তু ব্যতীত শৃগাল, বানর, হনুমান, খরগোস, ভোঁদড়, খেঁকশিয়াল, ইঁদুর, বেঁজি, ভাম, ছুঁচো, বহু পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া, ঘোড়া, কুকুর, শূকর, বিড়াল, মুরগী, হাঁস, পায়রা, প্রভৃতি প্রধান। সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর মধ্যে কচ্ছপ, কাঁকড়া এবং গঙ্গায় কুম্ভীর, হাঙর ও শিশুকও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। শালিক, টিয়া, বুলবুল, চন্দনা, ময়না প্রভৃতি বহু পক্ষী এই স্থানে আছে এবং বহু ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ময়ূর, হরিণ প্রভৃতি যত্ন করিয়া পুষিয়া থাকেন।

হুগলী জেলায় নানাজাতীয় পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কোকিল, বউ-কথা-কও, কাক, দাঁড়কাক, ঘুঘু, বক, বাবুই, বুলবুল, বাজ, চিল, শকুনি, পেচক, বাবুই, মাছরাঙা, পায়রা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই স্থানে মৎস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে ; পুষ্করিণী ও খাল বিলেতে রুই, কাতলা, মৃগেল, ভেটকী, মাগুর, বোয়াল, চিংড়ি, পুঁটি প্রভৃতি অসংখ্য মৎস্য কলিকাতায় চালান হইয়া থাকে। গঙ্গায় প্রচুর পরিমাণে ইলিশ মাছ জন্মিয়া থাকে। অন্নদামঙ্গল রচয়িতা কবি ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই স্থানের মৎস্যের যে তালিকা তাঁহার কাব্যে দিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

কাতলা ভেকুট কই ঝাল তাজা কোল।
সীকপোড়া ঝুরী কাঁটালের বীজে ঝোল॥
ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে চিতল ফলই।
কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে কই॥
মান্না সোনা খড়কীর ঝোল ভাজা সার।
চিঙ্গড়ার ঝাল বাগ্দা অমৃতের তার॥
কণ্ঠা রান্ধি রান্ধে রুই কাতলার মুড়া।
তিত দিয়া পচা মাছে রান্ধিলেক গুড়া॥
আম্র দিয়া শৌলমাছে ঝোল চড়চড়ী।
আড়ি রান্ধে আদারসে দিয়া ফুলবড়ী॥
রুই কাতলার তৈলে রান্ধে তৈল-শাক।
মাছের ডিমের বড়া ঘৃতে দেয় ডাক॥
বাটার করিলা ঝোল খয়রার ভাজা।
অমৃত অধিক বলে অমৃতের রাজা॥
সুমাছ বাছের বাছ আর মাছ যত।
ঝাল ঝোল চড়চড়ী ভাজা কৈল কত॥
বড়া কিছু সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম।
গঙ্গাফল তার নাম অমৃত অসীম॥

সর্পদংশনে ভারতবর্ষে যত লোকের মৃত্যু হয়, তন্মধ্যে দশহাজার লোক একমাত্র বঙ্গদেশে মারা যায়। বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলায় সর্প-দংশনে মৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কেউটে গোখুরা, শঙ্খচূড় প্রভৃতি বিষধর সর্প এই স্থানে বহু দেখিতে পাওয়া যায়। গোখরো সাপ নানা জাতীয় আছে—তন্মধ্যে জাতসাপ, কালসাপ, কেউটে সাপ প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ ধানের ক্ষেতের আলের পার্শ্বে এবং জলের ধারে ইহারা থাকে। সাপুড়ে ও বেদেরা এই ভীষণ সাপগুলিকে ধরিয়া সর্ব্বত্র সাপের বহু প্রকারের খেলা দেখাইয়া বেড়ায়। পূর্ব্বে গো-সাপের দ্বারা সর্পভয় অনেক নিবারিত হইত, কারণ গো-সাপ পূর্ব্বোক্ত সাপগুলিকে মারিয়া ফেলিত। কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ চামড়ার ব্যবসায়িবৃন্দ গোসাপের চামড়া দিয়া সুন্দর সুন্দর জুতা প্রস্তুত করিবার জন্ম ইহাদিগকে মারিয়া ফেলায়, সাপের উৎপাত বর্ত্তমানে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বহুপ্রকার সাপের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে বিজয় গুপ্তের "মনসার পাঁচালী" হইতে কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত হইল :

সর্প

ত্রিভুবন মোহ যায় পদ্মার প্রতাপে।
সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিল পদ্মা অজগর সাপে॥
আড়রিয়া বেঁকা নাগে করিল আসন।
পাটেশ্বরী নাগে পদ্মা করিল বসন॥
খইয়া জাতি নাগে পদ্মার হাতে বড় শোভা।
বিঘতিয়া নাগে পদ্মা মাথায় বাঁধে খোঁপা॥
কুণ্ডলিয়া নাগে পদ্মার কর্ণের কুণ্ডলী।
জাতি সর্প দিয়া বাঁধে মাথার খুটলি॥

শিশরিয়া নাগে পদ্মার ললাটে সিন্দুর।
বিঘতিয়া বোড়া নাগে চরণে নূপুর॥
সূর্য্যমণি নাগে পদ্মার শাড়ীর আঁচলী।
ধামু নাগেতে পদ্মার কোমরে কাঁচলী॥

"নহি ধান্ত-সমোহর্থঃ" নীতিশাস্ত্রকার চাণক্যের সূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ে ৬৬ শ্লোকে এই অমূল্য বাক্যটি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আমরা অনেকে একথাটি ভুলিয়া গিয়াছি। ইহার অর্থ ধান্তের সমান অন্য কোন অর্থই নয়। যতপ্রকার ধন আছে তন্মধ্যে ধান্য-ধনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ব্রীহি জাতীয় দ্রব্যাবলীর মধ্যে ধান্তের শ্রেষ্ঠত্ব কে অস্বীকার করিবে? মণিকাঞ্চন ধারণে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না; অন্নদ্বারা তাহা সম্ভবপর। ধান্ত, যব, গোধুম, কঙ্গু, নীবার, কোদ্রবাদি নানাপ্রকার ব্রীহি বা শস্ত দেখা যায়। পঞ্চ, সপ্ত ও সপ্তদশ প্রকার শস্ত আছে, যথা—ব্রীহি, যব, মসূর, গোধুম, মুদ্গ, মাষ, তিল, চণক, অণু প্রিয়ঙ্গু, কোদ্রব, মকুষ্ঠ কলায়, কুলথ, যঠ, সর্ষপ, তাতসী। এই সপ্তদশ প্রকার শস্ত ধান্তবর্গের মধ্যে গণনীয়। এতন্মধ্যে ধান্ত দ্বারা প্রাণ ধারণ করা যায় বলিয়াই তাহার প্রাধান্ত বহু প্রাচীন কাল হইতে সর্ব্বজন-সম্মত।

কৃষিজ দ্রব্য
ধান্ত

বঙ্গদেশে শস্তের মধ্যে ধান্তই সর্ব্বপ্রধান; হুগলী জেলাতেও ধান্ত প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। এই জেলায় বহু প্রাচীন কাল হইতে নানাবিধ শস্ত উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে আমন ধান্তই প্রধান। সমগ্র ভারতবর্ষে দশ হাজার রকমের আমন ধান্তের চাষ হয়।* হুগলী জেলায় প্রায় একশত বিভিন্ন রকমের ধান্ত উৎপন্ন হয়—যথা, দাদখানি, হাতিশাল, ঝিঙ্গেশাল, বাঁক তুলসী, কাটারী-ভোগ, নাগরা, ইন্দ্রশাল, কার্ত্তিকশাল, রামশাল, বাঁশফুলি, সিতাহার, পিঙ্গাশোল, কর্ণশাল, কাশিফুল, রূপশাল, মেটে আকড়া, ভূতাশোল,

* "কৃষক" ফাল্গুন ১৩২৩।

গয়াবালি, হলুদগুঁড়ি, সোনাতার, কলমকাঠি, বকুলকুঞ্জ, ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন আউশ ধান্যও এই স্থানে উৎপন্ন হয়। আউশ ধান্য যে কত প্রকারের আছে তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না।* প্রায় তিরিশ প্রকারের আউশ ধান্য হুগলী জেলায় উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে দুর্গাভোগ, তুলসী মঞ্জরী, চন্দ্রমণি, রাজসাই, সূর্য্যমুখী, কাজলা, কালা-মানিক, মধুমালতী, পিঁপড়ে সার, দলকচু, সূর্য্যমণি প্রভৃতি প্রধান। বঙ্গদেশে সাধারণতঃ অন্যান্য জেলায় যে প্রকারের ধান্য জন্মে, হুগলী জেলায় তাহার অনেকটা জন্মিয়া থাকে বলা যায়। পূর্ব্বাপেক্ষা এই স্থানের শস্যোৎ-পাদিনী শক্তি কমিয়া গিয়াছে, ইহা অসংকোচে বলা যায়। ধান্যোৎপত্তির পরিমাণ হিসাবে মেদিনীপুর জেলা বঙ্গদেশে প্রথম স্থান অধিকার করিলেও (প্রতি একারে † ষোল মণ) পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের সহিত ইহার তুলনাই হয় না। যথা—ইটালিতে প্রতি একারে চল্লিশ মণ, এবং আমেরিকায় প্রতি একারে পঁচিশ মণ করিয়া ধান্য উৎপন্ন হয়। এই দিকে আমাদের বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। বর্ত্তমানে এই জেলায় ৫ লক্ষ ৪ হাজার ৫ শত একার জমিতে মাত্র ধান চাষ হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার পুস্তকেও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষবাসের নির্দ্দেশ দিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন :

"চাষ করা পৈত্রিক পেশা ; তাই সময়, অসময়ে জমিতে ভুবার লাঙল দিয়ে, বীজ ছড়িয়ে, আকাশের পানে হাঁ করে চেয়ে বসে থাকে। একে চাষ করা বলে না, লটারী-খেলা বলে। কোন্ জমিতে কখন সার দিতে হয়, কাকে সার বলে, কাকে সত্যিকার চাষ করা বলে—এসব জানে না।" ‡

* বিক্রমপুরের ইতিহাস (২য় সংস্করণ)—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পৃঃ ৫৫
† ৪৮৪০ বর্গগজ পরিমিত ভূমিতে এক 'একার'—অর্থাৎ তিন বিঘার কিঞ্চিৎ বেশী।
‡ দত্তা—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৪০—৪১

প্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী তাঁহার 'দেশের ডাক' নামক পুস্তকে ধান্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

ভূলক্ষ্মী দয়া করে প্রতিবৎসর কেবল বৃটিশ ভারতেই গড়ে ৮০ কোটী মণ ধান দেন। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে ৮৬ কোটী মণ হতো—চীনদেশে হয় ৬৪ কোটী মণ। ৮০ কোটী মণে ২৬ কোটী ভারতবাসীর পেট ভরে খেয়ে দিন কাটে না, অথচ ৬৪ কোটী মণ দিয়ে প্রায় ৪০ কোটী চীনবাসী সুখে আছে কি করে? জাপানে ৬ কোটী লোকের ১৫ কোটী মণে চলে, আর আমাদের?

ভারতবর্ষ	চীন	জাপান
৮০ কোটী	৬৪ কোটী	১৫ কোটী

ইংরাজের খাতায় লেখা আছে, ১০ কোটী ভারতবাসী 'Insufficiently fed', পেটভরে খেতে পায় না; ৪ কোটী লোক "lie down with one meal a day." এক বেলা খেয়ে ঘুমায়—আর প্রায় এককোটী লোক তিনমাস ধরে নাকি আমের আঁটী, কদম-পাতা, আম-পাতা সিদ্ধ করে খেয়ে দিন কাটায়। কোন্ দেশে ও ভাই কোন্ দেশে? যে দেশে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী চাল হয় সেই দেশে, যে দেশেতে যত বড় চালের ছালা—সেই দেশেতে তত বেশী পেটের জ্বালা! তাই আমাদের যুঝবার লড়বার শক্তি কমে গেছে!

কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, কলেরা, যক্ষ্মা, জ্বর-জ্বাড়ি হবে না? পেটে ভাত নাই, রক্তে জোর আসবে কোথা থেকে? রক্তে জোর না থাক্‌লে রোগ এসে তো কাবু করবেই! ১৯১৮ সালে ৫ মাসের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে ৬০লক্ষ লোক কেবল ভারতে মারা গেল—আর সারা দুনিয়ায় ৩৫ লক্ষ। ম্যালেরিয়া, ম্যালেরিয়া এত যে শুনি, ওর যে আর একটা নাম 'Hunger disease', খেতে না পেয়ে, না পেয়ে, শক্তিহীন হ'লে যে জ্বর দেখা দেয়। কুইনাইনে কি খিদে মেটে? না কুইনাইনে 'vitality' জীবনী

শক্তি আছে? জীবনীশক্তি আছে খাবারে; সেই খাবার হচ্ছে যে সাগর-পারে।

বিগত ৫০ বৎসরে ভারতবর্ষে ২৫টী দুর্ভিক্ষ হয়েছে এবং তাতে প্রায় ৩ কোটী লোক মারা গেছে। ভারতের দুর্ভিক্ষে কালা আদমী মরে—সাদা তো নয়। তাই ১৯০৩ সালে ফরিদপুর দুর্ভিক্ষের সময় মিঃ জ্যাক্‌সন্ বাংলার বুকে বসে লিখেছিলেন, 'গাছে এখনও পাতা আছে এবং এ অঞ্চলের মেয়েদের এখনও বেশ্যা হতে হয় নি—অতএব এদিকে দুর্ভিক্ষ আছে বলা যায় না।' কি নির্ম্মম!

"There are still leaves on the trees and the women are not yet prostitutes, therefore there is no famine in this part of the country." *

হুগলী জেলা হইতে ধান্য বিদেশে ইউরোপীয় বণিকগণ রপ্তানি করিত, দেখিতে পাওয়া যায়। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে কাশীমবাজার কুঠীর কর্ত্তা মিঃ জন কার, হুগলী হইতে কোন্ মাসে, কোন্ জিনিষ সুবিধা দরে কিনিতে পাওয়া যায়, তাহার একটি তালিকা প্রেরণ করেন। উক্ত তালিকা হইতে বণিকগণ জুলাই ও আগষ্ট মাসে এবং ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে ধান্য সংগ্রহ করিত বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

"In July and August—Rice, Hemp, Flax.
In December and January—Long Pepper, Oyle and Rice of the second growth." †

সপ্তদশ শতাব্দীতে এই স্থানে এক টাকায় দেড় মণ চাউল বিক্রয় হইত। ইউরোপীয় বণিকগণ কোন্ কোন্ জিনিষ হুগলী হইতে লইয়া যাইত, তাহা পৃথক অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। নিম্নে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে

* দেশের ডাক (২য় সংস্করণ) শ্রীজ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী।

† Wilson's Early Annals, Vol—I, Page—378.

১৯০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হুগলী জেলায় এক টাকায় চাউল গম, ছোলা ও লবণ কত পাওয়া যাইত তাহা প্রদত্ত হইল :

চাউল প্রভৃতির দর

গড় বৎসর	চাউল (সের হিসাবে)	গম (সের)	ছোলা (সের)	লবণ (সের)
১৭৯৩—১৮১৩	৪০	৫০·৫০	৫০·৫০	......
১৮৬১—১৮৬৫	২১	২১·৪০	২২·৭১	১০·৬০
১৮৬৬—১৮৭০	২০·৮৪	২১·৮৬	১৭·১৪	৯·৩২
১৮৭১—১৮৭৫	১৬·৯৪	১৪·৬৪	১৮·৭৪	৮·৭৩
১৮৭৬—১৮৮০	১৪·৪০	১৩·৮৯	১২·৪৩	৯·০০
১৮৮১—১৮৮৫	১৬·৫৯	১৫·৫৭	১৮·৩৭	১২·৪৩
১৮৮৬—১৮৯০	১৪·৮৬	১৩·৯৫	১৭·১৬	১০·৭৬
১৮৯১—১৮৯৫	১১·৮৬	১২·৯৫	১৫·০৩	১০·৫৯
১৮৯৬—১৯০০	১০·৯৫	১০·৯৭	১২·৫৯	৯·৯৭
১৯০১—১৯০৫	৯·৯৮	১০·৩৪	১২·৬৪	১২·১৬
১৯০৫—১৯০৭	৭·৪০	৮·৪০	৯·৪৬	১৬·১৭

হুগলী জেলায় চাউল ও অন্যান্য জিনিষের দর বিশেষভাবে সস্তা দেখিয়া, ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বণিক সভা "হুগলীকে বাঙ্গলার চাবিকাঠি" বলিয়া (Key of Bengal) বর্ণনা করেন। পরবর্ত্তীকালে লর্ড ক্লাইভও লক্ষী-গঞ্জের ধানের আড়তগুলি দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া, উক্ত স্থানকে "ভারতের শস্যাগার" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়।

হুগলী জেলার ভূমি সমস্ত কর্ষণযোগ্য এবং এক 'একারে' বৎসরে বার মণ ধান হুগলীতে বর্ত্তমানে উৎপন্ন হয়। জনসংখ্যার অনুপাতে যে

ধান উৎপন্ন হয়, তাহাতে প্রতি বৎসর ১ মণ ৩৪ সের ৬ ছটাক চাউল জেলার প্রত্যেকের ঘাটতি পড়ে। *

"Almost the whole area of the district is cultivable and is highly cultivated. It is almost entirely asable i. e. rice-land. No measurable area of land is set apart as pasture land, the only pasturage in the district is found on the rice fields in the cold weather, after the crops have been cut."†

বিদেশী পর্য্যটকের প্রদত্ত দর

বিদেশী পর্য্যটকেরা আসিয়া বাঙ্গলা দেশের অবস্থা কিরূপ দেখিয়াছিলেন তাহার বহু বিবরণ পাওয়া যায়; নিম্নে কয়েকটি উল্লিখিত হইল :

১৩৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে শীতকালে বিখ্যাত ভূপর্য্যটক ইবন বটুটা বাঙ্গলায় আসেন। তিনি বাজার দর নিম্নলিখিতরূপ দেখিতে পান :

দুগ্ধবতী গাভী	১টি	৫৲ টাকা	চাউল	মণ ⁄১৫ পয়সা
মুরগী বড়	১টি	৫ পয়সা	ঘি	মণ ১৷৶০ আনা
ভেড়া বড়	১টি	।০ আনা	তিল তৈল	মণ ॥৶১০ আনা
চিনি	মণ	১৶০ আনা	উৎকৃষ্ট সুতী কাপড় ১৫ গজ	২৲ টা

মানরিক ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে বাজার দরের এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন :

চাউল ১৫ মণ মোট মূল্য (সরু মোটা হিসাবে)
৩৲ টাকা হইতে ৪৲ টাকা

মাখন ১ মণ	২৲ টাকা
২০ হইতে ২৫টি মুরগী	২৲ টাকা
গাভী একটি	১৲ টাকা
চিনি ২॥০ মণ	৭ আনা হইতে ৮ আনা

* নয়া-বাঙ্গলা—শ্রীসুধীরকুমার মিত্র, পৃষ্ঠা ১৬৪

† Hooghly Medical Gazetteers.

চল্লিশ বৎসর পর বাউরি বাঙ্গলাদেশে আসেন; তিনি যে মূল্য তালিকা দিয়াছেন তাহা এইরূপ :

উৎকৃষ্ট গাভী একটি	মূল্য	২৲ টাকা
উৎকৃষ্ট শূকর একটি	"	৸৹ আনা
৪০ হইতে ৫০টি মুরগী	"	১৲ টাকা

টাকায় আট মণ চাউল

সায়েস্তা খাঁ এই সময়ে বাঙ্গলার সুবেদার। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য-হ্রাসের জন্য তিনি খুব বেশী চেষ্টা করেন এবং উহা সাফল্যমণ্ডিত হয়। খাদ্য ও বস্ত্রের মূল্য-হ্রাস এবং জনসাধারণের বৈষয়িক উন্নতি-বিধানের জন্য শাসকদের মধ্যে তখন রীতিমত প্রতিযোগিতা হইত। চাউলের মূল্য টাকায় আট মণে নামাইয়া সায়েস্তা খাঁ এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ঢাকা সহরের পশ্চিম তোরণের উপর এই কথাগুলি খোদাই করিয়া দেন :

"যাঁহার আমলে চাউলের দর এত সস্তা হইবে, তিনি ভিন্ন আর কেহ যেন এই তোরণ না খোলেন।"

সায়েস্তা খাঁর শাসনকালের পর মাত্র দুইবার অল্প সময়ের জন্য তোরণটা খোলা হইয়াছিল, একবার নবাব সুজাউদ্দীন এবং দ্বিতীয়বার নবাব সরফরাজ খাঁর আমলে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দলিলপত্র হইতে জানা যায় যে, সায়েস্তা খাঁর মৃত্যুর অর্দ্ধশতাব্দী পর পর্য্যন্তও বাঙ্গলায় খাদ্য-দ্রব্যের দর খুব সস্তা ছিল। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট বাঁশফুল চাউলের দর টাকায় ১ মণ ১০ সের এবং মোটা কর্কশালি চাউলের দর টাকায় ৭ মণ ২০ সের ছিল। মাঝারি রকমের দেশনা, পূর্ব্বা, মণসরা প্রভৃতি চাউল টাকায় সাড়ে চারি মণ হইতে সাড়ে পাঁচ মণ পর্য্যন্ত পাওয়া যাইত।

উৎকৃষ্ট সরিষার তেলের দর ছিল টাকায় ২১ সের এবং প্রথম শ্রেণীর ঘৃত টাকায় সাড়ে দশ সের পাওয়া যাইত।

ইংরেজ আমলের গোড়ার দিক

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বুকানন হ্যামিলটন আসিয়া পণ্য মূল্যের অবস্থা দেখিলেন এইরূপ :

সরু চাউল	১।০ মণ	ময়দা	২৲ মণ
মোটা চাউল	১৲ মণ	ঘি	।৶০ সের
অড়হর ও মুগের ডাইল	১॥০ মণ	সরিষার তেল	৵০ সের

মণ্টগোমারী মার্টিন মূল্য তালিকা দিতেছেন এইরূপ :

মোটা চাউল	৸৵০ মণ	মোটা শাড়ী প্রতিটি	⁄০ আনা
খেসারি ও মশুর ডাইল	৸০ মণ	উৎকৃষ্ট ধুতি প্রতিটি	১৲ টাকা
লবণ	⁄১৫ সের	মোটা ধুতি	টাকায় ৩
তেল	৪৲ মণ	গামছা প্রতিটি	⁄০ আনা
উৎকৃষ্ট শাড়ী প্রতিটি	১॥০ আনা	গোলাপ চাদর প্রতিটি	॥৵০ আনা

ধানের দরের ক্রমবৃদ্ধি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভ পর্য্যন্ত ধানের স্বাভাবিক বাজার দর মোটা-মুটি দুই হইতে আড়াই টাকার মধ্যে ওঠানামা করিত। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের পর হইতে কি ভীষণ অবস্থা হইয়াছে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিভিন্ন জেলায় ধানের দর কি ভাবে উঠা-নামা করিয়া ক্রমশঃ বাড়তির দিকে অগ্রসর হইয়াছে তাহারি একটি সুদীর্ঘ তালিকা ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টে প্রদত্ত হইয়াছে। উহা হইতে কয়েকটি দর পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল :

বৎসর		প্রতি মণ
১৬৭০	...	৴৪ পাই
১৭৬৮	...	।০ হইতে ।৴৩ পাই
১৭৯০	...	৴০ হইতে ।।০ আনা
১৮০৪	...	৴৩ পাই
১৮৩৪	...	৸৶০ আনা
১৮৬০	...	১।০ আনা
১৮৮০	...	১।২ পাই
১৮৯৮	...	১৷০ আনা
১৯০০	...	২৲ টাকা
১৯১০	...	৩৲ টাকা

পশ্চিমবঙ্গে চাউলের দর

সম্প্রতি ২১শে ডিসেম্বর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে, যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে পশ্চিম বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে প্রতি টাকায় নিম্নলিখিত মত চাউল পাওয়া যাইত বলিয়া ১৫ই জানুয়ারী তারিখের "কলিকাতা গেজেটে" যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

২৪ পরগণা :—সদর ২ সের ৭ ছটাক, ডায়মণ্ডহারবার ২ সের, ৪ ছটাক, বারাকপুর ২ সের ৭ ছটাক, বশিরহাট ২ সের ২ ছটাক।

নবদ্বীপ :—সদর ২ সের ১১ ছটাক, রাণাঘাট ২ সের ৫ ছটাক।

মুর্শিদাবাদ :—সদর ২ সের ৮ ছটাক, লালবাগ ২ সের ৮ ছটাক, জঙ্গীপুর ৪ সের ১০ ছটাক, কান্দি ২ সের ১১ ছটাক।

বর্দ্ধমান :—সদর ২ সের ৯ ছটাক, আসানসোল ২ সের ১১ ছটাক, কাটোয়া ২ সের ১৪ ছটাক, কালনা ২ সের ৬ ছটাক।

হুগলী :—সদর ২ সের ৭ ছটাক, শ্রীরামপুর ২ সের ৭ ছটাক, আরামবাগ ২ সের ৪ ছটাক।

হাওড়া :—সদর ২ সের ৭ ছটাক, উলুবেড়িয়া ১ সের ১২ ছটাক।

বীরভুম :—সদর ২ সের ৯ ছটাক, রামপুরহাট ২ সের ১১ছটাক।

বাঁকুড়া :—সদর ২ সের, বিষ্ণুপুর ২ সের ৮ ছটাক।

মেদিনীপুর :—সদর ২ সের ৯ ছটাক, কাঁথি ২ সের ৮ ছটাক, ঘাটাল ২ সের ১১ ছটাক, ঝাড়গ্রাম ২ সের ১ ছটাক।

জলপাইগুড়ি :—সদর ২ সের ১০ ছটাক, আলীপুরদুয়ার ২ সের ৩ ছটাক।

দার্জ্জিলিং :—সদর ২ সের ১১ ছটাক, কারশিয়ং ২ সের ১১ ছ, শিলিগুড়ি ১ সের ১২ ছটাক, কালিম্পং ২ সের ১১ ছটাক।

মালদহ :—২ সের ৪ ছটাক।

পশ্চিম দিনাজপুর :—২ সের ১২ ছটাক।

নীলের চাষ এই জেলায় বহুল পরিমাণে হইত এবং জেলার বহু স্থানে ভগ্ন নীল-কুঠি অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। তৎকালে নীলকর সাহেবগণের অত্যাচারে

নীল

বঙ্গদেশের কৃষককুল উদ্ব্যস্ত হইয়া পড়ে। নীলকর সাহেবরা চাষীকে দিয়া জোর করিয়া নীল চাষ করাইয়া লইত এবং নীলের ব্যবসা করিয়া বণিকগণ কোটী কোটী টাকা উপার্জ্জন করিত। প্রজার সহিত সাহেবদের সাধারণতঃ এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইত। কিন্তু নীলকর সাহেবগণ ১ম বীজের মূল্য, ২য় দাদনের টাকা, ৩য় চুক্তি-পত্রের স্ট্যাম্পের মূল্য প্রভৃতির দাম ধরিয়া, এইরূপ ভাবে কৌশলে হিসাব করিত, যে কৃষকের ভাগ্যে কিছু জুটিত না, উপরন্তু বাকী বকেয়া শোধ করিবার জন্য পুনরায় চুক্তি-বদ্ধ হইত। হুগলী জেলার নীল-চাষ ও নীলকরদিগের অবস্থা দেখিয়া দীনবন্ধু মিত্রের প্রসিদ্ধ নাটক "নীল-দর্পণ" রচিত হয়। উহাতে এক স্থানে লিখিত আছে—

"নীলের দাদন ধোপার ভ্যালা,
একবার লাগলে আর উঠে না।"

ওয়্যালী সাহেব গেজেটিয়ারে লিখিয়াছেন যে, বাঁশবেড়িয়া নীলকুঠির অত্যাচার হইতেই দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের উপাদান সংগৃহীত হয়। এতদ্ভিন্ন নদীর পশ্চিম দিকে কালীপুর এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বে পারুল নামক দুইটি গ্রামে অদ্যাপি নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

The ruins of the indigo factories can still be seen one at Kalipur west of the river and another at Parul in the south east......The scene of Nildarpan (Mirror of Indigo), a Bengali drama of the late Babu Dinabandhu Mitra, is said to have been laid in an Indigo factory of Bansberia. *

এই গ্রন্থ তৎকালীন অত্যাচার নিবারণে প্রধান সহায় হইয়াছিল এবং ইহার সহিত তৎকালীন সাময়িক পত্র সংবাদ-প্রভাকর, ভাস্কর, সোমপ্রকাশ, বঙ্গদর্শন, হিন্দু পেট্রিয়ট, প্রভৃতিও উহাতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। নীল-চাষ উপলক্ষ্য করিয়া যে জন-আন্দোলন বঙ্গদেশে আরম্ভ হয়, তাহাই পরবর্ত্তী কালে রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিবর্ত্তিত হয়।

স্যার জন পিটার গ্রাণ্ট, লর্ড কানিং, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড লং প্রভৃতির আন্দোলনের ফলে বঙ্গদেশে নীল-চাষ অন্তর্হিত হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত নীলদর্পণ নাটকের বাঙ্গলা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন এবং লং সাহেব উহার ভূমিকা লেখায়, তাহার এক মাস কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ তাহার জরিমানার টাকা দিয়া দেন। স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার স্মৃতি-কথায় লিখিয়াছেন:

---

* **Hooghly District Gezetteers. Pages 244 & 253.**

"যখন মানুষের মন এইরূপ উত্তেজিত, তখন দীনবন্ধু মিত্রের সুপ্রসিদ্ধ নীলদর্পণ নাটক প্রকাশিত হয়। নাটকখানি বঙ্গ-সমাজে কি মহা উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছিল তাহা আমরা কখনও ভুলিব না। আবালবৃদ্ধবনিতা আমরা সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলাম, ঘরে ঘরে সেই কথা, বাসাতে বাসাতে অভিনয়—ভূমিকম্পের ন্যায় এক সীমা হইতে আর এক সীমা পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। এই মহা উদ্দীপনার ফলেই নীলকরের অত্যাচার বঙ্গদেশ হইতে জন্মের মত অন্তর্হিত হইল।"

টয়েনবি সাহেব ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে হুগলীজেলায় নীলের চাষ হয় বলিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু তখন ভাল করিয়া কারবার আরম্ভ হয় নাই। মিঃ প্রিনসেপ (Mr. Prinsep) নামক একজন সাহেব সর্ব্বপ্রথম এই স্থানে নীলের কারবার সুরু করেন। পরে কোম্পানী ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে (XXIII) তেইশ আইন, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের (VI) ছয় আইন এবং ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের (X) দশ আইনের দ্বারা, সরকার নীলকর ও কৃষকদের যথাক্রমে পরিচালনা করেন।

১৮১০ খৃষ্টাব্দে নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচারে মিসেস স্টেপেলটন নামক একজন ইংরাজ মহিলা ও তাহার সাতজন কর্ম্মচারীকে কৃষকগণ আহত করে, পরে দুইজন কর্ম্মচারী মারা যায়। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে মিঃ চার্লস বেনেট নামক একজন সাহেবও আক্রান্ত হন, কিন্তু তিনি অল্পের জন্য বাঁচিয়া যান। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে চণ্ডীতলায় নীলকুঠিতে মিঃ ক্যাসেল নিহত হয়। এই জেলার বাঁশবেড়িয়া, হোসেনাবাদ, তালন্দা, বলাগড়, মায়াপুর, দ্বারবাসিনী, গোপীগঞ্জ, দুর্গাপুর, কালিকাপুর মেলিয়া, পাইতাছি, মহৎপুর, রাজপুর, সীতাপুর, শিবরামবাটী, জেজুর, খন্যান প্রভৃতি স্থানে নীলকুঠি ছিল।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ১৭ই মার্চ্চ তারিখে "কলিকাতা গেজেটে" হুগলী নদীর তীরে চুঁচুড়া-চন্দননগরের মধ্যে 'মুন্সিগঞ্জ' নামক স্থানের নীলকুঠি, উহার

মালিক মিঃ ব্লুম (Mr. Blume) পরলোকগমন করায়, বিক্রয় করা হইবে বলিয়া এক বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল।

বঙ্গদেশে মুসলমান রাজত্বের শেষে, কোম্পানীর রাজত্বের সূত্রপাত হয়; এবং সেই সময় বহু প্রাচীন জমিদার তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন ও নূতন ভূইফোড় জমিদারদের আবির্ভাব হয়। কোম্পানী কেবল জমির বন্দোবস্ত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, অধিকন্তু তাহাদের অধিকৃত বড় বড় শহরে কুঠি খুলিয়া বাঙ্গলার বস্ত্র ও রেশম শিল্পের জোর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া ইংরাজ-বণিকগণের ধনাগমের পথ সুগম করিয়া দেন। কালক্রমে বাঙ্গলার উর্ব্বর ক্ষেত্রগুলির উপর নীলকর সাহেবদিগের দৃষ্টি পড়িল। যে জমিতে ভাল ধান হয়, সেই জমিতেই ভাল নীল জন্মিত এবং নীল ও ধান একই সময়ে হইত। ধান বঙ্গের গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র পুঁজি; কিন্তু নীলকর সাহেব কৃষককুলকে ধানের পরিবর্ত্তে নীলচাষ করাইতে বাধ্য করিত। এই সম্বন্ধে ১২৯৩ সালের 'নবজীবন' মাসিক পত্রে 'নীলচাষ' সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল যে, 'সাহেবেরা যত কম মূল্যে প্রজার দ্বারা নীল জন্মাইয়া লইতে পারিতেন তাহার সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতেন। ধানের ন্যায় নীলের বাজার-দর ছিল না; সাহেবেরা যে একদর স্থির করিয়া রাখিয়া দিলেন, সেই হারে চিরকাল ধরিয়া জন্মা-অজন্মার তারতম্য বিচার না করিয়া প্রজাদিগের নিকট নীলের গাছ লইতেন এবং সেই হারও প্রজাদিগের ইচ্ছামত স্থির হইয়াছিল এবং ইহাতে কৃষকদের কখনও লাভ না হইয়া বরং বৎসর বৎসর সাহেবদের নিকট তাহাদিগকে ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকিতে হইত। অধিকন্তু প্রজাদিগের উত্তম জমিসকল নীলকররা তাহাদিগকে নীল ভিন্ন অন্য কিছু বপন করিতে দিতেন না। দ্বিতীয় কারণ এই যে, নীল এবং ধান একই সময় কর্ত্তন করিতে হয়; কিন্তু অগ্রে নীল কর্ত্তন করিয়া তাহা কুঠিতে দাখিল না করিলে কুঠির লোক প্রজাদিগের তাহাদের স্বীয় ধানে হস্তক্ষেপ করিতে

দিত না। ইহাতে প্রজারা অনেকে বিরক্তিবোধ করিত ও তাহাদের ক্ষতি হইত।'

নদীয়ায় মিঃ লার্মার Mr. Larmour নামে একজন নীলকর 'শ্যামচাঁদ' বা 'রামকান্ত' নামে এক অস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ইহার দ্বারা কৃষককুলকে নীলকুঠির·মধ্যে আবদ্ধ করিয়া প্রহার করা হইত। চুচুড়ার অক্ষয়চন্দ্র সরকার নবজীবনে লিখিয়াছিলেন যে, "এই অস্ত্রটির গঠন সকল কুঠিতে এক রকম হইত না। কুঠি বিশেষে এবং নীলকর কিম্বা দেওয়ানজীর দয়ার উপর তারতম্য অনুসারে তাহা ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিত। কোনও স্থানে একটা লাঠির অগ্রভাগে এক হাত দীর্ঘ এবং অর্দ্ধহাত প্রস্থ খুব শক্ত এবং মোটা চর্ম্মের একখানা হাতা এবং কোনও স্থানে হাতার পরিবর্ত্তে অগ্রভাগে গ্রন্থিযুক্ত কয়েকছড়া চর্ম্মের রজ্জু বাঁধা থাকিত।...... শ্যামচাঁদ নামক এইরূপ এক অস্ত্র ইণ্ডিকো কমিশনে সাহেবদিগের নিকট দাখিল করা হইয়াছিল।"

"Mr. Eden said, it consisted of a stick with a leather attached, and was called "Shamchand" or "Ramkanta". The authorship of this has been ascribed by some to Mr. Larmour."

নীলকর সাহেবগণ ব্যবসা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বঙ্গদেশে তাহাদের 'শিখণ্ডী' রূপে খাড়া করিয়া, যে সমস্ত 'দেওয়ান' 'গোমস্তা' প্রভৃতি দেশীয়গণ, তাহাদের স্ব-স্ব আধিপত্য বিস্তার কল্পে, কৃষককুলের উপর বর্ব্বরোচিত অত্যাচার করিয়াছিলেন, নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করিলে, সাহেবদিগের অপেক্ষা দেশীয়গণের কার্য্য যে অধিকতর ঘৃণিত তাহা আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সাহেবদের নামে অত্যাচারের জন্য দায়ী 'দেওয়ান' ও 'গোমস্তা'; কারণ নীলকরগণ এই দেশের সমাজ ও এতদ্দেশীয় লোকের চরিত্র সম্বন্ধে সেই সময় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল,

সেই সুযোগে আমাদের দেওয়ান, গোমস্তা প্রভৃতি ভ্রাতৃবৃন্দ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি, ও অর্থাগমের জন্ম প্রজাগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিত এবং সাহেবকে বুঝাইত যে, কুঠির মর্য্যাদা ও সুনাম অটুট ভাবে রক্ষা করিতে হইলে, রায়তদের উপর এইরূপ কড়া শাসন ও অমানুষিক অত্যাচার একান্ত আবশ্যক ; নচেৎ এই শ্রেণীর লোকদিগকে কখনই বশে, রাখা যাইবে না। নীলকরদিগের অত্যাচার কিরূপ চরমে উঠিয়াছিল তাহা নিম্নোক্ত ছড়াটি হইতে প্রতীয়মান হইবে।

"জমিনের শক্র নীল,
কর্ম্মের শক্র ঢিল,
জগতের শক্র পাদ্রি হিল।" *

টয়েনবি সাহেব তাঁহার পুস্তকে হুগলী জেলায় বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত নীলকুঠি ছিল, তাহার একটি তালিকা এবং উক্ত কুঠির মালিকগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। † নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল :

বৎসর	স্থান	মালিকের বা ম্যানেজারের নাম
১৮২২	বাঁশবেড়িয়া	জে, বি, ব্রিচ
১৮২৭	ঐ	টেম্পল
১৮২৯	হোসনাবাদ	সিরকোর
১৮২৯	ভালদা	এ, বার্জ
১৮৩০	গোপীগঞ্জ	টাইরী
১৮৩৮	দুর্গাপুর	ম্যাকলিন
১৮৩৯	কালকাপুর	ওয়ার্ণার
১৮৩৯	মেলিয়া	জেমস স্মিথ
১৮৪২	পায়গাছি	জি, গর্ডন

* ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে Rev : S. T. Hill কর্ত্তৃক ইণ্ডিকো কমিশনে প্রদত্ত সাক্ষ্য

† A Sketch of the Administration of the Hooghly District.

রেশম, তসর, সিল্ক ও মসলিন এই জেলার হরিপাল, খিরপাই, সোনামুখী, মগরা (পূর্ব্ব নাম গোলাঘর), বদনগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তুত হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জেলার বিভিন্ন 'আড়ং'এ (কারখানা) ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে নিম্নলিখিত স্থানে টাকা অগ্রিম দিয়াছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়।

রেশম সিল্ক

কারখানা		রেসিডেন্ট
Hurrypaul—হরিপাল	—৮৫ ৪৪৩	টমাস হিউয়েট (১৭৬৫ খৃঃ)
Dorneacally—ধনিয়াখালি	—৩৫ ৫৩৩	... ...
Gollagore—গোলাঘর	—৩৮ ৫১৮	রজার লেন ওরিকার্ড (১৭৯৫খৃঃ)
Keerpye—খিরপাই	—১৬২ ৫৭০	পিটস মিডলটন (১৭৯৬ খৃঃ)

১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত কারখানাগুলি দেখিয়া কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারী তথায় কার্য্য ভাল ভাবে চলিতেছে বলিয়া রিপোর্ট দেন; কিন্তু দ্বারহাটার কার্য্য খুব খারাপ এবং "গত বৎসরের পঞ্চাশ হাজার টাকা তখনও বাকী পড়িয়া আছে" বলিয়া তিনি উক্ত রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন।

"At Doorhatta the company's affairs in a distressed situation and proceeded to Keerpye where he found the investment in a very backward state." *

ধনিয়াখালিতে বহু মুসলমান অদ্যাপি চিকনের কার্য্য করিয়া থাকে এবং আমেরিকায় তাহা রপ্তানি হয়।

ডাঃ ক্রফোর্ড সাহেব হুগলী জেলার সিল্ক ব্যবসা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

"Silk was formerly an important manufacture of the Hughli district. Silk was a monopoly in the hands of the

* The Minutes of Consultations of Fort William.

company, managed by the Commercial Resident of Haripal Khirpai and Radhanagar. When their Commercial affairs were wound up and their factories sold, the silk industry, fell into the hands of Messrs. Robert Watson and Company. The East India Company's factory at Khirpai was certainly in existence in 1795, and probably existed prior to 1765, the date when the company received the Dewani of Bengal. Prior to this Dewanganj, on the west bank of the Dwarkeswar in Goghat Thana, was the seat of an important silk trade which was financed from upper India to which the silk manufactured was transported on camels. This trade was almost killed by the establishment of the East India Company's silk factories, which exported their silk by water from Ghatal to Calcutta, and thence to Europe." *

১৬৫০ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ব্রুকহ্যাভেনকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মাদ্রাজ হইতে হুগলীতে কুঠি স্থাপন করিতে প্রেরণ করেন; এবং তাঁহাকে হুগলী হইতে সিল্ক এবং চিনি রপ্তানী করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। এই সম্বন্ধে "হেজেস্ ডায়েরী"তে যাহা লিখিত আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"Capt. Broakhaven who was sent from Madras to establish the factory at Hughli, gave instructions that silk and sugar were to be brought here."

বর্ত্তমানে একমাত্র বদনগঞ্জ ব্যতীত এই জেলার আর কোথাও সিল্কের কাপড় তৈয়ারী হয় না। কাপড় চন্দননগর (ফরাসডাঙ্গা বলিয়া বিখ্যাত), হরিপাল, খানাকুল, বেগমপুর, কৈকালা, রাজবলহাট, বারহাটা প্রভৃতি গ্রামে এখনও তাঁতীগণ বুনিয়া থাকে। সিল্কের উপর ছাপার কাজ শ্রীরামপুরে এবং চুঁচুড়ায় খুব সুন্দর ভাবে এখনও হইয়া থাকে।

* Hooghly Medical Gazetteer.

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবাসী তাহার প্রয়োজনীয় লবণ নিজেই তৈয়ারী করিয়া লইত; রাজসরকারে হিন্দু রাজত্বকালে কোনরূপ কর সেইজন্য দিতে হইত না। 'নুন-ভাতে'র জন্য কোন কালেই ভারতবাসী পরমুখাপেক্ষী ছিল না, সকলেই স্বাবলম্বী ছিল। মুসলমান রাজত্বকালে সম্রাট্ সুজার রাজস্ব বন্দোবস্তে সর্ব্বপ্রথম 'নিমক-মহালে'র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঐ সময়ে ভারতের যাবতীয় লবণের কারবার জমিদারদিগের দ্বারা নবাবের কর্তৃত্বাধীনেই পরিচালিত হইত। *

লবণ

ভারতের মধ্যে বঙ্গদেশে মেদিনীপুরের হিজলী নামক স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট লবণ প্রস্তুত হইত এবং মুসমমান রাজত্বের পূর্ব্বেও হিজলী লবণ-প্রস্তুতের জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। যে সকল স্থানে ভাল লবণ উৎপন্ন হইত না, সেই সকল স্থানে ভাল লবণ প্রেরণের জন্য কাশ্মীরী, শিখ, ভাটিয়া প্রভৃতি ব্যবসায়িবৃন্দ বঙ্গদেশে আগমন করিতেন এবং এই প্রদেশের লোকেরা তাঁহাদিগের নিকট লবণ বিক্রয় করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। শালতি (ছোট নৌকা) করিয়া লইয়া যাইবার জন্য হিজলী হইতে সাকরাইলের নিকট সরস্বতী নদী পর্য্যন্ত তৎকালে একটি খাল খনন করা হইয়াছিল; উহা "নিমকীর খাল" বলিয়া অদ্যাপি খ্যাত।

হিজলী ৯৭৫ হিজরি বা ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যা-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া 'আকবর-নামায়' লিখিত আছে। ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহ উড়িষ্যা আক্রমণ করেন; বঙ্গদেশ দিল্লীর সম্রাটের অধীন হয়। সেকালের প্রাচীন কাগজপত্রে "হিজলী প্রদেশ হুগলী কালেক্টরীর অন্তর্গত ছিল" বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। † ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে

* Firminger's Fifth Report, Vol II।

† মেদিনীপুরের ইতিহাস—শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু

সমগ্র মেদিনীপুর ইংরেজদিগের অধিকারে আসে এবং ইংরেজগণ মীরকাশিমকে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করেন। মীরকাশিম সৈন্যব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা প্রদান করেন। আধুনিক হুগলী ও হাওড়া জেলা তৎকালে বর্দ্ধমানের অন্তর্ভুক্ত ছিল; ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ্চ তারিখে রাজস্ব কমিটির নির্দ্দেশানুসারে, হিজলী প্রদেশকে হুগলী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, একটি নূতন কালেক্টরী গঠন করা হয় এবং ইহার সাতাশ বৎসর পর ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্ব্বার হিজলীকে হুগলী কালেক্টরীর অধীন করা হয়। পরে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ইহাকে হুগলী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মেদিনীপুর কালেক্টরীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তদবধি ইহা মেদিনীপুরের মধ্যেই আছে।

সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্থানগুলিতেই যে কেবলমাত্র লবণ উৎপন্ন হইত তাহা নহে; লবণাক্ত ভূমি হইতেও তৎকালে প্রচুর পরিমাণে লবণ উৎপন্ন হইত। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১ শে আগষ্ট তারিখের 'সমাচার-দর্পণে' এই সম্বন্ধে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে উক্ত সংবাদটি উদ্ধৃত হইল:

"কাশী প্রদেশে অনেক লবণ উৎপন্ন হয় যেহেতুক সে দেশে লবণযুক্ত মৃত্তিকা আছে সে মৃত্তিকাও কূপ হইতে যে জল উঠান যায় সে জল অন্য মৃত্তিকার উপরে ছিটান যায় তাহাতে সে মৃত্তিকাও লবণযুক্ত হয় ও তাহার উপরে এক অঙ্গুলী পরিমিত লবণ জন্মে সে দেশের অনেক জমিদার যে ভূমিতে শস্য না জন্মে বুঝেন সে ভূমিতে এইরূপে লবণ উৎপন্ন করান ও তাহাতে লাভ হয়। হিন্দুস্থানের লবণের লাভ লোকসান কোম্পানী বাহাদুরের অধীন। অতএব এইরূপে লবণ উৎপত্তি বিষয়ে ইংলণ্ডীয় এক সাহেব সমাচার পত্রে ছাপাইয়া এই বিষয়ের কি কর্ত্তব্য জানিতে চাহিয়াছেন যেহেতুক ইহাতে কোম্পানির লোকসান হয়।"

বঙ্গদেশে সধারণতঃ কার্ত্তিক মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত লবণের

উৎপাদন-কার্য্য চলিত এবং যে সমস্ত জমি জোয়ারের জলে ধৌত হইয়া যাইত, সেই সকল জমিতেই ভাল লবণ প্রস্তুত হইত। উক্ত জমিগুলিকে 'চর' বলিত; 'চর'গুলি আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল, উহাকে 'খালাড়ী' বলিত। যাহারা 'খালাড়ী'তে লবণের কার্য্য করিত, তাহাদিগকে জনসাধারণ 'মলঙ্গী' বলিয়া অভিহিত করিত। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু লিখিয়াছেন যে, হিজলীর প্রত্যেক 'খালাড়ী'তে সাতজন করিয়া লোক নিযুক্ত থাকিয়া, গড়ে দুই শত তেত্রিশ মণ করিয়া লবণ উৎপন্ন করিত। লবণ ইজারাদারগণ এই 'মলঙ্গী'দের কিছু টাকা দাদন দিয়া, পরে তাহাদিগকে বেগার খাটাইয়া লইত। নীলকরদিগের অত্যাচারের ন্যায়, এই লবণ ইজারাদারদের অত্যাচারে উৎপীড়িত মলঙ্গীগণ ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট আবেদন করে; তিনি লবণের চুক্তির মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দেন, ফলে "হিজলী ও তমলুকের নিমকমহলে ১৩,৩৮৮ জন মলঙ্গী যাহারা তিন শত বর্ষ ধরিয়া এইরূপ ক্লেশ পাইতেছে, তাহারা বাঁচিয়া যায়।" *

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত একখানি সংস্কৃত পুঁথি আবিষ্কার করেন, উক্ত পুঁথিতেও লবণ ব্যবসায় এবং 'মলঙ্গী' নামটির উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে তাহা হইতে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইল:

"কৌচদামলকে দেশং গায়ন্তি দেশবাসিনঃ।
লবনানামাকরশ্চ যত্র তিষ্ঠন্তি ভূরিশঃ ॥ ৪৮
প্রণালী হি একা তত্র সদা বহিত ভূমিপ।
মালংগণা মনুষ্যাণাং নিবাসং বহিত কিল ॥ ৫০"

মুসলমান রাজত্বকালে লবণের ব্যবসায় জমিদারের দ্বারা পরিচালিত

* "সমাচার দর্পণ" ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮২৯

হইত এবং সরকার হইতে 'মলঙ্গী'গণের বেতনস্বরূপ প্রতি এক শত মণ উৎপন্ন লবণের উপর ২২ টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক ধার্য্য ছিল। জমিদারগণ উক্ত "মলঙ্গী"দের ছয় মাসের বেতন দিতেন এবং বাকী ছয়মাসের বেতন তাঁহারা নিজেরা গ্রহণ করিতেন ও তাহাদিগকে কিছু আবাদী জমি দিয়া অর্দ্ধেক ফসল আবার তাঁহারা লইতেন। এক শত মণ লবণ, সেই সময় ষাট টাকা মূল্যে মহাজনদিগকে বিক্রয় করা হইত এবং খরচ বাদে যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত, তাহা জমিদার ও নবাবের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ গ্রহণ করিতেন; 'মলঙ্গীগণ কেবল খাটিয়াই যাইত।* সেই সময় প্রধান লবণ ব্যবসায়ীগণ "মালীক-উল-তজ্জব" অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের রাজা উপাধিতে ভূষিত হইতেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিনা শুল্কে বঙ্গদেশে বাণিজ্যের ফরমান প্রাপ্ত হইয়া কয়েকটি কুঠি স্থাপন করেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের বেতন সেই সময় খুবই অল্প ছিল বলিয়া, তাঁহারা প্রত্যেকে ব্যক্তিগত লাভার্থে ব্যবসা করিতেন। জমিদারগণ লবণের ব্যবসায়ে বিশেষ লাভবান হন দেখিয়া কোম্পানীর ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ তৎকালীন নবাবকে বাধ্য করিয়া এই দেশের লবণ, তামাক ও সুপারির সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ নিয়ম প্রচার করেন এবং ক্লাইভ ও কাউন্সিলের অন্যান্য সভ্যগণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিলাতের ডিরেক্টরগণের নিষেধ সত্ত্বেও, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে "ট্রেডিং এসোসিয়েশন" নামে একটি বণিক-সভা, কলিকাতায় স্থাপন করেন। কোম্পানীর সমুদয় ইংরাজ কর্ম্মচারী উক্ত সভার সভ্য হইলেন এবং নিয়ম হইল যে, এই দেশে যত লবণ উৎপন্ন হইবে, তাহা প্রতি ৫ শত মণ '৫ টাকা হিসাবে ইংরেজ বণিকগণকে বিক্রয় করিতে হইবে, পরে বণিক-সভা উহা পাঁচ শত টাকা মূল্যে দেশীয় মহাজনদের বিক্রয় করিবেন;

* Fifth Report—Firminger Vol. II.

তাঁহারা উহার উপর লাভ রাখিয়া দেশবাসীকে বিক্রয় করিবেন। মহাজনগণ বণিক-সভা ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে এই সকল দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিবেন না বলিয়াও তাহাদিগকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

এই সম্বন্ধে William Bolts-এর *Consideration on Indian Affairs* নামক পুস্তক হইতে এখানে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল :

"The first was the private monopoly in partnership which commenced in the beginning of June 1765, between Lord Clive, Messieurs Summers, Sykes and Verelst, each one quarter part for purchasing large quantities of salt that was in the hands of private merchants and in August 1765, the monopoly of inland trade in salt, betelnut and tobacco was established."

বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার জমিদারগণের নিকট নবাব এক পরোয়ানা বাহির করিয়া হুকুম দেন যে, যত লবণ প্রস্তুত হইবে তাহা ইংরেজ বণিক-সভাকে (The English Society of Merchants for buying and selling all the salts, Betelnut and Tobacco in the Provinces of Bengal Bihar and Orissa) বিক্রয় করিতে হইবে বলিয়া মুচলেখা দিতে হইবে। নবাবের পরোয়ানার অংশ-বিশেষের ইংরেজী অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

"Until the contracts for salt are settled, no salt shall be made, or got ready in any District ; ... ... having given a bond, he may then proceed to his businees and make salt ; but till the bond be given to the Governor and the gentleman of the Committee and Council, they should make none. Therefore, give your bond and settle your business ; and then proceed to the making of salt." *

* *Bolts' on Indian Affairs.*

চণ্ডীচরণ সেন লিখিয়াছেন, ইংরেজ বণিকগণ এই নিয়মানুসারে ব্যবসা করায় দেশের সর্ব্বনাশ আরম্ভ হয়; চতুর্দ্দিক হইতে প্রজাদের হাহাকার উত্থিত হয় এবং দেশীয় প্রজাগণের কষ্টের লাঘব করিবার তখন কোন উপায় ছিল না। *

বোল্ট সাহেব লিখিয়াছেন :

"We now come to consider a monopoly the most cruch of its nature, and most destructive in its consequences, to the Company's affairs in Bengal, of all that have of late been established here. Perhaps it stands unparalleled in the history of any government, that ever existed on earth, considered as a public act...."

নবাবের পরোয়ানা অনুযায়ী দেশের জমিদারগণ, কলিকাতার ইংরেজ বণিক-সভায় লবণ প্রস্তুতের জন্য যথারীতি মুচলেখা দেন; উক্ত মুচলেকায় লিখিত ছিল যে, বণিক-সভা ভিন্ন আমি কাহাকেও লবণ বিক্রয় করিব না, যদি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইংরেজ বণিক-সভা ব্যতীত অন্য কাহাকেও লবণ বিক্রয় করিয়াছি, তাহা হইলে প্রতি মণে পাঁচ টাকা হিসাবে জরিমানা দিব। নিম্নে উক্ত মুচলেকার ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত হইল :

"I will on no account trade with any person for the salt to be made; and without their order I will not otherwise make away with, dispose of a single grain of salt, but whatever salt shall be made within the dependencies of my zamindary, I will faithfully deliver it all, without delay, to the said society and I will receive the money according to the agreement which I shall make in writing and I will deliver the whole and entire quantity of salt.

* মহারাজ নন্দকুমার

produced and without the leave of the said Committee, I will not carry to any other place, nor sell to any other person a single measure of salt. If such a thing should be proved against me, I will pay to the Sarcar of the said society a penalty of five Rupees per every maund." *

ক্লাইভের প্রতিষ্ঠিত বণিক-সভার কার্য্যপ্রণালী ও লবণের একচেটিয়া অধিকার বিলাতে কোম্পানির ডিরেক্টরগণ অনুমোদন করিলেন না, বরং বিরক্ত হইয়া তাঁহারা কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণকে উক্ত কার্য্যে ব্রতী হইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু এই ব্যবসায় দ্বারা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন হইতেছে দেখিয়া, কলিকাতার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণর এবং কাউন্সিলের সভ্যবৃন্দ কিছুতেই লবণ-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলেন না।

বিলাত হইতে বারংবার লেখা সত্ত্বেও, যখন তাহারা এই লাভজনক ব্যবসা পরিত্যাগ করাইতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা প্রতি মণ লবণ পাঁচ টাকা হিসাবে বিক্রয়ের পরিবর্ত্তে, দুই টাকা করিয়া বিক্রয়ের নির্দ্দেশ দেন। কলিকাতার বণিক-সভা অধিকন্তু বিলাতের কর্ত্তাদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য, যত লবণ বিক্রয় হইবে, তাহার উপর শতকরা পঁয়ত্রিশ টাকা হিসাবে মাশুল দেওয়া হইবে বলিয়াও নিয়ম করেন। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে একমাত্র লবণের মাশুল হইতে ১৩ লক্ষ টাকা কোম্পানীর আয় হইয়াছিল। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুন আইনদ্বারা দেশের জনসাধারণের পক্ষে লবণ প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ হয়। কোন্ বৎসরে কোম্পানীর ও সরকারের কত রাজস্ব একমাত্র লবণ হইতেই পাওয়া গিয়াছিল, তাহার একটি তালিকা সঙ্কলন করিয়া পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল :

* *Bolts on Indian Affairs*

লবণ শুল্ক হইতে রাজস্ব

বৎসর	টাকা
১৭৮০	৪০০০০০০০
১৮১০	১১৭২৫৭০০
১৮১২	১২০০০০০০
১৮২১	১২৮৪০৮০০
১৮২৬	১৫৮৮৬০০০
১৮২৯	২৫৮২০০০০
১৯০৭	৪৬০৪৬৫৭০
১৯১৬	৬৮৪৩২৪৬০
১৯২১-২২	৬৪৪৭৯৮০০
১৯২২-২৩	৭৩১৪৬৫১২
১৯২৩-২৪	১০১২৩৮৫০৫
১৯২৪-২৫	৭৮৫৭৭৫৭৩
১৯.৫.২৬	৬৩৭০৩৫৬০
১৯২৬-২৭	৬৭২৮৬২২৩
১৯৪০-৪১	৮৭৫৯৪০০৮

১৮০১ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট আইন করেন যে, যদি কোন জমিদারের এলাকায় কেহ গোপনে লবণের কারখানা স্থাপন করে এবং জমিদার গভর্ণমেণ্টকে তাহার কোন সংবাদ না দেন, তবে তাঁহার ৫০০ টাকা জরিমানা হইবে।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্টের লবণ বিভাগের কর্ম্মচারীগণ ইচ্ছামত যে কোন লোককে লবণ তৈয়ারের অপরাধে ৫০ টাকা জরিমানা করিতে পারিতেন।

হিকি (James Augustus Hickey) নামক এক সাহেব ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ভারতের প্রথম সংবাদপত্র, "বেঙ্গল গেজেট" কলিকাতা হইতে বাহির করেন। তিনি সাধারণ শ্রেণীর লোক হইলেও, নির্ভীক ভাবে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতেন এবং লবণ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধেও দরিদ্র প্রজাদের হইয়া লিখিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। উক্ত কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা থাকিত :

'A weekly political and commercial paper open to all parties but influenced by none.'

হেষ্টিংস লবণের ব্যবসায়ে কোটি কোটি টাকা অর্জ্জন করেন; তিনি হেষ্টিংসকেও আক্রমণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। হিকির 'বেঙ্গল গেজেটে'র প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে 'ইণ্ডিয়া গেজেট' বাহির হয়। উহার পরিচালক মিঃ পিটার রীডকে হেষ্টিংস সহায়তা করিতেন এবং রীড সাহেবও হেষ্টিংসের সহিত লবণের ব্যবসা করিতেন, বলিয়া হিকি সাহেব তাহাকে 'বেঙ্গল গেজেটে' পিটার রীডের পরিবর্ত্তে "পিটার নিমক" (Peters Nimak) আখ্যা দেন।

প্রথম শহীদ মহারাজ নন্দকুমারের জাল মোকদ্দমায় অন্যতম প্রধান সাক্ষী কমলউদ্দীন হিজলীর লবণের ইজারাদার ছিলেন। হিকি এবং নন্দকুমারের জ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়া, হেষ্টিংসের ষড়যন্ত্রেই যে জাল মোকদ্দমা নন্দকুমারের বিরুদ্ধে আনীত হয় এবং যাহার জন্য তাঁহার ফাঁসি হয়, ইতিহাস পাঠকগণ তাহার ইতিবৃত্ত সবিশেষ অবগত আছেন। হিকি সাহেব নন্দকুমারের ফাঁসির পর 'বেঙ্গল গেজেটে' লেখেন যে, জাল করিবার জন্য ক্লাইভকে 'লর্ড' উপাধি দেওয়া হয়, কিন্তু অদৃষ্টচক্রে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি হয়। পর পৃষ্ঠায় হিকির কথাগুলি 'বেঙ্গল গেজেট' হইতে উদ্ধৃত হইল :

"Clive was made a peer in England though he committed in Bengal the same crime for which we hanged Maharaja Nanda Coomar."

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণর হইতে আরম্ভ করিয়া কাউন্সিলের প্রত্যেক সভ্যকে আক্রমণ ও তাহাদের কার্য্যাদি সমালোচনা করিবার জন্য হেষ্টিংস হিকি সাহেবকে ছাড়িলেন না; তিনি তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। কলিকাতায় জেলের মধ্যেই সত্যনিষ্ঠ হিকি সাহেব পরলোকগমন করেন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কাগজ বন্ধ হইয়া যায়। হিকির প্রতি হেষ্টিংসের নিগ্রহের কারণ সম্বন্ধে *Original Inquiry* নামক গ্রন্থে যাহা লিপিবদ্ধ আছে, নিম্নে তাহার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইল :

"It cannot be doubted that the files of Hickey's *Bengal Gazette* must throw singular light on the nature of the contentions which then agitated the public mind and the character of the man who then held the highest stations; not without access to such can a just view of that period ever be obtained."

১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গের জমিদারগণ বণিক-সভাকে মুচলেকা দিয়া লবণ প্রস্তুত করিতেন এবং একটি নির্দ্দিষ্ট হারে তাহারা কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগকে লবণ সরবরাহ করিতেন। প্রকৃতপক্ষে সেই সময় জমিদারগণই লবণের ইজারাদার ছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিক্রীত লবণের উপর শতকরা পঁয়ত্রিশ টাকা হিসাবে কমিশন পাইত। উক্ত বৎসর লবণের কমিশন হইতেই কোম্পানী চল্লিশ লক্ষ টাকা পাইয়াছিল। লবণ ব্যবসায়ের এইরূপ লাভ দেখিয়া ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটি লবণ-বিভাগ (**Salt Department**) প্রতিষ্ঠা করেন এবং জমিদারদিগকে লবণ প্রস্তুতের ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিয়া

নিজ হস্তে ইংরেজ কর্ম্মচারীদের তত্ত্বাবধানে লবণ-প্রস্তুতের কার্য্য আরম্ভ করেন।

হুগলী, তমলুক, হিজলী ও চট্টগ্রামে কোম্পানীর লবণের এজেন্সী ছিল এবং প্রত্যেক স্থানে লবণ-এজেণ্ট (Salt Agent) উপাধিধারী ইংরেজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন এবং তাঁহারা কোম্পানীর লবণ ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধান ব্যতীত উক্ত স্থানের ফৌজদারী মোকদ্দমা বিচার ও রাজস্ববিষয়ক কার্য্যাদিও নির্ব্বাহ করিতেন। এজেণ্টগণ কোম্পানীর লাভের উপর শতকরা দশ টাকা করিয়া কমিশন পাইতেন, পরে তাহা কমিয়া তিন টাকা, শেষে আড়াই টাকা করিয়া নির্দ্ধারিত হয়। লবণ-এজেণ্টদিগের অধীনে কর্ম্ম করিয়া তৎকালে বহু শিক্ষিত বাঙালী প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন; তাঁহারা সাধারণতঃ সেরেস্তাদারী, দেওয়ানী, কেরানী প্রভৃতির কার্য্য করিতেন। এই সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন—"ইনি চুঁচুড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ বাবু নীলমণি হালদার মহাশয়ের পুত্র। তৎকালে তাঁহার পিতার ন্যায় কেহ বাবু ছিলেন না। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের পর টরেন্স সাহেবের আমলে নীলরত্ন বাবু সল্ট-বোর্ডের দেওয়ান হইয়াছিলেন।" *

রিকার্ড লিখিয়াছেন : "আমরা দরিদ্রতার একটি প্রধান প্রয়োজনীয় জিনিষের উপর একাধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছি—হিংস্রজন্তুসমাকুল ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে লবণের কারখানাতে লোককে জোর করিয়া খাটাইয়াছি এবং দরিদ্রের কাছে উহা ৪ গুণ এমন কি ৫ গুণের বেশী দরে বিক্রয় করিতেছি।"

১৮০৬ খৃষ্টাব্দের সম-সময়ে গভর্ণমেণ্ট প্রতি মণ লবণের দাম ৩৮৫ টাকা হইতে ৪৬৯ টাকা করেন—যাহাতে সহজেই বিলাতী লবণ বাঙ্গলার

* সেকাল আর একাল, পৃষ্ঠা ৬৮

বাজারে অপেক্ষাকৃত কম দরে বিক্রয় হইতে পারে। ফ্রেডারিক হ্যালিডে বলেন : যদি গভর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষ থাকিতেন এবং দেশী বিদেশী কোন লবণের উপর ট্যাক্স না বসাইতেন তাহা হইলে বাঙ্গলার বাজারে এক গ্রেণও বিলাতী লবণ বিক্রয় হইত না।

রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী স্যার বিডেনের সাক্ষ্য হইতে ইহা জানিতে পারা যায় যে, নবাবের আমলে যে দরে লবণ তৈয়ার হইত, তাহার উপর শতকরা আড়াই টাকা হইতে পাঁচ টাকা ট্যাক্স বসান হইত। কিন্তু কোম্পানীর আমলে এই ট্যাক্স ৫০০ হইতে ৫৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়।

কোম্পানীর আমলে লবণের দর এত চড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, বাঙ্গলায় কোন কোন জেলার লোক লবণ ব্যবহার একেবারে বন্ধ কয়িরা দিয়াছিল। *

জমিদারগণকে লবণ প্রস্তুত করিতে বঞ্চিত করা হয় বলিয়া, কোম্পানী ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ উৎপন্ন লবণের পরিমাণ অনুসারে তাহাদের একটি মাসোহারা দিবার ব্যবস্থা করেন। প্রতি বৎসর উক্ত মাসোহারার টাকা পরিবর্ত্তিত হইতে থাকায়, ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটি নির্দ্দিষ্ট জমা ধার্য্য করিয়া সমস্ত 'খালাড়ী' জমি বন্দোবস্ত করিয়া লন। কোম্পানীর দেয় 'খালাড়ী' খাজনা জমিদারদিগের রাজস্ব হইতে বাদ দেওয়া হইত।

এই সম্বন্ধে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের সমাচার দর্পণ পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল-ঃ

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব মোকররী বন্দোবস্ত করিলে নিমক দপ্তরের কার্য্য বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের তাঁবে হইল কিন্তু

* Observation on the Law and Constitution of India

ইউরোপীয় এজেন্ট সাহেবদিগের দ্বারা নিমকের সরবরাহকারী কর্ম্ম বজায় থাকিল। বোর্ড ত্রেডের সাহেবরা যখন লবণের সরবরাহের বিষয়ের তদারক করিতে লাগিলেন তখন তাঁহারা দেখিলেন যে নিমক-পোক্তানীর কার্য্য দুই প্রকারে চলিতেছিল। প্রথমতঃ আজোরা * নামক মলঙ্গীদের দ্বারা জবরদস্তিতে নিমক প্রস্তুত করা যাইতেছিল, দ্বিতীয়তঃ ঠিকা মলঙ্গীদের দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বন্দোবস্তের দ্বারা নিমকের সরবরাহ হইতেছিল। তাঁহারা আরও দেখিলেন যে ঠিকা মলঙ্গীরা লবণের নিমিত্ত যে মূল্য পাইতেছে তাহার কেবল অর্দ্ধেক মূল্য আজোরারা পাইতেছিল এবং এই অল্প বেতনে তাহাদের অতিশয় কষ্টে প্রাণধারণ হইতেছিল। ঐ সাহেবদিগের কর্ণগোচর হইল যে হিজলী ও তমলুকের নিমক মহালে ১৩৩৮৮ পরিজনসমেত আজোরা মলঙ্গীরা আছে এবং তাহারা দুই তিন শত বৎসরাবধি এইরূপ ক্লেশ পাইতেছে। বিবেচনাকরণানন্তর বোর্ডের সাহেবেরা ইহা ঠাহরাইলেন যে ইহার পূর্ব্বে অল্প মূল্যে নিমকের সরবরাহকরণের নিয়মে ঐ আজোরারা স্বকীয় ভূমি নিষ্করক্ষপে অথবা অতিশয় ন্যূন খাজনায় ভোগ করিল কিন্তু কালক্রমে জমিদারেরা নানা ছলে লবণের মূল্যের কিছু বৃদ্ধি না করিয়া সেই সেই ভূমির খাজনা সম্পূর্ণরূপে ঐ বেচারা মলঙ্গীদের স্থানে লইতে লাগিলেন।

বোর্ড ত্রেডের সাহেবরা ইহা অবগত হইবামাত্র আজোরারদের লবণের মূল্য ঠিকা মলঙ্গীদের তুল্য করিতে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিলেন এবং অবিলম্বে গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত হইলেন। নিমকের এজেন্ট সাহেবরা গবর্ণমেণ্টকে আরও এই নিবেদন করিলেন যে ঠিকা মলঙ্গীদের স্থানে যে হারে লবণ লওয়া যাইতেছে তাহাতে তাহাদের উপযুক্তরূপে গুজরাণ হয় না। ঐ সাহেবদের পরামর্শক্রমে নিমকের চুক্তির মূল্য

* 'আজোরা' অর্থাৎ যে সব কুলীকে বিনা পারিশ্রমিকে লবণের কার্য্যে বেগার খাটাইয়া লওয়া হইত।

শতকরা ৫৫ টাকা হইতে ৭৭ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা গেল। নিমকের মূল্য এইরূপে বৃদ্ধি হইলে এজেণ্ট সাহেবেরা অধিক লবণ প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন এবং এইরূপে মলঙ্গীরদের উপকার এবং সরকারেরও লাভ হইল।"

বঙ্গদেশে যে লবণ ব্যবহৃত হয়, তাহা বিদেশ হইতে বা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানী হয়। সমুদ্রকূলবর্ত্তী জেলাসমূহে লবণ প্রস্তুত নিষিদ্ধ, কারণ বে-আইনি লবণ প্রস্তুত বন্ধ করা কষ্টসাধ্য। ১৯১০—১১ খৃষ্টাব্দে ১১৮৭৯৫৭৪/মণ লবণ আমদানী হইয়াছিল। এই বৎসর লবণের মণ প্রতি দর ছিল শুল্কসহ ১৸৵৫পাই, খুরচা দর ছিল প্রতি সের তিন পয়সা হইতে পাঁচ পয়সা। এ বৎসর এই প্রদেশে ৮১৪৩১০০/মণ লবণ কাটতি হইয়াছে; ১৯০৯—১০ অব্দে হইয়াছিল ৮১৭২৮২০/ মণ। উক্ত বৎসর লবণ আইন অমান্যের অপরাধে ২৫ জন লোক দণ্ডিত হইয়াছিল, পূর্ব্ব বৎসর হইয়াছিল ৯৫ জন। ১৯১০ অব্দের শেষ ভাগে জামিন রাখিয়া ধারে লবণ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়; তাহাতে ১ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড জামিন পাওয়া গিয়াছিল।

ডাক্তারদের মতে স্বাস্থ্যরক্ষার্থ প্রত্যেক মানবের মাথাপিছু বৎসরে ২২৷২৩ পাউণ্ড (অন্ততঃ ১১ সের) লবণ ব্যবহার করা দরকার। কিন্তু সরকারী একচেটিয়ার ফলে লবণের দাম প্রতি মণ ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। সুতরাং দরিদ্র জনসাধারণ লবণ ব্যবহার বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। *

লবণ সম্বন্ধে জন ক্রফোর্ড লিখিয়াছেন: "আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, বাঙ্গালার দরিদ্র কৃষকগণের অধিকাংশ জনসাধারণের পরিবার প্রতিপালন করিতে লবণ কিনিতেই তার দুই মাসের মজুরী অর্থাৎ বাৎসরিক আয়ের ১।৬ অংশ ব্যয় হইয়া যায়।"

* Observation on the Law and Constitution of India.

ভারতের মাথা পিছু লবণ ব্যয় কিরূপ নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইল :

বৎসর	পরিমাণ
১৭৯৩	৫ ১৫ সের
১৮১৩	৫·৮৩ "
১৮৩৬	৪·৩৭ "
১৯৪০	৪·১৩ "

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মাথা পিছু কি পরিমাণ লবণ ব্যবহৃত হয় তাহা নিম্নে দেখান হইল :

দেশের নাম	জন প্রতি ব্যবহৃত লবণের পরিমাণ
ইংলণ্ড	৪০ পাউণ্ড
পর্ত্তুগাল	৩৫ "
ইটালি	২০ "
ফ্রান্স	২৮ "
বেলজিয়াম	১৬৷৷০ "
অষ্ট্রিয়া	১৬ "
পারস্য	১৪ "
ভারতবর্ষ	৮ "

১৮৪৮—৪৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় যত লবণ ব্যবহার হইত, তাহার শত-করা ৭৩ ভাগ ভারতে প্রস্তুত হইত, বাকী ২৭ ভাগ বিদেশ হইতে আসিত ; কিন্তু ১৮৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে এই বাঙ্গালা দেশেই শত করা ৫ ভাগ লবণ ভারতে প্রস্তুত আর ৯৫ ভাগ বিদেশ হইতে আমদানী। ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশে দেড় কোটী টাকার লবণ আমদানী হইয়াছে। অথচ ভারতের তিনদিকেই সমুদ্র !

ইহার পরিণাম এই দাঁড়াইয়াছে যে, হয় একেবারেই লোকের নুন

জোটে না; আর না হয় নূনের বদলে অস্বাস্থ্যকর লবণাক্ত মাটি তুলিয়া আনিয়া খায়। তাহাও আবার সংগ্রহ করিবার সময় জেলের ভয় আছে।*

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে সরকারের 'পার্লামেণ্টারী-কমিটি' ভারতে লবণ প্রস্তুতের কারবারগুলি তুলিয়া দিয়া লিভারপুল হইতে বিলাতী লবণ আমদানী করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন (Ultimate displacement of the Government manufacture by imported salt)। ইহার সাতাশ বৎসর পর, ১৮৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের ছোটলাট স্যার সিসিল বিডনের সময়ে ইংরেজ সরকার এই দেশে লবণের একচেটিয়া ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া, বিলাতী লবণ ভারতের সর্ব্বত্র বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। ইংরেজদের লবণের একচেটিয়া ব্যবসা উঠিয়া গেলে কতিপয় দেশীয় ব্যক্তি সরকারকে লবণ-কর দিয়া কিছুদিন এই ব্যবসায় চালাইয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকার এই দেশে প্রস্তুত লবণের উপর অধিক কর গ্রহণ করায় বিলাতী লবণের সহিত প্রতিযোগিতায় কেহই শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারেন নাই। পরিশেষে আইন করিয়া লবণ প্রস্তুত রহিত করিয়া দেওয়া হয়। হাণ্টার সাহেব তাঁহার Statistical Account of Bengal (vol. III) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে লবণের ব্যবসায় এই দেশ হইতে উঠিয়া যাওয়ায়, এই প্রদেশের অধিবাসীদের শ্রী, সৌভাগ্য, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য অনেকাংশে বিলুপ্ত হইয়াছিল।

উইলিয়ম রস লিখিয়াছেন যে, কেবল ভারতবর্ষে নূনের উপর শুল্ক আদায় করা হয়। পৃথিবীর আর-কোন দেশে এ-প্রথা নাই। সেই জন্য লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে ট্যাক্স দিয়া তাহাদের ক্ষুধার্ত্ত লবণ অভাবগ্রস্ত গবাদি পশুগুলির সহিত নিজেদের কুঁড়ে ঘরে থাকিয়া কঙ্কালসার হইয়া আসিয়াছে।

* Economic of British India.

বৃটিশ ভারতে লবণ আমদানি

১৮৪৭	৭২১১১২ মণ
১৮৫১	১৭২৭৯০৮ "
১৯০৯	১৩৯৫৬৫৪৪ "
১৯২৫	১৭২৩৯৫৪৪ "

এই সম্বন্ধে বাকল্যাণ্ড সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

"One of the most important administrative changes of the year 1862-63 was the abandonment by Government of its salt manufacture and its final disconnection with the so-called monopoly... .... With this* object in view, in deciding upon the the course to be adopted in the manufacturing season of 1862-63, it was determined that the Chittagong salt agency should be closed; the Hooghly and Tamluk agencies were united under one officer; the manufacture of *karkach* or solar evaported salt was stopped; and of boiled salt, the manufacture was limited to 9,00,000 maunds. The manufacture of the season was ordered to be closed as speedily as possible, and it was announced that it would not be re-opened in the current year ... ... Government thus definitely abandoned a system which, from its first establishment by Lord Clive, in the shape of a pure monopoly, had lasted various modifications almost a century. ... ..."

মহাত্মা গান্ধী ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে লবণ-কর রহিতকল্পে ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়া কারাবরণ করেন; সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা লইয়া তুমুল

* *Bengal under the Lieutenant Governors.*

আন্দোলন হয় এবং আইন অমান্যপূর্ব্বক লবণ প্রস্তুত করিয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তি কারাবরণ করেন। লবণ প্রস্তুত করিতে খরচ কিছুই নাই বলিলে চলে, অথচ ইংরেজ সরকার ভারতবাসীকে আইন করিয়া লবণ প্রস্তুত বা লবণের কারবার নিষিদ্ধ করিয়া দেন। লবণের পাইকারী দর প্রতি মণ পাঁচ টাকা এবং গবর্ণমেণ্ট প্রতি মণে দেড় টাকা হিসাবে ট্যাক্স আদায় করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে প্রায় আট কোটি টাকা রাজস্ব লাভ করিতেন।

মহাত্মা গান্ধী এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"ভারতে লবণকর বসাইবার ইতিহাসই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের একটা মস্ত বড় দুর্নীতির ইতিহাস। বাতাস এবং জলের পরই সম্ভবতঃ লবণ জীবন ধারণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়, দরিদ্রের উহাই একমাত্র ব্যঞ্জন। গো-মহিষাদি পশুও লবণ ছাড়া জীবনধারণ করিতে পারে না; অনেক শিল্প কার্য্যেও লবণ প্রয়োজনায়। উহা ভাল সারও বটে। যে গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের লবণ চুরি করে এবং এই চোরাই মালের জন্য জনসাধারণকে অত্যধিক ট্যাক্স দিতে বাধ্য করে সেই গভর্ণমেণ্টই বে-আইনী। জনসাধারণ যখন আত্মশক্তিতে আস্থাসম্পন্ন হইবে, সেই সময়ে যাহা তাহাদের নিজস্ব তাহার দখল পাইবার জন্য তাহাদের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে।

"কিন্তু আপনি যদি ঐ প্রতিকার সাধনে অগ্রসর হওয়া উচিত বোধ না করেন এবং আমার এই চিঠি আপনার হৃদয় স্পর্শ না করে, তাহা হইলে এই মাসের একাদশ দিবসে, আমি আশ্রমের যে সব সহকর্মীকে আমার সঙ্গে লইতে পারিব, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া লবণ সম্পর্কিত বিধি-বিধান অমান্য করিতে অগ্রসর হইব। দরিদ্রের দৃষ্টি হইতে আমি ঐ করকে সর্ব্বাপেক্ষা অন্যায় বলিয়া মনে করিয়া থাকি। পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলন প্রধানতঃ এতদ্দেশের দরিদ্রদের স্বার্থেরই জন্য, সুতরাং ঐ অন্যায়কে আক্রমণ করিয়াই ঐ আন্দোলন আরম্ভ করা

হইবে। আশ্চর্য্য এই যে, আমরা এতকাল পর্য্যন্ত এই হৃদয়হীন একচেটিয়া কারবার মানিয়া লইয়া আসিয়াছি।”

বর্ত্তমান ১৯৩৭ অব্দ হইতে কংগ্রেসের নির্দ্দেশানুযায়ী প্রাচীন হিন্দু রাজত্বকালের মত লবণ-কর ভারতবর্ষ হইতে রহিত হইয়াছে। লবণ-কর রহিত হইলেও লবণ-শিল্প পূর্ব্বে যেরূপ সমৃদ্ধ ও উন্নতিশীল ছিল, সেইরূপ এই শিল্পকে সমৃদ্ধিশালী করিতে ভারতবাসীকে সচেষ্ট হইতে হইবে, তবেই ভারতের আর্থিক উন্নতি হইবে এবং দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করা হইবে।

আজকাল বাঙ্গলার অবস্থা দেখিয়া কেবল মনে হয় যে—আমাদের এই বাঙ্গলা দেশ কাহার? এ দেশ সত্য সত্য বাঙ্গালীর, না অন্ত কাহারও? ব্যবসা বাণিজ্য বলুন, আর কৃষি শিল্প বলুন যে কোন কার্য্যক্ষেত্রে যাওয়া যাক্ না কেন, বাঙ্গালী দেখা যাইবে না, অ-বাঙ্গালীতে সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে এবং তাহারা বাঙ্গালীর মত নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া নাই, অর্থ উপার্জ্জন করিতে তাহারা আসিয়াছে এবং অর্থ শোষণই তাহাদের কাজ। ফলে বাঙ্গালী ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্র হইতে হটিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে কিন্তু বাঙ্গলার অবস্থা এরূপ ছিল না, ইংরাজ রাজত্বের ফলে, বাঙ্গলার প্রধান কুটীরশিল্পগুলিকে বিনষ্ট করায়—আজ এইরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে প্রত্যেককে প্রত্যেকের সহিত সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে, আমাদের নিশ্চিত বিলুপ্ত হইতে হইবে।

কৃষিকার্য্যে অনভিজ্ঞতা

বর্ত্তমানে বাঙ্গলার শতকরা ৯০ জন লোকই কৃষক। কৃষির দ্বারা বা কৃষিজাত আয় হইতে তাহারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে, কিন্তু কৃষি সম্বন্ধে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বা বস্তুগত লাভ কৃষকদের না থাকায়, কৃষির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি না হইয়া ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে। পূর্ব্বে কিন্তু বাঙ্গলার শতকরা ৯০ জন লোক কৃষি

কার্য্য করিত না, অপরাপর শিল্পকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত—বর্ত্তমানে সেই সমস্ত শিল্পাদি বিনষ্ট হওয়ায় বাধ্য হইয়া তাহাদের কৃষক শ্রেণীভূক্ত হইতে হইয়াছে। নিম্নলিখিত কথাগুলি হইতেই তাহা বেশ প্রমাণিত হয়: "পূর্ব্বে যে সম্প্রদায়গুলি শিল্পকার্য্য সমূহে নিযুক্ত থাকিত, এখন সেই সমস্ত শিল্পগুলি ধ্বংস হওয়ায়—তাহারাই কৃষক পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে।"

সর্ব্বপ্রধান কৃষি

বাঙ্গলার কৃষি সম্পদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কৃষি—পাট এবং কাপড়। এই সর্ব্বপ্রধান কৃষি দুইটি বাঙ্গালীর হাত ছাড়া হওয়ায় আজ বাঙ্গলার এই দুরবস্থা? বাঙ্গলাদেশে সকল লোকের অন্নসংস্থান হইতেছে; কেবল নিজের পেটে অন্ন নাই, বাঙ্গলা তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য হারাইয়া আজ পথের ভিখারী—বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে দুঃখ, দৈন্য এসে, অভাবের সংসার সৃষ্টি করেছে আজ বাঙ্গলা আর সোনার বাঙ্গলা নাই, আজ বাঙ্গলা ফকির, আজ বাঙ্গলা 'দুঃখের আগার'।

পাট শিল্প

বহু শতাব্দী হইতে বাঙ্গলাদেশে পাটের আবাদ চলিয়া আসিতেছে—পাট উৎপন্ন করিয়া, সেই পাট হইতে দড়ি দড়া, দুলো, রশি, কাছি ইত্যাদি প্রস্তুত হইত, নৌকা এবং জাহাজের পালও পাটের সূতায় প্রস্তুত হইত; এবং দেশ-বিদেশে এই সকল দ্রব্য চালান দিয়া, বাঙ্গলার জাতীয় ধন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইত; অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহুলোক পাটের থলিয়া প্রভৃতি ক্রয় করিবার জন্য বাঙ্গলায় আসিত, পাটের ব্যবসায় বাঙ্গলায় কিরূপ প্রসার ছিল, তাহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিবরণ হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়—"১৮৪৯—১৮৫০ সালে ২২৯৮১৪৪১ খণ্ড থলিয়া এবং ২৩৮০১৯১ খানি চট কলিকাতা হইতে রপ্তানী হইয়াছিল এবং তাহার মূল্য প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা ছিল।"

পাট হইতে যাবতীয় কারবার বাঙ্গলার জোলা, যুগী, কাপালী

তাঁতি প্রভৃতি জাতিগণ করিত এবং তজ্জন্য বাঙ্গলার ঐ সমস্ত ব্যবসা তাহাদের একচেটিয়া ছিল—টাকাও সমস্ত বাঙ্গলার ব্যবসায়ীগণ পাইত। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ডাঃ রক্সবার্গ ঐ শিল্পের পরিচয় পাইয়া, বিলাতের ব্যবসায়ীগণকে আকৃষ্ট করান এবং বাঙ্গলার এই উন্নতিশীল শিল্পটীকে বাঙ্গলার হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইয়া তাহারা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলায় প্রথম পাটকল স্থাপিত করেন।

"The Jute Mill at Champdani is one of the oldest in the Province having been built in 1872." *

প্রথমে শিল্পীদিগকে নানা রকমে প্রলুব্ধ করিয়া, খাদ্য শস্যের আবাদ হ্রাস করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পাটের চাষ বৃদ্ধি করায়, এই অমূল্য শিল্পটী লুপ্ত হয়, ফলে অসংখ্য পাট বয়ণকারীর রোজগারের পথ একেবারে রুদ্ধ হয়।

তারপর বস্ত্র-শিল্পের কথা—প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের এইস্থানে কাপড়ের প্রচলন ছিল। বাঙ্গলা চিরকাল তার মসলিনের জন্য বিখ্যাত। বাঙ্গলার মসলিন সেকালের গ্রীস এবং রোমের অধিবাসীগণও ব্যবহার করিত এমন কি ঐ দেশের রাণীরা মসলিন পরিয়া খুব গৌরব অনুভব করিতেন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে ২৪২ লক্ষ টাকার কাপড় রপ্তানি হইয়াছিল, আর আজ ৭০ কোটী টাকার কাপড় আমাদের বিলাত হইতে কিনিতে হয়। এই দেশের শিল্পটীকে ধ্বংস করিতে কিরূপ অত্যাচার এবং অনাচার করিতে হইয়াছিল, তাহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরদের বিবৃতি হইতেই বেশ বুঝা যায়। "আমরা যে অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছি, উহা অত্যন্ত নৃশংস এবং ইতিহাসে বিরল—অত্যাচার ও অনাচার করিয়া এবং ভারতের বুকে বসিয়া জোর করিয়া উহা আদায় করিয়াছি।" নানাপ্রকার অন্যায় আইন সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গলার বুকে তাঁতিদের উপর

বস্ত্র-শিল্প

* Hooghly District Gazetteers, Page 248

অন্যায় অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। এমন কি, পিতা মাতার সম্মুখে পুত্রকে হত্যা করা হইত এবং তাঁতিদের মায়েদের মেয়েদের সতীত্ব নষ্ট করিত।

"The Children were scourged almost to death in the presence of their parents...and these virgins were publicly violated by the lowest and wickedest of the human race—"*

যাহা হউক এইরূপ অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া তাঁতিগণ জাত ব্যবসা ছাড়িতে বাধ্য হয় এবং ফলে বাঙ্গলার অমূল্য শিল্পটি একেবারে ধ্বংস হয়। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে বিলাতে পরিষদের সভায় মিঃ লার্পেন্ট বলেন— "আমরাই ভারতের শিল্প সমূহ ধ্বংস করিয়াছি।" উত্তরে তদন্ত কমিটির প্রেসিডেন্ট বলেন, "ভারতের বস্ত্রশিল্প ইতিপূর্ব্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে—সুতরাং যাহা ধ্বংস হইয়াছে, তাহা লইয়া আর প্রশ্ন উঠিতে পারে না।" বাঙ্গলার তথা ভারতের বস্ত্র-শিল্প ধ্বংস হইল এবং ফলে বহু তাঁতির রোজগারের পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়—তাহার ফল স্বরূপ আজ আমাদের 'নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে' দিন কাটাতে হচ্ছে।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উইলসন্ সাহেব লিখিয়াছেন, ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে যে সাক্ষ্য গৃহীত হয় তাহাতে জানা যায় যে, ভারতীয় তুলাজাত দ্রব্য এবং সিল্ক বস্ত্র অপেক্ষ শতকরা পঞ্চাশ বা ষাট ভাগ কম দামে বিলাতের বাজারে বিক্রয় করিলেও লাভ পাওয়া যাইত। সুতরাং ভারতীয় বস্ত্রের যথার্থ মূল্যের উপর শতকরা সত্তর আশী ভাগ শুল্ক বসাইয়া অথবা সাক্ষাৎভাবে বিলাতের বাজার বন্ধ করিয়া দিয়া বিলাতি শিল্প রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল।

এইরূপ না করিলে—শুল্কদ্বারা ভারতীয় বস্ত্র বিলাতের বাজারে প্রবেশের পথ বন্ধ না করিলে, ষ্টিমার আবিষ্কার সত্বেও প্যাইলি ও ম্যাঞ্চে-

---

* Burke '1788'

ষ্টারের কলের চাকা ঘুরিত না। ভারতের শিল্প বলি দিয়াই ইংলণ্ডের কার্পাস শিল্প উৎপন্ন হইয়াছে। যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ হইত, তবে এই ব্যবহারের প্রতিশোধ লইতে পারিত; শুল্ক বসাইয়া বিলাতি বস্ত্র ভারতে প্রবেশ বন্ধ করিয়া দিত। কিন্তু এই আত্মরক্ষার পথ ভারতবর্ষকে অবলম্বন করিতে দেওয়া হয় নাই। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধীন বলিয়াই ইংলণ্ডের অন্যায়ের প্রতিশোধ লইতে পারে নাই। ইংলণ্ড রাজশক্তির অবৈধ প্রয়োগদ্বারা বস্ত্র ব্যবসায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতবর্ষকে দাবাইয়া রাখিয়া এবং পরিশেষে শ্বাসরোধ করিয়া মারিয়াছিল—যে প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট সমান শর্ত্তে টিকিয়া থাকা ইংলণ্ডের পক্ষে অসম্ভব ছিল।*

লর্ড সভায় হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ কালে এডমাণ্ড বার্ক বলেন যে, কোম্পানীর লোকেরা ভারতীয় শিল্পীদের হাতের আঙ্গুলগুলি এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে দড়ি জড়াইয়া জড়াইয়া বাঁধিত যে, প্রত্যেকের হাতের মাংসগুলি একত্রিত হইয়া দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন ও সংবদ্ধ হইয়া যাইত। তৎপর উহারা কাষ্ঠের বা লোহার গোঁজ হাতুড়ি দ্বারা ঐ সংবদ্ধ অঙ্গুলীগুলির মধ্যে বিদ্ধ করিয়া দিত। নিষ্পেষিত হইয়া হাতগুলি এরূপ বিকলত্ব প্রাপ্ত হইত যে হতভাগ্য নিরীহ এবং শ্রমশীল তাঁতিরা আর ইহজীবনে ঐ হাতদ্বারা কোন কিছু ধরিয়া মুখে তুলিতে সমর্থ হইত না।†

১৭৯৬ হইতে ১৮১১ খৃষ্টাব্দ অবধি সুরাটে ইংরাজের ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধানে মিঃ রিচার্ডস নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার দৈনিক-লিপিতে এইরূপ লেখা পাওয়া যায়—তাঁতিদের প্রতি অত্যন্ত নৃশংস অত্যাচার করা হইত। অত্যাচার ও জবরদস্তি এমন নির্ম্মম হইয়াছিল যে, বহু তাঁতি এই অত্যাচার সহিতে না পারিয়া, তাহাদের জাত ব্যবসা ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিল।‡

---

* ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কমিশন—১৯১৬-১৮ রিপোর্ট (পৃঃ ২৯৯)

† বার্ক, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৮৮

‡ মেজর বসু—রুইন অফ ইণ্ডিয়ান ট্রেড (পৃঃ ৭৮)

বঙ্গদেশের বস্ত্রশিল্প মস্‌লিন নির্ম্মাণে চরম বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল; মস্‌লিন বাংলার গৌরব—জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্চর্য্য।

তূলার চাষ

বাঙ্গলার মাটি ও জলবায়ু তূলার চাষের অতিশয় উপযোগী। এই স্থানে শিরজ, ফোটী (Foti) বা দেবকার্পাস উৎপন্ন হয়; ইহাকে বামুনীতূলাও বলা হইত। এই তূলার সুতায় উপবীত বা পৈতা অতি উত্তম হইত। এক একটি পৈতা এলাচির খোসার ভিতর রাখা যাইত। ইহা শিরজ তূলা ব্যতীত আদৌ সম্ভবপর হইত না।

শিরজ তূলার আঁশ দীর্ঘ, শক্ত ও সুশুভ্র। হিন্দুর ঘরের মেয়েরা শিরজ তূলা হইতে অসীম ধৈর্য্যের সহিত টাকুতে সুতা কাটিত। তাহাই মস্‌লিন বস্ত্রের সুতা। এই সুতা দিয়া সুদক্ষ তাঁতিরা মস্‌লিন তৈয়ারী করিত। মসলিন পৃথিবীর সর্ব্বত্র গৌরব প্রাপ্ত হইয়াছিল। গাছের ফলে তূলা উৎপন্ন হয়।

সেই তূলায় মানুষের হাতে সুতা প্রস্তুত হয়; আর সেই সুতায় মাকড়সার জালের মত কাপড় প্রস্তুত হইযা থাকে, ইহা তাহারা বিশ্বাস করিত না। অতি পুরাতন সভ্যদেশ গ্রীস এবং মিশরের লোকেরাও মস্‌লিন মানুষের তৈরি কি না সন্দেহ করিত।

মস্‌লিন ঘাসের উপর বিছাইয়া রাখিলে ঘাসই দেখা যাইত—কাপড় দেখা যাইত না। প্রবাদ আছে, কোন তাঁতি তাহার মস্‌লিনখানা ঘাসের উপর বিছাইয়া দিয়াছিল—একটি গাভী ঘাসের সঙ্গে সেই কাপড়খানাও খাইয়া ফেলে।

পারস্যের শাহ চ্যাসেফিকে তাঁহার দূত মহম্মদ আলি বেগ একখানি পাগড়ীর কাপড় পাঠাইয়া ছিলেন। কাপড়খানি ৬০ হাত লম্বা। ডিমের মত ছোট একটি নারিকেলের খোলা বিবিধ মণিমুক্তায় মনোহর করিয়া তাহার ভিতর ঐ মস্‌লিনখানি পাঠাইয়া ছিলেন। পারস্যের শাহ সেই

বস্ত্রের সূক্ষ্মতা, শুভ্রতা ও বয়ন-নৈপুণ্য দর্শনে সবিস্ময়ে বলিয়াছিলেন, এ সকল বস্ত্র মানুষে কি করিয়া তৈয়ার করিতে পারিবে! এটা আদৌ সম্ভবপর নহে। হয় কোন কীট (মাকড়সা শ্রেণীর) বা বেহেস্তের হুরীরা এইসকল তৈয়ার করিতে পারে!

কিন্তু সত্যসত্যই বাংলার মানুষ সেই বস্ত্র প্রস্তুত করিত। আমাদের দিদিমা ঠাকুরমা প্রভৃতি প্রাচীনারা একদিন ঐ মাকড়শার সূতার মত সূতা হাতের আঙ্গুলের ক্ষমতায় কাটিতেন। সেই সূতায় যে কাপড় হইত, তাহা দেখিয়া জগৎ সম্ভ্রমে মাথা নোয়াইত।

ভারতবর্ষে প্রাচীন সভ্যতার অতি বড় সাক্ষী—কার্পাস বস্ত্র। কোন্ সুদূর অতীত কালে ঋগেদ সংহিতা নামক গ্রন্থেও কার্পাস বস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। হিন্দুদিগের প্রাচীন সংহিতা গ্রন্থেও সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রের কথা রহিয়াছে। প্রাচীনকালে সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র গ্রীসদেশে ভারতীয় বস্ত্রের প্রশংসা ছিল। ইংলণ্ডের অনেক বড় বড় পণ্ডিত ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বহু সুখ্যাতি করিয়াছেন।

১৩৪০ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ পর্য্যটক ইবন বটুটা সপ্তগ্রামে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "সূক্ষ্ম কার্পাস সূত্রে প্রস্তুত অতি উত্তম বস্ত্র, লম্বা ত্রিশ হাত, মাত্র দুই 'দিরামে' (এক দিরামে দশ পয়সা হইত) আমার সম্মুখে বিক্রয় হইয়াছে।" *

অনেকের ধারণা যে, মসলিন কেবলমাত্র ঢাকা জেলাতেই প্রস্তুত হইত; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। বাঙ্গলার সর্ব্বত্র মসলিন প্রস্তুত হইত এবং তাহা বহু প্রকারের হইত। তবে ঢাকার মসলিন † সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল। নিম্নে কয়েক রকম প্রধান মসলিনের পরিচয় প্রদত্ত হইল:

১। মল্‌মল্ খাস—ইহাই শ্রেষ্ঠতম মস্‌লিন; শিরজ-তুলাতে সূতা

* Sanguinetti's Ibn Batoutah, Page 212

‡ বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্প—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কাটিয়া এই মস্‌লিন তৈয়ারী করা হইত। কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, আব-দুল্লাপুর সোনারগাঁও, কাপাসিয়া, তেজগাঁও, সপ্তগ্রাম, ধনিয়াখালি প্রভৃতি স্থানেই প্রধানতঃ মলমল খাস প্রস্তুত হইত। একমাত্র দিল্লীর সম্রাট ও বেগমগণই মলমল খাস ব্যবহার করিতেন। অন্তত্র ইহার বিক্রয় নিষিদ্ধ ছিল।

এই মস্‌লিনের টানায় ১৮০০—২০০০ সূতা থাকে। এক-অৰ্দ্ধ (আধি) থানের ওজন ৮ তোলা ৵০ আনা মাত্র। এই থান একটি অঙ্গুরীয়ের ভিতর দিয়া টানিয়া বাহির করা যাইত।

২। 'সরকার আলি'ও ঐ শ্রেণীর বস্ত্র। ইহার টানায়ও ১৯০০ সূতা থাকিত। ইহাও দিল্লীর সম্রাটের একচেটিয়া ছিল।

সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব অন্দরের নাযেববেগম মহলে তাঁহার কন্তা জেব-উন্নিসার কক্ষে উপনীত হইয়া পর্দা সরাইতে লক্ষ্য করিলেন যে, কন্তার গায়ে কাপড় নাই। সম্রাট্ পৰ্দ্দার বাহিরে থাকিয়া কন্তাকে গায়ে কাপড় দিতে বলিলেন। কন্তা উত্তর করিলেন—বাবা, আমার গায়ে সাত খানি মস্‌লিন জড়ান আছে।

৩। ঝিনা বা ঝুন্না বা ঝিন্নি—ইহাও মলমল খাসের সমকক্ষ। ২০গজ × ১॥ গজ কাপড়ের ওজন ৮॥ আউন্স। সেকালে সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়িকা ও নৰ্ত্তকীরা এই মূল্যবান ঝিনা ব্যবহার করিত।

৪। রঙ্গ বা রঙ—ঝিনাতে পাকা রং করা হইলে তাহার নাম হইত 'রঙ্গ ঝিনা'।

৫। আব্-রেঁায়া—(আব্—জল, রেঁায়া—প্রবাহ) অর্থাৎ নিৰ্ম্মল জল-প্রবাহ। ইহা জলে ভিজাইলে জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়, পৃথক অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না; ২০ × ১॥গজ কাপড়ের ওজন ১০॥ আউন্স। টানায় ৭০০ সূতা।

৬। 'জঙ্গল খাসা'—(খাসা—উত্তম) ইহা জঙ্গল বাড়ীতে তৈয়ারী

হইত। কেহ কেহ বলেন. জঙ্গল খাসা সোনারগাঁ আড়ং হইতে প্রচারিত হইত।. শম্ভায়ু গোবিন্দ বসাক বলিয়াছেন যে, ইহা একমাত্র জঙ্গল বাড়ীতেই প্রস্তুত হইত।

৭। 'তরন্দম'—ইহার প্রধান অর্থ, আঙ্গ্ রাখা বা অঙ্গরক্ষা। ইহা প্রায় জামার জন্তই ব্যবহৃত হইত। ২০×১গজ কাপড়ের ওজন ১৫।১৭ আউন্স।

৮। (ক) 'সুবনাম' (উষার নীহার) ও (খ) 'সবনাম' (সান্ধ্য-শিশির) এই উভয় মস্‌লিনই অতি সূক্ষ্ম। নব দূর্ব্বাদলের উপর বিছাইয়া দিলে ইহার অস্তিত্ব দেখা যায় না। ২০গজ×১॥ কাপড়ের ওজন ১০ আউন্স।

৯। 'আলবাল্লা'—অর্থ, শৌখিন সৈনিকের পোশাকের উপর দামী উড়ানী। সূতাগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট।

১০। তঞ্জাব—ইহা দেহের অলঙ্কার স্বরূপ। এই বস্ত্র পরিধান করিলে লোকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। ২০×১॥ হাত কাপড়ের ওজন ১০—১৮ আউন্স।

১১। নয়নসুখ বা নয়ানসুখ—আবুল ফজল বলেন, ইহার নাম 'তনুসুখ'। ইহা একটু মোটা; ১০ হইতে ২৪গজ দীর্ঘ, প্রস্থ ১॥গজ। দাম ৮০৲ টাকা।

১২। সুরবতী—ইহা মাথার পাগড়ীর কাজে ব্যবহার হইত। দৈর্ঘ্যে ২০—২৫ গজ, প্রস্থে আধ গজ। ওজন প্রায় ১২ আউন্স।

১৩। সরবতী—ইহার অর্থ মোচড়ান। ইহাও পাগড়ীর জন্ত ব্যবহার হইত।

১৪। কুমীস্—শৌখিন জামার কাপড়। ২০×১ গজ, ওজন ১০ আউন্স।

১৫। জামদানী—ইহা শিল্পচাতুর্য্যের নিদর্শন। বিবিধ চিত্র ও ফুল-

কাটা সুসূক্ষ্ম মস্‌লিন। তাঁতের সাহায্যে শিল্পীর দক্ষতায় ইহা কারুকার্য্য খচিত হইয়া উঠিত। জামদানীর কয়েকটি শ্রেণীভেদ ছিল, তাহা এইরূপ :

(ক) কেবলমাত্র শুভ্র জমিনের উপর শুভ্র মস্‌লিনের সাহায্যে ফুল ও চিত্র কাটা।

(খ) সুসূক্ষ্ম রেশমের সাহায্যে ফুল ও চিত্র কাটা।

(গ) বিবিধ বর্ণসংযোগে উর্ণার সূতায় ফুল কাটা।

এই সমুদয় শিল্পকার্য্য হিন্দুর ঘরের বৌ-ঝিরা সূচীর সাহায্যে সম্পাদন করিত। ইহাতে তাহাদের যশঃ ও অর্থ উভয়ই লাভ হইত।

জামদানীর নানা প্রকার বুনন ছিল, এইজন্য ইহাদের বিভিন্ন নামও হইত। যথা :—পান্নাহাজার, ডুবিয়া, তোড়াদার, করেলা, গেদা, সবুরশা, গুল্‌বদন বা গোলবাতান, আনার দানা, মেল, জলবার, দুবলী-জাল, আনার কলি ইত্যাদি।

১৬। কাশিদা—ইহা অতি সূক্ষ্ম ও শৌখিন বস্ত্র। আসাম জাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুগা সূতায় উত্তম কাশিদা প্রস্তুত হয়। মুগা ও রেশম মিশ্রিত করিয়াও কাশিদা প্রস্তুত করা যায়। কেবল রেশম দ্বারাও কাশিদা প্রস্তুত হইত। কুঠা ও রুমী, নৌবুটি, আজিজুল্লা প্রভৃতি নামে বিভিন্ন কাশিদা পরিচিত।

সকল প্রকার মস্‌লিনের বিশিষ্ট পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নাই। সকল মসলিনই অল্পাধিক সূক্ষ্ম ও মনোহর। এই অঞ্চলের চল্‌তি মস্‌লিন-গুলির নাম নিম্নে লিখিত হইল :

১। মলমল খাস ২। আব-রে঳ঁায়া ৩। ঝুনা বা ঝিনা ৪। সবনাম ও সুবনাম ৫। খাসা ৬। রঙ বা রঙ্গ ৭। সরকার আলি ৮। আল্‌-বাল্লা ৯। তঞ্জাব ১০। নয়ানসুখ ১১। বদনখাস ১২। জঙ্গল খাসা ১৩। উর্ণ ১৪। সর্‌বতী ১৫। সাঙ্গাতী ১৬। তরন্দম ১৭। জল-বার ১৮। জামদানী ১৯। কাশিদা ২০। হাম্মাম ২১। কাগজসাহী ২২। বুল্‌বুল চশম

২৩। আধি ২৪। গুলবদন ২৫। আনার কলি ২৬। কপোতের খোপ ২৭। আনার দানা ২৮। নন্দনসাহী ২৯। কুণ্ডীদার ৩০। সকতা ৩১। পাছাদার ৩২। বদন খাসা ৩৩। কারেলা প্রভৃতি।

পূর্ব্বে এই অঞ্চলে কফি উৎপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু জেলার জলবায়ু কফির পক্ষে অনুকূল নহে বলিয়া, এই চাষ বর্ত্তমানে হয় না। হুগলী জেলায় আম, কাঁটাল, নারিকেল, তাল, পেঁপে, খেঁজুর, বাতাবী লেবু, বেল, পাতিলেবু, সুপারি, পিয়ারা, আনারস, ডালিম, তেঁতুল, নোনা, কালোজাম, গোলাপজাম, তরমুজ, টেপারী, কামরাঙ্গা, বিলাতী-বেগুন, জামরুল, কলা, মিষ্ট কুমড়া, জেবির (Roselle) প্রভৃতি ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

ফলবান বৃক্ষ ও ফুল

অন্নদামঙ্গল রচয়িতা কবি ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকর হুগলী জেলার অধিবাসী ছিলেন, তিনি লিখিয়াছেন :

"আম আমসত্ব আর আমসী আচার।
চালিতা তেঁতুল কুল আমড়া মন্দার॥"

এতদ্ভিন্ন আমলকি, হরীতকি, বহেড়া, শিরীষ, ঘৃতকুকারী, ধুতুরা, শতমূল, অনন্তমূল, পিপুল, চিরতা, গুলঞ্চ, কালকাসান্দ, আবাদা প্রভৃতি ভেষজ উদ্ভিদ যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

বাঁশ, বেত, শর, প্রভৃতি গৃহনির্ম্মাণের জিনিষও এইস্থানে যথেষ্ট জন্মে। এতদ্ব্যতীত দেবদারু, সেওড়া, বট, অশ্বত্থ, চালতা, ফলসা, নিম, জেয়োল, আমড়া, সজিনা, বাবুল, শিরিষ, কদম, ছাতিম প্রভৃতি গাছ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

হুগলী জেলায় নানা জাতীয় ফুল জন্মে; পোর্ত্তুগীজগণ বিভিন্ন স্থান হইতে বহুপ্রকারের ফুল এবং ফলের গাছ এই জেলায় প্রথম লইয়া আসে এবং তাহাদের ফুলের শখ ছিল বলিয়া, ভারতের মধ্যে বহু বিদেশী ফুলের গাছ এইস্থানে সর্ব্বপ্রথম উৎপন্ন হয়। পৃথক অধ্যায়ে এই বিষয়ের

আলোচনা করা হইবে। গোলাপ, গাঁদা, যুঁই, চামেলী, চাঁপা, অপরাজিতা, পদ্ম, রজনীগন্ধা, কামিনী, শেফালী, বকুল, কেতকী, বেল প্রভৃতি নানাপ্রকার ফুল এইস্থানে পাওয়া যায়।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ চণ্ডীকাব্যে যে সকল বিষয়ের বর্ণনা আছে, তাহা তাঁহার সমসাময়িক এই কথা অসংকোচে বলা যায়। উক্ত কাব্যে ধনপতি সওদাগর যে সকল দ্রব্য লইয়া বিনিময়ার্থে সিংহলে গিয়াছিলেন, তাহার একটি সুন্দর বিবরণ অ ছে। উহা হইতে এই অঞ্চলের তৎকালীন বাণিজ্যের অবস্থা উপলব্ধি করা যাইবে বলিয়া, নিম্নে কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত করা হইল :

"কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাব,
নারিকেল বদলে শঙ্খ
বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ পাব
শুণ্ঠীর বদলে টঙ্ক ॥
প্লবঙ্গ বদলে মাতঙ্গ পাব
পায়রার বদলে শুয়া।
গাছ ফল বদলে জায়ফল পাব,
বহেড়ার বদলে গুয়া ॥
পাট শন বদলে চামর পাব,
কাঁচের বদলে নীলা।
লবণ বদলে সৈন্ধব পাব,
জোয়ানী বদলে জিরা ॥
আকন্দ বদলে মাকন্দ পাব
ধুতির বদলে গড়া।

শুক্তা বদলে মুকুতা পাব
ভেড়ার বদলে ঘোড়া ॥
হরিতাল বদলে গোরচনা পাব,
শুলফার বদলে মেথী।
আফিঙ্গ বদলে হিঙ্গ পাব
জোড়ের বদলে ধুতি ॥
চিনির বদলে দানা কর্পূর,
আলতার বদলে মাটি।
সগন্নথে পঙ্গার কম্বল পরি
বদল করিব পাটী ॥
যব খড়িয়া সার্ষপ মুসুর,
তিল মুগ লইয়া ছোলা।
কিনিয়া বহুতর অন্যান্য সফর,
বদল পাত্যাছি গোলা ॥
মাস মুসুরী তণ্ডুল বদরী
বরবটী পাটুন চিনা।
বদলে শকটে ঘৃত তৈল ঘটে,
বহুতর আন্যাছি কিনা ॥”

চতুর্থ অধ্যায়

ভৌগোলিক অবস্থান

বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের পূর্ব্বে বঙ্গদেশ—রাঢ়, বগড়ি, বঙ্গ, বরেন্দ্রে ও মিথিলা এই পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত ছিল; তন্মধ্যে বঙ্গ আবার লক্ষণাবতী, সুবর্ণগ্রাম ও সপ্তগ্রাম এই তিনটী উপবিভাগে বিভক্ত ছিল। এই তিন বিভাগের প্রধান শহর পূর্ব্বোক্ত তিনটি নামেই অভিহিত হইত এবং এই শহরগুলি অতীব সমৃদ্ধিশালী ছিল।

উপবিভাগ

"In 1330 Muhammad Tughluk conquered Eastern Bengal also and divided into three provinces—Lakhuwati, Santgaon and Sonargaon including Dacca." †

প্রাচীন তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, পূর্ব্বে বঙ্গদেশ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—পৌণ্ডবর্দ্ধন এবং বর্দ্ধমান।

"From the records of the early Sena Kings, we know of only two Bhuktis in Bengal viz Paundra Vardhana & Vardhamana." *

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট সাহেব লিখিয়াছেন যে সের শাহের পূর্ব্বে আর কোন নবাব বঙ্গরাজ্য নানা ভাগে নানা জেলায় বিভক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায় নাই। কেবল গিয়াসুদ্দিন তোগলক্ বঙ্গদেশকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন:

* Hunter's Statistical Account of Bengal.

† Saktipur Copper Plate of Lakshman Sena By Dr, D.C. Ganguly. (Epigraphica Indica)

"After this, Shere proceeded to Gour aud subdivided the kingdom of Bengal into several provinces to each of which he nominated a District-Governor." *

মুসলমান শাসনকর্ত্তা সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে, তাহার রাজস্ব-সচিব তোডরমল্ল রাজস্ব নির্দ্ধারণ কল্পে, প্রাগুক্ত পাঁচটি বিভাগকে চতুঃ বিংশ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া "সরকার" নামকরণ করেন। কিন্তু তাহার সময়ে সুবা বাঙ্গলা সুরমা তীরবর্ত্তী শ্রীহট্ট হইতে কৌশিকী ধৌত পূর্ণিয়া ও গঙ্গার দক্ষিণস্থিত কাঁকজল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মেদিনীপুর, হিজলী চটগ্রাম এবং কোচবিহার তখনও এই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। মেদিনীপুর ও হিজলী উড়িষ্যার এবং চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; কোচবিহার সীমান্তবর্ত্তী স্বাধীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। সম্রাট সাজাহান ও আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে এই সকল ভূখণ্ড বাঙ্গলায় আসে।

হুগলী জেলা তৎকালে 'সরকার সাতগাঁও' 'সরকার সেলিমানাবাদ' এবং 'সরকার মান্দারণ' এই তিনটি বিভাগে বিভক্ত ছিল।

সরকার সাতগাঁও বর্ত্তমান ২৪ পরগণা, নদীয়া জেলার পশ্চিমাংশ, মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। † বর্ত্তমানে

সাতগাঁও

সাতগাঁও বা সপ্তগ্রাম একটি দরিদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে রূপান্তরিত হইয়া, তাঁহার ইতিহাস বিখ্যাত অতুল বৈভবসম্পন্ন মহানগরীর সাক্ষ্য বহন করিতেছে; পৃথক অধ্যায়ে সপ্তগ্রামের বিবর বর্ণনা করা হইয়াছে, এইস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। 'সরকার সাতগাঁও, (Sircar Satgong) তিপান্নটি মহালে বিভক্ত ছিল ও ১ কোটি ৬৭ লক্ষ ২৪ হাজার, ৭ শত ২০ 'দাম' রাজস্ব দিতে হইত।

* Stewart's History of Bengal.

† বিশ্বকোষ—নগেন্দ্রনাথ বসু, পৃঃ ২১৭

নিম্নে 'আইন-আকবরী' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে উক্ত মহালের সমস্ত নামগুলি উদ্ধৃত হইল। * এই তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, বহু স্থানের নাম বর্ত্তমানে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

(১) বেনওয়া, (২) কাতাউলি, (৩) ফেরাসিৎগড়, (৪) ওকেরা, (৫) আনওয়ারপুর, (৬) এরসাদটুলি, (৭) সাতগাঁও, (৮) আকবরপুর, (৯) বৌখেন, (১০ বেউয়ান, (১১) সেলিমপুর, (১২) পুঁড়া, (১৩) বারমণ্ডড়া, (১৪) মাণিকহাটী (১৫) বীলগং, (১৬) বালিন্দা, (১৭) বাগওয়ান, (১৮) বঙ্গবাড়ি, (১৯) বালীয়া, (২০) ফেলগাঁ, (২১) বারমুধুতী, (২২) তুরসরায়, (২৩) হাভেলী সের, (২৪) হোসেনপুর, (২৫) হাজিপুর, (২৬) বারবাকপুর, (২৭) ধলগাপুর, (২৮) রাণীহাট, (২৯) সাগহাটী, (৩০) সাকোটা, (৩১) শ্রীরাজপুর, (৩২) বন্দর, (৩৩) শাগহাট, (৩৪) কাসফল, (৩৫) ফতেপুর, (৩৬) কলিকাতা (৩৭) মেকুমা, (৩৮) ব্যারাকপুর, (৩৯) খরাড়, (৪০) খুস্তাল, (৪১) গিলারওয়া, (৪২) মুকোরা, (৪৩) মেটারী, (৪৪) মেদনীমল, (৪৫) মজাফারপুর, (৪৬) মুণ্ডাগাছা, (৪৭) মাহিহাটী, (৪৮) নদীয়া, (৪৯) সাত্তেনপুর, (৫০) সালকিয়া, (৫১) হাতীকুন্দ, (৫২) হায়াগড় এবং (৫৩) সরকার সাতগাঁও।

এই মহালের একজন 'ফৌজদার' ছিলেন এবং তিনিই বিচার ও শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। কোন প্রকার যুদ্ধের সময়, প্রয়োজন হইলে এই সরকার হইতে পঞ্চাশজন অশ্বারোহী ও ছয় হাজার পদাতিক সৈন্য নবাবকে পাঠাইতে হইত। ফৌজদারের অধীনে 'কোতোয়াল' এবং তাহার অধীনে 'নাজিম' থাকিত।

"The Fouzdar was the chief police officer and judge of all crimes not capital; Kotwal the head constable of the

* Gladwin's Ayeen Akbari, Pages 207—209.

৮

town was subordinate to him, The Nazim as surpreme Magistrate presided at the trial of capital offenders." *

সরকার সোলিমানাবাদের (Sircar Solimanabad) অন্তর্ভুক্ত একত্রিশটি মহাল ছিল এবং নবাবকে পাঁচহাজার পদাতিক সৈন্য পাঠাইতে হইত। সরকার সোলিমানাবাদ হইতে ১ কোটী ১৬ লক্ষ ২৯ হাজার ৯ শত ৬৪ 'দাম' রাজস্ব আদায় হইত বলিযা লিখিত আছে। তৎকালে তাম্রনির্ম্মিত স্থূল ও অসমান পযসাকে 'দাম' বলিত এবং সম্ভবতঃ 'দাম' হইতে 'দামড়ি' কথার উদ্ভব হইয়াছে। ৪০ হইতে ৪৮ দাম এক টাকার সমান ছিল। † হুগলী জেলার বর্ত্তমান সমূদয উত্তরভাগ এবং বৰ্দ্ধমান ও নদীযা জেলার দক্ষিণ ভাগের কযেকটি পরগণা লইয়া এই সরকার গঠিত হইয়াছিল। সুলেমান সাহ সম্রাট আকবরের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন এবং পঁচিশ বৎসর যাবৎ রাজত্ব করিযা পরলোকগমন করেন। ** বৰ্দ্ধমান শহরের দক্ষিণ পূৰ্ব্ব দিকে দামোদর নদের তীরে এই সরকারের প্রধান শহর সালিমাবাদ অবস্থিত ছিল। †† নিম্নে সোলিমানাবাদের মহালগুলির নাম উল্লিখিত হইল :

সোলিমানাবাদ

(১) ইব্রাযিন, (২) ইসমাইলপুর, (৩) আমুল্যা, (৪) উলা, (৫) বসুন্ধরী, (৬) ভূশুট, (৭) পাণ্ডুযা, (৮) বাজেমুব, (৯) বালীচুকা, (১০) চুটীপুর, (১১) জুমহা, (১২) জযপুর, (১৩) হোসেনপুর, (১৪) খরসা, (১৫) রাযসক, (১৬) হাভেলী সোলিমানাবাদ, (১৭) সৎসুজা, (১৮) সবুশপুর, (১৯) সুন-

* Field's Regulations, Page 135.

† Seir Mutaqherin translated by M. Raymond, Page 12.

** Brigg's Ferishta, Vol IV (1829), Page 39.

††Contribution to the Geography and History of Bengal by H. Blohman. Page 10

গোলী, (২০) ওমরপুর, (২১) সুলতানপুর, (২২) আলামপুর, (২৩) কবুজ-পুর, (২৪) গোবিন্দ, (২৫) মোহাম্মদপুর, (২৬) মুলখার, (২৭) মুকিন, (২৮) নায়েবা, (২৯) নেসাঙ্গ, (৩০) নীপা, (৩১) তালুকদার।

মাদারুণ

সরকার মাদারুণ (Sircar Madarun) বা মান্দারের অন্তর্গত যোলটি মহাল ছিল এবং ৯৪ লক্ষ ৩ হাজার ১ শত 'দাম' এই সরকার হইতে রাজস্ব দিতে হইত। সরকার মাদারুণ অর্দ্ধ বৃত্তাকারে বীরভূম জেলার অন্তর্গত নাগর হইতে আরম্ভ করিয়া বর্দ্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ, হুগলী জেলার আরামবাগ (তৎকালে জাহানাবাদ) ও হাওড়া জেলার পশ্চিমাংশ হইয়া মেদিনীপুর জেলার চিতুয়া ও মহিষাদল পরগণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। * যুদ্ধের সময় এই সরকারের ফৌজদারকে আড়াই শত অশ্বারোহী এবং সাত হাজার পদাতিক সৈন্য সরবরাহ করিতে হইত। নিম্নে মহালগুলির নাম উদ্ধৃত হইল :

(১) উনছুটি, (২) বলগড়ন, (৩) বীরভূম, (৪) ভেওলভূম, (৫) চিতুয়া, (৬) চম্পানগরী, (৭) হাভেলী মাদারুণ, (৮) সায়ীভূম, (৯) সুকেরভূম, (১০) সাহাপুর, (১১) কেইট, (১২) মণ্ডল ঘাট, (১৩) নাগর, (১৪) মিনা-বাগ, (১৫) হুসৌলী, (১৬) সামার সনহুস।

১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা দ্বিতীয়বার বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা হইয়া পুনরায় রাজস্ব বিভাগের সুবিধার্থে মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি মহাল উড়িষ্যা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই সময় পোর্ত্তুগীস দস্যুগণ পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গে ভয়ানক উপদ্রব করিতে আরম্ভ করায় হুগলী ও হিজলীতে 'নওয়ার মহল' অর্থাৎ নৌ-সৈন্যের ব্যবস্থা করা হয়।

* মেদিনীপুরের ইতিহাস—শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু—১১ পৃঃ।

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সুলতান সুজা সুবা বাঙ্গলার এক নূতন হিসাব প্রস্তুত করেন এবং তোডরমল্লের সময়ের ১৯টি সরকারের পরিবর্ত্তে ৩৪টি সরকার ও ৬৮২টি মহালের পরিবর্ত্তে ১৩৫০টি মহালে বিভক্ত করিয়াছিল।* তখন পুরাতন সরকারের সীমার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিলেন। এই সময় সপ্তগ্রাম হইতে সরকারের যাবতীয় অফিসাদি হুগলী শহরে স্থানান্তরিত করা হয়। হুগলী শহর পূর্ব্বে পোর্ত্তুগীসদের অধিকারে ছিল; কাশীম খাঁ পর্ত্তুগীসদের বিতাড়িত করিয়া হুগলী অধিকার করেন। "Hughly having came into possession of the Moghuls, was established as the royal port of Bengal. All the public offices were withdrawn from Satgaon which soon declined into a mean village." †

সুজার রাজস্ব বিভাগ

১৭০৬ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক হ্যামিলটন সাহেব বঙ্গদেশে মোগলদের প্রধান বন্দর হুগলী পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে হুগলী খুব বড় শহর হইলেও সুসংবদ্ধ নহে; মোগল সম্রাটের 'ফুরজা' (Custom House) এইস্থানে অবস্থিত এবং বঙ্গদেশের যাবতীয় দ্রব্য আমদানী বা রপ্তানী হুগলী বন্দর হইতেই হয়। তিনি লিখিয়াছেন:

"Hooghly is a town of a large extent, but ill built. It reaches about two miles along the river's side from the Chinchura before mentioned. The Bandel, a colony formerly settled by the Portuguese but the Mughul's Fouzdar govern both at present. This town of Hughly drives a great trade because all foreign goods are brought thither for import and all goods of the product of Bengal are brought hither for exportation, and the Moguls Furza or Custom House is at this place."

* Grants Analysis, V-II. Page 182.
† Stewart's History of Bengal, Page 235.

১৭২২ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ বঙ্গদেশের রাজস্বের তৃতীয় হিসাব প্রস্তুত করেন। তিনি ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্য সুজার ৩৪টি সরকারের পরিবর্ত্তে বঙ্গদেশকে ১৩টি 'চাকলায়' ও ১৬৬০টি পরগণায় বিভক্ত করেন। * উক্ত সময় হইতেই মহালগুলি 'পরগণা' নামে অভিহিত হইতেছে; তিনি হিন্দু জমিদারদিগের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া, তাহাদিগকে নিজের অধীন করিয়াছিলেন এবং কোন হিন্দু জমিদারের রাজস্ব বাকী পড়িলে, তিনি যেরূপ অত্যাচার করিতেন ইতিহাসে তাহা অতুলনীয়। তিনি মলমূত্রাদিপূর্ণ একটি পুষ্করিণীকে 'বৈকুণ্ঠ' বলিয়া অভিহিত করিতেন এবং কোন হিন্দু জমিদার সময়মত রাজস্ব দিতে না পারিলে, তাহাকে উক্ত কুলিখাঁর 'বৈকুণ্ঠ' দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হইত। মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের এই ধরণের অত্যাচার তৎকালে প্রায়ই হইত এবং তৎকালীন গ্রন্থাদিতেও এইরূপ বিবরণ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে বিজয়গুপ্তের 'পদ্মপুরাণ' হইতে দুই পঙক্তি উদ্ধৃত হইল:

কুলি খাঁর রাজস্ব বিভাগ

"ব্রাহ্মণে পাইলে লাগে পরম কৌতুকে।
কার পৈতা ছিঁড়ি ফেলে থুতু দেয় মুখে॥"

হিন্দু প্রজা যথা সময়ে কর দিতে অপারগ হইলে, মুসলমান শাসনকর্ত্তা ইচ্ছা করিলে প্রজার মুখের মধ্যে থুতু দিতে পারিবেন; এবং হিন্দু প্রজা ইসলাম ধর্ম্মের সমুজ্জল মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য, মুখে থুতু লইতে বাধ্য থাকিবেন, এইরূপ ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ আইনও তৎকালে প্রচলিত ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। মহামতি আকবরের সময় এই বর্ব্বরোচিত হিন্দু-বিদ্বেষমূলক আইন রহিত হয়।

"When the Collector or the Dewan asks them (i.e. the

* Verselst's A view of the English Government in Bengal Vol I, Page 216.
Grant's Analysis. Vol II, page 183.

Hindus) to pay the tax, they should pay it with all humility and submission. If the collector wishes to spit into their mouth, they should open their mouth without the slightest fear of contamination so that the collector may do so. The object of such humiliation and spitting into their mouths is to prove the obedience of the infidel subjects under protection and promote, if possible, the glory of the Islam the true religion and to show contempt to false religions." *

মুসলমান রাজত্বকালে বঙ্গদেশ এক প্রকার হিন্দুদের দ্বারাই শাসিত হইত ; আবুল ফজল লিখিয়াছেন যে, তৎকালে বঙ্গদেশ চব্বিশটি 'সরকার' এবং সাতশত সাতাশীটি মহালে বিভক্ত ছিল। এই স্থানের ভূস্বামী সকলেই কায়স্থ ছিলেন এবং রাজস্ব বাবদ উনষাট কোটী চুরাশী লক্ষ উনষাট হাজার তিন শত উনিশ 'দাম' (অর্থাৎ ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৬১ হাজার ৪ শত ৮২ টাকা) আদায় হইত। তাহাদের সৈন্য সংখ্যা তেইশ হাজার তিন শত ত্রিশ জন অশ্বারোহী এবং আশী হাজার, এগার শত পঞ্চাশ পদাতিক ও এগার শত সত্তর হস্তি এবং চারি হাজার চারি শত নৌকা ছিল বলিয়া জানা যায়। এই সম্বন্ধে 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত আছে :

"The Subah of Bengal consists of twenty four Sarkars and seven hundred eightyseven Mahals. The revenue is fifty nine crores eihty four lacs and fifty nine thousand three hundred nineteen dams in money. The Zeminders were all Kayasthas. The troops number twenty three thousand three hundred and thirty cavalry and eighty thousand eleven hundred fifty infantry and eleven hundred seventy elephants and four thousnd four huundred boats." †

কুলি খাঁর সময়ে বঙ্গদেশের কেবল যে যথেষ্ট রাজস্ব-বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহা নহে, বহু হিন্দুও তাহার অত্যাচারে অত্যাচারিত হইয়া হিন্দু সমাজে আর স্থান না পাওয়ায়, দায়ে পড়িয়া মুসলমান হইয়াছিল।

* 'Akbar' By Von Noha, Page 271.
† 'Ain-i-Akbari' By Col : H. S. Jarrett. Vol. II, Page 129.

কুলি খাঁ স্বয়ং ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়া, হিন্দুদের যে কি অনিষ্ট-সাধন করিয়া ছিলেন তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। যাহা হউক মুর্শিদকুলি খাঁর আমলের 'চাকলা' বিভাগগুলিকে, বর্ত্তমান বঙ্গদেশের জেলা বিভাগগুলির মূল ভিত্তি স্বরূপ এক প্রকার বলা যাইতে পারে।

ইংরাজ অধিকার

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে নবাব মিরকাশিম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে চাকলা বর্দ্ধমান, চাকলা মেদিনীপুর ও চাকলা ইসলামাবাদ (বর্ত্তমান নাম চট্টগ্রাম) প্রদেশের সকল অধিকার ছাড়িয়া দিলে, এই স্থানত্রয়ে সর্ব্বপ্রথম ইংরাজাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। *

"5. For all charges of the company and of the said Army and provisions for the field etc., the lands Burdwan, Midnapur and Chittagong shall be assigned and Sunnad for that purpose shall be written and granted. The company is to stand to all losses and receive all the profits of these three countries and we will demand no more than the three assignments aforesaid." †

ইংরাজ অধিকারের প্রথম হইতেই হুগলী জেলা সেই জন্য বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল; ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর ছত্রিশ বিধানানুযায়ী Regulation XXXVI of 1795 বর্দ্ধমানকে দুই ভাগে বিভাগ করিয়া, উত্তর বিভাগ বর্দ্ধমান এবং দক্ষিণ বিভাগ হুগলী বলিয়া দুইটি পৃথক জেলা গঠিত হয়। বর্দ্ধমান পৃথক জেলা হইলেও, বর্দ্ধমান বিভাগের প্রধান নগর অদ্যাপি চুঁচুড়ায় অবস্থিত আছে এবং বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার এই স্থানে বাস করেন। বর্দ্ধমান বিভাগ বাঙ্গলার পশ্চিম প্রান্তে; এবং ইহার পরই বিহার প্রদেশ আরম্ভ হইয়াছে। বর্দ্ধমান বিভাগের মধ্যে বর্ত্তমানে (১) বর্দ্ধমান, (২) হুগলী, (৩) হাওড়া, (৪) মেদিনীপুর, (৫) বাঁকুড়া এবং (৬) বীরভূম এই ছয়টি জেলা আছে।

* Verselst's A view of the English Government in Bengal Vol I, Page 216.

† Grant's Analysis. Vol II, Page 188.

পঞ্চম অধ্যায়

সিংহ ও সেন বংশ

ভগবান বুদ্ধদেব অশীতিবর্ষ বয়সে ৪৮৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে কুশীনগরে যে বৎসর দেহত্যাগ করেন, সেই বৎসরই বঙ্গদেশের রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহ সিংহল দ্বীপ অধিকার করেন। এই সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন :

"আমাদের ছেলে বিজয় সিংহ হেলায় লঙ্কা করিয়া জয়।
সিংহল নাম রেখে গেছে নিজ শৌর্য্যের পরিচয়॥"

রাজা সিংহবাহু রাঢ়দেশান্তর্গত শত যোজন ব্যাপী এক জনপদ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার 'সিংহপুর' নামকরণ করেন। রাঢ়ের সিংহপুর বর্ত্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত 'সিঙ্গুর' বলিয়া ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; ইহার সম্বন্ধে পৃথক অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইবে।

সিংহপুর

সেন-রাজ বিজয় সেন বিক্রমপুর অধিকারের পূর্ব্বে বর্ম্মরাজবংশের অভ্যুদয় হয়। * প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন "যে সময়ে বরেন্দ্র বা গৌড়ে পাল বংশ, বঙ্গে চন্দ্র বংশ ও রাঢ়ে শূর বংশ আধিপত্য করিয়াছিল, সেই সময়েই প্রথিত বর্ম্ম বংশের অভ্যুদয় হয়।" এই বর্ম্ম বংশের সম্বন্ধে সম্প্রতি ঢাকা জেলার মহেশ্বরদি পরগণার বেলাব গ্রামে যে তাম্র শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, বর্ম্ম রাজ বংশ সিংহপুর হইতে আসিয়া বিক্রমপুরে রাজত্ব করেন।

"The Varmans who ruled over Vikrampura for only a a short period came originally from Sinhapur."

এই তাম্রশাসন খানি ভোজ-বর্ম্মদেবের 'বেলাব-লিপি' (The

* বিক্রমপুরের ইতিহাস (২য় সংস্করণ)—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

Belabo Copper Plate) বলিয়া প্রসিদ্ধ ; ইহা হইতে ভোজ বর্ম্ম পশ্চিম বঙ্গের সিংহপুর হইতে বিক্রমপুরে যাইয়া রাজত্ব করেন, তাহাই আবিষ্কৃত হইয়াছে।

"About this time probably occurred a migration of people from West to East Bengal and in the Belava Plate we find Jatavarma's grandson Bhojavarma ruling at Vikrampur.' *

এই তাম্রশাসন খানির পাঠোদ্ধার ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক সর্ব্বপ্রথম সম্পাদন করেন এবং তিনি সিংহপুরের অবস্থান সম্বন্ধে মহাবংশে উল্লিখিত 'সিংহপুর' (Sinhapur) বা 'সিংহপুরকে' রাঢ়ার অন্তর্গত স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। † এই তাম্রশাসনখানিতে সংস্কৃত ভাষায় প্রথম পৃষ্ঠায় ২৬ পঙক্তি এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ৩৫ পঙক্তি উৎকীর্ণ আছে। ইহার আয়তন ১০$\frac{1}{8}$ × ৯$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি ; "ওঁ সিদ্ধি" বলিয়া আরম্ভ হইয়াছে এবং অক্ষরগুলি একাদশ শতাব্দীর 'বঙ্গাক্ষর' বলিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নিম্নে নবম পঙক্তিতে যাহা উৎকীর্ণ আছে, তাহা উদ্ধৃত হইল :

"৯—শ্লাঘ্যৌ ভূজৌ বিভ্রতো
ভেজু সিংহপুরং গুহামিব মৃগেন্দ্রাণাং হরে র্বান্ধবাঃ ॥"

অর্থাৎ বর্ম্মা উপাধিধারী অতি গভীর নাম এবং শ্লাঘ্য বাহুযুগল ধারণ করিয়া তাহারা সিংহ-বিবর-তুল্য সিংহপুর নামক স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

ডক্টর নলিনী কান্ত ভট্টশালী মহাশয় বর্ম্ম-রাজবংশের যেরূপ বংশ তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পরপৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইল।

---

* The Indian Hstorical Quarterly Vol-VII No3. Sep 1931

† The History of North Eastern India By Dr R. G. Basak.

১। বজ্রবর্ম্ম
|
২। জাতবর্ম্ম
|
৩। সামল বর্ম্ম
|
৪। ভোজবর্ম্ম
|
৫। জ্যোতিবর্ম্ম
|
৬। হরি বর্ম্ম
|
৭। তাঁহার অনামক পুত্র

তিনি বলিয়াছেন "The dynasty perhaps came to an end with the son of Hariburman and the sovereignty of Vikrampura passed into the hands of the Sena Kings." *

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে পাল রাজ বংশের প্রভাব হ্রাস হয়, এবং বর্ম্ম নৃপতিরা, কাম্বোজ নৃপতিরা ও সেন নৃপতিরা যে সর্ব্বপ্রথম রাঢ়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা সুনিশ্চিত। ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক, ডক্টর দীনেশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ 'সিংহপুরকে' রাঢ়ের অন্তর্গত স্থান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং আমরাও তাঁহাদের সহিত এই বিষয়ে একমত। সিংহপুর যে বর্তমান সিঙ্গুর তাহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এবং ভবিষ্যতে এই বিষযে আরো প্রমাণ আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া আশা রাখি। সিঙ্গুরের অন্যান্য বিবরণ যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।

বাঙ্গলার সেন রাজ-বংশ কোন সময়ে বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাহা

---

* The Dacca Review, Vol II, No 4, July 1912.

সঠিক জানিবার উপায় নাই। স্বর্গীয় রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বিজয় সেনই সেন-রাজ-বংশের প্রথম স্বাধীন নরপতি। তিনি প্রথমে রাঢ় দেশের অংশ বিশেষের এবং পরে সমগ্র রাঢ় দেশের অধিপতি হইয়াছিলেন। উৎকল-রাজ অনন্ত বর্ম্মা চোড়গঙ্গ যখন গৌড় রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন বিজয় সেন পাল-বংশীয় গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। তাহার পিতার নাম হেমন্ত সেন ; বিজয় সেন ১১০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। পাল বংশীয় রাজাগণের সহিত সেন বংশীয় রাজাগণের সদ্ভাব ছিল না ; কারণ রামপাল যখন দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়া সাহায্যার্থে সেন রাজগণের নিকট আসিয়াছিলেন, তখন ইহারা তাহাদিগকে সাহায্য করেন নাই। বিজয় সেনই সেন-রাজ বংশের প্রধান নৃপতি এবং তাঁহার সময় হইতেই সেন-রাজ্য বিস্তৃত হয়। দেবপাড়া লিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি বরেন্দ্রভূমি স্বীয় করতলগত করিয়া গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করেন, অতঃপর কামরূপাধিপতিকে এবং কলিঙ্গ নৃপতিকেও দমন করিয়া, পরে মিথিলার রাজাকে দমন করেন।

বিজয় সেন

"The real founder of the Sena Kingdom was Hemanta Sen's son Vijayasena who reigned from about 1100 to 1165. His wife was a members of the Sura family, and this all iance mayhave increased his prestige. He defeated Navya and Vira, attacked the lord of Gauda, humbled the King of Kamrupa. protected the King of Kalinga, made many lessor rulers captive and sailed his fleet up the Ganges. Vijayasena found Pala territory divided up among a number of petty dynasties of which till his time the Sens had themselves been one." *

* Cambridge Shorter History of India By H.H. Dodwell.

বিজয়সেনের বহু নৌবিতান ছিল এবং 'সেকশুভোদয়ে' লিখিত আছে যে, প্রত্যহ তিনি শিবপূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। তিনি নিজ নামানুসারে "বিজয়পুর" নামক একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন। 'গৌড়ের ইতিহাস' প্রণেতা স্বর্গীয় রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন যে "বিজয় সেন ভূরসুটে বিজয়পুর নামক নগর প্রতিষ্ঠা করেন" কিন্তু "বাঙ্গলার ইতিহাস" লেখক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার "বিজয়পুর ত্রিবেণীর নিকটে অবস্থিত ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন" এবং 'পবনদূতে'ও ইহা ত্রিবেণীর সন্নিকটে বলিয়া লিখিত আছে। কেহ কেহ রাজসাহীর নিকটবর্ত্তী 'বিজয়নগর' গ্রামকেও প্রাচীন বিজয়পুর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। * কিন্তু বিজয়পুর নগর যে রাঢ়ে ছিল, সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সেন এবং শ্রীহেমচন্দ্র চৌধুরী ত্রিবেণীর নিকট বিজয়পুর ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বিজয়পুর

"সামন্তসেনের পৌত্র বিজয় সেন শূর বংশের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বাঙ্গলায় প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। গৌড়ের পালরাজকে পরাজিত করিয়া তিনি একে একে তীরভুক্তি (উত্তর বিহার) কামরূপ (আসাম) ও কলিঙ্গের অর্থাৎ উড়িষ্যা ও উত্তর মাদ্রাজ প্রদেশের রাজগণকে পরাভূত করেন এবং ত্রিবেণীর সন্নিকটে বা উত্তরে 'বিজয়পুর' নামে নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া সেইখানে তাহার রাজধানী স্থাপন করেন।" †

"This city Vijayápura stood on the banks of the Ganges in or near the world sanctfiying country (Desam—Jajati Pavanam) where the Jamuna (Tapan Tanaya) stands off

---

* ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৩শ সংস্করণ)—সেন ও রায়চৌধুরী।

‡ 'প্রবাসী' পত্রে স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ ১৩১৯সাল, শ্রাবণ মাস। বিক্রমপুরের ইতিহাস (২য় সংস্করণ), পৃঃ ২৫২

from the Bhagirathi. This undoubtedly points to the region of Triveni in the Northern part of the Hoogly district." *

ত্রিবেণী এবং সপ্তগ্রাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং সপ্তগ্রামই উক্ত সময়ে বাণিজ্য সম্বন্ধ রক্ষার একমাত্র স্থান এবং ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ নগর ছিল। সপ্তগ্রামের একাংশই যে বিজয়সেনের 'বিজয়নগর' ছিল তাহা সুনিশ্চিত কারণ 'দেবপাড়া লিপি' হইতে তাঁহার বহু নৌবহর ছিল জানিতে পারা যায় এবং তৎকালে সপ্তগ্রাম ব্যতীত বঙ্গের আর কোন স্থানেই রাজকীয় বন্দর ছিল না। এই সম্বন্ধে রেভারেণ্ড লংসাহেব লিখিয়াছেন :

"Many years ago Satgaon the Royal Emporium of Bengal from the time of Pliny down to the arrival of the Portuguese in this country.........." †

নিম্নে বিজয় সেনের 'দেবপাড়া লিপি' হইতে দ্বাবিংশতি শ্লোকটি উদ্ধৃত হইল :

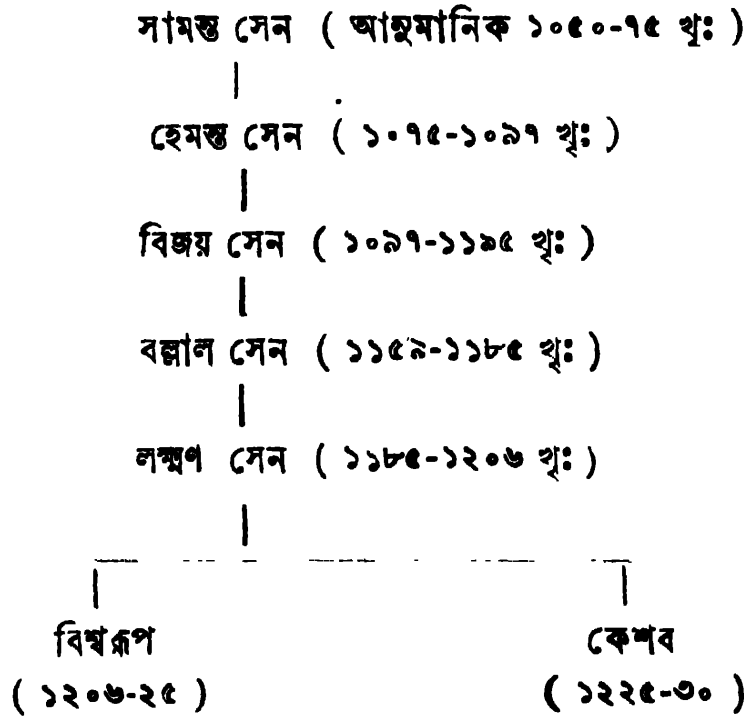
"পাশ্চাত্য জয়চক্র কেলিষু যস্য যাবদ্
গঙ্গা প্রবাহ মনুধাবতি নৌ বিতানে
ভর্গাস্য মৌলিসরিদম্ভাসি ভস্মপঙ্ক
লগ্নোজ্ঝিতেব তরিরিন্দুকলা চকাস্তি ॥২২॥"

অর্থাৎ যাহার নৌবহর পাশ্চাত্য রাজচক্রের জয়রূপ কেলিক্রিয়াতে গঙ্গা-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে অনুধাবন করিলে পর শিবের মস্তকস্থিত নদী গঙ্গার জলে ভস্ম-পঙ্কে লগ্ন লইয়া পরিত্যক্ত ইন্দুকলার ন্যায় তরীসমূহ শোভা পাইতেছিল।

* The History of Bengal Vol. I, By Dr. R.C. Mazumder.
† Calcutta Review, 1846.

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে তিনি পরলোকগমন করেন এবং বিলাস দেবী গর্ভজাত পুত্র বল্লাল সেন, তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। বর্ত্তমানে সেন রাজগণের বংশলতা যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি :

সেন রাজবংশের তালিকা



বিজয় সেনের পর তাঁহার পুত্র বল্লাল সেন রাজা হন ; তিনি পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন এবং বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে কৌলিন্ত প্রথা প্রবর্ত্তন করায় ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন।

বল্লাল সেন

বল্লাল সেন শাসন-দক্ষ নৃপতি ছিলেন এবং বাঙ্গলার কোন নৃপতি তাঁহার ন্যায় প্রসিদ্ধ হন নাই। কথিত আছে, শাসন-কার্য্যের সুবিধার জন্ত তিনি বঙ্গদেশকে রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বাগড়ি, মিথিলা এই পাঁচভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক ভাগে এক একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। লক্ষ্মণ সেন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পূর্ব্ব-বঙ্গের ভার পান। পূর্ব্ব হইতে গৌড়-রাজ্য রাঢ়, বঙ্গ, পুণ্ড্র ও উপবঙ্গ এই কয়টি ভাগে

বিভক্ত ছিল। * তুর্কিগণ কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বল্লাল সেন কর্তৃক পূর্ব্বোক্ত বিভাগ যে অব্যাহত ছিল, তাহা সুনিশ্চিত। এই বিভাগ সম্বন্ধে ব্রকম্যান সাহেব যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

1. Barendra -bounded by the Mahanda on the west; by Padma or great branch of the Ganges on the south; by the Korotoya on the East by the adjacent Governments on the north.

2. Banga—or the territory east from Korotoya towards the Brahmaputra. The capital of Bengal both before etc, afterwards...........in the province of Banga, the name is said to have been communicated to the whole.

3. Bagri—or the Delta called also Dwipa, or the island bounded, on the one side by the padma, or the great branch of the Ganges; on another by sea and other bounded by the hughli river or Bhagirathi.

4. Rarhi—bounded by the Hugli and Padma on the north and east and by adjacent Kingdoms on the west and south.

5. Mithila—bounded by the Mahanda and Gaur on on the east, the Hughly or Bhagirathi on the south and on the west. †

বল্লাল সেন প্রতি ছত্রিশ বৎসর অন্তর কুলীনদের নির্ব্বাচন হইবে এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন; তাহাতে অকুলীন সদাচারী ব্যক্তি পুনরায় কৌলিন্যের অধিকারী হইতে পারিবেন এবং কৌলিন্যপ্রাপ্ত দুঃশীল ব্যক্তিও কৌলিন্যভ্রষ্ট হইতে পারিবেন এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে নির্ব্বাচনের সময়ে কৌলিন্য লইয়া

---

* গৌড়ের ইতিহাস—শ্রীরজনী কান্ত চক্রবর্ত্তী

† Hamiltion's Hindusthan. Vol I. No. I.

গণ্ডগোল উপস্থিত হওয়ায়. নির্ব্বাচন-প্রথা রদ হয় এবং কৌলিন্য বংশানুগত হইবে ইহা স্থির হয়। কৌলিন্য সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে। নিম্নোক্ত গুণের উপর তখন কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রদত্ত হয় :

আচারো বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম।
নিষ্ঠা বৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম ॥

বল্লাল সেন প্রদত্ত 'কৌলিন্য' ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের মধ্যে প্রায় সাতশত বৎসর যাবৎ বঙ্গদেশে অপ্রতিহত ছিল ; বর্ত্তমানে এই প্রথার কিঞ্চিৎ শৈথিল্য ঘটিয়াছে। কৌলিন্য-প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ যে সকল গ্রামে বসবাস করেন, পরবর্ত্তীকালে সেই সকল ব্রাহ্মণদের নামানুসারে 'গাঞী' সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ; এই গ্রামগুলির বর্ত্তমান নাম কিঞ্চিৎ বিকৃত হইলেও, প্রায় সমস্ত গুলিই রাঢ় দেশের অন্তর্ভুক্ত থাকায় 'বিজয়পুর' যে রাঢ়ের মধ্যে ছিল, তাহাই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়।

"ঘোষ বসু দত্ত মিত্র এই চারিজন।
দ্বিজাজ্ঞায় সপ্তগ্রামে রহিল তখন ॥"

ঘোষ বংশ আকনা গ্রামে, বসু বংশ মাহীনগরে, দত্ত বংশ বালী গ্রামে এবং মিত্র বংশ বড়িশায় বসবাস করেন ; এই গুলি সমস্তই সপ্তগ্রামের অন্তর্গত ছিল।

বল্লাল সেন প্রতিভাশালী ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন ; তল্লিখিত "দানসাগর" ও "অদ্ভুতসাগর" গ্রন্থ তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। "সেন রাজাগণ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন ; এই বংশটি দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট দেশ হইতে বাঙ্গলায় আগমন করিয়াছিল। সামন্ত সেন নামক এক ব্যক্তির অধিনায়কত্বে ইহারা পশ্চিম-বঙ্গে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।" *

* ভারতবর্ষের ইতিহাস (১ম সংস্করণ)—হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী ও সুরেন্দ্রনাথ সেন।

বিজয় সেনের "দেওপাড়া লিপি" হইতে এই রাজ বংশ "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" অর্থাৎ কায়স্থ ছিল বলিয়া জানা যায়। * নিম্নে পঞ্চম শ্লোকটি উদ্ধৃত হইল :

"তস্মিন্ সেনান্বয়ে প্রতি সুভটশতোৎসাদন ব্রহ্মবাদী
স ব্রহ্মক্ষত্রিয়ানামজনি কুল শিরোদাম সামন্ত সেনঃ।
উদ্গীয়ন্তে যদীয়াঃ স্খলদুদধিজলোল্লশীতেষু সেতোঃ
কচ্ছান্তেষপ্সরোভি র্দশরথতনয় স্পর্দ্ধয়া যুদ্ধগাথাঃ ॥"

অর্থাৎ শত শত শ্রেষ্ঠ প্রতিযোদ্ধার উন্মূলন করিয়া পারদর্শী ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণের কুলশেখর, সামন্ত সেন নামক ব্যক্তি সেই সেন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—দশরথ-তনয় রামচন্দ্রের তুলনায় যাঁহার যুদ্ধগাঁথা, সেতুবন্ধের স্খলদ জলধিজলের উত্তাল তরঙ্গ সম্পর্কে শীতল কচ্ছ প্রদেশ সমূহে অপসরোগণ কর্ত্তৃক উচ্চৈস্বরে গীত হইত।

"আদৌ ব্রাহ্মণঃ পশ্চাৎ ক্ষত্রিয় ইতি—ব্রহ্মক্ষত্রিয়" † স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ 'বঙ্গের সেন রাজগণের জাতি' নামক প্রবন্ধে ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণের উৎপত্তি নিম্নোক্ত তিন রকমে হইয়াছিল বলিয়া লিখিয়াছেন। যথা—

(১) ক্ষত্রিয়গণের ব্রাহ্মণরূপে পরিচয় দ্বারা
(২) ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তান এবং
(৩) ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম গ্রহণ করা।

ব্রহ্মক্ষত্রিয় জাতি মূলতঃ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তবে বঙ্গদেশে আসিয়া তাহারা চিত্রগুপ্ত বংশীয় লিপি-ব্যবসায়ী কায়স্থ সমাজে মিশিয়া গিয়াছিলেন। বঙ্গের রাজবংশগুলি যে তাহাদের রাজ্য-লোপের সঙ্গে সঙ্গেই এদেশ হইতে চলিয়া গিয়াছে, কিম্বা একেবারে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহা মনে করা সুকঠিন। পাল বংশ ও বর্ম্ম বংশ খুব সম্ভবতঃ কায়স্থ

* ব্রহ্মক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ শ্রেণীর ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধা।

† Indian Antiquary, 1911, Page 29.

জাতিতে আত্মগোপন করিয়াছে এবং সেন বংশ কায়স্থ ও বৈদ্য এই উভয় জাতির মধ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে।

অধুনা সেন বংশের জাতি লইয়া কেহ কেহ বিতর্ক উপস্থিত করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, যাঁহারা সেন রাজগণকে কায়স্থ বলিয়া দাবী করেন, তাহাদের কথাও উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এই উভয় জাতি এক বৃক্ষের দুইটি শাখা ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং এই উভয় জাতির অধিকাংশই যে ব্রাহ্মণ জাতি হইতে উৎপন্ন তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

হুগলী জেলার ত্রিবেণী তীর্থ পর্য্যন্ত বল্লাল সেনের অধিকারভুক্ত ছিল বলিয়া ধোয়ী কবি রচিত 'পবনদূত' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে। *

বল্লাল সেন প্রথমে শৈব ছিলেন কারণ তাঁহার আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে "ওঁ নমঃ শিবায়ঃ" বলিয়া তিনি সর্ব্বাগ্রে মহাদেবের বন্দনা করিয়াছেন। The record opens with the auspicious formula *Om Om Naman Sivaya* followed by an invocation to Siva as Ardha-Nariswara. † সেন রাজাগণের সময়ে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির অর্চ্চনা বঙ্গদেশে নানাস্থানে প্রচলিত ছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। **

তিনি হিন্দু, ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন; এবং মগধ, ভুটান চট্টগ্রাম আরাকান, উড়িষ্যা ও নেপালে হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারক প্রেরণ করেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি সিংহগিরি নামক এক ব্যক্তির প্ররোচনায় তান্ত্রিক মতাবলম্বী

---

* J. A. S. of Bengal, 1902. Pages 44 & 58.

† Inscription in Bengal by Nani Gopal Majumdar, Page-69

** বিক্রমপুরের ইতিহাস, ১মখণ্ড —শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত পৃষ্ঠা—২৭৭

হইয়াছিলেন। ১১৮৫ খৃষ্টাব্দে বল্লাল সেনের লোকান্তর হয়; তাহার মৃত্যুর পর লক্ষ্মণ সেন রাজা হন।

"The Hinduism of Ballal Sen was of Tantric kind. The Brahman genealogists assert that he sent numerous missionaries, to Magadha, Bhotan, Chittagong, Arakan Orissa and Nepal." *

লক্ষ্মণ সেন দানশীল ও মহৎ রাজা ছিলেন; তাঁহার রাজত্ব কালের তপনদীঘি, সুন্দরবন, আনুলিয়া, মাধাইনগর, শক্তিপুর, এবং গোবিন্দপুরের তাম্রশাসন অবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত তাম্রশাসনগুলি হইতে তিনি প্রথম বয়সে শৈব এবং শেষ বয়সে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া জানা যায়। এই গুলিতে তিনি "পরম বৈষ্ণব", "পরম নরসিংহ" প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত হইয়াছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়। মাধাইনগর তাম্রশাসনখানি 'বীর্য্যগ্রাম পরিসর সমাবাসিত' স্থান হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল এবং ইহাতে তিনি "গৌড়েশ্বর" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। অন্যান্য শাসনগুলি বিক্রমপুরের 'জয়স্কন্ধাবার' হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। †

লক্ষ্মণ সেন

লক্ষ্মণ সেন পরাক্রমশালী নৃপতি, কবি, পণ্ডিত ও বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। হলায়ুধ তাঁহার ধর্ম্মাধিকারী ছিলেন এবং তিনি "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার সভায় গোবর্দ্ধনাচার্য্য, শরণ, জয়দেব, উমাপতিধর, ধোয়ী কবিরাজ এই পঞ্চ-রত্ন বিরাজ করিত। **

"গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতি।
কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষণস্যচ॥"

* Early History of India by V.A. Smith. Page, 403,

† বিক্রমপুরের ইতিহাস—পৃষ্ঠা ২৮৫

** Jowrnal of the Asiatic Society Bengal, 1896.

তাঁহার অমাত্য বটুদাসের পুত্র, শ্রীধর দাস কর্ত্তৃক সংগৃহীত "সদুক্তি কর্ণামৃতে" লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে রচিত বহু কবির শ্লোক দৃষ্ট হয়। শিল্পকলায় গৌড় তৎকালে শীর্ষস্থানে উঠিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। ধনুর্ব্বিদ্যায় লক্ষণ সেনের অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল এবং তাঁহার নিক্ষিপ্ত শর অপর তীরে যাইয়া পড়িত বলিয়া 'সেকশুভোদয়ে' লিখিত আছে।

লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' এবং ধোয়ী কবির 'পবনদূত' বিরচিত হইয়াছিল। তিনি কালিদাসের 'মেঘদূতে'র অনুকরণে 'পবনদূত' রচনা করেন। উহার আখ্যানভাগে, লক্ষ্মণ সেন দিগ্বিজয় করিতে যাইয়া ভারতের দক্ষিণ ভাগে মলয় পর্ব্বতে যাইয়া উপস্থিত হন, তথায় কুলয়াবতী নামক এক গন্ধর্ব কন্যা লক্ষ্মণ সেনের অপরূপ লাবণ্য ও শৌর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, তিনি পবনকে দূত করিয়া লক্ষ্মণ সেনের নিকট পাঠাইয়াছিলেন ও পথের নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন।

পবনদেব এই দৌত্য স্বীকার করিয়া মলয় পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া বহু পথ অতিক্রম পূর্ব্বক বৈদ্যবাটীর নিকট গঙ্গাতীরে উপনীত হন ; তথা হইতে গঙ্গার তীর দিয়া উত্তরমুখে অগ্রসর হইয়া ত্রিবেণী পশ্চাতে রাখিয়া বিজয়পুর নগরে উপস্থিত হন বলিয়া ঐতিহাসিকগণ ত্রিবেণীর নিকটে বিজয়পুর অবস্থিত ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে ঐতিহাসিকগণের মতামত উল্লেখ করিয়াছি।

'পবনদূতে' সুহ্মের একটি বর্ণনা আছে, নিম্নে তাহার কিয়দংশ বঙ্গানুবাদ করিয়া উল্লিখিত হইল :

"গৌড় দেশ মহাদেবের নগর শ্বেত অট্টালিকা বলিতে কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় শোভাবান ; সেখানে গঙ্গানদীর তীরে অর্দ্ধগৌরীশ্বর মূর্ত্তি বিরাজমান। মহাদেবের ক্ষেত্র হইতে গঙ্গা অল্প দূরস্থ।" *

* মঃ মঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত প্রবন্ধ, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—১৩০৫ সাল।

"The literature seems to have flourished at his court, the most notable names being those of Jayadeva, author of the Gitagovindo, Halayudha and Dhoyi, author of the Pavanduta, an imitation of the celebrated Meghduta." *

লক্ষ্মণসেন পিতৃ প্রবর্ত্তিত কুলবিধির উৎসাহদাতা ছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বকালে তিনি খলিফাদিগের ন্যায় ধর্ম্মজগতের নেতা ছিলেন এবং তাঁহার বিচারে কেহ কোন দিন অবিচার লাভ করেন নাই। এই সম্বন্ধে ভিনসেণ্ট স্মিথ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে।

"His (Lakshman Sena) family, we are told, was respected by all the Rais or Chiefs of Hindusthan and he was considered to hold the rank of hereditary Khalif or spiritual head of the country. Trustworthy persons affirmed that no one, great or small ever suffered injustice at his hands, and his generosity was proverbial."†

লক্ষ্মণসেন বিক্রমপুরে যাইয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজের সমীকরণ করেন এবং ১২০৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলে, তাহার পুত্র মাধব সেন রাজা হন এবং সম্ভবতঃ তিনি উক্ত স্থানে দশ বৎসর রাজত্ব করেন।

লক্ষ্মণসেনের পলায়ন কাহিনী, মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ কর্ত্তৃক রচিত "তকবাৎ-ই-নাসেরী" গ্রন্থকে ভিত্তি করিয়া যাঁহারা এই বীরকে এবং হিন্দুগণের নাম কলঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা ঐতি-

* The Cambridge Shorter History of India.

† Early History of India by V. A. Smith.

হাসিকবৃন্দ কর্ত্তৃক গবেষণা দ্বারা বর্ত্তমানে অমূলক বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা লইয়া আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই আমার ধারণা; তথাপি যদি কেহ এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় বলিতে হয়— "সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বক্তিয়ার খিলজী বাঙ্গলা জয় করিয়াছেন, এ কথা যে বাঙ্গালী বিশ্বাস করে— **সে কুলাঙ্গার।"** *

তাঁহার রাজত্বকালে "লক্ষ্মণাব্দ" বা "লক্ষ্মণ সংবৎ" বলিয়া একটি নূতন অব্দ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল এবং ইহা তাহার রাজ্যাভিষেকের সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তৎকালে বঙ্গদেশ কিরূপ বিলাসে মগ্ন ছিল, তাহা প্রমাণার্থ 'পবনদূত' এবং কেশব সেনের ইদিলপুর তাম্রশাসন হইতে নিম্নে কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল :

"লক্ষ্মণসেনের সময় বঙ্গের রাজধানীর রাজপথ সায়ং কালে বার-বিলাসিনীগণের মঞ্জীর নিক্কণে চমকিত হইত। নিশীথে স্বেচ্ছাবিহারিণী অভিসারিকাগণের অব্যাহত গতিতে মুখরিত হইত; প্রেমলিপ্সু কামিনী-গণের প্রেমালাপে সমস্ত বিভাবরী উদ্‌ভ্রান্ত হইত।"

১১৯৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে সুহ্মদেশ মুরারি শর্ম্মা কর্তৃক শাষিত হইত এবং সপ্তগ্রামে তাঁহার রাজধানী ছিল।

মুরারি শর্ম্মা।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, তল্লিখিত ধোয়ী কবির 'পবনদূত' নামক প্রবন্ধে "গঙ্গা বীচি বিপ্লুত পরিসরঃ সৌধমালাবতংশো" † দেখিয়া উক্ত স্থানকে তিনি সপ্তগ্রাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কারণ তৎকালে রাঢ়ে গঙ্গাতীরে সপ্তগ্রাম ব্যতীত আর কোন সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল না।

---

* "বঙ্গদর্শন" ১২৮৭ সাল, অগ্রহায়ণ।

† সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩০৫ সাল, পৃষ্ঠা ১৯৩।

মুরারিশর্ম্মা লক্ষ্মণসেনের অভীষ্টদেব ছিলেন। এই সম্বন্ধে 'পবনদূতে' যাহা লিখিত আছে, তাহার কয়েক পঙক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :

"তস্মিন সেনান্বয়ন পতিনা দেবরাজ্যা ভিষক্তা।
দেবঃ সুহ্মাদ বসতি কমলা কেলী কারো মুরারিঃ ॥
পানৌ লীলাকমল সুহৃদ সৎসমীপে বহন্ত্যো।
লক্ষ্মীশঙ্কাং প্রকৃতি সমগাঃ কুর্ব্বন্তে বাররামাং ॥"

অর্থাৎ সেখানে সেনবংশীয় নরপতির ইষ্টদেবতা মুরারি শর্ম্মা দেবরাজ্যে অভিষিক্ত এবং তিনি সুহ্মদেশেই বসবাস করেন। সেখানকার বার-বামাগণের হস্তে সকল সময়েই লালকমল বিরাজ করে এবং তাঁহাদিগকে দেখিলে নারায়ণের লক্ষ্মী বলিয়া ভ্রম হয়।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাধিকার শেষ হয় এবং তাহার পর শত বৎসর সপ্তগ্রামে হিন্দুগণ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে জাফর খাঁ সপ্তগ্রাম আক্রমণ করেন এবং তুমুল যুদ্ধের পর সপ্তগ্রামের হিন্দু দুর্গে তিনি আপনার বিজয় পতাকা উড়াইয়া সপ্তগ্রাম দখল করেন। ১৩১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি সপ্তগ্রাম শাসন করেন, পরে ভুদিয়ার রাজার সহিত যুদ্ধে নিহত হন।

"In the early period of the Mahomedan rule Satgaon was the seat of the Governors of lower Bengal and a mint town. It was also a place of great commercial importance." *

সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পৃথক অধ্যায়ে যথাস্থানে করা হইবে, বঙ্গে মুসলমান অধিকার সম্বন্ধে ডয়েল সাহেব লিখিয়াছেন : "Although the progress of the Mohammedans was slower in Eastern

---

* Enyclopaedia Brittannica (9th Edn.) Vol XII, Page 148.

than in Western Bengal, by the middle of the thirteenth century all trace of Hindu rule has disappeared." * ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশ হইতে হিন্দুশাসন অদৃশ্য হয় বলিয়া তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক। সপ্তগ্রাম ও পাণ্ডুয়া শীর্ষক অধ্যায়ে প্রমাণ সহকারে, তাঁহার উক্তি খণ্ডন করা হইবে। নিম্নে রাজা লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক প্রদত্ত মাধ্যইনগর তাম্রশাসনের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল :

লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসন

সুহ্ম নামক দেশে অম্বষ্ঠ নামক ব্রাহ্মণ বংশে শ্রীধল্ল সেন নামে, নৃপতিগণের ভূষণস্বরূপ, পঞ্চানন সদৃশ পূজ্য এক রাজা ছিলেন, যাঁহার শরীর ও অঙ্গুলি সকল সুন্দর শ্বেতপদ্মের মত কমল এবং তাঁহার ধ্বনি সমুদ্রের অপর পারে এবং যাঁহার সুযশঃ অতিথিরূপে দুগ্ধসমুদ্রের অপর তীরে উপনীত হইত, যিনি নানা রত্নে বিভূষিত, মহা মহা ক্ষত্রিয় যোদ্ধগণে বেষ্টিত ও আয়ুর্ব্বেদবেত্তাগণের একান্ত সহায় ছিলেন এবং যিনি যজুর্ব্বেদকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

তাঁহার বংশে নরপতি মন্মথ সেনের জন্ম হয়। তিনি পৃথিবীর অলঙ্কার ও সুহ্ম দেশের মণিস্বরূপ ছিলেন। মন্মথ সেন মত্তবৃষের ন্যায় একাকী ঝম্ ঝম্ শব্দে প্রীতির সহিত ক্ষীর সমুদ্রে পতিত হইতেন এবং তিনি একান্ত সৎকার্য্যাভিলাষী রাজা ছিলেন। মন্মথ সেনের বংশে প্রদ্যুম্ন সেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সৎকার্য্যের সমুদ্র, বিশুদ্ধধর্ম্মা ও একান্ত নীতিপরায়ণ রাজা ছিলেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সহিষ্ণু, ক্ষমা ও ক্রিয়াশীল রাজা প্রদ্যুম্ন সেন,

* The Cambridge Shorter History of India
by H. H. Dodwell, Page 149.

স্বীয় সম্পত্তির পুষ্টি-সাধন ও যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মের দ্বারা নিতান্ত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

প্রদ্যুম্ন সেনের পুত্র নৃপতিশ্রেষ্ঠ বীর সেন, অশেষ গুণের আধার ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণের সহিত বাস করিতেন। তাঁহার গুণরাশি পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘোষিত হইয়াছিল। তিনি একান্ত শত্রুহন্তা ছিলেন। বীর সেনের অপর নাম ধৃতি ও ধীর সেন। তাহার পুত্র সামন্ত সেন, তিনি নিতান্ত জ্ঞানবান্, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সৎক্রিয়াশীল ও কলঙ্কবিহীন রাজা ছিলেন। সামন্ত সেন পৃথিবীকে বীরশূন্য করত শান্তিরূপ জলের দ্বারা ধৌত করিয়া স্বীয় অধীনস্থ করিয়াছিলেন। তিনি সূর্য্যাস্তের পরেও অনায়াসে লক্ষ্য বিদ্ধ (শিকার) করিতেন। তিনি রাত্রিতে রুধিরকণাকীর্ণ-ধারবিশিষ্ট তরবারি গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করত বীরগণের অন্বেষণ করিতেন। সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন শত্রুগণের ঊর্দ্ধ-বিক্ষিপ্ত শল্যাস্ত্র দ্বারা বিনষ্ট করত আপনাকে এবং সেনা-গণকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতেন। হেমন্ত সেন মগধে বাস করিয়া বসুমতী ভোগ করিয়াছিলেন।

হেমন্ত সেনের ঔরসে নরপতি বিজয় সেন জন্মগ্রহণ করেন। বিজয় সেন চন্দ্রের ন্যায় যশোবান্ ছিলেন। তাঁহার মস্তকে মণি চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় শোভা পাইত। সংগ্রাম-সমুদ্রে তিনি ভীষণধ্বনি, বৃহস্পতিতুল্য বুদ্ধি, ইন্দ্র-তুল্য অস্ত্র শিক্ষা ইত্যাদি অশেষ প্রকার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় প্রদান এবং সৎলোকের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেন। বিজয় সেন বিধি-পোষণ-বশদিগের ঈশ্বর। সুকৃতি ও সুধীগণের সত্যস্বরূপ ছিলেন। শিক্ষা, সন্ধ্যা ও ক্ষমাশীল বিজয় সেন সর্ব্বদা সত্য কথা বলিতেন ও তদীয় পূর্ব্ব পুরুষ নিতান্ত ক্রিয়াশীল রাজা প্রদ্যুম্ন সেনের অক্ষৌণীনাম যশঃ-সমুদয়কে সর্ব্বদা স্মরণ করিতেন।

বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন। তিনি লব্ধলক্ষ্য, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিশিষ্ট ও

সকলের জ্ঞানদাতা ছিলেন। বল্লাল সেন স্বীয় রাজধানীতে থাকিয়া সর্ব্বদা যজ্ঞাদি সৎকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার অম্বরতুল্য বীরত্ব যশঃ ক্ষীর-সমুদ্র তীরবর্ত্তী যোদ্ধগণেরও বীরত্বে বিঘ্ন উৎপাদন করিত। ধর্ম্মকার্য্যের অধীন তীর্থ-বিশ্বাসিব্যক্তিগণের তিনি ভূষণতুল্য ছিলেন। নরপতি বল্লালের শরীর অসুর বিনাশের একান্ত উপযুক্ত ছিল। তিনি নীচ জাতি, ক্ষুব্ধ পাপীগণের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার যশঃ ও বল নূতন।

তিনি যজ্ঞবৃত্তিতে সুরাসুর বিষ্ণুতুল্য ও উচ্চাধর্ম্ম ছিলেন এবং নিশ্চয় জয়লাভ করিতেন। শুদ্ধ, শান্ত, সুশীল, ক্ষমা, দক্ষতা, যুদ্ধক্ষমতা, যুদ্ধবিধি প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিঘর্ষণের দ্বারা তিনি সর্ব্বদা পৃথিবীর হিত ও উজ্জ্বল কূল সাধনে একান্ত যত্নবান্ ছিলেন। তাঁহার ক্রোধ নিতান্ত যুদ্ধ প্রবৃত্তির দ্বারা দূরস্থ শত্রু সৈন্যগণও তাঁহার স্বীকার করিত এবং যজ্ঞাদি ক্ষমাবল ও ক্ষত্রিয়োচিত বিচক্ষণতা হইতে কাপালিক মূর্ত্তি-মল্ল (এক প্রকার-শৈব ধর্ম্মাবলম্বীয় শ্রেণীবিশেষগণও) তাঁহার একান্ত অনুগত ছিল। রাজা বল্লাল সেন নিতান্ত সুশীল ও ব্রহ্মণ্যষট্‌কর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার লক্ষ! বিদ্বান্ মত্ত ! সম যম তুল্য যুদ্ধধর্ম্মে প্রাজ্ঞ ক্ষত্রিয় সৈন্যাধ্যক্ষ ছিল। গৌড়েশ্বর বল্লাল, স্বীয় রাজত্বের শ্রীবৃদ্ধিসাধন, সুবিধান-স্থাপন ও সুন্দর ভবনাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে পৃথিবীর অন্যান্য রাজাদিগের হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার অসীম চক্রে কলঙ্কবিহীন নৃপতিগণও ক্ষণ-কালের মধ্যে প্রীতির সহিত করপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহার বশ্যতাস্বীকার করিতেন। তাঁহাব লক্ষ্য দূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত গমন করিত। তিনি ভীম সংগ্রাম ও তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান দ্বারা কাশীরাজের সমরসাধ এবং রাজ্য শাসনাদি ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনি পৃথিবীর মধ্যে বীর, জ্ঞানবান, ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন। বিক্রমপুরে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের সঙ্গে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে অবস্থিতি করিয়া তিনি স্বীয় মন্ত্র, ধর্ম্ম দ্বারা প্রাণতুল্য জ্ঞানে প্রাণিগণকে ধর্ম্মে রক্ষা করিতেন। তিনি এক মাত্র অসিকেই তাঁহার ঐশ্বর্য্য, দুর্ব্বৃত্তদিগকে বধ করাকেই

সম্পত্তি, ধর্ম্মতে উন্নতি সত্যকে ক্ষুধা মনে করিতেন। তাঁহার শঙ্খদেশ (কপাল) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মূর্ত্তিবিশিষ্ট ছিল। গুণসাগর ক্রিয়াশীল বল্লাল সেন বিজ্ঞ, ধীর, সুব্রাহ্মণ সুশিষ্যগণের সহিত মিলিত ও ক্ষত্রিয়-বলাভিষিক্ত হইয়া ত্রিসন্ধ্যা ব্রহ্ম কবচ আরাধনা করিতেন। তিনি বন্ধু ও ব্রাহ্মণগণের শত্রুদিগকে সর্ব্বদা বধ করিতেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেণীর ও মহোপম আচার, বিনয়, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ দর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি, তপঃ এবং দান প্রভৃতি নবগুণসম্পন্ন কলাচারের আদি নিয়ন্তা।

বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষণ সেনও লক্ষ্যকার্য্যে নিতান্ত সুখী হন। বিদ্ধ করিবার উপযুক্ত জন্তু দূরে থাকিতেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা তাহাকে বধ করেন। তিনি বীর এবং ঔষধিজ্ঞ (চিকিৎসক)। তিনি সহজেই লক্ষ্য কার্য্য ও ক্ষত্রিয়দিগের সমুদয় কার্য্য বুঝিতে সক্ষম। রাজা লক্ষ্মণ সেন সুশাসকে, সুক্ষ্মধী, সুশীল, বিজ্ঞ, সুযশস্বী ও ধর্ম্মের নিতান্ত অধীন; ব্রহ্ম ধর্ম্মোন্নতি, ক্ষমা ও লক্ষ্মীযুক্ত এবং অশেষ প্রজ্ঞাবান্। তিনি পরম সুধীর, ত্রিসন্ধ্যা ব্রহ্মকবচ, ব্রহ্মগায়ত্রী আরাধনা করেন। ধৃতি সম্পন্ন অতিশয় ধার্ম্মিক, অসংখ্য সুধী ব্রাহ্মণ সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে অবস্থিতি করেন। তিনি সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মূল যে কুল, বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহারই উৎকর্ষসাধন করিতেন।

তাঁহার সুখ্যাতি ঘনদ্যুতিবিশিষ্ট। একমাত্র ক্ষমাই তাঁহার বৃত্তি। তিনি ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণধর্ম্ম প্রযুক্ত এবং সকল প্রকার মঙ্গলের হেতু স্বরূপ। রাজা লক্ষণ সেন শুদ্ধপ্রতিজ্ঞ, একমাত্র বীরত্বই তাঁহার ব্রত। রক্ষক সৈন্যদিগের রক্ষা-কার্য্যের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা আছে। তাঁহার নিজের কার্য্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ মনোযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। সুনাম ও যশের সহিত তাঁহার নিতান্ত ঘনিষ্ঠতা। তিনি বিশুদ্ধ নীতিজ্ঞ বসু * ও ব্রহ্মজ্ঞ। ধর্ম্মকার্য্যাদিতে তিনি বিলক্ষণ সুখী হন।

* ধব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, প্রত্যূষ ও প্রভাত ইহাদিগকে বসু বলে।

লক্ষ্মণ সেন সকল কার্য্যেই সুবিজ্ঞ। তিনি ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের হইতে শ্রেষ্ঠ সাধু, কেলিবিহ্বল ও কৃতকর্ম্মা। তিনি নির্লিপ্ত বুদ্ধি, একমাত্র ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের সহিতই তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি ধর্ম্ম ব্রহ্ম প্রভৃতি সমুদয় বিদিত। গৌড়েশ্বর যশঃসিন্ধু লক্ষ্মণ সেন ব্রাহ্মণমণ্ডলীর একমাত্র চক্রবর্ত্তিস্বরূপ। মহাবীর ব্রাহ্মণ রঘুবংশীয় ব্রহ্মণের ন্যায় সম্প্রতি ভূতলে বিরাজমান। তিনি রসজ্ঞদিগের ক্ষুধাস্বরূপ, পৃথিবীতে রামচন্দ্র তুল্য। তাঁহার চক্ষু বিশাল এবং শ্মশ্রু (দাড়ি গোঁপ) সকল বাণ প্রযুক্ত অর্থাৎ তীরের ন্যায়। তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও সুধী-শ্রেষ্ঠ। তিনিব্রাহ্মণ ধর্ম্মের অধ্যক্ষ, সত্যপ্রতিজ্ঞ। সম্প্রতি তিনি বিক্রমপুরে গমন করত, মত্ত পরাক্রমশালী সৈন্যগণের দ্বারা স্বীয় পিতৃরাজধানীকে অধিকার করিয়া মহাসমারোহের সহিত যজুর্ব্বেদোক্ত যজ্ঞাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ধর্ম্মজ্ঞ নৃপতি লক্ষ্মণ সেনের পুরোহিতের নিবাস মৎস্যবনে। দ্বারপালগণের দোষে সেই বনের একজন তস্কর পৃথিবীর মধ্যে অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠে। তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য নৃশংস রাবণগুণসম্পন্ন বিষয়-প্রয়াসী, দক্ষ, সুযোদ্ধা ক্ষত্রিয় ও অম্বষ্ঠ সৈন্যগণ নিযুক্ত হয়। ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে ক্ষত্রিয়ই বীরশ্রেষ্ঠ, পৃথিবী শাসনের উপযুক্ত শরীর-বিশিষ্ট। জপ, যজ্ঞ, ন্যাস লক্ষণাদিতে ব্রাহ্মণ শীঘ্রহস্ত ও সুবিজ্ঞ। ইষ্টবান ব্রাহ্মণেরা জপশ্রম দ্বারা দুর্ব্বৃত্তদিগকে হত, ধৃত ও আবদ্ধ করিয়া থাকেন এবং ব্রহ্মজ্ঞান স্বভাব দ্বারা দয়া বশতঃ কোন কোন সময়ে দুর্ব্বৃত্তগণকে ক্ষমা করেন। বপুষ্ক ব্রাহ্মণ জপ ও আশীর্ব্বাদ দ্বারা সকলেরই গুরু। সেই চোর রাজ পুরোহিতের জপশ্রম দ্বারা প্রথমে আক্রান্ত হইয়া তৎপরে যুদ্ধে আবদ্ধ ও হত হয়, ইহা যুদ্ধস্থানের পশ্চিম-সীমান্তবাসী সমুদয় যোদ্ধা ও জাতকগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

অতএব চন্দ্রকোণ বিরাটনগর যাহার উত্তর সীমা, যে ভূভাগের পশ্চিমে সপ্তক্ষীরা, বান্ধুক, চন্দ্রকোণ ও বিরাট নগরই যাহার পূর্ব্ব সীমা তারাস,

অগ্রসর যে ভূমির দক্ষিণ সীমা, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন কানন, অশেষবিধ সজল স্থল ভূমি শ্রীমাধব * ব্রাহ্মণের পাল্যভূমি হইল। মহারাজের ঋককর্ম্ম অর্থাৎ পৌরোহিত্য কার্য্য সম্পাদানার্থ সকল প্রকার পৌরোহিত্য কার্য্যের দক্ষিণাস্বরূপ ঋত্বিক ঋষির সম্বন্ধে রিত্বিগার্থিক ভূমি বলিয়া স্বীকৃত হইল। বুড়াকা পাষাণিকা, ষাম্বুক, ভূষা, উদিযূষ চাঙ্গধুপিল, ভূশ্বর, ক্ষযব, সাধুবাকলা, বেত্তিল ও ভূশর প্রভৃতি গ্রাম, ধৈর্য্যশীল বিজ্ঞ, ধর্ম্ম ও ক্ষমাদিতে তুষ্ট, কুশলী, প্রাজ্ঞ, বিশুদ্ধ, ক্ষিতিজ্ঞ, সুশ্রাদ্ধতর্পণ ও শ্রুতিজ্ঞ বিষয়মোহান্ধকারের ক্ষয়কারক, বিষয় কার্য্যে বিজ্ঞ, প্রধান, জপ যজ্ঞাদি যুক্ত, অধ্যাত্মসিদ্ধ শ্রীসর্ব্বেশ্বর দেব শর্ম্মার পুত্র, কৌশিকগোত্র, কৌথুম শাখানুধ্যায়ী, বিশ্বামিত্র, আপ্লুবৎ ও যমদগ্নি প্রবর শ্রীমান্ মাধব দেব শর্ম্মাকে ধর্ম্ম নির্ব্বন্ধ দ্বারা বর্ষ শক ও স্বস্তি (অর্থাৎ স্বীকৃত বাক্য) উচ্চারণপূর্ব্বক প্রদত্ত হইল।

ধৈর্য্যশীল, পুণ্যবান্ সৎলোকের দ্বারা বিবর্দ্ধিত অর্ণব সদৃশ, অম্বষ্ঠসংজ্ঞক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অভিষেক ও ক্ষত্রিয়ের স্থায় শরীর, বলাদিযুক্ত, কর্ম্মলব্ধ, মহাপ্রাজ্ঞ বৈদ্যগণের ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণের এবং ধীর কবি জয়দেব ধোয়িকাদি বীর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণেরবিখ্যাত ব্রহ্মের তুল্য ত্রৈলোক্য-বিমুগ্ধকারণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতির হিংসকের প্রতিহিংসক, যজ্ঞাদি দ্বারা প্রজাগণের মঙ্গলকারক যশের রেখাস্বরূপ লক্ষণাবতী নাম্নী নগরীর নির্ম্মাতা ও তাহাতে নানাবিধ ধনরত্নের আবিষ্কারকর্ত্তা; ধর্ম্ম, দ্বিজ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির গৌরবর্দ্ধন-কারী, পৃথিবীতে অর্জ্জুনতুল্য। অর্জ্জুনের স্থায় যোদ্ধামেঘের স্থায় শীঘ্রকর্ম্মা, বিক্রমদক্ষ অমৃতভাষী, ক্ষীরসমুদ্রতীর বিজয়ী, সুহ্মদেশের মণি, সুবঙ্গের অধিপতি বীরতেজবিশিষ্ট বীরশ্রেষ্ঠ, সুন্দর, সুবুদ্ধিযুক্ত, শ্রীলক্ষ্মণ সেন দেবশর্ম্মা সুব্রাহ্মণ, শ্রীকৃষ্ণ ও স্বস্তি স্মরণ করতঃ,

* এই মাধব ব্রাহ্মণ হইতে বোধ হয় দত্ত ভূমির নাম মাধবনগর হইয়াছিল এবং তাহা হইতে কালে মাধাইনগর হইয়াছে।

সূর্য্যদেবের পূজাপূর্ব্বক বিষ্ণুকে পূজা করিলেন ওঁ হ্রী ব্রহ্মকে নমস্কার। উপরিতন অর্থাৎ তাম্রশাসনের শীর্ষস্থ বিশ্বমূর্ত্তি ত্রিমূর্ত্তি বিষ্ণু, যিনি সহস্র মস্তক, সহস্রচক্ষু, সহস্র-বাহু, সহস্রপদবিশিষ্ট, যিনি আকাশ পৃথিবী প্রভৃতি সর্ব্বত্র শান্তি, সাক্ষী ও শাস্তারূপে বিরাজমান রহিয়াছেন, তিনিই এই দান সম্বন্ধে শান্তি সাক্ষী ও শাস্তাস্বরূপ।

সুকর্ম্মা, ব্রহ্মশক্তিযুক্ত, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা বৈশ্যবর্ণ, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের বৃত্তি ও ধর্ম্মের সাক্ষী, ব্রহ্মদেশের ঈশ্বর স্বমিত্র ও ব্রাহ্মবিদগণের আশ্রয়, স্বধর্ম্ম ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্মজ্ঞ, ব্রহ্মসন্ন্যাস ধর্ম্ম ও ঔষধ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণের সহিত বর্ত্তমান, ত্রৈলোক্যের লক্ষ্মীযুক্ত, যুধিষ্ঠির ও রামচন্দ্রের তুল্য, অশেষবিজয়ীলক্ষ্মী, ব্রাহ্মণ কুলীন বন্ধুগণের ও স্বধর্ম্ম, দেবতা, বেদজ্ঞগণের আশ্রয় এই লক্ষ্মণ ব্রাহ্মণ। *

---

* হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ়—অম্বিকাচরণ গুপ্ত

ষষ্ঠ অধ্যায়

সামাজিক বিবরণ

হিন্দু রাজত্বে এই অঞ্চলের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা বর্ত্তমানে অধিক জানিবার উপায় না থাকিলেও তৎকালে সকল ব্যক্তিই যে স্ব স্ব জাতীয় বৃত্তির দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত এবং দেশের কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতিকল্পে সহায়তা করিত তাহা সুনিশ্চিত। এই অঞ্চলের অধিবাসিগণ সকলেই ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলিতেন এবং সকলেই

হিন্দু রাজত্বে দেশের অবস্থা

ধর্ম্মভীরু ছিলেন একথা নিঃসংশয়ে মেগাস্থিনিশের বর্ণনা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। "Theft is of very rare occurrence and their houses and property leave unguarded." অর্থাৎ চুরী কদাচিৎ ঘটিত এবং দেশবাসিগণ ঘরের দরজা খুলিয়া নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইত। সকল গৃহস্থ সাধ্যানুসারে অতিথি-সেবা করিত এবং দেশে দারিদ্র বলিয়া কোন জিনিষই ছিল না। রাজাকে দেশবাসী দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিত এবং তিনিও প্রজার সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য সর্ব্বদা মুক্ত-হস্ত থাকিতেন।

সেকালের বাঙ্গালী সমাজ কিরূপ ছিল তাহা তৎকালনী কাব্য

সেকালের-বাঙ্গালী সমাজ

গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। মানিকচাঁদের গীতে বাঙ্গলার অবস্থাপন্ন লোক তখন আটচালায় বাস করিত এবং পালঙ্ক ব্যবহার কেবল ধনীদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। সর্ব্ব সাধারণে শীতলপাটি পাতিয়া বালিসে হেলান দিয়া বসিতেন। অগুরু-চন্দনের ব্যবহার তখন আদরণীয় ছিল। চাষীরা

মোটা কাপড় পরিধান করিত। পিতৃকার্য্য ও গয়ায় পিণ্ডদান, ব্রাহ্মণ-সেবা পুণ্য কার্য্য বলিয়া গণ্য হইত। জ্যোতিষীরা পাঁজি লইয়া ভ্রমণ করিতেন, পাঁজির বচন না শুনিয়া কেহ কোন ক্রিয়া-কর্ম্ম করিতেন না।

ধনী গৃহিণারা হার, কেয়ূর কঙ্কণ, বেসর, নপুর ব্যবহার করিতেন। মানিকচাঁদের রাজত্বে সকলের দুয়ারেই ঘোড়া বাঁধা থাকিত। দেড় কুড়িতে কৃষাণ একমাস চালাইত এবং ঐ দেড়কুড়ি খাজনা দিয়া একমাস পাল চড়াইতে পারিত। স্ত্রীলোকেরা পাশা খেলিতেন। ঢাক ঢোল বাজাইয়া উৎসব করা হইত। চতুর্দ্দোলায় বরকে বিবাহ-বাসরে লইয়া যাওয়ার রীতি ছিল। সাধারণ গৃহস্থ চৌপালা ব্যবহার করিতেন।

স্ত্রীলোকেরা সীমন্তে সিন্দুর ও কেশে সুগন্ধি ব্যবহার করিতেন। পুরুষদের বাবরী চুল রাখা সৌখিনতার পরিচায়ক ছিল। বাবরী চুল রাখা এখনও রাঢ় অঞ্চলের দুলে বাগ্দীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। বিজয় গুপ্তের 'একখানি কাচিয়া পিন্ধে, আর একখানা মাথায় বাঁধিয়া আর একখানা দিলা সর্ব্ব গায়' হইতে প্রমাণিত হয় যে, বাঙ্গালী পাগড়ি বাঁধিত ও উত্তরীয় ব্যবহার করিত।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের রচনা হইতে প্রমাণ হয়, সমাজে তখন বিধবা-বিবাহ ছিল না। শিশুদের কটীতে কিঙ্কিনী বাঁধিয়া দেওয়া হইত। 'কটীতে কিঙ্কিনী বাজে অতি মনোহর।' ওই অলঙ্কার লোভে বালক বালিকা চুরি হইত। টোলের পড়ুয়ার কেশ বেশ সুন্দর ছিল; 'শিরে চাঁচড় কেশ অতি মনোহর।' তখনকার লোকে ভোজন-পটু ছিল। মহোৎসবে চিঁড়া দধি খাওয়ানো হইত এবং বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকায় (নাদায়) চিঁড়া ভিজানো হইত। সেইজন্য দুধ কলা প্রচুর সংগৃহীত হইত।

দূর তীর্থে যাওয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার, বোম্বাই অঞ্চলে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত দুইজন বাঙ্গালী তীর্থযাত্রীর সাক্ষাৎ হয়। প্রয়াগ স্নান সেকালে সমধিক প্রচলিত ছিল। অহিন্দুর অন্ন খাইলে জাত যাইত। "ছয়মাস

অন্ন যদি করয়ে গ্রহণ। প্রায়শ্চিত্ত করিলে জাতি পায় সেইক্ষন॥” (অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ)। কায়স্থ এবং বৈদ্যের সেকালে বিশেষ সম্মান ছিল। হোসেনসার চিকিৎসক ছিলেন, বর্দ্ধমানের অন্তর্গত শ্রীখণ্ডগ্রামবাসী মুকুন্দরাম বৈদ্য। কায়স্থরাও সেকালে সংস্কৃত চর্চ্চা করিতেন; সেকালে হিন্দু সমাজের সকলেই সরল ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন।

মুকুন্দরামের পুঁথি হইতে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণরা পূজা করিতেন; কায়স্থেরা লেখাপড়া করিতেন এবং নাপিত কাংশ নির্ম্মিত দর্পণ লইয়া কামাইয়া বেড়াইত। কলুরা ঘানি বসাইত; তাঁতী ভুনী ধুতি ও গড়া বুনিত। গড়া এখনকার খাদি। সরাক তাঁতী নেত ও পাট সাড়ী বয়ন করিত, ছুতার চিঁড়া কুটিত এবং কৈবর্ত্তেরা মাছ ধরিত।

সেকালে নগরের মধ্যে থাকিত শিব-মন্দির। পথিকদের জন্য থাকিত—অতিথিশালা। গন্ধবণিকেরা গন্ধেশ্বরীর পূজা করিত। পূজায় বলিদান ব্যবস্থা ছিল। “আশ্বিনে অম্বিকা পূজার পর” দেবীর প্রসাদ-মাংস ঘরে ঘরে ব্যবহার হইত। ইহাতে বুঝা যায় যে সেকালের বাঙ্গালীরা ছিল শাক্ত ধর্ম্মাবলম্বী। চড়ক পূজার প্রচলন সেই সময়ের। মুকুন্দরামের রচনা হইতে জানা যায়, সমুদ্র-যাত্রা সেকালে গর্হিত ছিল না। রাঢ় অঞ্চলে নানা প্রকারের নৌকা নির্ম্মিত হইত। বর্ত্তমান বাঙ্গালীর সহিত সেকালের বাঙ্গালীর এক সুদূরতম ব্যবধান দাঁড়াইয়া গিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্বে বাঙ্গলার আর্থিক অবস্থার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু ঐ সময় হইতে বিদেশী পর্য্যটকদের বিবরণে এবং বাঙ্গলা লোকসাহিত্যে দেশের জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তাহাদের আয়ের উপায়, পণ্যমূল্য প্রভৃতির ইতিহাস পাওয়া যায়। হিন্দু আমলে প্রজা সাধারণের বৈষয়িক জীবনযাত্রা ও নাগরিক অধিকারের উপর ব্যাপক হস্তক্ষেপ কখনও করা হয় নাই; রাজা তাঁহার

ফসলের ষষ্ঠাংশ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। গ্রামগুলি ছিল এক একটি ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র। সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের জন্য কৃষক, তাঁতি কামার, কুমার, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি যে সকল বৃত্তি আবশ্যক সেই সবগুলি লইয়া এক একটি গ্রাম গঠিত হইত এবং যথাসম্ভব নিজেদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান এবং গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে স্কুল বসাইয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা তাহারা নিজেরাই করিয়া লইত। ইংরেজ আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুসলমান আমলে মাঝে মাঝে সাময়িক দুঃখ ঘটিলেও, মোটামুটিভাবে বাঙ্গালার বৈষয়িক সমৃদ্ধি অটুট ছিল এবং পাদ্রী লং হিসাব দিয়া গিয়াছেন যে, ইংরেজ আগমনের পর বাঙ্গলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক।

নবাবেরা অর্থ-সংগ্রহ করিয়াছেন, প্রভূত বিত্ত-সঞ্চয়ও করিয়াছেন, কিন্তু উহা ব্যয় করিয়াছেন এ দেশেই। লুণ্ঠন তাঁহারা বড় কম করেন নাই. কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্র-শক্তি হস্তক্ষেপ করে নাই বলিয়া আপামর জনসাধারণের উৎপাদনের উৎস বন্ধ হয় নাই, কৃষি ও শিল্পে তাহার প্রেরণা ও উৎসাহ স্তব্ধ হয় নাই। মুসলমান আমলের শেষের দিকেও বাঙ্গলায় এমন বহু পরিবার ছিল যাহারা সোনার থালায় ভাত খাইত—একথা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গলার ইতিহাস রচয়িতা গোলাম হোসেন তাঁহার রিয়াছুল সালাতিন গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। মোগলেরা সোনার থালাগুলি লুঠ করিয়াছে, কিন্তু দেশের লোকের উপার্জ্জনের পথ বন্ধ করে নাই। ইংরেজ আসিয়া থালাও লইয়াছে, বিলাতী পণ্য আমদানি করিয়া এবং তরবারির জোরে উহা দেশে ঢুকাইয়া আয়ের পথটাও শেষ করিয়াছে। ইংরেজ আমলেই ভারতবর্ষে শোষণ-নীতির প্রথম সূত্রপাত হয়।

সোনার বাঙ্গালার মাটিতে সাত শত বৎসরের মুসলমান শাসন ভারতবাসীর যে ক্ষতি করিতে পারে নাই, ইংরেজ তাহাই সাধন করিয়াছে।

ইহারই জের দেশ আজও বহিয়া চলিয়াছে। ইংরেজ গিয়াছে, কিন্তু রাখিয়া গিয়াছে এমন একদল আত্মকেন্দ্রিক লোক, যাহারা এ দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও মনে প্রাণে বিদেশী, মাটির সহিত বা দেশের সহিত যে সব লোকের লেশমাত্র সম্পর্ক নাই, আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য যাহারা বিবেক বিসর্জ্জন দিয়া ইংরেজের দাসত্ব করিয়াছে, জননী-জন্মভূমির শৃঙ্খল-মোচনের সকল শুভপ্রচেষ্টায় উৎসাহের সহিত বাধা 'দয়া বিদেশীয় নিকট পুরস্কার ও বাহবা লাভ করিয়াছে। ইহাদের হাতে দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি সংস্থানের ভার পড়িয়া দেশের কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু তৎপূর্ব্বে যে কি ছিল তাহা জানিবার প্রযোজন আছে।

জিনিষপত্র যখন এত সস্তা, মজুরি প্রভৃতি তখন কম থাকিবে ইহাই স্বাভাবিক। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাগজপত্র হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সি, আর, উইলসন ১৭০৩ হইতে ১৭১০ খৃষ্টাব্দে প্রচলিত বেতনের নিম্নোক্তরূপ তালিকা দিয়াছেন :

	মাসিক বেতন
কেরানী	৪।৶০ আনা।
পুলিশ দারোগা	৪৲ টাকা।
খাজনা আদায়কারী	১৸৵০ আনা।
কনেষ্টবল	১৷০ আনা
পিয়ন	৫৲ টাকা

পাদ্রী লং ১৭৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে প্রচলিত মজুরের নিম্নোক্ত তালিকা দিয়াছেন :

সাধারণ কুলী দৈনিক এক পণ ১২ গণ্ডা কড়ি, অর্থাৎ দুই পয়সা।
রাজমিস্ত্রী দৈনিক এক গণ্ডা কড়ি অর্থাৎ, এক পয়সারও কম।
দক্ষ মিস্ত্রী দৈনিক দশ পয়সা।

বুকানন হ্যামিলটন ১৮০০—১০ খৃষ্টাব্দে প্রচলিত মজুরির তালিকা এইরূপ দিয়াছেন :

সাধারণ শ্রমিক	দৈনিক	৶০ আনা
দক্ষ শ্রমিক	"	৵০ আনা
ছুতার মিস্ত্রী	মাসিক	৬৲ টাকা
কাঁসারি	"	৪৸৶০ আনা
তাঁতী	"	৫৲ টাকা

সচ্ছল জীবন

আয়ের স্বল্পতা যে দুর্দ্দশার নিদর্শন নয়, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বাঙ্গলা সাহিত্যে পাওয়া যায়। বংশীদাসের মনসামঙ্গল কাব্যে সনকার, কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে খুল্লনার, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে সীতাদেবীর, মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে সুরিক্ষার এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে অন্নপূর্ণার রন্ধন-প্রণালীর বিবরণ হইতে জানা যায়, সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থ পরিবারের অবস্থা তখন সচ্ছল ছিল এবং ভোজন-বিলাসীও তাহারা বড় কম ছিলেন না। 'অন্নপূর্ণার রন্ধন' হইতে তেইশ পদ নিরামিশ রান্নার কয়েকটি মাত্র পদের কথা এখানে উল্লেখ করা হইল :

হাস্যমুখী পদ্মমুখী আরম্ভিলা পাক।
শড়শড়ি ঘণ্ট ভাজা নানামত শাক॥
ডালি রান্ধে ঘনতর ছোলা অরহরে।
মুগ, মাষ বরবটি বাটুলা মটরে॥
বড়া বড়ী কলা মূলা নারিকেল ভাজা।
ফুনথোড়া আলনা শুক্তানি ঘণ্ট তাজা॥
কাঁঠালের বীজ রান্ধে চিনি রসে বুড়া।
তিল পিটালিতে লাউ বার্ত্তাকু কুমড়া॥

পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে বাঙ্গলার বৈষ্ণব এবং অন্যান্য সাহিত্যে দেশের বৈষয়িক অবস্থা ও জীবনযাত্রার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

বাঙ্গলা সাহিত্য —বাজার দর

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত কাব্যে উল্লিখিত আছে যে, চৈতন্য দেবের বিবাহ কয়েক কৌড়ি মাত্র ব্যয়ে সুন্দরভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং উহাকে রীতিমত জাঁক জমকপূর্ণ বিবাহ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত কবিকঙ্কণের চণ্ডী কাব্যে দুর্ব্বলার বেসাতির বিবরণে বাজার দরের নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে :

দুর্ব্বলা হাটেরে যায় পশ্চাতে কিঙ্কর ধায়
কাহন পঞ্চাশ লয়্যা কড়ি।
লাউ কিনে কচি কুমড়া শতমূলে পলা কড়া
পাকা আম্র কিনে ঝুড়ি-মূলে।
বিশাদরে ছেনা কিনি কিনিল নবাত চিনি
গণ্যে পণ মূলে পান নিলে ॥
রন্ধন সন্ধান জানে চিতল বোয়ালি কিনে
শোল পনা কিনিল চিঙ্গড়ি।
চতুর সাধুর দাসী আট কাহনেতে খাসী
তৈল সের দরে দশ বুড়ী ॥

দেশের সাধারণ বৈষয়িক অবস্থা এবং প্রজার অধিকার কিরূপ ছিল, চণ্ডীকাব্যে রাজা কালকেতুর নিম্নলিখিত কথায় তাহা প্রতীয়মান হইবে :

শুন ভাই বুল্লান মণ্ডল।
আইস আমার পুর, সন্তাপ করিব দুর
কাণে দিব সোনার কুণ্ডল ॥
আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চাষ চষ,
তিন সন নহি দিহ কর

হাল পিছে এক তঙ্কা কারে না করিহ শঙ্কা,
পাট্টায় নিশান মোর ধর ॥
পার্ব্বণী পঞ্চক যত গুড়া লোন সনা ভাত
ধান কাটি বলেন কসুরে।
যত বেচ ভাল ধান, তার না লইব দান,
অন্ধ নাহি বাড়াইব পুরে ॥
যত প্রজা বৈসে ঘর, তার না লইব কর,
চাষী জনে বাড়ি দিব ধান ॥

এই দেশের নারীগণ পতিকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞান করিতেন এবং পতিপরায়ণতাই তাঁহাদের একমাত্র ধর্ম্ম ছিল। পতির সহিত সহমরণই সেই জন্য বঙ্গরমণীগণ তাঁহাদের জীবনের একমাত্র কাম্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং ইহাতে তাঁহারা জীবন সার্থক জ্ঞান করিতেন। এই প্রথা কোন সুদূর অতীত কাল হইতে যে ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। তৎকালে সহমরণ দেখিবার জন্য ভীষণ জনসমাগম হইত, ঢাক-ঢোল প্রভৃতি বাদ্য বাজিত এবং সতী তাঁহার শেষ বেশবিন্যাস করিয়া, নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া হাঁসিমুখে (অর্থাৎ স্ব-ইচ্ছায়) স্বামীর মৃতদেহ কোলে লইয়া দক্ষিণ হস্তে একটি আম্র-শাখা ঘুরাইতে ঘুরাইতে ভস্মীভূতা হইতেন। সতীর শেষ সিন্দুর ও শাঁখা পাইবার জন্য স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত, কারণ সতীর সিন্দুর মাথায় দিলে বা তাহার ব্যবহৃত শাঁখা পরিলে আর বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, এইরূপ একটা বিশ্বাস তৎকালীন মহিলাদের মধ্যে ছিল।

সতী-দাহ

হিন্দুরাজত্বকালে কোন রাজা এই প্রথা রহিত করিবার কথা স্বপনেও চিন্তা করিতে পারিতেন না। বরং সতীরমণীর আত্মবিসর্জ্জনের পবিত্র স্মৃতি

জাগরূক রাখিবার জন্যই তাঁহারা চেষ্টা করিতেন। উদাহরণ স্বরূপ 'সতীচোড়া ঘাটের' কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। বেশী দিনের কথা নয়, ১৭৪২ খৃষ্টাব্দেও মুর্শিদাবাদে যে স্থানকে 'সতীচোড়া' বলে, তথায় জগৎ সেটের বাড়ীর কিছু উত্তরে কোন সতীর সহমরণ-স্মৃতি রক্ষা কল্পে, একটা মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এইরূপ সহমরণ-স্মৃতি তৎকালে বঙ্গদেশে বহুস্থানেই ছিল, কালক্রমে তাহা সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে।

সহমরণ-স্মৃতি

কোন সময় হইতে সতীদাহ ভারতবর্ষে প্রচলিত তাহা বলা যায় না এবং কি করিয়া যে, এই প্রথার উৎপত্তি হইল তাহাও সঠিক বলিতে পারা যায় না; তবে সেলুকাস আলেকজান্দারের ভারত অভিযান বর্ণনা মধ্যে লিখিয়াছেন যে, রাজপুতানার এক অনার্য্য রমণী বিষপ্রয়োগে তাঁহার স্বামীকে হত্যা করে বলিয়া স্বামীর সহিত সহমৃতা হইবার জন্য তাহাকে দণ্ড দেওয়া হয়; সেই সহমরণ হইতেই সতীদাহের উৎপত্তি হইয়াছে। *

সতীদাহের উৎপত্তি

তৎকালে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং একজন ব্যক্তির মৃত্যুতে বহু নারীকে সহমৃতা হইতে হইত; কেহ সহমৃতা না হইলে সমাজের ব্যক্তিগণ তাহাকে 'অসতী' বলিয়া ঘোষণা করিতেন এবং সেইজন্য অপবাদের হাত হইতে নিস্তার কল্পে পুত্রও মাতাকে প্রজ্জ্বলিত চিতায় ফেলিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বাগনপাড়ায় এক ব্রাহ্মণের একশত স্ত্রী ছিল; ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হইলে, সাঁইত্রিশ জন স্ত্রী সহমৃতা হন এবং উপর্য্যুপরি তিন দিন ধরিয়া তাহার চিতাগ্নি প্রজ্বলিত ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়।

"In 1793 at Baganpara 37 widows were burnt with

* Macrindle's Ancient India as described by Megasthenes.

their husbands, the fire was burning 3 days; on the first day 3 were burnt, on the second 15, and on the third 19; the deceased had over 100 wives."

উলার মুক্তারাম নামক এক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার ত্রয়োদশজন ভার্য্যা সহমৃতা হন, কিন্তু শেষ দুইজন সূর্য্যার্ঘ্য দিবার সময় মন্ত্রপাঠকালে প্রাণভয়ে পলাইতে উদ্যত হইলে, তাহার পুত্র ধরিয়া আনিয়া মাতাকে চিতায় ফেলিয়া দেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত রমানাথ এই ঘটনা সচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।*

সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে ডাক্তার বার্নিয়ার ভারতবর্ষ পরিভ্রমণকালে কয়েকটি সতী-দাহ সচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি এই প্রথাকে নিষ্ঠুরতা ও বর্ব্বরতা বলিয়া অভিহিত করিয়া লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের সকল প্রসূতিই নিজ কন্যাকে বাল্যকাল হইতে স্বামীর সহিত সহমৃতা হওয়ার তুল্য পুণ্য ও প্রশংসার কাজ আর নাই, এই শিক্ষা দিয়া থাকেন। আর পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগকে বশীভূত রাখিবার, রোগে শুশ্রূষা পাইবার এবং বিষপ্রয়োগে স্বামী হত্যা না করে, এই সকল কারণে সহমরণের পোষকতা করিয়া থাকে।

ফরাসী পরিব্রাজক বার্নিয়ার

বৈদেশিক ভ্রমণকারী কর্ত্তৃক বিষ-প্রয়োগে স্বামী হত্যা হইতে সতী-দাহের উদ্ভব হইয়াছে, এই বিবরণ পাঠ করিয়া বার্নিয়ার সাহেবও 'বিষ-প্রয়োগ স্বামী হত্যার' কথা উল্লেখ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদেশিক লেখকগণ এই প্রথার উৎপত্তির বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে, আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ পূর্ব্বে হিন্দু-নারী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ব-ইচ্ছায় 'সতী' হইত। শেষে স্বেচ্ছায় সতী হইবার ইচ্ছা না থাকিলেও, সামাজিক ব্যবস্থায় 'সতী' হইতে বাধ্য হইত। হুগলী জেলার শেষ সতী-দাহ ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়; জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট হ্যালিডে

* নদীয়া কাহিনী (২য় সংস্করণ), পৃষ্ঠা ২৮৪

সাহেব ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হুবহু উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে বার্নিয়ার সাহেবের ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল তাহাই প্রমাণিত হইবে।

প্রত্যক্ষদর্শী হ্যালিডে সাহেবের বিবৃতি

"*Suttee* was prohibited by law in 1829. At and before that time I was acting as Magistrate of the district of Hooghly. Before the new law came into operation, notice was one day brought to me that a *Suttee* was about to occur a few miles from my residence. Such things were frequent in Hooghly as the banks of that side of the river were considered particularly propitious for such sacrifices. When the message reached me, Dr. Wise of the Medical service and a clergyman (whose name I forget), who was Chaplain to the Governor-General, were visiting me and expressed a wish to witness the ceremony, Accordingly we drove to the appointed place where a large crowd of natives was assembled on the river bank and the funeral pile already prepared, the intended victim seated on the ground in front of it. Chairs were brought for us and we sat down near the woman. My 2 companions, who did not speak the language, then began to press the widow with all the reason they could urge to dissuade her from her purpose, all of which at their request I made the woman understand in her own language. To this she listened with grave and respectful attention but without being at all moved by it; the priests and many of the spectators also listening to what was said.

At length she showed some impatience and asked to be allowed to proceed to the pile. Seeing that nothing

further could be done, I gave her the permission, but, before she had moved, the clergyman begged me to put to her one more question—"Did she know what pain she was about to suffer ?" She, seated on the ground close to my feet, looked up at me with a scornful expression in her intelligent face and said for answer, "Bring a lamp" : the lamp was brought, of the small sauce-boat fashion used by peasants, and also some *ghi* or melted butter and a large cotton wick. These she herself arranged in the most effective form and then said, "Light it ;" which was done and the lamp placed on the ground before her. Then steadfastly looking at me with an air of grave defiance she rested her right elbow on the ground and put her finger into the flame of the lamp. The finger scorched, blistered, and blackened and finally twisted up in a way which I can only compare to what I have seen happen to a quill pen in the flame of a candle. This lasted for some time, during which she never moved her hand, uttered a sound or altered the expression of her countenance. She then said : "Are you satisfied ?' to which I answered hastily, "Quite satisfied," upon which with great deliberation she removed her finger from the flame, saying : "Now, may I go ?" To this I assented and she moved down the slope to the pile. This was placed on the edge of the stream. It was about 4½ feet high, about the same length, and perhaps 3 feet broad, composed of alternate layers of small billets of wood and light dry brushwood between 4 upright stakes. Round this she was marched in a noisy procession 2 op 3 times and then ascended it, laying herself down on her side with her face in her hands like one composing

herself to sleep, after which she was covered up with light brushwood for several inches, but not so as to prevent her rising had she been so minded. The attendants then began to fasten her down with long bamboos. This I immediately prohibited and they desisted unwillingly but without any show of anger. Her son, a man of about 30, was now called upon to light the pile.

It was one of those frequent cases in which the husband's death had occurred too far off for the body to be brought to the pile, and instead of it a part of his clothing had been laid thereon by the widow's side. A great deal of powdered resin and, I think, some *ghi* had been thrown upon the wood which first gave a dense smoke and then burst into flame. Until the flames drove me back I stood near enough to touch the pile, but I heard no sound and saw no motion, except one gentle upheaving of the burshood over the body, after which all was still. The son who had lighted the pile remained near it until it was in full combustion, and then rushing up the bank threw himself on the ground in a paroxysm of grief. So ended the last *Suttee* that was lawfully celebrated in the district of Hooghly and perhaps in Bengal. *"

হুগলীতে সহমরণ

ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশ এবং বঙ্গদেশের মধ্যে বর্ত্তমান হুগলী জেলার মধ্যেই সতীদাহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল বলিয়া জানা যায়। ইহার কারণ তৎকালে ত্রিবেণী ও 'নিমাই তীর্থ' বঙ্গের প্রসিদ্ধ পুণ্যতীর্থ ছিল এবং কাশী-মৃত্যুর ন্যায় এই স্থানদ্বয়ে মৃত্যু হওয়া এক মহাপুণ্যজনক ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইত।

*Bengal under the Lieutenant Governors, Vol I. by C. E. Buckland.

উচ্চশ্রেণীর হিন্দু, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যেই, সহমরণ বেশী হইত। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর এই সহমরণ-প্রথা আইন-বিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হয়; তাহার দশ বৎসর পূর্ব্বে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ্চ ও ৫ই জুন তারিখের সমাচার-দর্পণের দুইটি সংবাদ হইতে হুগলী জেলায় সহমরণের আধিক্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া যাইবে। "অধিক সহমরণ বাঙ্গলা দেশে হয়, পশ্চিম দেশে তাহার চতুর্থাংশও হয় না এবং বাঙ্গলার মধ্যে ও কলিকাতার কোর্ট আপিলের অধীন জিলাতে অধিক হয়। আরো হিন্দুস্থানে যত সহমরণ হয় তাহার সাত অংশের একাংশ কেবল জিলা হুগলীতে হয়।"

"সহমরণ—তৃতীয় সন জেলা হুগলীতে এক শত বার স্ত্রী সহগামিনী হইয়াছে, গত বৎসর ঐ জেলাতে দুই শত স্ত্রী সহগামিনী হইয়াছে কিন্তু গত বৎসর যে এত অধিক হইয়াছে ইহার কারণ কিছু নিশ্চয় হয় নাই। অন্য অন্য জেলা হইতে জেলা হুগলীতে অধিক সহগমন নিত্য হয়।"

বৈদেশিক লেখকগণ সহমরণকে বর্ব্বর-প্রথা এবং পুরুষগণ নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ইহা সমর্থন করেন বলিয়া, ভারতবাসীকে হেয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্ব্বে হ্যালিডে সাহেবের বিবরণ উল্লেখ করিয়াছি; নিম্নে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট তারিখের সমাচার-দর্পণের সংবাদটি হইতে প্রমাণিত হইবে, যে রমণীগণ 'সতী' হইবার জন্য আত্মীয়-স্বজনের নিষেধ সত্ত্বেও স্বামীর সহিত সহমৃতা হইতেন।

"১৪ই শ্রাবণ সোমবার চাতরা গ্রাম-নিবাসী ষটপঞ্চাশদ্বৎসর বয়স্ক রামধন বাচস্পতি নামে এক ব্রাহ্মণ মরিয়াছেন। তাঁহার পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক স্ত্রী তৎসহগামিনী হইতে উদ্যতা হইলে তাহার আত্মীয়বর্গেরা ও রাজ সম্পর্কীয় লোকেরা নানা প্রকার নিবারণ করিল, কিন্তু ঐ স্ত্রী সে সকল কথা কোন মতে গ্রাহ্য করিল না। পর দিন প্রাতঃকালে মোং চাতরার ঘাটে সহমৃতা হইলেন।"

মুসলমান রাজত্বকালে শাসন-কর্ত্তারা সহমরণ প্রথা সমর্থন করিতেন না এবং কেহ কেহ বাধা দিতেন বলিয়া জানা যায়। * আবার অন্য গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, গর্ভনমেণ্ট হইতে কোন বাধা দেওয়া হইত না, তবে উপযুক্ত কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে সহগামী হইবার পূর্ব্বে অনুমতি লইতে হইত। † ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর আমলে হুগলী জেলা হইতেই এই প্রথা রদ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথম রেভারেণ্ড উইলিয়াম কেরী তৎকালীন গর্ভনর লর্ড ওয়েলেসলীকে পত্র দেন এবং তিনিই এই প্রাণান্তকর প্রথা সংযমিত করিবার প্রথম চেষ্টা করেন। ইহার পূর্ব্বে একমাত্র সম্রাট আকবর এই প্রথা রহিত করিবার একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই জেলারই অন্যতম সুসন্তান রাজা রামমোহন রায় যে সময়ে ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময় বঙ্গদেশে সহমরণ লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। তিনিও এই নৃশংস প্রথা রহিতের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং হিন্দুশাস্ত্র হইতে প্রমাণ করিয়া দেন যে, স্বামীর সহিত সহমরণে যাইতে হইবে, শাস্ত্রে এমন কোন নির্দ্দেশ নাই। ইংরেজ গভর্ণমেণ্টও এই বিষয়ে নানা নিয়ম করিতেছিলেন, কিন্তু একেবারে বন্ধ করিয়া দিবেন কি না, স্থির করিয়া পারিতেছিলেন না, কারণ বহু হিন্দু ইহা সমর্থন করিয়া সভা করিতে লাগিলেন এবং ইহা রদ করিলে হিন্দুধর্ম্মের গায়ে হাত দেওয়া হইবে বলিয়াও দরখাস্ত করিলেন। যাঁহারা ইহার রহিতের চেষ্টা করিতেছিলেন তাহাদিগকে "সতীদ্বেষী" আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। রক্ষণশীলগণ যাহাতে সতীদাহ বন্ধ না হয় তজ্জন্য "ধর্ম্মসভা" বলিয়া একটি

হুগলী হইতে প্রথম সহমরণ রহিতের চেষ্টা

* Hindu Manners, Customs and Ceremonies by J. A. Dubais

† The Administration of the East India Company, by Gohn Kaye.

সভারও প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এই ধর্ম্মসভার সভাপতি ছিলেন। যাহা হউক, কেরী সাহেব, তাহার বন্ধু জর্জ উদনে এবং রামমোহন রায়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ আইন-বিরুদ্ধ বলিয়া একটি ঘোষণা করেন। রাধাকান্ত দেব ১৭ই নভেম্বর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে তারিণী চরণ মিত্রকে লেখেন—"I deeply regret to inform you that the Suttee petition was dismissed after a long argument for three days. The dismissal, however, was not unanimous and impartial as 4 lords of the Privy Council were in favour of the Petition and 6 against it." *

১৮৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে কর্ত্তৃপক্ষ সতীদাহ নিবারণ করিবার জন্য বিশেষ ভাবে তৎপর হন এবং সমস্ত থানার দারোগাগণকে কোন সতী সহমরণে যাইবেন শুনিলে, যেন তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া, নিরস্ত করিবার চেষ্টা করা হয়, এইরূপ নির্দ্দেশ দেন। দারোগাগণ যথাসম্ভব নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিত এবং প্রতিমাসে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উহার একটি তালিকাও পাঠাইত। নিম্নে দারোগাদের বিবৃতি প্রদত্ত হইল :

"আমি (দারোগার নাম) উক্ত মহিলাকে শান্তভাবে কোন গোলমালের সৃষ্টি না করিয়া সহমরণে যাইতে নিবৃত্ত করি এবং তাঁহাকে পরে গ্রামের মণ্ডলের হস্তে অর্পণ করি। মহিলাটি অনশনে প্রাণত্যাগ করিবে বলে এবং দুই দিবস যাবৎ কোনরূপ আহার্যও গ্রহণ করে নাই। কিন্তু তৃতীয় দিবসে তাঁহার দৃঢ়তা কিঞ্চিৎ শান্ত হয় এবং বর্ত্তমানে তিনি বেশ সন্তুষ্ট আছেন।"

I (the name of the Darogah) effectually and without disturbance restrained the woman form her purpose and gave her into the charge of the Gomastha and

* রাধাকান্ত দেব—শ্রীযোগেশ চন্দ্র বাগল—পৃঃ ৪০।

Mandal. For two days she refused food and declared she would die by starvation. Her resolution failed her on the third day and she has since been perfectly contented.

সতীদাহ প্রথা ভারতবর্ষ হইতে বর্ত্তমানে উঠিয়া গিয়াছে। এই সম্বন্ধে বহু সত্যবাদী নিরপেক্ষ বিদেশীয় মনীষী ভারতীয়গণের নৈতিক চরিত্রবলের এবং নারীর সতীত্ব ও শালীনতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক স্যার জন, কে লিখিয়াছেন—"প্রাচীন খৃষ্টান সংস্কারকদিগের মধ্যে অনেকে ধর্ম্মের জন্ম প্রাণ দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ হিন্দু সতীদের মত মৃত্যুকালে মহত্তর ধৈর্য্য দেখাইতে পারেন নাই। এই মহীয়সী মহিলাদের জগতে তুলনা নাই।"

কর্ণেল টড তাঁহার 'রাজস্থানে' লিখিয়াছেন, "জগতের কোন জাতির ইতিহাসে হিন্দুনারীর মত গভীর পতিপ্রেম, হাঁসিমুখে আত্মত্যাগ এবং পতিপরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত-কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না।"

হিন্দু রাজত্বে শাস্ত্রের ব্যবস্থানুযায়ী হিন্দু সমাজ পরিচালিত হইত; প্রধানতঃ মনুর অনুশাসন এবং পরাশর, বশিষ্ট ও জিমুতবাহনের ধর্ম্ম শাস্ত্রানুযায়ী রাজা প্রজাপালন করিতেন। ঋণ-গ্রহণ, ধন-দান, ব্যাভিচার, পরস্ত্রীগমন, নরহত্যা, চুক্তিভঙ্গ প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের অভিযোগ রাজার নিকট উপস্থিত করা হইত এবং তিনি তিনজন সুবিবেচক, সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ অমাত্য লইয়া বিচার করিতেন। মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষের তৎকালীন শাসন ও বিচার প্রণালী দেখিয়া যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহার কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল:

শাসন প্রণালী

A person convicted of bearing false witness suffers mutilation of his extremeties. He who maimed any one, not only suffers in return the loss of the same

limb, but his hair is also cut off. If any one causes an artisan to lose his hand or eye he is put to death."

প্রাচীন কালে এই অঞ্চলে হিন্দু ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীর বাস ছিল না। আর্য্যেরা প্রথমতঃ বিজিত ও অনুন্নত অনার্য্যগণকে হিন্দু সমাজে শূদ্ররূপে স্থান দিয়া সমন্বয়ের চেষ্টা করিলেও, পরবর্ত্তীকালে ভেদ ও অনৈক্যের জন্য জাতিভেদের এবং আর্য্য ও অনার্য্যগণের সংমিশ্রণের ফলে হিন্দু সমাজের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য অস্পৃশ্যতার উদ্ভব হয়। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন যে পৌরাণিক যুগে অস্পৃশ্যতা হিন্দুসমাজে দৃঢ়বদ্ধ ছিল।* খৃষ্টপূর্ব্ব পাঁচ শতক হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী কাল ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল এবং বর্ত্তমান হুগলী জেলার অঞ্চলসমূহেও যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অখণ্ড প্রতাপ-প্রতিপত্তি ছিল তাহা সুনিশ্চিত। বৌদ্ধধর্ম্মের এই প্লাবনে হিন্দুধর্ম্মের জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা যে শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

ধর্ম্ম ও জাতি

অষ্টম শতাব্দী হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব হ্রাস হইতে সুরু হয়। হিন্দু সমাজের শঙ্করাচার্য্য, কুমরিল ভট্ট প্রভৃতি ধর্ম্মাচার্য্যগণের আবির্ভাবে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান হয়। বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম যেরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, ভারতের অন্য কোন প্রদেশে সেইরূপ হয় নাই। নবম শতাব্দীর মধ্যে অন্যান্য প্রদেশে হিন্দু-ধর্ম্মের নব জাগরণ হইলেও, বঙ্গদেশে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধপ্রভাব ছিল বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি করা হয় না। সেইজন্য অন্যান্য প্রদেশের সনাতনী হিন্দুগণ বৌদ্ধাচারপ্লাবিত

* ভারতীয় সমাজ পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস

† Macrindle's Ancient India as described by Megasthenes.

বঙ্গদেশকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন এবং কান্যকুব্জ হইতে বৈদিক যজ্ঞ করিবার জন্য সেই কারণে ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ আনিবার প্রয়োজন হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মই এই অঞ্চলের বৌদ্ধধর্ম্মকে কুক্ষীগত করিয়া ফেলে। তাহার পর রঘুনন্দন নূতন করিয়া আবার সমাজবন্ধন করেন এবং তাঁহার মৃত বর্তমান হুগলী জেলার সদর ও শ্রীরামপুর মহকুমায় প্রচলিত হইলেও, দামোদরের পশ্চিম দিকে তাঁহার অনুশাসন চলে নাই। প্রভাকর মতের শালিকনথী পুঁথি এই অঞ্চলের ব্রাহ্মণদের পাঠ্য ছিল এবং তাঁহারা এই মতে দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠানাদি করিতেন। খানাকুল-কৃষ্ণনগরের পণ্ডিত ঠাকুরনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় রঘুনন্দনের 'দায়ভাগের' মত খণ্ডন করিয়া নিজ মত সংস্থাপন করেন। তাহার সঙ্কলিত স্মৃতির নাম "স্মৃতি-সর্ব্বস্ব"।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম

শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামী সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তার একমাত্র পুত্র ছিলেন এবং তিনি বুদ্ধদেবের ন্যায় পিতা, মাতা, স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্যই হুগলী জেলায় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া, প্রতি গ্রামে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হয় এবং বৌদ্ধধর্ম্ম শিথিল হইয়া যায়। "শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ—শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ"। শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ প্রভুর এই ছয় জন পার্ষদ বঙ্গদেশে দ্বাদশ পাটে শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া বঙ্গবাসীর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণভক্তি উদ্দীপিত করেন। উক্ত দ্বাদশ পাটের মধ্যে চারিটি পাট-ই হুগলী জেলায় অবস্থিত। সাধকশ্রেষ্ঠ অভিরাম স্বামী খানাকুলে, কমলাকর পিপলাই মাহেশে, উদ্ধারণ দত্ত কৃষ্ণপুরে এবং পরমেশ্বর ঠাকুর বিষখালি (তড়া-আঁটপুর) গ্রামে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়া এই জেলাকে ধন্য ও পবিত্র করেন।

"অভিরাম পূর্ব্বে সুদাস খানাকুলে স্থিতি।
খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রাম নাম খ্যাতি ॥
আকনা মাহেশে জন্ম জাগেশ্বরে স্থিতি।
কমলাকর পিপলাই এই যে নিশ্চিতি ॥
কমলাকর মহাবল পূর্ব্ব নাম হয়।
উদ্ধারণ দত্তের বাস কৃষ্ণপুর কয় ॥
হুগলীর নিকট হয় কৃষ্ণপুর গ্রাম।
উদ্ধারণ সুবাহু জানিবা পূর্ব্ব নাম ॥
পরমেশ্বর দাস পূর্ব্বে স্তোক কৃষ্ণ ছিল।
বোদখানাতে নাগর পুরুষোত্তম জন্মিল ॥
সাচড়াতে পরমেশ্বর দাসের বসতি।
পরমেশ্বর অর্জ্জুন সখা পূর্ব্বে এই খ্যাতি ॥"

দ্বাদশ-পাট ব্যতীত শ্রীচৈতন্য-ভক্তগণ বঙ্গদেশে আরো সতেরটী শ্রীপাট প্রতিষ্ঠা করেন; উক্ত সতেরটী শ্রীপাটের নিম্নোক্ত পাটবাড়ি হুগলী জেলার মধ্যে অবস্থিত।

"পঞ্চধাম দ্বাদশ পাট সপ্তদশ হয়।
ভক্তগণের সপ্তদশ সহ চৌত্রিশ পাট কয় ॥
চারটী বল্লভপুরে সেবা অনুপাম।
ভক্তগণ যে যে ছিল কহি তার নাম ॥
কাশীশ্বর শঙ্করারণ্য শ্রীনাথ আর।
শ্রীরুদ্র পণ্ডিত আদি বাস সবাকার ॥
বেলুনে অনন্তপুরী মহিমা প্রচুর।
বৃন্দাবনপাড়াবাসী শ্রী রাধাকী ঠাকুর ॥
গোপীনাথপাড়াতে সত্যানন্দ সরস্বতী।
বৃন্দাবন চন্দ্র সেবান করিয়া পিরীতি ॥

ত্রিবাটে মাধবাচার্য্য আর গঙ্গাদেবী।
যশড়াতে জগদীশ নিত্য বেনোদী ॥
খানাকুল কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বাস।
কৈয়ড় গ্রামেতে বেদগর্ভ পরকাশ ॥
ভঙ্গমোড়াতে বাস সুন্দরানন্দ নাম।
পরম বিদ্বান বিপ্র পণ্ডিত আখ্যান ॥
দ্বীপগ্রামে স্থিতি কৃষ্ণানন্দ অবধূত।
সোনাতলা রঙ্গাদেশে রঙ্গনকৃষ্ণ দাস নিশ্চিত ॥
রাধানগরেতে বাস যদু হালদার।
হীরামাধব দাস স্থিতি অনন্তনগর ॥
মহেশ গ্রামেতে বাস গোপাল দাস নাম।
কোটরাতে বাস অচ্যুত পণ্ডিত আখ্যান ॥" *

কৌলীন্য ও বহু-বিবাহ

প্রাচীন কালে হিন্দুগণ ধর্ম্মের অনুশাসন মানিয়া চলিতেন এবং সকলেই ধার্ম্মিক ছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। সম্রাট অশোকের সময় হইতে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হইতে আরম্ভ হয় এবং কালক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্ম্মে প্লাবিত হইয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ তিরোহিত হইয়া ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম একপ্রকার বিলুপ্ত হয়। পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধধর্ম্ম বিকৃত হইয়া নষ্টজ্ঞান বলিয়া আখ্যাত হয়।

কৌলীন্য

গৌড়েশ্বর আদিশূর দেশকে সামাজিক দুর্নিতির হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কান্যকুব্জ হইতে শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড় নামক পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু,

* অভিরাম দাস লিখিত 'পাট পর্য্যটন'—সাঃ পঃ পঃ ১৩১৮ সাল, পৃঃ ১০৮

কালীদাস মিত্র, দশরথ গুহ ও পুরুষোত্তম দত্ত নামক পাঁচজন ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় অর্থাৎ কায়স্থ আনিয়া এই দেশের নষ্টপ্রায় হিন্দুধর্ম্মের উন্নতিসাধনে যত্নবান হন।

"গৌড়েশ্বরো মহারাজো রাজসূয়মনুষ্ঠিতঃ।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজা দশ॥"

মহারাজা আদিশূর ও পালবংশীয় নৃপতিবৃন্দ এই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণকে বহু ভূসম্পত্তি দান করেন। ইহার পর সেনরাজাগণ এই দেশ অধিকার করেন এবং সেন বংশীয় নরপতি বল্লাল সেনের নাম চিরপ্রসিদ্ধ। আদিশূর আনীত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের বংশাবলী বহু বিস্তৃত হইয়া পড়ায় এবং ইহাদের সন্তান পরম্পরার মধ্যে বিদ্যালোপ ও আচারভ্রংশ হওয়ায় বল্লাল সেন বিশৃঙ্খল সমাজ পুনর্গঠনের জন্য আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা ও দান এই নয়টি গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে 'কুলীন' আখ্যা প্রদান করেন। কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপনের পর, তাঁহার আদেশে কতকগুলি ব্রাহ্মণ 'ঘটক' উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ঘটকগণ কুলীনগণের স্তুতিবাদ ও বংশাবলী কীর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহাদের দোষ-গুণ ও কৌলীন্যমর্য্যাদা সংক্রান্ত নিয়ম বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন।

আদি পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের সন্তানগণ বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে পরিব্যাপ্ত হওয়ায়, তাঁহাদের বংশধরগণ ছাপ্পান্নটি গ্রামে বসবাস করেন এবং সেই গ্রামের নাম অনুসারে 'গাঁই'য়ের সৃষ্টি হয়। বল্লাল সেনের কৌলীন্য প্রথা ব্যক্তিগত গুণের উৎকর্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, বংশানুক্রমিক ছিল না। নবগুণের 'আবৃত্তি' শব্দের অর্থ পরিবর্ত্ত, পরিবর্ত্ত চারিপ্রকারের, যথা আদান, প্রদান, কুশত্যাগ ও ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা।

"আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগস্তথৈব চ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেষু পরিবর্তশ্চতুর্বিধ ॥"

আদান অর্থাৎ সমান বা উৎকৃষ্ট গৃহ হইতে কন্যাগ্রহণ; প্রদান অর্থাৎ সমান অর্থাৎ উৎকৃষ্ট গৃহে কন্যাদান; কুশত্যাগ অর্থাৎ কন্যার অভাবে কুশময়ী কন্যার দান, ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ উভয় পক্ষে কন্যার অভাব ঘটিলে, ঘটকের সম্মুখে বাক্য মাত্র দ্বারা পরস্পরের কন্যাদান। সৎ কন্যার অভাবে আদান প্রদান সম্পন্ন হয় না। সুতরাং কন্যাহীন ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুললক্ষণাক্রান্ত হইতে পারেন না। এই দোষের পরিহারের নিমিত্ত কুশময়ী কন্যার দান ও ঘটক সমক্ষে কেবল মাত্র বাক্য দ্বারা পরস্পর কন্যাদানের ব্যবস্থা হয়।

লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে কৌলীন্য লইয়া মহা গোলমাল হওয়ায় নির্ব্বাচন প্রথা রদ হয় এবং কৌলীন্য বংশানুগত হইবে বলিয়া স্থির হয়। ইহার রাজত্বকালে কায়স্থ সমাজের ঘোষ, বসু, মিত্র প্রভৃতি কুলীনগণের 'পর্য্যায়' নির্দ্দিষ্ট হয় এবং সমপর্য্যায় ব্যতীত আদান প্রদান হইবে না বলিয়া এক নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। লক্ষ্মণ সেনের সময় হইতেই কৌলীন্য প্রথাটিকে জটিল করিয়া তোলা হয় এবং তাহার ফলস্বরূপ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের বিবাহের জটিলতা বৃদ্ধি করিয়া সমাজের যে কি অনিষ্ট হয় তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। তাঁহার রাজত্বকালে বঙ্গদেশ কিরূপ বিলাসে মগ্ন ছিল তাহা পবনদূত পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তৎকালীন সামাজিক দুর্নীতি ও অনাচার-ব্যভিচারের জন্যই হিন্দুশাসন বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হয়।

লক্ষ্মণ সেন নিয়ম করিলেন যে, কুলীন কন্যা যে ঘরে প্রদত্ত হইবে আবার সেই ঘর হইতে কন্যা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার নাম বংশ পরিবর্ত্তন। দ্বিতীয়তঃ কুলীনদের মধ্যে কে কিরূপ উঁচনীচ কুলে

আদান-প্রদান করিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিয়া কুলীনদের পদমর্য্যাদার সমতা স্থির করা হয় ; ইহার নাম সমীকরণ। কৌলীন্য সংস্থাপিত হইলে গৌড়ের ব্রাহ্মণগণ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হন ; প্রথম কুলীন, দ্বিতীয় শ্রোত্রীয় ; তৃতীয় বংশজ, চতুর্থ গৌণ-কুলীন, এবং পঞ্চম সপ্তশতী সম্প্রদায়।

ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে গৌড়দেশে মুসলমান প্রভাব আরম্ভ হয় ; এই সময় হইতে মহাপ্রভুর সময় পর্য্যন্ত মুসলমানদের সংস্পর্শে ও অত্যাচারে এবং কৌলীন্য প্রথার অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক ব্যবস্থার ফলে হিন্দুর প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা শিথিল হইয়া গেল। কুলীনের কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার জন্য, অর্থ দিয়া কুলীন পাত্র সংগ্রহ করিতে হইত এবং এই সুযোগে এক একজন কুলীন ব্রাহ্মণ শতাধিক বিবাহ করিয়া 'বিবাহ-ব্যবসায়' আরম্ভ করিয়া দিল ; ইহার ফলে ব্রাহ্মণ সমাজে যে কিরূপ অনাচার প্রবেশ করিল, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত উক্তি হইতেই প্রতীয়মান হইবে।

"কোন কারণে কুলীন মহিলার গর্ভসঞ্চার হইলে, তাহার পরিপাকের নিমিত্ত কন্যাপক্ষীয়দিগকে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। প্রথম, সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া জামাতার আনয়ন। তিনি আসিয়া দুই একদিন শ্বশুরালয়ে অবস্থিত করিয়া, প্রস্থান করেন। ঐ গর্ভ তাঁহার সহযোগে সম্ভব বলিয়া প্রচারিত ও পরিগণিত হয়। দ্বিতীয়, জামাতা আনয়নে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে, ব্যাভিচার সহচরী ভ্রূণহত্যা দেবীর আরাধনা। এ অবস্থায়, এ ব্যতিরিক্ত আর কোন পথ নাই। তৃতীয় উপায় অতি সহজ ও অতিশয় কৌতুকজনক। তাহাতে অর্থব্যয়ও নাই এবং ভ্রূণহত্যাদেবীর উপাসনাও করিতে হয় না। কন্যার জননী অথবা বাটির অপর গৃহিণী, একটি ছেলে কোলে করিয়া, পাড়ায় বেড়াইতে যান ; এবং একে একে প্রতিবেশীদিগের বাটীতে গিয়া, দেখ মা, দেখ বোন,

দেখ বাছা, এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিতে আরম্ভ করেন, অনেক দিনের পর কাল রাত্রিতে জামাই আসিয়াছিলেন; হঠাৎ আসিলেন, রাত্রিকাল, কোথায় কি পাব; ভাল করিয়া খাওযাইতে পারি নাই। অনেক বলিলাম, একবেলা থাকিয়া, খাওয়া দাওয়া করিয়া যাও; তিনি কিছুতেই রহিলেন না। বলিলেন, আজ কোন মতে থাকিতে পারিব না; সন্ধ্যার পরেই অমুক গ্রামের মজুমদারদের বাটীতে একটা বিবাহ করিতে হইবেক; পরে, অমুক দিন, অমুক গ্রামের হালদারদের বাটীতেও বিবাহের কথা আছে; সেখানেও যাইতে হইবেক, যদি সুবিধা হয়, আসিবার সময় এই দিক হইয়া যাইব। এই বলিয়া ভোর ভোর চলিয়া গেলেন। স্বর্ণকে বলিয়াছিলাম, ত্রিপুরা ও কামিনীকে ডাকিয়া আন, তারা জামাইর সঙ্গে, খানিক আমোদ আহ্লাদ করিবেক। একলা যেতে পারব না বলিয়া, ছুঁড়ি কিছুতেই এল না। এই বলিয়া, সেই দুই কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, এবার জামাই এলে, মা তোরা যাস ইত্যাদি। এইরূপে পাড়ার বাড়ী বাড়ী বেড়াইয়া, জামাতার আগমনবার্ত্তা কীর্ত্তন করেন। পরে স্বর্ণমঞ্জরীর গর্ভসঞ্চার প্রচার হইলে, ঐ গর্ভ জামাতৃকৃত বলিয়া পরিপাক পায়।" *

ক্রমশঃ যত দিন যাইতে লাগিল মুসলমানদের সংস্পর্শে ও শিক্ষায় দেশ তত বিলাসিতার প্লাবনে মগ্ন হইয়া গেল। বহু বিবাহ এই সময় দেশে বিশেষভাবে প্রচারিত হয় এবং জনসাধারণের মধ্যে খাদ্যাখাদ্যের বিচারও একপ্রকার উঠিয়া যায়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ গোমাংস ও মদ্য পান করিতেছেন, ইহাও তৎকালীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য, গোমাংস ভক্ষণ।
ডাকাচুরি পর গৃহ দাহ সর্ব্বক্ষণ॥" †

* বহু বিবাহ—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (গ্রন্থাবলী ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৯০-৩৯১)

† চৈতন্য ভাগবত—শ্রীবৃন্দাবনদাস; মধ্যখণ্ড।

কৌলীন্য প্রবর্ত্তিত হইবার পর, দশ পুরুষ গত হইলে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে দেবীবর ঘটক কুলীনদিগের মধ্যে 'মেলবন্ধন' করিয়া এই প্রথাকে জটিলতম করিলেন। মেল শব্দের অর্থ দোষ মেলন অর্থাৎ দোষ অনুসারে সম্প্রদায় বন্ধন। 'দোষান্ মেলয়তীতি মেলঃ।' দেবীবর সকল কুলীনকেই দোষাশ্রিত দেখিয়া এক এক প্রকারেব দোষে দুষ্ট কুলীনদিগকে লইয়া এক একটি মেল সৃষ্টি করিলেন। যাঁহারা তাহার বিপক্ষে ছিলেন, তাঁহাদিগকে নিষ্কুলীন করিয়া 'বংশজ' আখ্যা দিলেন। বিভিন্ন প্রকার দোষে দুষ্ট কুলীনগণকে ছত্রিশ ভাগে বা 'মেলে' বিভক্ত করা হয। তিনি প্রতি মেলে দুই দুইজনকে প্রধান বলিযা স্বীকার করিলেন। যাঁহার হইতে মেলের উৎপত্তি হয তিনি প্রকৃতি এবং তাহার সহিত কুল করিযা যিনি সমমর্য্যাদা সম্পন্ন হইলেন, তিনি 'পালটি'। এইরূপ মেলবন্ধনের পূর্ব্বে কুলীনগণের আটঘরে পরস্পর আদান প্রদান চলিত কিন্তু দেবীবরের কৃপায় প্রত্যেক মেলের মধ্যে যে যাহার 'প্রকৃতি' ও যে যাহার "পালটি" তাহাদের মধ্যেই কেবলমাত্র আদান প্রদান চলিবে। ইহাই স্থির হইল।

কোন কোন দোষে, কি কি মেল বন্ধন হইযাছিল, তাহা 'দোষমালা' গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে, নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল:

"অনূঢ়া শ্রীনাথ সুতা ধন্ধঘাটস্থলে গতা।
হাঁসাইখানদারেণ যবনেন বলাৎকৃতা ।।
ধন্ধস্থানগতা কন্যা শ্রীনাথচট্টজাত্মিজা।
যবনেন চ সংস্পৃষ্টা সোঢ়া কংসসুতেন বৈ ।।"

অর্থাৎ শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দুই অবিবাহিতা কন্যা ছিল; হাঁসাই নামক জনৈক মুসলমান, ধন্ধ নামক স্থানে বলাৎকার করিয়া তাহাদের সতীত্ব নষ্ট করে। পরে এক কন্যা কংসারিতনয় পরমানন্দ পতিতুণ্ড

ও আর এক কন্যা গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিবাহ করেন। ইহাদের সহিত যাহারা আদান প্রদান করেন তাহারা 'যবনদোষে দূষিত' হন। ইহা 'খন্দদোষ' ব িয়া খ্যাত। সুতরাং যবনদোষে দুষ্ট কুলীনগণ তাহাদের 'পালটি' ঘর ব্যতীত অন্যত্র বিবাহ করিতে পারিবে না। কারণ অন্য কুলীন, যাঁহাদের দোষ নাই, ইহাদের সহিত বিবাহাদি হইলে, তাহারাও যবনদোষ প্রাপ্ত হইবে বলিয়া 'পালটি' ব্যতীত বিবাহ নিষিদ্ধ হয়।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রন্থ; এই শতাব্দীতে বঙ্গদেশের বহু পরিবর্তন সাধিত হইলেও, কৌলীন্যের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে "সূতা বেচা কড়ি" দিয়া কুলীনের ব্রাহ্মণীকে স্বামীর রুষ্ট মুখকে মিষ্ট করিতে হইত, দৃষ্ট হয়। সুতরাং কুলীনত্বের প্রভাব অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বঙ্গদেশে পুরামাত্রায় বজায় ছিল।

বহু-বিবাহ

কৌলীন্যের এইরূপ মূঢ় ব্যবহার ফলে কুলীন-কন্যার বিবাহ দেওয়া যেমন দুঃসাধ্য হইল, বংশজদের মধ্যে পুত্রের বিবাহ দেওয়াও সেইরূপ অসম্ভব হইল। একদিকে কুলীনগণ শত শত বিবাহ করিতেন, অন্যদিকে বংশজগণ বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পারিতেন না, কারণ কন্যা সংগ্রহের জন্য পণ দিতে হইত। বংশজ ব্রাহ্মণগণের কন্যা সংগ্রহ করিবার জন্য একদল প্রতারকের দল ব্যবসায়ী, বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে নিম্নশ্রেণীর বালিকা আনিয়া, ব্রাহ্মণ-কন্যা বলিয়া পরিচয় পূর্ব্বক মূল্য লইয়া বিবাহ দিয়া দিত। নৌকা বা 'ভরা' করিয়া এই সব মেয়েকে আনয়ন করা হইত বলিয়া ইহাদিগকে 'ভরার মেয়ে' বলিত। বলা বাহুল্য, এইরূপ দেশাচারের ফলে, কুলীন-কন্যাগণ অনূঢ়ার মত পিতৃগৃহেই থাকিত এবং বংশজ ছেলেরা কন্যাভাবে ও অর্থাভাবে চিরকাল অবিবাহিত রহিত। এই জন্য সমাজের মধ্যে কিরূপ ব্যভিচার চলিত, তাহা ভাষায় ব্যক্ত না করাই ভাল। পণ্ডিত

রামনারায়ণ তর্করত্ন বিরচিত ‘কুলীনকুল সর্ব্বস্ব’ নামক বঙ্গের প্রথমাভিনীত নাটকে ইহার জলন্ত চিত্র অঙ্কিত আছে।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু-বিবাহ প্রথা রদ করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি লিখিয়াছেন “কুলীন ভগিনী ও কুলীন ভাগিনেয়ীদের বড় দুর্গতি। তাঁহাদিগকে, পিত্রালয়ে অথবা মাতুলালয়ে থাকিয়া, পাচিকা ও পরিচারিকা উভয়ের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হয়। পিতা যত দিন জীবিত থাকেন, তত দিন কুলীন মহিলার নিতান্ত দুরবস্থা ঘটে না। পিতার দেহত্যাগের পর, ভ্রাতারা সংসারের কর্ত্তা হইলে, তাহারা অতিশয় অপদস্থ হন। প্রখরা ও মুখরা ভাতৃভার্য্যারা তাহাদের উপর, যার পর নাই, অত্যাচার করেন। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ, রাত্রিতে নিদ্রাগমন, এ উভয়ের অন্তবর্ত্তী দীর্ঘ কাল, উৎকট পরিশ্রম সহকারে সংসারের সমস্ত কার্য্য করিয়াও, তাঁহারা সুশীলা ভাতৃভার্য্যাদের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না। ভাতৃভার্য্যারা সর্ব্বদাই, তাহাদের উপর খড়্গাহস্ত। তাঁহাদের অশ্রুপাতের বিরাম নাই বলিলে, বোধহয় অত্যুক্তি দোষে দুষিত হইতে হয় না। অনেক সময় লাঞ্ছনা সহ্য করিতে না পারিয়া, প্রতিবেশীদিগের বাটীতে গিয়া, অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে, তাহারা আপন অদৃষ্টের দোষকীর্ত্তন ও কৌলীন্য প্রথার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং পৃথিবীর মধ্যে কোথাও স্থান থাকিলে, চলিয়া যাইতাম, আর এ বাড়ীতে মাথা গলাইতাম না এইরূপ বলিয়া, বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া মনের আক্ষেপ মিটান। উত্তরসাধকের সংযোগ ঘটিলে অনেকানেক বয়স্থা কুলীন মহিলা, যন্ত্রণাময় পিত্রালয় ও মাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া বারাঙ্গনা বৃত্তি অবলম্বন করেন। তাঁহাদের যন্ত্রণার বিষয় চিন্তা করিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, এবং যে হেতুতে তাঁহাদিগকে ঐ সমস্ত দুঃসহ ক্লেশ ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনুষ্যজাতির উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মে।”

বংশজগণ কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করিতেন তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি ; নিম্নে ১২৪৪ সালের ৫ই আষাঢ় তারিখে প্রকাশিত "সমাচার দর্পণের" একটি পত্র হইতে এক শতাব্দী পূর্ব্বে হিন্দু সমাজের যে কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা জানা যাইবে।

"অন্যদেশীয় লোকেরদের বিদ্যা বুদ্ধি বল কৌশলাদি অনেক সম্পত্তি আছে তাঁহারা এই সকল নানাবিষয়ে অহঙ্কার করিতে পারেনা এতদ্দেশীয় লোকেরদের উক্ত সম্পত্তি নাই কেবল জাতি লইয়া ইহাঁরদিগের অহঙ্কার কিন্তু বিবেচনা করিলে এইক্ষণে তাহাও গিয়াছে। সম্পাদক মহাশয় এ দেশের কুলীনবংশজ ব্রাহ্মণেরাই জাতি লোপ করিয়াছেন তাহার কারণ আমি বিশেষ করিয়া বলি আপনি বিবেচনা করিবেন। বংশজ ব্রাহ্মণেরা কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন কিন্তু তাহাতে অনেক জাতির কন্যা চলিয়া যায়। অধিক কি কহিব কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহকরণ ব্যবহার থাকাতে বংশজ ব্রাহ্মণ মোসলমানের কন্যাপর্য্যন্তও বিবাহ করিয়াছেন আমি ইহার কএক প্রমাণ লিখিতেছি।

১। এক সময়ে কন্যাবিক্রয়ি দুই ব্রাহ্মণ বর্দ্ধমান দিয়া আসিতেছিল তাহাতে পথিমধ্যে এক সুরূপা বালিকাকে দেখিয়া তাহাকে ক্রয়করণার্থ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পরে তাহারদিগের অভিলাষ বুঝিয়া এক জবনী কহিল ব্রাহ্মণঠাকুর এইটি মোসলমানের কন্যা ইহার কেহ নাই শিশুকালাবধি আমি প্রতিপালন করিয়াছি তোমরা মোসলমানের কন্যাকে লইয়া কি করিবা তাহাতে ব্রাহ্মণেরা কহিল ভাল সে কথা পরে সংপ্রতি তুমি দিবা কি না তাহা বল অনন্তর জবনীকে ছয় টাকা দিয়া কন্যাকে ক্রয় করিল এবং বাজারে আসিয়া একখানি শাড়ী কিনিয়া তাহাকে পরাইয়া লইয়া চলিল কিন্তু পথের মধ্যেই কুমারীকে শিক্ষা দিল কাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিবেনা পরে ঐ ধূর্ত্তেরা সন্ধ্যাকালে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে গিয়া অতিথি হইল তাহার দুই মাস পূর্ব্বে গৃহস্থ ব্রাহ্মণের স্ত্রী

বিয়োগ হইয়াছে তাহাতে ব্রাহ্মণ ব্যাকুল ছিলেন সেই শোকের সময়ে দিব্যাঙ্গনা দেখিয়া অতিথির নিকট ঘনাইয়া বসিলেন ঐ ব্রাহ্মণের সম্পত্তিও কিঞ্চিৎ ছিল অতএব বিবাহের প্রস্তাব করিয়া মূল্যের ডাক আরম্ভ হইল বিক্রেতারা প্রথমতঃ পাঁচশত টাকা চাহিল কিন্তু শেষ চারিশত টাকা রফা হইলে তৎক্ষণাৎ টাকাগুলি গণিয়া লইযা সেই রাত্রিতে বিবাহ দিল এবং পরদিবস প্রাতে উঠিযা তাহারা প্রস্থান করিল অনন্তর গৃহী সকল জ্ঞাতি কুটুম্বাদিকে গৃহিণীর পাকান্ন ভোজন করাইযা এক বৎসর পর্য্যন্ত ঐ স্ত্রীকে লইয়া সুখভোগ করেন তাহার পরে এক দিবস লাউ পাক করিতে ঐ স্ত্রী অভ্যাস প্রবুক্ত হঠাৎ কহিযা উঠিল যে "কদু ছে কেযা ছালান হোগা" এই কথা শুনিযা ব্রাহ্মণের ভগিনী তাহার মাতাকে ডাকিয়া কহিল "ওমা শুন্ আসিযা তোর বৌ কি বলিতেছে" তাহার পরে জিজ্ঞাসা করিবাতে জবন কন্যা আপন জাতিকুলের সকল কথাই ভাঙ্গিযা বলিয়া ফেলিল তাহাতে ব্রাহ্মণ চমৎকার ভাবিযা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেন।

২। কলিকাতা শহরের সীমাসংযুক্ত পূর্ব্বাংশবাসি—মুখোপাধ্যায় এক সাহেবের হিন্দুস্থানীয উপপত্নী ব্রাহ্মণীর কন্যাকে বিবাহ করেন ঐ কন্যা সাহেবের ঔরসজাত পরে তাহার গর্ভে মুখুর্য্যের এক কন্যা এবং তাহাকে রাঢ়দেশবাসী এক শুদ্ধাচার বিশিষ্ট পরনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে বিবাহ দেন ঐ পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী কলিকাতাতেই ছিল পরে বিবাহ করিযা বাটীতে গেলেন তিনি ঐ ভার্য্যাতে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত সহবাস করিবাছিলেন এবং তাহার গর্ভে দুই তিনটা সন্তানও জন্মিল পরে টের পাইলেন সাহেবের দৌহিত্রী বিবাহ করিয়াছেন কিন্তু পণ্ডিতের যজমান শিষ্য ও জ্ঞাতি কুটুম্ব অনেক আছেন সাহেবের কন্যার অন্নে সকলের উদর পবিত্র হইয়াছে।

৩। কাজলা পাড়াতেও দুই ব্রাহ্মণ ঘটকের কথা প্রমাণে কন্যা

কিনিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু বহুকালের পর সন্তানাদি উৎপত্তি করিয়া শেষ টের পাইলেন ঘটকেরা প্রতারণাপূর্ব্বক মালাকারের কন্যা বিবাহ দিয়াছে।

৪। ভাটপাড়াতেও এক ব্রাহ্মণ ক্রীতা কন্যা বিবাহ করেন এবং বহুকাল সহবাস করিয়া শেষ জানিলেন পোদজাতীয় বৈষ্ণবের কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছেন এতদ্ভিন্ন কলিকাতা শহরের মধ্যে এইরূপ স্ত্রী অনেক আছে আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি ভারি২ পণ্ডিত ন্যায়রত্নের ও প্রধান২ বাঁড়ুয্যের ঘরে যে তাঁহারদিগের পুত্র পৌত্রাদির গৃহিণী সকল আছেন তাহারদিগের মধ্যে অনেকেই ধোপা নাপিত বৈষ্ণব মালি কামার কপালির কন্যা কিন্তু সম্পত্তিশালী ব্রাহ্মণের ঘরে পড়িয়া পবিত্রা ব্রাহ্মণী হইয়া গিয়াছেন এখন তাঁহারদিগের পাকান্ন সকলেই পবিত্রজ্ঞান করেন।"

কৌলীন্য প্রথা, বহু-বিবাহ এবং তাঁহার আনুসঙ্গিক রীতিনীতিতে দেশ হইতে ভগবদভক্তি অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। ব্রাহ্মণ হিন্দু সমাজের শিরোভূষণ, তাহাদের জীবনের কার্য্যাবলী, প্রত্যক্ষ করিয়া অন্যান্য জাতিগণ তাহাদের অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিল, দেশ হইতে প্রেম-ভক্তি লুপ্ত হইল। এই সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কবিতাটি, তৎকালীন অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করিবে।

"কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সব এইমাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিবাহে।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়ে॥

যে বা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারও না জানে গ্রন্থ অনুভব ॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যমপাশে বান্ধিয়া মারে ॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বহি কার গুণ না করে বাখন ॥
যে বা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানি।
তা সবার মুখেও নাহি হরিধ্বনি।
অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময।
গোবিন্দ পুণ্ডরিকাক্ষ নাম উচ্চারয ॥
গীতা ভাগবত যে জনাতে পড়ায।
ভক্তির বাখান নাই তাহার জিহ্বায ॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবস্থার রসে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি নাহি কার বাসে ॥
বাসলি পূজযে কেহ নানা উপচারে।
মদ্য মাংস দিযা কেহ যক্ষ পূজা করে ॥” *

বঙ্গদেশ যখন এইভাবে নীতিভ্রষ্ট হইযা কদাচারে মগ্ন, হিন্দুগণও মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের অত্যাচারে যখন দলে দলে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে, ঠিক সেই সময় শ্রীচৈতন্যদেব নদীযা নগরে অবতীর্ণ হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রেম ও ভক্তির প্লাবনে বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়া বঙ্গবাসীর কলুষরাশি ধৌত পূর্ব্বক ‘ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামিচ যুগে যুগে’ এই শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ করিয়া

* চৈতন্য ভাগবত—শ্রীবৃন্দাবন দাস

দিলেন। তাঁহার প্রচারিত সুমধুর বৈষ্ণব ধর্ম্ম বঙ্গদেশের কদাচারের মোড় ঘুরাইয়া দিল।

হুগলী জেলা হইতে বহু বিবাহ রোধ আন্দোলন

হুগলী জেলা হইতে কুলীনদের বহু বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথম রাজা রামমোহন রায় আন্দোলন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এই সম্বন্ধে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ তারিখের নিম্ন-লিখিত সংবাদ হইতে তাহা প্রমাণিত হইবে। "ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইংলণ্ডাধিপতি রাঢ়ীয় শ্রেণী কুলীন ব্রাহ্মণদের প্রতি কোন নিয়ম না করাতে লক্ষ ২ সধবা থাকিয়াও বৈধব্যাচরণ ও বেশ্যা হইতেছে। যদি ধর্ম্মাবতার শ্রীল শ্রীযুক্ত লর্ড অকলণ্ড গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর কৃপাবলোকন পূর্ব্বক কোন নূতন চার্টার করেন তবে ভূরি ২ স্ত্রীলোকের জাতি ও ধর্ম্মরক্ষা পাইয়া তাঁহার পুত্র পৌত্রাদিদিগের আশীর্ব্বাদে নিযুক্ত থাকেন। বিশেষতঃ প্রজার পাপ যথাশাস্ত্র রাজার হইতে পারে। এবং এই বিষয়ের নিমিত্ত ৺রামমোহন রায়ের একান্ত মানস ছিল তাঁহার ইউরোপে গমনেতে নিতান্ত ভরসা ছিল যে এ সকল বিষয় শ্রীল শ্রীযুক্ত বাদশাহের হুজুরে প্রস্তাব করিবেন। কিন্তু এ দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ শীঘ্র তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন!"

তৎকালীন 'সমাচার দর্পণ', 'জ্ঞানান্বেষণ' 'সংবাদ সুধাকর' প্রভৃতি পত্রগুলিতে বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে বহু আন্দোলন হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে এই আন্দোলন সুরু হয়, কিন্তু তৎকালীন গোঁড়া হিন্দুগণ বহু বিবাহ বর্ত্তমানে হয় না বলিয়া, এইরূপ আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের জ্ঞানান্বেষণ পত্রে কোন কুলীন কত বিবাহ করিয়াছিলেন তাহার নাম, নিবাস এবং বিবাহের সংখ্যা প্রকাশিত হয়, উহা হইতে বিরোধীগণের কথা যে ভ্রমাত্মক তাহাই প্রমাণিত হইয়াছিল। রেভারেণ্ড লং সাহেব The Banks of the Bhagirathi নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "A Kulin Chandra

Bandopadhya was kilied here 30 years ago. He was married to 100 wives and was murdered by the brothers of one of them on account of his profligate conduct towards his sister. 8 of his wives performed Suttee on his funeral pyre."*

১৪ই মার্চ্চ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে শান্তিপুর নিবাসী স্ত্রীগণ. বিধবাদের পুনরায় বিবাহ হয় অথচ কুলীন কন্তাদের সম মেল না হইলে বিবাহ হয় না বলিয়া তদ্বিষয়ে একখানি করুণ পত্র প্রকাশিত হয়, নিম্নে পত্রখানির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল :

"কেবল আমারদিগের এই বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালির মধ্যে যে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের কন্তা বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হয় না এবং কুলীন ব্রাহ্মণের শুদ্ধ সম মেল না হইলে বিবাহ হয় না। যগ্যপি ঐ স্ত্রীলোকেরা উপপতি আশ্রয় করে তবে যে কুলোদ্ভবা সে কুল নষ্ট হয়। কিন্তু উভয় বিশিষ্ট কুলোদ্ভব মহাশয়েরা অনায়াসে বেশ্যালয়ে গমনপূর্ব্বক উপস্ত্রী লইয়া সম্ভোগ করেন তাহাতে কুল নষ্ট হয় না।......যাহা হউক অবলার অবলা মনোব্যথা শমতা করণের কর্ত্তা পতি অভাবে ভূপতি। অতএব নিবেদন এইক্ষণে ধার্ম্মিক রাজা ইঙ্গরেজ বাহদুর নানাবিধ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতেছেন। আমারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে এই যাতনা নির্দ্ধারণের উপায় আছে তাহা প্রাচীন পুরাণ ও শাস্ত্রে দৃষ্টিপূর্ব্বক ও প্রধান ২ পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বারা অবগত হইয়া শুদ্ধ সদ্বিচার করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক আইন অনুসারে প্রকাশ করেন। কিম্বা বিশিষ্ট কুলোদ্ভব মহাশয়েরদিগের উপস্ত্রী সহিত সম্ভোগ রহিত করেন তাহা হইলে আমারদিগের ধর্ম্ম বলবৎ হয় এবং রাজার প্রধান ধর্ম্ম সংস্থাপন হয়।"

ইহার পর 'চুঁচুড়ানিবাসী স্ত্রীগণস্য' কর্ত্তৃক লিখিত পূর্ব্বোক্ত পত্রের

* Calcutta Review, 1846. Vol VI. Pages 398—448.

প্রত্যুত্তর ২১শে মার্চ্চ তারিখের পত্রে প্রকাশিত হয়। নিম্নে চুঁচুড়ার মহিলাবৃন্দের পত্রখানি হুবহু উদ্ধৃত হইল :

"শ্রীযুক্ত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। শান্তিপুর নিবাসী স্ত্রীগণ আপনারদের দুঃখ প্রকাশার্থ অগ্রসর হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমরা পরম সন্তুষ্ট হইলাম। তাঁহারা এইক্ষণে যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিতে আমাদেরও বহুকাল যত্ন ছিল। কিন্তু সহকারী না থাকাতে ভয়প্রযুক্ত আমরা অগ্রসর হইতে পারি নাই এইক্ষণে সেই ভয় দূর হইল অতএব আপনাদের সঙ্গে দুঃখসম্বেদক রোদন করিতে আমরা মিলি। প্রথমতঃ আমারদের পিত্রাদি ও ভ্রাতৃবর্গের নিকটে জ্ঞাপন করিতেছি কিন্তু দেখা যাউক তাহাতে কি ফল হয়।

১। হে পিতঃ ও ভ্রাতরঃ সভ্যদেশীয় স্ত্রীগণের যেমন বিদ্যাধ্যয়ন হয় তদ্রূপ আমারদের কি নিমিত্ত না হয়। আপনারা কি ইহা বুঝেন যে বিদ্যাধ্যয়ন করিলেই সাংসারিক নীতি ও ধর্ম্ম প্রতিপালন হইতে পারে না।

২। অন্যান্য দেশীয় স্ত্রীলোকেরা যেমন স্বচ্ছন্দে সকল লোকের সঙ্গে আলাপাদি করে আমারদিগের তদ্রূপ করিতে কেন না দেন। কি আমারদের স্বভাবপ্রযুক্ত কি আমারদের দেশে কোন বাধা আছে যে এমত ব্যবহার করা হইতে পারে না। ফলতঃ প্রথমতঃ আপনারা অবিবেচনা পূর্ব্বক এই ব্যবহারে আসক্ত আছেন এইক্ষণে তাহা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ।

৩। বলদ ও অচেতন দ্রব্যাদির ন্যায় আমারদিগকে কি নিমিত্ত হস্তান্তর করিয়া আপনারা নির্দয়াচরণ করিতেছেন। আমরা কি আপনারাই বিবেচনাপূর্ব্বক স্বামী মনোনীত করিতে পারি না। আপনারা কহেন যে আমারদের কুলধর্ম্ম ও সম্ভ্রম বজায় রাখিতে হইবে এই নিমিত্ত কোন বিবেচনা করিয়া যাহারদের সঙ্গে আমারদের কখন কিছু জানা শুনা নাই এবং বিদ্যা কি রূপ ধনাদি কিছু নাই এমত পোড়া কপালিয়ারদের সঙ্গে

কেবল ছাইর কুলের নিমিত্ত আমারদের বিবাহ দিতেছেন এবং যখন অতি বালিকা অর্থাৎ ৪।৫।১০।১২ বর্ষবয়স্কা এমত অজ্ঞানাবস্থায় আমারদিগকে দান করিতেছেন। সংসারের মধ্যে প্রবেশের কি এই উচিত সময়। ইহাতে কি কুফল হইতেছে তাহাও আপনারা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। আমরা তাহার বিস্তার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া লোকের ঘৃণা জন্মাইব না। যে ব্যাপারেতে আমাদের সুখ দুঃখের ক্ষতি বৃদ্ধি সেই কর্ম্মেতে যদি আমারদিগের বিবেচনা করিতে ভার দিতেন তবে কি তাহাতে আপনারদের কুলের সম্ভ্রম ও আমারদের সুখের হানি হইত। ফলতঃ প্রার্থনা যে এই বিষয়ে আপনারা কেবল সাধারণ কর্ত্তৃত্ব করেন আমারদের প্রতি মনোনীত করণের ভার থাকে।

৪। হে পিতঃ ও ভ্রাতরঃ আপনারা কেহ২ টাকা লইয়া আমারদিগকে বিবাহ দিতেছেন তাহাতে যাঁহারা মূল্য অধিক ডাকেন তাঁহারাই আমারদের স্বামী হন এবং আমরা তাঁহারদের ক্রীত সম্পত্তির মধ্যে গণ্যা হই। তাহাতে যে টাকা পাওয়া যায় তাহা যদি আমারদিগকে স্ত্রীধন বলিয়া দেওয়া যাইত তবে সে স্বতন্ত্র কথা ছিল কিন্তু সেই সকল টাকা লইয়া আপনারা নিজ ব্যয় করিতেছেন। অতএব ইহাতে আমারদিগকে জীবদ্দশাতে বিক্রয় করা হইতেছে। যদি আমারদের দেশের শাসনকর্ত্তা এই ঘৃণ্যব্যাপারে সহিষ্ণুতা করেন তবে পাপভাগী হইবেন কিন্তু পরমেশ্বর যে কত কাল সহিবেন তাহা কহা যায় না। তিনি আপনারদের অপরাধ মার্জনা করুন।

৫। যাঁহারদের অনেক ভার্য্যা আছে তাঁহারদের সঙ্গে কেন আমারদের বিবাহ দিতেছেন। যাঁহার অনেক ভার্য্যা তিনি প্রত্যেক ভার্য্যা লইয়া সাংসারিক যেমন রীতি ও কর্ত্তব্য তাহা কিরূপে করিতে পারেন।

৬। ভার্য্যার মৃত্যুর পরে স্বামী পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে তবে কেন স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পরে বিবাহ করিতে না পারে। পুরুষের যেমন বিবাহ

অনুরাগ তেমন কি স্ত্রীর নাই। এই স্বাভাবিক বিরুদ্ধ নিয়মেতে কি দুষ্টতার দমন হয়। হে প্রিয় পিতঃ ও ভ্রাতৃগণ এই সকল বিষয়ে মনোমধ্যে যথার্থ বিচার করিয়া করুন দেখি যে আমারদিগকে আপনারা কিরূপ দুঃখিনী ও গোলামের ন্যায় অপমানিতা দেখিতেছেন।…১৫ মার্চ ১৮৫৫। চুঁচুড়ানিবাসী স্ত্রীগণস্য।"

হুগলী জেলার স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র সর্ব্বপ্রথম 'বন্ধুবর্গ সমবায়' নামক একটি সমিতি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক উহার পক্ষ হইতে বহু বিবাহ অশাস্ত্রীয়, সুতরাং ইহা রহিত করা বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বর্দ্ধমানের মহারাজার নেতৃত্বে এক আবেদন প্রেরণ করেন, কিন্তু বিপক্ষ দল কর্ত্তৃক বহু বিবাহ রোধ করিলে হিন্দুধর্ম্ম লোপ পাইবে বলিয়া আর একটি দরখাস্ত প্রেরিত হইলে, দুইটি আবেদনই কিছুকালের জন্য চাপা পড়িয়া থাকে। ইহার দুই বৎসর পর অর্থাৎ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় রমাপ্রসাদ রায় বহু বিবাহ রোধ করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান হন এবং ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদের ৪৩শ ধারানুসারে ব্যবস্থাপক সভা হইতে আইন দ্বারা এই কুপ্রথা রদ করিবার ব্যবস্থা হয়, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের জন্য কেহ এই দিকে মনোযোগ দেন নাই বলিয়া আইন প্রণয়ন পিছাইয়া যায়। তারপর বারাণসী নিবাসী স্বর্গীয় রাজা দেব-নারায়ণ সিংহও এই বিষয়ে উদ্যোগী হন।

এই দিকে পশ্চিম বঙ্গে প্রধানত পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং পূর্ব্ববঙ্গে স্বর্গীয় রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বহু বিবাহের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করেন। রাসবিহারী বাবু নিজে কুলীন ব্রাহ্মণ এবং বহু বিবাহ করিয়া তাহার বিষময় ফল ভোগ করেন বলিয়া ইহা রহিত করিতে তিনি বদ্ধপরিকর হন এবং গ্রামে গ্রামে গান গাহিয়া বহু বিবাহের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে প্রচার কার্য্য করেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টা অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না।

তিনি স্বয়ং হুগলী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং হুগলী জেলার প্রতি গ্রামে যাইয়া বহুবিবাহের সন্ধান লইয়া তাহা ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া প্রমাণ করিয়া দেন যে, বহু বিবাহ বর্ত্তমানে বিদূরিত হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা দাবী করিতেছেন, তাহারা নির্জ্জলা মিথ্যাকথা বলিতেছেন। সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার পক্ষ হইতে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বিশ সহস্রের অধিক সংখ্যক ব্যক্তি বহু বিবাহ রদ করিবার জন্য পুনরায় রাজদরবারে এক আইন প্রণয়নের জন্য আবেদন করেন। উক্ত আবেদনে হুগলী জেলার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সেওড়াফুলীর রাজা পূর্ণচন্দ্র রায়, ভান্ডাড়ার যজ্ঞেশ্বর সিংহ, রামগোপাল ঘোষ, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক, দ্বারকানাথ মিত্র, প্যারিচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর), দুর্গাচরণ লাহা, কোন্নগরের শিবচন্দ্র দেব, ও পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সাক্ষর করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থানের সাক্ষরকারীদের মধ্যে বর্দ্ধমানাধিপতি মহাতাপ চন্দ্র বাহাদুর, নবদ্বীপাধিপতি সতীশচন্দ্র রায়, পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, বারুইপুরের রাজকুমার রায় চৌধুরী, চকদিঘির সারদাপ্রসাদ রায়, টাকীর প্রিয়নাথ চৌধুরী, জাড়ার শিবনারায়ণ রায়, কলিকাতার শম্ভূনাথ পণ্ডিত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হীরালাল শীল, শ্যামাচরণ মল্লিক, রামচন্দ্র ঘোষাল, দ্বারকানাথ মল্লিক, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, দয়ালচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্র দত্ত, নৃসিংহ দত্ত, গোবিন্দচন্দ্র সেন, ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শ্যামাচরণ সরকার, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতির নামে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারত সরকার হইতে, বঙ্গের তৎকালীন ছোটলাট স্যার সিসিল বিডনকে, বহু বিবাহ আইন করিয়া নিষিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে, এই বিষয়ে ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয় এবং তদনুযায়ী ছোটলাট বাহাদুর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মিঃ সি, হবহাউস, মিঃ এইচ, ব্রিন্সেপ এবং কলিকাতার বিশিষ্ট কয়েকজন হিন্দুকে লইয়া একটি

কমিটি গঠন করিয়া দেন, এবং উক্ত কমিটিকে এই গুরুতর বিষয়টি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া, তাহাদের মতামত জানাইতে অনুরোধ করা হয়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কমিটি আইন প্রণয়নের পক্ষে মত না দেওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার মতামত পৃথক ভাবে দেন। কমিটির হিন্দু সভ্যের অধিকাংশই বহু বিবাহের সপক্ষে থাকায় এইরূপ মতামত গৃহীত হইয়াছিল। নিম্নে কমিটির মতামত উদ্ধৃত হইল :

"The report of the the committee was submitted in February 1867. The Kulin Brahmins being the class to whom the excesses complained of were almost exclusively confined (and chiefly to the Bhongho Kulins) the committee gave a sketch of the origin of this denomination of Brahmins and of the various classes of Kulins existing at the time. They also enumerated the customs prevalent, from which the alleged abuses (which they believed to be exaggerated and on the decline) took their rise. They further proved very clearly that these customs had for the most part no warrant among the approved authorities of Hindu Theology. Thus far, in the opinion of committee, the path for legislation was smooth enough, as a declaratory act might be passed setting forth the law on the subject of polygamy and making any infraction of it penal. But the report further showed that, although the chief abuses of polygamy would be condemned by a reference to the authorized Hindu law, this law at the same time warranted the suppression of one wife and the contraction of subsequent marriages on many grounds which in the eye of English law were firivolous and untenable. They, therefore pointed out that, owing to the restriction imposed upon them that legal sanction to

polygamy was not to be conveyed, they were unable to recommend even the passing of a declaratory Act of the kind related above." *

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর প্রায়ই বিদ্যাসাগর মহাশয় হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রামে যাইয়া বহু-বিবাহকারী কুলীনদিগের সন্ধান করিবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম এবং জলের ন্যায় অর্থব্যয় করেন। আজ তাঁহার চেষ্টায় বহু-বিবাহ প্রথার প্রাবল্য বিনা আইনে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পাঁচটির কম যাঁহারা বিবাহ করিয়াছিলেন, তিনি তদসংগৃহীত তালিকা হইতে তাঁহাদের নাম বাদ দিয়া ছিলেন। আশী বৎসর পূর্ব্বে এই জেলায় কতজন বিবাহ-ব্যবসায়ী ছিলেন, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বহুবিবাহ' ১ম পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছি এবং সেই মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে জেলার পক্ষ হইতে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাইতেছি। তিনি অমর জগত হইতে আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন তাঁহার যোগ্য দেশবাসী হইতে পারি।

হুগলী জেলায় বহু বিবাহকারীর তালিকা †

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮০	৫৫	বসো
ভগবান চট্টোপাধ্যায়	৭২	৬৪	দেশমুখো
পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬২	৫৫	চিত্রশালী
মধুসূদন মুখোপাধ্যায়	৫৬	৪০	চিত্রশালী
তিতুরাম গাঙ্গুলী	৫৫	৭০	ঐ

* Bengal under the Lieutenant Governors. Page 325.

† বহু-বিবাহ—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
রামময় মুখোপাধ্যায়	৫২	৫০	তাজপুর
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৫০	৭০	ভুঁইপাড়া
শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়	৫০	৬০	পাখুড়া
নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০	৫২	ক্ষীরপাই
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৪	৫২	আঁকড়ি শ্রীরামপুর
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১	৪৭	চিত্রশালী
শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪০	৪৫	তীর্ণা
রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০	৫০	কোননগর
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	৪০	৫৫	দণ্ডিপুর
নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৬	৪৪	গৌরহাটি
রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০	৪০	খামারগাছি
শশীশেখর মুখোপাধ্যায়	৩০	৬০	ঐ
তারাচরণ মুখোপাধ্যায়	৩০	৩৫	বরিজহাটী
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮	৪০	গুড়প
শ্রীচরণ মুখোপাধ্যায়	২৭	৪০	সাঙ্গাই
কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫	৪০	খামারগাছি
ভবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	২৩	৪০	জাঁইপাড়া
মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২২	৩৫	খামারগাছি
গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২২	৩৪	কুচুণ্ডিয়া
প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়	২১	৩৫	ভৈটে
পার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়	২০	৪০	ভৈটে
যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	২০	৩৭	মাহেশ
কৃষ্ণপদ মুখোপাধ্যায়	২০	৪৫	বসন্তপুর
হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২০	৪০	রঞ্জিতবাটি

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
রমানাথ চট্টোপাধ্যায়	২০	৫০	গরলগাছা
অন্নদাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২০	৪৫	ভৈটে
দীননাথ মুখোপাধ্যায়	১৯	২৮	বসন্তপুর
রামরত্ন মুখোপাধ্যায়	১৭	৪৮	জয়রামপুর
কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়	১৭	৫২	মাহেশ
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬	২০	চিত্রশালী
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৬	৩৫	মহেশ্বরপুর
অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	২০	মালিপাড়া
অন্নদাচরণ মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৫	গোয়াড়া
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৫	সেঁাতিয়া
জগচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৫	৪০	খামারগাছি
অঘোরচন্দ্র মুখোপ্যাধ্যায়	১৫	৩৬	ভুঁইপাড়া
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৫	৩২	মোগলপুর
ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	২৪	পাতা
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	২২	ঐ
দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	২৫	বেনেসিকরে
ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়	১৫	২০	ভৈটে
কালীপ্রসাদ গাঙ্গুলী	১৫	৪৫	পশপুর
সূর্য্যকান্ত মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৫	ভৈটে
রামকুমার মুখোপাধ্যায়	১৪	৩২	ক্ষীরপাই
কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৪	৪৫	মধুখণ্ড
কালীকুমার মুখোপাধ্যায়	১৪	২১	সিয়াখালা
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	৫০	চুঁচুড়া
মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৩	৫০	বৈঁচী

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩	৪০	গরলগাছা
কাত্তিকেয় মুখোপাধ্যায়	১২	৩০	দেওড়া
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৩০	তাঁতিসাল
মোহিনী বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৩০	মালিপাড়া
সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৪০	ঐ
ব্রজরাম চট্টোপাধ্যায়	১২	২৫	চন্দ্রকোণা
কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৩২	কৃষ্ণনগর
রামতারক বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	২৮	জয়রামপুর
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	১২	৪০	ভুঁইপাড়া
বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়	১২	৩০	বলাগড়
তিতুরাম মুখোপাধ্যায়	১২	৪০	নতিবপুর
প্রসন্নকুমার গাঙ্গুলি	১২	৩৬	গজা
মনসারাম চট্টোপাধ্যায়	১১	৬৫	ভগ্নপুর
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়	১১	১৮	তাঁতিসাল
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়	১০	১৫	বিদ্যাবতীপুর
শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১০	৪৫	ঐ
কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১০	৩০	ভৈটে
রামকমল মুখোপাধ্যায়	১০	৪০	নিত্যানন্দপুর
কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	২৮	বৈঁচী
দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	১০	২৫	ঐ
মতিলাল মুখোপাধ্যায়	১০	৪৫	ঐ
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭	৪৫	ধসা
দুর্গারাম বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৫০	শ্যামবাটী
যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৪৫	আজুড়

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
প্রসন্ন কুমার চট্টোপাধ্যায়	১০	৩৫	বেঙ্গাই
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৩০	বৈন্তল
প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১০	৪০	বসন্তপুর
কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১০	৪০	সিয়াখালা
রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়	৯	৫৬	যদুপুর
কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৯	৩০	নপাড়া
সূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৪০	বৈঁচী
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮	৪৫	ঐ
চুণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৩২	ঐ
কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৪০	মোল্লাই
গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮	২৬	দেওড়া
দিগম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৩৫	গুড়প
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	৮	৪০	মালিপাড়া
যাদবচন্দ্র গাঙ্গুলী	৮	৩৫	বহরকুলী
মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	২৫	সিকরে
কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়	৮	৩২	বরিজহাটী
ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮	৪৫	পাতুল
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়	৭	৪৫	জয়রামপুর
হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৪০	শ্যামবাটী
রামচাঁদ চট্টোপাধ্যায়	৮	৪০	ভঞ্জপুর
ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৭	৩২	ঐ
দিগম্বর মুখোপাধ্যায়	৭	৩৬	রঞ্জপুর
কুড়ারাম মুখোপাধ্যায়	৭	৩২	নতিবপুর
দুর্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭	৬২	মথুরা

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭	৩৪	বসন্তপুর
শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায়	৭	৩৫	ভুরস্থরা
রামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়	৭	৫০	আঁটপুর
বেণীমাধব গাঙ্গুলি	৭	৫০	চিত্রশালি
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬	৩০	মোগলপুর
নবকুমার মুখোপাধ্যায়	৬	২২	চন্দ্রকোণা
যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	৬	৩০	বাথরচক
চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬	৩০	বসন্তপুর
উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়	৬	৪০	রঞ্জিতবাটী
উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬	২৬	নন্দনপুর
গঙ্গানারায়ণ মুখোপাধ্যায়	৫	৩০	গৌরহাটী
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩২	পশপুর
কানাচাঁদ মুখোপাধ্যায়	৫	৫০	সুলতানপুর
মনসারাম চট্টোপাধ্যায়	৫	৪৫	তারকেশ্বর
গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	২২	আমড়াপাট
বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়	৫	৪০	বালিগোড়
ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫	৩৫	তারকেশ্বর
মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫	৪০	তালাই
ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়	৫	২৬	ঢেঁকরা
হরশম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৪০	মাজু
নীলাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩২	সন্ধিপুর
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	৫	৩০	বালিডাঙ্গা
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩৬	গৌরাঙ্গপুর
দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩০	কৃষ্ণনগর

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
সীতারাম মুখোপাধ্যায়	৫	৩৫	চন্দ্রকোণা
রামধন মুখোপাধ্যায়	৫	৪০	চন্দ্রকোণা
নবকুমার মুখোপাধ্যায়	৫	৪৩	বরদা
ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায়	৫	৩৫	নারীট
সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়	৫	২৬	বরদা
শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	১৯	নপাড়া
মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৫	১৮	দণ্ডিপুর

প্রাণান্তকর প্রথা

নরবলি

ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় হুগলী জেলায় বহু প্রাচীনকাল হইতে নরবলি হইত বলিয়া জানা যায়। সাধারণতঃ বালকদিগকে কালীর সম্মুখে বলি দেওয়া হইত। * প্রাচীনকালে ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য নরবলি দিয়া, উক্ত দেহ ক্ষেত্রমধ্যে প্রোথিত করা হইত। লংসাহেব শান্তিপুর, নদীয়া ও বিষ্ণুপুরের নিকট ব্রামনিতলার দুর্গামন্দিরে বহু প্রাচীনকাল হইতে নরবলি দিবার প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া লিখিয়াছেন। † এতদ্ব্যতীত ডাকাতি করিবার পূর্ব্বে ডাকাতগণ কালির নিকটে নরবলি দিত। তাহাদের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, দেবী প্রসন্না হইলে ডাকাতি করিয়া তাহারা বহু ধন রত্ন পাইবে। এই জেলার বহু স্থানে অদ্যাপি 'ডাকাতেকালি' বর্ত্তমান আছেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। সর্ব্বপ্রথম লেফটেন্যাণ্ট হিকস্ নামক এক ব্যক্তি এই কুপ্রথা রহিত করিবার জন্য

* The Annals of Rural Bengal.

† The Banks of the Bhagirathi-Calcutta Review. 1846

বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিলেও, তাহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গের বহু স্থানে নরবলি হইতে দেখা যায়।

রেভারেণ্ড লং সাহেব কলিকাতা রিভিয়ু পত্রিকায় লিখিয়াছেন: Human sacrifices were also frequent even as late as 1832. A Hindu at Kalighat sent for a Musalman barber to shave him. He asked him afterwards to hold a goat while he cut off its head as a offering to Kali. The barber did so but the Hindu cut off the barber's head and offered it to Kali. He was sentenced by the Nizamut to be hung.

নরবলি তৎকালে শাস্ত্র-সম্মত ও ধর্ম্মমূলক কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত বলিয়াই এই প্রথা প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমানে যেরূপ ছাগবলি দেওয়া হয়, নরবলিও সেইভাবে পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য সম্পন্ন হইত। প্রাচীন সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠা উল্টাইলে বহু নরবলির সংবাদ উনবিংশ শতাব্দীতেও অনুষ্ঠিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্র হইতে নিম্নে একটি সংবাদ উদ্ধৃত হইল;

"সমাচার পাওয়া গেল যে পশ্চিম অঞ্চলে মোকাম তারকেশ্বরের সন্নিকটে শিববাটী কালিকাপুর গ্রামের অর্দ্ধক্রোশ অন্তর মাঠে এক প্রসিদ্ধা সিদ্ধেশ্বরী প্রতিমা আছেন সম্প্রতি ৯ মাঘ সোমবার রটন্তী পূজার রাত্রিতে ঐ সিদ্ধেশ্বরীর গুপ্তরূপে পূজা হইয়াছে সে পূজা কে করিল তাহা স্থির হয় নাই কিন্তু পরদিবস প্রাতঃকালে সেই সিদ্ধেশ্বরীর সেবাকারী ব্রাহ্মণ সেখানে গিয়া পূজার আয়োজন দেখিয়া চমৎকৃত হইল। চারি জোড় পট্ট বস্ত্র ও চারি বর্ণের চারি থান পট্ট শাটী বস্ত্র আর ঘড়া প্রভৃতি এক প্রস্থ তৈজস পাত্র এবং প্রচুর উপকরণযুক্ত নৈবেদ্য ও আট প্রমাণ পিতলের বাটীতে আট বাটী রক্ত আছে ইহাতে অনুমান হয় যে আট বলিদান হইয়াছিল এবং বলিদানের চিহ্নও আছে কিন্তু কি বলিদান হইয়াছিল তাহার নিদর্শন কিছু নাই কেহ ২ অনুমান করে যে নরবলি

হইয়া থাকিবেক। এবং নগদ ৫ পাঁচটি টাকা রাখিয়াছে ও লিখিয়া রাখিয়াছে যে এই তাবৎ সামগ্রী ও পাঁচ টাকা দক্ষিণা সেবাকারি ব্রাহ্মণের কারণ রাখা গেল।"

যাহা হউক ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ছয় বৎসর যাবৎ ক্যাপ্টেন ক্যাম্পবেল ও মেজর ম্যাকফারসনের * ঐকান্তিক চেষ্টায় এই প্রথা বঙ্গদেশ হইতে বিদূরিত হইলেও, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, মধ্যে মধ্যে হুগলী জেলায় নরবলির সংবাদ পাওয়া যাইত।

এই সম্বন্ধে ৪ঠা জুলাই ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের সমাচার দর্পণের আর একটি সংবাদ উদ্ধৃত হইল:

নরবলি—কিয়দ্দিবস হইল জেলা হুগলীর অন্তবর্ত্তি কালীপুর গ্রামে এক সিদ্ধেশ্বরী আছেন তাঁহাকে পূজা করিয়া একদিবস পূজারীরা দ্বারবদ্ধ করণানন্তর গমন করিয়াছিল পরদিবস তথায় আসিয়া ঐ পূজারীরা দেখিলেক যে কতকগুলিন ছাগ ও এক মহিষ ও এক নর ঐ সিদ্ধেশ্বরীর সম্মুখে ছেদিত হইয়া পড়িয়া আছে ইহাতে তাহারা অনুমান করিলেক যে পূর্ব্ব রজনীতে কেহ পূজা দিয়া থাকিবেক, ইহাতে পূজারীরা নরবলি দেখিয়া রিপোর্ট করাতে তত্রস্থ রাজপুরুষ অস্ত্র শস্ত্রাদি সম্বলিত বহুলোক সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া অনেক সন্ধান করিলেন কিন্তু তাহাতে কিছু অবধারিত হয় নাই আমরা অনুমান করি যে দস্যুরদিগের কর্ত্তৃক এরূপ কর্ম্ম হইয়া থাকিবেক।

প্রাচীনকাল হইতে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী বক্ষে হিন্দুগণ ধর্ম্মার্থ জীবন বলি দিত দেখিতে পাওয়া যায়। নর নারী উভয়েই স্বর্গে যাইবার জন্য এই ভাবে জীবন দান করিত। পুরুষেরা গোঁফ-দাড়ি ও মস্তক মুণ্ডন করিয়া এবং রমণীগণ স্নান করিয়া গঙ্গায় জীবন বিসর্জ্জন দিত। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে

গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জ্জন

* Half hours in the Far East.

বহু হিন্দু ত্রিবেণীতে নিজের গলা কাটিয়া বা কুমিরের মুখে আত্মদান করিয়া জীবন দান করিত। শিশু ও বৃদ্ধগণ আত্মবিসর্জ্জন দিতে ভয় পাইত বলিয়া তাহাদিগকে জলে নিক্ষেপ করা হইত।

রেভারেণ্ড লং সাহেব লিখিয়াছেন—"Chogdah as well as Bansberia and Gangasagar were formerly noted for human sacrifices by drowning, the aged and children were thrown into the river; In November 1801 some pilots saw 11 persons at Sagar throw themselves to sharks and that month 29 persons were devoured by them."

এতদ্ব্যতীত শিশু সন্তানকে গঙ্গায় উৎসর্গ করা আর একটি নৃশংস প্রথা ছিল। এই প্রথার উৎপত্তি সম্বন্ধে কিংবদন্তী যে, স্ত্রীলোকগণ বিবাহের পর বহু দিন অপুত্রক থাকিলে, গঙ্গার নিকট মানত করিত যে, সন্তান হইলে প্রথম সন্তানটিকে তাহারা গঙ্গায় উৎসর্গ করিবে। মৃতবৎসা দোষ কাটাইবার জন্তও অনেকে গঙ্গার নিকট সন্তান উৎসর্গের মানত করিত। ঢাকা এবং যশোহর হইতে নরনারী সন্তান-বিসর্জ্জনের জন্য ভাগীরথী সমীপে উপস্থিত হইত।

"In 1813 two women cast their children into the river, but the fathers took them out again and paid a certain sum of money to the Brahmins for their ransom. People from Dacca and Jessore used to throw their children to the Ganges here,"*

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেও এই কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে এই প্রথা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং এই কার্য্যে যাঁহারা সাহায্য করিবে, তাহাদিগকে হত্যাকারী হিসাবে গণ্য করা হইবে বলিয়া স্থির হয়; বর্ত্তমানে এই প্রথা ভারতবর্ষে আর প্রচলিত নাই।

* On the Banks of the Bhagirathi-Calcutta Review. 1846.

বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারতের সর্ব্বত্র আর একটি প্রাণান্তকর প্রথা প্রচলিত ছিল—তাহা চড়কের সময় ঝুলিবার জন্য পৃষ্ঠদেশে বান-ফোঁড়া বলিয়া কথিত। চড়কগাছে ঝুলিবার জন্য জনসাধারণকে পুণ্যসঞ্চয়ের লোভ দেখাইয়া, সাধারণতঃ মাদকদ্রব্য সেবন করাইয়া, উক্ত কার্য্যে প্রলুব্ধ করা হইত। চড়কের সময় চড়কগাছে ঘোরা একটি প্রধান উৎসব ছিল। চড়ক দেখিবার জন্য দেশদেশান্তর হইতে জন-সমাগম হইত এবং যাহারা চড়ক-গাছে ঝুলিত, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহারা মৃতপ্রায় হইয়া পড়িত ততক্ষণ তাহাদিগকে ঘুরান হইত। বহু বৈদেশিক ভ্রমণকারীর বর্ণনার মধ্যে এই নিষ্ঠুর প্রথার উল্লেখ আছে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে তৎকালীন সংবাদপত্রে চড়ক পূজা সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রাদি প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। নিম্নে 'সমাচার দর্পণ' পত্র হইতে দুইটি সংবাদ উদ্ধৃত হইল :

চড়কে বান-ফোঁড়া

চরক পূজা—চরক পূজার অতি ঘৃণ্য ব্যবহার ১২ তারিখে দৃষ্ট হইল। ঐ দিবসীয় অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা সময়ে দক্ষিণ ইটালির রাস্তার পশ্চিম দিগবর্ত্তি প্রথম গলির মধ্যে রাধাকান্ত মুন্সী নামক এক ব্যক্তির ভূমিতে চরকগাছ প্রোথিত হইয়াছিল তৎসময়ে ঐ স্থান সমূহ সর্ব্বজাতীয় দিদৃক্ষু লোকেতে পরিপূর্ণ হইয়া অতিযুব একব্যক্তিকে পাক খাইতে দেখিতেছিল এবং তৎকালে ঐ মুনসীর চাকর বাকর ও অন্যান্ত অত্যন্ত কলরব করিতেছিল কিন্তু যে রজ্জুতে সন্ন্যাসী ঘুরিতেছিল তাহা দৈবাৎ ছিঁড়ে যাওয়াতে ঐ ব্যক্তি বেগে গিয়া ৬০ হাত দূরে পড়িল পরে উঠাইয়া দেখা গেল যে শরীরটা তাহার একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে মুখখান পিণ্ডাকার প্রায় কোন অঙ্গ অবিকল ছিল না। [২২ এপ্রিল ১৮৩৭]

আমি এইবার কোন স্থানে দুই মোচ যোজিত একটা চড়ক গাছে চারিজন সন্ন্যাসীকে ঘুরিতে দেখিলাম তাহার মধ্যে একজন মহাদেবের

স্থায় বেশভূষা করতঃ পদদ্বয়ে বাণ ফুঁড়িয়া ঊর্দ্ধপদে অধঃশিরে নির্নিমেষাক্ষ হইয়া ঘুরিতেছে। দে পাক্ দে পাক্ তাহাতে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার পর ঐ চারিজন সন্ন্যাসীকে নামাইয়া দেখা গেল যে তাহারা সকলেই মুমূর্ষপ্রায় বিশেষতঃ উক্ত শিববেশধারী দীর্ঘ জটাজুটযুক্ত ফণিফণান্বিত ভক্ত পরিব্রাজক অত্যন্ত রক্তাক্ত এবং তাহার যে স্থানে ঐ বাণ ভেদিত হইয়াছিল তথাকার মাংস প্রায় তাবৎ ছিঁড়িয়াছিল। আর কিঞ্চিৎকাল ঘূর্ণায়মান থাকিলে বোধকরি ঐ সন্ন্যাসী ছিঁড়িয়া পড়িয়া কতিপয় দিদৃক্ষুগণ সহিত নিধন হইত। অস্মদাদির মানস যে ঐ প্রব্রজ্যা এককালীন প্রশমন না করিয়া তাহার আর ২ তামাসা ও পূজা প্রভৃতি বজায় রাখিয়া কেবল বাণ ফোঁড়া ও চড়ক ঘোরা মাত্র রহিত আজ্ঞা করেন। ত্বদীয় শ্রীচুঁচুড়া নিবাসিনঃ। [১২ মে ১৮৩৮]

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এই প্রাণহারী প্রথা চিরতরে রদ করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করা হয় এবং বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থানে ক্রমশঃ ইহা বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৬৪—৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের ছোটলাট বিডন সাহেব বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহিত পরামর্শ করিয়া, চড়কের সময় পৃষ্ঠে বাণ-ফোঁড়া বে-আইনী কার্য্য বলিয়া ঘোষণা করেন।

বাণ-ফোঁড়া বে-আইনী ঘোষিত হইবার পর, ইহা একপ্রকার বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু হুগলী জেলায় উক্ত বৎসরে তিনজন বাণ-ফোঁড়ার জন্য গ্রেপ্তার হয়। ছোটলাট বিডন সাহেব ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ তারিখে এই প্রথা সমূলে রহিত করিবার জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি করিয়াছিলেন।

চড়কপূজা উপলক্ষে বাণ-ফোঁড়া ভারতবর্ষে বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে; বর্ত্তমানে স্বেচ্ছায় বা সরকারী নিষেধাজ্ঞায় অন্যান্য প্রদেশে এই প্রথা বন্ধ হইলেও, নিম্ন-বঙ্গের বহু জেলায় অদ্যাপি ইহা ধর্ম্মের অন্যতম

অঙ্গ হিসাবে প্রচলিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই নির্ম্মম প্রথা সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর; কারণ এইরূপ প্রাণান্তকর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিগণ ক্রমশঃ হৃদয়হীন হইয়া যায় এবং তাঁহাদের স্বজনগণ তাহারা এইরূপ কৃচ্ছসাধন করিতেছে দেখিয়াও নীরব থাকে। এই প্রথা উচ্ছেদ করিবার জন্য সরকার বাহাদুর এবং বঙ্গের বিশিষ্ট হিন্দুগণ বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। কয়েকজন শক্তিশালী হিন্দু, ইহা উচ্ছেদ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এমন কি বঙ্গের ছোটলাটের কাউন্সিলের জনৈক সদস্য আইনের সাহায্যে ইহাকে রহিত করিবার বিশেষ পক্ষপাতী।

ধর্ম্মের নামে কুপ্রথা প্রচলিত হইলেও, সরকার হইতে কোনপ্রকার উৎসাহ এযাবৎ দেওয়া হয় নাই, বরং ইহা রদ করিবার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই প্রথা রহিত না হওয়ায় মহামান্যা মহারাণী মহোদয়ার ভারতীয় সেক্রেটারী (Secretary of State for India) ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের 'ডেসপ্যাচে' এই কুপ্রথা সমূলে উচ্ছেদ করিবার চূড়ান্ত নির্দ্দেশ দিয়াছেন। সেইজন্য নিম্ন-বঙ্গের জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে নির্দ্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে, যখন এই প্রথার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া কেহ নিজের জীবন বা স্বাস্থ্য বিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইবেন, তখন যেন তাঁহারা তাহাদের হস্তে রক্ষিত যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করেন এবং প্রয়োজন হইলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহাদিগকে আইনানুসারে দণ্ড দেন।

প্রত্যেক বিভাগের কমিশনার ও জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে আরও জানান যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন তাহাদের এলাকার যাবতীয় জমিদার-বৃন্দকে জানাইয়া দেন, যে যদি তাহারা বাণ-ফোঁড়ার প্রশ্রয় দেন তাহা হইলে তাহারাও আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেন। চড়ক-পূজার সময় ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার কোন বাধা নাই; কিন্তু ধর্ম্মের নাম দিয়া কোন

ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ম্মম অত্যাচার এবং তাহা দেখিয়া জনসাধারণের আমোদ প্রমোদ করিবার যে প্রথা অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে তাহাই এতদ্বারা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

যাহা হউক, সরকার হইতে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করায়, মেদিনীপুর ও ঢাকা জেলা ব্যতীত বঙ্গের সর্ব্বত্র ইহা একপ্রকার বন্ধ হইয়া যায়। এই সম্বন্ধে সরকারী কর্ম্মচারীগণ মেদিনীপুর ও ঢাকা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"The reports of the local officers showed that in the cases alleged to have occurred in Midnapore the Swingers had not used hooks. As the interference of Government with native customs extends only so for as is necessary in the interests of humanity, the practice of swinging during the Charak Puja without the infliction of bodily torture had never been prohibited. In the cases, however in the Dacca districts, hook-piercing had been practised. The commissioner reported that the parties immediately concerned had been punished but that no steps had been taken against the Zamindars in whose estates the cases were discovered." *

চড়ক বাঙ্গলা দেশের শেষ উৎসব ; ইহার সহিত সারা বাঙ্গলাদেশে গাজন মহাসমারোহে পালিত হইয়া থাকে। কেবল হুগলী জেলায় নহে, সমগ্র বঙ্গদেশে এই উৎসব ঢাকঢোলের বাদ্য সরকারে হিন্দুর গৃহে এক নব ধর্ম্ম-ভাবের সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ কারিগর ও নীচ সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরাই সন্ন্যাস অবলম্বন করে দেখা যায়। তাহারা প্রাচীন প্রথা অনুসরণ করিয়া গাজন ব্রত

গাজন

* Bengal under the Lieutenant Governors Vol I., Page 438-439.

পালন করিয়া থাকে। চৈত্র মাসের প্রথম হইতে ব্রতীগণ, পুরুষ ও নারী নির্ব্বিশেষে, গেরুয়া বস্ত্র পরিধান, ফলমূল আহার, প্রতিদিন গঙ্গাস্নান এবং এক সন্ধ্যায় নিরামিষ আহার করিয়া থাকে। এই ব্রত-পালন করা দেখিলে প্রথমেই ইহাকে শাস্ত্রীয় ব্রত বলিয়া মনে হয়।

এক এক স্থানের গাজন এক একটি ভাবে উদযাপিত হয়। স্থান, পাত্র ও কালভেদে কেহ শিবের গাজন আর কেহ বা নীলের গাজন বলিয়া থাকে। সকল স্থানে গাজনে সাত দিন ব্যাপিয়া আনুষ্ঠানিক পর্ব্বের মধ্য দিয়া চড়ক, ঝাঁপ, পূজা ইত্যাদি পালিত হয়। এই উৎসবে নিম্নশ্রেণী সন্ন্যাস হইলে, ব্রাহ্মণও তাহাদিগকে প্রণাম করে এবং এই সময়ে সন্ন্যাসীদের নীলকে পূজা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে। আমি দেখিয়াছি, যখন সন্ন্যাসীরা প্রতি গৃহে আসিয়া নীলের গান করিয়া ভিক্ষা করিতে আসে তখন পুরনারীরা তাহাদের ফল উপহার দিয়া, পা ধুয়াইয়া ও চন্দন দুর্ব্বা এবং পাখার বাতাস করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করে। তাহারা মূল সন্ন্যাসীকে ঢাকীর বাদ্যসহকারে ছোট শিশুদিগকে লইয়া নৃত্য করিতে অনুরোধ করে। নারীদের বিশ্বাস যে, যদি শিশুদের উপর নজর অর্থাৎ কু-দৃষ্টি লাগিয়া থাকে তাহা হইলে উহা কাটিয়া যাইবে। তাহা ছাড়া চড়কে অন্যান্য লৌকিক আচার দৃষ্ট হয়। বহুদিন অতিবাহিত হইল, বাণ ফোঁড়া নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু চন্দননগরে এবং হুগলী জেলার বহু স্থানে এখনও একজন ঢুলিকে চড়ক-গাছে বাঁধিয়া ঘুরান হয়। শতাধিক বৎসরের পূর্ব্বেকার ক্ষীণ আভাস এই গাজন অনুষ্ঠানের মধ্য হইতে দেখা যায়। বাঙ্গলার এই গাজন পর্ব্বে কুম্ভীর তৈয়ার করাকে ইহা নীলের প্রতীক বলিয়া মনে করা হয়। এই উৎসবের মধ্যে লোক-নৃত্য, গীত, চিত্রকলা ও ব্রতের একসঙ্গে সমাবেশ দেখা যায়। বাঙ্গলার মেলা হইতে যে, শিল্প ও সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা গাজনের মধ্যে আজও বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গলায় 'বারমতী' ও 'গৃহভরণ' গাজনই সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত হয়। বারমতী অর্থাৎ গাজনের বারটী অধ্যায় ও তাহার আনুষঙ্গিক উৎসব প্রচলিত আছে। গৃহভরণ গাজন ধর্ম্মপুরাণ মতে চলিয়া আসিতেছে। মানসিক থাকিলে এই ব্রত করে। একটি কাল ছাগলকে সংস্কার করিয়া থাকে; এই ছাগলের এক বৎসর সংস্কারের পর চার বা পাঁচ বৎসর পর গাজন হয়। ইহাকে কোল লুইয়া বলে। একজন দলপতি নিযুক্ত হয়, তাহার কথায় মানসিক শোধ এবং গাজন অনুষ্ঠান হয়। তিনি অসমর্থ হইলে একজন প্রতিনিধি অর্থাৎ পটভক্ত্যা নিযুক্ত হয়। গাজন বেদীতে লক্ষ্মী ও কুবেরের পূজা করা হয়। পূজায় চণ্ডীপাঠ এবং রমাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ পাঠ কোন কোন স্থানে বিধি আছে। ধর্ম্ম পণ্ডিত ভক্ত্যা ও কামিনীগণ (মেয়ে ভক্ত্যা) দ্বারায় ধর্ম্মের পূজা করান হয়। এই উৎসবে ধর্ম্মমঙ্গলের গান হয়। নিম্নে ধর্ম্ম-পুরাণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল:

"ধর্ম্ম গৃহাভরণে যে ফল পায় সবে।
শুনিলে সাংজাত খণ্ড সেথ ফল লভে ॥
পুণ্যদিনে গঙ্গাস্নানে শত ধেনু দান।
ততোধিক ফল পায় শুনিলে পুরাণ ॥
দ্বিতীয় চরিত্র খণ্ড অতি সুললিত।
তাহাতে আছয়ে লাউসেনের চরিত ॥
পিতামহ তোমার লাউসেন গুণধর।
তাহার চরিত্র যত অতি মনোহর ॥
বারমতী নামে ব্যক্ত শ্রীধর্ম্মপুরাণ।
কহিব তোমারে সেই অপূর্ব্ব আখ্যান ॥
লাউসেন চরিত্র খণ্ড নাম বারমতী।
সকল মঙ্গলদ ধর্ম্মের প্রিয় অতি ॥" *

* ধর্ম্মপুরাণ—ময়ুর ভট্ট, পৃষ্ঠা ৩৭।

বারমতী ও সংজাত এই দুইটি গাজন একসময় বাঙ্গলায় খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। সংজাত বৈশাখ মাসে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বারমতী পুঁথি চব্বিশ পালায় সমাপ্ত হয়। গায়কেরা প্রথম দিন বৈকাল বেলা ও দ্বিতীয় দিন সম্পূর্ণ গীত করিয়া থাকে। পঞ্চমী হইতে একাদশীর মধ্যে কমিস্তা সন্ধ্যার কার্য্য শেষ করিয়া রাত্রের গান করে।

সাধারণতঃ গাজনের প্রথম দিনের উৎসবে, মূল সন্ন্যাসী গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঢাক পিটাইয়া নরনারী এবং শিশু সকলের প্রাণে ভক্তির ভাব আনয়ন করে। দ্বিতীয় দিনে সন্ন্যাসীরা শিবের মন্দিরে এক সঙ্গে সমবেত হইয়া নৃত্য করে; ইহাকে 'নিজহর কামান' বলে। তৃতীয় দিন গঙ্গা বা অন্য কোন নদী হইতে মাটির কলস করিয়া জল আনয়ন করিয়া তাহা গাজন মণ্ডপে রাখিয়া দেয়। চতুর্থ দিনে তাহারা 'মহাহবিষান্ন' করিয়া থাকে। সন্ধ্যায় সুসজ্জিত চতুর্দ্দোলায় ধর্ম্মের বা শিবের পাদুকাকে সংস্থাপিত করিয়া আবালবৃদ্ধবণিতা বাদ্য ও গীত সহকারে অন্য একটী গ্রামে মুক্তি আনয়ন করিতে যায়। সেই স্থানের ব্যক্তিগণ ধর্ম্মের পত্নীরূপে মুক্তি দেবীকে দান করে। সেই স্থানে পুরোহিত মুক্তি 'অধিবাস' ও 'ধান্যের জন্মবিবরণ' বলে। তৎপরে ধর্ম্ম ও মুক্তিদেবীকে চতুর্দ্দোলায় লইয়া গাজন মণ্ডপে সংস্থাপিত করিয়া পূজা প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার করা হয়। পঞ্চম দিন অর্থাৎ গাজনের শেষ দিনে চড়ক পূজা হয়। শোনা যায়, চড়ক-গাছটি মাছের মত জলে সাঁতার কাটে, যতক্ষণ না তাহারা উহাকে ধরিতে পারে, ততক্ষণ সন্ন্যাসীরা জলস্পর্শ করে না। চড়ক-গাছটিকে পূজা করিয়া তারপর উহাকে পুনরায় জলে বিসর্জ্জন দেয়। এই দিনে তাহারা সন্ন্যাস ব্রতের নিয়ম ভঙ্গ করে।

"ধর্ম্মভক্ত লাউসে হাকন্দ তীরে নিজ দেহ নব খণ্ড সেবা করিয়াছিলেন। এই জন্য কৃত্রিম হাকন্দ প্রস্তুত করিতে হয়। এই সময় ভক্ত্যারা

স্নান করিয়া নূতন, অভাবে পুরাতন, শালবাণ, বাণ, জিহ্বাণ, ঝাঁপকণ্টক ইত্যাদি লইয়া ছাঁওলায় উপস্থিত থাকে। ব্রাহ্মণ গাজনের ঝাঁপ কণ্টক, সূচীমুখ, খড়্গ, অর্দ্ধচন্দ্র, ক্ষুরধার ইত্যাদি অস্ত্রের যথাবিধি পূজা সমাপ্ত করিলে, পাটভক্ত্যা বা নব খণ্ডকারী ভক্ত্যা বাণ বিদ্ধ করে। সংজাত এই নয়টি বাণ বিদ্ধ করিতে অসমর্থ হইলে, কেবল মাত্র জিহ্বাবাণ দ্বারা জিহ্বা বিদ্ধ করা হয়।" অধুনা সর্ব্বত্র এই সকল নির্ম্মম আনুষ্ঠানিক পর্ব্ব নিষিদ্ধ হইয়া যাওয়াতে কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ পাঠ, গান, পূজা ও ব্রত উদযাপন সংযম ও সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জাগতিক ও পরমার্থিক সাধনা করে।

বাঙ্গলার নব বাসন্তিকা যে নৃত্য-গীতের ছাপ নরনারীর প্রাণে রাখিয়া যায়, তাহার ভাবে বিহ্বল হইয়া বঙ্গবাসী প্রতিটি দিন আনন্দরস অনুভব করিতে থাকে। ফাল্গুনের সকল আনন্দ শুধু যৌবন উপভোগ করিবার জন্য, ইহার ভিতর কোন পবিত্র ভাব থাকে না। চৈত্রের সন্ন্যাস ভূষণ ভোগীকে ত্যাগী হইবার নির্দ্দেশ দেয়; ইহা যেন বাণপ্রস্থের পূর্ব্বাভাস। জগৎটিকে ভোগ করিতে হইলে, ত্যাগ না করিলে তাহার কোন রস আস্বাদন করা যায় না। এই ত্যাগের ভাব দ্বারা চরিত্রে দৃঢ়তা সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য। তাই দেখা যায়, বাঙ্গালী ফাল্গুনে কৃষ্ণ-রাধার দোলযাত্রা করিয়া চৈত্রে সন্ন্যাসী শিবের সাধনা করে। বাঙ্গলার কৃষক কুলের মাঝে এই ধর্ম্ম-জাগরণ কিরূপে আসিল, তাহার প্রধান কারণ নির্ণয় করিবার উপায় অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, ঋতুর পরিবর্ত্তন ও প্রকৃতির প্রভাব। গ্রাম্য সঙ্গীতে চৈত্রের বর্ণনায় দেখা যায়—'হইত গাছে পাকা বেল', কবি বার মাসের পর্ব্ব বর্ণনা করিতে যাইয়া গাহিয়াছেন—'চৈত্র মাসে চড়ক সন্ন্যাস গাজনে বাধে ভরা।' *

* শ্রীগোপীনাথ সেনের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য; বাতায়ন ৭ই চৈত্র, ১৩৫৩

পশ্চিম বঙ্গে 'তপ্তমুক্তি' বলিয়া দোষী ব্যক্তিকে সাজা দিবার একপ্রকার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। তপ্তমুক্তি অর্থাৎ গরম ঘৃত মুখে প্রয়োগ করিয়া দোষী ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলা হইত। ইংরাজ রাজত্বে সামাজিক শাসন শিথিল হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাণান্তকর প্রথা দূরীভূত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে জনৈক যুবতী তাঁহার স্বামী কর্ত্তৃক অসতী বলিয়া প্রমাণিত হইলে গ্রাম্য সামাজিক বিধানে তাঁহার 'তপ্তমুক্তি'তে মৃত্যু হয় এবং সাতহাজার নরনারী উহা দর্শন করেন। বর্ত্তমানে এই প্রকার সামাজিক শাস্তি দেওয়ার প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে। রেভারেণ্ড লং সাহেব এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

তপ্ত-মুক্তি

"In 1807 the Topta-Mukti or ordeal by hot clarified butter was tried before 7000 spectators on a young woman accused by her husband of adultery." *

বহু প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গদেশে বৃদ্ধ, জরাতুর এবং মৃতকল্প ব্যক্তিকে গঙ্গাযাত্রা করা হইত; কারণ গঙ্গাতীরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা, হিন্দুগণের নিকট এক মহাপুণ্যজনক ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত। হুগলী জেলার মধ্যে নিমাই তীর্থের ঘাট ও ত্রিবেণীতে বহু দূর দেশ হইতে সেই জন্য 'গঙ্গাযাত্রী' আগমন করিত এবং তাঁহাদের জন্য নির্ম্মিত গঙ্গাতীরে সুবৃহৎ ঘরগুলি অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্যু ধীরে ধীরে আসিয়া ঐ সকল অন্তিম শয্যাশায়ী পুণ্যার্থী নরনারীর ভব-যন্ত্রণা দূর করিয়া দিত। যাহাদের মৃত্যু হইতে দেরী হইত, তাহাদের আত্মীয়বর্গ মহা বিপদে পড়িতেন; পরিশেষে মুমূর্ষু রোগীকে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান এবং ঠাণ্ডা দ্রব্যাদি ভোজন করাইয়া তাহার

গঙ্গাযাত্রা

* The Banks of Bhagirathi—Calcutta Review. 1846.

মৃত্যুর পথ সুগম করিয়া দিতেন। কারণ, হিন্দুদিগের তৎকালে এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল যে, কোন গঙ্গাযাত্রী যদি রোগমুক্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহা হইলে সংসারের অমঙ্গল হয়। সেই জন্য কিংবদন্তী এইরূপ যে, যাহারা গঙ্গাযাত্রার পর দৈবক্রমে প্রাণে বাঁচিয়া যাইত, তাহারা আর দেশে ফিরিয়া যাইত না; শান্তিপুরে যাইয়া ভাগীরথী তীরে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিত। এইরূপ আত্মীয়-স্বজন-পরিত্যক্ত গঙ্গাযাত্রী নরনারীর জন্যই শান্তিপুরের জন-সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল বলিয়া **Honigberger** সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন।

"When a patient thus situated, happens to recover, he considers that he has, as it was, acquired a new life and thenceforth all his former relations and friends are treated as strangers; he never returns to the dwelling in which he had formerly resided, but wanders down the Ganges until he arrives at Santipore, where he settles himself and it is a curious fact, that the whole populations of Santipur is composed of such persons."

সোমবার স্বর্গীয় দুর্গাচরণ রায় ত্রিবেণীতে এক গঙ্গাযাত্রীর যে বিবরণ দিয়াছেন, নিম্নে তাহার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল:

"এক বৃদ্ধাকে গঙ্গাযাত্রার জন্য আনিয়াছে; প্রাচীনের কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট। কথা কহিবার ক্ষমতা নাই—অতি কষ্টে দুই একটি কথা বাহির হইতেছে। শীতকাল, কিন্তু তাহাকে অতি প্রত্যূষে তৈল হরিদ্রা মাখাইয়া স্নান করান হইয়াছে। ডাবের জল, দধি, মর্ত্তমান রম্ভা এবং চিনির জল ঘন ঘন খাওয়ান হইতেছে। টক দই খেয়ে রোগীর দাঁত টকিয়া যাওয়ায় কহিতেছে—ওঁরে আঁর দঁই দেসনে বঁড় দাঁত টকে গিয়েছে, কিন্তু "যাবে বৈ কি" বলিয়া তথাপি তাহার মুখে দধি প্রদান করা হইতেছে।

উঃ কি নিষ্ঠুর! কি পাষণ্ড! যখন মৃত্যুকালে রোগীর মুখে বিন্দুমাত্র গঙ্গাজল দিলে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয়, তাড়াতাড়ি গঙ্গাযাত্রা করাইবার আবশ্যকতা কি? আর এই প্রকার হত্যাসাধন করা কি মানুষের উচিৎ?" *

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রে এই কুপ্রথার নিন্দা করিয়া একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বঙ্গের শিক্ষিত জনসাধারণ এই কুপ্রথা রহিত করিবার জন্য ছোট লাট বিডন সাহেবের নিকট আবেদন করেন। এই বিষয়টি লইয়া অনুসন্ধান করা হয় এবং গঙ্গাযাত্রা শাস্ত্র-সম্মত হইলেও "অন্তর্জলি" অর্থাৎ মৃতপ্রায় বা অসুস্থ ব্যক্তির অর্দ্ধাংশ গঙ্গায় ডুবাইয়া রাখা অশাস্ত্রীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়। আইনের সাহায্য না লইয়া যাহাকে গঙ্গাযাত্রা করান হইবে, তাহার নিকট আত্মীয়, রোগীর বাঁচিবার আশা নাই, এই মর্ম্মে ডাক্তারের সার্টিফিকেট সহ পুলিশে দরখাস্ত করিলে তবে গঙ্গাযাত্রা করিতে দেওয়া হইবে এইরূপ স্থির হয়। ক্রমশঃ এই প্রথা বিলুপ্ত হইয়া যায়।

---

* দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন—পৃষ্ঠা ৩৬৮

সপ্তম অধ্যায়

যাতায়াতের পথ-নির্দ্দেশ

প্রাচীন কালে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র জলপথেই যাতায়াত চলিত, কারণ ভাল রাস্তা তৎকালে বিশেষ ছিল না বলিলেই চলে। হুগলী জেলায় রাণী অহল্যা বাঈ রোড ও শের সাহ প্রবর্ত্তিত গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড ব্যতীত আর কোন উল্লেখজনক রাস্তার সন্ধান পাওয়া যায় না। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার জন্য গ্রাম্য পথ ছিল, তাহাকে রাস্তা বলিয়া অভিহিত করা যায় না। হুগলী জেলার রাস্তার বিবরণ ৫৯ পৃষ্ঠা হইতে ৬২ পৃষ্ঠার মধ্যে লিখিত আছে।

স্থলপথ

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডালহৌসির শাসনকালে মিঃ রোলাণ্ড ষ্টিফেনসন (Mr. Rowland M. Stephenson) নামক একজন ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট যাতায়াতের সুবিধার্থে সর্ব্বত্র রেলগাড়ি চালাইবার জন্য এক আবেদন করেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের প্রথমে তিনি কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত একটি সার্ভে করেন এবং লণ্ডনে যাইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত পরীক্ষামূলক ভাবে রেলগাড়ি চালাইবার জন্য তিনি আদেশ-প্রাপ্ত হন; কিন্তু বলা বাহুল্য, সরকার বাহাদুর ইহার সাফল্য সম্বন্ধে তখন বিশেষ সন্দিহান ছিলেন।

জর্জ্জ টার্ণবুল (George Turnbull) নামক একজন ইঞ্জিনিয়ার রেলপথ নির্ম্মাণে ষ্টিফেনসন সাহেবকে বিশেষ সাহায্য করেন। সেই সময় রেলপথের জন্য জমি-সংগ্রহের বিশেষ কোন আইন না থাকায়, তাহাদের বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়; কিন্তু ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর

মাসে রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য জমি সংগ্রহ করিবার জন্য একটি আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় তাহাদের কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয়।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে হাওড়া হইতে পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত রেলগাড়ি চালাইবার জন্য উপযুক্ত রেলপথ প্রস্তুত হয়; কিন্তু ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর ইহার মধ্যে পড়ায়, ফরাসী সরকারের সহিত লেখালেখি করিয়া তাহাদের মত পাইতে প্রায় তিন বৎসর দেরী হইয়া যায়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বিলাত হইতে 'ফেয়ারী-কুইন' (Fairy Queen) নামক প্রথম ইঞ্জিনখানি কলিকাতায় আসিয়া পৌছে এবং ২৮শে জুন ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মিঃ হজসন বঙ্গদেশের প্রথম রেলগাড়ি হুগলী জেলার মধ্যে পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত চালাইয়া পরীক্ষা করেন। *

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে হাওড়া হইতে হুগলী পর্য্যন্ত চল্লিশ মাইল রাস্তায় প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে রেলগাড়ি চলিতে সুরু হয়। তৎপরে ১লা সেপ্টেম্বর পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত ১২০ মাইল রাস্তায় নিয়মিত ভাবে রেল-চলাচল আরম্ভ হয়। 'ফেয়ারী-কুইন' নামক প্রথম ইঞ্জিনখানি বহু বৎসর যাবৎ হাওড়া ষ্টেশনে প্রদর্শনার্থে রক্ষিত ছিল; বর্ত্তমানে ইহা লিলুয়ায় আছে।

প্রথম যে দিন রেলগাড়ি চলিয়াছিল, সে দিন ইহা দেখিবার জন্য যে কিরূপ জনসমাগম হইয়াছিল, তাহা অভূতপূর্ব্ব বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। লাইনের দুই পার্শ্বে অগণিত নরনারী শঙ্খধ্বনি করিয়া রেলগাড়িকে অভ্যর্থনা করে এবং বিশেষ জাঁকজমকের সহিত উক্ত কার্য্য সমাধা হয়।

এই জেলার মধ্যে বাঙ্গালী পরিচালিত "বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে" নামক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রায় পঞ্চাশ মাইল রেলপথ আছে।

* পুরাতনী—শ্রীহরিহর শেঠ, পৃষ্ঠা—৪৭

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এই রেলপথ খোলা হয়। এইরূপ বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান বঙ্গদেশে আর কোথাও নাই।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিখে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ের তারকেশ্বর হইতে বসুয়া পর্য্যন্ত সাড়ে বার মাইল এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ, বসুয়া হইতে মগরা পর্য্যন্ত প্রায় উনিশ মাইল রেলপথে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া সর্ব্বপ্রথম এই বাঙ্গালী পরিচালিত রেলওয়ে কোম্পানীর গাড়ী যাতায়াত করে। অতঃপর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে তৎকালীন প্রচলিত প্রথা অনুসারে বাঙ্গলা দেশের ছোট লাট স্যার চার্লস ইলিয়ট এই লাইন আনুষ্ঠানিক ভাবে খুলিয়া দেন। ক্রমশঃ এই কোম্পানী মগরা হইতে ত্রিবেণী এবং দশঘরা হইতে জামালপুর পর্য্যন্ত শাখা বর্দ্ধিত করিয়াছেন। এই কোম্পানী বাঙ্গালীর একটি গৌরবের বস্তু। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ রায় বর্ত্তমানে এই রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের পদে অধিষ্ঠিত আছেন; তাঁহার ব্যবস্থাপনায় এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

নিম্নে এই জেলার মধ্যস্থিত রেলওয়ে ষ্টেশনগুলির নাম প্রদত্ত হইল:

মেন লইন—হাওড়া, লিলুয়া, বেলুড়, বালি, * উত্তরপাড়া, হিন্দমোটর, কোন্নগর, রিষড়া, শ্রীরামপুর, সেওড়াফুলি, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, মানকুণ্ডু, চন্দননগর, চুঁচুড়া, হুগলী, ব্যাণ্ডেল, আদি-সপ্তগ্রাম, মগরা, তালাণ্ডু, খন্যান, পাণ্ডুয়া সিমলাগড়, বৈঁচী, দেবীপুর। (৪৪ মাইল)

নিউ কর্ড লাইন—হাওড়া, লিলুয়া, বেলুড়, * ডানকুনী, আকডাঙ্গা, বেগমপুর, বড়তাজপুর, মনিরামপুর, মহম্মদপুর, বলরামবাটী, কামারকুণ্ডু, মধুসূদনপুর, চন্দনপুর, পোড়াবাজার, বেলমুড়ী, গুড়প, জৌগ্রাম, নবগ্রাম, (৪৩ মাইল)।

* হাওড়া হইতে এই ষ্টেশন পর্য্যন্ত হাওড়া জেলার অন্তর্গত।

তারকেশ্বর লাইন—সেওড়াফুলি হইতে দিয়াড়া, নসিবপুর, সিঙ্গুর, কামারকুণ্ডু, নালিকুল, হরিপাল, কৈঁকালা, বাহিরখণ্ড, লোকনাথ, তারকেশ্বর। (২২ মাইল) ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এই লাইন খোলা হয়।

তারকেশ্বর হইতে ত্রিবেণী—তারকেশ্বর, গোপীনগর, দশঘরা, কানানদী, ধনিয়াখালি, রুদ্রাণী, মাজনান, ভাস্তাড়া, মেলকি, গোয়াই-আমড়া, দ্বারবাসিনী, মহানাদ, হানুসাই, সুলতানগাছা, মগরাগঞ্জ, মগরা, ত্রিবেণী, (মোট রেলপথ ৩৩ মাইল; বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে কর্ত্তৃক পরিচালিত)।

ব্যাণ্ডেল হইতে কাটোয়া—ব্যাণ্ডেল, বাঁশবেড়িয়া, ত্রিবেণী, ডুমুরদহ, খামারগাছি, জিরাট, বলাগড়, সোমড়া বাজার, গুপ্তিপাড়া (২২ মাইল)।

শেয়াখালা লাইন—কদমতলা, উত্তর বাঁটরা কোনা, একসরা, বলুহাটী (এই ষ্টেশন পর্য্যন্ত হাওড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত), কালীপুর, চণ্ডীতলা, জনাই, কলাছড়া, কৃষ্ণরামপুর, জঙ্গলপাড়া, মশাট, শিয়াখালা। এই লাইন মার্টিন-বার্ন কর্ত্তৃক পরিচালিত।

এই রেলপথগুলি ব্যতীত হুগলী জেলা হইতে গঙ্গা পারাপারের জন্ম "জুবিলী ব্রীজের" উপর দিয়া ব্যাণ্ডেল-নৈহাটী শাখা এবং দক্ষিণেশ্বরের নিকট হইলে বালী পর্য্যন্ত "উইলিংডন ব্রীজের" উপর দিয়া শিয়ালদহ হইতে ডানকুনী পর্য্যন্ত রেলগাড়ী যাতায়াত করে। নিম্নে ষ্টেশনগুলির নাম প্রদত্ত হইল:

ব্যাণ্ডেল নৈহাটী শাখা—(জুবিলী ব্রীজের উপর দিয়া) ব্যাণ্ডেল, হুগলীঘাট, গরিফা, নৈহাটী।

কলিকাতা কর্ড লাইন—(উইলিংডন ব্রীজের উপর দিয়া) শিয়ালদহ, উল্টাডাঙ্গা রোড, দমদম, বরানগর রোড, দক্ষিণেশ্বর, বালিঘাট, ডানকুনি।

বাস-সার্ভিস

হুগলী জেলার বিভিন্ন রাস্তায় যাতায়াতের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে মোটর বাস চলাচল করে ; নিম্নে জেলার রুটগুলির নাম লিখিত হইল :

১। চুঁচুড়া হইতে শ্রীরামপুর।
২। বালি হইতে বর্দ্ধমান।
৩। চুঁচুড়া হইতে ধনিয়াখালি।
৪। চুঁচুড়া হইতে পোলবা।
৫। শ্রীরামপুর হইতে বালি।
৬। বৈঁচী হইতে বৈদ্যপুর।
৭। উত্তরপাড়া হইতে চণ্ডীতলা।
৮। হরিপাল হইতে ভাণ্ডারহাটী।
৯। সেওড়াফুলি হইতে সিঙ্গুর।
১০। চুঁচুড়া হইতে বৈচী।
১১। হুগলী হইতে বরাকর
১২। হুগলী হইতে হাওড়া।
১৩। চুঁচুড়া কোর্ট হইতে দশঘরা (মেমারী ও চকদিঘী হইয়া)
১৪। চুঁচুড়া কোর্ট হইতে চণ্ডীতলা
১৫। ঝিকরা হইতে আরামবাগ।
১৬। মুলকাটি হইতে আরামবাগ।
২৭। বর্দ্ধমান হইতে বৈদ্যপুর (বৈঁচী হইয়া)
১৮। হুগলী হইতে বর্দ্ধমান।
১৯। আসানসোল হইতে ত্রিবেণী-ঘাট (রাণীগঞ্জ হইয়া)
২০। বর্দ্ধমান হইতে হাওড়া।

ভাগীরথীতে সারা বৎসর ষ্টীমার চলে ; রূপনারায়ণ বন্দর হইতে রাণীচক পর্য্যন্ত প্রত্যহ ষ্টীমার চলে এবং বারমাস এই নদী দিয়া নৌকা যাতায়াত করে।

বর্ত্তমানে কলিকাতা ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী (The Calcutta Steam Navigation Co. Ltd. গঙ্গার হাটখোলা হইতে কালনা পর্য্যন্ত মাল ও যাত্রাসহ ষ্টীমার চালায় এবং মোট বাইশটি ইহার ষ্টেশন আছে, তন্মধ্যে তারকাচিহ্নিত পাঁচটি ষ্টেশন গঙ্গার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। নিম্নে ষ্টেশনগুলির নাম এবং দূরত্ব প্রদত্ত হইল।

	নাম	মাইল		নাম	মাইল
১।	হাটখোলা	...	১২।	ত্রিবেণী	৩৩
২।	উত্তরপাড়া	৬	১৩।	সিজাই	৩৬
৩।	শ্রীরামপুর	১৪	* ১৪।	কালিগঞ্জ	৩৯
৪।	সেওড়াফুলি	১৫	১৫।	জিরেট	৪১
* ৫।	নবাবগঞ্জ	১৬	* ১৬।	গৌরনগর	৪২
৬।	ভদ্রেশ্বর	১৮	১৭।	শ্রীপুর (বলাগড়)	৪৪
৭।	চন্দননগর	১৯	১৮।	সোমড়া	৪৮
* ৮।	ভাটপাড়া	*২০	১৯।	বয়ড়া	৫৪
৯।	চুঁচুড়া	২৭	* ২০।	শান্তিপুর	৫৮
১০।	হুগলী	২৬	২১।	গুপ্তিপাড়া	৬০
১১।	বাঁশবেড়িয়া	৩১	২২।	কালনা	৬৪

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ভাগীরথী-বক্ষে, হুগলীর নিকট বাষ্পচালিত পোত চালান হয়। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম দৈনিক যাত্রীবাহী ষ্টীমার চুঁচুড়া হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত খোলা হয় এবং তখন প্রতি যাত্রীর আট টাকা করিয়া ভাড়া ধার্য্য হইয়াছিল। ক্রমশঃ রেলগাড়ী না হওয়া পর্য্যন্ত ষ্টীমার-যাত্রীদের যাতায়াতের জন্য বহুবিধ সুবন্দোবস্ত ও সুবিধা হইয়াছিল। প্রথম যে দুইখানি ষ্টীমার কলিকাতা হইতে চুঁচুড়া পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত, তাহাদের নাম ‘কমেট’ ও ‘ফায়ার-ফ্লাই’।

জলপথ

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে হাওড়া হইতে পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত রেলগাড়ি চালাইবার জন্য রেললাইন প্রস্তুত হয় এবং ১৫ আগষ্ট ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে হুগলী পর্য্যন্ত বঙ্গের প্রথম রেলগাড়ি চলা আরম্ভ হয় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পূর্ব্বে স্থলপথে পালকি করিয়া ও জলপথে নৌকা করিয়া যাতায়াত চলিত। উড়িয়া বেহারাগণ এই পালকি বহন করিত এবং ১৭'৬ খৃষ্টাব্দে

কোম্পানী কর্ত্তৃক ঠিকা উড়িয়া বেহারাদের দৈনিক হার নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পাঁচজন ঠিকা বেহারার দৈনিক পারিশ্রমিক সিক্কা ১৲ টাকা ও অর্দ্ধদিন ৷৷৹ আনা এবং আট মাইল যাইলেই একদিন ধরা হইত। * পাঁচ মাইলের অনধিক যাইবার জন্য বেয়ারাদের মজুরী জনা প্রতি তখন চারি আনা ধার্য্য ছিল।

ডাক-বিভাগ কর্ত্তৃক চিঠিপত্র ব্যতীত তাহাদের পালকিতে তৎকালে যাত্রী যাইবারও সু-ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু তাহার ভাড়া অত্যধিক ছিল। দেশের বিভিন্ন স্থানে ডাক-চৌকি থাকিত এবং পালকি ও বেহারাগণ উক্ত স্থানে অপেক্ষা করিত। ডাক-চৌকি পোষ্টাফিসের অধীন ছিল। ৬ই জানুয়ারী ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের 'কলিকাতা গেজেটে' বিভিন্ন স্থানের ডাক-চৌকিতে ভ্রমণের একটি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল; উক্ত তালিকায় কলিকাতা হইতে চন্দননগর ও চুঁচুড়ার ভাড়া ২৪৷৷৹ (চব্বিশ টাকা আট আনা), এবং কলিকাতা হইতে হুগলীর ভাড়া ৪৬৷৹ (ছেচল্লিশ টাকা চার আনা) এবং কলিকাতা হইতে বাঁশবেড়িয়ার ভাড়া ৭৬৲ (ছিয়াত্তর টাকা) ছিল বলিয়া জানা যায়। সুতরাং তৎকালে যাতায়াত কিরূপ ব্যয়সাধ্য ছিল, ইহা হইতেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

জলপথে নৌকায় গমনাগমন করা তখন অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে হইত। নৌকা বা বজরা তৎকালে পুলিশের অধীনে থাকিত এবং জলপথে যাইতে হইলে পূর্ব্বে পুলিশের নিকট আবেদন করিতে হইত। পুলিশ দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বাসী লোককে দাঁড়িমাঝি নির্ব্বাচন করিত, কারণ পূর্ব্বে জলপথে বা স্থলপথে দস্যুর উৎপাত ছিল বলিয়া যাত্রীগণকে নিজেদের রক্ষার জন্য সিপাহী-সান্ত্রী সঙ্গে লইতে হইত। পথিমধ্যে কোন বিপদ উপস্থিত হইলে তাহার জন্য কোম্পানী দায়ী হইতেন না। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চ এক

* The Good old Days of Honourable John Company.

পুলিশ বিজ্ঞাপন বাহির হয়, উক্ত বিজ্ঞাপনে জলপথে নৌকার ভাড়া ছিল আটজন দাঁড়ির বজরা দুই টাকা, দশজন দাঁড়ির বজরা আড়াই টাকা, ষোলজন দাঁড়ির বজরা সাড়ে তিন টাকা ইত্যাদি। সেই সময় মেসার্স হোমস এণ্ড এলেন (Holmes & Allen) কোম্পানীর জলপথে মাল পাঠাইবার কার্য্য প্রায় একচেটিয়া ছিল।

খেয়াঘাট

হুগলী জেলা হইতে যে সমস্ত ফেরী নৌকা গঙ্গার পূর্ব্বদিকে প্রত্যহ যাতায়াত করে, নিম্নে তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল ; এই খেয়াঘাট-গুলি বর্ত্তমানে হুগলী জেলাবোর্ডের অধীন।

১।	গুপ্তিপাড়া	হইতে	শান্তিপুর (নদীয়া)
২।	সোমড়া	"	গোঁসাইচড় "
৩।	বলাগড়	"	চকদহ "
৪।	জিরাট	"	কালীগঞ্জ বা সুখসাগর (নদীয়া)
৫।	ডুমুরদহ	"	দুর্গাপুর "
৬।	ত্রিবেণী	"	গুস্তুটি "
৭।	বংশবাটী	"	কাঁচড়াপাড়া (২৪ পরগণা)
৮।	কামারপাড়া	"	হালিশহর "
৯।	হুগলী বাজার	"	নৈহাটী "
১০।	হুগলী বাবুগঞ্জ	"	নৈহাটী "
১১।	চুঁচুড়া মেছোবাজার		নৈহাটী "
১২।	ষণ্ডেশ্বরতলা চুঁচুড়া		কাঁকিনাড়া "
১৩।	চন্দননগর	"	জগদ্দল "
১৪।	তেলিনীপাড়া	"	শ্যামনগর "
১৫।	ভদ্রেশ্বর	"	গাড়ুলিয়া "

১৬। গরুটি	হইতে	ইছাপুর	(২৪ পরগণা)
১৭। চাঁপদানী	”	পলতা	”
১৮। নিমাইতীর্থের ঘাট		নবাবগঞ্জ	”
১৯। চাতরা	”	বারাকপুর	”
২০। শ্রীরামপুর কোর্ট		বারাকপুর হাঁসপাতাল ঘাট	”
২১। বল্লভপুর	”	টিটাগড়	”
২২। মাহেশ জগন্নাথঘাট		ঐ	”
২৩। রিষড়া	”	খড়দহ	”
২৪। কোন্নগর	”	পানিহাটী	”
২৫। উত্তরপাড়া	”	এড়েদহ	”

গঙ্গা ব্যতীত মিউনিসিপ্যাল এলাকার বাহিরে যে সমস্ত স্থানে ফেরী ঘাট আছে, তাহার কয়েকটি নিম্নে লিখিত হইল :

১। চাঁপাডাঙ্গা হইতে পুরসুঁড়া (দামোদর নদী পারের জন্য)

২। বলরামপুর হইতে আরামবাগে যাইবার জন্য

৩। হরিণখোলা হইতে মুনেশ্বরী নদী পারের জন্য

৪। হরাদিত্য হইতে খাল পার করিবার জন্য (মুনেশ্বরীর কিঞ্চিৎ পশ্চিমে)

৫। অশথখালি খাল পারাপারের জন্য

৬। আরামবাগে দ্বারকেশ্বর নদী পারাপারের জন্য

এতদ্ব্যতীত কানা নদী, সরস্বতী নদীর ও রূপনারায়ণ নদীর উপর বহু স্থানে যাতায়াতের জন্য নৌকা আছে। বহুস্থানে গ্রীষ্মকালে জল শুকাইয়া যাইলে, নৌকা বন্ধ হইয়া যায় এবং নদীবক্ষ দিয়া তখন লোকজন যাতায়াত করে।

অষ্টম অধ্যায়

হুগলী জেলার শিক্ষা-ব্যবস্থা

বর্ত্তমানে উচ্চশিক্ষার জন্ত বিভিন্ন শহরে যেরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দেখা যায়, প্রাচীন কালে এইরূপ জনবহুল স্থানে কোন শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল না। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে দ্বিজাতিকে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য) নির্জ্জন অরণ্যবেষ্টিত গুরুর আশ্রমে যাইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে হইত। যাঁহারা সকল উচ্চবিদ্যার পাণ্ডিত্যলাভে অভিলাষী হইতেন, তাঁহাদিগকে ছত্রিশ বৎসর কাল গুরুগৃহে থাকিতে হইত।

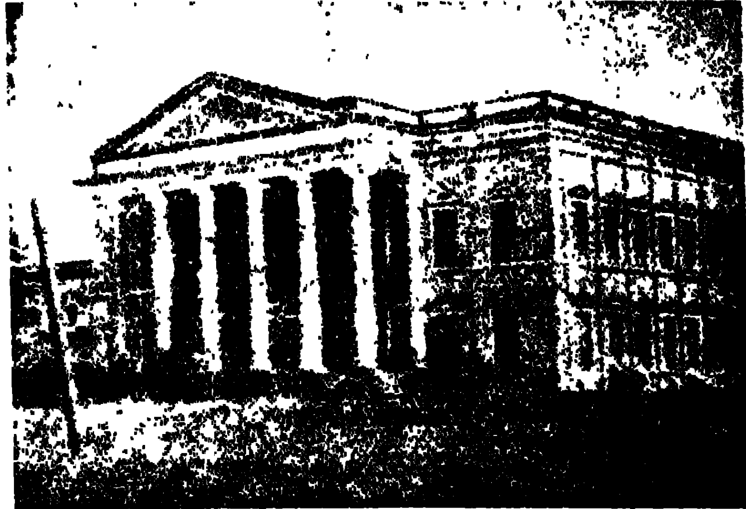
"ষট্ ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।"

(মনু ৩।১)

যে সকল স্থানে দেশ দেশান্তর হইতে ছাত্রবৃন্দ আসিয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করে, বর্ত্তমানে তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয়। University বা বিশ্ববিদ্যালয় বলিলে আমরা বর্ত্তমানে যে অর্থ করি, এই অর্থ আধুনিক। প্রাচীনকালে বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটি ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল না; 'পরিষদ' বলিয়া একটি স্বতন্ত্র জিনিষ ছিল এবং তাহা দ্বারাই বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। University শব্দ মধ্য যুগে লাটিন ভাষায় প্রচলিত Universitas শব্দ হইতে গৃহীত। উহা লোক-সঙ্ঘের সমষ্টি অর্থে প্রযুক্ত হইত; পরে "জ্ঞানান্বেষী সম্প্রদায়ের" পরিজ্ঞাপক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে কাশ্মীরে সর্ব্বপ্রথম 'পরিষদ' প্রতিষ্ঠার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে যেরূপ অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রের কথা জন-

সাধারণ আগ্রহের সহিত শুনিয়া থাকেন এবং কাশী বা নবদ্বীপ হইতে শিক্ষিত উচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত পণ্ডিতমণ্ডলী যেমন অদ্যাপি ভারতের সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া থাকেন, প্রাচীনকালে সেইরূপ ভারতবাসীগণ কাশ্মীরীয় আচার্য্যের কথা বিশেষভাবে মান্য করিতেন, দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই কাশ্মীর বিদ্যার আদিস্থান বা 'সারদা-পীঠ' বলিয়া প্রখ্যাত।

ভারতীয় শিক্ষা-প্রণালীর সহিত বর্ত্তমান শিক্ষার কোন তুলনাই হয় না। বর্ত্তমানে স্কুলে বা কলেজে যেমন প্রধান শিক্ষক (হেডমাষ্টার) বা অধ্যক্ষ (প্রিন্সিপ্যাল) দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন কালেও সেইরূপ অধ্যক্ষ থাকিত এবং তিনি 'কুলপতি' নামে অভিহিত হইতেন। বর্ত্তমানে



শ্রীরামপুর কলেজ ভবন

হেডমাষ্টার বা প্রিন্সিপালগণ বেতন লইয়া উচ্চশিক্ষা দান (?) করেন, কিন্তু ভারতবর্ষে কুলপতিগণ বেতন লওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যেক দশহাজার শিষ্যকে কেবল বিদ্যাদান নহে, শিক্ষা-সমাপ্তি পর্য্যন্ত ছাত্রগণকে অন্নদানাদি দ্বারা ভরণ-পোষণ করিতেন। ইহাই ভারতীয় শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ছিল ; এই সম্বন্ধে পণ্ডিত নীলকণ্ঠ মহাভারতের টীকাতে লিখিয়াছেন :

"একো দশসহস্রানি যোহন্নদানাদিনা ভরেৎ। স বৈকুলপতিরিতি" (১।১।১)

বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে যেরূপ উচ্চশিক্ষার জন্য নির্জ্জন স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, বৌদ্ধ-যুগেও সেইরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে গান্ধার ও উদ্যানে এবং পূর্ব্বপ্রান্তে নালন্দায় বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। উক্ত বিহারগুলির কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য 'কুলপতি' ছিলেন।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেও ভারতবর্ষে যে কুলপতি প্রথা বিলুপ্ত হয় নাই, তাহা মৃচ্ছকটিক নাটকের "তৎ পৃথিব্যাং সর্ব্ববিহারেষু কুলপতিরয়ং ক্রিয়তাং" এই উক্তিটি হইতে বেশ বুঝা যায়।

চীন পরিব্রাজক হিউএন সিয়াং সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দায় আসিয়া বৌদ্ধ-শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া যান এবং তিনি সেই সময় পঞ্চাশ হাজার শিক্ষার্থীকে নালন্দায়, কেবল ভারতবর্ষ নহে, এমন কি সুদূর চীন, কোরিয়া, ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে আগত ছাত্রগণ শিক্ষা লাভ করিতেন, দেখিয়া যান; সেই সময় শীলভদ্র নালন্দার 'কুলপতি' ছিলেন।

বৌদ্ধগণের সভ্যতা প্রাখর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে মঠেও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল, দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ-প্রভাবের অবসান ও বৈদিক ধর্ম্মের অভ্যুদয় কালে কান্যকুব্জ ও কাশীতে বৈদিক-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মুসলমান আক্রমণে কনোজের বিদ্যালয় বিলুপ্ত হইলে বারাণসী আজও শাস্ত্র অধ্যয়নের সর্ব্বপ্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত।

সেন রাজাগণের সময়ে পূর্ব্বতন আদর্শে মিথিলায় ও নবদ্বীপে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কার্য্য সম্পন্ন হইত। ষোড়শ শতাব্দী হইতে নবদ্বীপই ন্যায়-চর্চ্চার সর্ব্বপ্রধান শিক্ষাপরিষদ বলিয়া গণ্য হইয়াছে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে অদ্যাপি ছাত্রগণ এই স্থানে শিক্ষার্থ আসিয়া থাকেন।

হুগলী জেলাকে 'মনীষার শ্রীক্ষেত্র' বলিয়া অভিহিত করা হয়; কারণ শিক্ষার দিক হইতে এইরূপ উন্নত জেলা বঙ্গদেশে আর নাই। পাশ্চাত্য-

ধরণে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে, বঙ্গদেশে ধর্ম্ম ও সামাজিক আচার ব্যবহার সংস্কার করিবার ইচ্ছা দেখা দেয় এবং নূতন ভাবে বঙ্গ-সাহিত্যের সৃষ্টি হয় এবং নবভাবে বঙ্গভাষার পত্তন এই হুগলী জেলা হইতেই আরম্ভ হয়। প্রথম ইংরাজী শিক্ষা এই স্থানের অধিবাসগিণ সর্ব্বপ্রথম গ্রহণ করিবার সুযোগ পাওয়ায় এই জেলা উনবিংশ শতাব্দী হইতে বঙ্গদেশের পথপ্রদর্শক হইয়াছিল এবং ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বহুবিধ শিক্ষা-ক্ষেত্রে এই জেলার অধিবাসিগণই অগ্রণী হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়।

"As regards knowledge of English, the ratio in the case of males is the highest in the Province outside Calcutta and Howrah, where conditions are exceptional owing to the numbers of Europeans resident in those two cities." *

হুগলী-জেলার শিক্ষা-বিস্তারে সর্ব্বপ্রথম উদ্যোগী হন শ্রীরামপুরের মিশনরীবৃন্দ। তাঁহারা এই স্থানে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া প্রথম সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন এবং দেশীয় খৃষ্টানগণের শিক্ষার নিমিত্ত ১৮০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে বঙ্গদেশের প্রথম শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মার্শম্যান সাহেবের চেষ্টায় ইহার প্রতিষ্ঠা হয় এবং উক্ত বৎসরে তাঁহার সহধর্ম্মিণী হ্যানা ম্যার্শম্যানের চেষ্টায় শ্রীরামপুরে বালিকাগণের শিক্ষার জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয় খোলা হয়।

এই সম্বন্ধে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন লিখিয়াছেন "খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম প্রচার করা যদিও ঐ সাহেবদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি তৎপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগের দ্বারা বাঙ্গলাভাষায় যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। যেরূপ চৈতন্য সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের দ্বারা বাঙ্গলা পদ্য রচনার উন্নতি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল,

* Hooghly District Gazetteers, Page 230.

সেইরূপ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পাদরী সাহেবদিগের দ্বারাই বাঙ্গলা গদ্য রচনা সমধিক অনুশীলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। *

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই শ্রীরামপুর কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং ১৮২০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনারীগণ কর্তৃক শ্রীরামপুর কলেজের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বিভাগগুলি খোলা হয়। ইহাই বঙ্গদেশে পাদ্রীদের প্রথম কলেজ। ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে ইহাকে গঠন করিবার জন্য তাঁহাদের বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ওয়ার্ড সাহেব এবং ১২২৪ খৃষ্টব্দে কেরী সাহেব পরলোকগমন করায়, তাহাদের শুভ ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। ওয়ার্ড সাহেব শ্রীরামপুরে কাগজ প্রস্তুতের জন্য একটি করখানাও স্থাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীরামপুর তৎকালে দিনেমারদের হস্তে ছিল এবং কেরী সাহেবের পরিচালিত 'মিশনস্কুলে' কলিকাতা হইতে সমস্ত ইউরোপীয় ছাত্রগণ তখন পড়িতে যাইত। কলিকাতা গেজেটে এই বিদ্যালয়ের প্রায়ই "The Mission School at Serampur under Mr Carey" † বলিয়া বিজ্ঞাপন বাহির হইত দেখিতে পাওয়া যায়।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কেরী সাহেবের চেষ্টায় শ্রীরামপুরে জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষার জন্য একটি টোল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্বন্ধে তৎকালীন "সমাচার দর্পণ" পত্রে (২০শে মার্চ্চ, ১৮১৯) যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

"শ্রীরামপুরের টোল—শ্রীরামপুরস্থ সাহেবেরা মোং শ্রীরামপুরে এক কলেজ অর্থাৎ বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে ক্রমে ২ বিদ্যার্থিগণ

---

* বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, পৃষ্ঠা ২০২

† Calcutta Gazette, 1st May, 1800.

নিযুক্ত হইতেছে এই কলেজে নানাপ্রকার বিদ্যা ও বহু প্রকার পুস্তক ও বিবিধ প্রকার শিল্পাদি যন্ত্র থাকিবে ও প্রতি শাস্ত্রের এক ২জন পণ্ডিত ক্রমে ২ নিযুক্ত হইবেন যেহেতুক এই মহাবিদ্যালয় এককালে প্রস্তুত হওয়া ভার তৎপ্রযুক্ত ন্যায় ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির পণ্ডিত ক্রমে ২ নিযুক্ত হইবেন এখন কেবল জ্যোতিষশাস্ত্রের পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন।

এই বাঙ্গলা দেশে অন্য ২ শাস্ত্রের টোল চৌপাড়ি সর্ব্বত্র বাহুল্যরূপে আছে এবং অনেক লোক ব্যবসায় করিয়া বিদ্যাবান হইতেছেন কিন্তু



উইলিয়াম কেরী

প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র লীলাবতী ও বীজ ও সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত শিরোমণি প্রভৃতি ভাস্করাচার্য্যাদি প্রণীত গ্রন্থের পাঠ ও ব্যবসায় বাঙ্গালা দেশে নাই কিন্তু পশ্চিমে কাশী প্রভৃতি দেশে আছে তন্নিমিত্ত শ্রীরামপুরের সাহেবলোকেরা প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র পারদর্শী শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্যকে সভাপতি করিয়া এই কলেজে প্রথম স্থাপিত করিয়াছেন।

অতএব যদি কাহার জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিতে ইচ্ছা হয় তবে মোং শ্রীরামপুরে আইলে জ্যোতিশাস্ত্র পাঠ করিতে পাইবেন।"

১৮২২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজে ইংরাজি শিক্ষা সম্বন্ধে একটি সংবাদ ১৩ই জুলাই তারিখের সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হইয়াছিল; ইহা হইতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারা যায়। নিম্নে সংবাদটি উদ্ধৃত হইল:

শ্রীরামপুরের কলেজ অর্থাৎ বিদ্যালয়—এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সাহেব লোকেরা বাসনা করিয়াছেন যে এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান হিন্দু কিম্বা মুসলমানের সন্তানেরদিগকে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করান। যে সকল ভাগ্যবান লোকের সন্তানেরা ইংরাজী শিক্ষার্থে আসিবেন তাঁহারা অত্যল্প ব্যয়েতে বিদ্যা পাইবেন। ঐ বিদ্যার্থীরা অন্যত্র বাসা করিয়া থাকিবেন কিন্তু কলেজের রীত্যনুসারে তাহারদিগকে চলিতে হইবে অর্থাৎ সময়ানুসারে গমনাগমন ইত্যাদি করিতে হইবে। এই বিদ্যালয়ে যে ২ ইউরোপীয় বিদ্যা প্রচার আছে তাহার মধ্যে যিনি যাহা শিক্ষা করিতে বাসনা করেন তিনি এই কলেজের শিক্ষাদাতা শ্রীযুত রিবরেণ্ড জন ম্যাক সাহেবের দ্বারা শিক্ষা পাইবেন। এই কলেজে ইউরোপীয় বিদ্যা শিক্ষা করিলে যত লাভ হয় তত লাভ ভারতবর্ষের কোন স্থানে হয় না যেহেতুক এই কলেজে কেবল সাধারণ ইংরাজী বিদ্যা যে পাইবেন এমত নয় কিন্তু বৃহৎ ২ যন্ত্র দর্শনে ভূগোলবিদ্যা ও খগোলবিদ্যা ও রসায়ণ বিদ্যা ও শিল্প বিদ্যা ও পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা পাইবেন। অতএব এই বিদ্যালয়ে যে কেহ আপন সন্তানকে পাঠাইতে বাসনা করেন তিনি শ্রীরামপুরস্থ কালেজে শ্রীযুত রিবরেণ্ড ডাক্তার কেরী সাহেবের নামে পত্র পাঠাইলে বিশেষ জানিতে পাইবেন।"

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখের সর্ত্তানুসারে দিনেমারগণ

তাহাদের ভারতীয় যাবতীয় সর্ত্ত ত্যাগ করেন। উক্ত সর্ত্তের ষষ্ঠ ধারায় শ্রীরামপুর কলেজ এবং পূর্ব্বোক্ত পাদ্রীগণের শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখিত আছে। নিম্নে উক্ত ধারাটি উদ্ধৃত হইল:

"Article VI—The Church Missionary Board at Copenhagen for the Propagation of the Gospel shall be at liberty to continue their exertions in India for the conversion of the heathens to the Christian religion, and shall be afforded the same protection, by the Government of India as similar English societies under the general law of the land; the rights and immunities granted to the Searampore College by Royal Charter, of date 23rd of February 1827, shall not be interfered with, but continue in force in the same manner as if they had been obtained by a Charter from the British Government, subject to the general law of British India."

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের এবং শ্রীরামপুরের দিনেমার গভর্ণর কর্ণেল কেফটিং-এর পৃষ্ঠপোষকতায়, কেরী-মার্শম্যান-ওয়াডের দ্বারা শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহারাই কলেজ-কাউন্সিলের প্রথম সভ্য ছিলেন। ভারতের যুবকবৃন্দকে সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা এবং ইঙ্গ-ভারতীয় ও ভারতীয় উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার কল্পে শিক্ষা দিবার জন্যই এই কলেজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ডেনমার্কের অধিপতি ষষ্ঠ ফ্রেড্‌রিক এই কলেজে সাহায্য করেন এবং ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে 'রাজকীয় সনন্দ' (Royal Charter) দ্বারা এই বিদ্যালয় হইতে ছাত্রগণকে 'ডিক্রি' দেওয়া হইবে স্থির হয়। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে দিনেমারগণ শ্রীরামপুর ত্যাগ করিলে ইংরেজদের সহিত এই কলেজের জন্য কি সর্ত্ত লিখিত ছিল তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

শ্রীরামপুর কলেজ-ভবন ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর ভবন বলিয়া প্রসিদ্ধ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক্যালেণ্ডারে' লিখিত আছে :

"The College building, erected in 1818 by Dr. Carey and his colleagues, still remains one of the finest college buildings in India."

এই কলেজের জন্য স্থান ও টাকা সংগ্রহ মিশনারীগণের চেষ্টায় সম্পন্ন হয় এবং ভবনটি নির্ম্মাণ করিতে পনের হাজার পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল। এই ভবনের এক অংশে কেরী সাহেব বাস করিতেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূক্ত যে আটটি কলেজ ছিল, শ্রীরামপুর কলেজ তাহাদের মধ্য অন্যতম। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূক্ত ছিল, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ (Baptist Missionary Society) ইহাকে ভারতের খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বিজ্ঞান শিক্ষার একমাত্র শিক্ষালয় রূপে পরিগণিত করিবার জন্য, অন্যান্য বিভাগগুলি বন্ধ করিয়া ইহার সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন অধ্যক্ষ ডক্টর হাউএলস্, প্রোটেস্টাণ্ট মিশনারীগণের সম্মিলিত আবেদনে ইহাকে প্রতিষ্ঠাতাগণের শিক্ষা-বিস্তারের অন্যতম যন্ত্ররূপে পুনরায় পরিচালন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন ও সর্ব্বসাধারণের জন্য শ্রীরামপুর কলেজ পুনরায় উন্মুক্ত করা হয় এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূক্ত (affiliated) হয়। আর্থিংটন-ট্রষ্টিগণ কর্ত্তৃক আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে অধ্যাপকগণের ও ছাত্রবৃন্দের বসবাসের জন্য একটি হোষ্টেল নির্ম্মিত হাওয়ায় ইহার সৌন্দর্য্য অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে 'শ্রীরামপুর কলেজ এ্যাক্ট' বলিয়া এক আইন পাশ হয় ; কলেজ কাউন্সিলে চৌদ্দজন সভ্য আছেন এবং বিলাতে ইহা অবস্থিত হইলেও 'ফ্যাকালটি' আভ্যন্তরিক ব্যাপারও পরিচালনা করেন। এত-

ব্যতীত ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা দিবার জন্য কলেজের সেনেট যাবতীয় ব্যবস্থা করেন। সতের জন সদস্য লইয়া শ্রীরামপুর কলেজের 'সেনেট'



জশুয়া মার্শম্যান

গঠিত এবং রেভারেণ্ড জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড এস, কে, চাটার্জ্জি প্রভৃতি বাঙ্গালী ভদ্রমহোদয়গণ এই সেনেটের সদস্য ছিলেন।

নিম্নে শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যক্ষগণের নাম প্রদত্ত হইল :

১৮১৮—উইলিয়াম কেরী, ১৮৭৯—এ্যালবার্ট উইলিয়াম

১৮৩২—জশুয়া মার্শম্যান, ১৮৮২—ই, এস, সামারস্

১৮৩৭—জন ম্যাক ১৯০৭—জর্জ্জ হাউয়েলস্

১৮৪০—ডবলিউ, এইচ, ডেনহ্যান ১৯২৯—জি, এঙ্গাস

১৮৫৮—জন ট্রাফোর্ড

হুগলী মহসীন কলেজ, হাজী মহম্মদ মহসীনের টাকায় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়। হুগলীর সিভিল সার্জ্জেন ডাঃ টমাস ওয়াইজ এই কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন এবং তাঁহার চেষ্টায় এই কলেজের যথেষ্ট উন্নতি হয়। পূর্ব্বে ইহার নাম "কলেজ অফ মহম্মদ মহসীন" ছিল; পরে ইহা "হুগলী কলেজ" বলিয়া খ্যাত হয়। বর্ত্তমানে উক্ত নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া "হুগলী মহসীন কলেজ" নামে ইহা পরিচিত। কলেজের বিস্তৃত হলে একখানি প্রস্তর-ফলকে নিম্নলিখিত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে দেখিতে পাওয়া যায় :

"COLLEGE OF MOHAMMAD MOHSIN—The College was established through the munificence of the late Mohammad Mohsin, and was opened on the 1st of August 1836."

বর্ত্তমান কলেজের সুরম্য ভবনের একটি ইতিহাস আছে। পূর্ব্বে ইহা জেনারেল পেরন নামক এক ফরাসী সাহেবের ছিল। তিনি বিলাতে যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে এই প্রাসাদোপম অট্টালিকা বিক্রয় করিবার জন্য "কলিকাতা গেজেটে" * এক বিজ্ঞাপন দেন এবং হুগলীর স্বনাম-ধন্য জমিদার প্রাণকৃষ্ণ হালদার এই ভবন ক্রয় করেন। তিনি নোট জাল

* Vide Calcutta Gazette 10th October, 1805.

করিবার অপরাধে ধৃত হইয়া ১৪ বৎসর কারাবাস করেন এবং চুঁচুড়ার অবসর প্রাপ্ত জেলা-জজ ব্রজেন্দ্রকুমার শীলের নিকট হইতে উক্ত ভবন বন্ধক রাখিয়া তিনি টাকা ধার করেন। হালদার মহাশয় টাকা পরিশোধ



হাজী মহম্মদ মহসীন

করিতে না পারায় ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কোর্ট হইতে বাটি বিক্রয় হয় এবং ব্রজেন্দ্র বাবু উহা ক্রয় করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি এই বাটি বিশ হাজার টাকায় বিক্রয় করিলে হুগলী কলেজ কর্তৃপক্ষ ইহা ক্রয় করেন।*

*History of Hughli College by K. Zakarriah দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা 'প্রেসিডেন্সি কলেজের' অব্যবহিত পরেই এই কলেজের স্থান ছিল এবং ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের স্থায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই কলেজের ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রিন্সিপাল ছিলেন। রেভারেণ্ড লালবিহারী দেব, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ এই কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিচারপতি ডক্টর দ্বারকানাথ মিত্র এবং বিচারপতি আমির আলির স্থায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। বর্ত্তমানে শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ (ভাস্কর) এই কলেজের অধ্যক্ষ আছেন।

উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরপাড়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁহারা সরকারের হস্তে ইহা পরিচালনের জন্য বৈঁচী এবং রামনগর মহল দুইটি পত্তনি করিয়া দেন। কিন্তু সরকার কর্ত্তৃক কতকগুলি নূতন বিধি আরোপিত হওয়ায়, তাহার পুত্র রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় (কারণ তিনি ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন) নিজ ব্যয়ে ইহা পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন, এবং ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাহার পুত্র কুমার ভূপেন্দ্র নাথ ইহা পরিচালনা করেন। নিম্নে উত্তরপাড়া কলেজের অধ্যক্ষগণের নাম প্রদত্ত হইল।

১৮৮৭—শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়
১৮৯৮—কালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়
১৮৯৯—অমূল্যধন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯০১—অমূল্যধন বন্দ্যোপাধ্যায়
রাজেন্দ্র নাথ সেন (offg)
১৯০২—কুমুদবিহারী মিত্র (offg)
১৯০৩—প্রসন্নকুমার ঘোষাল
১৯০৫—মনোরথধন দে
—রঞ্জিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (offg)
১৯০৭—হেরম্বচন্দ্র সেনগুপ্ত (offg)
১৯০৮—প্রফুল্লকুমার শীল (offg)
—রাধিকানাথ বসু (offg)
১৯১১—যোগেন্দ্রনাথ মিত্র
১৯২৪—যোগেন্দ্রনাথ মিত্র
—ধ্রুবকুমার পাল (offg)
১৯২৬—ধ্রুবকুমার পাল
—নিরঞ্জন নিয়োগী (offg)

এতদ্ব্যতীত হুগলী জেলায় স্যার জর্জ ক্যাম্বেল একটি 'সিভিল সার্ভিস কলেজ' এবং স্যার রিচার্ড টেম্পল একটি সার্ভে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন; কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠান দুইটি উঠিয়া যায়। বঙ্গদেশে পুলিশদিগের শিক্ষার জন্য শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হইলে, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে, হুগলীতে "পুলিশ ট্রেনিং স্কুল" সর্ব্ব প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়; পরে উক্ত শিক্ষালয় ভাগলপুরে স্থানান্তরিত হয়।

শ্রীরামপুর কলেজ এবং হুগলী মহসীন কলেজ এই জেলার দুইটি প্রথম শ্রেণীভুক্ত কলেজ; চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজ, উত্তরপাড়া কলেজ, এবং চুঁচুড়ার হুগলী মাদ্রাসা এই জেলার দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ। এতদ্ব্যতীত শ্রীরামপুরে গভর্ণমেণ্ট উইভিং ইনষ্টিটিউট, চুঁচুড়ায় ভূতনাথ পাল এগ্রিকালচার্ স্কুল ও গভর্ণমেণ্ট এগ্রিকালচার্ ফার্ম্ম এবং মবার্লি টেকনিক্যাল স্কুল আছে। এতদ্ভিন্ন সিঙ্গুরে সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক হেল্‌থ ইউনিট ও মেটার্নিটি ক্লিনিক অবস্থিত, ইহা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রকফেলারের দানে ও বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের দ্বারা পরিচালিত হয়; এইরূপ প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে আর কোথাও নাই।

প্রথম শ্রেণীর কলেজ—শ্রীরামপুর কলেজ—শ্রীরামপুর (বঙ্গের প্রাচীনতম শিক্ষালয়) হুগলী মহসীন কলেজ—চুঁচুড়া

দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ—উত্তরপাড়া কলেজ—উত্তরপাড়া, হুগলী মাদ্রাসা—চুঁচুড়া, ডুপ্লে কলেজ—চন্দননগর।

কৃষি বিদ্যালয়—ভূতনাথ পাল এগ্রিকালচার্ স্কুল ও গভর্ণমেণ্ট এগ্রিকালচার্ ফার্ম্ম—চুঁচুড়া।

শিল্প বিদ্যালয়—মবার্লি টেকনিক্যাল স্কুল—চুঁচুড়া।

বয়ন বিদ্যালয়—গভর্ণমেণ্ট উইভিং ইনষ্টিটিউট—শ্রীরামপুর।

চন্দননগরের "ডুপ্লে কলেজ" ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়; পূর্ব্বে ইহা "সেণ্ট মেরীস্ ইনিষ্টিটিউশন" বলিয়া পরিচিত ছিল। ইহা ফরাসী সরকারের

কর্ত্তৃক পরিচালিত হয় এবং এই কলেজে অন্যান্য ভাষার সহিত "Brevet Elementaire" পর্য্যন্ত ফরাসী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এই কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা করেন এবং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই নিয়ম অব্যাহত ছিল, কিন্তু ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশানুসারে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত এই কলেজ সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ডুপ্লে কলেজে পুনরায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ইণ্টারমিডিয়েট কলা ও বিজ্ঞান পরীক্ষা তখন এই কলেজ হইতে দিবার ব্যবস্থা হয়।

নিম্নে ডুপ্লে কলেজের অধ্যক্ষগণের নাম উল্লিখিত হইল :

১৮৮৮—ওয়াই, কোটেনি	১৯০৪—এইচ, পোডেল্স
১৮৮৯—দেঁ-লরেন্স	১৯৩১—ভি. চ্যাম্পিয়ান
১৮৯৩—জে, এফ, জেইস্ট	ডেনহাম (offg)
১৮৯৩—এইচ, সিরট	লেঃ দে-আস্যারস (offg)
১৮৯৫—এফ, ডিকষ্টা	১৯৩২—আর, বারথক্স (offg)
১৯০৪—এইচ, পোডেন্স	জে, বাফার্ড (অস্থায়ী)
১৯০৩—চরুচন্দ্র রায়	১৯৩৩—ডি, এন, মুখার্জ্জি

হুগলী জেলার শিক্ষা সম্বন্ধে টয়েনবি সাহেব লিখিয়াছেন যে, প্রাচীন কাগজপত্র হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতার কালেক্টারকে চুঁচুড়া এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমুহের বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার্থ রেভারেণ্ড মুণ্ডীর হস্তে মাসিক আটশত টাকা দিবার নির্দ্দেশ দেন। কোম্পানীর পক্ষ হইতে একাউণ্টেণ্ট-জেনারেল কর্ত্তৃক ২৫শে মার্চ্চ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে এই নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

"To continue to pay to the Revd Mr. Mundy Rs. 800/- per mensom on account at the native Schools supported by Government at Chinsura and its vicinty." *

পর বৎসর চুঁচুড়া ওলন্দাজদিগের হস্ত হইতে ইংরাজদের নিকটে আসিলে, তিনি ওলন্দাজদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'চুঁচুড়া স্কুল সোসাইটি'র হস্তে প্রতিমাসে আরো পঞ্চাশ টাকা করিয়া দিবার নির্দ্দেশ দেন।

রেভারেণ্ড মুণ্ডী কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত চৌদ্দটি স্থানের বিদ্যালয় তখন পরিচালিত হইত। যথা নৈহাটী, ভাটপাড়া, গৌরপাড়া (Gaurapara) (ইহা সম্ভবতঃ গৌরীপুর হইবে) বিবিহাট, মানকুণ্ডু, হালদারপাড়া, হাজিনগর, হুগলী, খসবাটী (Khasbati) বাঁশবেড়িয়া, হালিশহর, কাঁচড়াপাড়া, কুলোপুকরি (Kulopakheree) এবং কাঁকসালি (Kankshali)। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর সরকারী মাসিক আট শত টাকা সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং যদি কোন ভদ্রলোক নিজ ব্যয়ে কোন বিদ্যালয় পরিচালন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে আসবাব পত্রগুলি দেওয়া হইবে বলিয়া জানান হয়, কিন্তু কেহই অগ্রসর না হওয়ায় এই বিদ্যালয়গুলি পরে উঠিয়া যায়।

মুসলমান রাজত্বের প্রথম দিকে এই দেশে শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না; পরে তাহারা ফারসী শিক্ষার জন্য 'মক্তব' প্রতিষ্ঠা করেন এবং হিন্দু ছাত্রগণকে উক্ত মক্তবে মুসলমানদের সহিত পাঠ করিতে হইত। টোল ও চতুষ্পাঠীতে একমাত্র ব্রাহ্মণ ছাত্র ব্যতীত অন্য কোন বর্ণের ছাত্রবৃন্দের প্রবেশাধিকার ছিল না বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। কায়স্থ ব্যতীত অন্য কোন জাতি তৎকালে ফারসী অধ্যয়ন করিতেন না; সেই জন্য রাজকার্য্যে একমাত্র কায়স্থগণই নিয়োজিত হইত দেখা যায়।

* Toynbee's Administration of the Hughly District.

স্ত্রীশিক্ষা মুসলমান রাজত্বে নিতান্ত দূষনীয় ছিল ; যদি কোন মহিলা রামায়ণ বা মহাভারত কদাচিৎ পড়িতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি শিক্ষিতা বলিয়া বিবেচিত হইতেন। স্ত্রীলোকদের বার-ব্রত পালন ও কথকথা শ্রবণ তৎকালে একমাত্র শিক্ষা ছিল। এই 'কথকথা' প্রায় পাঁচশত বৎসর ধরিয়া হিন্দু সংস্কৃতি রক্ষায় যে কিভাবে সহায়তা করিয়াছিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইয়া যাইতে হয়। প্রতিদিন হিন্দুদের গৃহে সন্ধ্যাকালে বর্ষীয়সী মহিলাগণ, হিন্দু ধর্ম্মের কোন না কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন এবং বালিকা, যুবতী ও বৃদ্ধাগণ সমবেত হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেন। ইহা তৎকালে 'কথা' বলিয়াই খ্যাত ছিল। অদ্যাপি বহু হিন্দু গৃহে কোন পর্ব্ব উপলক্ষে এইরূপ 'কথা' (যেমন ইতুর কথা, মঙ্গল-চণ্ডীর কথা) হইয়া থাকে। এইরূপ 'কথা' ও 'কথকথা' দ্বারাই তৎকালে স্ত্রীলোকদের প্রধানতঃ শিক্ষা দেওয়া হইত।

আকবর মোগলযুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাট , শুধু মোগলযুগের কেন, পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে যে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ নরপতির নাম আমাদের মনে উদিত হয়, আকবর তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। উদারতা, পরমত-সহিষ্ণুতা, দূরদৃষ্টি প্রভৃতি গুণে ও অপক্ষপাত রাজ্যশাসনে তিনি ভারতের মোগল সাম্রাজ্য দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছিলেন।

আকবর নিজে নিরক্ষর ছিলেন ; তিনি লিখিতে কিম্বা পড়িতে পারিতেন না ; কিন্তু শিক্ষার প্রতি, তাঁহার খুব আগ্রহ ছিল।

রাজ্যমধ্যে যাহাতে শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তার হয় আকবরের সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি একটি বড় লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ফতেপুর সিক্রী, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি কলেজও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি সমভাবে সচেষ্ট ছিলেন। মাদ্রাসা সমূহে যাহাতে মুসলমান ছাত্রগণের সঙ্গে হিন্দুছাত্রগণও শিক্ষালাভ করিতে পারে, তিনি তাহারও-

ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আবুল ফজল রচিত 'আইন-ই-আকবরী' একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহাতে আকবরের রাজ্যশাসন প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শিক্ষাক্ষেত্রে আকবর যে সংস্কার প্রবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিলেন তাহার একটি মনোজ্ঞ বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়; বিবরণটির সংক্ষিপ্ত মর্ম্মানুবাদ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

"প্রত্যেক দেশেই বিশেষতঃ হিন্দুস্থানে, বিদ্যালয়ের বালকগণের স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ শিখিতেই বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যায়। আর কতকগুলি অনাবশ্যক বই পড়িতে বাধ্য করিয়া ছাত্রগণের অধিকাংশ সময় নষ্ট করান হয়। সুতরাং সম্রাট আদেশ দিতেছেন যে, বিদ্যালয়ের প্রত্যেক বালককে প্রথমে বর্ণমালার অক্ষরগুলি লিখিয়া শিখাইতে হইবে এবং এইজন্য তাহাদিগকে অক্ষরের উপর দাগা বুলাইতে অভ্যস্ত করাইতে হইবে। প্রথমে ছাত্রগণ বর্ণমালার অক্ষরগুলির নাম এবং আকৃতি শিখিবে, দুই দিনেই ইহা শিখান যাইতে পারে। তৎপরে ছাত্রগণ যুক্তাক্ষর লিখিতে শিখিবে। এক সপ্তাহেই যুক্তাক্ষরগুলি আয়ত্ত হইবে। ইহার পরে কিছু গদ্য ও পদ্য মুখস্থ করাইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু স্তোত্র ও নীতিকাব্যও মুখস্থ করিবে। এই গুলি বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিতে হইবে। সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, ছাত্র যেন নিজের চেষ্টায় সব বুঝিতে শেখে; শিক্ষক মহাশয় মাঝে মাঝে তাহাকে একটু সাহায্য করিবেন মাত্র। প্রত্যহই ছাত্রকে কিছু কিছু হাতের লেখা লিখিতে হইবে; প্রসিদ্ধ কবিতার লাইন বা অর্দ্ধ লাইন বারংবার লিখিবার অভ্যাস করিলে হস্তাক্ষর সুন্দর হইবে। শিক্ষক মহাশয় বিশেষ করিয়া পাঁচটি জিনিষের দিকে লক্ষ্য রাখিবেন—(১) বর্ণ জ্ঞান; (২) শব্দার্থ, জ্ঞান; (৩) কবিতার অর্দ্ধ লাইন; (৪) কবিতার পূর্ণ লাইন (৫) পূর্ব্বের পাঠ। পূর্ব্বে যাহা শিখিতে ছাত্রগণের বহু বর্ষ লাগিত, এই শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করিলে এক মাসের মধ্যেই তাহারা তাহা শিখিয়া ফেলিবে।

প্রত্যেক বালকের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা করা উচিত—নীতি, অঙ্ক, কৃষি, ক্ষেত্রবিজ্ঞান, জ্যামিতি, জ্যোতিষ, চরিত্রানুমান বিদ্যা, গৃহস্থালী, রাজনীতি, চিকিৎসা ন্যায়, ইতিহাস এবং ভাবী, রিয়াজী ও ইলাহী বিদ্যা (অর্থাৎ বিজ্ঞান, সংখ্যাশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র)। এইগুলি ক্রমশঃ শিখিতে হইবে। যাহারা সংস্কৃত শিখিবে তাহাদিগকে ব্যাকরণ, ন্যায়, বেদান্ত ও পতঞ্জল পড়িতে হইবে বর্ত্তমান কালোপযোগী বিদ্যা কেহই অবহেলা করিতে পারিবে না।"

এই বিবরণ দিয়া আবুল ফজল বলিতেছেন যে, সম্রাটের এই অনুশাসনের ফলে বিদ্যালয়সমূহ নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং মাদ্রাসাসমূহ উজ্জল আভায় দীপ্ত হইল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এই দেশে শিক্ষা বিস্তারে কোনরূপ সহানুভূতি ছিল না এবং এদেশের জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া যে তাহাদের কর্ত্তব্যের অন্তর্গত তাহাও তাহারা চিন্তা করিতেন না। কিন্তু ওয়ারেণ হেষ্টিংসের যত দোষই থাকুক, উচ্চশিক্ষা দানের তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছিলেন যে, যাহারা দুর্ব্বল তাহাদের রক্ষা করা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক, যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত, তাহাদের ক্ষতিপূরণ করা প্রশংসার্হ; কিন্তু জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধির চেষ্টা ঐশ্বরিক দানের মত গৌরবজনক।

"It is human, it is generous to protect the feeble, it is meritorious to redress the injured but it is Godlike bounty to bestow expansion of intellect to infuse the Promethean Spark into the statue and weaken it into a man." *

তৎকালে এই দেশে শিক্ষা বিস্তারের দিকে সরকারের বিশেষ লক্ষ ছিল না; আরবী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য সরকার হইতে সামান্য

* Good old Days of Honourable John Company, Vol I.

কিছু ব্যয় করা হইত। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের 'মিনিটে' গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্ক প্রথম লিখিলেন—"ভারতবাসী জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রচারই বৃটিশ রাজ্যের মহৎ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং শিক্ষা বাবদ সকল মঞ্জুরী অর্থ শুধু ইংরাজী শিক্ষার জন্য ব্যয় করিলেই ভাল হয়।" ইহার পর হইতেই সরকার বাহাদুর শিক্ষা ব্যবস্থায় উৎসাহ দান করিতে আরম্ভ করেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে বঙ্গদেশে ছোটলাটের পদ সৃষ্টি হয় এবং স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে প্রথম ছোটলাট হইবার পূর্ব্বে তিনি শিক্ষা পরিষদের সদস্যরূপে ২৪শে মার্চ্চ তারিখে যাহা বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল :

"বঙ্গদেশে অসংখ্য দেশীয় ধরণের পাঠশালা আছে ; ইউরোপীয় এবং এদেশীয় উভয় শ্রেণীর ভদ্রলোকের কাছে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে, পাঠশালাগুলির অবস্থা অতি শোচনীয় কারণ শিক্ষকের কার্য্য অতি অযোগ্য লোকের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। এই পাঠশালাগুলিকে যথাসম্ভব উন্নত করিয়া তোলা আমাদের উদ্দেশ্য হইবে। পাঠশালাগুলির আদর্শ-স্বরূপ কতকগুলি মডেল স্কুলের ব্যবস্থা করা দরকার নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিলে, গুরুমহাশয়ের আদর্শের প্রেরণায় ক্রমশঃ পাঠশালাগুলিকে উন্নত ধরণে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন।" *

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই সময় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার সাহায্যেই ছোটলাট বাহাদুর বঙ্গদেশে শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করেন ; হ্যালিডে সাহেব তাহাও পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যর সহিত বড়লাটের

---

* Selections from the Records of the Bengal Government, No—XXII.

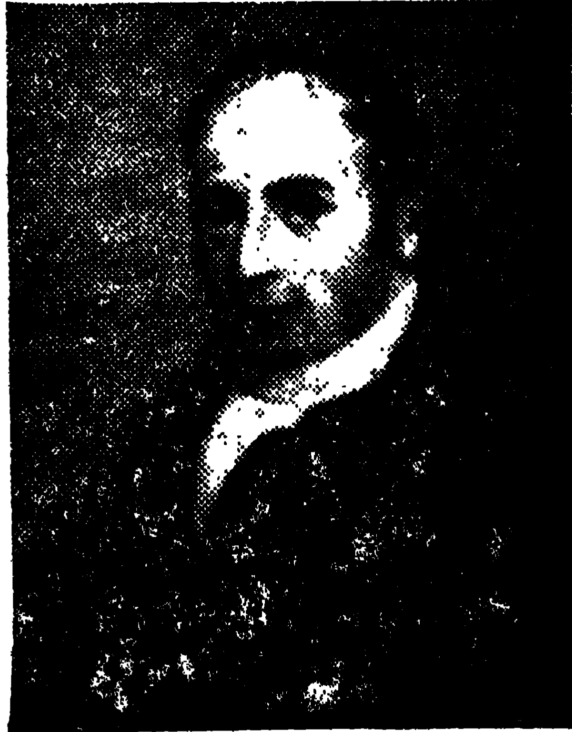
নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। নিম্নে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মন্তব্য উদ্ধৃত হইল :

"সুবিস্তৃত এবং সুব্যবস্থিত বাংলা শিক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয়, কেন না মাত্র ইহারই সাহায্যে জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব। কেবল লেখা, পড়া ও কিছু অঙ্ক শেখাতেই এই শিক্ষা পর্য্যবসিত হইলে চলিবে না; শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্ম ভূগোল, ইতিহাস, জীবন-চরিত, পাটিগণিত, পদার্থ-বিদ্যা, নীতি বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, এবং শরীরতত্ত্ব শেখান প্রয়োজন।" *

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশে পাঠশালার অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু এই পাঠশালায় পূর্ব্বেকার সঙ্কীর্ণ প্রথায় শিক্ষাদান করা হইত এবং তৎকালে পাঠ্য পুস্তকের একান্ত অভাব ছিল। খৃষ্টান মিশনারীগণ অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন ও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষা শিক্ষা ও চর্চ্চার পথ সুগম করিলেও তরুণ ছাত্র-গণকে খৃষ্টতত্ত্ব শিখাইয়া তাহাদিগকে জোর করিয়া খৃষ্টান করিতেন। তৎকালীন হিন্দুগণ ইহাতে বিশেষ শঙ্কিত হইলেন এবং মিশনারীগণের এইরূপ কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রতিবাদ সুরু করিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এই কার্য্যে অগ্রণী হন। ইহার ফলে দরিদ্র হিন্দু-ছাত্রগণকে যাহাতে মিশনারীগণের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে যাইতে না হয়, তজ্জন্য হিন্দু হিতৈষী বিদ্যালয় (Hindu Charitable Institution) ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ তারিখে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উত্তম পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলন করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হয়।

* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর —শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৪৮—৪৯

যাহা হউক হ্যালিডে সাহেব পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর মডেল বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপনের যাবতীয় ভার অর্পণ করেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে মে হইতে ১১ই জুন পর্য্যন্ত হুগলী জেলার শিয়াখালা, রাধানগর, কৃষ্ণনগর, ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা, শ্রীপুর, কামারপুকুর, রামজীবনপুর মায়াপুর, কেশবপুর, পাতিহাল প্রভৃতি গ্রামগুলি পরিভ্রমণ করিয়া স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। স্থানীয় গ্রামের অধিবাসীগণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং কেহ কেহ নিজ ব্যয়ে স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।



ওয়ার্ড

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার চেষ্টায় নদীয়া, বৰ্দ্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় মাসিক পাঁচটি করিয়া কুড়িটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়-

গুলিতে মাসিক পঞ্চাশ টাকা করিয়া খরচ হইত। নিম্নে হুগলী জেলার কোন কোন্ গ্রামে বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং প্রতিষ্ঠার তারিখ প্রদত্ত হইল।

১।	হারোপ মডেল স্কুল	প্রতিষ্ঠাকাল	২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৫
২।	শিয়াখালা মডেল স্কুল	„	১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৫
৩।	কৃষ্ণনগর মডেল স্কুল	„	২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৫
৪।	কামারপুকুর মডেল স্কুল	„	২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৫
৫।	ক্ষীরপাই মডেল স্কুল	„	১ নভেম্বর ১৮৫৫

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের 'এডুকেশন ডেসপ্যাচে' ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তার কল্পে যাহা উল্লিখিত হইয়াছিল তাহা উদ্ধৃত হইল : "(1) the constitution of a separate Department of the administration for education. (2) the institution of Universities at the presidency towns, (3) the establishment of the institutions for training teachers for all classes of Schools. (4) the maintenance of the existing Government Colleges and high Schools, and the increase of their number, where necessary, (5) the establishment of new middle schools ; (6) increased attention to vernacular schools, indigenous or other for elementary education ; and (7) the introduction of a system of grants-in-aid."

বর্তমানে হুগলী জেলায় ৬৫টি উচ্চ ইংরাজী স্কুল, ৫টি কলেজ, ১২১৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫৪টি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ৩৫টি বালিকাদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২৬৫টি মক্তব আছে। এতদ্ব্যতীত কলকারখানার শ্রমিকদের নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য হুগলী জেলা বোর্ডের ৪০টি নৈশ বিদ্যালয় আছে। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য এই জেলায় ৬৬টি টোল আছে এবং ২৪টি মাদ্রাসা আছে। মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে জেলাবোর্ড কর্তৃক সাহায্য দান করা হয়।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে এই জেলায় তিরিশটি উচ্চ ইংরাজি স্কুল ছিল; তন্মধ্যে একমাত্র মহানাদে খৃষ্টান মিশনারীগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত উচ্চ ইংরাজী স্কুলটি বর্ত্তমানে উঠিয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্কুলগুলি ছাড়া এক্ষণে জেলায় ৩৫টি স্কুল বেশী স্থাপিত হইলেও বঙ্গের অন্য জেলা অপেক্ষা এই স্থানের স্কুলের সংখ্যা অনেক কম। বঙ্গদেশের মধ্যে ঢাকা জেলায় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা সর্ব্বাধিক ১৫১টি, তাহার পর কলিকাতা, এই স্থানের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩৭টি। সর্ব্বাপেক্ষা কম সংখ্যক বিদ্যালয় জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিঙ জেলায় দেখিতে পাওয়া যায়; জলপাইগুড়িতে ১০টি এবং দার্জ্জিলিঙ জেলায় মাত্র ৯টি বিদ্যালয় আছে।

বর্দ্ধমান বিভাগের জেলাগুলির মধ্যে মেদিনীপুরে ৮৩টি, বর্দ্ধমানে ৭৭টি, হুগলীতে ৬৫টি, হাওড়ায়, ৬৩টি, বাঁকুড়াতে ৩০টি এবং বীরভূমে ২৭টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। ঢাকা বিভাগের চারিটী জেলায় মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৭২ এবং তাহার সহিত তুলনায় বর্দ্ধমান বিভাগের ছয়টী জেলায় মোট উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৪৫টি। শিক্ষা বিস্তারের প্রধান অঙ্গ বিদ্যালয়; বর্ত্তমানে এই জেলার বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে না পারিলে ভবিষ্যতে এই জেলার সুনাম রক্ষা করা যে অসম্ভব, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

নিম্নে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়গুলির নাম ও কোন স্থানে অবস্থিত, তাহা উল্লিখিত হইল।

সরকারী বিদ্যালয়

১। হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল—হুগলী
২। হুগলী কলেজিয়েট স্কুল—চুঁচুড়া
৩। উত্তরপাড়া গভর্ণমেণ্ট স্কুল—উত্তরপাড়া

সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত

৪। আকুনি উচ্চ বিদ্যালয়—আকুনি
৫। আরামবাগ উচ্চ বিদ্যালয়—আরামবাগ
৬। বাগাটি উচ্চ বিদ্যালয়—মগরা
৭। বলাগড় উচ্চ বিদ্যালয়—বলাগড়
৮। বন্দীপুর উচ্চ বিদ্যালয়—বন্দীপুর
৯। বাঁশবেড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়—বাঁশবেড়িয়া
১০। বাতানল উচ্চ বিদ্যালয়—বাতানল।
১১। ভাণ্ডারহাটি উচ্চ বিদ্যালয়—ভাণ্ডারহাটি
১২। ভাস্তাড়া উচ্চ বিদ্যালয়—ভাস্তাড়া
১৩। চাতরা নন্দলাল উচ্চ বিদ্যালয়—শ্রীরামপুর
১৪। চুঁচুড়া ডাফ ইনষ্টিটিউশান—চুঁচুড়া
১৫। চুঁচুড়া বালিকা বাণীমন্দির—চুঁচুড়া
১৬। গুপ্তিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়—গুপ্তিপাড়া
১৭। ইলছোবা-মণ্ডলাই উচ্চ বিদ্যালয়—ইলছোবা
১৮। জনাই ট্রেনিং স্কুল—জনাই
১৯। কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়—কোন্নগর
২০। মুথাডাঙ্গা আর-কে উচ্চ বিদ্যালয়—মায়াপুর
২১। রাজবলহাট উচ্চ বিদ্যালয়—রাজবলহাট
২২। রিষড়া উচ্চ বিদ্যালয়—রিষড়া
২৩। সেণ্ট জন্স হাই স্কুল—ব্যাণ্ডেল
২৪। শ্রীরামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়—শ্রীরামপুর
২৫। সিঙ্গুর মহামায়া ইনষ্টিটিউশান—সিঙ্গুর
২৬। শ্রীরামপুর ইউনিয়ন স্কুল—শ্রীরামপুর

জন সাধারণের দ্বারা পরিচালিত

২৭। অলাতি উচ্চ বিদ্যালয়—অলাতি
২৮। আটপুর উচ্চ বিদ্যালয়—আটপুর
২৯। বাবনান উচ্চ বিদ্যালয়—বাবনান
৩০। বৈদ্যবাটি উচ্চ বিদ্যালয়—বৈদ্যবাটি
৩১। বাহিরখণ্ড গিরিশ ইনষ্টিটিউশন—কৈঁকালা
৩২। বড়ডঙ্গল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়—বড়ডঙ্গল
৩৩। বেঙ্গাই উচ্চ বিদ্যালয়—সুরুল চৌমাথা
৩৪। ভদ্রেশ্বর তেলিনাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়—ভদ্রেশ্বর
৩৫। বৈঁচী বিহারীলাল মুখার্জ্জি ফ্রি স্কুল—বৈঁচী
৩৬। চন্দননগর বঙ্গ বিদ্যালয়—চন্দননগর
৩৭। ডুপ্লে কলেজ—চন্দননগর
৩৮। চন্দননগর প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থীভবন—চন্দননগর
৩৯। চুঁচুড়া দেশবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়—চুঁচুড়া
৪০। চুঁচুড়া শিবচন্দ্র সোম ট্রেণিং একাডেমী—চুঁচুড়া
৪১। দশঘরা উচ্চ বিদ্যালয়—দশঘরা
৪২। দ্বারবাসিনী উচ্চ বিদ্যালয়—দ্বারবাসিনী
৪৩। গড়বাটী উচ্চ বিদ্যালয়—চন্দননগর
৪৪। গোপালনগর কে. কে. জ্ঞানদা উচ্চ বিদ্যালয়—নাঙ্গলপাড়া
৪৫। গরলগাছা উচ্চ বিদ্যালয়—চণ্ডীতলা
৪৬। গুড়্‌প আর. কে. উচ্চ বিদ্যালয়—গুড়্‌প
৪৭। হরিপাল গুরুদয়াল উচ্চ বিদ্যালয়—হরিপাল
৪৮। হেলন-সেকেন্দরপুর কে. পি. পাল ফ্রি ইনষ্টিটিউশন—হেলনঃ
৪৯। ইটাচোনা শ্রীনারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়—ইটাচোনা

৫০। জঙ্গলপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়—অলতাই

৫১। জাঙ্গিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়—জাঙ্গিপাড়া

৫২। কেশবপুর মহেন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়—কেশবপুর

৫৩। * কৃষ্ণভামিনী নারী শিক্ষা মন্দির—চন্দননগর

৫৪। মাহেশ উচ্চ বিদ্যালয়—শ্রীরামপুর

৫৫। নন্দনপুর রূপচাঁদ একাডেমী—নন্দনপুর

৫৬। প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থী ভবন—চন্দননগর

৫৭। পুইনান উচ্চ বিদ্যালয়—পুইনান।

৫৮। রমানাথপুর কুমিরমোড়া উচ্চ বিদ্যালয়—কৃষ্ণরামপুর

৫৯। শেয়াখালা বেণীমাধব উচ্চ বিদ্যালয়—শিয়াখালা

৬০। সোমড়া উচ্চ বিদ্যালয়—সোমড়া

৬১। তারকেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়—তারকেশ্বর

৬২। উত্তরপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়—উত্তরপাড়া

৬৩। জামগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়—জামগ্রাম

৬৪। ভাঙ্গামোড়া উচ্চ বিদ্যালয়—ভাঙ্গামোড়া

৬৫। বড়া মধুসূদন উচ্চ বিদ্যালয়—বড়া

স্ত্রী শিক্ষার ব্যবস্থা

শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ পাদরী মার্শম্যান সাহেবের সহধর্ম্মিনী হানা মার্শম্যানের চেষ্টায় ১৮০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর সহরে বঙ্গদেশের প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার চেষ্টায় শ্রীরামপুরের চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহে তেরটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। বঙ্গদেশে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁহারা সমাচার দর্পণে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়।

---

* তারকা চিহ্নিত বিদ্যালয়গুলি কেবল মাত্র বালিকাদের জন্য।

'সমাচার-দর্পণ' পত্রে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ২২শে এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

স্ত্রী শিক্ষা ॥—এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাবিধায়ক এক গ্রন্থ পূর্ব্বং প্রমাণ সহকারে মোকাম কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ দেওয়া যাইতেছে।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণেরা ইদানীং বিদ্যাভ্যাস করেন না কিন্তু বিদ্যাভ্যাস করণে দোষ লেশও নাই। যদ্যপি শাস্ত্রীয় ও ব্যবহারিক দোষ থাকিত তবে পূর্ব্বতন সাধ্বী স্ত্রীগণেরা বিদ্যাশিক্ষাতে অবশ্য পরাঙ্মুখ হইতেন। তথাচ

যাজ্ঞবল্ক্যপত্নী মৈত্রেয়ী অনুসূয়া দ্রৌপদী রুক্মিণী চিত্রলেখা লীলাবতী কর্ণাটরাজস্ত্রী লক্ষ্মণসেনের স্ত্রী ও খনা ইত্যাদি পূর্ব্বতন স্ত্রী সকল অশেষ শাস্ত্রধ্যয়ন করিয়া তত্তৎ শাস্ত্রের পরিদর্শরূপে বিখ্যাত ছিলেন এবং ইদানীন্তন মহারাণী ভবানী হটী বিদ্যালঙ্কার শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মণী এঁহারা লেখাপড়া ও নানা শাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যাতে অতিতৎপরা হইয়া অতিসুখ্যাতি প্রাপ্তা হইয়াছেন। বিদ্যাশিক্ষাতে তাহারদিগের কোন অংশে মানক্রটি কিম্বা অপযশ হয় নাই বরং যশোবৃদ্ধি হইয়াছে।

এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদে স্পষ্ট লিখিয়াছেন অনেকের বোধের অগম্য যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞ্যবল্ক আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা মৈত্রেয়ী চরিতার্থা হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার কীর্ত্তি অদ্যাপি আছে এবং ব্রহ্মার পুত্র অত্রি তাঁহার স্ত্রী অনুসূয়া অশেষ শাস্ত্র পাঠ করিয়া বিদ্যাবতী হইয়া অন্যকে শাস্ত্রোপদেশ করিয়াছেন এবং দ্রুপদরাজকন্যা পাণ্ডব পত্নীর পাণ্ডিত্য লিপিবাহুল্য। এবং রুক্মিণী পত্র লিখিয়া সুদাম ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে স্পষ্ট লিখিয়াছেন। এবং চিত্রলেখার শাস্ত্রদৃষ্টি ও শিল্পবিদ্যা ঐ শ্রীমদ্ভাগবতে উদাহরণ প্রকরণে স্পষ্ট লিখিয়াছেন। এবং

উদয়নাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী এমন পণ্ডিতা ছিলেন যে তাঁহার স্বামীর সহিত শঙ্করাচার্য্য যৎকালে বিচার করিলেন তখন ঐ লীলাবতী উভয়ের মধ্যস্থা ছিলেন এবং তাহার রচিত অনেক২ গ্রন্থ প্রচলিত আছে। এবং সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থকর্ত্তা ভাস্করাচার্য্যের কন্যা দ্বিতীয় লীলাবতী অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার তুল্য ছিল না। এবং কর্ণাট দেশের রাজরাণী এমত পণ্ডিতা ছিলেন যে কালিদাস প্রভৃতির কবিতা তুচ্ছ করিয়াছেন। এবং লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রী যে২ কবিতা করিয়াছেন। পণ্ডিতেরা যে সকল প্রসঙ্গ করিয়া জ্ঞানীর নিকট প্রতিপন্ন হইতেছেন। এবং পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগ-সারে লিখিত আছে যে তালধ্বজপুরীতে বিক্রম নামক রাজার পুত্র মাধব যখন সুলোচনাকে বিবাহ করিতে দীব্যন্তী নগরে গিয়া সুলোচনাকে পত্র লিখিয়াছিলেন তখন ঐ সুলোচনা পত্র পাঠ করিয়া সদুত্তর লিখিয়াছিলেন। এবং বীরসিংহ রাজার কন্যা স্ত্রী মহারাণী ভবানী বিদ্যাভ্যাস দ্বারা চিরকাল রাজশাসন করিয়াছেন কাশীতে তাঁহার অন্নপূর্ণা খ্যাতি আছে অদ্যাপি প্রাতঃকালে উঠিয়া লোকেরা তাঁহার নামস্মরণ করে। এবং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কন্যা হটী বিদ্যালঙ্কার নামে খ্যাত হইয়া বৃদ্ধাবস্থাতে কাশীতে অধ্যাপনা করিয়াছেন এবং সেখানে তাঁহার সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ হইত। এবং কোটালীপাড়া গ্রামে শ্যামাসুন্দরী নামে এক ব্রাহ্মণী ব্যাকরণাদি ন্যায় পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন।

স্ত্রী শিক্ষার শেষ॥—স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক বিষয়ের অবশিষ্ট যে ছিল তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে। ইদানীন্তন বিদ্যাবতী অনেক স্ত্রী আছেন এই কলিকাতা মহানগরের মধ্যে ভাগ্যবান লোকেরদিগের অনেক স্ত্রী প্রায় লেখাপড়া জানেন। এবং বীরনগরের শরণসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্যের দুই কন্যা বার্ত্তাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া পরে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ করিয়া ব্যুৎপন্না হইয়াছিলেন ইহা অনেকে জ্ঞাত আছেন। এবং মালতী মাধব নাটক গ্রন্থে অতিসুস্পষ্ট লিখিত আছে যে মালতী চতুষ্পাঠীতে নানা শাস্ত্র

অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যাবতী হইয়াছিলেন। এবং কর্ণাট দ্রবিড় মহারাষ্ট্র তৈলঙ্গ ইত্যাদি দেশে অনেক বিদ্যাবতী অদ্যাপি আছেন কেহবা স্বয়ং রাজকার্য্য করিতেছেন এবং সংস্কৃত বাক্য অনেকে কহেন এমত অনেক স্ত্রী কাশীতে আছেন। এবং অহল্যা বাঈ নামে একজন পুণ্যবতী ছিলেন তাঁহার কীর্ত্তি কাশীতে ও গয়াতে অদ্যাপি দীপ্তিমতী আছে। তিনি তাবৎ রাজকার্য্য স্বয়ং করিতেন ও সংস্কৃত বাক্য অনর্গল কহিতেন। এখনও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে ইংগ্লণ্ডীয় স্ত্রীগণের আনুকুল্যে কন্যারদিগের পাঠার্থে যে পাঠশালা হইয়াছে তাহাতে যে বালিকারা শিক্ষা করিতেছে তাহার মধ্যে কেহ এক বৎসরে কেহ দেড় বৎসরে লিখাপড়া শিখিয়াছে তাহারা যে ভাষা পুস্তক কখনও দেখে নাই তাহা অনায়াসে পাঠ করিতে পারে। ইহাতে বোধ হয় যে স্ত্রী লোক যদি বিদ্যাভ্যাস করে তবে অতিশীঘ্র জ্ঞানাপন্না হইতে পারে। অতএব যেমত গৃহ কর্ম্মাদি শিক্ষা করান সেমত বালক কালে বিদ্যা শিক্ষা করান উচিত। যেহেতুক স্ত্রী লোকেরা অবীরা হইলেও বার্ত্তাবিদ্যাদ্বারা আপন ধন রক্ষা করিয়া কাল যাপন করিতে পারে অন্যের অধীন হইতে হয় না এবং অন্যে প্রতারণা করিতে পারে না। আরও আপন মনোভিলষিত স্বামীর নিকটে লিখিতে পারে। স্ত্রীলোকেরা পূর্ব্বাপর সিদ্ধ ব্যবহার কর্ম্ম যে আছে তাহা তাহারদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। সে এই যে বাল্য কালে পিতামাতার বশীভূতা হইয়া আজ্ঞানুসারে চলিবে। যৌবনাবস্থাতে স্বামীর বশীভূতা থাকিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানাদি করিবেক। অতএব স্ত্রীলোক কখন স্বতন্ত্র থাকিতে যোগ্য নহে। পিতা রক্ষতি কৌমার ইত্যাদি।

অনেক শাস্ত্রে লিখিত আছে স্ত্রীলোকের অকর্ত্তব্য এই২ দুষ্ট বুদ্ধিতে অন্য পুরুষাবলোকন সহবাস ও যাত্রোৎসবে গমন ও একাকিনী গমন ও ব্যাভিচারিণীর সংসর্গ। এ সকল কর্ম্ম স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নাশের কারণ হয়। যে স্ত্রী গৃহকর্ম্মে নিপুণা ও পতিপ্রিয়া ও প্রিয়ভাষিণী ও

অপ্রগল্‌ভা ও লজ্জিতা ও পতিপরায়ণা ও ধর্ম্মশীলা সে স্ত্রী ইহকালে ও পরকালে অপার সুখভাগিনী হয়।”

হুগলী হইতে এক ক্রোশ দূরে অমরপুর গ্রামে দানবীর তারকনাথ পালিতের পিতা কালীকিঙ্কর পালিত ১৮৩৭ সনের মাঝামাঝি বেনাভোলেণ্ট ইনৃষ্টিটিউশন নামে একটি স্কুল স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় সম্পর্কে ‘জে আর এম,’ স্বাক্ষরে একখানা পত্র ১৮৩৯ সনের ২৬শে জানুয়ারী তারিখের সমাচার দর্পণে’ প্রকাশিত হয়; পত্রখানা এইরূপ:

“এই পাঠশালা দেড় বৎসরাবধি স্থাপিত হইয়াছিল এবং এই অল্প-কালের মধ্যে বালকেরা নানাপ্রকার বিদ্যাতে বিলক্ষণ সুশিক্ষিত হইয়াছে। এবং অরিএণ্টাল সেমিনারির অধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু প্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রেরদিগকে নানাপ্রকার শিক্ষা দেওনার্থ উদ্যোগ কলিতেছেন।··· শেষোক্ত বিজ্ঞবর বাবুর অত্যন্ত মনোযোগ দ্বারা অত্যুত্তম পাঠশালার তুল্য এই পাঠশালা হইবে এবং শ্রীযুত বাবু কালীকিঙ্কর পালিত এই মহা ব্যাপারের বিষয়ে যে বিলক্ষণ মনোযোগ করিয়াছেন ইহাতে অত্যন্ত প্রশংসা পাত্র হইয়াছেন।”

১৮৪৩-৪৪ সনের এডুকেশন রিপোর্ট এই বিদ্যালয়টি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

“Umorpore School...In the annual report of July an apprehension was expressed, that the Umorpore School would be given up, but the liberal proprietor, Baboo Kallykincur Paulit, continued it, entirely at his own expense, with exception of the trifling aid afforded by Government for the purchase of books up to the date of his death in December last. It was then found that his estate was bankrupt, and that there were no fund to carry it on. The Head Master Baboo Peary Mohun Banerjee, however, carried on the school for

sometime at his own risk, and without pay, and second Master is now trying to keep it together on a reduced scale...The Head Master has left the School to seek employment, and the Pundit has been appointed, at the Principal's recommendation, to the Bulia Government School." *

ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে অমরপুর অবৈতনিক স্কুল কালীকিঙ্কর পালিতের দানেই পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল, সরকার পুস্তকাদি ক্রয়ের জন্য সামান্যমাত্র অর্থ দিতেন। ১৮৪২ সনের ডিসেম্বরে মৃত্যুকাল অবধি কালীকিঙ্করবাবু এইরূপ অর্থ দিয়া আসিতেছিলেন। মৃত্যুর পর দেখা গেল, স্কুলটির পরিচালনার জন্য তিনি কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। স্কুলের প্রধান শিক্ষক কিছুকাল নিজ দায়িত্বে বিনা বেতনে ইহা চালাইয়াছিলেন, পরে দ্বিতীয় শিক্ষক এ কার্য্যে ব্রতী হন। শেষে প্রধান শিক্ষক মহাশয় স্কুল ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, দ্বিতীয় শিক্ষক বোয়ালিয়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

অমরপুর বিদ্যালয়টি ১৮৪৪ সনের ২৫শে এপ্রিল উঠিয়া যায়। ১৮৪৪-৪৫ সনের এডুকেশন রিপোর্টে পাই,—

"The final, cessation of the Umorpore School, took place on the 25th of April, 1844."

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু কলেজ সংলগ্ন বাংলা পাঠশালার আদর্শে ১৮৪০ সনের ১৩ই জুন কলিকাতায় তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা* স্থাপন করেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক স্বনামধন্য অক্ষয়কুমার দত্ত এই পাঠশালার শিক্ষক ছিলেন। কলিকাতায় তিন বৎসর কাল (জুন ১৮৪০—এপ্রিল ১৮৪৩) অবস্থানের পর পাঠশালাটি বংশবাটি বা বাঁশবেড়িয়ায় স্থানান্তরিত হয়। মফস্বলে নব্য-শিক্ষার প্রসার আবশ্যক—ইহা বিবেচনা করিয়া দেবেন্দ্রনাথ পাঠশালাটিকে ঐ স্থলে লইয়া যান। কলিকাতায় ইহা প্রাতঃকালীন

* বঙ্গে অবৈতনিক বিদ্যালয়—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বিদ্যালয় ছিল। বংশবাটীতে ইহা একটি পুরাপুরি শিক্ষায়তনে পরিণত হয়। অক্ষয়কুমার বংশবাটিতে শিক্ষকরূপে কার্য্য করেন নাই, স্থানীয় এক জন যোগ্য লোকের কর্ত্তৃত্বাধীনে শিক্ষাদান কার্য্য পরিচালিত হইতে থাকে। স্কুলে ছয়টি শ্রেণী ছিল। *

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার কতগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। এখানে ছেলেদের ইংরাজী পড়ানো হইত বটে, কিন্তু সকল বিষয়ই বাংলার মাধ্যমেই পড়াইবার রীতি ছিল। স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার পাঠ্য পুস্তক রচনায় রত হইলেন। অক্ষয়কুমার অঙ্ক, পদার্থ-বিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি সম্বন্ধে বাংলাতেই পাঠ্য পুস্তক লেখেন। এখানে ধর্ম্মশিক্ষারও বিশেষ ব্যবস্থা হইল। বেদান্ত প্রতিপাদ্য উচ্চাঙ্গের হিন্দুধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ্য বিষয়ের অঙ্গীভূত হয়। কলিকাতা এবং বংশবাটী উভয় পাঠশালাটির বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রাখা হইয়াছিল। পাঠশালায় বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদান সম্বন্ধে মাঘ ১৭৬৭শকের (ইং ১৮৪৬) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লেখেন :

"এই পাঠশালাতে পদার্থ বিদ্যা এবং ভূগোলের উপদেশ বঙ্গভাষাতে প্রদান করিবার তাৎপর্য্য এই যে বঙ্গভাষা স্বদেশীয় ভাষা। অতএব তাহাতে উক্ত শাস্ত্রে সকল প্রচলিত হইলে ক্রমশঃ তাহার জ্ঞান সাধারণ লোকের মধ্যে বিস্তারিত হইতে পারিবেক, দ্বিতীয়তঃ ছাত্ররা অতি অল্প বয়স্ক, অদ্যাপি ইংলণ্ডীয় ভাষাতে এরূপ সুশিক্ষিত হয় নাই যাহাতে উক্ত শাস্ত্র সকল উক্ত ভাষাতে অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হয়। যখন তাহারা সুশিক্ষিত হইবে তখন বঙ্গভাষাতে উক্ত শাস্ত্র সকলের প্রধান গ্রন্থ অপ্রাপ্ত হইলে ইংলণ্ডীয় ভাষাতে অধ্যাপনা করা যাইতে পারিবেক।"

১৮৪৫-৪৬ সনের এডুকেশন রিপোর্টেও (পৃঃ ৭৭) হুগলী কলেজ প্রসঙ্গে পাঠশালাটির এইরূপ উল্লেখ আছে :

* বিস্তৃত বিবরণের জন্য শ্রীযোগেশ চন্দ্র বাগল কৃত "দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর" (পৃঃ ৩২-৪০) দ্রষ্টব্য।

"Native education in the district. There is an English school at Bansberia, an ancient seat of Hindoo learning, supported by Baboos Debendranath Tagore and Ramaprasaud Ray the sons of distinguished fathers.

It is established for the diffusion of Vedantic principles but is conducted by an ex-student of the [Hooghly] College, who is himself not of that persuasion."

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ইহার পর তিন বৎসর চলিয়াছিল। ১৮৪৮ সনে ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কার ঠাকুর কোম্পানী এবং ইউনিয়ন বাঙ্কের পতন হেতু সবিশেষ বিব্রত হইয়া পড়েন। সেই বৎসরের মার্চ্চ মাস নাগাদ পাঠশালাটি উঠিয়া যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে নব্যশিক্ষা লাভের জন্য কলিকাতায় এবং মফস্বলে যেরূপ অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আয়োজন হইয়াছিল, শিক্ষার ইতিহাসে তাহা একটি গৌরবময় অধ্যায়। সাধারণের অনাদর এবং সরকারী ঔদাসীন্য হেতু এ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই, তবে কোন কোনটি বৈতনিক বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়া এখনও অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। কিন্তু এই সকল উদ্যোগ-আয়োজনের জন্য পূর্ব্বগামিগণ আমাদের অশেষ শ্রদ্ধাভাজন।

শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ এই অঞ্চলে কেবল বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; অধিকন্তু বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে শিল্প-শিক্ষা দিবারও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বয়স্কা কোন মহিলা শিক্ষায় অনুরাগ দেখাইলে, তাঁহারা মহিলা পাঠাইয়া বিনামূল্যে তাঁহাকে শিক্ষিতা করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। মহিলাগণকে শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করাও যে মিশনারীগণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই সম্বন্ধে কবি রাধামাধব মিত্র লিখিয়াছেন:

যুবক ধরার পক্ষে বিঘ্ন দেখে ভারী।
ফাঁদ পাতা হয়েছিলো ধরিবারে নারী॥
অন্তঃপুরে অঙ্গনাকে পড়াবার ছলে।
আরম্ভ করিল যেতে খৃষ্টানী সকলে॥
ঘরের ঘরণী যত বিদ্যালাভ আসে।
মহানন্দে তাদিগে আসিতে দিত পাশে॥
অন্তঃপুর নিবাসিনী কুলের ললনা।
স্বভাবে সরলা সব বুঝে না ছলনা॥
পরিণামে কি হবে, না ভেবে পুরুষেরা।
বড় খুসি, বিদ্যাশিক্ষা করিছে মেয়েরা॥
শিক্ষাদায়িনীর মনে অন্য ভাব রয়।
বাহিরে যেমন ভাব, ভিতরে তা নয়॥
সাবধান! সাবধান! যত হিন্দু ভাই।
শিক্ষাদায়িনীর বাক্যে আর ভুলো নাই॥
প্রবেশিতে দিও না, দিও না ভবনেতে।
বিদ্যাশিক্ষা হয় না কি অন্য উপায়েতে॥
নারীগণে এ উপায়ে বিদ্যা শিখিবারে।
সম্মতি দিও না আর বলি বারে বারে॥
নারীরা না শিখে বিদ্যা সেও বরং ভালো।
আঁধারে থাকুক তারা, কাজ নাই আলো॥ *

মিশনারীগণ প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের প্রতি বৎসর পরীক্ষা হইত এবং যে সমস্ত ছাত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইতেন তাহাদিগকে চারি আনা, দুই আনা করিয়া পারিতোষিক দেওয়া হইত।

* 'সুধাকর' ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১২৭৭

নিম্নে ১২৩০ সালের ৩০ শে চৈত্র তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্র হইতে একটা সংবাদ উদ্ধৃত হইল।

"পরীক্ষা—৫ এপ্রিল (১৮২৪) সোমবার দিবা দশ ঘণ্টার সময় শহর শ্রীরামপুরের কাছারি বাটীর সম্মুখস্থ বাবু গোপাল মল্লিকের বাটিতে শ্রীরামপুরের ও তচ্চতুর্দিকস্থ গ্রামের পাঠশালার বালিকাদের বিদ্যার পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে সাহেব লোক ও বিবি লোক অনেক আসিয়াছিলেন। ঐ স্থানে তেরটা পাঠশালার সর্ব্বশুদ্ধা দুই শত ত্রিশ বালিকা একত্র হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে পঞ্চাশ জন শব্দ-পাঠ করিল ও পঁয়ত্রিশ জন নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ২ পুস্তক পাঠ করিয়া সকলকে পরমাপ্যায়িত করিল ও অবশিষ্ট বালিকারা ফলা বানান ইত্যাদি পড়িল। পরে বিবি মার্সমন উঠিয়া বালিকাদিগকে বস্ত্র ও শিকি ও পয়সা ও ছবি ইত্যাদি পারিতোষিক দিলেন অপর সকলে সন্দেশ পাইয়া সন্তুষ্টা হইযা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। দুই প্রহরের পরে পরীক্ষা সমাপ্তা হইলে রিবরেণ্ড শ্রীযুক্ত জন মাক সাহেব ঐ সকল পাঠশালার বিবরণ পাঠ করিলেন তাহা শুনিয়া সাহেব লোকের তুষ্টি হইল। আবার বালিকারা যে সকল শিল্প কর্ম্ম অর্থাৎ মোজা ও রুমাল ও থলিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছিল তাহা দেখিয়া সকলে অধিক সন্তুষ্ট হইলেন।"

খৃষ্টান পাদরীগণ শিক্ষা-বিস্তারের সহায়তায় যুবক-যুবতীগণের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে বিশেষ উদ্যোগী হন। বঙ্গের সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণ পাদরীদের এই কাণ্ডে বিশেষ বিচলিত হন এবং যে সমস্ত হিন্দু খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহাদের পুনরুদ্ধারের জন্য "পতিতোদ্ধার সভা" গঠিত হয় এবং রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে তারিখে প্রথম অধিবেশন হয়। বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণের নিকট হইতে পাঁতি সংগ্রহ করিয়া ভিন্নধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দুদের পুনরুদ্ধারের আলোচনা সম্বলিত

একখানি পুস্তিকা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।* হিন্দুগণের এই আন্দোলনকে তৎকালীন ইংরাজি সাপ্তাহিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন তারিখের কাগজে "ঊনবিংশ শতাব্দীর এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

"One of the most important events that has occurred in India in the present century" †

শিক্ষা-বিভাগ ব্যতীত সরকারী অন্য বিভাগগুলিতেও তৎকালে পাদরীদের প্রভাব পরিলক্ষিত হইত। এই সম্বন্ধে রাজা রাধাকান্ত দেব কর্তৃক ডক্টর উইলসনকে লিখিত একখানি পত্র হইতে জানা যায় যে "Missionary influence is now on the ascendant; every department from the fountain head of the Government to the lowest course of office is infected with it." **

খৃষ্টান পাদরীগণ স্ত্রী-শিক্ষার সূচনা করিলেও, সরকার বাহাদুর নারীদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার কল্পে কিছুই করেন নাই। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে ড্রিঙ্কওয়াটার বিটন কলিকাতায় একটা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং শোভাবাজার রাজবাটিতে রাজা রাধাকান্ত দেব কলিকাতায় দ্বিতীয় বালিকা বিদ্যালয় ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে তারিখে স্থাপন করেন। সেই সময় হুগলী জেলার মিশনারীগণের বলিকা বিদ্যালয়গুলি দেখিয়া বহু স্থানে বালকদের বিদ্যালয়ে বালিকাদের পড়াইবার সূচনা হয়।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রী শিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন এবং তিনি মনে করিতেন যে স্ত্রী শিক্ষা ভিন্ন আমাদের দেশের উন্নতি নাই। সৌভাগ্যক্রমে বিটন সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ পরিচয় ছিল এবং 'বিটন নারী বিদ্যালয়ে'র, সম্পাদকরূপে কাজ করিবার জন্য তিনিই নির্ব্বাচিত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বালিকা

* রাজা রাধাকান্ত দেবের গ্রন্থাগারে এই পুস্তিকা রক্ষিত আছে।

† The Friend of India, 5th June, 1851

** রাধাকান্ত দেব—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। পৃষ্ঠা—২০

বিদ্যালয়ের গাড়ীর দুই পাশে মনুসংহিতার নিম্নোক্ত শ্লোকটি দেশবাসীকে সচেতন করিবার জন্য খোদিত করিয়া দিয়াছিলেন :

"কন্যামেব্য পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ।"

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণ ভারতে স্ত্রী শিক্ষা সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার কল্পে বহুল পরিমাণে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব সংগৃহীত হয়। হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত এই বিষয়ে খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা সরকারের স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা ভাল বলিয়া মনে করিয়া স্বয়ং এই দিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেন।

সেই সময় দক্ষিণ-বঙ্গের স্কুল সমূহের ইন্সপেক্টার প্রাট সাহেব বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য গ্রামবাসিগণের তিনখানি আবেদন পত্র পান; প্রথম দুই খানি হুগলী জেলার হরিপাল থানার অন্তর্গত দারহাট্টা গ্রাম, এবং সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত গোগালনগর গ্রাম হইতে আসে এবং তৃতীয়খানি বর্দ্ধমান জেলার নারোগ্রাম হইতে পাওয়া যায়। প্রাট সাহেব আবেদন পত্রগুলি ছোট লাটের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং তিনি দরখাস্ত তিনখানি মঞ্জুর করেন। প্রত্যেক স্থানেই গ্রামবাসিগণ বিদ্যালয়-ভবন নির্ম্মাণের জন্য ভার লইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ইতিপূর্ব্বে মডেল বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্যও তাহাই করিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস হইতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মে মাস এই সাত মাসের মধ্যে তিনি হুগলী, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর জেলায় পঁয়ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং এই বিদ্যালয়গুলির জন্য সরকারের মাসিক ৮৪৫৲ টাকা ব্যয় হইত। পরপৃষ্ঠায় হুগলী জেলার বালিকা বিদ্যালয়ের একটি তালিকা প্রদত্ত হইল। *

* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৬৭—৬৮

হুগলী জেলার বালিকা বিদ্যালয়

গ্রামের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	মাসিক খরচ
১। পোলবা	২৪শে নভেম্বর ১৮৫৭	২৯৲
২। দাসপুর	২৬শে নভেম্বর ১৮৫৭	২০৲
৩। বৈঁচী	১লা ডিসেম্বর ১৮৫৭	৩২৲
৪। দিগশুই	৭ই ডিসেম্বর ১৮৫৭	৩২৲
৫। তালাণ্ডু	৭ই ডিসেম্বর ১৮৫৭	২০৲
৬। হাতিনা	১৫ই ডিসেম্বর ১৮৫৭	২০৲
৭। হয়েরা	১৫ই ডিসেম্বর ১৮৫৭	২০৲
৮। ন'পাড়া	৩০শে জানুয়ারী ১৮৫৮	১৬৲
৯। উদয়রাজপুর	২রা মার্চ্চ ১৮৫৮	২৫৲
১০। রামজীবনপুর	১৬ই মার্চ্চ ১৮৫৮	২৫৲
১১। আকবরপুর	২৮শে মার্চ্চ ১৮৫৮	৩৫৲
১২। শিরখোলা	১লা এপ্রিল ১৮৫৮	২০৲
১৩। মাহেশ	১লা এপ্রিল ১৮৫৮	২৫৲
১৪। বীরসিংহ *	১লা এপ্রিল ১৮৫৮	২০৲
১৫। গোয়াল মারা	৪ঠা এপ্রিল ১৮৫৮	২৫৲
১৬। দণ্ডীপুর	৫ই এপ্রিল ১৮৫৮	২৫৲
১৭। দেপুর	১লা মে ১৮৫৮	২৫৲
১৮। রাউজাপুর	১লা মে ১৮৫৮	২৫৲
১৯। মলয়পুর	১২ই মে ১৮৫৮	২৫৲
২০। বিষ্ণুদাসপুর	১৫ই মে ১৮৫৮	২০৲
২১। বদনগঞ্জ †	১০ই মে ১৮৫৮	৩১৲

* বীরসিংহ গ্রাম তৎকালে হুগলী জেলার অন্তঃর্ভুক্ত ছিল।

‡ বদনগঞ্জ বর্ত্তমানে হুগলী জেলায় হইলেও তৎকালে মেদিনীপুরের মধ্যে ছিল।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর তারিখের পত্রে বিলাতের কর্তৃপক্ষ বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য করা হইবে বলিয়া আশ্বাস দিলেও, পরে সিপাহী বিদ্রোহের জন্য আর্থিক অনাটন হওয়ায়, স্থায়ীভাবে সাহায্য করিতে কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করেন এবং শুনা যায় বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই জন্যই অবসর গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ডিরেক্টার অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনকে বালিকা বিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধে ২০শে জুন ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে যে পত্র দেন, নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। এই পত্রখানি হইতে যাবতীয় ব্যাপার সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে।



পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

"হুগলী, বর্দ্ধমান, নদীয়া এবং মেদিনীপুর জেলায় অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম; বিশ্বাস ছিল সরকার হইতে মঞ্জুরী পাওয়া যাইবে। স্থানীয় অধিবাসীরা স্কুল গৃহ তৈয়ারী করিয়া দিলে সরকার খরচ-পত্র চালাইবেন। ভারত-সরকার কিন্তু ঐ সর্ত্তে সাহায্য করিতে নারাজ, কাজেই স্কুলগুলি তুলিয়া দিতে হইবে। কিন্তু শিক্ষক-

বর্গ গোড়া হইতে মাহিনা পান নাই, তাহাদের প্রাপ্য মিটাইয়া দেওয়া দরকার। আশা করি সরকার এই ব্যয় মঞ্জুর করিবেন।

সরকারী আদেশ পাইবার পূর্ব্বেই, আমি অবশ্য স্কুলগুলি চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রথমে আপনি, অথবা বাঙ্গলা সরকার এ বিষয়ে কোনরূপ অমত প্রকাশ করেন নাই; করিলে এতগুলি বিদ্যালয় খুলিয়া এখন আমাকে এমন বিপদে পড়িতে হইত না। স্কুলের কর্ম্মচারিবর্গ মাহিনার জন্য স্বভাবতই আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে। যদি আমাকে নিজ হইতে এত টাকা দিতে হয়, তাহা হইলে, সত্যই আমার উপর অবিচার করা হইবে—বিশেষতঃ খরচ যখন সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্যই করা হইয়াছে।"

সরকার হইতে এই বিদ্যালয়গুলির খরচা দেওয়া হইলেও, ভবিষ্যতে সরকার হইতে পুনরায় সাহায্য দান করা হইবে না বলায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় "নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান" নামক এক ভাণ্ডার স্থাপন করেন এবং পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উক্ত ভাণ্ডারে অর্থ সাহায্য করায়, এই অঞ্চলে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার অল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রসারলাভ করিয়াছিল।

এই দেশের স্ত্রীলোকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য মিশনারীগণ এবং কতিপয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় সবিশেষ চেষ্টা করেন তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি; এই সম্বন্ধে পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে "স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক" শীর্ষক একখানি পুস্তক রচনা করেন। কয়েক মাসের মধ্যেই এই পুস্তকের দুইটি সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যায় এবং কলিকাতার 'স্কুল বুক সোসাইটি' এবং 'চার্চ্চ মিশনরী সোসাইটি' জনমত

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের "দুষ্প্রাপ্যগ্রন্থমালার" ৬ষ্ঠ গ্রন্থরূপে "স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক" বর্ত্তমানে প্রকাশিত হইয়াছে।

গঠনের জন্য এই পুস্তকখানি বিতরণ করিয়াছিলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয় এবং প্রথমেই 'দুই স্ত্রীলোকের কথোপ-কথন' নামে একটি নূতন অধ্যায় ইহাতে সংযোজিত হয়। একটি কবিতা এবং উক্ত গ্রন্থের, দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছি। ইহা হইতে প্রাচীন কালে স্ত্রী শিক্ষার অন্তরায় সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য অবগত হওয়া যাইবে।

প্রশ্ন। ওলো। এখন যে অনেক মেয়্যা মানুষ লেখা পড়া করিতে আরম্ভ করিল এ কেমন ধারা। কালে কালে কতই হবে ইহা তোমার মনে কেমন লাগে।

উত্তর। তবে মন দিয়া শুন দিদি। সাহেবেরা এই যে ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝি এতকালের পর আমারদের কপাল ফিরিয়াছে, এমন জ্ঞান হয়।

প্র। কেন গো। সে সকল পুরুষের কাজ। তাহাতে আমারদের ভাল মন্দ কি।

উ। শুন লো। ইহাতে আমারদের ভাগ্য বড় ভাল বোধ হইতেছে; কেননা এদেশের স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া করে না; ইহাতেই তাহারা প্রায় পশুর মত, অজ্ঞান থাকে। কেবল ঘর দ্বারের কাজ কর্ম্ম করিয়া কাল কাটায়।

প্র। ভাল। লেখা পড়া শিখিলে কি ঘরের কাজ কর্ম্ম করিতে হয় না। স্ত্রীলোকের ঘর দ্বারের কাজ রাঁধা বাড়া ছেলে পিলে প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন। তাহা কি পুরুষে করিবে।

উ। না পুরুষে করিবে কেন, স্ত্রীলোকেরই করিতে হয়, কিন্তু লেখা পড়াতে যদি কিছু জ্ঞান হয় তবে ঘরের কাজ কর্ম্ম সারিয়া অবকাশ মতে দুই দণ্ড লেখা পড়া নিয়া থাকিলে মন স্থির থাকে, এবং আপনার গণ্ডাও বুঝিয়া পড়িয়া নিতে পারে।

প্র। ভাল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার কথায় বুঝিলাম যে লেখা পড়া আবশ্যক বটে। কিন্তু সে কালের স্ত্রীলোকের। কহেঁন যে লেখা পড়া যদি স্ত্রীলোক করে তবে সে বিধবা হয় এ কি সত্য কথা যদি এটা সত্য হয় তবে মেনে আমি পড়িব না, কি জানি ভাঙ্গা কপাল যদি ভাঙ্গে।

উ। না বইন: সে কেবল কথার কথা। কারণ আমি আমার ঠাকুরানীদিদির ঠাঁই শুনিয়াছি যে কোন শাস্ত্রে এমত লেখা নাই, যে মেয়্যা মানুষ পড়িলে রাঁড় হয়। কেবল গতরশোগা মাগিরা এ কথার সৃষ্টি করিয়া তিলে তাল করিয়াছে। যদি তাহা হইত তবে কত স্ত্রীলোকের বিদ্যার কথা পুরাণে শুনিয়াছি, ও বড় বড় মানুষের স্ত্রীলোকেরা প্রায় সকলেই লেখা পড়া করে এমত শুনিতে পাই। সংপ্রতি সাক্ষাতে দেখ না কেন, বিবিরা তো সাহেবের মত লেখা পড়া জানে, তাহারা কেন রাঁড় হয় না।

প্র। ভাল। যদি দোষ নাই তবে এত দিনে এ দেশের মেয়্যা মানুষে কেন শিখে নাই।

উ। শুন লো। যখন স্ত্রীলোক মা বাপের বাড়ী থাকে, তখন তাহারা কেবল খেলা ধুলা ও নাট রঙ্গ দেখিয়া বেড়ায়। বাপ মায়ও লেখা পড়ার কথা কহেন না। কেবল কহেন, যে ঘরের কাজ কর্ম্ম রাঁধা বাড়া না শিখিলে পরের ঘর কন্না কেমন করিয়া চালাইবি সংসারের কর্ম্ম দেয়া থোয়া শিখিলেই শ্বশুর বাড়ী সুখ্যাতি হবে। নতুবা অখ্যাতির সীমা নাই। কিন্তু জ্ঞানের কথা কিছুই কহেন না।

প্র। হায় হায় কেমন দুঃখের কথা দিদি। ভাল প্রায় সকল গাঁয়েই তো পাঠশালা আছে, তবে কন্যারা আপনারাই সেখানে গিয়া কেন শিখে না।* তখন তো বাল্যকাল থাকে কোন স্থানে যাইবার বাধা নাই।

উ। হেসে দেখ দিদি। বাহির পানে তাকাইয়া দেখ না। যদি

ছোট ছোট কন্যারা বাটীর বালকের লেখা পড়া দেখিয়া সাদ করিয়া কিছু শিখে ও পাততাড়ি হাতে করে তবে তাহার অখ্যাতি জগৎ বেড়ে যায়। সকলে কহে যে এই মদ্দা ঢেঁটি ছুঁড়ি বড় অসৎ হবে। এখনি এই, শেষে না জানি কি হবে। যে গাছ বাড়ে তাহার অঙ্কুরে জানা যায়। *

তৎকালে বাঙ্গলা পদ্যে কি ভাবে ইংরাজী শব্দের অর্থ ছাত্র-ছাত্রী-গণকে শিখান হইত, নিম্নের কবিতাটি হইতে তাহা সম্যক অবগত হওয়া যাইবে :

গড ঈশ্বর, লর্ড ঈশ্বর, কম মানে এসো।
ফাদার বাপ, মাদার মা, সিট মানে বসো॥
ব্রাদার ভাই, সিষ্টার বোন, ফাদার-সিষ্টার পিসী।
ফাদার-ইন-ল মানে শ্বশুর, মাদার-সিষ্টার মাসী॥
আই মানে আমি, আর ইউ মানে তুমি।
আস মানে আমাদিগকে, গ্রাউণ্ড মানে জমি॥
ডে মানে দিন, আর নাইট মানে রাত।
উইক কে সপ্তাহ বলে, রাইস মানে ভাত॥
পমকিম্ লাউ কুমড়ো, কোকম্বর শসা।
ব্রিঞ্জেল বেগুন, আর প্লাউম্যান চাসা॥

———

* স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক—গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, পৃষ্ঠা ১—৪

নবম অধ্যায়

ভারতের প্রাচীন স্থানের কাহিনী

সপ্তগ্রাম ভারতের একটি সুপ্রাচীন স্থান ; এই বিখ্যাত অংশ পূর্বে 'সাতগাঁও' নামে পরিচিত ছিল। হিন্দু শাসন সময়ে সপ্তগ্রামে বহু রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সপ্তগ্রাম শহর পুণ্যতোয়া সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। চারিশত বৎসর পূর্বেও সরস্বতীর বিশাল বক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে আগত বাণিজ্যতরীগুলি বিরাজ করিত। ইউরোপীয় লেখকগণ এই সরস্বতী নদীকে "সাতগাঁ রিভার" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সরস্বতী নদী সপ্তগ্রামের নিম্ন দিয়া পশ্চিম-দক্ষিণ মুখে আদমজুড়, আমতা, তমলুক প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত এবং বাণিজ্যপোতগুলি দেশ-বিদেশের রত্নভাণ্ডার সপ্তগ্রাম বন্দরে বহন করিয়া আনিত। মূল সরস্বতী নদী শিবপুরের বোটানিকেল গার্ডেনের কিছু নীচে শাখরাইল গ্রামের নিকট ভাগীরথীর সহিত মিলিত হয়। সরস্বতী ও সপ্তগ্রামের প্রাচীন গৌরবের অসংখ্য পরিচয় পাইলেও আজ উক্ত ইতিবৃত্ত স্বপ্নকাহিনীতে পর্যবসিত হইয়াছে।

সপ্তগ্রাম নামকরণ সম্বন্ধে একটি পৌরাণিক ইতিহাস আছে। সুদূর অতীতে কাণ্যকুব্জে প্রিয়বন্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাহার অগ্নিত্র, মেধাতিথি, বপুষ্মান, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিষ্মান্, সবন ও ভব্য নামে সাতটি পুত্র ছিল। তাঁহারা গৃহাশ্রমী না হইয়া নিভৃত নির্জন গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম-স্থলে সাতখানি বিভিন্ন গ্রামে তপঃসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সপ্তঋষির তপঃস্থল বলিয়া উক্ত স্থান সপ্তগ্রাম নামে আখ্যাত হয়। যে সাতখানি গ্রামে তাঁহারা তপঃশ্চরণ করিয়াছিলেন, সেই গ্রামগুলির নাম বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, খামারপাড়া, কৃষ্ণপুর দেবানন্দপুর, শিবপুর ও ত্রিশবিঘা।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৬ অব্দে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার পঞ্চনদ অধিকার করিয়া বিপাসা তীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন; তখন তাঁহার নিকট 'প্রাসিই' (Prasi) এবং 'গঙ্গরিডয়' (Gangaride) এই দুইটি রাজ্যের সংবাদ আসিয়াছিল। ইহার পরে গ্রীক দূত মেগাস্থিনাস্ পাটলিপুত্র নগরে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সভায় আসিয়া ছিলেন। তিনিও মৌর্য্য সাম্রাজ্যের রাজধানী 'প্রাসিই' অর্থাৎ মগধ এবং উহার পূর্ব্বদিকে স্বাধীন 'গঙ্গরিডয়' রাজ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। *

বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা জেলা, নদীয়া জেলার পশ্চিমাংশ এবং দক্ষিণ ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত সাতগাঁ নামে অভিহিত এবং সপ্তগ্রাম এই বিভাগের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণী তীর্থের গঙ্গা-সরস্বতী সঙ্গমের সমীপ-দেশে এবং ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের 'আদি-সপ্তগ্রাম' নামক স্টেশনের অনতিদূরে সপ্তগ্রাম শহর অবস্থিত ছিল। এই স্থানটি হুগলী শহরের উত্তর-পশ্চিমে প্রায় চার মাইল এবং কলিকাতা হইতে সাতাশ মাইল দূরে অক্ষাংশ ২২°৫৮'২০" উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৮°২৫'১০" পূর্ব্বে অবস্থিত।

ভারতের প্রাচীনতম শহর সপ্তগ্রাম সমগ্র ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধ রক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের বিবিধ পণ্যবাহী বিশাল বাণিজ্যতরী সপ্তগ্রামে উপনীত হইয়া সরস্বতীর বক্ষে কোলাহলের সৃষ্টি করিত এবং সরস্বতীর বিশাল জলরাশি উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া সপ্তগ্রামের পাদমূলে ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্লীনি † লিখিয়াছিলেন:

"That the ships near the Godavori sailed from thence.

* **Portugeese in Bengal, Page 78.**

† Calcutta Review 1846. Page 408.

to Cape Palimerous thence to Tennigale opposite Fulta, thence to Tribeni."

রেভারেণ্ড লং সাহেব লিখিয়াছেন যে, প্লীনির সময় হইতে পর্ত্তুগীজদের আগমনকাল পর্য্যন্ত সপ্তগ্রাম রাজকীয় একটি বন্দর ছিল।

সপ্তগ্রাম-মহানগরে যেমন বহু লোকের বাস ছিল, সপ্তগ্রামের তলদেশ-



সরস্বতী নদীর বর্তমান অবস্থা

বাহিনী সরস্বতী বক্ষেও সেইরূপ বহু অধিবাসী পোতপৃষ্ঠে অবস্থান করিত। বাণিজ্যালয়, ধনীদিগের বিরাট প্রাসাদ, বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম-মন্দির, বিস্তৃত রাজপথ এবং রাজপথের অবিরাম জনপ্রবাহ সপ্তগ্রামের শ্রী ও সজীবতা রক্ষা করিত এবং এই স্থানের বণিক সম্প্রদায় শতসৌধ চূড়ায় সে বিভবচ্ছট বিকীর্ণ করিয়া ভারতের জয়গান ঘোষণা করিত। প্রাচীন রোম প্রভৃতির বৈদেশিক বণিকেরা সপ্তগ্রামের সূক্ষ্ম বস্ত্র 'মসলিন' এখান হইতে লইয়া যাইত এবং উক্ত মসলিন রোমের রাণীরা পরিধান করিতেন। সপ্তগ্রামকে "গ্যাঞ্জেস রেজিয়া" নামে তাঁহারা অভিহিত করিতেন। *

দশম শতাব্দীতে কবি দ্বিজ বিপ্রদাস তাঁহার 'মনসামঙ্গল' নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত হইল :

"বহিত্র চাপায়ে কূলে চাঁদ অধিকারী বলে
দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম।
তথা সপ্তঋষি স্থান সর্ব্বদেব অধিষ্ঠান
শোক দুঃখ সর্ব্বগুণ ধাম॥
জ্যোতি হইয়া এক মূর্ত্তি ঋষিমুনি সেবে তথি
তপজপ করে নিরন্তর।
গঙ্গা আর সরস্বতী যমুনা বিশাল অতি
অধিষ্ঠান উমা মহেশ্বর॥
দেখিব ত্রিবেণী-গঙ্গা চাঁদ রাজা মনে রঙ্গা
কূলেতে চাপায় মধুকর।
আনন্দিত মহারাজ করে নানা তীর্থ কাজ
ভক্তিভাবে পূজে মহেশ্বর॥

* Hamilton's East India Gazetteer, Vol. 11, Page 592.

তীর্থকায সমাপিয়া অন্তরে হরিষ হৈয়া
উঠে রাজা ভ্রমিয়া নগর।
ছত্রিশ আশ্রমের লোক সহি কোন দুঃখ শোক
আনন্দে বঞ্চয়ে নিরন্তর॥
অভিনব সুরপুরী দেখি ঘর সারি সারি
প্রতি ঘরে কনকের ঝারা।
নানা রত্ন সুবিশাল জ্যোতির্ম্ময় কাচ ঢাল
রাজমুক্তা প্রলম্বিত ধারা॥"

পরবর্ত্তীকালে স্মার্ত্ত পণ্ডিত রঘুনন্দনও তাঁহার "প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বে" লিখিয়াছেন—"দক্ষিণ প্রয়াগ উন্মুক্তবেণী সপ্তগ্রামোথ্যা দক্ষিণ দেশে ত্রিবেণীতে খ্যাতঃ।"

বিজয় সেন 'সেনরাজ বংশের' প্রথম স্বাধীন নরপতি। তিনি ১০৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম রাঢ় দেশে রাজত্ব করেন এবং সেই সময় সপ্তগ্রাম তাহার রাজধানী ছিল। পরে তিনি পাল সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ অধিকার করিয়া গৌড় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ত্রিবেণীর নিকটে নিজ নামানুসারে "বিজয়পুর" নামক নগর প্রতিষ্ঠা করেন। *

বিজয় সেনের পর তাহার পুত্র বল্লাল সেন এবং তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেন ১১৮৫ খৃষ্টাব্দে হইতে ১২০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গে রাজত্ব করেন। বল্লালের সময়ে কোন্ হিন্দু রাজা সপ্তগ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় না, তবে লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে মুরারি শর্ম্মা রাঢ়ে রাজত্ব করিতেন এবং সপ্তগ্রাম তাহার রাজধানী ছিল।

* History of Bengal By R. C. Majumdar, Vol. I, Page—33.

মুরারি শর্ম্মার পর রাজা শক্রজিৎ সপ্তগ্রামের শাসন-কর্ত্তা হইয়াছিলেন। কবি কৃষ্ণরাম তৎপ্রণীত "ষষ্ঠীমঙ্গল" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

"সপ্তগ্রাম যে ধরণী তার নাহি তুল।
চালে চালে বৈসে লোক ভাগীরথী কূল॥
নিরবধি যজ্ঞদান পূণ্যবান লোক।
অকাল মরণ নাহি, নাহি দুঃখ শোক॥
শক্রজিৎ রাজার নাম তার অধিকারী।
বিবরয়ে কত গুণ বলিতে না পারি॥
নির্ম্মল যশের শশী প্রতাপে তপন।
জিনিয়া অমরাপুরী তাহার ভবন॥"

রাজা শক্রজিতের বংশীয় কোন রাজার রাজত্বকালে ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে জাফর খাঁ সপ্তগ্রাম অধিকার করেন; সপ্তগ্রামে বিজয়ের পর মুসলমানগণ বহু হিন্দু দেবমন্দির ধ্বংস করিয়া তৎস্থলে মসজিদ নির্ম্মাণ করেন! ত্রিবেণীতে প্রস্তর নির্ম্মিত একটি প্রকাণ্ড দেবমন্দির এবং সপ্তগ্রামের একটি প্রাচীন মন্দিরকেও মসজিদে পরিণত করা হয়। সপ্তগ্রামজয়ী জাফর খাঁ ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করিলে তাঁহাকে ত্রিবেণীর রূপান্তরিত মসজিদে সমাহিত করা হয়। স্যার উইলিয়াম হাণ্টার বলেন যে জাফর খাঁ হিন্দু রাজা ভূদিয়ার সহিত যুদ্ধে ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে নিহত হন। *

১২৯৮ খৃষ্টাব্দে আরবী ভাষায় লিখিত একখানি শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, জাফর খাঁ কাফেরদিগকে তরবারী ও বল্লম দ্বারা বিতাড়িত করিয়া ঈশ্বরের নামে সপ্তগ্রামে মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। ত্রিবেণীর একটি শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, জাফর খাঁ তুরস্ক জাতীয় ছিলেন; বঙ্গের শেষ সুলতান বাহাদুর শাহকে পরাজিত করিবার জন্য ইনি সপ্তগ্রামে

* Ibid, Pages 245—246.

আসিয়াছিলেন। পূর্বে জাফর খাঁ বঙ্গেশ্বরের সৈন্তাধ্যক্ষ ছিলেন এবং সপ্তগ্রাম অভিযানের পূর্বে ইনি দেওকোটের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। গায়সুদ্দীন বুলবনের পৌত্র রুকনুদ্দীন কৈকায়স সাহ যখন বঙ্গদেশ শাসন (১২৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩০২ খৃষ্টাব্দ) করিতেছিলেন, সেই সময় জাফর খাঁ সপ্তগ্রাম অধিকার করেন। দিনাজপুরে প্রাপ্ত শিলালিপিতে ইহার পূর্ণ নাম নিম্নলিখিতরূপে লিখিত আছে:

"উলাঘ-ই-আজম্ হুমায়ুন জাফর খাঁ বরহাল ইংসিল।" *

১৩১৩ খৃষ্টাব্দে জাফর খাঁ সপ্তগ্রামে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং উক্ত বৎসরে তাঁহার মৃত্যু হয়। জাফর খাঁর তৃতীয় পুত্র বারখান গাজি হুগলীর হিন্দু রাজাকে জয় করিয়া তাঁহার কন্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; তাঁহার সমাধিও ত্রিবেণীতে আছে। জাফর খাঁর পর ১৩২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইজুদ্দীন ইয়াহ খাঁ "আজম-উল-মুলুক" উপাধি ধারণ করিয়া সপ্তগ্রাম শাসন করেন। তাঁহাকে পরাজিত করিয়া সৈয়দ ফকর-উদ্দীন সপ্তগ্রামের শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। হিজরী ৭২৯ অব্দে অর্থাৎ ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রামে প্রথম টাকশাল স্থাপিত হইয়াছিল। হিজরী ৯৫৭ অব্দ অর্থাৎ ১৫৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শের শাহের পুত্র ইসলাম শা'র রাজত্বকাল পর্য্যন্ত সপ্তগ্রামে টাকশাল ছিল। সপ্তগ্রামে মুদ্রিত যে সমস্ত মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা Catalogue of coins in the Indian Museum, Vol. II নামক পুস্তকের বহু স্থানে (নং ৭৪, ৮২, ২২৪, ২২৭ ইত্যাদি) উল্লিখিত আছে।

কতিপয় শিলালিপি দৃষ্টে জানা যায় যে, ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে ইকরার খাঁ, ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে তরবিয়ৎ খাঁ, ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে উলাঘ মজলিশ খাঁ, ১৫০৫

* Journal of the Asiatic Society of Bengal—1870, Page 285-286.

খৃষ্টাব্দে উলাঘ খাঁ এবং ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে রুকুনুদ্দীন সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত শ্রীমদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতৃব্য হিরণ্য দাস ও পিতা গোবর্দ্ধন দাস সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। গৌড়েশ্বর তাঁহাদের নিকট হইতে বার লক্ষ টাকা রাজস্ব গ্রহণ করিতেন, কিন্তু তাঁহারা প্রজাদের নিকট হইতে ত্রিশ লক্ষ টাকা আদায় করিতেন বলিয়া জানা যায়। এই সম্বন্ধে "চৈতন্য চরিতামৃতে" লিখিত আছে

"হেনকালে মুলুকের ম্লেচ্ছ অধিকারী।
সপ্তগ্রাম মুলুকের সে হয় চৌধুরী॥
হিরণ্য দাস মুলুক নিল মোকতা করিয়া।
তার অধিকার গেল, মরে সে দেখিয়া॥
বার লক্ষ দেন রাজায় সাধেন ত্রিশ লক্ষ।
সেই তুড়ুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ॥
রাজারে কৈফিতি দিয়া উজিরে আনিল।
হিরণ্য মজুমদার পলাইল, রঘুনাথে বান্ধিল॥

১৩৩০ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ মহম্মদ তোগলক্ বঙ্গদেশকে তিনটি উপবিভাগে বিভক্ত করেন, যথা (১) লক্ষ্মণাবতী, (২) সাতগাঁ, এবং (৩) সোনারগাঁ উক্ত তিনটি শহর তিন বিভাগের রাজধানী হইয়াছিল। *

বাদশাহ মহা অত্যাচারী হইয়া উঠিলে, সোনারগাঁয়ের শাসনকর্ত্তা ফকরউদ্দীন স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। † সেইসময় সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা ইজুদ্দীন ইয়দ খাঁ এবং লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা কাদর খাঁ ফকরউদ্দীনের

* Hunter's statisticl Account of Bengal. (Page 119.)

† মস্তখব-উৎতওয়ারিখ, ১ম ভাগ, পৃঃ ৩০২

বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধে ফকরউদ্দীন প্রথমে পরাস্ত হন, কিন্তু কাদর খাঁর সৈন্যগণ অর্থলোভে ফকরউদ্দীনের পক্ষে যোগদান করিলে, তিনি জয়ী হন এবং সপ্তগ্রাম ও লক্ষ্মণাবতী অধিকার করেন। সৈয়দ ফকরুদ্দীন, তাহার পত্নী ও একটি খোজাকে সপ্তগ্রামে সমাহিত করা হয় এবং তাহাদের সমাধি অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। সৈয়দ ফকরউদ্দীনের সময়ে ইবন্ বটুটা নামক একজন পর্য্যটক ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তিনি সপ্তগ্রাম এবং তৎকালীন বঙ্গদেশের অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

"আমরা মালদ্বীপপুঞ্জের সাহাই দ্বীপ হইতে ৪৩ দিন সমুদ্রবক্ষে অতিবাহিত করিয়া বঙ্গদেশে আসিয়া উপস্থিত হই। দেশ অতি বিস্তীর্ণ, এখানকার সকল পণ্যই সুলভ কিন্তু বায়ুমণ্ডল সর্ব্বদাই তমসাচ্ছন্ন। আমরা সর্ব্বাগ্রে সাতগাঁ দর্শন করি। বঙ্গসাগরের উপকূলে ইহা একটি প্রকাণ্ড এবং প্রসিদ্ধ নগর। ইহার নিকটেই গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম। অনেক হিন্দু তথায় তীর্থস্নান করিয়া থাকেন। গঙ্গাবক্ষে বহুতর সজ্জিত সৈন্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেশবাসীরা লক্ষৌতিবাসীদের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। এই সময় বাঙ্গলার সিংহাসনে সুলতান ফকরুদ্দীন অধিরূঢ় ছিলেন। দেশের শাসনভার সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের পুত্র সুলতান নাসিরুদ্দীনের উপর ন্যস্ত ছিল। ইনি আপনার পুত্র মুই-জামুদ্দীনকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপিত করেন। কিন্তু পরে তাঁহারই বিরুদ্ধে সমরসজ্জা করিয়াছিলেন; উত্তরকালে পিতাপুত্রে গঙ্গাতীরে সাক্ষাৎ হইলে সকল বিরোধ মিটিয়া যায়।

"সপ্তগ্রামে এক রৌপ্য দিরামে পঁচিশ রিথল (অর্থাৎ এক মণ তিন পোয়া) চাউল বিক্রয় হইতে দেখিলাম। একটী রৌপ্য দিরাম প্রায় দশ পয়সা; আমাদের দেশের রৌপ্য দিরাম ও বঙ্গদেশের দিনারের মূল্য সমান। আমি নিজে তিন রৌপ্য দিনারে (তিন টাকা বার আনা) একটি পয়স্বিনী গাভী বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি। এখানকার বলদ ঠিক মহিষের

ন্যায় বলশালী। এক দিরামে আটটি করিয়া হাঁস ও মুরগী এবং পনেরটী পায়রা বিক্রয় হইত। একটী মোটা-সোঁটা ভেড়া দুই দিরামে (পাঁচ



সপ্তগ্রামে প্রাকৃতিক পুষ্পসম্পদ

আনায়), এক রিথল শর্করা তিন দিরামে, এক রিথল গোলাপ জল আট দিরামে, এক রিথল ঘৃত (সাত পোয়া), চার দিরামে (দশ আনা) এবং এক রিথল সরিষার তৈল দুই দিরামে কিনিতে পাইয়াছিলাম।

"সূক্ষ্ম কার্পাস সূত্রে প্রস্তুত ত্রিশ হাত লম্বা অতি উত্তম মসলিন বস্ত্র দুই দিরামে আমার চোখের সামনে বিকাইয়াছে। একটী পরমাসুন্দরী ক্রীত-দাসীর মূল্য এক স্বর্ণ দিরাম। আমি ঐ মূল্যে লাসুয়া নাম্নী একটি পরম

রূপলাবণ্যবতী সুন্দরী বালিকা ক্রয় করিয়াছিলাম। আমার একজন সঙ্গী লুলু নাম্নী একটী সুরূপা যুবতীকে দুই স্বর্ণ দিরামে ক্রয় করিয়াছিলেন।

"ফকরউদ্দীন ফকিরদিগকে বড় শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার বিশ্বাসের সুযোগ লইয়া সইদা নামে এক ফকির সাতগাঁর শাসনকর্ত্তা হন। সুলতান বিদ্রোহ দমনের জন্য অন্যত্র গমন করিলে, সইদা তাহার একমাত্র পুত্রকে হত্যা করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সুলতান তাহা অবগত হইয়া সপ্তগ্রামে উপস্থিত হন, সইদা পলায়ন করে, কিন্তু পথিমধ্যে ধৃত ও নিহত হয়। আমি সাতগাঁয়ে পৌছিয়া সেখানকার সুলতানকে দেখিতে পাই নাই—কারণ এই সময়ে তিনি দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। সুলতানের সহিত সাক্ষাতের ভাবী ফলে আশঙ্কিত হইয়া, আমি তাড়তাড়ি সাতগাঁ পরিত্যাগ করিয়া কামরূপ যাত্রা করি।" *

লেঃ কর্ণেল ক্রাফোর্ড লিখিয়াছেন,—

"Satgaon or Saptagram (seven villages) was one of the oldest city of India and the ancient royal port of Bengal. When the Portuguese first began to visit Bengal, about 1530, Satgaon was still a flourishing city." †

শ্রীমদ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সপ্তগ্রামে যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন শত বৎসরেও তাহা বলা যায় না বলিয়া 'চৈতন্য ভাগবতে' উল্লেখ আছে।

"কথো দিন নিত্যানন্দ থাকি খড়দহে।
সপ্তগ্রাম আইলেন গণজন সহে॥
সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্তঋষি স্থান।
জগতে বিদিত সে ত্রিবেণী ঘাট নাম॥

* Sanguinette's Ibn Batoutah, Pages 212—216.

† Bengal Past & Present, Vol. III, 1909.

সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রায়।
গণ সহ সংকীর্ত্তন করেন লীলায় ॥
সপ্তগ্রামে যত কৈল কীর্ত্তন বিহার।
শত বৎসরও তাহা নহে বলিবার ॥
সপ্তগ্রামে প্রতি বণিকের ঘরে।
আপনি শ্রীনিত্যানন্দ কীর্ত্তন বিহরে ॥
পূর্ব্বে যেমন সুখ হৈল নদীয়া নগরে।
সেই মত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম পুরে ॥

বঙ্গে ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে (১৪৭৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দ) সপ্তগ্রামের এলাকায় মালাধর বসু নামক একজন অতিশয় ধার্ম্মিক ধনী ও বিদ্যানুরাগী সুবিখ্যাত কায়স্থ বাস করিতেন। তিনি বহু সুপণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে নিজ বাসগ্রামে আনিয়া বাস করান এবং তাঁহাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য বহু ভূসম্পত্তি দান করেন; তদবধি উক্ত গ্রাম 'কুলীন-গ্রাম' নামে পরিচিত হইয়াছে। পরম বৈষ্ণব মালাধর বসু বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত। কারণ তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের বঙ্গানুবাদ করেন এবং উক্ত গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' নামে খ্যাত। তজ্জন্য হোসেন শাহ তাঁহাকে 'গুণরাজ খাঁ উপাধি দান করেন। তিনি ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে (১৩৯৫ শকে) রচনা আরম্ভ করিয়া ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে (১৪৮০ শকে) সুসম্পন্ন করেন।

১৪৮১ খৃষ্টাব্দে বৈষ্ণব মহাত্মা উদ্ধারণ দত্ত সপ্তগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; শ্রীমদ্ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর তিনি বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভের মন্দিরে নিত্যানন্দ স্বহস্তে একটী মাধবীলতার বৃক্ষ রোপণ করেন; উক্ত মাধবীলতাকুঞ্জ এবং উদ্ধারণ দত্তের প্রতিষ্ঠিত মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহরক্ষা করেন; তাঁহার ফুল-সমাধি

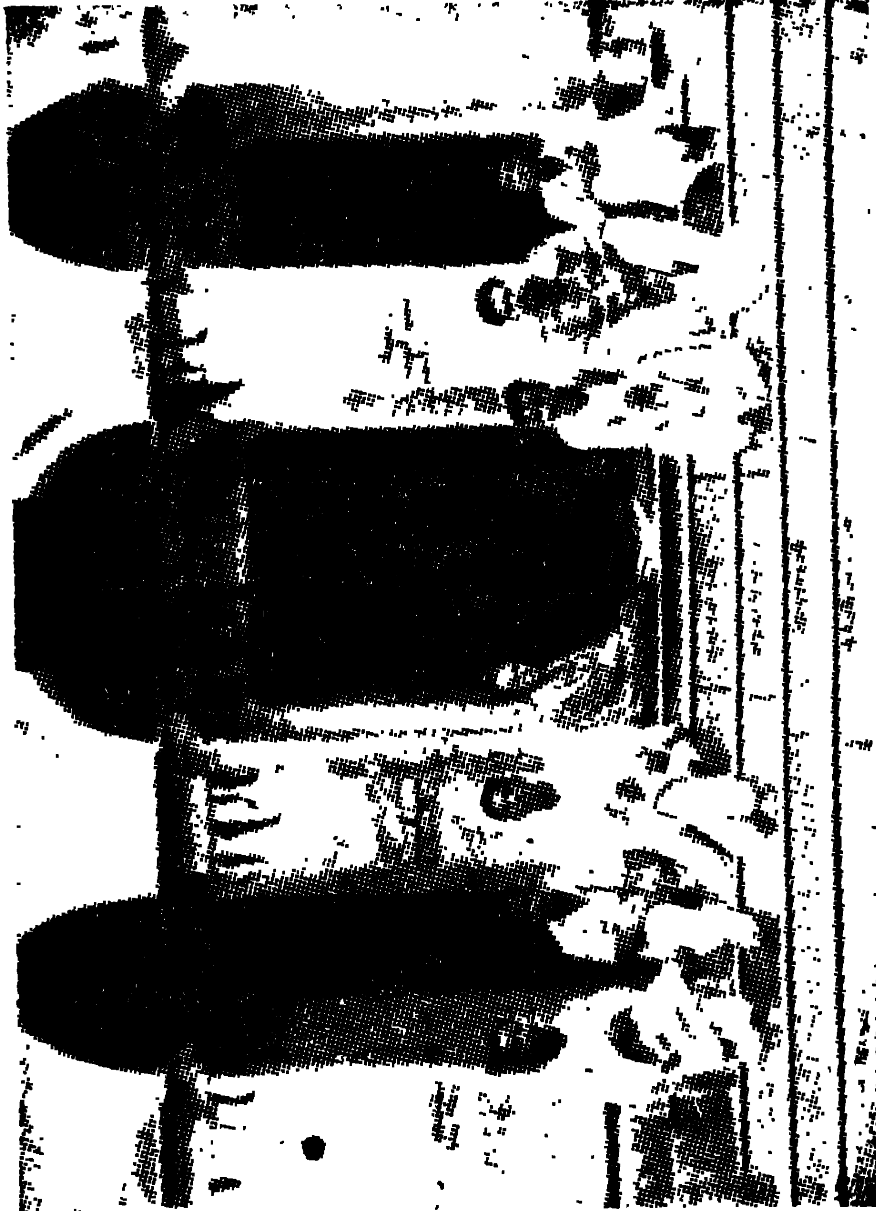
মন্দির প্রাঙ্গণে বিদ্যমান আছে। তাঁহার নামানুসারে উদ্ধারণ দত্তের বাসগ্রাম উদ্ধারণপুর বলিয়া খ্যাত।

হুগলী জেলায় ত্রিশবিঘার (বর্তমান নাম আদি সপ্তগ্রাম রেলওয়ে ষ্টেশন) অনতিদূরে শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত-ঠাকুরের শ্রীপাট; এইস্থানে যে মন্দির স্থাপিত আছে, তাহা সংস্কারের অভাবে জীর্ণ হইয়া পড়ে; দেব-সেবারও তৎকালে বিশেষ কোন বন্দোবস্ত ছিল না।

হুগলী-নিবাসী অবসর-প্রাপ্ত সাবজজ বলরাম মল্লিক মহাশয় প্রথম এই শ্রীপাটের সংস্কার-কার্য্যে অগ্রণী হন। তিনি ১২ই পৌষ ১৩০৬ সালে কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী, চুঁচুড়া প্রভৃতি অঞ্চলের সুবর্ণবণিক্‌গণকে লইয়া একটি সভা আহ্বান করেন। এই সভা হইতেই শ্রীপাট সংস্করণ সমিতি গঠিত হয়। শ্রীপাটের সংস্কার, দেব-সেবার স্থায়ী বন্দোবস্ত ও শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত-ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে বার্ষিক মহোৎসব পালন এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে বলরাম মল্লিক মহাশয়ের নেতৃত্বে সমিতির সদস্যগণ নানা স্থানের সুবর্ণবণিক্‌গণের মধ্যে প্রচার-কার্য্যের ফলে ও দত্ত-ঠাকুরের মাহাত্ম্যে তাঁহার তিরোভাব মহোৎসবের সময় সপ্তগ্রামে বহু সুবর্ণবণিকের সমাগম হইত। সমবেত সুবর্ণবণিক্‌গণকে লইয়া ১৩০৭ সালের ৪ঠা পৌষ একটি সভার অধিবেশন হয় এবং এই সভাকে সুবর্ণ বণিক্ স্বজাতি সম্মিলন নামে অভিহিত করা হয়। সেই বৎসর হইতে প্রতিবৎসর মহোৎসবের সময় শ্রীপাটে এইরূপ 'স্বজাতি সম্মিলন' হইতে থাকে। সম্মিলনীতে কলিকাতা এবং হুগলী, চুঁচুড়া প্রভৃতি নানা স্থান হইতে প্রায় দেড় হাজারের অধিক সুবর্ণবণিক্ যোগদান করিতেন এবং তাহাতে শ্রীপাটের সংস্কার ভিন্ন সুবর্ণবণিক্ জাতির উন্নতিবিধান ও সমাজ-সংস্কারকল্পে বক্তৃতা ও আলোচনা হইত। উত্তরকালে কলিকাতা সহরে বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় যে সমস্ত জাতীয় সভা-সমিতি গঠিত হইতে থাকে তাহার মূল প্রেরণা আসিয়াছিল সপ্ত-

গ্রামের এই স্বজাতি-সম্মিলন হইতে। কলিকাতায় সুবর্ণবণিক্-সমাজ স্থাপনেরও প্রথম অনুপ্রেরণা আসে শ্রীপাট সপ্তগ্রাম হইতে।

শ্রীপাটের দেবসেবা ও অতিথি সংকারের জন্য শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত-



শ্রীমদ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট

ঠাকুরের সপ্তগ্রাম সেবা ফণ্ড স্থাপিত হয়। এই ফণ্ডের ৫ জন ট্রাষ্টী নিযুক্ত হন, ১। প্রসাদদাস বড়াল, হুগলী, ২। কুঞ্জবিহারী সেন,

কলিকাতা, ৩। * অমূল্যধন আঢ্য, কলিকাতা, ৪। হরিচরণ মল্লিক, হাওড়া, ৫। কালীকুমার দত্ত, হুগলী।

অন্যতম ট্রাষ্টী কুঞ্জবিহারী সেন এবং তাঁহার ভ্রাতা রামচন্দ্র সেন এই বার্ষিক মহোৎসবে ও স্বজাতিসম্মিলনীতে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। রামচন্দ্র সেন মহাশয় একজন কবি; তাঁহার রচিত কবিতা গাহিয়া তখনকার দিনে স্বজাতি-সম্মিলনীর উদ্বোধন হইত। রামচন্দ্র সেন মহাশয় যে গান রচনা করিতেন, তাহা কলিকাতা সুরতিবাগান নিবাসী সুবর্ণবণিক্ যুবকবৃন্দ সমবেত কণ্ঠে গাহিত। রামচন্দ্র সেনের একটি গানের কিয়দংশ এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম:

"বণিক্ এখন কেন ঘুমে অচেতন
'উদ্ধারণ'-আশীর্ব্বাদ
পুরাবে মনের সাধ
ওঠ, জাগ, বুক বাঁধ, বহিয়া যায় লগন।" *

সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর এক প্রাচীন স্মৃতিমন্দির কৃষ্ণপুরে আছে; এই স্থানেই তাঁহার রাজবাটী ছিল। সপ্তগ্রামে যাঁহারা স্বর্ণ রৌপাদি আমদানী করিতেন, তাঁহারা সুবর্ণবণিক আখ্যা লাভ করিয়া পুরুষানুক্রমে এই স্থানে একটী সম্প্রদায়ে পরিগণিত হইয়াছিলেন। উক্ত সম্প্রদায় কেবলমাত্র বাণিজ্যব্যবসায়াদি ঐহিক বিষয়েই যে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে, পারত্রিক পরমার্থিক বিষয় চিন্তনেও তাঁহারা অগ্রগামী ছিলেন। প্রসিদ্ধ দানবীর স্বর্গীয় মতিলাল শীল, রাজা রাজেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, রাজা হৃষীকেশ লাহা প্রভৃতি মনীষিগণের পূর্ব্বপুরুষগণ সপ্তগ্রামে ব্যবসায়াদি করিতেন এবং এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন। সুবর্ণবণিকদের সমৃদ্ধি সম্বন্ধে কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে লিখিয়াছেন:

* "সুবর্ণবণিক সমাচার" পত্রে শ্রীগোপীনাথ নন্দীর প্রবন্ধ—কার্ত্তিক, ১৩৫৩

"সপ্তগ্রামের বেনে সব কোথা নাহি যায়।
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়॥
তীর্থ মধ্যে পুণ্যতীর্থ অতি অনুপম।
সপ্তঋষি শাসনে বলয়ে সপ্তগ্রাম॥"

আকবরের রাজত্বের পূর্ব্ব হইতেই সন্দ্বীপের অধিবাসী ফিরিঙ্গীগণ সাতগাঁয়ের প্রায় এক ক্রোশ দূরে বাঙ্গালী রাজার নিকট হইতে কিছু ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া, বাঙ্গালী ধরণের গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহারা ব্যবসায়াদি করিত। প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক হাণ্টার সাহেব এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

"While Bengal was governed by its own princes a number of merchants resorted to Hugli and obtained a piece of ground and permission to build houses in order to carry on commerce to advantage."

১৫৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হয় এবং সেই জন্য সরস্বতী নদী পলি ও বালুকাপূর্ণ হইতে থাকে। জলপথে সরস্বতীর সাহায্যে সপ্তগ্রামে বাণিজ্য করিতে অসুবিধা হইতে লাগিল বলিয়া পর্ত্তুগীজগণ আকবরের নিকট হইতে গঙ্গার ধারে হুগলীতে একটি কুঠী ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হয়। পর্ত্তুগীজগণ হুগলীতে কোন্ বৎসরে আসেন সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে স্যাম্প্রায়ো (Samprayo) নবাবের অনুমতি লইয়া হুগলীতে একটি কুঠী ও দুর্গ নির্ম্মাণ করেন বলিয়া "Hooghly Past & Present" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে। কিন্তু ওম্যালী সাহেব (L. S. Omaly) ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে সুলেমান কররনির রাজত্বকালে হুগলীতে প্রথম পর্ত্তুগীজদের উপনিবেশ স্থাপিত হয় বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

---

* Hooghly District Gazetteer, Page 48.

সিজার ফ্রেডারিক নামক জনৈক ভ্রমণকারী ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রাম ভ্রমণ করিয়া লিখিয়াছেন,—সপ্তগ্রামে বহু বণিক সমবেত ও সমাগত হয়। সপ্তগ্রাম বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র। সপ্তগ্রামের দক্ষিণে ভাগীরথী তটে বেতড় নামক গ্রাম; জোয়ারের সময় বেতড় হইতে নৌকাপথে গমন করিলে অতি অল্পক্ষণেই সপ্তগ্রামে পৌঁছান যায়। প্রতি বৎসর সপ্তগ্রাম বন্দর হইতে ত্রিশ পঁয়ত্রিশখানি বাণিজ্য-তরী চাউল কার্পাসজাত বস্ত্রাদি, লাক্ষা, প্রচুর পরিমাণ চিনি, তৈল (Oil of Zerzeline) এবং আরো বহুবিধ বাণিজ্যদ্রব্য দেশান্তরে রপ্তানি হইত।

প্রতি বৎসর পর্ত্তুগীজগণ বেতড়নামক স্থানে বহু সংখ্যক খড়ের অস্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করিত। যতদিন বেতড়ের নিকটবর্ত্তী সরস্বতী নদীতে বাণিজ্য-পোতসকল ভাসমান থাকিত, ততদিন এই স্থান বহু লোকজনপূর্ণ একটি গণ্ডগ্রামে পরিণত হইত। আবার পর্ত্তুগীজ বণিকগণ যখন জাহাজ লইয়া ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহে চলিয়া যাইত, তখন তাহারা এই সমস্ত গৃহে অগ্নিদান করিয়া দিয়া যাইত। কিছুকাল এইরূপ অস্থায়ীভাবে বাণিজ্য করিবার পর ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে আকবরের ফারমানের বলে পর্ত্তুগীজ-গণ হুগলীতে স্থায়ীভাবে উপনিবেশ স্থাপন করে। পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজগণ কেবল বর্ষাকালে এখানে থাকিয়া ক্রয়-বিক্রয় করিত; বর্ষা শেষ হইলেই তাহারা গোয়া নগরে চলিয়া যাইত।

পর্ত্তুগীজগণ বঙ্গোসাগর দিয়া গঙ্গার মোহনায় প্রবেশ করত হুগলী ও সপ্তগ্রামে যাতায়াত করিত। বঙ্গদেশীয় বণিকগণ স্বদেশী দ্রব্যের বিনিময়ে সিংহল, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ হইতে নানাবিধ মশলা, গন্ধদ্রব্য, মুক্তা, প্রবালাদি আনয়ন করিত। পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণের উৎপাতে এ দেশীয় বণিকগণের বহির্ব্বাণিজ্য এক প্রকার নষ্ট হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত তাহারা সপ্তগ্রাম ও হুগলীর নিরীহ প্রজাবৃন্দের উপর যেরূপ অত্যাচার করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত, লেখনীতে তাহা ব্যক্ত

করিতে পারা যায় না। তাহারা জোর করিয়া দেশীয় লোকদিগকে খৃষ্টান করিত এবং দাসরূপে বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিত। সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা তাহাদের কিছুই করিতে পারিত না। সপ্তগ্রামের ধারে তাহারা উপনিবেশ স্থপন করায় সমস্ত পণ্যবাহী নৌকার নিকট হইতে মাশুল আদায় করিযা লইত। এতদ্ব্যতীত গৃহে অগ্নিদান, নরহত্যা, নারীর সতীত্ব নাশ প্রভৃতি কোন কুকর্ম্ম করিতে তাহারা পরাঙ্মুখ ছিল না। সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা তাহাদের কিছুই করিতে পারিত না, অধিকন্তু ফৌজদার মির্জা নজৎ খাঁ উড়িষ্যা রাজ্যের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, দামোদর নদের পশ্চিম তীরে সেলিমাবাদের নিকট পলাইয়া যান, তিনি পরে পর্তুগীজেদের শরণাপন্ন হইয়া আত্মরক্ষা করেন।

পর্তুগীজগণ ভাগীরথীতে দস্যুবৃত্তি করিত বলিয়া তৎকালে ভাগীরথীর নাম 'দস্যু নদী' (Rogues River) ছিল।

তাহাদের অত্যাচারে নিরীহ প্রজাবৃন্দ 'ত্রাহি ত্রাহি" ডাক ছাড়িত এবং 'মগের মুলুক' নামক ঘৃণিত কথা তাহাদের অত্যাচারের জন্যই বঙ্গভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। র‍্যালফ ফিচ নামক একজন ইংরেজ পরিব্রাজক ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে হুগলী, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থানগুলি দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি ভাগীরথীতে দস্যুবৃত্তির জন্য সোজা পথে না যাইয়া নির্জন স্থান দিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া তাহার পুস্তকে লিখিয়াছেন।

"We went through the wilderness because the right way was full of thieves."

আকবরের সময় সপ্তগ্রাম 'বালঘকখানা' অর্থাৎ 'দস্যু স্থান' বলিয়া পরিচিত ছিল। "In Akbar's time Satgaon was known as 'Balghak Khana' the house of revolt."

---

* Ralph Fitch, Page 113.

যাহা হউক আকবরের সময় সপ্তগ্রাম ও হুগলী ইউরোপীয়দের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল বলিয়া 'আইন-ই-আকবরিতে' লিখিত আছে।

"There are two emporiums a mile distant from each other, one called Satgong and the other Hooghly, with its dependencies, both of which are in the possessions of the Europeans."

আকবরের শাসনকালে ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা হইতে আফগানগণ আসিয়া সপ্তগ্রাম লুণ্ঠন করে এবং সপ্তগ্রামের অনেক প্রাচীন নিদর্শন সেই সময় নষ্ট হইয়া যায়।

সাজাহান ভারত সম্রাট হইয়া প্রজাগণকে পর্তুগাজদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। সাজাহানের আদেশে ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার তৎকালীন শাসনকর্ত্তা কাসিম খাঁ পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং তিন মাস যুদ্ধের পর মোগল সৈন্য হুগলী অধিকার করিয়া পর্তুগীজ বালকবালিকাদিগকে ক্রীতদাসরূপে এবং সুন্দরী যুবতীগণকে বাদশাহের অন্তঃপুরে লইয়া আসে। হুগলী অধিকার করিবার পর সপ্তগ্রাম হইতে যাবতীয় অফিসাদি হুগলীতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এই সময় হইতে হুগলী মোগলদের রাজকীয় বন্দর হয়।

"All the public offices were withdrawn from Satgaon, which soon declined into a mean village, now scarcely known to Europeans." †

পর্তুগীজগণ ভারত হইতে বিতাড়িত হইবার পর ওলন্দাজ বণিকগণ বঙ্গদেশে বাণিজ্য ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। ওলন্দাজগণ চুঁচুড়ায়

* Gladwins "Ayeen Akbari." Page 11

† Steuart's History of Bengal, Prge 235.

একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করে। বাঙ্গালাদেশে বাণিজ্য করিবার জন্য ইংরাজ বণিকগণ ১৬১৭ খৃঃ স্যার টমাস রোর সাহায্যে একবার চেষ্টা করেন; তৎপরে হিউজেস্ ও পার্কার নামক দুইজন ইংরাজ বঙ্গে বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেন; কিন্তু উভয়েই অকৃতকার্য্য হন। অবশেষে ডাঃ বাউটন্ সাজাহানের কন্যাকে এক পীড়া হইতে আরোগ্য করিলে সম্রাট তাঁহাকে পুরস্কার দিতে চান। কিন্তু ডাঃ বাউটন্ পুরস্কারের পরিবর্ত্তে ইংরাজদিগকে বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিবার অনুমতি দিবার সনন্দ চান এবং সম্রাট সাজাহান সেইজন্য অনুমতি দেন। ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বণিকগণ হুগলীতে কুঠী স্থাপন করেন। হুগলীতে বণিক দলের অধ্যক্ষ জব্ চার্ণকের সহিত রাজকর্ম্মচারীদের মনোমালিন্য হয় এবং হুগলীর ফৌজদারের সহিত পরে যুদ্ধ হয়। হুগলীতে ঝগড়া করিয়া বসবাস করা অসুবিধা বুঝিয়া ইংরাজ বণিকগণ আওরঙ্গজেবকে দেড় লক্ষ টাকা পূজা দিয়া সূতানটীতে কুঠী স্থাপন করেন। শোভা সিংহের বিদ্রোহ, ঠগীদের অত্যাচার প্রভৃতির হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সুতানটীর কুঠী দুর্গে পরিণত হইল এবং সপ্তগ্রাম ও হুগলীর কুঠি দুর্গে পরিণত হইল। এবং সপ্তগ্রাম ও হুগলীর ধনী, বিদ্বান সমর্থ ব্যক্তিগণ বাসস্থান ছাড়িয়া ইংরাজদের সুতানটীর দুর্গের নিকটে বসবাস করিতে আরম্ভ কারল।

মুসলমানদের অত্যাচার, পর্তুগীজ জলদস্যুদের উপদ্রব এবং শোভা সিংহ ও রহিম খাঁর বিদ্রোহকালীন অত্যাচার এবং সর্ব্বোপরি মহারাষ্ট্রীয় বর্গীগণের পাশবিক অত্যাচারের জন্যই সপ্তগ্রাম ও হুগলীর আজ এই দুর্দ্দশা। বর্গীগণ যদি শুধু রাজস্ব আদায় করিয়া ক্ষান্ত হইত, তাহা হইলে লোকে দেশ ছাড়িয়া পলাইত না। এইরূপ নির্ম্মম অত্যাচার কাহিনী পৃথিবীর কোন দেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করে নাই। মহারাষ্ট্রীয়-হিন্দুগণের নিকট হইতে যদি বঙ্গীয়হিন্দুগণ্ কিছু সাহায্য ও সহানুভূতি পাইত, তাহা হইলে বাঙলা ও ভারতের ইতিহাস অন্যরূপ

ধারণ করিত, কিন্তু হিন্দুর অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া হিন্দুগণই বিধর্ম্মীর শরণাপন্ন হইয়া জীবন ও নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করিল। ইংরাজ বণিকগণ খাত (Marhatta Ditch) খনন করিয়া কলিকাতায় সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ এবং সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করায় ভাগীরথীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়ের অধিকাংশ নরনারী তাহাদের সবকিছু ফেলিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিল, পশ্চিম বঙ্গ শ্মশানের আকার ধারণ করিল।

বর্গীদের অত্যাচার কিরূপ হইত তাহা 'মহারাষ্ট্র-পুরাণ' হইতে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"ছোট বড় গ্রামে যত লোক ছিল।
বরগীর ভয়ে সকলে পলাইল॥
মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া।
সোনা রূপা লুটে নেয় আর সব ছাড়া॥
কারু হাত কাটে কারু নাক কাণ।
একি চোটে কারুর বধয়ে পরাণ॥
ভাল ভাল স্ত্রীলোক যত ধরিয়া লইয়া যায়ে।
অঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলায়ে॥
এক জনে ছাড়ে তারা আর জনা ধরে।
রমণের ভয়ে নারী ত্রাহি শব্দ করে॥
এই মতে বরগী কত পাপ কর্ম্ম করিয়া।
সেই সব স্ত্রীলোকে যত দেয় সব ছাড়িয়া॥
তবে মাঠে লুটিয়া বরগী গ্রামে সাঁধায়ে।
বড় বড় ঘরে আইল আগুনি লাগায়ে॥
বাঙ্গলা চৌআরি যত বিষ্ণু মণ্ডপ।
ছোট বড় ঘর আছি পোড়াইল সব॥

এই মতে যত সব গ্রাম পোড়াইয়া।
চতুর্দ্দিকে বরগী বেড়ায় লুটিয়া॥
কাহাকে বাঁধে বরগী দিয়া পিট মোড়া।
চিৎ করিয়া মারে লাথি পায়ে জুতা চড়া॥
রূপি দেহ দেহ বোলে বারে বারে।
রূপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে॥
কাহুকে ধরিয়া বরগী পুকুরে ডুবায়ে।
ফাঁফর হইয়া তবে কারু প্রাণ যায়ে॥
এই মতে বরগি কত বিপরীত করে।
টাকা কড়ি না পাইলে তারে প্রাণে মারে॥
যার টাকা কড়ি আছে সেই দেয় বরগীরে।
যার টাকা কড়ি নাই সেই প্রাণে মরে॥"

ব্যবসা-বাণিজ্য সপ্তগ্রাম হইতে স্থানান্তরিত করা হইলেও ইংরাজগণ 'চাকলা-সাতগাঁ' হইতে বাণিজ্যের শুল্ক ও বাজারের ভাড়া বাবদ ১৭২৮ খৃষ্টাব্দেও প্রায় তিন লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে কার্য্য-বিবরণীতে সয়ার (SAYER) খাতে যে টাকা জমা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কথাগুলি লেখা আছে:

"Buksh Bunder or Hooghly—The ground rent of 37 markets and gunges chiefly in the vicinity and dependent on the European settlement in the chuklah of Satgaon together with the customs levied on goods paying that grand emporium of foreign commerce in all Rs. 3,43,708; deduct from which already included under the head of Calcutta Rs. 45,767 making net Rs. 297,941." *

* Fifth Report of the Select Committee of the House of Commons in the affairs of the East India Company, Vol. I. Page 265.

জাফর খাঁ গাজীর দরগার (ত্রিবেণী) উত্তর-পূর্বে ও উত্তর-পশ্চিম দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দর্শকগণ "সীতা বিবাহ," "খরত্রিশিরসোর্বধ", "শ্রীরামেণ রাবণবধঃ", "শ্রীসীতা নির্বাসঃ", "শ্রীরামাভিষেকঃ" প্রভৃতি রামায়ণের ঘটনাবলী ও শিলালিপিতে উহাদের পরিচয় লিখিত আছে দেখিতে পাইবেন। মহাভারতের দৃশ্যাবলীর মধ্যে "ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনয়োযুদ্ধ", "চানুর বধঃ", "কংস বধঃ", "শ্রীকৃষ্ণবানাসুরেয়োযুদ্ধম্" প্রভৃতি চিত্র ও উহাদের পরিচয় অঙ্কিত ও লিখিত আছে।

মুসলমানেরা এই মন্দিরের উপর অংশ বিনষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু নিম্নের অংশ বিনষ্ট না করিয়া তাহারা উহা দরগায় পরিণত করে। এই দরগায় গদাধারী বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীরে ধ্যানস্তিমিত চারিটি সাধুর মূর্ত্তি আছে; এই মূর্ত্তিগুলি বৌদ্ধ মূর্ত্তি। ত্রয়োবিংশ জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্ত্তিও এই দরগায় আছে।

মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে গৌড়, সুবর্ণগ্রাম, সপ্তগ্রাম, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; এই সকল মসজিদ প্রস্তরফলকে শাসনকর্ত্তার নাম, কার্য্যাদি ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিত আছে এবং উক্ত প্রস্তরফলক মসজিদের প্রাচীরে রক্ষিত আছে। সপ্তগ্রামে এইরূপ একটি মসজিদ আছে; এই সম্বন্ধে ব্লকমান সাহেব লিখিয়াছেন যে, এই মসজিদের প্রাচীরগুলি ক্ষুদ্র ইষ্টকে বিরচিত এবং প্রাচীরগুলির ভিতর ও বাহির আরবীয় প্রণালীর কারুকার্য্য সমলঙ্কৃত। মসজিদের অভ্যন্তরে প্রাচীরে একটি "কুলুঙ্গী" আছে, উহা দেখিতে অতি সুদৃশ্য। ইহাও একটি হিন্দু মন্দিরকে রূপান্তরিত করিয়া মসজিদে পরিণত করা হইয়াছিল। এই মসজিদের খিলান ও গম্বুজগুলি দেখিয়া বোধ হয় এইগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বোধ হয় পাঠান রাজত্বের অবসানে এইগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করিলে দুইধারে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের দুইটি পাঁচ ফুট লম্বা গম্বুজ দৃষ্ট হয়, ইহার

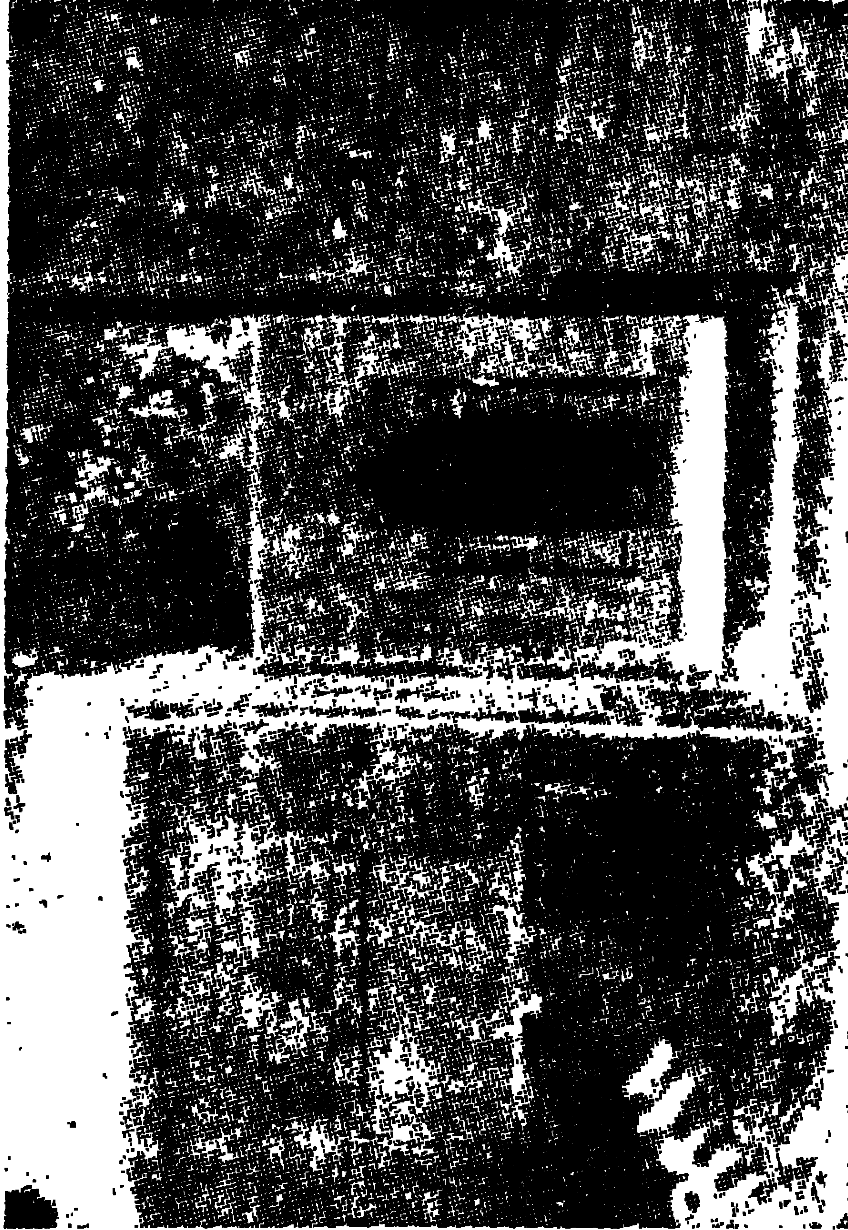
উপরিভাগ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। চিত্রে মধ্যস্থলের একটি "কুলুঙ্গী" এবং প্রবেশপথের দক্ষিণে প্রাচীরে রক্ষিত একখানি শিলালিপি দেখা যাইতেছে। উহা আরব্য অক্ষরে লিখিত, উক্ত শিলালিপির বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের বাণী এই যে, যাঁহারা ঈশ্বরে ও পরলোকে বিশ্বাস রাখেন, ঈশ্বরের প্রার্থনা করেন ঈশ্বর ব্যতীত কাহাকেও ভয় করেন না, যাহারা ঈশ্বরের আদেশে পরিচালিত হন—কেবল তাহারাই মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। যাঁহার গৌরব চতুর্দ্দিকে উদ্ভাসিত হয়, যিনি মুক্তহস্তে সকলের উপকার করেন—তিনিই বলেন, মসজিদ সকল ঈশ্বরের সম্পত্তি এবং আল্লা ব্যতীত কাহারও শরণাগত হইও না। মহম্মদের উক্তি এই যে, যিনি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন—তাহার উপরে তাহার গৃহের উপরে এবং তাহার সঙ্গীদের উপরে ঈশ্বরের কৃপা সংরক্ষিত হয়। যিনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন, তাহার জন্য ঈশ্বর স্বর্গে একটি বাটী নির্ম্মাণ করেন। * * * নসীরউদ্দীন ওয়াদিল আবুল মজফফর মহম্মদ শাহ রাজা; ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য ও শাসন চিরস্থায়ী করুন। তাহার অবস্থার উন্নতি সাধন করুন। তরবিয়ৎ খাঁ খুব উদার ও মহৎ প্রকৃতির লোক, ঈশ্বর তাঁহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করুন। হিজরী ৮৬১।" (খৃষ্টাব্দ ১৪৫৭)।

মসজিদের বহির্দেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে তার দিয়া বেষ্টিত একটি স্থান আছে; এই স্থানে তিনটি সমাধিস্তম্ভ দৃষ্ট হয়। এই তিন স্থানে সৈয়দ ফকরউদ্দীন, তাহার পত্নী এবং একটি খোজার মৃতদেহ সমাহিত করা হইয়াছে। এই স্থানে দুইটি কৃষ্ণবর্ণ শিলাখণ্ডে পারস্য ভাষায় লিখিত লিপি উৎকীর্ণ আছে। কিন্তু এই লিপির সহিত সমাহিত ব্যক্তিগণের কোন সম্বন্ধ নাই। ফকরউদ্দীনের সমাধি স্তম্ভের গাত্র সংলগ্ন প্রস্তরে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে কোথা হইতে এই শিলাখণ্ড সংগ্রহ

করিয়া সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহাই লেখা আছে, কিন্তু লেখাগুলি বড়ই অস্পষ্ট। বর্ত্তমানে মসজিদের খাদিম (মোহান্ত) ফতেমা বিবি, বয়স ৮০ বৎসর এবং তাহার ধর্ম্মপুত্র জব্বর খাঁ মসজিদে বসবাস করে।

ফকরুদ্দীনের সমাধির উপর প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ যে লিপি আছে,



সপ্তগ্রামের খাঁয়া সাহেবের মসজিদ

তাহা এত অস্পষ্ট যে, তাহার পাঠোদ্ধার করিতে পারা যায় নাই। চারিখানি প্রস্তরলিপিমধ্যে দুইখানি সপ্তগ্রামের পূর্ব্বোক্ত মসজিদ

সম্বন্ধীয়। দুইখানিই কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ, তন্মধ্যে একখানি বেশী লম্বা—সেখানি ফকরুদ্দীনের সমাধির দেওয়ালে বক্রভাবে রক্ষিত। লিপিখানি আরবী ভাষায়। তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

১

"পরমেশ্বর বলিয়াছেন, যদি তুমি তাঁহাকে বিশ্বাস কর, তাহা হইলে শুক্রবারে উপাসনা-শব্দ শুনিবামাত্র ত্বরিতপদে ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করিয়া উপাসনায় যোগদান করিতে যাইবে। যদি তুমি তাঁহাকে বিশ্বাস কর, তোমার মঙ্গল হইবে। দ্রব্য অপহরণ করিও না মহপুরুষ (ভগবৎকৃপা তাঁহার উপর অক্ষুণ্ণ থাকুক) বলিয়াছেন—যখন তুমি বাটী হইতে বহির্গত হও, সে দিন যদি শুক্রবার হয় তাহা হইলে তুমি একজন মুহাজির (মহম্মদের প্রস্থানের সঙ্গী), আর যদি তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হও, তুমি উচ্চতম স্বর্গে গমন করিবে। মহাপুরুষ আরও বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়পূর্ব্বক মসজিদ এবং দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করে, সে স্বীয় দুহিতা মাতা এবং ভগ্না-গমনের পাপে পতিত হয়। মস্‌জিদ সকল ভগবানের সম্পত্তি। * * * * * *

(অস্পষ্ট)

তাঁহার মুখজ্যোতি পুনরুত্থানের দিবস পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাত হইবে। (পারস্য ভাষায়) হাসানের বংশধর হাসেন সার পুত্র ন্যায়বান্ এবং আদর্শ সুলতান মোজাফার সুলতান নাস্‌রা সার রাজত্বকালে জুম্মা মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয়। ভগবান তাঁহার রাজত্বের স্থায়িত্ববিধান করুন। ৯৩৬ হিজরী রমজান মাসে (মে, ১৫২৯ খৃঃ) আমুল নগরনিবাসী সৈয়দ-দিগের আশ্রয়রূপ সৈয়দ জালালুদ্দীন হাসেন এই মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। মোল্লা এবং জমীদাররা দেবোত্তর অপহরণ করিয়া নরকের পথ প্রশস্ত করেন। সে জন্য যাহাতে এরূপ না ঘটে, শাসনকর্ত্তা এবং কাজী-

দিগের সে দিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা হইলে পুনরুত্থানের দিবস তাঁহারা এই কুকর্ম্মের সহায়তার জন্ম দণ্ডিত হইবেন না।"

২

অপর প্রস্তর-ফলকখানিতে এইরূপ লিখিত আছে—"পরমেশ্বর বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাঁহাকে এবং অন্তিম দিবসকে বিশ্বাস করে, দৈনিক উপাসনা করে এবং ধর্ম্মানুমোদিত দান-ধ্যান করে এবং পরমেশ্বর ভিন্ন অপর কাহাকেও ভয় করে না, সেই ব্যক্তি ভগবদুদ্দেশে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিবার অধিকারী। যাহারা ভগবৎকৃপায় চালিত কেবল তাহারাই এই সকল কার্য্য করিতে পারে।

মহাপুরুষ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ভগবানের জন্য ইহজগতে একটি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করে, ভগবান তাহার জন্য স্বর্গে ৭০টি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া রাখেন। হাসেনের বংশধর সুলতান হাসেন সার পুত্র ন্যায়বান্ নৃপতি আবুল মোজাফার নৌস্‌রা সাহ সুলতানের রাজত্বকালে টাহাবংশের গৌরব, সৈয়দদিগের আশ্রয়রূপ, আমূল নগরনিবাসী সৈয়দ ফকরুদ্দীনের উপযুক্ত পুত্র সৈয়দ জালালুদ্দীন হাসেন কর্ত্তৃক ৯৩৬ হিজরী শুভ রমজান মাসে (মে, ১৫২৯ খৃঃ) এই জুম্মা মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয়। ভগবান্ তাঁহাকে এবং তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসকে অক্ষুণ্ণ রাখুন।"

অপর দুইখানি প্রস্তরলিপির মধ্যে একখানিতে ৮৬১ হিজরী (১৪৫৭ খৃঃ) মামুদ সাহর রাজত্বকালে তরবিয়ৎ খাঁ কর্ত্তৃক এবং আর একখানিতে ৪ঠা মহরম ৮৯২ হিজরী (১৪৮৭ খৃঃ) ফাত সাহর রাজত্বকালে তাঁহার প্রধান সেনাপতি ও উজীর উলুগ্ মজিলিস নুর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মস্‌জিদ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। মস্‌জিদ দুইটি কোন্ স্থানে ছিল, তাহার উল্লেখ প্রস্তর-ফলকে নাই এবং কি প্রকারে এগুলি ফকরুদ্দীনের সমাধির নিকট স্থান পাইল, তাহাও জানিবার উপায় নাই। এগুলি ভিন্ন সপ্ত-

গ্রামের প্রাচীন নিদর্শন আর কিছু দেখা যায় না। অপর প্রস্তরফলক দুইখানির মর্ম্মানুবাদ নিম্নে উল্লিখিত হইল :

৩

"মহম্মদ বলিয়াছেন, যে তাঁহাকে বিশ্বাস করে এবং অন্তিমকালে বিশ্বাসস্থাপন করে, দৈনন্দিন উপাসনায় যোগদান করে এবং ধর্ম্মানুযায়ী দান করে এবং ভগবান্ ভিন্ন অপর কাহাকেও ভয় করে না, কেবল সেই ব্যক্তিই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিবার উপযুক্ত পাত্র। যাহারা ভগবানের করুণালাভের অধিকারী, তাহারাই এই মহৎ কার্য্য আরব্ধ করিতে সমর্থ। যিনি নিজের গৌরবেই গৌরবান্বিত এবং যাঁহার পর-হিতৈষণা বিশ্বব্যাপী, তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, মসজিদ সকল ভগবানের সম্পত্তি। ভগবান্ ভিন্ন আর কাহারও উপাসনা করিও না। মহাপুরুষ (তাঁহার নামে শান্তি বর্ষিত হউক) বলিয়াছেন, যিনি ইহজগতে ভগবানের উদ্দেশে মসজিদ নির্ম্মাণ করেন, স্বর্গে ভগবান্ তাঁহার জন্য গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়া রাখেন। (এই স্থানে দুইটি ছত্র ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং এত অস্পষ্ট হইয়াছে যে পাঠ করা দুষ্কর)।

যিনি প্রমাণ এবং সাক্ষ্যের দ্বারা বলীয়ান, ইসলামধর্ম্ম এবং মুসলমান-দিগের আশ্রয়স্বরূপ, সুলতান নাসীরুদ্দীন আবুল মোজাফার সাহ, ভগবান্ তাঁহার রাজ্য ও রাজত্ব চিরস্থায়ী করুন এবং তাঁহার পদগৌরব এবং সম্মান বৃদ্ধি করুন। এই মস্‌জিদ সেই মহামহিম মহিমান্বিত তরবিয়ৎ খাঁ উপাধিধারী খাঁ সাহেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ভগবান্ তাঁহার অপার করুণা দ্বারা তাঁহাকে অন্তিম কালের ক্লেশ হইতে রক্ষা করুন।" ৮৬১ হিজরী বর্ষে (১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে) উপরিউক্ত লিপি আরবী ভাষায় একখানি পাতলা কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরফলকে খোদিত এবং জফরুদ্দীনের সমাধিস্তম্ভের-উপরের দেওয়ালে সন্নিবিষ্ট আছে।

৪

'"মহাপুরুষ বলিয়াছেন যে, যাহারা ভগবানে এবং অন্তিমকালে বিশ্বাসী, দৈনন্দিন প্রার্থনা করে এবং দান-ধর্ম্ম প্রতিপালন করে, এবং ঈশ্বর ভিন্ন কাহারও ভয়ে ভীত হয় না— কেবল সেই ভক্ত ঈশ্বরের উদ্দেশে মসজিদ উৎসর্গ করিবার অধিকারী ঈশ্বরের কৃপাভাজনগণই এই সকল সৎকার্য্য করিতে পারে। মহাপুরুষ (তাঁহার নামে শান্তি বর্ষিত হউক) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি ইহজগতে ভগবানের উদ্দেশে মসজিদ নির্ম্মাণ করে, স্বর্গে ভগবান্ তাহার জন্য একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া রাখেন। সুলতান মামুদের পুত্র ন্যায়বান্ এবং সদাশয় নৃপতি জালালুদ্দীন আবুল মোজাফার ফাত সাহ সুলতানের রাজত্বকালে এই মসজিদ নির্ম্মিত হয়। ভগবান্ তাঁহার রাজত্বের স্থায়িত্ব বিধান করুন।

হাদিগড় জিল ও মহলের (পরগণা ?) শাসনকর্ত্তা এবং লাওবলা ও মিরবক থানার অধ্যক্ষ, সাজ্জিলা মানকবাদ এবং সিমলাবাদ নামক সহরের শাসনকর্ত্তা এবং উজীর, আসি এবং লেখনীর অধিপতি উলুগ মজ্‌লিসনুর এই সুবৃহৎ মসজিদের নির্ম্মাণকর্ত্তা। ভগবান্ তাঁহাকে ইহলোকে এবং পরলোকে রক্ষা করুন। তারিখ ৪ঠা মহরম ৮৯২ সাল (১লা জানুয়ারী ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দ।) দাসানুদাস আখন্দ মালিক কর্ত্তৃক লিখিত।"

একখানি লম্বা কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরফলকে আরবী ভাষায় এই লিপি অঙ্কিত ইহাও ফকরুদ্দীনের সমাধিস্থানের উত্তরের দেওয়ালের নিম্নে রক্ষিত।

এখন আমরা এই সংক্রান্ত দুই একটি কথার আলোচনা করিব।

১। জিলা সাজ্জিলা মানকবাদ, ২। জিলা হাদিগড়, ৩। থানা লাওবলা ও মিরবক্, ৪। সহর সিমলাবাদ। এই কয়েকটি স্থান নির্ণয় করা দুরূহ। থানা লাওবলা সম্ভবতঃ লাওপাল্লা। ত্রিবেণীর ৫ ক্রোশ পূর্ব্বে ভাগীরথীর অপর পারে যমুনার নিকট লাওপাল্লা নামক একটি স্থান আছে।

লাওপল্লা এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহের অধিবাসী অধিকাংশই মুসলমান।

প্রস্তরলিপিগুলিতে যে তিন নরপতির নাম আছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে বাঙ্গালার ইতিহাসে কোনও উল্লেখ আছে কি না, দেখা কর্ত্তব্য।

১। নাসিরুদ্দীন আবুল মোজাফার হাসেন সা (৮৬১ হিজরী)

২। মামুদের পুত্র জালালুদ্দীন আবুল মোজাফার ফাত সাহ (৮৯২ হিজরী)

৩। আলাউদ্দীন হাসেন সার পুত্র নাস্‌রা সাহ (৯৩৬ হিজরী)

বঙ্গদেশের ইতিহাসে তৃতীয় মুসলমান নরপতি নাসির সাহের উল্লেখ আছে। তিনি ৮৩০ হইতে ৮৬২ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ নাসিরুদ্দীন আবুল মোজাফার হাসেন সাহ ইতিহাসে নাসির সাহ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। নামের শেষে পদবী ধরিয়াই নৃপতিগণের নামকরণ হওয়াই প্রচলিত পদ্ধতি। ইতিহাসে নাসির সাহের নাম প্রথম হাসেন সাহ দেওয়া উচিত ছিল। ইতিহাসে নাসরা সাহের পিতা জালালউদ্দীন বলিয়া উল্লেখ আছে, বস্তুতঃ তাঁহার নাম দ্বিতীয় হাসেন সাহ দিলে এত গোল হইত না।

বঙ্গদেশের পঞ্চম মুসলমান নরপতি ফাত সাহ নামে অভিহিত হইয়াছেন। মার্সডেন এবং লেডলী বলেন, ফাত সাহ মামুদের পুত্র, সুতরাং বারবাক্ সাহেব ভ্রাতা। মার্সডেন ৮৭৩ হিজরী বারবাক্ সাহেব নামাঙ্কিত একটি মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন বারবাক্ সাহ ৮৬২ হইতে ৮৭৯ হিজরী পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সামসুদ্দীন আবুল মোজাফার যুসুফ সাহ রাজত্ব করেন। গৌড়ের ক্ষোদিত লিপিতে ৮৮০ হইতে ৮৮৫ যুসুফের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হওয়ায়, রাজবংশের সিকন্দর সাহ নামক এক ব্যক্তি সিংহাসন অধিকার করেন।

য়ুসুফ সাহের খুল্লতাত ফাত সাহ সিকন্দরকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। *

সপ্তগ্রাম হইতে স্বর্গীয় নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত কতকগুলি কারুকার্য্য খচিত ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দান করেন; ইষ্টকগুলি পরিষদের প্রত্নশালায় রক্ষিত আছে। নিম্নে তিনখানি ইষ্টকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল:

১। ইষ্টকখানির আকার ৯৩/৪'×৫১/৬" ইষ্টকখানির মধ্যে একটি খিলান এবং তাহার উপর একটি ফুলের কিয়দংশ অঙ্কিত আছে। প্রথম খিলানের দক্ষিণে আর একটি খিলানের অর্দ্ধাংশ আছে; দ্বিতীয় ইষ্টকের বামদিকে এইরূপ অর্দ্ধেক খিলান আছে। দুইটি ইষ্টক একত্রিত করিলে একটি সম্পূর্ণ খিলান হইবে।

"The arch is bounded by the representation of petals of a flower drawn from the artists imagination and surmounted at the apex by a rosette projecting boldly from the background."

২। ইষ্টকখানির আকার ৬১/৬×৮১/২। কাল্পনিক লতাপাতা আলোচ্য ইষ্টকে উৎকীর্ণ আছে। উপরের দিকে চিত্রটি নিচে অপেক্ষা সরু হইয়া গিয়াছে। চিত্রের পরিকল্পনা মধ্যযুগের আরবদেশের ন্যায় বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

"A horizontal frieze and showing a boldly projocting arabesque pattern terminating in arrowheads and containing in the enclosed space the foliage device issuing from a floral base".

৩। ইষ্টকখানির আকার ৬×৫১/২"। প্রথম ইষ্টকখানির ন্যায়

* কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয় লিখিত সপ্তগ্রাম নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ইহার মধ্যে দুইটি খিলানের অর্দ্ধাংশ আছে এবং প্রথম ইষ্টকখানির পার্শ্বে এইখানি স্থাপন করিলে পূর্ব্বোক্ত ইষ্টকখানির খিলানের অর্দ্ধাংশ সম্পূর্ণ খিলানে পরিণত হইবে।

"It shows two halves of a ogee on the two sides with a floral device issuing from a stem in the intervening space." *

স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সপ্তগ্রাম হইতে একটি ভগ্ন প্রস্তরময়ী সরস্বতী মূর্ত্তি সংগ্রহ করেন; মূর্ত্তিটির উচ্চতা প্রায় এক ফুট এবং ত্রিভঙ্গ ঠামে বীণা হস্তে তিনি দণ্ডায়মান আছেন। ইহা বিষ্ণু মূর্ত্তির সহিত ছিল, কিন্তু বিষ্ণু মূর্ত্তিটি পাওয়া যায় নাই। সাহিত্য পরিষদে উক্ত সরস্বতী মূর্ত্তিটি রক্ষিত আছে।

হুগলী জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত আটশখানি বিবিধ চিত্র শোভিত ইষ্টক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রত্নশালায় রক্ষিত আছে। নিম্নে স্বর্গীয় জানকীনাথ গুপ্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত একখানি ইষ্টকের চিত্র-বিবরণ উল্লিখিত হইল :

আলোচ্য ইষ্টকখানিতে রামচন্দ্র বনমালা পরিধান পূর্ব্বক তাঁহার ধনুক হইতে শর নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন এবং রাবণও তাহার দক্ষিণ হস্তের তরবারী দ্বারা রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিতে যাইতেছেন ইহাই চিত্রে উৎকীর্ণ আছে। রামচন্দ্রের দুই ধারে দুইটি বানর আছে এবং তাহারাও রাবণের উদ্দেশ্যে কিছু নিক্ষেপ করিতে যাইতেছেন, এইরূপ মনে হয়। চিত্রে রাক্ষসরাজ রাবণের পশ্চাতেও তাহার এক সঙ্গী আছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইষ্টকখানির আকার লম্বায় ৮½

---

* Handbook to the sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parsihad by Monomohn Ganguly—Pp. 107-108.

ইঞ্চি এবং মধ্য স্থলের উচ্চতা ৫১/২" ইঞ্চি। ইহার বৈশিষ্ট যে, উচ্চতা বাম দিক হইতে ক্রমশঃ নিচের দিকে নামিয়া গিয়াছে।"

The most interesting feature of this piece is that the upper rim of the panneli s inclined and tends to meet the bottom rim at the vanishing point. This is indicative of the artists knowledge of perspective." (Page-125)

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র পাল, সগ্রামে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের পার্শ্বে একটী কূপ আবিষ্কার করিয়াছেন, উক্ত কূপ হইতে বহু প্রাচীন ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে। ইষ্টকগুলি পরীক্ষা করিয়া উহা যে মোগল যুগের, তাহাই ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রামে সরস্বতী নদীর উপর পুল হুগলীর তৎকালীন জজ্ ডেভিড, সি, স্মিথের চেষ্টায় নির্ম্মিত হয়। তিনি হুগলী জেলার উন্নতি কল্পে বিশেষ চেষ্টা করেন এবং ১৮২৭ হইতে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হুগলীর জজ ছিলেন। এই সম্বন্ধে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন তারিখে "সমাচার দর্পণ" পত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:

"লৌহময় সেতু।—পরম্পর শুনা গেল যে জিলা হুগলীর জজ শ্রীযুক্ত স্মিথ সাহেব হুগলী শহরের শোভার সীমা করিয়াছেন অর্থাৎ নানাদিগে রাস্তা করাতে অতি সুদৃশ্য হইয়াছে অপর সরস্বতী নদীর উপর এক পাকা পুল করিয়া দিয়াছেন লোকের গমনা গমণের মহাসুখ হইয়াছে এক্ষণে শুনা যাইতেছে ঐ জজ সাহেব হুগলীর কিঞ্চিৎ পশ্চিম সপ্তগ্রাম নামে যে গ্রাম আছে তাহার নিকট ঐ সরস্বতী নদীতে এক লৌহময় সেতু প্রস্তুত করাইতেছেন ইহাতে লোকেরদিগের কি পর্য্যন্ত উপকার হইবেক তাহা বলা যায় না পরমেশ্বরেচ্ছায় ঐ জেলায় ঐ জজ সাহেব আর কিছুকাল স্থায়ী হইলে তত্রস্থ তাবৎ গ্রামস্থদিগের অধিক মঙ্গল হইবেক

যেহেতুক প্রজাপালক সদ্বিচারক লোকোপকারক এমত সাহেব অল্প দেখা যায় যেহেতুক নিরন্তর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া চাঁদা দ্বারা টাকা সংগ্রহ করত উক্ত কর্ম্মসকল সম্পন্ন করাইতেছেন।"

সম্প্রতি ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধের জন্য ভারী লরি যাতায়াতের সুবিধার্থে স্মিথ সাহেবের চেষ্টায় নির্ম্মিত পুলটি পরিত্যক্ত হইয়াছে ; তদস্থলে 'গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড' ঘুরাইয়া লইয়া একটি মজবুত পুল নির্ম্মিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে ভাগীরথীর প্রধান জলস্রোত সরস্বতী নদী দিয়াই প্রবাহিত হইত। প্রাচীন কালে পশ্চিম বঙ্গ, গৌড়, বিহার, কাশী, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থান হইতে সমুদ্রে গমন করিবার জন্য, সরস্বতী নদীই সহজ ও সরল পথ ছিল। সেইজন্য স্মরণাতীত কাল হইতে এই পথেই সমুদ্রযাত্রা হইত এবং সপ্তগ্রাম মহানগর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দরে পরিণত হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে সরস্বতী তীরে বহু নগর ছিল—শিয়াখালা, জনাই, চণ্ডীতলা, বাক্সা, বেগমপুর, ঝাঁপড়দহ, মাকড়দহ, বেগড়ী, আন্দুল, মৌড়ি প্রভৃতি স্থানগুলির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বিদেশীয় বণিকগণ ভাগীরথী তীরে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে এই গ্রামগুলিই সুবৃহৎ সহর ছিল এবং ধনী ও বিদ্বানের লীলাক্ষেত্র ছিল। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই সরস্বতী নদীর তীরেই সিংহপুর রাজ্য (বর্ত্তমান সিঙ্গুর) বর্ত্তমান ছিল এবং সিংহবংশীয় রাজকুমার বিজয় সিংহ অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া লঙ্কায় উপনীত হন এবং উক্ত স্থান জয় করেন। চণ্ডীভক্ত সুপ্রসিদ্ধ বণিকচাঁদের প্রতিষ্ঠিত চণ্ডীর নামানুসারে চণ্ডীতলা গ্রামের নামকরণ হয়। গঙ্গার প্রবাহ পরিবর্ত্তিত এবং হুগলী বন্দর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ও মুসলমানদের অত্যাচার, মগেদের উপদ্রব এবং বর্গীগণের উৎপীড়ন এই কয়টির মহাসম্মেলনে জগদ্বিখ্যাত মহানগর সপ্তগ্রামের ধ্বংস ও পতন হয়।

এখন আর সরস্বতীর সে বিশাল জলরাশিও নাই, আর তারস্থের

প্রাচীনতম শহর সপ্তগ্রামের সে কোলাহলও নাই; সমস্তই মহাকালের কবলে লুপ্ত হইয়াছে। কালচক্রে সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বহু-সমৃদ্ধিশালী সপ্তগ্রাম নগর এক্ষণে ত্রিশখানি কুঠির লইয়া একটি ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হইয়াছে, আর ক্ষীণতোয়া সরস্বতী সেই অতীত গৌরব কাহিনী গাহিতে গাহিতে অতি ধীরে প্রবাহিত হইতেছে, বোধ হয় ভবিষ্যতে আর ইহার চিহ্নই পাওয়া যাইবে না। যে প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া জগদ্বিখ্যাত ট্রয়, বাবিলন প্রভৃতি সহর এক্ষণে নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, যে সর্ব্বগ্রাসী কালের বশবর্ত্তী হইয়া গৌড়, পাণ্ডুয়া, সিংহপুর, ভূরশুট, মহানাদ প্রভৃতির গৌরব-সূর্য্য অস্তাচলে চিরনিমগ্ন হইয়াছে, সেই অলঙ্ঘনীয় নিয়মের কঠোর হস্ত হইতে সপ্তগ্রাম এবং সরস্বতীও অব্যাহতি লাভে সমর্থ হয় নাই।

* * * * * *

রাঢ় বঙ্গের রাজধানী তুমি, প্রাচীন লক্ষ্মীর সিংহদ্বার,
বিজয়ধ্বজা বহে নাক আজ তব গৌরব-শৃঙ্গ আর।
আজি ইতিহাসে তুমি স্মৃতিসার ক্ষিতিতলে আজ ধংসশেষ,
ধরে না তরণী কেলি-কুতূহলে তোমা লাগি রাজহংস-বেশ।
সিংহল চীন রোম কার্থেজে বহে নাক পোত পণ্যভার,
বিশাল স্বর্ণ-ভাণ্ডার আজি শূন্য হয়েছে অন্নদার।
লুপ্ত তোমার কীর্ত্তি-গরিমা শ্মশান হয়েছে সপ্তগ্রাম,
ছিলে মর্ত্তের বৈজয়ন্ত আজি তুমি অভিশপ্ত ধাম।

সাধু শ্রীমন্ত তব মেখলায় পরায় না মতি-চন্দ্রহার,
ধনপতি চাঁদ আসে না বেচিতে এলা-লবঙ্গ-গন্ধভার।
অভ্রংলিহ হর্ম্ম্য তোমার পণ্য-বীথিকা লুপ্ত আজ,
মুক্তা কিনিতে মালব বণিকে পাঠায় না আজ "গুপ্তরাজ"।

বসে নাক আর ত্রিবেণী ক্ষেত্রে চারুশিল্পের রত্নহাট,
অতলে ডুবেছে শৌর্য্য তোমার পাতালে নিহিত প্রত্নপাঠ।
জ্ঞান বিজ্ঞান কলা বাণিজ্যে পরম পুজ্য সপ্তগ্রাম,
বিস্মৃত আজি কাল-সিন্ধুতে তোমার বিশ্বব্যাপ্ত নাম।

গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মিলন-তীর্থ পুণ্যময়,
বঙ্গ প্রযাগ, তোমার পরশে পাপী পাপলেশ শূন্য হয়।
নিত্যানন্দ নিত্যানন্দে বিলাল এখানে নিত্য ধন,
রঘুনাথ হলো গোরাগত প্রাণ তেয়াগি হর্ম্ম্য বিত্ত জন।
উদ্ধারণের উদ্ধার পীঠ লুটি তব পূত মৃত্তিকায়,
এখনো তাঁহার মাধবা-কুঞ্জ হেথায় মহিমা কীর্ত্তি গায়।
পুণ্যশ্লোকের জননী ধাত্রী, রত্নগর্ভা, সপ্তগ্রাম,
শূন্যে আজিকে বিলীন হয়েছে তোমার পুণ্য দীপ্তিদাম।

দিগ্‌বিজয়িনী চতুষ্পাঠীর নাহি এ শ্মশানে চিহ্ন আর,
সরস্বতীর বালুতে লুপ্ত সরস্বতীর ছিন্ন হার।
আজি গঙ্গার পুত তটে নিখাত হয় না যজ্ঞযূপ
শিবের বদলে শিবা রাজে মঠে, জ্বলে না দেউলে অর্ঘ্য ধুপ।
শোচনীয় আজি তব পরিণাম নিয়তির অনিবার্য্য তার,
লক্ষ্মী গেছেন গোলোকে ফিরিয়া পেচক নিয়েছে রাজ্যভার।
মথুরা কোশল গৌড় গিযাছে তুমিও গিয়েছ সপ্তগ্রাম,
যুগে যুগে হবে রুদ্র এমনি ধ্বংস প্রয়াসে আপ্তকাম। *

* কবিতাটি কবি কালিদাস রায় কর্ত্তৃক লিখিত

শ্রীমদ্ রঘুনাথদাস গোস্বামী

হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রাম বর্ত্তমানে একটী সামান্য স্থান হইলেও প্রাচীনকালে ইহা একটী তীর্থস্থান এবং ভারতের অন্যতম প্রধান নগর ও প্রসিদ্ধ বন্দর বলিয়া পরিচিত ছিল। পূণ্যতোয়া বিশালকায়া সরস্বতী নদী এই নগরের নিম্ন দিয়া কুলু কুলু স্বরে প্রবাহিত হইত এবং বিদেশীয় বাণিজ্যপোতগুলি তখন পৃথিবীর রত্নরাজি এই দেশে বহন করিয়া আনিত। পর্ত্তুগীজ ঐতিহাসিক ডি-বারো (De-Barros) লিখিয়াছেন "বাণিজ্য-তরীর প্রবেশ ও নিষ্ক্রামণ সম্বন্ধে যদিও চট্টগ্রাম অধিকতর সুবিধাজনক, তথাপি সপ্তগ্রাম বন্দর খুব বৃহৎ এবং সপ্তগ্রাম একটি শ্রেষ্ঠ সহর।"

ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট আকবরের রাজস্ব-সচিব টোডরমল্ল রাজস্ব-নির্দ্ধারণ কল্পে বঙ্গদেশকে ১৯ সরকারে এবং ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত করেন। উক্ত সময়ে সপ্তগ্রাম 'সরকার সাতগাঁও' নামে অভিহিত হইত এবং ইহার মধ্যে ৫৩ পরগণা ছিল; কলিকাতা, শালকিয়া, বারাকপুর, নদীয়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি স্থানগুলি সপ্তগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ৪ লক্ষ ১৮ হাজার ১শত টাকা 'সরকার সাতগাঁও' হইতে সম্রাটকে রাজস্ব ও যুদ্ধের সময় পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সৈন্য এবং ছয় হাজার পদাতিক সৈন্য শাসনকর্ত্তাকে দিতে হইত তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। *

বাঙ্গলাদেশের প্রথম সাময়িকপত্র "দিগদর্শন" নামক মাসিক পত্রের পঞ্চম ভাগে 'বাঙ্গলার প্রধান নগর বিষয়' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত আছে "সাতগাঁ হুগলীর উত্তর পশ্চিমে দুই ক্রোশ দূরে। আড়াই শত বৎসর হইল সে বাণিজ্যের কারণ গতায়াত ছিল সে এই শহরে এবং

---

* Gladwin's 'Ayeen Akbari' Page 208.

সেই সময়ে সরস্বতী নদী এমত আয়তা ছিল যে অল্প বোঝাই জাহাজে চলিত।" ভ্রমণকারী ফ্রেডরিক ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রাম পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন "সপ্তগ্রাম বাণিজ্যের একটী প্রধান কেন্দ্র, বাণিজ্যার্থ বণিকগণ বহু দূর দেশ হইতে এই স্থানে সমাগত ও সমবেত হয়। প্রতিবৎসর বন্দর হইতে ত্রিশ পঁয়ত্রিশখানি বাণিজ্যতরী চাউল, কার্পাস-জাত বস্ত্রাদি, লাক্ষা, প্রচুর পরিমাণ চিনি, কাগজ, তৈল এবং আরো বহুবিধ বাণিজ্যদ্রব্য দেশান্তরে রপ্তানি হইত।"



রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ এই স্থানে প্রোথিত ছিল

বহু প্রাচীনকাল হইতে এই স্থান হিন্দুদিগের দ্বারা শাসিত হইয়াছিল। কোন সময়ে কোন রাজা এই স্থানের অধিপতি ছিলেন তাহার পূর্বাপর ইতিহাস না পাওয়া যাইলেও শক্রজিৎ নামক এক রাজা যে এই স্থানে রাজত্ব করিতেন তাহা কবি কৃষ্ণরাম কৃত "ষষ্টিমঙ্গল" গ্রন্থ হইতে

জানিতে পারা যায়। কাল প্রবাহে ভারতের এই প্রচীনতম সহর বর্ত্তমানে লুপ্ত হইয়াছে।

পাঠান রাজত্বকালে দিল্লীর বাদশার অধীন, এক শাসনকর্ত্তার দ্বারা এই স্থান শাসিত হইত, পরে রাজা হিরণ্যদাস মজুমদার ও তদীয় ভ্রাতা গোবর্দ্ধন দাস মজুমদার একত্রে সপ্তগ্রামের শাসন কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হন। ইহারা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ এবং 'মজুমদার' নবাব প্রদত্ত উপাধি ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে, তাঁহারা এই স্থান শাসন করিতেন বলিয়া জানা যায়। এই 'মজুমদার' বংশ ধনে মানে তৎকালে যে প্রধান ছিল তাহারও বহু প্রমাণ আছে। রাজা হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই ভাই সদাচারী, ধাম্মিক ও বদান্যতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। গঙ্গাতীরবর্ত্তী বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহাদের নিকট হইতে বৃত্তি পাইতেন এবং তাঁহাদের প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি দানের বহু নিদর্শন পুরাতন কাগজ পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের সপ্তগ্রাম হইতে বার্ষিক আয় ত্রিশ লক্ষ টাকা ছিল এবং তাঁহারা গৌড়েশ্বরকে বার লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতেন। এই সম্বন্ধে 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে' যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি :

"হেনকালে মুলুকের এক ম্লেচ্ছ অধিকারী
সপ্তগ্রাম মুলুকের সে হয় চৌধুরী ॥
হিরণ্যদাস মুলুক নিল মোকতা করিয়া।
তার অধিকার গেল মরে সে দেখিয়া ॥
বার লক্ষ দেন রাজায় সাধেন ত্রিশ লক্ষ।
সেই তুড়ুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ ॥"

রাজা হিরণ্যদাস নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবর্দ্ধন দাসের ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে একটী পুত্র জন্মিয়াছিল তাহার নাম রঘুনাথ। রাজবংশের একমাত্র পুত্র বলিয়া উভয় ভ্রাতারই এই শিশু

বিশেষ আদরের ছিল। 'রাধাকৃষ্ণ' রাজ বংশের কুলদেবতা ছিল এবং গোবর্দ্ধন মহাসমারোহের সহিত নবজাত পুত্র হওয়ায় বিগ্রহের একটী সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

ইহাদের শাসনকালে পর্ত্তুগীজগণ বাণিজ্য ব্যবসায়ের জন্য বঙ্গদেশে ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম আগমন করেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন যে 'সাজাহান' নামক পারস্য গ্রন্থে লিখিত আছে যে, যখন হুগলী হিন্দুরাজার শাসনাধীনে ছিল তখন ঘরবাড়ী নির্ম্মাণের জন্য জমি খরিদ করিবার অনুমতি একদল বণিক পাইয়াছিলেন। "While Bengal was governed by its own princes a number of merchants restored to Hugli and obtained a piece of ground and permission to build houses in order to carry on commerce to advantage" হাণ্টার সাহেব হুগলীতে যে হিন্দু রাজার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; ঐতিহাসিকগণ উক্ত রাজাকে গোবর্দ্ধন দাস মজুমদার বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন: কারণ ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ প্রথম বঙ্গদেশে আগমন করেন, এবং উক্ত সময়ে গোবর্দ্ধন মজুমদার ব্যতীত আর কেহ হুগলীতে রাজত্ব করিতেন না। রঘুনাথ ঐশ্বর্য্যের ও বিলাসের ক্রোড়ে শশীকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। রাজা হিরণ্য দাস রঘুনাথের সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তৎকালীন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীমদ্ বলদেব আচার্য্যকে নিযুক্ত করেন। বালক অতিশয় মেধাবী ছিলেন; অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। রঘুনাথ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন এবং তাহার শিক্ষাগুরু শ্রীমদ্ বলদেব আচার্য্যও ভগবদ্ভক্ত ছিলেন।

শ্রীমদ্ হরিদাস ঠাকুর ঠিক এই সময়ে ঘটনাচক্রে বলদেব আচার্য্যের গৃহে অতিথি হন। রঘুনাথ হরিদাস ঠাকুরের অসাধারণ ভগবদ্ প্রেম দেখিয়া তন্ময় হইয়া পড়েন এবং তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন।

কিছু দিন পরে, যে দিন শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন তখন সেই সংবাদ বঙ্গের চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইল, এবং রঘুনাথ নারায়ণের অবতারকে সেই সময় দেখিবার জন্ম ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। বলা বাহুল্য পূর্ব্ব হইতেই হরিদাস ঠাকুরের নিকট মহাপ্রভুর নাম শ্রবণ করিয়া অবধি, তাঁহার শ্রীচরণে তিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।



কৃষ্ণপুরে শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাঠ

শ্রীপাদ অদ্বৈতাচার্য্যের আলয়ে যখন মহাপ্রভু পদার্পণ করেন, তাঁহার বাটীতে যাইয়া তিনি সর্ব্বপ্রথম তাহার প্রেমময় মূর্ত্তি অবলোকন করিলেন। এই স্থানে সাত দিন অতিবাহিত করিবার পর, তাঁহার আর ঘর-সংসার ভাল লাগিল না। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন

"রঘুনাথ এখনও তোমার সময় হয় নাই, এখন স্থির হইয়া গৃহে যাও, যখন চঞ্চল হৃদয় যথার্থ স্থির বৈরাগ্যের উপযোগী হইবে তখন স্বয়ং ভগবানই তোমার পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন এবং তোমাকে মুক্তির পথে লইয়া যাইবেন।"

মহাপ্রভুর আদেশে রঘুনাথ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন বটে, কিন্তু তিনি 'রাধাকৃষ্ণের' মন্দিরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্য এরূপ আত্মহারা হইতেন যে তাহার জনক ও জ্যেষ্ঠতাত তাহা দেখিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এই ভাবে একবৎসর কাটিল, তাঁহার পিতামাতা রঘুনাথের সহিত এক সুন্দরী কন্যার বিবাহের স্থির করিলেন। রঘুনাথ তাহা জানিতে পারিয়া একদিন রাত্রে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

"এই মত রঘুনাথের বৎসরেক গেল।
দ্বিতীয় বৎসরে মন পলাইতে কৈল ॥
রাত্রে উঠি একলা চলিল পালাইয়া।
দূরে হইতে পিতা তারে আনিল ধরিয়া ॥"

রঘুনাথ বাড়ী ফিরিয়া সর্ব্বদাই বিভোর হইয়া থাকিতেন, তাঁহার তীব্র অনুরাগ কিছুতেই বাধা মানিতে চাহিল না। জ্যেষ্ঠতাত, পিতামাতা প্রত্যেকেই রঘুনাথের জন্য বিষণ্ণ ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে গৃহাশ্রয়ী করিবার জন্য তাঁহারা যুক্তি করিয়া এক রূপলাবণ্যবতী কন্যার সহিত রঘুনাথের বিবাহ দিলেন।

পার্থিব ভোগবিলাসে রঘুনাথকে আকৃষ্ট করা গেল না, বরং তাঁহার হৃদয়ে দারুণ বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তাঁহার স্নেহময়ী মাতা ও প্রেমময়ী পত্নী কাঁদিতে লাগিলেন, সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। রঘুনাথ পুনঃ পুনঃ পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া, তাঁহাকে বন্ধন করিয়া রাখিবার প্রস্তাব তাঁহার পিতার নিকট করায়, তিনি বলিয়াছিলেন

যে রাজ ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরার মত স্ত্রী যাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে নাই, দড়ির বন্ধন তাঁহাকে কি করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে?

"ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরাসম।
এ সব বান্ধিতে যার নারিলেক মন॥
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে?
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ ঘুচাইতে॥"

রঘুনাথ পানিহাটী গ্রামে শ্রীমদ্ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। তিনি তাঁহার অতুলনীয় ভক্তি উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন যে, রঘুনাথ আমি আজ তোমাকে দণ্ডিত করিব; তুমি আমার শিষ্যগণকে চিঁড়া-দধি ভোজন করাও। রঘুনাথ প্রেমে গদ গদ হইয়া পরমানন্দে মহাপ্রভু এবং তাঁহার শিষ্যবর্গকে চিঁড়া-দধি ভোজন করাইযাছিলেন। আজও পানিহাটী গ্রামে পুণ্যসলিলা জাহ্নবী তীরে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে উক্ত চিঁড়া-দধি মহোৎসবের স্মৃতি স্মরণার্থে বৈষ্ণবগণ 'দণ্ডমহোৎসব লীলা'র অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

"পানিহাটী গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন।
কীর্ত্তনীয়া সেবকগণ সঙ্গে বহুজন॥
কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়।
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয়॥
নিকটে না আইস মোর, ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগি পাইয়াছো, দণ্ডিমু তোমারে॥
দধি চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।
শুনি আনন্দিত হৈল রঘুনাথ মনে॥"

অতঃপর রঘুনাথ প্রতিদিন ষোল ক্রোশ করিয়া পথ অতিক্রম করিয়া দ্বাদশ দিনে পদব্রজে নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সহিত মিলিত হন।

নীলাচলে যাইতে তাঁহাকে হিংস্র জন্তুসমাকুল নিবিড় বন ও প্রান্তর এবং মকর ও নক্র বিশিষ্ঠ নদী সকল সন্তরণ করিয়া যাইতে হইয়াছিল।

নীলাচলে উপস্থিত হইয়া তিনি কয়েক বৎসর শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত বাস করেন। মহাপ্রভু তাঁহার অসাধারণ প্রেমের একাগ্রতা দেখিয়া তাঁহাকে শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করেন। শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামী রঘুনাথকে ভক্তির উপযুক্ত আধার বিবেচনা করিয়া দীক্ষা প্রদান করেন এবং সাধ্য সাধনতত্ত্ব প্রণালী শিক্ষা দেন। রঘুনাথ যে অনন্যসাধারণ কৃচ্ছ্রতা সাধন করিয়া ভক্তির সকল অঙ্গ যাজন মার্গের শীর্ষস্থানে উন্নীত হইয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইয়া যাইতে হয়। তিনি স্নান, আহার ও নিদ্রার জন্য মাত্র তিন ঘণ্টা সময় রাখিয়া, প্রতিদিন একুশ ঘণ্টা হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে বিভোর হইয়া থাকিতেন। রঘুনাথের পিতা তাঁহার জন্য অর্থাদি পাঠাইযাছিলেন কিন্তু তিনি সে অর্থ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, ছত্রে ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিতেন।

"তোমা লাগি রঘুনাথ সব ছাড়ি আইল।
হেথায় তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল॥
তোমার চরণ কৃপা হঞাছে তাহারে।
ছত্রে মাগি খায়, বিষয় স্পর্শ নাহি করে॥"

এই সময় রঘুনাথের শোকে তাঁহার মাতা ও পত্নী লোকান্তরিতা হন। নীলাচল হইতে তিনি কয়েক বৎসর পুরীধামে অতিবাহিত করিয়া মহাপ্রভু প্রদত্ত এক সাক্ষাৎ মোহনমুরলীধারী শিলারূপী মদনমোহন বিগ্রহ লইয়া একবার সপ্তগ্রামে প্রত্যাগমন করেন। সপ্তগ্রামে তাঁহাদের 'রাধাকৃষ্ণের' মন্দিরে, তিনি উক্ত মদনমোহনকে প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। রঘুনাথ আসিয়াছে শুনিয়া দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার

* শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। বৈষ্ণবগণ আসিয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে সপ্তগ্রামকে মাতাইয়া তুলিল। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুও সপ্তগ্রামে আসিয়া রঘুনাথের সঙ্গে যোগ দিলেন; সপ্তগ্রামের দেবালয় বৈকুণ্ঠালয়ে পরিণত হইল।

মহাপ্রভুর পার্ষদগণ যখন বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যান রঘুনাথও সেই সময় বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত পরলোকগমন করেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনে শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড বিদ্যমান আছে; কিন্তু সাড়ে-চার শত বৎসর পূর্ব্বে উক্ত কুণ্ডদ্বয়ের চিহ্ন মাত্র ছিল না। যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে কয়েকটী জলাভূমিকে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড বলিয়া দেখাইয়া দেন। রঘুনাথ সেই স্থানটীকে ভগবৎ আরাধনার উপযুক্ত স্থান ভাবিয়া, তথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁহার মানসিক বলে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হয়। একদিন রঘুনাথের ইচ্ছা হইল যে, কি উপায়ে এই পুণ্য জলাশয় দুইটীকে পূর্ব্বের ন্যায় বিশালকায় করিতে পারা যায়। এইরূপ চিন্তায় কয়েকদিন অতিবাহিত করিতেছেন, এমন সময় বহু ধনরাশি লইয়া এক ব্যক্তি আসিয়া রঘুনাথকে বলিলেন যে, বদরিকাশ্রমের শ্রীশ্রীনারায়ণ জীউর আদেশে তিনি ধনরত্ন লইয়া আসিয়াছেন। তিনি স্বপ্নে বলিয়াছেন যে, শ্রীমদ্ রঘুনাথ গোস্বামীর নিকট যাইয়া এই ধন রত্ন অর্পণ করিয়া বলিও যে, তিনি যেন রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড খনন করিয়া দেন। রঘুনাথ ও তাঁহার শিষ্যগণ পুলকে কাঁদিতে লাগিলেন এবং অচিরে কুণ্ড দুইটী স্বচ্ছ জলাশয়ে পরিণত হইল। এই স্থানে তিনি এরূপ কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন যে, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান এক-প্রকার লোপ পাইল।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমানগণ পুনরায় সপ্তগ্রাম কাড়িয়া লন এবং এই স্থান মুসলমান শাসনকর্ত্তার দ্বারা শাসিত হয়। মুসলমান রাজত্বকালে এই প্রাচীন স্থানের যাবতীয় হিন্দু মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়া

সেই স্থানে মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। আকবরের সময় এই স্থানের অবস্থা এরূপ হইয়াছিল যে, তৎকালীন লেখকগণ এই স্থানকে "দস্যুস্থান" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

মুসলমান রাজত্বে রঘুনাথের বাড়ী ধ্বংস হইল এবং মন্দির অপবিত্র হইবার পূর্ব্বেই মন্দিরের পুজারী-ব্রাহ্মণ 'রাধাকৃষ্ণ' এবং 'মদনমোহনের' বিগ্রহগুলি মন্দিরের পার্শ্বে সরস্বতী নদীর তীরে প্রোথিত করিয়া প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিলেন; রাজবাড়ীর কুল-দেবতার মন্দির ধ্বংস হইল।

সপ্তগ্রামের ভগ্ন মসজিদ সম্বন্ধে ব্লাকম্যান সাহেব লিখিয়াছেন যে, এই মসজিদের প্রাচীরগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকে রচিত এবং প্রাচীরগুলির ভিতর ও বাহির আরবীয় প্রণালীর কারুকার্য্যসমলঙ্কৃত। মসজিদের অভ্যন্তরে প্রাচীরে একটী 'কুলুঙ্গি' আছে। উহা হিন্দু মন্দিরের খিলানের ন্যায়—দেখিতে অতি সুদৃশ্য। বোধ হয় পাঠান রাজত্বের অবসানে এইগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। *

বৃন্দাবনে রঘুনাথ তাঁহার আরাধ্য দেবতার দুর্দ্দশার বিষয় ধ্যানে অবগত হইলেন এবং তাঁহার অন্যতম প্রিয়শিষ্য শ্রীমদ্ কৃষ্ণকিঙ্কর গোস্বামীকে সপ্তগ্রামে প্রেরণ করিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে, সপ্তগ্রামে যাইলেই তিনি যাবতীয় বিষয়ে অবগত হইবেন এবং বিগ্রহগুলিকে পুনরুদ্ধার করিয়া তিনি যেন যথাস্থানে তাঁহাদিগকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। রঘুনাথের কথানুযায়ী তদীয় শিষ্য সপ্তগ্রামে আসিয়া বিগ্রহগুলিকে নদীর তীর হইতে উদ্ধার করিলেন এবং নবাবের নিকট হইতে কিছু জমি লইয়া পূর্ব্বোক্ত স্থানেই খড়ের ঘরে তাঁহাদিগকে পুনঃ

---

* Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part I Vol 39-. 1870.

প্রতিষ্ঠা করিলেন। পরবর্ত্তীকালে স্বর্গীয় দানবীর মতিলাল শীলের পিতামহী বর্ত্তমান গৃহ এবং যে স্থানে বিগ্রহগুলি প্রোথিত ছিল, সেই স্থান ইষ্টক দিয়া বাঁধাইয়া তথায় একটী ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

রঘুনাথ বৃন্দাবনে এরূপ কঠোর সাধনা আরম্ভ করিলেন যে, আহার নিদ্রা তাঁহার একপ্রকার লোপ পাইল। অনন্যসাধারণ কৃচ্ছ্রতা সাধন করিয়া তিনি সাধনার চরম সীমায় উপনীত হইলেন এবং ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দের (১৫০০ শকাব্দ) আশ্বিন মাসের শুক্লা দ্বাদশীর দিন রঘুনাথের অমর আত্মা জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত পুরুষে লীন হইয়া গেলেন। শ্রীমদ্ রঘুনাথ গোস্বামী মুক্তির যে পথ দেখাইয়া গেলেন, তাঁহার শিষ্যগণও সেই পথ অবলম্বন করিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার পরম পবিত্র রাধাকৃষ্ণ লীলাকথাপূর্ণ সুদীর্ঘ জীবনকাহিনী বৈষ্ণবগণের নিত্য আস্বাদনের বস্তু। মহাপ্রভুর পরিকরের মধ্যে ছয়জন গোস্বামী ছিলেন, তন্মধ্যে একমাত্র কায়স্থ রঘুনাথ ব্যতীত সকলেই জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কায়স্থ হইয়াও মহাপ্রভুর কৃপায় এবং নিজ চরিত্রবলে তিনি ব্রাহ্মণসদৃশ সর্ব্ববর্ণের পূজনীয় হইয়াছিলেন।

"শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥
এই ছয় গোস্বামী যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥"

শ্রীমদ্ রঘুনাথ গোস্বামীর নিকট হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গ প্রভুর জীবনের ঘটনাবলী অবগত হইয়াই প্রধানতঃ হিন্দুদিগের অমূল্য গ্রন্থ "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচনা করেন। এই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাকায় উক্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

"রঘুনাথ দাসের সদা প্রভু সঙ্গে স্থিতি।
তাঁর মুখে শুনি-লিখি করিয়া প্রতীতি॥" *

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র প্রতি পরিচ্ছেদের অন্তে নিম্নোক্ত ভনিতাটি দেখিতে পাওয়া যায় :

"শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥" *

তাঁহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, জ্ঞান ও ভক্তির বিষয় উক্ত গ্রন্থের 'অন্ত্যলীলা' মধ্যে অতি মধুর ও লোকপাবনী ভাষায় বর্ণিত আছে। রঘুনাথ যে সমস্ত অমূল্য ভক্তিমূলক ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহার কতিপয় মুদ্রিত হইলেও, এখনও বহু হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি কীটদষ্ট হইতেছে। উক্ত অপ্রকাশিত পুঁথিগুলি প্রকাশ করিলে কেবল যে বঙ্গভাষা সমৃদ্ধ হইবে তাহা নহে, তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার পথ অবলম্বন করিয়া, দেশ-বাসী ধন্য ও কৃতার্থ হইবে এবং ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মূর্ত্ত প্রতীক কায়স্থ কুলোজ্জ্বলকারী রঘুনাথেরও কীর্ত্তিস্তম্ভ সংরক্ষিত হইবে।

সপ্তগ্রামের এই প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের দেবালয় ও রঘুনাথের সাধনক্ষেত্র দেখিয়া আজও ভক্তগণের হৃদয়ে রঘুনাথের দিব্য জ্ঞান ও ভক্তির স্মৃতি জাগ্রত হইয়া উঠে। যে মহাত্মা এই জাতিকে প্রেমময় নামের দ্বারা সমাজের শীর্ষস্থানে উন্নীত করিয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতিবিজড়িত স্থানের দেবালয়টি দর্শন করিলে লজ্জায় মস্তক অবনত হইয়া যায়। আমাদের উদাসীনতায় ও অবহেলায় বিগ্রহের সেবা পর্য্যন্ত প্রতিদিন হয় না এবং দেবালয়টীও বর্ত্তমানে যেরূপ জীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, ইহা ধূলিসাৎ হইতে আর বোধ হয় বিশেষ বিলম্ব নাই।

বর্ত্তমান মন্দিরটী "রঘুনাথ দাসের শ্রীপাট" বলিয়া খ্যাত এবং ইহার

* শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বিগ্রহগুলি ব্যতীত রঘুনাথের অন্যতম শিষ্য কমললোচন গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত "শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ গৌরাঙ্গদেবের" বিগ্রহ আছে। এতদ্ভিন্ন যে প্রস্তরময় বেদীর উপর বসিয়া রঘুনাথ সাধনা করিতেন এবং তাঁহার ব্যবহৃত কাষ্ঠ-পাদুকাদ্বয়ও (খড়ম) যত্নের সহিত মন্দির মধ্যে সংরক্ষিত আছে। ভগবদ্‌ভক্ত স্বর্গীয় মতিলাল শীলের পিতামহী কর্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত হইবার পর, ১৩১৬ সালে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সভ্য স্বর্গীয় অধ্যাপক হেমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের চেষ্টায় এবং রাজর্ষি বনমালী রায়, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, রায়সাহেব রাধাগোবিন্দ রায়, কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ প্রমুখ কয়েকজন ভক্তের অর্থ সাহায্যে, মন্দিরের সামান্য কিছু সংস্কার হইয়াছিল। * পরে ১৩৩০ সালে চুঁচুড়ার সদ্‌গোপবংশীয় শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ নামক জনৈক ভক্ত পুনরায় মন্দিরের কিছু সংস্কার করিয়া দেন। বর্ত্তমান মোহান্তের নাম শ্রীগৌরগোপাল দাস অধিকারী, অর্থাভাবে পঞ্চাশের মন্বন্তরে ঠাকুরের সেবা করা অসম্ভব হইলে, তিনি শ্রীমদ্ রামদাস বাবাজীর নিকট এই বিষয় জ্ঞাপন করেন এবং ১৩৫০ সাল হইতে, তাঁহারই যৎকিঞ্চিৎ অর্থসাহায্যে, আজ বিগ্রহের সেবা হইতেছে।

এই অনাদৃত ও অজ্ঞাত রঘুনাথ গোস্বামীর শ্রীপাটের অনতিদূরে সুবর্ণ-বণিকদিগের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীমদ্ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট বিদ্যমান আছে। ভক্তজাতি সুবর্ণ বণিক বহু অর্থ ব্যয়ে দত্তঠাকুরের শ্রীপাট সুন্দরভাবে সুসংস্কৃত করিয়াছেন এবং প্রতি বৎসর উক্ত স্থানে দত্ত ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি-আরাধনা মহোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকেন। বঙ্গীয় সুবর্ণ-বণিক সমাজ তাঁহাদের এই জাতিয় মহাপুরুষের কীর্ত্তি স্মরণ করতঃ প্রতি বৎসর উক্ত স্থানে সমবেত হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া থাকেন এবং শ্রীপাটের যাবতীয় সংস্কারাদির ভারও তাঁহাদের "সমাজ" গ্রহণ করিয়াছেন।

* কায়স্থ পত্রিকা, ১৩১৬ সাল।

ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি বাঙ্গলার জাতীয়-গৌরব শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ন্যায় কয়জন মহাপুরুষ বাঙ্গলা দেশকে পবিত্র করিয়াছেন? রঘুনাথ প্রবর্ত্তিত পুণ্যসলিলা সরস্বতীর উপকূলে প্রতি বৎসর যে উত্তরায়ণ-মেলার (১লা মাঘ) অনুষ্ঠান আজ সাড়ে চারিশত বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহার সংবাদই বা কয়জন জানেন?

জাতীয় মহাপুরুষদিগের মহিমা বিস্মৃত হওয়া যে, আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। শ্রীভগবানের অংশসম্ভূত রঘুনাথ জীবের প্রতি কৃপা বিতরণের জন্য নরাকারে যে স্থানে এবং যে জাতির মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি বিজড়িত সেই স্থানের রক্ষাকল্পে, যদি আমরা সচেষ্ট না হই— আমাদের অবহেলায় ও উদাসীনতায় যদি কায়স্থকুল উদ্ধারকারী প্রেমময় মহাত্মার নাম এবং কায়স্থ জাতি ও বৈষ্ণব সংস্কৃতির মূর্ত্ত-প্রতীক চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের আর যে কোন আশা নাই, একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

দেবানন্দপুর

হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রাম বর্ত্তমানে একটি নগণ্য স্থান হইলেও ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহা ভারতের অন্যতম প্রধান সহর এবং একটি প্রসিদ্ধ বন্দর বলিয়া খ্যাত ছিল। সুদূর অতীতকালে বাসুদেবপুর, বংশবাটী, খামারপাড়া, কৃষ্ণপুর দেবানন্দপুর, শিবপুর ও ত্রিশবিঘা এই সাতটি স্থানে সপ্তঋষি তপঃ সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া ইহা সপ্তগ্রাম বলিয়া প্রখ্যাত হয় এবং গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গমস্থল বলিয়া ইহা হিন্দুগণের নিকট একটি তীর্থক্ষেত্র বলিয়া যে পরিচিত হয় তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; দেবানন্দপুর সেই সপ্তগ্রামের অন্যতম গ্রাম।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে সপ্তগ্রাম ২৫টি পরগণায় বিভক্ত ছিল এবং হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলাগুলির অংশবিশেষ ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সপ্তগ্রামের বৈভব গৌরব সম্বন্ধে রেভারেণ্ড লং সাহেব লিখিয়াছেন যে, প্লিনীর সময় হইতে পর্ত্তুগীজদের আগমন কাল পর্য্যন্ত এই স্থান রাজকীয় বন্দর ছিল। কালক্রমে এই প্রাচীন স্থান ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও পরবর্ত্তীকালে যাঁহাদের গৌরবে এই দেবানন্দপুর পুনরায় গৌরবান্বিত হইয়াছিল সেই 'মুন্সী' বাবুদের কীর্ত্তি অদ্যাপি তাহার সাক্ষ্য-দান করিতেছে।

দেবানন্দপুরের মুন্সী বাবুদের পূর্ব্বপুরুষ কামদেব দত্ত এই স্থানে আসিয়া প্রথমে বাস করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কল্যাণপ্রসাদ দত্ত, নবাব সরকারে কার্য্য করিয়া দিল্লীতে উচ্চ পদ এবং 'মুন্সী' আখ্যা প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র রামরাম দত্ত-ও রাজকার্য্যে কৃতিত্ব এবং পারস্য ভাষায় অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য, সম্রাট মহম্মদ শাহের নিকট হইতে ১১৩১ সালে বংশানুক্রমে 'মুন্সী' পদবী ব্যবহার করিবার অনুমতি এবং বহু জায়গীর প্রাপ্ত হন। তাঁহার চেষ্টায় এই গ্রামে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষার একটি কেন্দ্রস্থল হয় এবং বাঙ্গলার প্রাচীন শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকর, হুগলী জেলার অন্তঃপাতী ভুরিশ্রেষ্ঠ * বা ভুরশুট পরগণা হইতে বাল্যকালে দেবানন্দপুর গ্রামে রামরাম দত্ত মুন্সী মহাশয়ের বাটীতে অবস্থিতিপূর্ব্বক পারস্যভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন।

১৭১২ খৃষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পিতা রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ভুরিশ্রেষ্ঠ পরগণার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বর্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র † কর্ত্তৃক তিনি হৃতসর্ব্বস্ব হইলে, বালক ভারতচন্দ্র বাটী

* 'ভুরিশ্রেষ্ঠ' নামক প্রবন্ধে উক্ত স্থানের প্রাচীন বিবরণ বর্ণনা করা হইবে।

† Hunter's Statistical Account of Bengal.

হইতে পলায়ন করেন। তিনি যে কবিত্ব রত্নের আকর তাহা পূর্ব্বে কেহ জানিত না। একদিন দেবানন্দপুরে মুন্সী বাবুদের বাড়িতে সত্যনারায়ণ-দেবের সিন্নি উপলক্ষ্যে ভারতচন্দ্র পাঁচালী পাঠ করিবার জন্য আদিষ্ট হন। কিন্তু তিনি অন্যের রচিত পাঁচালী পাঠ না করিয়া, স্বয়ং ত্রিপদী ছন্দে এক নূতন পাঁচালী রচনা করিয়া সভা মধ্যে পাঠ করেন। ইহাই তাঁহার প্রথম কাব্য রচনা; এই পাঁচালী শুনিয়া সভাস্থ নর-নারী ভারতচন্দ্রের অলৌকিক কবিত্বশক্তি দেখিয়া, তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই পাঁচালীর শেষভাগে দেবানন্দপুর গ্রামকে তিনি দেবের আনন্দধাম বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কবি ঈশ্বর গুপ্ত ১২৬১ সালের সংবাদ প্রভাকরে লিখিয়াছেন—"আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা কতিপয় প্রামাণ্য লোকের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইলাম, যৎকালে ঐ পুস্তক প্রচারিত হয়, তৎকালে পুস্তককারকের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসরের অধিক হয় নাই।" নিম্নে উক্ত পাঁচালী হইতে কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল :

ভারতচন্দ্র

দেবানন্দপুর গ্রাম,
দেবের আনন্দ ধাম,
হীরারাম রায়ের বাসনা॥
ভারত ব্রাহ্মণ কয়,
দয়া কর মহাশয়,
নায়েকেরে গোষ্ঠীর সহিত।
ব্রতকথা সাঙ্গ হল,
সবে হরি হরি বল,
দোষ ক্ষম যতেক পণ্ডিত॥

ভারতচন্দ্রের কবিত্বশক্তির বিষয় রামরাম দত্ত মুন্সীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি বিশেষ প্রীত হন এবং ইহার কিছুদিন পরে পুনরায় সত্য-

নারায়ণ দেবের সিন্নি দিবার ব্যাপার উপস্থিত হইলে, রামরাম দত্ত তাঁহাকে পাঁচালী পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। ভারতচন্দ্র তাহার পূর্ব্ব রচিত পাঁচালী পাঠ না করিয়া চৌপদীছন্দে হিন্দী মিশ্রিত আর একটি কবিতা রচনা করিয়া সভাস্থলে পাঠ করেন। ইহার শেষভাগে দেবানন্দপুরের মুন্সীবাবুদের কথা এবং তাঁহার নিজ পরিচয় কিঞ্চিৎ লিখিত আছে। নিম্নে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :

"ভরদ্বাজ অবতংশ, ভূপতি রায়ের বংশ
সদাভাবে হত কংস, ভূরসুটে বসতি।
নরেন্দ্ররায়ের সুত, ভারত ভারতীযুত
ফুলের মুখুটী খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি॥
দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর গ্রাম
তাহে অধিকারী রাম-রামচন্দ্র মুনসী।
ভারতে নরেন্দ্ররায়, দেশে যশ গায়
হয়ে মোরে কৃপাদায়ে, পড়াইল পারসী॥
সবে কৈল অনুমতি, সঙ্ক্ষেপে করিতে পুঁথি
তেমতি করিয়া গতি, না করিও দূষণা।
গোষ্ঠির সহিত তাঁয়, হরি হোন বরদায়
ব্রতকথা সাঙ্গ পায়, সনে রুদ্র চৌগুণা॥"

অতঃপর ভারতচন্দ্র তাঁহার জমিদারী পুনরুদ্ধারকল্পে ভূরিশ্রেষ্ঠ পরগণায় যাইয়া, তথায় বর্দ্ধমান রাজ কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হন। কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া তিনি কটকে মহারাষ্ট্র সুবাদার শিব ভট্টের আশ্রয় লন, পরে বিভিন্ন স্থান গৈরিক বস্ত্রে অজ্ঞাত ও অখ্যাত অবস্থায় পরিভ্রমণ করিয়া গোন্দলপাড়ায় ফরাসী গভর্ণমেণ্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর * আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং এই স্থানের দেওয়ান রামেশ্বর

* "ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য প্রবর্ত্তক, ফাল্গুন ১৩২৮ সাল।

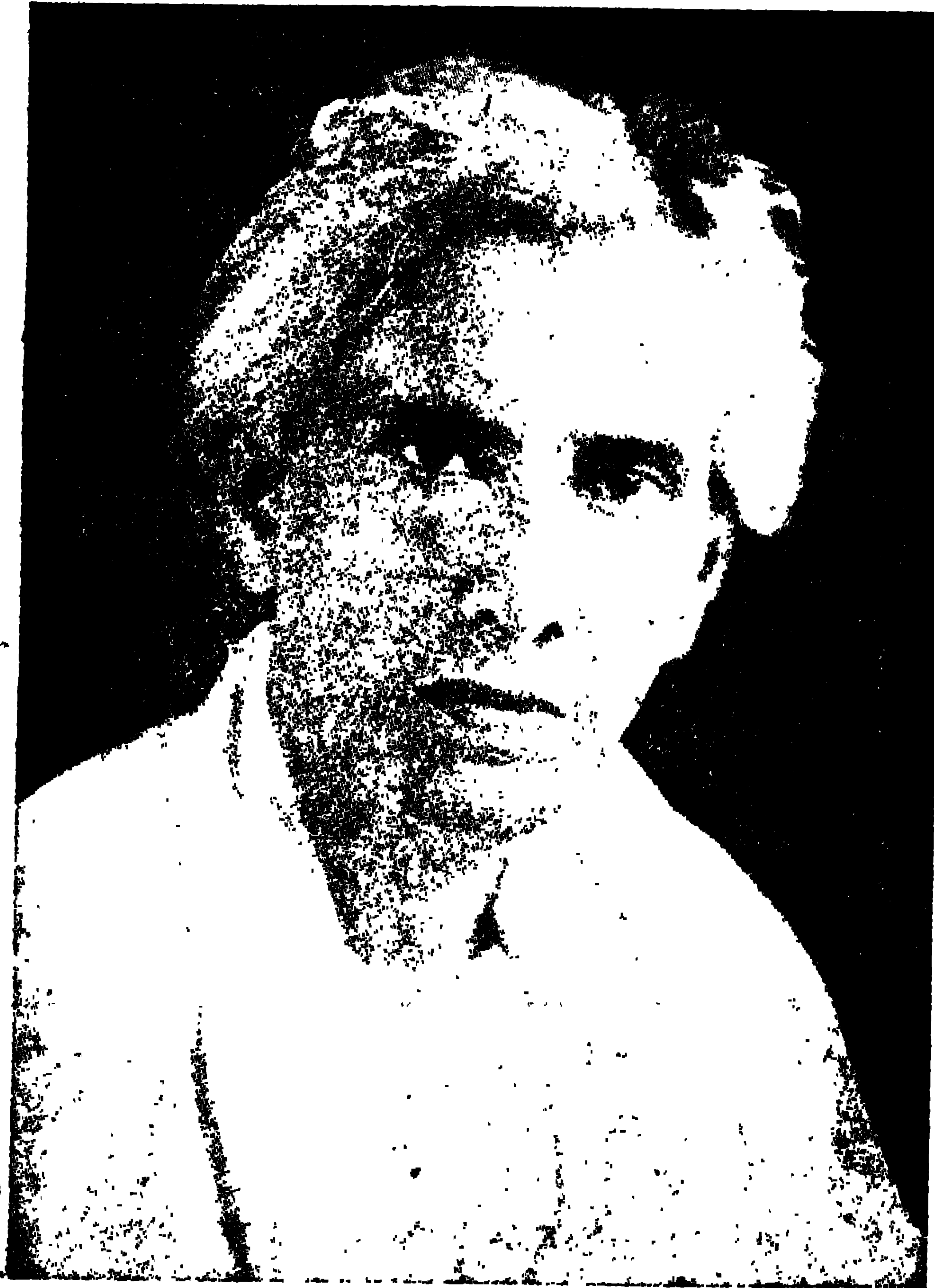
মুখোপাধ্যায়ের গৃহে বাস করিতেন, পরে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বাল্য জীবনের কিছু অংশ উক্ত ভবনে অতিবাহিত করেন। তিনি ভারতচন্দ্রের কবিত্ব দর্শনে প্রীত হইয়া ফরাসীদের গৃহে কাজকর্ম্ম করিলে, তাঁহার প্রকৃত গুণের প্রকাশ পাইবে না বলিয়া, তাঁহাকে কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট পাঠাইয়া দেন।

এই সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব লিখিতেছেন :

"Kirtti Chandra Rai inherited the ancestral Zamindari and added to it the Parganas of Shetwa, Bhursut, Barada and Monohar Sahi. He was bold and adventurous and fought with the Rajas and dispossesed them of their kingdoms."

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রের গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ৪০৲ টাকা বেতনে নিজ সভাসদরূপে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে "গুণাকর" উপাধিতে ভূষিত করেন। এই স্থানে তিনি রাজার অনুমত্যানুসারে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর 'চণ্ডী' কাব্যের ন্যায় 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করিয়া তন্মধ্যে বিদ্যাসুন্দর ও মানসিংহের উপাখ্যান কৌশলে সংযোজিত করিয়া দেন। ইহার পর তিনি 'রসমঞ্জরী' নামক আর একখানি কাব্য রচনা করিয়া ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। দেবানন্দপুর গ্রামে তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থে, তিনি যে স্থানে বাস করিতেন, তথায় শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রমোহন দত্ত একখানি প্রস্তর-ফলকে তাঁহার সহিত দেবানন্দপুর মুন্সীবাবুদের সম্বন্ধের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

পুণ্যশ্লোক রামরাম দত্ত মুন্সীর অন্যতম অধঃস্তন বংশধর রায় শ্যামচন্দ্র দত্ত মুন্সী একজন প্রখ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি "সদর-আলা" অর্থাৎ **Principal Sudder Amin** বলিয়া পরিচিত ছিলেন এবং মধ্য ভারতের রাজনৈতিক প্রতিনিধি (**Political Agent**) পদে



শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

উন্নীত হন। তিনি অত্যন্ত ধাৰ্ম্মিক ছিলেন এবং দেবানন্দপুর গ্রামে দুইটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাপি উক্ত মন্দিরগুলি তাঁহার পুণ্যকীৰ্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

শ্যামচন্দ্রের পৌত্র মোহিনীমোহন দত্ত মুঙ্গেরের সাব্‌জজ ছিলেন; তেজস্বী, সত্যনিষ্ঠ ও সুবিচারক বলিয়া তাহার বিশেষ খ্যাতি ছিল এবং অবসর গ্রহণ করিয়া বহু বৎসর যাবৎ তিনি কলিকাতায় অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে কার্য্য করেন; এতদ্ভিন্ন বিহারের গঠনকৰ্ত্তা গুরুপ্রসাদ সেনের অনুরোধে তিনি "বিহার হেরাল্ড" নামক ইংরাজী পত্র সম্পাদনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র অক্ষয়চন্দ্র তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহার বহু রচনা তৎকালীন বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি সমস্তিপুর হইতে বিদ্যাপতির স্বহস্তলিখিত তালপাতার পুঁথি আবিষ্কার করেন: পরবর্ত্তীকালে উক্ত পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রামের ঈশানচন্দ্র দাস একজন স্বনামখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন; সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে তিনি এলাহাবাদে যান এবং তথায় ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের হিসাব-রক্ষকের কার্য্য করিতেন। প্রবাসে তাঁহার ন্যায় সুনাম অর্জ্জন খুব অল্প ব্যক্তির ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। তাঁহার এরূপ বাঙ্গালী প্রীতি ছিল যে, তিনি এলাহাবাদ স্টেশনে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, যেন কোন নবাগত বাঙ্গালী আসিলে, তাঁহার বাড়িতে প্রথমে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। বাঙ্গালীদের জন্য তাঁহার বাড়ি সর্বসময় উন্মুক্ত থাকিত। অদ্যাপি তাঁহার নামে এই প্রবাদ এলাহাবাদে প্রচলিত আছে—"বাবু তো ঈশান বাবু থে, এ্যায়সা বাবু ঔর নেহি হোগা।"

দেবানন্দপুর গ্রাম বর্ত্তমানে ম্যালেরিয়ায় অধ্যুষিত বলিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায় গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বসবাস করিলেও, বঙ্গের অপরাজেয় কথা-শিল্পী, বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ডক্টর শরৎচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়ের জন্মে এই স্থান পবিত্র হইয়াছে, এই কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। রায়গুণাকর কবি ভারতচন্দ্রের লীলাভূমি হিসাবে এই স্থান বঙ্গবাসীর নিকট পূর্ব্ব হইতে পরিচিত থাকিলেও, বাঙ্গলার জনপ্রিয় সাহিত্যিকের জন্মস্থান বলিয়া, এই ক্ষুদ্র গ্রাম আজ সর্ব্বজনপরিচিত। এই স্থানের চট্টোপাধ্যায় বংশে ১২৮৯ সালের ৩১শে ভাদ্র তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ; তাঁহার পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়।

শরৎচন্দ্র নিজের জীবন-কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা ছিলেন খুব জ্ঞানী ও সাহিত্যানুরাগী ; ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক

শরৎচন্দ্র

কবিতা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের সাহিত্য রচনায় তিনি হাত দিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনটাই তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার রচনা পাঠ করিয়াই শরৎচন্দ্রের গল্প ও উপন্যাস রচনায় প্রথম প্রেরণা আসে। তাঁহার পিতা বিশেষ সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন না বলিয়া, বাল্যকাল তাঁহার বহু বিপত্তির মধ্যে অতিবাহিত হয়। গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ সাঙ্গ করিয়া তিনি ভাগলপুরে তাহার মাতুলালয়ে চলিয়া যান এবং তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তেজনারায়ণ কলেজ প্রবিষ্ট হন। এই সময় হইতেই তিনি সাহিত্যচর্চ্চা আরম্ভ করেন। এই কলেজে তিনি এফ-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় পরীক্ষার পূর্ব্বে, তাহার মাতৃদেবী গতায়ু হওয়ায়, এই স্থানেই তাহার লেখাপড়ার পরিসমাপ্তি ঘটে। অতঃপর তিনি ভাগ্যান্বেষণে বহির্গত হইয়া কলিকাতায় আসেন, কিন্তু এই স্থানে তাহার বিশেষ সুবিধা না হওয়ায়, সকলের অগোচরে তিনি একদিন রেঙ্গুন চলিয়া যান।

রেঙ্গুনে যাইয়া তিনি একটি সওদাগরী অফিসের হিসাব বিভাগে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন এবং এই স্থান হইতেই তাহার সাহিত্যসেবা আরম্ভ হয়। যতদূর জানা যায়, 'কাশীনাথ' শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনা এবং সেই

সময় তাহার বয়স কুড়ি বৎসরের অনধিক ছিল। তাহার পর 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস' প্রভৃতি রচনা প্রকাশিত হয়; বড়দিদি বেনামীতে 'ভারতী' মাসিক পত্রে প্রথম প্রকাশিত হইলে, সাহিত্য-জগতে বেশ সাড়া পড়িয়া যায় এবং এই শক্তিমান লেখকের খোঁজ পড়িতে থাকে। ইহার পর 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি' প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিলেও, তখনও তিনি বঙ্গদেশে আসেন নাই। ১৩২০ সালে তিনি কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধে কলিকাতায় আসিয়া সাহিত্য সেবায় মনোনিবেশ করেন। এই সম্বন্ধে মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি কল্পনাও করিনি যে, সাহিত্য সেবাই একদিন আমার পেশা হয়ে দাঁড়াবে। প্রায় বছর দশেক পূর্ব্বে কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিকের আগ্রহ ও একান্ত চেষ্টার ফলেই আমি সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়ে পড়ি।"

তাহার পর বাঙ্গালী চরিত্রের আলোক-চিত্র স্বরূপ তাঁহার 'শ্রীকান্ত', 'পথের দাবী', 'চরিত্রহীন', প্রভৃতি উপন্যাসগুলি কিভাবে পাঠকসমাজকে চমকিত করিয়া তুলিয়াছিল, সে ইতিকথা আজ কাহারও অবিদিত নাই। সাধারণ বাঙ্গালী চরিত্রের আশা আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম যে ভাবে তাঁহার রচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অনন্যসাধারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মানুষের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে, তাহাকে তিনি আপনার মনের বেদনা ও মাধুরী দিয়া এরূপ ভাবে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন যে, সেইরূপ সৃজনীশক্তি অন্য কোন লেখকের রচনায় সাধারণত দেখা যায় না। সেই জন্য তাহার লেখা পড়িতে পড়িতে পাঠকের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে, মনে হয় যেন আমাদের একান্ত পরিচিত কোন নরনারীর সহিত আমাদের পুনঃ পরিচয় ঘটিয়াছে।

তাঁহার সর্ব্বজন সমাদৃত উপন্যাসগুলি নাটক ও বাণীচিত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি দেশের কাজে আত্মনিয়োগ

করেন; পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সাহিত্যক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্যের জন্য "ডি-লিট" উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন। দেবানন্দপুরে তাঁহার বাস্তু ভিটার প্রতি বিশেষ দরদ ছিল এবং প্রায়ই তিনি জন্মভূমি



গোন্দলপাড়ার এই ভবনে ভারতচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র বাস করেন

দর্শন করিতে যাইতেন। ১৩৪৪ সালের ২রা মাঘ তারিখে তিনি পরলোক-গমন করেন।

দেবানন্দপুরে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা কল্পে একটি স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ১৩৫২ সালের ১৩ই মাঘ, কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক উক্ত মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যে একটি সভাগৃহ, একটি পাঠাগার এবং একটি মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ও শৈলেন্দ্রমোহন দত্ত এই বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন।

তিনি যে গৃহে জন্মগ্রহণ করেন সেই গৃহের বাহিরের দেওয়ালে, হুগলী জেলা বোর্ড "এই গৃহে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন" এই কথাগুলি একটি মর্ম্মর প্রস্তরে লিখিয়া গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন এবং রাস্তার উপর বাটির সম্মুখস্থ ময়দানেও একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া, প্রস্তর ফলকে নিম্নলিখিত কথাগুলি উৎকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন :

"বঙ্গের অপরাজেয় কথা-শিল্পী
প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক
ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
এই ভবনে জন্মগ্রহণ করেন।

জন্ম—৩১ ভাদ্র ১২৮৯
মৃত্যু—২ মাঘ ১৩৪৪।"

কবি নজরুল ইসলাম তাঁহার সম্বন্ধে যে সঙ্গীত রচনা করেন, তাহার কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেবানন্দপুরের উপসংহার করিতেছি :

সেদিনও দেখেছি আকাশের শোভা শরৎচন্দ্র তিলকে।
শূন্য গগন বিষাদ মগন সে তিলক মুছি দিল কে॥
পৃথিবীর চাঁদ অস্ত গিয়াছে, আলো তার প্রতি ভবনে।
তেজ-প্রদীপ্ত তেমনি জ্বলিছে, নিভিবে না তাহা পবনে॥

ত্রিবেণী

বর্ত্তমানে ত্রিবেণী হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি সামান্য স্থান হইলেও সুদূর অতীতকাল হইতে ইহা ভারতের একটি প্রধান বন্দর এবং হিন্দুদিগের নিকট একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্রে বলিয়া পরিচিত ছিল। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই তিনটি নদীর মিলনস্থান বলিয়া ইহা ত্রিবেণী নামে পরিচিত— "ত্রিস্রো বেণ্যঃ বারিপ্রবাহা বিযুক্তা বা যত্র।" এলাহাবাদেও গঙ্গা, যমুনা ও অন্তঃসলিলা সরস্বতী মিলিত হইয়াছে বলিয়া, উক্ত স্থানও ত্রিবেণী বলিয়া অভিহিত; তবে উহাকে 'যুক্তবেণী' বলে এবং এই স্থানে নদী তিনিটি মুক্ত হইয়া বিভিন্ন দিকে চলিয়া গিয়াছে বলিয়া, ইহাকে 'মুক্তবেণী' বলে। প্রাচীন পুরাণাদিতে প্রয়াগই 'ত্রিবেণী' নামে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে :

"ন মাধব সমো দেবো ন চ গঙ্গা সমা নদী।
ন তীর্থরাজসদৃশং ক্ষেত্রমস্তি জগত্রয়ে।"

অর্থাৎ মাধব সদৃশ আর দেবতা নাই, গঙ্গা সদৃশ আর নদী নাই এবং ত্রিজগতে ত্রিবেণী সদৃশ পুণ্যক্ষেত্র আর কোথাও নাই। পণ্ডিত রঘুনন্দনও তাঁহার 'প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বে লিখিয়াছেন :

"দক্ষিণ প্রয়াগ উন্মুক্তবেণী সপ্তগ্রামোখ্যা,
দক্ষিণ দেশে ত্রিবেণীতি খ্যাতঃ।"

দশম শতাব্দীতে কবি দ্বিজ বিপ্রদাস 'মনসামঙ্গল' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে ত্রিবেণীর যে বিবরণ আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

"দেখিয়া ত্রিবেণী গঙ্গা চাঁদরাজা মনে রঙ্গা
কুলেতে চাপায় মধুকর।
আনন্দিত মহারাজ করে নানা তীর্থ কাজ
ভক্তিভরে পূজে মহেশ্বর॥

তীর্থ কার্য্য সমাপিয়া অন্তরে হরিষ হৈয়া
উঠে রাজা ভ্রমিয়া নগর।
ছত্রিশ আশ্রমের লোক সহি কোন দুঃখ শোক
আনন্দে বঞ্চয়ে নিরন্তর॥"



ত্রিবেণীর বেণীমাধব জীউ

বিভিন্ন গ্রন্থকারগণ ত্রিবেণীকে—ত্রিপানি, তারবানি, ত্রিভেণী, তির-পুর্ণী, ত্রিপিনা প্রভৃতি বহু নামে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে রেভারেণ্ড লং সাহেব লিখিয়াছেন—"The Portugese, Ptolemy and the natives now call it Tripina but incorrectly." অর্থাৎ পর্ত্তুগীজগণ, টলেমি এবং দেশীয় ব্যক্তিগণও

* Calcutta Review, 1846, page 408

এই স্থানকে অশুদ্ধ ভাবে ত্রিপিনা বলিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ 'নৌকাযাত্রা' নামক কবিতায় ত্রিবেণীকে "তিরপূর্ণি" বলিয়া একটি পল্লী বালকের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। একটি বালক গঙ্গায় একখানি নৌকা দেখিয়া তাহার মায়ের নিকট বলিতেছে যে, যদি সে ঐ নৌকাখানি পায়, তাহা হইলে সে বহু স্থানে বেড়াইতে যাইবে এবং সন্ধ্যাবেলা ফিরিয়া আসিয়া মায়ের কোলে শুইয়া সেই সমস্ত গল্প তাঁহাকে বলিবে। নিম্নে 'নৌকাযাত্রা' হইতে কয়েক পঙ্ক্তি উদ্ধৃত হইল :

"দুপুরবেলা তুমি পুকুর ঘাটে
　　আমরা তখন নূতন রাজার দেশে।
পেরিয়ে যাব তিরপূর্ণির ঘাটে
পেরিয়ে যাব তেপান্তরের মাঠে
ফিরে আসতে সন্ধ্যে হ'য়ে যাবে
　　গল্প বলব তোমার কোলে এসে।
আমি কেবল যাব একটি বার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।"

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার 'চণ্ডীতে' ত্রিবেণী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

"বামদিকে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।
যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি॥
লক্ষ লক্ষ লোক এক কালে করে স্নান।
বাস হেম তিল ধেনু দ্বিজে দেয় দান॥
গর্ভে বসে শিবপূজা করে কোন জন।
ব্রাহ্মণের সাথে কেহ করয়ে তর্পণ॥
শ্রাদ্ধ করে কোন জন জলের সমীপে।
সন্ধ্যাকালে কোন জন দেয় ধূপ দীপে॥"

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস রচিত 'চৈতন্যভাগবতে'ও ত্রিবেণীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় :

"কথোদিন নিত্যানন্দ থাকি খড়দহে।
সপ্তগ্রামে আইলেন সর্ব্বগণ সহে॥
সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্তঋষি স্থান।
জগতে বিদিত সে ত্রিবেণী ঘাট নাম॥
সেই গঙ্গাঘাটে পূর্ব্বে সপ্তঋষিগণ।
তপ করি পাইলেন গোবিন্দ চরণ॥
তিন দেবীর সেই স্থানে একত্র মিলন।
জাহ্নবী, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গম॥"

'দিগ্বিজয়-প্রকাশ' নামক গ্রন্থের কিলকিলা বিবরণে ত্রিবেণীর বিষয় উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায় :

"অহিপালো মাহেশে চ রাজ্যং ত্যক্ত্বা চ পশ্চিমে।
ত্রিবেণী সন্নিধানে চ চক্রদ্বীপস্য সন্নিধৌ॥
ডমুরদ্বীপ মধ্যে চ বসতিং কৃতবান মুদা। ৬৮১।
পশ্চিমে যোজনান্তে চ সপ্তগ্রামস্য মধ্যতঃ।
নৃপো ভূত্বা বেঘ জাতিং......পপালহ॥ ৬৮৩।"

অর্থাৎ অহিশাল মাহেশ ছাড়িয়া ত্রিবেণীর নিকটে চক্রদ্বীপ ও ডমুরদহের মধ্যে আসিয়া বাস করিতে থাকেন; তিনি কিলকিলার পশ্চিমে যোজনান্তরে সপ্তগ্রাম মধ্যে রাজা হইয়া 'বেঘ' জাতিকে পালন করিতে লাগিলেন।

রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কর্তৃক সম্পাদিত 'শব্দকল্পদ্রুমে' ত্রিবেণীর পরিচয় সূত্রে নিম্নোক্ত কথাগুলি লিখিত আছে :-

"প্রদ্যুম্নস্য হ্রদাৎ যাম্যে সরস্বত্যাস্তথোত্তরে।
তদ্দক্ষিণ প্রয়াগস্ত গঙ্গাতো যমুনাগতা॥"

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ত্রিবেণী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

"মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই তীর্থে—বরদ বঙ্গে ;
বাম হাতে যার কমলার ফুল, ডাহিনে মধুক-মালা,
ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,
কোলভরা যার কনকধান্য, বুকভরা যার স্নেহ,
চরণে পদ্ম, অতসী অপরাজিতায় ভূষিত দেহ,
সাগর যাহার বন্দনা রচে—শত তরঙ্গ ভঙ্গে
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।"

'আইন-ই-আকবরী'র লেখক আবুল ফজল ত্রিবেণীতে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর উল্লেখ করিয়াছেন। ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম হেজ (William Hedges) এবং ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ষ্ট্রাভোরিনাস্ (Stravorinus) ত্রিবেণী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ডু বারো (De-Barros) এবং ব্যালেভ (Balev) তাঁহাদের মানচিত্রে ত্রিবেণীর উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত 'পবন-দূতম্' নামক সংস্কৃত কাব্যে এবং 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনী' প্রভৃতি অনেক প্রাচীন কাব্য গ্রন্থেও ত্রিবেণীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

সপ্তগ্রামের সহিত ত্রিবেণী আঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত; সপ্তগ্রাম ভারতের অন্যতম প্রাচীন শহর ছিল এবং সমুদ্রগামী জাহাজসকল সপ্তগ্রাম যাতায়াত কালে ত্রিবেণীতে নোঙর করিত, তাহা প্রথম শতাব্দীতে প্লীনি লিখিয়া গিয়াছেন, এবং সপ্তগ্রামের মধ্যে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত দ্বিজ বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল' ও পরবর্ত্তী গ্রন্থকারদের গ্রন্থ হইতেও ইহা জানিতে পারা যায়। ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহা একটি বিশিষ্ট বাণিজ্যস্থান ছিল, কিন্তু ১২৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তিত হয় এবং সেই জন্য সরস্বতী নদী পলি ও বালুকাপূর্ণ হইয়া ক্রমশঃ মজিতে আরম্ভ করে। সেইজন্য সরস্বতী তীরে অবস্থিত সপ্তগ্রামের ব্যবসা-বাণিজ্য

বিলুপ্ত হয়। মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভেও ত্রিবেণীর খ্যাতি যে যথেষ্ট ছিল তাহা নিম্নের কয়েক ছত্র হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়।

"Tribeni retained its fame in the early Muslim period and is still one of the most sacred spots of Bengal." *

পশ্চিম বঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য পূর্ব্বে নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, গুপ্তিপাড়া ও ত্রিবেণী এই চারিটি স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল; এই চারিটি স্থানকে তৎকালে চারিটি সমাজ বলিত। ত্রিবেণীতে যে সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ছিল, সেই কেন্দ্রে ত্রিশটির অধিক টোল ছিল। প্রাচীনকাল হইতে এই স্থানে মকরসংক্রান্তি বা উত্তরায়ণ, বিষ্ণু সংক্রান্তি, দশহরা, বারুণী, অর্দ্ধোদয় যোগ, সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ প্রভৃতি উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হইত এবং তদুপলক্ষে মেলা বসিত। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের কোন একটি যোগে একমাত্র উড়িষ্যা হইতেই ত্রিশ হাজার যাত্রী ত্রিবেণীতে সমাগত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে ত্রিবেণী মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে জাফর খাঁ সর্ব্বপ্রথম রাজত্ব করেন। ১২৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত জাফর খাঁ সপ্তগ্রামের অধীশ্বর ছিলেন। জাফর খাঁ বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার উপাদান হইতে পাঁচটি গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ ত্রিবেণীতে নির্ম্মাণ করেন। এই মসজিদের পূর্ব্বদিকে গঙ্গা-তীরে জাফর খাঁ এবং তাঁহার পুত্রগণের সমাধি দৃষ্ট হয়। যে স্থানে তিনি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন, সেই স্থানে পূর্ব্বে একটি মন্দির ছিল। ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বর্ত্তমান মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। মসজিদের মধ্যে আটখানি শিলা-লিপি আছে। উক্ত শিলালিপির পিছনে হিন্দু দেবদেবীর বহু মূর্ত্তি আছে। আরবী ভাষায় লিখিত একখানি শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, জাফর খাঁ

* History of Bengal, By R. C. Mazumdar. Page 33

তুর্কীজাতীয় ছিলেন, বঙ্গের শেষ সুলতান বাহাদুর শাহকে পরাজিত করিবার জন্য ইনি সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলেন। পূর্ব্বে জাফর খাঁ বঙ্গেশ্বরের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন এবং সপ্তগ্রাম অভিযানের পূর্ব্বে ইনি দেওকোট শাসন করিতেন।



বেণীমাধবের মন্দির—ত্রিবেণী

জাফর খাঁ পাণ্ডুয়ার গো-হত্যা ঘটিত যুদ্ধের নায়ক শাহা সুফির পিতৃব্য হইতেন। জাফর খাঁর সহিত ভুদিয়ার রাজার যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে তিনি নিহত হইলে, তাঁহার নির্ম্মিত মসজিদের প্রাঙ্গণে তাঁহাকে সমাহিত করা

হয়। জাফর খাঁর তৃতীয় পুত্র বরখান গাজী ও হুগলীর রাজকন্যার সমাধিও এই স্থানে থাকায় ইহা হিন্দুদিগের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে। মসজিদটি দুইটি প্রাচীরে বেষ্টিত। বাহিরের প্রথম প্রাচীরটি সুবৃহৎ বাসাল্ট (basalt stone) প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া যে পাথরগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহার অসংখ্য প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ-স্বরূপ গঙ্গার ধারে প্রাচীরগাত্রের পাথরগুলিতে বহু হিন্দু দেবদেবীর অঙ্গহীন মূর্ত্তি ও পক্ষবিশিষ্ট সরীসৃপাদির মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাচীরগাত্রে ভূমি হইতে প্রায় আট ফুট ঊর্দ্ধে একটি লৌহদণ্ড প্রোথিত আছে—উহা জাফর খাঁর যুদ্ধাস্ত্রের হাতল ছিল; উক্ত লৌহদণ্ডকে "গাজীর-কুড়ুল" বলিয়া অভিহিত করা হয়। লৌহ-দণ্ডটি নাড়াইলে নড়ে, কিন্তু প্রাচীর হইতে পড়িয়া যায় না বলিয়া প্রবাদ আছে যে "গাজীর কুড়ুল নড়ে-চড়ে পড়ে না।"

জাফর খাঁ

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ষ্ট্রাভোরিনাস ত্রিবেণী পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন:

About an hour before we came to Terbonee, we entered another wood, into which having advanced a little, we met with an ancient building, of large square stones, which seemed as hard as iron; for whatever pains we took, we could not, with a hammer break any pieces off. The building was an oblong square 30 feet in length and 20 in breadth. The walls were 13 or 14 feet in height. It had no roof, and within it were three (?) tombs, four feet above the ground, made of a blackish kind of stone and polished, with here and there some Persian character engraved upon them. About 40 paces further was a large but very ruinous building, the roof of which consisted in fine domes or cupolas which has been adorned with sculptured imagery, but which was much obliterated.

প্রথম বেষ্টনীর মধ্যে কুড়ি ফুট লম্বা ও তের ফুট চওড়া একটি বেদীব উপর চারিটি সমাধি আছে, কিন্তু ষ্ট্রাভোরিনাস তিনটি সমাধির উল্লেখ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ একটি সমাধি তাঁহার পরিদর্শনের সময় জঙ্গলাবৃত ছিল বলিয়া, তিনি দেখিতে পান নাই। এই সমাধিগুলির মধ্যে প্রথমটি জাফর খাঁ গাজীর তৃতীয় পুত্র বর খাঁ গাজীর এবং অন্য দুইটি বর খাঁ গাজীর দুই পুত্র, রহিম খাঁ গাজী এবং করিম খাঁ গাজীর। এই স্থানে একটি স্ত্রীলোকেরও সমাধি আছে কিন্তু উহা যে কাহার সমাধি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না।

দ্বিতীয় বেষ্টনীর মধ্যেও চব্বিশ ফুট লম্বা ও পনর ফুট চওড়া একটি বেদীর উপর জাফর খাঁ গাজী, তাঁহার দুই পুত্র জয়েন খাঁ গাজী ও গায়েন খাঁ গাজী এবং বর খাঁ গাজীর হিন্দু স্ত্রীর (হুগলীর রাজকন্যা) সমাধি আছে। সমাধির উপর আরবী ভাষায় লিখিত একখানি কৃষ্ণবর্ণের শিলালিপি রক্ষিত আছে। উক্ত শিলালিপির পশ্চাতে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। এই শিলালিপিখানি পূর্ব্বে দেওয়ালের সহিত গাঁথা ছিল, বর্ত্তমানে উক্ত দেওয়াল ভূমিসাৎ হইয়া যাওয়ায় বোধ হয় উহা এই সমাধির উপর রক্ষিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই বেষ্টনীর মধ্যে "সীতা বিবাহঃ", "শ্রীরামাভিষেক", "চানুর বধঃ", "কংস বধঃ", প্রভৃতি সংস্কৃত লিপি পাথরে খোদাই করা রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। বহু সংস্কৃত লেখা গাঁথুনি করিবার সময় উল্টাইয়া গাঁথা হইয়াছিল বলিয়া কয়েকটি সংস্কৃত লিপি উল্টা ভাবে আছে।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ ডি, মনি নামক একজন ইংরেজ পরিব্রাজক ত্রিবেণী পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনিও জাফর খাঁ গাজীর দরগায় সংস্কৃত শিলালিপি দেখিতে পান। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, একটি হিন্দু মন্দিরকে "জাফর খাঁ গাজীর দরগা"য় পরিণত করা হয়। দরগার যে অংশ এখনও বর্ত্তমান আছে, সেই অংশ একটু সূক্ষ্ম-

ভাবে পরীক্ষা করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, উহা একটি হিন্দু মন্দিরের অন্তরালভাগ। প্রত্যেক দ্বারের উপরের থিলানে অর্দ্ধ চন্দ্রকারে বহু কারুকার্য্য খোদিত আছে, তন্মধ্যে বহু মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়! দক্ষিণ দিকের দ্বারে মূর্ত্তিগুলি চাঁচিয়া ফেলা হইয়াছে—কিন্তু উত্তর ও পশ্চিম দ্বারের মূর্ত্তিগুলি এথনও সুস্পষ্ট আছে। সমাধি কক্ষে যে সকল সংস্কৃত শিলালিপি আছে তাহা মহাভারত ও রামায়ণের দৃশ্যগুলির পরিচয়জ্ঞাপক বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। দরগার উত্তর পূর্ব্বে ও উত্তর পশ্চিমে দৃষ্টিপাত করিলে দর্শকগণ “সীতা বিবাহঃ” শ্রীরামেণ রাবণ বধঃ”, “থরত্রিশিরর্সোবধ,” “শ্রীরামাভিষেকঃ,” “ভরতাভিষেকঃ” “শ্রীসীতা নির্ব্বাসঃ” প্রভৃতি রামায়ণের ঘটনাবলী অঙ্কিত ও শিলালিপিতে উহাদের পরিচয় লিখিত আছে দেখিতে পাইবেন।

মহাভারতের দৃশ্যাবলীর মধ্যে “ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনয়োর্যুদ্ধম্” “চাণুরবধঃ” “কংসবধ” প্রভৃতি চিত্র ও উহাদের পরিচয় অঙ্কিত ও লিখিত আছে। মুসলমানেরা এই হিন্দু-মন্দিরের উপরিভাগ বিনষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু নিম্নের অংশ বিনষ্ট না করিয়া তাহারা উহা দরগায় পরিণত করে। এই দরগায় গদাধারী বিষ্ণুমূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীরে ধ্যানস্তিমিত চারিটি সাধুর মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তিগুলি বৌদ্ধমূর্ত্তি, ত্রয়োবিংশ জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্ত্তিও এই দরগায় আছে। যে স্থানে রুকনুদ্দিনশাহের শিলালিপি (হিজরী ৮৬০) খোদিত আছে, তাহার সম্মুখদিকে পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। উহার পদদ্বয়ের পশ্চাৎ হইতে শেষনাগ উত্থিত হইয়া ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। উল্লিখিত হিন্দু মূর্ত্তিগুলি সম্ভবতঃ মুসলমানদের নিকট আপত্তিজনক হয় নাই বলিয়া দরগার শোভা বর্দ্ধনের জন্য থাকিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত দরগার সম্মুখে একটি প্রস্তরের উচ্চ মিনার ছিল, মিনারটি বর্ত্তমানে পড়িয়া গেলেও তাহার ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। যে পাথরখানি পড়িয়া আছে,

তাহা দৈর্ঘ্যে আট ফুট, এবং প্রস্থে তিন ফুট ; ইহা ছাড়া একখানি গোল চাকনার ন্যায় পাথর (পরিধি চার ফুট) লম্বা মিনারটির সম্মুখে পড়িয়া আছে। সম্ভবতঃ মিনারটির উপর পূর্ব্বে উক্ত গোল পাথরখানি রক্ষিত ছিল।

ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেবের মত উদ্ধৃত করিয়া ব্লকম্যান সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

The first which lies near the road leading along the bank of the Hughli, is built of large basalt stones, said to have been taken from an old Hindu Temple, which Zafar Khan destroyed. Its east wall, which faces the river shows clear traces of mutilated Hindu idols and dragons and fixed into it, at a height of about six feet from the ground, is a piece of iron said to be the handle of Zafar Khan's battle-axe." *

সম্রাট্ আকবরের শাসনকালে সোলেমান কররাণী বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং মির্জ্জা নজৎ খাঁ সপ্তগ্রামের ফৌজদার ছিলেন। এই সময় বাংলার পাঠানদিগের সহিত মোগল সম্রাট্ আকবরের বিরোধ চলিতেছিল। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে হইতে ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যার স্বাধীন হিন্দু রাজা হরিচরণ মুকুন্দদেব রাজত্ব করিতেন। তিনি আকবরের সহিত সন্ধি করিয়া ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন এবং পাঠানদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য সপ্তগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন এবং পশ্চিম বঙ্গ হইতে পাঠান রাজত্ব কিছুকালের জন্য লুপ্ত হইয়াছিল। বঙ্গবিজয়ের চিহ্নস্বরূপ ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে ত্রিবেণীতে বহু অর্থব্যয়ে গঙ্গার উপর তিনি একটি ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ত্রিবেণীতে রাজা মুকুন্দদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বিস্তৃত ঘাট অদ্যাপি তাঁহার পুণ্যকীর্ত্তির

* *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* 1870, P. 222

সাক্ষ্যদান করিতেছে। এতগুলি সোপানবিশিষ্ট ঘাট কাশী ব্যতীত বঙ্গদেশে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'কালাপাহাড়' নাটকে রাজা মুকুন্দদেবের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন যে, 'হিন্দু রাজ্য-চিহ্নের' জন্য ত্রিবেণীতে এই ঘাট নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। নিম্নে 'কালাপাহাড়' হইতে কয়েক পঙ্‌তি উদ্ধৃত করা হইল :

"তিনশত বর্ষ বঙ্গ বিধর্ম্মীর করে।
দেবতার বরে অর্দ্ধ-বঙ্গ আজি পুন
হিন্দু অধিকারে, হিন্দু রাজ্য চিহ্ন এই
সোপান নির্ম্মাণ। রম্য দেবস্থান শুভ
দিন আজি, তাই কল্পতরু সুরধুনী—
তীরে, আমি উড়িষ্যার স্বামী অর্দ্ধবঙ্গ-
ভূমি অধিকারী আজি হউক প্রচার।"

যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানগুলি পর্য্যটন করিয়া 'তীর্থভ্রমণ' নামক পুস্তক রচনা করেন। উক্ত পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন : "নসরাইয়ে বাজার আছে। পরে ১ ক্রোশ আসিয়া ত্রিবেণীর বাঁধাঘাটে ঝাউতলাতে বাজার। মুক্তবেনী—দক্ষিণমুখে গঙ্গা, পশ্চিমমুখে সরস্বতী, পূর্ব্ব মুখে যমুনা এই স্থানে মুক্ত হইয়াছেন। এখানে স্নান তর্পণ শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়।"

জাফর খাঁ বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়া মসজিদ নির্ম্মাণ করেন তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু গঙ্গার প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল এবং গঙ্গার স্তবমালার মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় সুললিত ছন্দে যে স্তবটি আছে তাহা জাফর খাঁ (ওরফে দরাফ খাঁ) রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। জাফর খাঁর গঙ্গা-ভক্তির কারণ তাঁহার তৃতীয় পুত্র বর খাঁ গাজী হুগলীর রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। উক্ত রাজকন্যার গঙ্গাভক্তির জন্যই জাফর

খাঁ এবং তাঁহার পুত্রগণ গঙ্গাদেবীর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। হুগলীর রাজকন্যা গঙ্গার আরাধনা করিয়া বহু অলৌকিক কার্য্য করেন, তাহা দেখিয়া জাফর খাঁও গঙ্গাদেবীর পূজা করিতেন। তাহার রচিত স্তবের আরম্ভ এইরূপ :

"যৎত্যক্তং জননী-গণৈর্যদপি ন স্পৃষ্টং সুহৃদ্বান্ধবৈ-
যস্মিন পান্থ দিগন্ত সন্নিপতিতে তৈ স্বর্য্যতে শ্রীহরি।
স্বাঙ্কে নস্ত তদীদৃশং বপুরহো সংনীয়তে পৌরুষং
ত্বং তাবৎ করুণাপরায়ণপরা মাতাসু ভাগীরথী।" *

বহু প্রাচীনকাল হইতে ত্রিবেণী হিন্দুদিগের একটি মহাতীর্থ রূপে পরিচিত ছিল, এবং তাহার ফলস্বরূপ কাশী প্রভৃতি প্রাচীন স্থানগুলির



জাফর খাঁ গাজির দরগা—ত্রিবেণী

ন্যায় এই স্থানের যাবতীয় বিধ্বস্ত হিন্দু মন্দিরের উপাদান হইতে বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে একমাত্র বেণীমাধবের মন্দির অবশিষ্ট আছে। ত্রিবেণীর ঘাটের

* এই স্তবটি দরাফ খাঁ সর্ব্বদা পাঠ করিতেন বলিয়া, ইহা তাহার দ্বারা রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও, প্রকৃতপক্ষে ইহা বেদব্যাস রচিত গঙ্গাষ্টক।

অনতিদূরে অবস্থিত এই মন্দির ভগ্ন হইয়া গেলে, ভাস্তাড়ার জমিদার ছকুরাম সিংহ ১১৪৮ বঙ্গাব্দে উক্ত মন্দিরটিকে সংস্কার করিয়া উহার দুই দিকে তিনটি করিয়া আরও ছয়টি শিব-মন্দির নির্ম্মাণ করেন। উক্ত ছয়টি মন্দিরের গাত্রে "শকাব্দ ১৭৬৩—২০শে মাঘ" এই তারিখটি উৎকীর্ণ আছে, সুতরাং ঐ তারিখেই শিবস্থাপনা করা হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়।

ত্রিবেণীতে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি বাস করিতেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রত্যেকের বিষয় বিস্তারিত ভাবে এই গ্রন্থে উল্লেখ করা সম্ভব না হইলেও একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ না বলিলে পুস্তক অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তিনি হইতেছেন পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।

১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ত্রিবেণীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম পণ্ডিত রুদ্রদেব তর্কবাগীশ। তাহার পিতা একজন শাস্ত্রজ্ঞ ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। জগন্নাথ পিতার নিকট হইতে অল্প বয়সেই মুখে মুখে বহু শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি থাকায় শ্রুতিধর বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। বাল্যে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং উক্ত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া 'তর্কপঞ্চানন' উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত তৎকালে বঙ্গদেশে কেহই ছিলেন না বলিয়া বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিত। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য রাজা, মহারাজা ও জমিদারবৃন্দ তাঁহাকে বহু অর্থ ও ভূমি দান করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় হিন্দু আইন প্রণয়নের বিশেষ ভার তিনি লইয়াছিলেন। ইনি 'অষ্টাদশ বিবাদের বিচার গ্রন্থ' এবং 'বিবাদ-ভঙ্গার্ণব' নামক দুইখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ইংরেজ সরকারের নিকট হইতে বহু অর্থ পুরস্কার-স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তৎকালে ইংরেজ বিচারকের পার্শ্বে একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিচার কার্য্য

করিতেন বলিয়া তাঁহাকে লোকে 'জজ-পণ্ডিত' বলিত। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে বহু গল্প প্রচলিত আছে। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে ১১৩ বৎসর বয়সে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

ত্রিবেণী মুকুন্দদেবের ঘাটের উত্তর দিকে সে শ্মশানটি আছে তাহা ত্রিবেণী মহাশ্মশান নামে পরিচিত। এ মহাশ্মশান সম্বন্ধে নানা অলৌকিক ঘটনার কথা লোক পরম্পরায় বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তন্মধ্যে একটি গল্প এইস্থানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। পূর্ব্বে ত্রিবেণীতে বহু চতুষ্পাঠী বা টোল ছিল। ত্রিবেণী সরস্বতী তীরে অবস্থিত বলিয়া তখনকার দিনে অধ্যাপক ও শিষ্যমণ্ডলী গর্ব্ব করিয়া বলিতেন যে, তাঁহারা মা সরস্বতীর ক্রোড়ে বসিয়া আছেন। সরস্বতী পার হইয়া কোনও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের যাইবার যো ছিল না; সরস্বতীকে কেহ কি ডিঙ্গাইয়া পণ্ডিত হইতে পারেন?

তখন বিদ্যা শিক্ষা শেষ হইলে পণ্ডিতেরা দিগ্বিজয় করিতে পারিতেন তিনি "দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত" আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন। ত্রিবেণীতে সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন জন্মিবার বহু পূর্ব্বে সাধক জগন্নাথ নামে এক মহা পণ্ডিত ছিলেন। একবার ভোলানাথ কণ্ঠাভরণ নামে এক পণ্ডিত ত্রিবেণীতে বিচার করিতে আসেন। তিনি সাধক জগন্নাথকে বিচারে আহ্বান করেন। মুকুন্দ দেবের ঘাটের উপর বিচার আরম্ভ হয়। তখন বিচার কালে বহু পণ্ডিতের সমাগম হইত —এ ক্ষেত্রেও হইয়াছিল। দুই দিন দুই রাত্রি ক্রমাগত বিচার চলিল, উভয়ে বিচারে উন্মত্ত, আহার নিদ্রা বন্ধ। ব্রাহ্মণদ্বয় দুই দিন ধরিয়া উপবাসী শুনিয়া বাঁশবেড়িয়ার দেবদ্বিজভক্ত রাজা গোবিন্দদেব রায় মহাশয় বিচারস্থলে আসিয়া একরূপ জোর করিয়া বিচার বন্ধ করিয়া দিলেন ও পণ্ডিতদ্বয়কে স্নান আহার করিতে বাধ্য করিলেন ও পরবর্ত্তী বিচার আহার নিদ্রার অবসরকালে হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

সাধক জগন্নাথ

সাতদিন বিচারের পর অপরাহ্নে জগন্নাথ পরাজিত হইলেন। ভোলানাথ কণ্ঠাভরণ জয়লাভের পর অপর পণ্ডিতগণের অধিক মনঃকষ্ট হইবে ভাবিয়া সরস্বতী পার না হইয়া বর্দ্ধমানাঞ্চলে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল, জগন্নাথ বাটীতে প্রত্যাগমন না করায় তাঁহার ভৃত্য রামদাস চঙ্গ তাঁহাকে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য আসিল। জগন্নাথের পরাজয় সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। জগন্নাথ বিষণ্ণ বদনে ঘাটে বসিয়াছিলেন—পরাজয়ে বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইয়াছিল। তিনি রামদাসকে দেখিয়া বলিলেন যে, তিনি আর গৃহে ফিরিয়া যাইবেন না, সেইখানেই প্রয়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিবেন—আর জনসমাজে তিনি মুখ দেখাইবেন না! তারপর প্রভুভক্ত রামদাসকে শপথ করাইয়া তাহাকে একটি গুরু কার্য্যের ভার দিলেন। রামদাস তাহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত, সে তাঁহার অভিলাষ মত কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল। তাঁহার আদেশে রামদাস গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলে তিনি তাহার কর্ণে মহামন্ত্র প্রদান করিয়া বলিলেন, "দেখ রামদাস, আজ হইতে আমি গুরু ও তুমি শিষ্য। বিচারে হারিবার কারণ আমি গণেশ সিদ্ধ, আর কণ্ঠাভরণ মহাবিদ্যা তারা সিদ্ধ, গনেশ মা অপেক্ষা বড় হইবে কি করিয়া? কাজেই আমার পরাজয় হইল। ইহার প্রতিশোধ না লইলে আমার তৃপ্তি হইবেনা। তুমি জান আমার ব্রাহ্মণীর গর্ভাবস্থা তাহার পুত্র সন্তান হইবে। তুমি সেই পুত্রকে মানুষ করিবে, তাহার উপনয়নের পর, আমি যে মহামন্ত্র তোমায় দিলাম, সেই মহামন্ত্র তাহাকে উপদেশ করিবে। পরে উপযুক্ত সময়ে ত্রিবেণীর এই মহাশ্মশানে ঐ মন্ত্রবলে উত্তর সাধক হইয়া আমার পুত্রকে মহাবিদ্যা কালীসিদ্ধ হইবার জন্য শব সাধনা করাইবে। অমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তোমরা দুই জনেই সিদ্ধ হইবে। আমার আত্মা সতত তোমাদের সঙ্গে থাকিবে। ভগবতীর নিকট বরলাভের পর, কণ্ঠাভরণকে এই ত্রিবেণীর ঘাটে আহ্বান করিয়া আনিবে।

আমার পুত্র বিচার করিয়া যে দিন সেই পণ্ডিতকে পরাস্ত করিবে, সেই দিন আমার আত্মার শান্তি হইবে, তৎপূর্ব্বে নহে।” এই বলিয়া জগন্নাথ রামদাসের কর্ণে কর্ণে আরও কত কি কথা বলিলেন। গভীর রাত্রে ব্রাহ্মণী আসিয়া দেখা করিয়া গেলেন। জগন্নাথ পরদিন প্রাতে সঙ্কল্প করিয়া প্রায়োবেশন আরম্ভ করিলেন। যথাকালে তাহার আত্মা জড় দেহ ত্যাগ করিয়া অনন্ত লোকে চলিয়া গেল।



সরস্বতী নদী—ত্রিবেণী

রামদাস গুরুর আদেশ পালনে যত্নবান হইল। শিশু জন্ম গ্রহণের পর হইতে সে তাহাকে লালন পালন করিতে লাগিল। সে শিশুকে লইয়া এই শ্মশানে খেলা করিত, শিশু বড় হইলে সে শ্মশানে উপুড় হইয়া শুইত; অন্ধকার রজনীতে শিশুকে পৃষ্ঠে বসাইয়া কালীনাম জপ করাইত। সে এইরূপে শিশুর তরুণ হৃদয়ে শ্মশানভীতি স্থান পাইতে দিল না। উপনয়নের পর রামদাস বালককে মহামন্ত্র দিল। তার পর রামদাস বার তিথি নক্ষত্রাদি অনুকূল দেখিয়া এক অমাবস্যা নিশা তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিল। সেদিন উভয়ে উপবাস করিয়াছিল।

সন্ধ্যার পর আকাশ ঘন ঘটায় সমাচ্ছন্ন হইল। প্রবল বেগে বায়ু বহিতে লাগিল। ক্রমে বারিপাত হইতে আরম্ভ হইল। অশনি সম্পাতে দিগদিগন্ত প্রকম্পিত হইতে লাগিল। ঘোরান্ধকারে পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইল। সেই তমিস্রাময়ী ঘোরা রজনীর সূচীভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া রামদাস চণ্ড পূজার দ্রব্যাদি ও বালককে লইয়া শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করিল। যাত্রাকালে আকাশে নীল বিদ্যুৎ চমকাইল, সাধক জগন্নাথের মত একটি ছায়া রামদাসের অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিল। ত্রিবেণীর মহাশ্মশানে উপস্থিত হইয়া, রামদাস শাস্ত্রমত যথাবিধি পূজার ব্যবস্থা করিল। তাহার পর সে উপুড় হইয়া শুইল, বালককে পিঠে বসাইয়া মহামন্ত্র জপ করিতে বলিল ও তাহাকে নানারূপ উপদেশে উৎসাহিত করিয়া, তীক্ষ্ণধার ক্ষুর প্রয়োগে স্বীয় কণ্ঠনালী ছেদন করিয়া ফেলিল। শোণিত ধারায় শ্মশান ভূমি রঞ্জিত হইল। রামদাস তখন শব—চণ্ডালের শব। বালক একাগ্রচিত্তে মহামন্ত্র জপ করিতে লাগিল। রামদাসের শব দুলিতে লাগিল বালককে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল—বালক দৃঢ় হইয়া বসিল। তারপর সর্প, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, ভূত, প্রেত, পিশাচ, ডাকিনী, বটুক ভৈরব, যোগিনী প্রভৃতি দেখা দিয়া বালকের ভীতি উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

'বিভীষিকা সে কি মানে, বসে থাকে বীরাসনে
কালীর চরণ করে ঢাল।"

শূন্য হইতে স্তূপাকার রমণীর কেশরাশি পতিত হইল! কোথা হইতে পর্যুষিত শব মাংস পতিত হইল, দুর্গন্ধে বালককে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। বালককে মাতৃরূপ ধারণ করিয়া কে যেন তাহাকে জপ করিতে নিষেধ করিল, বাড়ী ফিরিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল, বালক রামদাসের উপদেশ মত সে দিকে দৃক্‌পাতও করিল না; কঠোর সাধনায় নিযুক্ত রহিল। ক্রমে রজনী তৃতীয় প্রহর অতীত হইল; শুকতারা উঠিবার সময় হইয়া আসিল। সহসা পূর্ব্বদিক অরুণোদয়ের মত উজ্জ্বল,

মৃদুমন্দ মলয় পবন বহিতে লাগিল। প্রকৃতি দেবী বসন্ত সমাগমের মত রূপ ধারণ করিলেন। দূরে পিক ধ্বনি ও নিকটে ভ্রমর গুঞ্জন শ্রুত হইতে লাগিল। বালক দেখিতে পাইল পূর্ব্বাকাশে একখানি গাঢ় নীল কাদম্বিনী প্রকাশিত হইল। সহসা কাদম্বিনীর মধ্যস্থল হইতে কোটী সূর্য্য সমুজ্জল অথচ কোটী চন্দ্র সুশীতল অপরূপ মনোরম জ্যোতিঃ সাগরে ভাসমানা মহা-কালী মূর্ত্তি ধীরে ধীরে প্রকটিত হইল। বালক তখন দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত



ইতিহাস প্রসিদ্ধ ত্রিবেণীর ঘাট

হইয়াছে, চৈতন্য দেহ লাভ করিয়াছে। সে উঠিয়া মায়ের পদতলে গড়াগড়ি দিল। বালকের আনন্দাতিশয্যে কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল। জগজ্জননী তখন বালককে বর লইবার জন্য আদেশ করিলেন। বালক তাহার রাম দাদাকে বর দিবার জন্য বলিল। জগদম্বা বলিলেন সে যে ঘুমিয়াছে, কেমন করিয়া বর লইবে। তখন বালক রামদাদাকে বর না দিলে সে বর লইবে না জানাইল। জগদম্বা বালকের দৃঢ়তা

দেখিয়া রামদাসের মস্তক শিব বাঞ্ছিত বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিলেন :

উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽসি যোগনিদ্রাং পরিত্যজ।
পশ্য মে পরমং রূপং যথোপ্সিতং বরং বৃণু॥

রামদাস উঠিয়া জগন্মাতাকে দেখিল—আনন্দ নীরে তাহার বক্ষস্থল আপ্লুত হইল। সে ভূতলে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া মায়ের স্তব করিতে লাগিল। তারপর বালক মাতার নিকট সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী ও বিচারে অজেয় হউক এই বর চাহিয়া লইল। মা তথাস্তু বলিয়া নব ব্রহ্মচারী অষ্টম বর্ষীয় বালককে ক্রোড়ে করিয়া মুখ চুম্বন করিলেন। হরিহর ব্রহ্মা, যাহা সর্ব্বদা বাঞ্ছা করেন, বালক সেই স্তন্য পীযূষ পান করিয়া দেবত্ব লাভ করিল। মা তখন আশীর্ব্বাদ করিয়া শূন্যে বিলীন হইয়া গেলেন। জগন্নাথ আবির্ভূত হইয়া উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তারপর রামদাস, ভোলানাথ কণ্ঠাভরণের নিকট গিয়া ত্রিবেণীর ঘাটে আসিয়া বালকের সহিত বিচার করিবার জন্য আহ্বান করিল। ভোলানাথ বালককে দেখিয়া বলিলেন "বিচারে কায কি, আমি পরাজয় পত্র লিখিয়া দিতেছি"। অবশেষে নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তিনি বালকের তুষ্টির জন্য ত্রিবেণীতে আসিলেন। যথাকালে সেই মুকুন্দদেবের ঘাটে আবার বিচার আরম্ভ হইল। বলা বাহুল্য ভোলানাথ কণ্ঠাভরণ এবার বিচারে পরাজিত হইলেন। এতদিনে জগন্নাথের আত্মার তৃপ্তি সাধিত হইল। *

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তারকেশ্বরের নিকটে দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি চণ্ডী রচনা করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

মাধবাচার্য্য

কবিকঙ্কনের পূর্ব্বে ত্রিবেণীতে মাধবাচার্য্য নামক এক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে (১৫০১ শকে) ত্রিবেণীতে বসিয়া 'চণ্ডীমঙ্গল' বা দুর্গামাহাত্ম্য রচনা করেন। কবি

* প্রায়োপবেশন—কুমার মুনীন্দ্রদেব রায়।—(কায়স্থ পত্রিকা)

মাধবাচার্য্যই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গভাষায় চণ্ডী রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' হইতে নিম্নে কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল, ইহা হইতে তাঁহার কাব্য রচনার নিদর্শন পরিলক্ষিত হইবে।

"পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার॥
অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধি বৃহস্পতি।
কলিযুগে রামতুল্য প্রজাপালে ক্ষিতি॥
সেই পঞ্চগৌড় মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল।
ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল॥
সেই মহানদী তটবাসী পরাশর।
যাগ-যজ্ঞে জপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর॥
তাহার তনুজ আমি মাধব আচার্য্য।
ভক্তিভরে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য॥"

ত্রিবেণীর পাঁচ মাইল দূরে সপ্তাতপুর নামক একটি জনপদ ছিল এবং বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস গ্রামের রাজ বংশধর কৃষ্ণচাঁদ এই স্থানে প্রাচীন কালে এক রাজ্য স্থাপন করেন বলিয়া জানা যায়। কৃষ্ণ-চাঁদের পুত্র সুখচাঁদ, সুখচাঁদের পুত্র গোপীচাঁদ, গোপীচাঁদের পুত্র হরিচাঁদ এবং হরিচাঁদের পুত্র নবচাঁদ এই স্থানে পুরুষানুক্রমে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের রাজত্বকালে এই স্থানে বিশেষ সমৃদ্ধশালী ছিল। এই রাজবংশ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম মুসলমান অধিকারে যাইবার পর এই রাজবংশের পতন হয়।

সপ্তাতপুর

ত্রিবেণীর সন্নিকটে কোনা নামক গ্রামে বঙ্গের আলোকসামান্যা দান-শীলা মহিলা দেবী রাণী রাসমণি জন্মগ্রহণ করেন। কোনা গ্রামের মাহিষ্য-বংশোদ্ভূত রামকৃষ্ণ দাস ও তাহার পত্নী রামপ্রিয়া দাসীর তিনি একমাত্র

কন্যা ছিলেন। তাহার পিতা মাতা কৃষ্ণভক্ত ছিলেন বলিয়া তিনিও বাল্যকাল হইতে কৃষ্ণানুরক্তির অনুকরণ করিতেন এবং পরবর্ত্তীকালে এই ধর্ম্মভাবের জন্যই তিনি লক্ষমুদ্রা ব্যয় করিয়া দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা করেন। ১২৩৬ সালে রাসমণি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৬৭ সালের ৯ই ফাল্গুন তারিখে তিনি লোকান্তরিতা হন।

রাণী রাসমণি

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন হালীসহরের অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। শ্যামা-বিষয়ক রামপ্রসাদী-গান বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মাসিক "প্রভাকরে" সর্ব্বপ্রথম ইহার জীবনী ও বহু অপ্রকাশিত গান বাহির করেন। সাধক রামপ্রসাদ সম্বন্ধে বহু অলৌকিক উপাখ্যান প্রচলিত আছে; নিম্নে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য হইতে একটী উপাখ্যান উদ্ধৃত হইল। কথিত আছে যে, রামপ্রসাদ এক দিন গঙ্গাস্নান করিয়া বাটি ফিরিয়া আসিলে. তাঁহার মাতা কহিলেন 'কে একটী স্ত্রীলোক তোমার গান শুনিতে আসিযাছিল, তোমার দেখা না পাইয়া চণ্ডীমণ্ডপের দেওয়ালে কি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, পড়িয়া দেখ।' রামপ্রসাদ দেওয়ালের লেখাগুলি পড়িয়া দেখিলেন যে কাশী হইতে স্বয়ং অন্নপূর্ণা তাহার গান শুনিতে আসিয়াছিলেন; দেখা না পাইয়া তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে "কাশীতে যাইয়া আমাকে গান শুনাইয়া আইস।" রামপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ আর্দ্রবস্ত্রেই মাতাকে সঙ্গে লইয়া 'মন চলরে বারাণসী' গান গাহিতে গাহিতে কাশী যাত্রা করিলেন।

রামপ্রসাদ

ত্রিবেণী গিয়া সে রাত্রি অবস্থান করিলেন; নিশাযোগে অন্নপূর্ণা রামপ্রসাদকে স্বপ্নে জানাইলেন যে, আর তোমার কাশী যাইতে হইবে না, এই স্থানেই আমায় গান শুনাও। রামপ্রসাদ ত্রিবেণীতে বসিয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন। কত গান যে গাহিলেন, তাহার ইয়ত্তা,

নাই। নিম্নে ত্রিবেণীতে রামপ্রসাদের রচিত ও গীত একটি গান উদ্ধৃত হইল :

"আর কাজ কি আমার কাশী।
ঘরে বসে পাব গয়া গঙ্গা বারাণসী॥
ফেলে মার চরণ কাশী সেই কালো চরণ ভালবাসী
কাশী মোলে হয় মুক্তি বটে সেই শিবের উক্তি,
(ওরে) সকলের মূল ভক্তি মুক্তি তার কেনা দাসী।"

ত্রিবেণীর অনতিদূরে হালিসহরের নিকটবর্ত্তী কোনা গ্রামের পালিত বংশ সুপ্রসিদ্ধ। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সু-সাহিত্যিক এবং বাঁকীপুর প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজে বিশেষভাবে পরিচিত বলদেব পালিত এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে মাতুলালয় চন্দননগর হইতে দানাপুরে চলিয়া যান এবং তথায় কমিশরিয়টে কার্য্য করেন। তাহার পিতা বিশ্বনাথ ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সৈন্যের সহিত কাবুল অভিযানে গমন করেন, কিন্তু পথিমধ্যে প্রত্যাগমন করিবার সময় তিনি শত্রুদ্বারা নিহত হন। সেই জন্য গভর্ণমেণ্ট বিশ্বনাথের সন্তানদের ভরণপোষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। বিশ্বনাথের চেষ্টায় দানাপুরে একটি অতিথিশালা ও একটি কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হয়।

বলদেব পালিত

বলদেব দানাপুরে মিলিটারী পে-অফিসে হেড ক্লার্কের কার্য্য করেন এবং দানাপুরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বর্ত্তমানে ইহা দানাপুর বলদেব একাডেমী নামে খ্যাত। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ৭ই জানুয়ারী তিনি গতায়ু হন। তিনি পাঁচখানি কাব্য গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন—কাব্যমঞ্জরী, কাব্যমালা, ললিত কবিতাবলী, ভক্তিহরি কাব্য, কর্ণার্জ্জুনকাব্য তন্মধ্যে ললিতকবিতাবলী সম্বন্ধে ১২৭৯ সালের পৌষমাসের বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন "লেখকের কবিত্বশক্তি ও শিক্ষা দুই আছে।"

ত্রিবেণীতে করুণাময় চট্টোপাধ্যায় নামক একজন সাধক পুরুষ ছিলেন ; তিনি স্বামী যোগাচার্য্য বলিয়া এই অঞ্চলে খ্যাত। ১২৬৬ সালের ২৮শে কার্ত্তিক তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৮শে পৌষ ১৩৩৭ সালে দেহরক্ষা করেন।

যোগাচার্য্য স্মৃতিমন্দির

বংশবাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাহার সহধর্ম্মিনী শ্রীমতী চারুশীলা দেবী ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ সালে স্বামী যোগাচার্য্যের যোগাবস্থায় আসীন একটি পূর্ণাবয়ব মর্ম্মর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং তাহা প্রত্যহ মহা আড়ম্বরের সহিত পূজিত হইয়া থাকে। স্বর্গীয় রাধাচরণ পালের সহধর্ম্মিনী শ্রীমতী মহারাণী দাসী ১৫শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৩ সালে বহু অর্থব্যয়ে যোগাচার্য্য স্মৃতি মন্দির এবং তদসংলগ্ন একটি মনোরম নাটমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কয়েকজন সন্ন্যাসী এই মন্দিরে অবস্থান করেন। মন্দির গাত্রে ও মর্ম্মরমূর্ত্তির পাদদেশে দাতার নাম উৎকীর্ণ আছে। ২৮শে পৌষ স্বামী যোগাচার্য্যের তিরোধান উৎসব উপলক্ষে এই স্থানে তাঁহার বহু ভক্ত ও শিষ্যের সমাগম হয়।

প্রাচীন কালে ছড়ার মধ্য দিয়াই শিশু সাহিত্য সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় ; আর এই সমস্ত ছড়ার রচয়িত্রী ছিলেন, মূলতঃ আমাদের দেশের অন্তঃপুরিকারা অর্থাৎ ঠাকুরমা দিদিমা প্রভৃতি। হুগলী জেলার মধ্যে যে কত শত ছড়া প্রচলিত ছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। নিম্নে সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচলিত একটি প্রসিদ্ধ ছড়ার উল্লেখ করিতেছি, ইহার মধ্যে বঙ্গদেশের তৎকালীন সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থান ত্রিবেণীর উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

"পানকৌড়ী পানকৌড়ী ডাঙ্গায় ওঠ হে।
তোমার ভাসুর বলে গেছে বেগুন কোট সে॥
বেগুন হোল কালা কালা,
বউ পালাল দুপুর বেলা,

ও বেগুনটি কুটো নাক ভাব লেগেছে।
ভাব ভাব কদম্বের ফুল ফুটেছে ॥
কদম কুড়াতে কদম কুড়াতে পেয়ে গেলাম মালা ।
দাম কুড়াকুড় বাদ্যি বাজে তুলারামের খেলা ॥
নাচ ত ভাই তুলারাম কাঁকাল বেঁকিয়ে ।
আলোচাল খেতে দোব টোপর ভরিয়ে ॥
আলোচাল খেতে খেতে গলা হোল কাঠ ।
কতক্ষণে যাবরে ভাই ত্রিপুর্ণির ঘাট ॥
ত্রিপুর্ণির ঘাটে রে ভাই বালি ঝক ঝক করে ।
যেন চাঁদ মুখে রোদ লেগেছে কিরণ ফেটে পড়ে ॥

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন

বাঙ্গালী হিন্দু আজ যে মহাসঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় পৌছিয়াছে তাহা অনেকাংশে আত্মকৃত অপরাধের ফল সন্দেহ নাই। যে দেশে প্রতিভা এবং পাণ্ডিত্যের সমুচিত সমাদর লোপ পাইতে বসিয়াছে সে দেশের কৃষ্টিসংরক্ষণের মৌখিক আড়ম্বর অনেক সময়ে এক প্রকাণ্ড উপহাস বলিয়া মনে হয়। ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে যিনি বাংলার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজের শীর্ষস্থানে ছিলেন, ত্রিবেণী নিবাসী সেই জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সম্প্রতি বিশিষ্ট সমাজেও উল্লেখ করিয়া কেবল বাঙ্গালীর আত্মবিস্মৃতির বিচিত্র রূপ দেখিয়াই বিস্মিত হইয়াছি। আজ পর্য্যন্ত সাহেবের সার্টিফিকেট সম্বল করিয়া যে সকল বাঙ্গালী কার্য্যক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করিতেছেন তাঁহারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার উইলিয়াম জোন্স সস্ত্রীক ত্রিবেণীতে গিয়া জগন্নাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং জোন্স-পত্নী "আবাং ম্লেচ্ছৌ" বলিয়া

জগন্নাথের চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিতে সাহস পান নাই। আজ আমরা তৎকালীন সরকারী দলিল হইতে জগন্নাথের কীর্ত্তি খ্যাপন করিতে বিরত থাকিলাম। বাঙ্গালী নিজে তাঁহাকে কি চোখে দেখিতেন একবার জানা যাক।

শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ অত্যন্ত বিদ্বৎ-সেবী ছিলেন। তিনি বিক্রমাদিত্যের অনুকরণে "নবরত্ন" সভা স্থাপন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। রাজা কালীকৃষ্ণের সভাপণ্ডিত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার রচিত "মাধব-মালতী" গ্রন্থে নবকৃষ্ণের "নবরত্ন" সভার বর্ণনা এই :

তাঁর ছিল নবরত্ন ইহার সে রূপ।
সভাস্থের কিবা কব নিজে বিদ্যাকূপ॥
সাক্ষাৎ বরদাপুত্র নামে জগন্নাথ।
তর্কপঞ্চাননরূপে ভুবন বিখ্যাত॥
মহাকবি বাণেশ্বর নদের শঙ্কর।
বলরাম কামদেব আর গদাধর॥
শিশুরাম পসপুরে স্মার্ত্ত কৃপারাম।
শান্তিপুরে বাস গোঁসাই ভট্টাচার্য্য নাম॥
এই নবরত্ন লয়ে সর্ব্বদা আমোদ।
আপনি আছেন লক্ষ্মী কি কব সম্পদ॥ *

সাক্ষাৎ সরস্বতীপুত্র জগদ্বিখ্যাত জগন্নাথ যে সভার শ্রেষ্ঠ রত্ন রূপে খ্যাতিলাভ করেন, অন্যান্য রত্নদের কিঞ্চিৎ পরিচয় না দিলে তাহার সমুজ্জ্বল চিত্র এখন পরিস্ফুট হইবে না। দ্বিতীয় রত্ন মহাকবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার —চিত্রচম্পু, রহস্যামৃত মহাকাব্য, চন্দ্রাভিষেক নাটক ও বহু খণ্ডকাব্যের রচয়িতা। তাঁহার বিবরণ আমরা গ্রন্থান্তরে লিখিয়াছি (সা-প-প,

* মাধব-মালতী—রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, পৃষ্ঠা ৫।

১৩৪৯, পৃঃ ৪৩-৫৪)। চিত্রচম্পূ মুদ্রিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর কীর্ত্তি-রক্ষায় বাঙ্গালী চিরকালই পরাঙ্মুখ, নতুবা খাঁটি বাঙ্গালীর উৎকৃষ্ট সংস্কৃত রচনার নিদর্শনস্বরূপ চিত্রচম্পূর অংশবিশেষ আমরা বাংলার বিবিধ সংস্কৃত পরীক্ষায় পাঠ্যমধ্যে দেখিতে পাইতাম। তৃতীয় রত্ন 'নদের শঙ্কর' অর্থাৎ নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক শঙ্কর তর্কবাগীশ। ১২২৩ সনে প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। এক সময়ে ইঁহার চতুষ্পাঠীতে প্রায় ৩০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিত, অথচ ইনি নিরবচ্ছিন্ন নৈয়ায়িক ছিলেন। নব্যন্যায়ের চর্চ্চা বাংলা হইতে এখন লোপ পাইয়াছে, ছাত্রাভাবে লুপ্তাবশিষ্ট নৈয়ায়িকগণ এখন কাব্যশাস্ত্র কিম্বা আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চায় রত হইয়াছেন। কালে হয়ত কাশী কিম্বা মান্দ্রাজে গিয়া বাঙ্গালীকে নব্যন্যায় পড়িতে হইবে। "নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক" পদের ঐতাহাসিক গুরুত্ব পরিগ্রহ করিতে শিক্ষিত বাঙ্গালী আজ একান্ত ভাবে অসমর্থ। চতুর্থ ও পঞ্চম রত্ন বলরাম তর্কভূষণ ও তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কামদেব বিদ্যাবাচস্পতি কামালপুরের ভট্টাচার্য্য বংশীয় এবং চিরবিলুপ্ত কুমাহট্ট নৈয়ায়িক সমাজের নেতা ছিলেন। এক সময়ে সমগ্র বাংলাদেশে কুমারহট্টের শিবের গলির নৈয়ায়িকগণের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, কথাটা হয়ত গভীর পরিহাস বলিয়া অনেকে এখন মনে করিবেন। শিবের গলি এখন শৃগালাকীর্ণ একটি অরণ্যমাত্র। ষষ্ঠ রত্ন গদাধরের পরিচয় অজ্ঞাত। সপ্তম রত্ন শিশুরাম তর্কপঞ্চানন পূর্ব্বোক্ত বলরামের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং নৈয়ায়িক। জগন্নাথ হইতে শিশুরাম পর্য্যন্ত সকলেই প্রধানতঃ নৈয়ায়িক ছিলেন। অষ্টম রত্ন হুগলী জেলার পসপুর নিবাসী স্মার্ত্ত কৃপারাম তর্কবাগীশ। ১২১০ সনে ১১০ বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গী হন। নবম রত্ন শান্তিপুর নিবাসী নানাশাস্ত্রীয় গ্রন্থকার রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি গোস্বামী ভট্টাচার্য্য। নব রত্নের মধ্যে তিনিই বয়সে সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। ১২৩০ সনেও তিনি জীবিত ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়, যদিও তিনি তখন অতিবৃদ্ধ।

রাজা রামমোহন রায় জগন্নাথের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

Jagannath was universally acknowledged to be the first literary character of his day, and his authority has nearly as much weight as that of Raghunandan.

অর্থাৎ—জগন্নাথ তাঁহার সময়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন এবং তাঁহার প্রামাণ্যগৌরব প্রায় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের সমান ছিল।

জগন্নাথের জনৈক ছাত্র একটি ব্যাকরণ গ্রন্থের প্রতিলিপিতে জগন্নাথের স্তুতি করিয়াছেন,—"বিদ্যাবিত্তবয়:কুলাদিবিভবৈঃ খ্যাতো দ্বিতীয়ঃ স্বয়ং"। অর্থাৎ জগন্নাথ বিদ্যায়, বিত্তার্জ্জনে, বয়সে এবং কুলমর্য্যাদাদিতে "অদ্বিতীয়" ছিলেন। জগন্নাথ পিতৃশ্রাদ্ধের পর একটি "অমৃতী" মাত্র সম্বল করিয়া সংসার আরম্ভ করেন এবং মৃত্যুকালে নগদ লক্ষাধিক টাকা এবং বহু সহস্র টাকা আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া যান। কুলাংশে তিনি স্বয়ং "সিদ্ধশ্রোত্রিয়" ছিলেন এবং তিন কন্যাই কুলীনে সম্প্রদান করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার এক জামাতার নাম রামগোপাল মুখোপাধ্যায়, তাঁহার সম্বন্ধে একটি কারিকা পাওয়া যায় :

আধুনিক জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।
তার সুতা লইয়াছিলেন গোপাল ভাজন॥

লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৮০৫ সালে যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত গাজীপুরে পরলোকগমন করেন। কলিকাতার সাহেবরা সভা করিয়া চাঁদা তুলিয়া তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করেন। তদনুসারে গাজীপুরে তাঁহার সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হয়। মন্দিরমধ্যে কর্ণওয়ালিসের প্রস্তরক্ষোদিত দক্ষিণাভিমুখী মুখাকৃতির (Medallion bust) সম্মুখে এক ব্রাহ্মণের ও পশ্চাতে এক মুসলমানের দণ্ডায়মান অধোমুখ পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। চিরন্তন প্রবাদ অনুসারে এই ব্রাহ্মণই বাঙ্গালী শ্রুতিধর জগন্নাথ

তর্কপঞ্চানন। ক্ষোদিত লিপিতে কিম্বা সরকারী কাগজপত্রে ব্রাহ্মণ ও মৌলবীর পরিচয় লিপিবদ্ধ নাই বটে, কিন্তু সোম-প্রকাশে এক পত্রলেখক নিঃসন্দিগ্ধ বাক্যে উহা জগন্নাথের মূর্ত্তি বলিয়াই লিখিয়াছেন। মূর্ত্তিগুলির ক্ষোদিতার নাম Flaxman (Fisher: N. W. P. Gazetteer, Gazipur, 1883, pp. 122-3 দ্রষ্টব্য)। *

জগন্নাথের চরিতকার প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট জানিয়া জগন্নাথের শরীরের বর্ণনা করিয়াছেন—"জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন গৌরাঙ্গ ছিলেন না—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ প্রিয়দর্শন ছিলেন। তাঁহার দেহ সুগঠিত ও লোমশ, বাহু দীর্ঘ, নাসিকা উন্নত, ললাট প্রশস্ত এবং চক্ষু উজ্জ্বল ছিল।" আমরা বৃদ্ধমুখে শুনিয়াছি তৎকালীন পণ্ডিতসমাজ তাঁহাকে "লোমশ মুনি" আখ্যা দিয়াছিলেন। জগন্নাথের বিস্ময়কর জীবনাখ্যানের মূলকথা আমরা সংক্ষেপে লিখিতেছি। †

স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র শ্রীমান্ বসন্তদেব আমাদের অনুরোধে গাজীপুর গিয়া অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া মন্দির মধ্যে অবস্থিত মূর্ত্তির ছবি কৌশলে তুলিয়া আনিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। উক্ত ছবি ১৩৫৪ সালের আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে মুদ্রিত হইয়াছে।

জগন্নাথের জীবনী কালীময় ঘটকের প্রথম চরিতাষ্টকে, উমাচরণ ভট্টাচার্য্য রচিত গ্রন্থে (১৮৮০, পৃঃ ৬০), রজনীগুপ্তের চরিত কথায়, বিশ্বজীবন পত্রিকায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথায় ২য় খণ্ডে (পৃঃ ৭২৯-৩৫) এবং সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (১৩৪৯, পৃঃ ১-১৪) প্রকাশিত হইয়াছে।

---

* সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড ২য় সং পৃঃ ৭৩৫।

† উমাচরণ ভট্টাচার্য্য-রচিত জীবনী পৃঃ ১৫

১৭৮৯ সালে সার উইলিয়াম জোন্স শকুন্তলা নাটকের অনুবাদ "Fatal Ring" নামে প্রকাশ করেন। ভূমিকায় প্রসঙ্গক্রমে লিখিত আছে যে নাটকখানা জগন্নাথের কণ্ঠস্থ ছিল—"The venerable Compiler of the Hindu Digest, who is now in the eightysixth year has the whole play of Sacontala by heart as he proved when I last conversed with him to my entire satisfaction." এতদনুসারে জগন্নাথের জন্ম হয় ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে এবং মৃত্যুকালে বয়স হয় ১০৩ মাত্র—ইহা সমস্ত বিবরণের বিরোধী। জোন্স ৯৬ স্থলে ভ্রমক্রমে ৮৬ লিখিয়াছেন। কারণ ১৭০৪ সালে অশ্বিনী শুক্লা পঞ্চমীর সহিত তুলারাশির সংযোগ ছিল না—জগন্নাথের রাশ্যাশ্রিত নাম 'রাম রাম' তুলারাশি সূচনা করে। দ্বিতীয়তঃ, জগন্নাথের কনিষ্ঠ পুত্রের মধ্যম পুত্র গঙ্গাধরের জন্ম সন ১১৬৪ সালের পরে নহে, কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে—ঐ সনে সম্ভবতঃ অন্নপ্রাশন উপলক্ষে, গঙ্গাধর নবদ্বীপরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ভূমিদান পাইয়াছিলেন (নদীয়ার ২২৮০ ২ সং তায়দাদ দ্রষ্টব্য)। জগন্নাথের প্রথম পৌত্রের জন্মকালে সুতরাং তাঁহার বয়স হয় মাত্র ৪৫—দরিদ্র ভট্টাচার্য্য বংশে ইহা প্রায় অসম্ভব। তৃতীয়তঃ, জগন্নাথের বৃদ্ধপ্রপৌত্র রামদাসের জন্ম ১৭৯৯ সনে কি কিছু পূর্ব্বে এবং একপুরুষের গড়পড়তা হয় ২৪ বৎসরেরও কম—ইহাও প্রায় অসম্ভব। সুতরাং ভ্রম-সংশোধন পূর্ব্বক ১৬৯৪ সনেই (১৬৯৫ নহে) তাঁহার জন্ম-সন নির্ণীত হইল (সা-প-প, ১৩৪৯, পৃঃ ২-৩)।

১১০১ সালের আশ্বিনী শুক্লা পঞ্চমীতে (ইংরাজী ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতৃপুরুষের পরিচয়াদি প্রবন্ধান্তরে দ্রষ্টব্য * দুই-একটি নূতন সম্বাদ লিখিতেছি। এই বংশ ত্রিবেণী-সমাজের মৌলিকবংশ নহে। জগন্নাথের আদিপুরুষ

বাল্যজীবন

* সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩৪৯ সাল পৃষ্ঠা ৪-১৪

"দীননাথ ঠাকুর" যশোহর হইতে এখানে আসেন। "ত্রিবেণ্যাং রঘুরাঘবৌ" প্রবাদ-বাক্যে ত্রিবেণীর দুই জন প্রাচীন পণ্ডিতের নাম আছে, ইহারা জগন্নাথের বংশ নহেন। রঘুনাথ সার্ব্বভৌম ও রাঘব সার্ব্বভৌম উভয়েই জগন্নাথের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন—রাঘবের বংশ এখনও বিদ্যমান। জগন্নাথের অলৌকিক প্রতিভায় ত্রিবেণীর প্রাচীন বংশগুলি অনেকটা নিষ্প্রভ হইয়া যায়। জগন্নাথের পিতা ও জেঠা অপেক্ষা পিতামহ ও জ্যেষ্ঠ পিতামহ (চন্দ্রশেখর বাচস্পতি) অধিক প্রতিভাশালী ছিলেন এবং চন্দ্রশেখরের পিতা অপেক্ষা পিতামহ প্রসিদ্ধ ছিলেন। অপরদিকে জগন্নাথের পুত্রাপেক্ষা পৌত্র ঘনশ্যাম এবং ঘনশ্যামেরও পৌত্র রামদাস প্রতিভার অবতার ছিলেন।

বাল্যে জগন্নাথের মাতৃবিয়োগ হয় এবং তিনি পিতার নিকট পড়িয়া জেঠা ভবদেব ন্যায়ালংকারের বাঁশবেড়িয়াস্থিত টোলে স্মৃতিশাস্ত্র পড়েন "একদিন ভবদেব তাঁহার পিতা হরিহর তর্কালঙ্কারের জ্যেষ্ঠ সহোদর সুবিখ্যাত পণ্ডিত চন্দ্রশেখর বিদ্যাবাচস্পতি প্রণীত প্রসিদ্ধ দ্বৈতনির্ণয় নামক স্মৃতিগ্রন্থ জনৈক কৃতবিদ্য ছাত্রকে পড়াইতেছিলেন; বহু চিন্তাতেও এক স্থানে আর্থিক-আপত্তির উপপত্তি করিতে না পারিয়া বলিলেন, "এই স্থানটি জেঠা মহাশয় ভাল বুঝিতে পারেন নাই।" অদূরবর্ত্তী জগন্নাথ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "মহাশয়ের জেঠা উত্তম বুঝিয়াছিলেন, আমার জেঠা বুঝিতে পারিতেছেন না।" *

দ্বৈতনির্ণয় স্মৃতিশাস্ত্রের কুট বিষয়ের মীমাংসাগ্রন্থ এবং তাহার দুরূহ পঙ্‌ক্তি বিশেষের অর্থসঙ্গতি করা সহজ নহে। জগন্নাথের ন্যায়গুরু ছিলেন রঘুদেব বাচস্পতি, ইনি কামালপুরের ভট্টাচার্য্য বংশের তৎকালীন প্রধান নৈয়ায়িক এবং ত্রিবেণীতে তাঁহার টোল ছিল। ন্যায়শাস্ত্র আরম্ভ

---

* উমাচরণ পৃঃ ৯-১০।

করার এক বৎসর পরে জগন্নাথ নবদ্বীপের রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশকে বিচারে পরাজিত ও সন্তুষ্ট করেন (উমাচরণ, পৃঃ ১২-১৫)। রমাবল্লভ দীধিতির টীকাকার জগদীশ তর্কলঙ্কারের বৃদ্ধপ্রপৌত্র (পৌত্র নহে)।

জগন্নাথ ২৪ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগের পর অতি নিঃস্ব অবস্থায় তিনি টোল করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন এবং মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে তাহা হইতে বিরত হন। অর্থাৎ পূর্ণ ৯০ বৎসর (১৭১৮-১৮০৭ সন) তিনি অবাধে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। জগতের সারস্বত ইতিহাসে এই বিস্ময়কর ব্যাপার দ্বিতীয় ব্যক্তির জীবনে ঘটে নাই বলিয়া আমাদের ধারণ। তাঁহার অধ্যাপনার বিষয় ছিল "ন্যায়, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, সাহিত্য, অলঙ্কার ও আয়ুর্ব্বেদ" * তন্মধ্যে ন্যায়ের ছাত্রই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল। তদ্ভিন্ন বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য পাতঞ্জলাদি শাস্ত্রেও তিনি কৃতবিদ্য ছিলেন, কিন্তু বঙ্গদেশে তৎকালে এই সকল শাস্ত্রের পৃথক অধ্যাপনা প্রচলিত ছিল না। কালক্রমে বর্দ্ধমান-রাজ, নবকৃষ্ণ, কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির পোষকতায় তিনি বাংলাদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হন এবং পূর্ণ অভ্যুদয়কালেও নবদ্বীপকে নিষ্প্রভ করিয়া দেন। নবদ্বীপের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ করিতে বাঁশবেড়িয়া, কুমারহট্ট প্রভৃতি সমাজ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু একমাত্র জগন্নাথই তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই উক্তির মধ্যে কতটা কৃতিত্ব সূচিত হইয়াছে শিক্ষিত বাঙালী আজ তাহা বুঝিতে অসমর্থ। বাংলার ও নবদ্বীপের সারস্বত ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙ্গালী তাহার বিরাট অজ্ঞতা দূর করিতে সমুৎসুক নহে। নবদ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া বাংলাদেশে ৫০০ বৎসরে (১৪০০-১৯০০ সাল) যত শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিত আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা

অধ্যাপনা

*উমাচরণ, পৃ ১৭।

ন্যূন কি-না সন্দেহ। বাংলায় শাস্ত্রচর্চ্চার এই বিস্ময়কর প্রসার জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়। অলৌকিক প্রতিভা, অদ্ভুত মেধা ও সুদীর্ঘ-জীবনবলে জগন্নাথই প্রতিষ্ঠা ও সম্মানের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া লক্ষাধিক পণ্ডিতের শীর্ষস্থানে পৌছিয়া ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার তেজস্বিতার নিদর্শনস্বরূপ নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত তাঁহার অদ্ভুত বিরোধের কথা উল্লেখ করা যায়। * কৃষ্ণচন্দ্রের অন্যায় হস্তক্ষেপ উপেক্ষা করিয়া জগন্নাথ সমাজভ্রষ্ট এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সমাজে তুলিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া "বাজপেয়" যজ্ঞের পনের দিন ব্যাপী বিরাট অনুষ্ঠানকালে জগন্নাথকে বাদ দিয়া নানাদেশীয় বহুতর পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ করেন। সুবৃহৎ পণ্ডিত সভায় উপস্থিত হইতে উদ্‌গ্রীব হইয়া জগন্নাথ অনিমন্ত্রিত অবস্থায়ই যজ্ঞের পঞ্চম দিবসে এক শত ছাত্র সহ রাজবাটীতে গমন করেন এবং কৃষ্ণচন্দ্রের আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বব্যয়ে অবস্থান করেন। যজ্ঞশেষে কৃষ্ণচন্দ্র জগন্নাথকে প্রশ্ন করিলেন "যজ্ঞ কিরূপ হইল? জগন্নাথ উত্তর করিলেন "যাহাতে জগন্নাথ রবাহুত, সে যজ্ঞের মহিমার সীমা কি?" পরে জগন্নাথের সাহায্যে বিপন্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে "গলদেশে স্বর্ণ-কুঠার বন্ধন পূর্ব্বক" জগন্নাথের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল।

যৌবনে জগন্নাথ "রামচরিত" নাটকাদি রচনা করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে তাহা লোপ পাইয়াছে। তাঁহার নব্যন্যায়ের উপরি পত্রিকাও এখন দুষ্প্রাপ্য। ফলতঃ গ্রন্থরচনায় তিনি কমই কালক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু জীবনসন্ধ্যায় সার্ উইলিয়ম জোন্সের অনুরোধে হিন্দুর ব্যবহারশাস্ত্র "বিবাদভঙ্গার্ণব" রচনা করিয়া চিরযশস্বী হইয়াছেন। এই বিরাটগ্রন্থ রচনা করিতে ৪ বৎসর

• গ্রন্থ রচনা

* উমাচরণ পৃ ২৩-২৪

(১৭৮৮-৯২ সাল) লাগিয়াছিল এবং ইহার ইংরেজী অনুবাদ দৃষ্টে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে দীর্ঘকাল ধরিয়া হিন্দু আইনঘটিত বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়াছে। গ্রন্থ সমাপ্তিকালে জগন্নাথের বয়স ছিল ৯৮। রাজা রাধাকান্তদেবের গ্রন্থাগারে ইহার যে প্রতিলিপি আছে, তাহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯৭০। বাঙ্গালী প্রতিভার সমুজ্জ্বল নিদর্শনরূপে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া সুরক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য।

১২১৪ সনে (১৮০৭ খৃষ্টাব্দে) বিজয়াদশমীর দিন বিসর্জ্জন দেখিয়া জগন্নাথ আর গৃহে গমন করেন নাই। ৯ দিন গঙ্গাবাস করিয়া আশ্বিনী

মৃত্যু

কৃষ্ণা তৃতীয়ায় গঙ্গালাভ করেন, (৪ কার্ত্তিক—১৯ অক্টোবর) তখন তাঁহার বয়স সৌরমানে ১১৩ বৎসর সম্পূর্ণ হইয়া কিঞ্চিদধিক এক মাস হইয়াছিল। তাঁহার পারিবারিক জীবনের চিত্র অতি বিস্ময়কর। তিনি অন্যূন ৫০ বৎসর বিপত্নীক ছিলেন। কথায় বলে, "নাতির নাতি স্বর্গে বাতি"—জগন্নাথ বহুবারই স্বর্গে বাতি জ্বালিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ১২০৯ সালের ৬ চৈত্র (১৮০৩ খৃঃ) তিনি ভূসম্পত্তির যে বিবরণ প্রদান করেন তন্মধ্যে দখলকার স্থলে ৩০ জনের নাম আছে—তিনি স্বয়ং, এক পুত্র রামনিধি বিদ্যাবাচস্পতি (বুঝা যায় জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র তখন স্বর্গী হইয়াছেন) ১০ পৌত্র, ১৫ প্রপৌত্র ও ৩ বৃদ্ধপ্রপৌত্র। তাঁহার জীবনের বাকী চারি-পাঁচ বৎসরে প্রপৌত্র ও বৃদ্ধপ্রপৌত্রের সংখ্যা আরও বাড়িয়াছিল। ইহাদের পত্নী ও কন্যা সন্তান সহ টোলের ছাত্র ও ভৃত্যাদি স্বজনের সমষ্টি ৩০০ ব্যক্তি প্রতিদিন একান্নে আহার করিত। দুই মাসে ছয় দিন করিয়া এক এক নাতবৌয়ের রান্নার পালা ছিল। বৃদ্ধপ্রপৌত্রদের অন্নপ্রাশনাদি সংস্কারকার্য্যে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের আবশ্যক হইত না, তিন পুরুষ একত্র বসিয়া আহার করিতেন! বৃদ্ধপ্রপৌত্র রামদাস তর্কবাচস্পতির উপনয়ণ সংস্কারে জগন্নাথ স্বয়ং অন্যূন ১১০ বৎসর বয়সে "আচার্য্য" পদে বৃত হইয়াছিলেন। আজ স্বাধীনতা ও প্রগতির যুগে

একান্নভুক্ত পরিবারের এই উজ্জ্বল চিত্র স্বপ্নের অগোচর হইয়াছে। ১৯ কিম্বা ২০ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিলে জগন্নাথ শতবর্ষজীবী হইতে পারিতেন না, সাংসারিক চিন্তায়ই তাঁহার আয়ুক্ষয় হইত। ১১৩ বৎসর বয়সেও নব্যন্যায়ের কূটপ্রশ্ন সমাধান করার শক্তি জগন্নাথের ছিল। বর্ত্তমানে এতাদৃশ অদ্ভুত শক্তির আবির্ভাব স্বপ্নেরও অগোচর হইয়াছে কেন, ভাবিবার বিষয়।

জগন্নাথের সম্বন্ধে বহু গল্প প্রচলিত আছে এবং চরিতকারগণ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা দুই-একটি অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত গল্প এখানে সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

(১) রাজা নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণপত্র লাভের জন্য জনৈক পণ্ডিত উপস্থিত কবি কবিচন্দ্রকে জগন্নাথের নিকট সুপারিশ করিতে বলেন। কবিচন্দ্র নবকৃষ্ণের সভাপণ্ডিত (মহাকবি বাণেশ্বরের পৌত্র) চতুর্ভুজ ন্যায়রত্নকে ধরিতে উপদেশ করেন। পণ্ডিতটি বলিলেন এ ব্যাপারে চতুর্ভুজের হাত নাই। কবিচন্দ্র উত্তর করিলেন:

"চতুর্ভুজে ভুজো নাস্তি নির্ভুজঃ কিং করিষ্যতি।" * (পুরীর জগন্নাথ নির্ভুজ)

(২) নবদ্বীপে প্রবাদ আছে, দিবারাত্রির মধ্যে অন্ততঃ একক্ষণের জন্যও নবদ্বীপে সরস্বতী অধিষ্ঠান করেন! শুনিয়া জগন্নাথ বলিলেন, ত্রিবেণীতে সরস্বতী দিবারাত্র প্রত্যক্ষ। শ্লেষ অলঙ্কারদ্বারা সরস্বতীপদে নদীকে বুঝাইতেছে। (ঐ, ৯৬ কথা)

(৩) জগন্নাথের কৃপণতার খ্যাতি ছিল। ডাকাত-সর্দার শ্যাম মল্লিক এক প্রাতে রীতিমত দক্ষিণা দিয়া জগন্নাথের নিকট ব্যবস্থা চাহি-লেন, "লুঠের দ্রব্যে ডাকাতের স্বত্ব আছে কি না?" জগন্নাথ স্বত্ব আছে বলিয়া লিখিত ব্যবস্থা দিয়াছিলেন এবং ঐ রাত্রিতেই তাঁহার বাড়ীতে

* রামগতি ন্যায়রত্নের গোষ্ঠীকথা, ৫৬ গল্প

ডাকাতি হয়! আমরা "বিবাদভঙ্গার্ণব" হইতে এই অতি বিস্ময়কর অথচ শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থার প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।

পার্শ্বিকদ্যুতচৌর্য্যাদি প্রতিরূপকসাহসৈঃ।
ব্যাজেনোপার্জ্জিতং যচ্চ তৎকৃৎস্নং সমুদাহৃতম্॥

ইতি বচনেন চৌর্য্যস্য স্বত্বজনকত্বম্। অতএব তদ্দ্রব্যস্য ঋণদানেঽপি চৌরস্য বৃদ্ধিলাভঃ এবং তদ্ধনেন পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানেন কিঞ্চিৎ ফলং ভবতি। পিতামহচরণাশ্চ চোরিতদ্রব্যে চৌরস্য স্বত্বং স্বীকুর্ব্বন্তি।"

১২০৯ সনের তায়দাদে জগন্নাথ ডাকাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন "আমারদিগের বাটীতে ডাকাতি হইয়াছে এবং কোটা পড়িয়া কাগজ-পত্রাদি ও পুস্তক অনেক তছরূপ হইয়াছে।"

উপসংহারে আমরা জগন্নাথের অধঃস্তন বংশের শ্রেষ্ঠপুরুষ-গণের নামকীর্ত্তন করিলাম। তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্রের ধারায় ন্যায়শাস্ত্র এবং কনিষ্ঠ রামনিধির ধারায় স্মৃতিশাস্ত্র পূর্ব্বাপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র ঘনশ্যাম সার্ব্বভৌম বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় স্বয়ং জগন্নাথকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন। তিনি ন্যায়শাস্ত্র ও ব্যবহারশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যলাভ করেন এবং বিবাদভঙ্গার্ণব রচনায় জগন্নাথের অন্যতম সহকারী ছিলেন। ১৮০১ সনে সদর দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠা হইলে প্রথম বাঙ্গালী পণ্ডিত নিযুক্ত হন রাধাকান্ত তর্কবাগীশ। রাধাকান্তের মৃত্যুর পর ১৮০২ সনে কোলব্রুক সাহেবের অনুরোধে ঘন-শ্যাম উক্ত পদ গ্রহণ করেন। ১৮০৬ সনে ঘনশ্যামের পরলোকগমনের পর উক্ত পদে চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অনেকে অবগত নহেন, সতীদাহের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম ঘনশ্যামই ব্যবস্থা দিয়াছিলেন যে ইহা শাস্ত্র ও সদাচার বিরুদ্ধ। ৪।৩।১৮০৫ তারিখে প্রেরিত * নিজামত

* জন্মভূমি. ফাল্গুন ১৩০০, পৃঃ, ১৬৯ ৭০

আদালতের প্রশ্নের উত্তরে তিনি কোর্ট-পণ্ডিতরূপে ঐ ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। ঘনশ্যামের পৌত্র রামদাস তর্কবাচস্পতি (মৃত্যু ১২৭৫ সন) তাঁহার সময়ে বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন। ত্রিবেণীর শেষ নৈয়ায়িক রামদাসের পুত্র অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন ১৩১৯ সনের চৈত্রমাসে স্বর্গী হন।

রামনিধির মধ্যম পুত্র স্মার্ত্ত গঙ্গাধর তর্কভূষণও বিবাদভঙ্গার্ণব রচনায় সহকারী ছিলেন! ১৭৯৩ সনের ডিসেম্বর মাসে তিনি নদীয়ার জজ B. Rocke সাহেব কর্ত্তৃক নদীয়ার জজ-পণ্ডিত পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮০৭ সনে জগন্নাথের পূর্ব্বেই তিনি স্বর্গী হন। তিনিও অত্যন্ত প্রতিভাশালী ছিলেন। সর্ব্বোপযুক্ত পৌত্র ঘনশ্যাম ও গঙ্গাধরের অকালমৃত্যু জগন্নাথের পরম দুঃখের কারণ হইয়াছিল, নতুবা হয়ত তিনি শাস্ত্রোক্ত ১২০ বৎসরই পরমায়ু লাভ করিতে পারিতেন।

আশ্বিনের শুক্লা পঞ্চমী (অর্থাৎ বোধনের পূর্ব্বদিন) জগন্নাথের জন্মতিথি উপলক্ষে, কিম্বা আশ্বিনের কৃষ্ণা তৃতীয়া তাঁহার শ্রাদ্ধতিথিতে ত্রিবেণীতে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। আশা করি আমাদের এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে স্থানীয় লোকের উৎসাহ ও প্রবৃত্তির অভাব হইবে না। *

তাঁহার অলৌকিক জীবন-কাহিনী বঙ্গভাষায় মুদ্রিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য এবং তল্লিখিত "বিবাদভঙ্গার্ণব" নামক সুবৃহৎ পুস্তক সংরক্ষণের জন্য প্রকাশ করিতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ বা বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনকে আমরা অনুরোধ জানাইতেছি।

---

* শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিত "ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন"—প্রবাসী আষাঢ়—১৩৫৪।

বংশবাটী

বংশবাটী সপ্তগ্রামের অন্যতম প্রধান গ্রাম। বংশবাটী নামকরণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে ভাগীরথীতীরে বহু বাঁশঝাড় ছিল এবং সেই বাঁশবন হইতেই বংশবাটী নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বংশবাটীর অপভ্রংশ 'বাঁশবেড়ে' বলিয়াও বহু পুস্তকে, এই স্থানের উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

কবিরাম রচিত 'দিগ্বিজয়-প্রকাশ' নামক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের 'কিলকিলা বিবরণে' হুগলীর নিকটে বংশবাটি প্রভৃতি গ্রাম, এই স্থানে খলাপী নদী দামোদর হইতে আসিয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে বলিয়া লিখিত আছে।

"বংশবাটী প্রভৃতয়ো হুগলীমাজ্য বর্ত্ততে।
খলাপি তটিনী নিত্যং বহতে বালুকান্তরে॥"

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার 'সুরধনী-কাব্যে' এই স্থানের বিষয় যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত করিলাম:

"পরিপাটী বংশবাটী স্থান মনোহর,
যে দিকে তাকাই দেখি সকলই সুন্দর!
বিদ্যাবিশারদ কত পণ্ডিতের বাস,
সুগৌরবে শাস্ত্রালাপ করে বার মাস।
এইস্থানে জন্মেছিল শ্রীধর রতন,
কথক কুলের কেতু কাঞ্চন বরণ।
সুভাবে রচিল কত গীত মধুময়,
শুনিলে আনন্দে নাচে লোকের হৃদয়।"

বর্ত্তমানে পরিপাটী বংশবাটীর মনোহারিত্ব কালের কবলে যাইলেও এক সময়ে এই স্থান বঙ্গের অন্যতম প্রসিদ্ধ জনপদ বলিয়া খ্যাত ছিল

এবং যাহাদের গৌরবে এই স্থান গৌরবান্বিত, সেই প্রসিদ্ধ রাজবংশও বহু বৎসর যাবৎ রাঢ়ের বহুলাংশ শাসন করিয়াছিল।

বংশবাটী রাজবংশের আদিপুরুষ দেবদত্ত বঙ্গেশ্বর রাজা আদিশূর কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া হরিদ্বারের অন্তর্গত মায়াপুরী নামক স্থান হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। বঙ্গদেশে তিনি সর্ব্বপ্রথম মুর্শিদাবাদ জেলার



শ্রীশ্রীহংসেশ্বরী দেবী—বংশবাটী

অন্তর্গত দত্তবাটীতে বাস করেন বলিয়া এই বংশ উক্ত স্থানে প্রথম বিস্তৃতি লাভ করে। অতঃপর এই বংশের একটী শাখা পাটুলিতে বসতি স্থাপন করেন। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে এই বংশের উদয় রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র

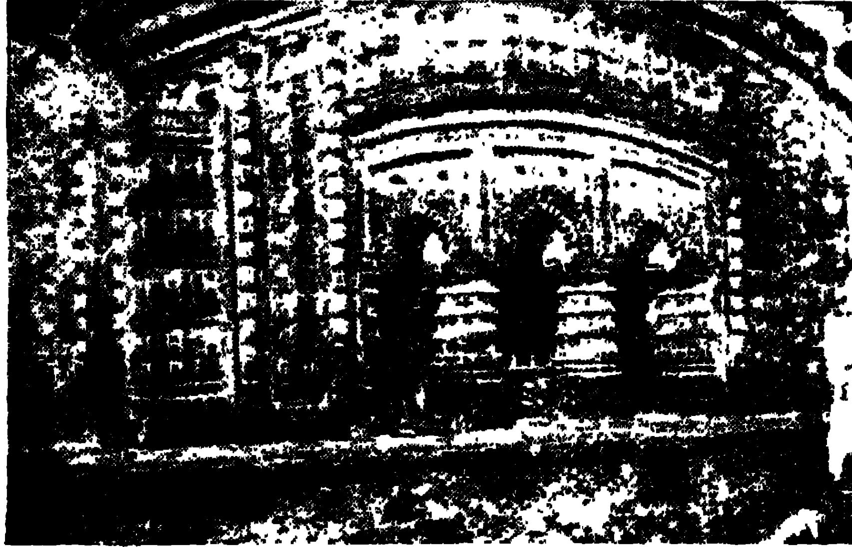
জয়ানন্দ রায়, সম্রাট সাজাহানের নিকট হইতে 'মজুমদার' উপাধি এবং 'কোট এক্তিয়ারপুর' পরগণা জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তৎকালে বঙ্গদেশে মাত্র ৪ জন মজুমদার ছিলেন, তন্মধ্যে সপ্তগ্রামের মজুমদার ছিলেন ভবানন্দ, সেই জন্যই তিনি ভবানন্দ মজুমদার নামে খ্যাত হন। বঙ্গের নবাব কাসীম খাঁ তাঁহাকে 'কানুনগো' নিযুক্ত করেন এবং ইহার দ্বারা তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে পাঁচ পুত্র রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করেন।

১৬৮২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মিঃ হেজস পাটুলির ভূস্বামী 'উদয় রায়ের' সম্বন্ধে এবং 'রেউই' গ্রামের বিষয় তাঁহার রোজনামাচায় লিখিয়া গিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। নদীয়ার বহু গ্রাম তৎকালে পাটুলির অন্তর্গত ছিল এবং বংশবাটীর রাজাগণ পাটুলির রাজা বলিয়া সেই সময় আখ্যাত ছিলেন। উদয় রায়ের পুত্র জয়ানন্দ এবং তাহার পুত্র রাঘব রায় পাটুলি ত্যাগ করিলে, এই স্থান নদীয়ার রাজাগণ প্রাপ্ত হন এবং সেই সময় এই স্থানে নদীয়ার রাজধানী স্থাপিত হয়। পরবর্ত্তীকালে পাটুলি হইতে নবদ্বীপে নদীয়ার রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

"Early in ye morning we passed by a village called Sreenagar and by 5 o'clock this afternoon (October, 1682). We got as far as Rewee, a small village belonging to Woodoy Roy, a Jamindar that owns all the Country on that side of the water almost as far as over against Hughly. It is reported by ye country people that he pays more than twenty lacks of Rupees per annum to ye King, rent for what he possesses and that about two years since he presented above a lack of rupees to ye Mogoul and his favourite, to divert his intention of hunting and hawking in his country for fear of his tenants being ruined and plundered by the Emperors lawless and unruly followers.

This is a fine pleasant situation, full of great shady trees, most of them tamarins, well stored with peacocks and spotted deer like our fellow deer. We saw two of them near the river side on our first landing." *

জয়ানন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র রাঘব ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সাজাহানের নিকট হইতে 'চৌধুরী' এবং পর বৎসর 'মজুমদার' উপাধি লাভ করেন। রাঘব পিতার বহু ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন এবং সম্রাটও প্রচুর নিষ্কর জমি ও আর্শা,



রাজা রামেশ্বর প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণু মন্দির

বাঁশবেড়িয়া, মামদানীপুর, সাহাপুর, জাহানাবাদ, রায়পুর, ঘোষালপুর প্রভৃতি একুশটী পরগণার জমিদারী-স্বত্ব প্রদান করেন। এই পরগণাগুলির পরিমাণ প্রায় সাতশত বর্গমাইল এবং এই সমস্ত পরগণা সরকার সাতগাঁয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া, তিনি সুবন্দোবস্ত ও সুশাসনের জন্য পাটুলি ত্যাগ করিয়া সপ্তগ্রামের উত্তর-পূর্ব্বে ভাগীরথী তীরের বাঁশ-বন পরিষ্কার করাইয়া বংশবাটীর ভিত্তিস্থাপন পূর্ব্বক তথায় বসবাস করেন।

*Hedges Diary, Vol—1, Page 29.

পাটুলি সম্বন্ধে 'দিগ্বিজয়-প্রকাশ' নামক গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

"গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে পাটলিগ্রামবাসিনাম্।
কায়স্থানাং শাসনঞ্চ বর্ত্ততে অধুনা নৃপ ॥" ৬৯২

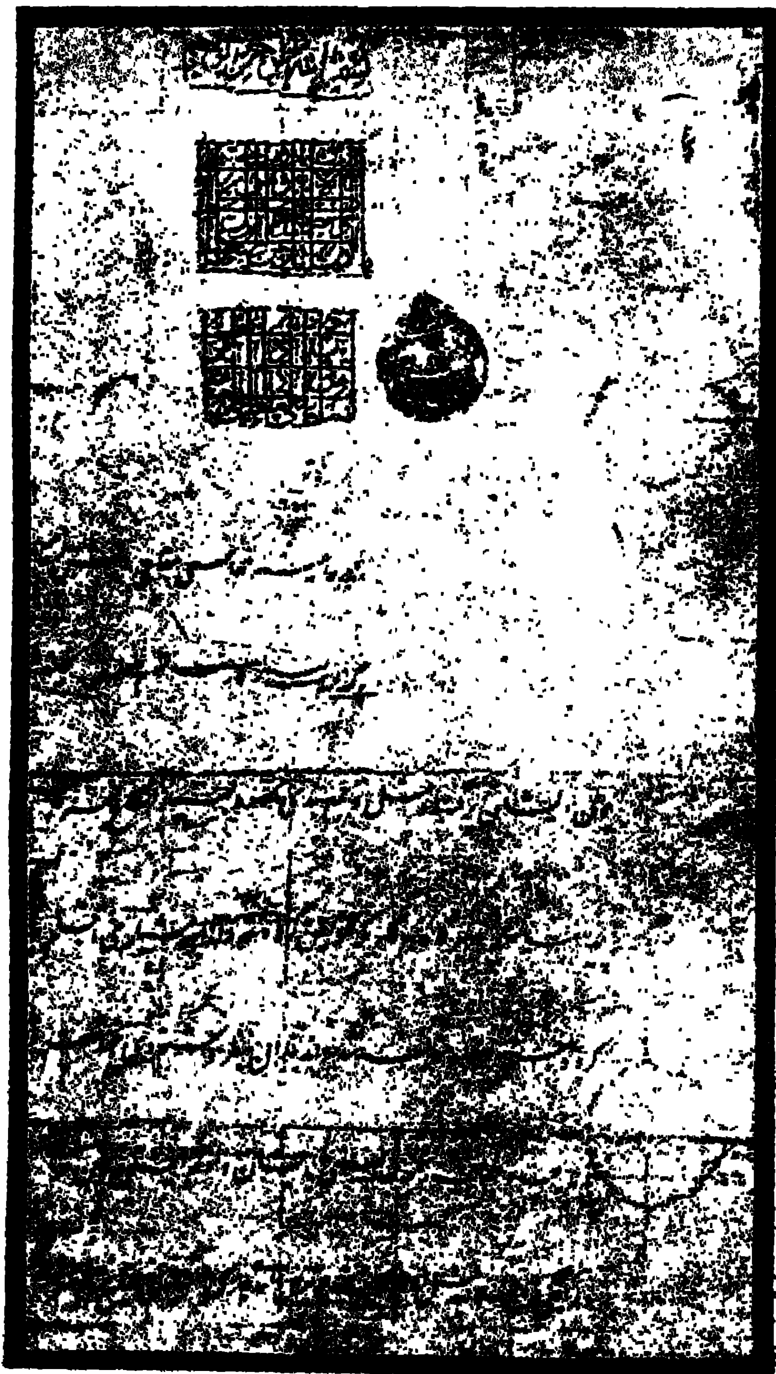
পাটুলি রাজ্যের অধীনে মোট একান্নটী পরগণা ছিল, রাঘব তাঁহার দুই পুত্র রামেশ্বর ও বাসুদেবকে বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করিয়া দেন। জ্যেষ্ঠত্বের সম্মানস্বরূপ রামেশ্বর দশ আনা (২।০) এবং বাসুদেব ছয় আনা (১।০) অংশ প্রাপ্ত হন। রামেশ্বর হইতে বংশবাটী রাজবংশ এবং বাসুদেব হইতে সেওড়াফুলি রাজবংশ সমুদ্ভূত হইয়াছে। এই বংশের সহিত রাজা গণেশ, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, দিনাজপুর রাজবংশ, ভাগলপুরমহাশয় বংশ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বা বংশগুলি রক্তসম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট।


হংসেশ্বরী দেবীর মন্দির

রামেশ্বরের দ্বারাই বংশবাটীর মনোহারিত্ব সর্ব্ব প্রথম প্রকাশ হয়। তিনি বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে ৩৬০ ঘর কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং বিবিধ জলাচরনীয় হিন্দু এবং বহু সমরকুশল পাঠানকে আনাইয়া বংশবাটীতে স্থায়ীভাবে বাস করান। বারাণসী হইতে ন্যায়, সাংখ্য, দর্শন শাস্ত্রে পারদর্শী বহু পণ্ডিতকে আনাইয়া তাঁহাদের সাহায্যে বংশবাটীতে ৬০টী চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। * উক্ত চতুষ্পাঠীর যাবতীয় ব্যয়, রাজসরকার হইতে দেওয়া হইত। তৎকালীন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামশরণ তর্কবাগীশকে তিনি বারাণসী

* Hunters Statistical Account of Bengal. Vol. 1.

আনাইয়া তাঁহার সভা-পণ্ডিত করেন। তাহার বংশধরগণ অদ্যাপি পূর্ব্ব-পুরুষের ন্যায় অধ্যাপনা পদে ব্রতী হইয়া আসিতেছেন।



রাজা-মহাশয় উপাধির সনন্দ

বংশবাটীতে বহু পণ্ডিত বাস করিতেন; এবং ন্যায় ও স্মৃতি চতুষ্পাঠী যে কত ছিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের উইলিয়াম ওয়ার্ড উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নদীয়া, কলিকাতা, বংশবাটী,



রাজা পূর্ণেন্দু দেব রায়

কাশী প্রভৃতি স্থানে যে সকল চতুষ্পাঠী ও প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও পণ্ডিতবর্গ ছিলেন, তাহার একটি বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন; * নিম্নে তাহার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল:

"হুগলীর অনতিদূরে বাঁশবেড়িয়ায় ১২-১৪টি চতুষ্পাঠী আছে; সেখানে প্রধানতঃ ন্যায় শাস্ত্রেরই অধ্যাপনা হয়। ত্রিবেণী, কুমারহট্ট ও ভাটপাড়ায় এইরূপ ৭-৮টি চতুষ্পাঠী আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন

* A view of the History, Literature and Mythology of the Hindu নামক পুস্তকের চতুর্থ খণ্ডে (পৃঃ ৪৯০-৪৯৭ দ্রষ্টব্য)।

ত্রিবেণীর একটি বড় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ছিলেন। বেদেও তাহার কিছু কিছু অধিকার ছিল এবং বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, স্মৃতি, কাব্য, পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ এবং বাঙ্গলাদেশের প্রাচীনতম ব্যক্তি বলিয়া তাহার খ্যাতি আছে, মৃত্যুকালে তাহার ১০৯ (?) বৎসর বয়স হইয়াছিল। *

গোন্দলপাড়া ও ভদ্রেশ্বরে ৮টি করিয়া ন্যায় চতুষ্পাঠী আছে; আন্দুলে ১০।১২টি, বালী ও অন্যান্য স্থানে ২-৩-৪টি চতুষ্পাঠী আছে।"

মুসলমান রাজত্বকালে বঙ্গে নানাকারণে বিশৃঙ্খলা ছিল, সেইজন্য জমিদারগণ সুযোগ বুঝিয়া প্রাপ্য রাজস্ব যথাসময়ে দিতেন না। রামেশ্বর অন্যান্য জমিদারদিগের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিয়া তাহাদের জমিদারী হস্তগত করেন এবং যথাসময়ে রাজ-সরকারে রাজস্ব প্রেরণ করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব হিন্দুদ্বেষী হইলেও রামেশ্বরের কার্য্যে বিশেষ প্রীত হন এবং ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে 'পঞ্চপর্চা খেলাত সহ 'রাজা-মহাশয়' উপাধিতে তাঁহাকে ভূষিত করেন। † এই সম্মানসূচক রাজোপাধি পুরুষানুক্রমে রক্ষা করিবার জন্য আর একখানি সনদ দ্বারা বংশবাটী গ্রামে ৪০১ বিঘা নিষ্কর ভূমি জায়গীর ও ১২টী পরগণা তিনি জমিদারী স্বরূপ প্রাপ্ত হন। মিঃ এ, ডি, বাওয়ার লিখিয়াছেন:

"We know of no family in India enjoying the title of "Rajah Mahasaya" except the Bansberia Raj" ‡

'রাজা মহাশয়' উপাধি সম্বলিত মূল সনন্দখানি পারস্য ভাষায় লিখিত এবং বঙ্গের প্রাচীন রাজ-বংশের গৌরবস্তম্ভ স্বরূপ পুরাতত্ত্ব হিসাবে উক্ত সনন্দ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের "ডকুমেণ্ট-গেলারী"তে (Document

* পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সম্বন্ধে ৩৫০ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হইয়াছে।

† Golden Book of India By Sir Roper Lethbridge

‡ The family History of Bansberia Raj. Page 8

Gallery) ১লা সেপ্টেম্বর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম রক্ষিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও পারস্ত ভাষায় সুপণ্ডিত মিঃ হেনরী বেভারিজ মূল 'রাজা-মহাশয়' সনন্দের যে ইংরাজী অনুবাদ করেন, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল :

'To Raja Rameswar Rai Mahasaya,

Pargana Arsha of Satgaon (Government of Satgoan).

As you have promoted the great interest of Government in getting possession of parganas and making assessment thereof ; and as you have performed with care whatever services were entrusted to you, you are entitled to reward. The Khelat of Panja Percha (five clothes *i.e*, dresses of honour) and the title of 'Raja Mahasaya' are therefore given to you in recognition thereof, to be inherited by the eldest children of your family ; generation after generation without being objected to by any one. 10 Safar 1090 Hijar.

বঙ্গানুবাদ। যেহেতু তুমি পরগণাগুলি অধিকারে আনিয়া ও জরিপ জমাবন্দী করিয়া রাজ্যশাসনের সাহায্য করিয়াছ এবং তোমাকে যখন যে কার্য্যের ভার দেওয়া হইয়াছে, তাহা তুমি সযত্নে সুসম্পন্ন করিয়াছ, সেইজন্ত তুমি পুরস্কার পাইতে পার। তোমার গুণের পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে পঞ্চ-পার্চা খেলাত এবং রাজা মহাশয় উপাধি দেওয়া হইল। পুরুষানুক্রমে তোমার বংশের জ্যেষ্ঠপুত্রগণ এই উপাধি ধারণ করিবেন, ইহাতে কেহ কোন প্রকার আপত্তি করিতে পারিবে না। ১০ শফর ১০৯০ হিজরি।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কিউরেটার রায় বাহাদুর বি, এ, গুপ্ত Ethnology in Ancient Historical Documents নামক পুস্তকে আওরঙ্গজেবের পূর্ব্বোক্ত 'রাজা-মহাশয়' সনন্দ সম্বন্ধে এক বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন।

রাজা রামেশ্বর পরম ভাগবত ছিলেন এবং ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে বংশবাটীতে এক বিষ্ণু-মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত সরকারী গ্রন্থে লিখিত আছে : "On the west of the temple of Ham-



কুমার মুনীন্দ্রদেব রায়

sesvari, there is a temple of Ananta Deva, which is said to be about 200 years old." এই মন্দিরের প্রত্যেক ইষ্টকে বহু দেব-দেবীর মূর্ত্তি সুন্দরভাবে খোদিত আছে। বঙ্গদেশে কারুকার্য্য সমন্বিত এইরূপ মন্দির আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই মন্দিরকে ভারতের

স্থাপত্য-শিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। মন্দির-গাত্রে একখানি প্রস্তর-ফলকে নিম্নোক্ত শ্লোকটী উৎকীর্ণ আছে :

"মহীব্যোমাঙ্গশীতাংশুগণিতশকবৎসরে।
শ্রীরামেশ্বরদত্তেন নির্ম্মমে বিষ্ণুমন্দিরং ॥ ১৬০১।"

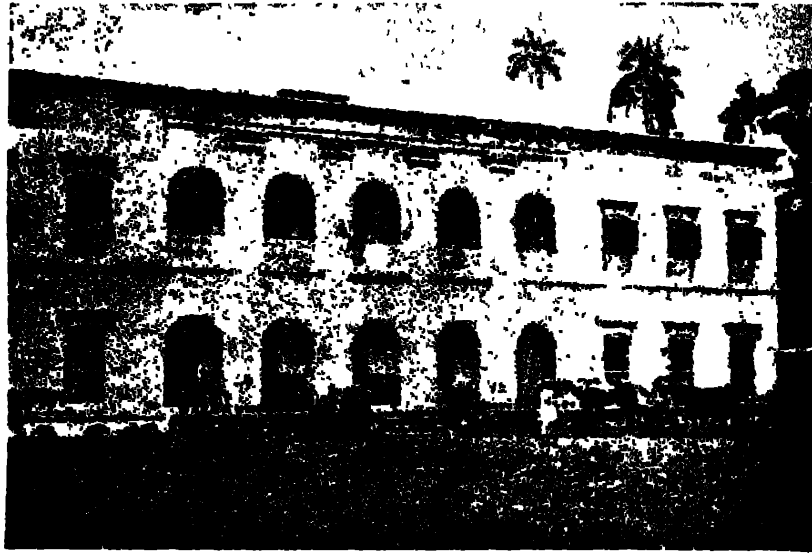
১৯০২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের ছোটলাট সার জন উডবার্ণ মন্দিরের ইষ্টকগুলিতে নানাবিধ কারুকার্য্য দেখিয়া বলেন যে, অঙ্কিত ইষ্টকগুলি এত সুন্দর যে, প্রত্যেকখানির চিত্র সংগ্রহ করিয়া দেওয়ালে টাঙ্গাইলে গৃহের শোভা নিঃসন্দেহে বর্দ্ধিত হইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নির্দ্দেশানুযায়ী ভারতের প্রসিদ্ধ শিল্পী নন্দলাল বসু, এক মাস বংশবাটীতে থাকিয়া এই মন্দিরের প্রত্যেকটি ইষ্টকের চিত্র গ্রহণ করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের কিউরেটার স্বর্গীয় বি, এ, গুপ্তে মহাশয় লিখিয়াছেন :

It will be seen that inspite of ups and downs this eminent family of Bengal Kayasthas have been able to maintain the highest social position and that they have from time to time, recived many high titles. The last high title of "Raja Mahasaya" has been socially recognised. The family has maintained this high position for nearly 100 years. The Bengal Kayasthas are loyal people. They have not fought any battles. Their strength lies in the manipulation of the pen. They are equal to Brahmins and Baidyas. They are not upstarts. They have not assumed grandiloquent name for their caste but they have steadily remained in high litarature. In official position there are among them Governor, HighCourt Judges, Member of the Board of Revenue, Members of the Council and Vice-Chancellors of the Calcutta University. They are equally prominent in other learned professions, Lord Singha of

Raipur is a Kayastha and the first Indian to enter the House of Lords. He became a first Indian Governor of a Province. *

রাজা রামেশ্বর তিন পুত্র রাখিয়া গতাসু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা রঘুদেব বংশবাটীতে বাস করেন এবং অন্য দুই পুত্র জমিদারী বিভাগ



বংশবাটী রাজভবন

করিয়া শিবপুর ও রাজহাটে বাস করেন। সেই সময়ে নবাব মুর্শীদকুলি খাঁ বঙ্গের সুবাদার; তিনি নানাস্থানে জমিদারদিগের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া তাহাদিগকে নিজের অধীন করিয়াছিলেন। তাহার সময়ে সরকারী রাজস্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইলেও, জমিদারদিগকে তিনি যেরূপ উৎপীড়ন করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই। মলমূত্রাদিপূর্ণ একটি পুষ্করিণীকে তিনি "বৈকুণ্ঠ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন এবং যে হিন্দু জমিদার সময়মত রাজস্ব দিতে না পারিত, তাহাকে কুলি খাঁর প্রবর্তিত 'বৈকুণ্ঠ' দিয়া

* Ethnology in Ancient Historical Documents By Rai Bahadur B. A. Gupto, Pages 30-31.

টানিয়া লইয়া যাওয়া হইত। মুসলমান রাজত্বকালে এই ধরণের হিন্দুদের প্রতি অত্যাচারের বিবরণ তৎকালীন গ্রন্থাদি হইতেও যথেষ্ট পাওয়া যায়। বিজয় গুপ্ত তাঁহার 'পদ্মপুরাণে' লিখিয়াছেন :

"ব্রাহ্মণে পাইলে লাগে পরম কৌতুকে।
কার পৈতা ছিঁড়ি ফেলে থুতু দেয় মুখে॥"

যাহা হউক, রাজা রঘুদেব নদীয়ার ব্রাহ্মণ জমিদার বাকী খাজনার দায়ে 'বৈকুণ্ঠে' যাইবেন শুনিয়া, তাহার যাবতীয় বাকী রাজস্ব (কেহ কেহ বলেন একলক্ষ টাকা) নবাব সরকারে জমা দিয়া, তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। *

সেই সময় বর্গীদের অত্যাচারে বঙ্গদেশ শ্মশানের আকার ধারণ করিয়াছিল। বর্গীগণ বঙ্গবাসীর উপর যেরূপ অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা মিলে না। "মহারাষ্ট্র পুরাণ" নামক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহার কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল :

"ছোট বড় গ্রামে যত লোক ছিল।
বর্গীর ভয়ে সকলে পলাইল॥
কারু হাত কাটে, কারু নাক কাণ
একি চোটে কারুর বধয়ে পরাণ॥
ভাল ভাল স্ত্রীলোক যত ধরিয়া লইয়া যায়ে।
অঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাধি দেয় তার গলায়ে॥
একজন ছাড়ে তারে, আর জনা ধরে।
রমণের ভয়ে নারী ত্রাহি শব্দ করে॥"

রাজা রঘুদেবের বদান্যতার কথা শুনিয়া এই অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম

* নদীয়া কাহিনী—শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক, পৃষ্ঠা ৩৭

হইতে ধনরত্ন ও স্ত্রী পুত্রাদি সহ বহু লোক তাঁহার বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি বর্গীদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটি খাল, বাড়ীর চারিদিকে খনন করান এবং এই খালের সাহায্যে বহুবার তাঁহার সৈন্যগণ বর্গী বিতাড়ন করেন। তিনি প্রায় একলক্ষ বিঘা নিষ্করভূমি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া যান, অদ্যাপি উক্ত ভূমিগুলি তাহাদের বংশধরগণ ভোগ-দখল করিতেছেন। রাজা রঘুদেবের এক মাত্র পুত্র গোবিন্দদেবের পুত্র, রাজা নৃসিংহদেব রায় মৃত্যুর তিন মাস পর জন্মগ্রহণ করেন।

আলিবর্দ্দী খাঁ সেই সময় বাঙ্গলার নবাব ; বংশবাটীর রাজা গোবিন্দদেব



বংশবাটী রাজবংশের প্রতীক

নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগত হইয়াছেন শুনিয়া, তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি জমিদারের সহিত বন্দোবস্ত করেন ; ফলে বিপুল সম্পত্তির মালিক হইয়াও তিনি সমস্ত জমিদারী হইতে এক প্রকার বঞ্চিত হন। তাহার লিখিত বিবরণ হইতে পর পৃষ্ঠার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

'সন ১১৪৭ সালের মাহ আশ্বিনে আমার পিতা গোবিন্দদেব রায়ের কাল হয়, সে কালে আমি গর্ভস্থ ছিলাম। বৰ্দ্ধমানের জমিদারের পেস্কার মাণিকচন্দ্র নবাব আলিবৰ্দ্দী খাঁর নিকট আমার পিতার অপুত্রক কাল হইয়াছে খেলাপ জাহির করিয়া আমার পুস্ত পুস্তানের জর খরিদা সনন্দী জমিদারী আপন মালিকের জমিদারী সামিল করিয়া সন ১১৪৮ সালের মাহ বৈশাখে খামাখা দখল করে ও হলদা পরগণা কিসমতের মালগুজারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সামিল ছিল, তিনিও ঐ সন কিসমত মজকুর আপন পুত্র শ্রীশম্ভুচন্দ্র রায়ের তালুকের সামিল করিয়া দখল করেন। মৌজে তালুহাণ্ডা মজকুরি তালুক হুগলী চাকলার সামিল ছিল। পীর খাঁ ফৌজদার বৰ্দ্ধমানের জমিদারকে দখল দিলেন না। অতএব তালুক মজকুর আমার দখলে আছে। সুবে বাঙ্গলার কোন জমিদার ও তালুকদারের পর এমন বেইনসাজী ও বেদায়ত হয় নাই...ইত্যাদি। সন ১১৯৪ সাল।'

রাজা নৃসিংহদেব শৈশবে সেইজন্ম সহায় সম্বলহীন অবস্থায় দিনাতিপাত করেন। সেই সময় বঙ্গের সর্ব্বত্র অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল; বর্গীর হাঙ্গামা ও ইংরাজ বণিকের সহিত মনোমালিন্ত নবাব আলিবৰ্দ্দী খাঁকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দৌহিত্র নবাব সিরাজ-দ্দৌলা বঙ্গের শাসনভার গ্রহণ করেন; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই পলাশীর যুদ্ধের অভিনয়ের পর বঙ্গদেশে কোম্পানীর রাজত্বের প্রবর্ত্তন হয়। নৃসিংহ-দেবের বয়স সেই সময় সতের বৎসর হইয়াছিল; তিনি ওয়ারেন হেষ্টিংসকে তাহার পৈত্রিক সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিবার জন্ম দরখাস্ত করেন। হেষ্টিংস এই বিষয়ে তদন্ত করিয়া নৃসিংহ দেবের যতটুকু জমিদারী চব্বিশ পরগণার মধ্যে ছিল তাহা তিনি প্রত্যর্পণ করেন, কারণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তৎকালে কেবল এই প্রদেশের দেওয়ানী স্বত্বে সত্ববান ছিলেন এবং চব্বিশ পরগণা ব্যতীত অন্ত কোন স্থানের ভূমি দিবার তাঁহার হাত ছিল না।

অতঃপর ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া তিনি আরও তিনটি পরগণা প্রাপ্ত হন *

১৭৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি কাশীধামে গমন করেন এবং তথায় সাধু সন্ন্যাসী-দের সাহায্যে তান্ত্রিক মতে যোগশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন।



রাজা নৃসিংহদেব রায়

সেই সময় ভূ-কৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল কাশীবাস করিতেছিলেন এবং তাঁহার সাহায্যে সংস্কৃত হইতে জয়নারায়ণ ঘোষাল কাশীখণ্ডের বঙ্গানুবাদ করেন; এই সম্বন্ধে কাশীখণ্ডে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন:

"মনে করি কাশীখণ্ড ভাষা করি লিখি।
ইহার সহায় হয় কাহারে না দেখি॥
মিত্রশত চৌদ্দশকে পৌষমাস যবে।
আমার মানস মত যোগ হইল তবে॥

* Firminger's Introduction to Fifth Report on the Affairs of the East India Company—1812. Page XCVI.

শূদ্রমণি কুলে জন্ম পাটুলি নিবাসী।
শ্রীযুত নৃসিংহদেব রায়াগত কাশী॥
তাঁর সহ জগন্নাথ মুখুর্য্যা আইলা।
প্রথম ফাল্গুনে গ্রন্থ আরম্ভ করিলা॥
তাঁহার করেন রায় তর্জ্জমা খসড়া।
মুখুর্য্যা করেন সদা কবিতা পাতড়া॥
রায় পুনর্ব্বার সেই পাতড়া লইয়া।
লিখেন পুস্তকে তাহা সমস্ত শুধিয়া॥
পদ্ধতি ভাষাতে করিলেন পরিষ্কার।
রায় করিলেন সর্ব্ব গ্রন্থের প্রচার॥"

রাজা নৃসিংহদেব সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং কাশীখণ্ডের বঙ্গানুবাদ ব্যতীত তিনি সংস্কৃত হইতে 'উড্ডীশতন্ত্র' বাঙ্গলা কবিতায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। কাশী যাইবার পূর্ব্বে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে বংশবাটীতে তিনি "স্বয়ম্ভবা-মন্দির" প্রতিষ্ঠা করেন।

মন্দির গাত্রে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উৎকীর্ণ আছে :

"আশাচলেন্দুসম্পূর্ণে শাকে শ্রীমৎস্বয়ম্ভবা।
রেজে তৎ শ্রীগৃহঞ্চ শ্রীনৃসিংহসদেবদত্ততঃ॥"

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কাশীধাম হইতে প্রত্যাগমন করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশ তাঁহাকে অন্যান্য সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য বিলাতে কোর্ট-অফ-ডিরেক্টারগণের নিকট আবেদন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া, তাঁহার পূর্ব্ব মত বদলাইয়া যায় এবং সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য বিলাতে বিপুল ব্যয় করিয়া আবেদনের পরিবর্ত্তে, মানবের দেহমধ্যে ঈড়া, পিঙ্গলা, বজ্রাক্ষ, সুষুম্না ও চিত্রিনী নামক যেরূপ পাঁচটি নাড়ী বিদ্যমান আছে, সেইরূপ পঞ্চতোলা ও ত্রয়োদশ মিনার বিশিষ্ট একটি

সুউচ্চ মন্দির মধ্যে কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে দেবী হংসেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠার তিনি সঙ্কল্প করেন এবং পরে ষট্‌চক্রভেদ প্রণালীতে মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মন্দিরের দ্বিতীয় তোলা গাঁথা হইবার সময় ১৮০২ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। নৃসিংহদেবের আরব্ধ-কার্য্য তাঁহার স্বাধ্বী স্ত্রী রাণী শঙ্করী দেবী সুসম্পন্ন করেন এবং স্বামীর নির্দ্দেশানুযায়ী উক্ত মন্দির মধ্যে তিনি পরাশক্তির বিকাশস্বরূপ শ্রীশ্রীহংসেশ্বরীদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হয় এবং এইরূপ মন্দির বঙ্গদেশে আর দ্বিতীয় নাই, এমন কি ভুবনেশ্বরের মন্দিরও ইহার নিকট প্রতিযোগিতায় হারিয়া যায়।

স্থাপত্যশিল্পে বঙ্গদেশে এই হংসেশ্বরী মন্দির একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই মন্দির দেখিতে অতি সুন্দর এবং ইহার কারুকার্য্যও অতুলনীয়; বহু ব্যক্তি এই মন্দির দর্শন করিবার জন্য বংশবাটীতে সমবেত হইয়া থাকেন। হাণ্টার সাহেব তাঁহার Statistical Account of the Hooghly District (পৃষ্ঠা ৩০৩) নামক গ্রন্থে এই মন্দিরের সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। Imperial District Gazetteers, বাঁশবেড়িয়া রাজ (শ্রীশম্ভুচন্দ্র দে কৃত), মহাপুরুষ মহারাজজীর কথা (স্বামী শিবানন্দ), A Short Account of the Sudramani Rajas—By A. C. Mukerjee, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু), The Family History of Bansberia Raj (A. G. Bower) প্রভৃতি বহু গ্রন্থে এই মন্দিরের বিষয় উল্লিখিত আছে। নিম্নে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত List of Ancient Monuments in Bengal নামক সরকারী গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে তাহা উদ্ধৃত হইল:

Temple of Hamsesvari—This temple is situated in the District of Hooghly about a mile from the Trisbigha

station * East Indian Railway in the village of Bansberia. The image of the goddess is made of black stone. She represents a form of *Kali* with her hair unbraided. The God Mahadeva is lying on a *Trikonajantra* and the goddess *Hemsesvari* is placed on the lotus, that has sprung from the navel of the aforesaid deity.

The temple is made of stone and has thirteen minarets. It possesses architectural beauty of a very high order, and it may be considered as one of the finest Hindu temples of Bengal, if not of India. The temple was erected 88 or 90 years ago, (Pages 46-48)

সরকারী গ্রন্থে দুইটি ভুল দৃষ্ট হয়। প্রথম হংসেশ্বরী দেবীর বিগ্রহ কাল প্রস্তরের নহে; ইহা নিমকাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত এবং রং নীল বর্ণ। আর দ্বিতীয়, মন্দিরটী প্রস্তরনির্ম্মিত বলিয়া লিখিত আছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহার কতক প্রস্তর এবং কতক ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত। হংসেশ্বরী মন্দীর নির্ম্মাণ করিতে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, এতদ্ব্যতীত মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রাণী শঙ্করী দেবী ভারতের বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিত এবং অধ্যাপকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া, তাঁহাদিগকে প্রচুর অর্থ দান করেন। তাঁহার ন্যায় মহীয়সী মহিলা এদেশে বিরল; তিনি স্বয়ং রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন এবং প্রজাবৃন্দের কল্যাণসাধনে সর্ব্বদাই যত্নবতী ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের দ্বারদেশে নিম্নোক্ত সংস্কৃত শ্লোকটি খোদিত আছে:

"শাকাব্দে রস-বহ্নি-মৈত্রগণিতে শ্রীমন্দিরং মন্দিরং
মোক্ষদ্বারচতুর্দ্দশেশ্বরসমং হংসেশ্বরীরাজিতং।
ভূপালেন নৃসিংহদেবকৃতিনারব্ধং তদাজ্ঞানুগা
তৎপত্নী গুরুপাদপদ্মনিরতা শ্রীশঙ্করী নির্ম্মমে॥

শকাব্দা ১৭৩৬।"

---

* ত্রিশবিঘা ষ্টেশনের নাম শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র পালের চেষ্টায়, পরিবর্ত্তিত হইয়া 'আদি-সপ্তগ্রাম' নামকরণ হইয়াছে এবং বংশবাটি নামক একটি রেলওয়ে ষ্টেশনও বর্ত্তমানে হইয়াছে।

রেভারেণ্ড লং সাহেব "কলিকাতা-রিভিউ" পত্রে মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

"On the occassion of the festival of the Goddess to whom the temple[1] is dedicated the Rani used to invite Pundits from all the neighouring countries."

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক Mr. John Alexander Chapman হংসেশ্বরী দেবীর মন্দির দেখিয়া যে কবিতা রচনা করেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :

"What did he do ? He built a temple, still
It stands and I have seen it, but too ill
Would words of mine describe it. Inside, out,
Silent on earth, in pinnacled air ashout ;
It doth reveal what to the initiate
Figures pure thought. So unto them a gate
Is opned to deliverance, I outside,
Alien but not unmoved unto ached, abide." *

১২২৬ সালে হংসেশ্বরী মন্দির হইতে দেবীর যাবতীয় অলঙ্কারাদি অপহৃত হয় ; এই সম্বন্ধে 'সমাচার-দর্পণ' পত্রে যে সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

চুরি।—মোং বাঁশবাড়িয়াতে নৃসিংহ দেবরায় হংসেশ্বরী প্রতিমা সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অলঙ্কার দুই তিন হাজার টাকার স্বর্ণ-রৌপ্যাদিঘটিত দিয়াছিলেন এবং প্রতি অমাবস্যা রাত্রিতে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। সম্প্রতি গত অমাবস্যা রাত্রিতে পূজাবসান কালে তাহার সমুদয় অলঙ্কার ও অন্যান্য ব্যবহারিক দ্রব্য চুরি গিয়াছে তাহার তদারক অনেক হইয়েছে। (১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৮২০)।

* Bengali Religious Lyrics. Page 69.

রাজা নৃসিংহ দেবের পরলোকগমনের পর, তাঁহার দত্তক পুত্র রাজা কৈলাসদেব উত্তরাধিকারী হন; কিন্তু তাঁহার মাতা রাণী শঙ্করী দেবী স্বয়ং জমিদারী কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং সমস্ত কর্তৃত্ব নিজ হস্তে রাখিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রাণীর জীবদ্দশায় ১২৪৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে, রাজা কৈলাসদেব লোকান্তরিত হন এবং তাঁহার একমাত্র পুত্র রাজা দেবেন্দ্রদেব বিশাল জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন।

রাজা দেবেন্দ্রদেবও রাণীর জীবদ্দশায় ১২৫৯ সালের বৈশাখ মাসে তিন পুত্র রাখিবা পরলোকগমন করেন; জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা পূর্ণেন্দুদেবের সেই সময় আট বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি অল্প বয়স হইতেই জমিদারী পরিদর্শন করিতেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সাহায্য করিয়া সরকারের ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন।

১২৫৯ সালের আশ্বিন মাসে রাণী শঙ্করী দেবী পরলোকগমন করেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষা কল্পে কলিকাতা কর্পোরেশন রাণীর কালীঘাটস্থ ভবনের সম্মুখস্থ রাস্তার নাম "রাণী শঙ্করী লেন" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার বংশধরগণ (রাজা পূর্ণেন্দুদেবের পুত্র) অদ্যাপি এই স্থানে বসবাস করেন। রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয় বর্ত্তমানে এই সুপ্রাচীন বংশের যোগ্য বংশধর। ভারতের প্রত্যেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া জনসেবার পুরস্কার-স্বরূপ তিনি "ভারতধর্ম্ম-প্রবর্দ্ধক" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। বঙ্গভাষা-সংস্কৃতি সম্মেলন প্রভৃতি সংস্কৃতি মূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত তিনি ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত থাকিয়া, দশের ও দেশের ৫০ বৎসর যাবৎ সেবা করিতেছেন। ভারতীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর বেতারে এই সম্বন্ধে প্রথম বক্তৃতা দেন। তাঁহার ভ্রাতা কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন; তিনিও স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে স্পেনে ২য় আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার ও গ্রন্থপঞ্জী কংগ্রেসে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে

তিনি যোগদান করিয়া যে সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন, গ্রন্থাগারের উন্নতিকামী প্রত্যেকের তাহা পাঠ করা কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত বহু বৎসর যাবৎ তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন।

বর্ত্তমানে বংশবাটির পূর্ব্বসমৃদ্ধির কিছুই নাই; যে স্থান এককালে শ্রুতি, স্মৃতি, বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, আজ তাহার নিদর্শন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তামার ও পিতলের কাজের জন্যও এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য স্থাপিত টোলগুলি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইলে এই স্থানে ইংরাজী বিদ্যার অভ্যুদয় হয়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম সমাজের তত্ত্ববোধিনী সভা সর্ব্বপ্রথম বংশবাটিতে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্ত এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায়ই বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করিতে আসিতেন এবং ছাত্রগণকে ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। বংশবাটির রাজা দেবেন্দ্রদেবের সহিত তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল এবং উভয়ে সেইজন্য 'সখা' পাতাইয়াছিলেন। বিদ্যালয়টিতে প্রায় তিন শতাধিক ছাত্র অধ্যয়ন করিত; কিন্তু বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করায়, স্থানীয় ব্যক্তিগণ উক্ত বিদ্যালয়ের বিরোধিতা করেন; ফলে বিদ্যালয়টি উঠিয়া যায়। *

অতঃপর রেভারেণ্ড ডক্টর ডাফ্ ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে এইস্থানে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সিন্ধু প্রদেশ জয় করিয়া সেনাপতি স্যার জেমস্ আউটরাম বহু অর্থ লুট করিয়া আনেন এবং উক্ত অর্থের কিয়দংশ তিনি ডক্টর ডাফকে বংশবাটির বিদ্যালয়ের বাটি নির্ম্মাণের জন্য দান করেন এই সম্বন্ধে ডক্টর স্মিথ কৃত 'ডাফ সাহেবের জীবনী' শীর্ষক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে যাহা লিখিত আছে পর পৃষ্ঠায় তাহার বঙ্গানুবাদ করিয়া কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল :

* সাহিত্য সাধক চরিতমালা—৩য় খণ্ড দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৩৬—৪৪

"ওয়েষ্টমিনিষ্টার সমাধি মন্দিরের চির-বিশ্রাম স্থান টেমস্ নদীর বাঁধের উপর এবং কলিকাতা ক্লাবসমূহের পুরোভাগে শিল্পী ফলি নির্ম্মিত অশ্বারোহী মূর্ত্তি স্যার জেমস্ আউটরামের পারস্য বিজয় ও লক্ষ্ণৌ উদ্ধারের স্মৃতি জাগ্রত রাখিয়াছে; কিন্তু জীবন্ত মর্ম্মর বা স্থায়ী প্রস্তরফলকে অঙ্কিত বা লিখিত না থাকিলেও কেহ যেন সিন্ধুপ্রদেশের রুধিরাক্ত মুদ্রা এবং বংশবাটি বিদ্যালয়ের কথা বিস্মৃত না হন।"

ডাফ সাহেবের স্কুলে প্রায় হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করিত এবং তারাচাঁদ নামক একজন বাঙ্গালী পাদরীর অধীনে বংশবাটিতে বঙ্গদেশের প্রথম ভজনালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের বহু ছাত্র খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তন্মধ্যে রেভারেণ্ড প্যারীমোহন রুদ্রের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার পুত্র মিঃ এস, রুদ্র দিল্লীর St. Stephens College-এর বহু বৎসর যাবৎ প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মহামারীতে বংশবাটির জনসংখ্যা বিশেষভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি উঠিয়া যায়। প্রাসাদোপম বিরাট ভবন স্থানীয় শিবপুরের জমিদার রায় বাহাদুর ললিতমোহন সিংহ খরিদ করিয়া 'শ্রীবাস' নামকরণ করেন; বর্ত্তমানে কায়স্থ-কুলভাস্কর কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম-এ, প্রাজ্ঞ, বিদ্যাভূষণ মহোদয় উক্ত ভবন উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলায় সর্ব্বপ্রথম নীলের চাষ আরম্ভ হয় এবং বংশবাটিতেও একটি নীলকুঠি ছিল। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে বার্চ্চ সাহেব এবং ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে টেম্পল সাহেব বংশবাটি নীলকুঠির কুঠিয়াল ছিলেন; টেম্পল সাহেব বিঘাপ্রতি বার্ষিক একটাকা খাজনায় ১৭৮০ বিঘা জমি জমা লইয়া নীল চাষ করেন। নীলকরদিগের ঘোরতর অত্যাচারে বাঙ্গালার কৃষককুলের যে কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। রেভারেণ্ড লং সাহেবে উক্ত পুস্তকের ভূমিকা ইংরাজীতে অনুবাদ করায় তাঁহার কারাদণ্ড ও

জরিমানা হয়। প্রথমে সরকার যে নীলকরদিগকে -সাহায্য করিতেন, নিম্নের কয়েক লাইন হইতে তাহা প্রমাণিত হইবে :

"The Police Darogahs had instructions from the higher authorities and that unless the Petitionors submitted to they will be turned out from their habitations," *

সেই সময় বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র নীলকরদিগের অত্যাচারের জন্য এই প্রবাদটী প্রচলিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায় :

"নীল বাঁদরে সোনার বাংলা
করলো এবার ছারখার,
হায়রে ভাই প্রজার এবার
প্রাণ বাঁচানো বিষম ভার।"

বংশবাটীর নীলকুঠী দেখিয়া দীনবন্ধু মিত্র 'নীল-দর্পণ' প্রণয়ণ করেন।

যাহা হউক সার.জন পিটার গ্রাণ্ট এবং লর্ড ক্যানিং এর চেষ্টায় এবং হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র এবং মহানুভব পাদ্রী লং সাহেবের আন্দোলনে নীলচাষ উঠিয়া যাওয়ায় বংশবাটীর নীলকুঠি, উলার জমিদার বামনদাস মুখোপাধ্যায়, মেসার্স ম্যাকিনন্ ক্রাটেনডেন কোম্পানীর নিকট হইতে ক্রয় করেন। বর্ত্তমানে এই বাটি Ganges Manufacturing Company লইয়া, মিল করিবার জন্য তাহা ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বংশবাটীর কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য আন্দোলন করেন এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাহারা সকল জাতির একত্র ভোজন ও সকল জাতির ধর্ম্ম পুস্তক একত্র পাঠের ব্যবস্থা করেন। তাঁহাদের উক্ত কার্য্যের জন্য বঙ্গদেশে তুমুল আন্দোলন হইলেও, ভারতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশের এই নিভৃত পল্লী হইতে যে সর্ব্বপ্রথম অস্পৃশ্যতা রহিত কল্পে আন্দোলন হইয়াছিল, ইহাই

* Extracts from the Records of the Bengal Govt. No. 111 Page 782.

গর্ব্বের বিষয়। এই সম্বন্ধে ১৬ই ফাল্গুন, ১২৩১ সালের 'সমাচার-দর্পণ' পত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত হইল :

"বাঁশবেড়িয়া নিবাসিনঃ ৺মথুরামোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুত শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় ও ৺রামলোচন গুণাকরের পুত্র শ্রীযুত কৃষ্ণকিঙ্কর গুণাকর এবং শ্রীযুক্ত নবকিশোর বাবুর পুত্র শ্রীযুত মতিলাল বাবু। এই কয়েকজন বাবু একত্র হইয়া মোং কাচড়াপাড়ার অন্তঃপাতি পাচঘরা সাকিনে একজন পোদের ভবনে এক ইষ্টক নির্ম্মিতা বেদি তদুপরি চৌকী এবং তদুপরে কুসুমমাল্য প্রদানপূর্ব্বক পরমসুখে পরম সত্য নামক বেদি স্থাপন করিয়া বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য আয়োজন পূর্ব্বক বিবিধ বর্ণ প্রায় পঞ্চ সহস্র লোক এক পংক্তিতে বসিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়াছেন এবং ত্রিবেণী ও বাঁশবেড়িয়া ও হালিশহর নিবাসী প্রায় শত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া এক এক পিতলের থাল ও সন্দেশাদি বিদায় পাইয়াছেন এবং মুসলমানে কোরাণ পাঠ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গীতা পাঠ করিয়াছেন।"

বংশবাটীতে কত যে সতী-দাহ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; **Papers Relating to East India Affairs viz. Hindoo Widows and Voluntary Immolations** নামক সরকারী গ্রন্থে সতীদাহের সংখ্যা ও বিবরণ লিখিত আছে; নিম্নে সমাচার-দর্পণ * পত্র হইতে দুইটি সহমরণ সংবাদ উদ্ধৃত হইল :

সহগমন।—শুনা গেল যে বংশবাটী নিবাসী পঞ্চানন বসু নামক একব্যক্তি বর্দ্ধিষ্ণু প্রাচীন কায়স্থ জ্বরবিকারে অস্বস্থ হইয়া ৩রা চৈত্র পরলোকগামী হওয়াতে দুই স্ত্রী তৎসহগামীনী হইয়াছেন। (৩০শে চৈত্র ১২৩০)।

---

* সমাচার দর্পণ' হইতে উদ্ধৃত সংবাদগুলি শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' হইতে সংগৃহীত।

সহমরণ।—শুনা গেল যে বংশবাটী নিবাসী গণেশ ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য্য জ্বরবিকারে পীড়িত হইয়া ৩রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার পরলোকগামী হইয়াছেন তাঁহার স্ত্রী তৎসহগমন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের বয়ঃক্রম পঁয়ষট্টি বৎসর হইবেক ইনি ন্যায় শাস্ত্রেতে উত্তম পণ্ডিত ছিলেন। (১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৩১)



রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের প্রলয়ঙ্করী ম্যালেরিয়া বংশবাটীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। এই ব্যাধি 'বর্দ্ধমানের জ্বর' বলিয়া প্রসিদ্ধ। ডাক্তার এলিয়ট সাহেব এই জ্বরের অনুসন্ধান কার্য্যে সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া যে

রিপোর্ট দেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে এই জ্বর সর্ব্ব-প্রথম বঙ্গদেশে মহম্মদপুরে দেখা দেয় ; তারপর যশোহর, নদীয়া হইয়া এই মহামারী শান্তিপুরে আসে, তারপর ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের বর্ষারম্ভে এই মড়ক হালিসহর হইতে গঙ্গার পশ্চিম তীরে হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া শিবপুর, ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হইয়া, শত শত লোকের জীবন নাশ করে।

মহামারীর পর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ঝড় বংশবাটীর যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ধ্বংস করে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে প্রথম মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয় এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেবের চেষ্টায় মিউনিসি-প্যালিটি কর্ত্তৃক জলের কল প্রতিষ্ঠা হয়। বর্ত্তমানে পিচের রাস্তা, সিনেমা, ইলেক্‌ট্রিক আলো প্রভৃতির ব্যবস্থা হইলেও, পূর্ব্বেকার বংশবাটীর সে শ্রী আজ আর নাই। যাত্রা, তর্জ্জা, কবির লড়াই, কথকথা, ভাগবত পাঠ প্রভৃতি বঙ্গের আনন্দবিধায়ক নিজস্ব জিনিষগুলির পরিবর্ত্তে বর্ত্তমানে পাট কলের অ-বাঙ্গালী কুলীদিগের ভজন গান শুনিয়া, বংশবাটীকে আজ পশ্চিমের কোন ক্ষুদ্র সহর বলিয়া ভ্রম হয়। যে সকল দেবালয়ে প্রত্যহ উৎসব লাগিয়া থাকিত, আজ সেই সকল দেবালয়ের দেবতা পর্য্যন্ত ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়াছে। সে স্থান একদিন ভাটপাড়া প্রসিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে গভীর জ্ঞানপূর্ণ তর্কবিচারে মুখরিত ছিল, আজ তথাকার সঙ্কীর্ণতাময় দ্বন্দ্ব-কোলাহলে জর্জ্জরিত গ্রামবাসিগণ, দেশত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বসবাস করিতেছেন। এক কথায় বর্ত্তমান বংশবাটীকে ভূতপূর্ব্ব বংশবাটীর প্রেতমূর্ত্তি বলিলেও বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। কবে আবার বঙ্গের গ্রামগুলির শ্রী ফিরিবে, স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে, পরশ্রীকাতারতা বিদূরিত হইবে, বিদ্যাচর্চ্চা, কৃষি, বাণিজ্য ও ললিতকলার উন্নতি হইবে, বাঙ্গালী আবার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, কর্ম্মঠ ও স্বাস্থ্যবান হইয়া জগৎ সভায় মাথা উঁচু করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দাঁড়াইতে পারিবে, তাহা কে জানে!

দশম অধ্যায়

পুরাতন স্থানের বিবরণ

মহানাদ হুগলী জেলার অন্তর্গত ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত বর্ত্তমানে একটি সামান্য স্থান হইলেও, শত বৎসর পূর্ব্বে ইহা একটি সুসমৃদ্ধ বৃহৎ জনপদ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ত্রিবেণীর চারি ক্রোশ পশ্চিমে এবং কলিকাতা হইতে মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে এই স্থানটি অবস্থিত। মহানাদ নামকরণ সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান প্রচলিত আছে যে, সুদূর অতীতকালে এই স্থানে একটি দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ পতিত হয় এবং বায়ু লাগিয়া উহা হইতে মহানাদ উত্থিত হয় বলিয়া পরবর্ত্তীকালে এই স্থান মহানাদ নামে খ্যাত হয়। লেফ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল ডি জি ক্রফোর্ড তল্লিখিত "হুগলীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" নামক গ্রন্থে মহানাদের অপর নাম 'কিশাবতী' (Kissabutty) ছিল বলিয়া লিখিয়াছেন।

ভারত-সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে রচিত "দেশাবলি বিবৃতি" নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ স্বর্গীয় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কার করেন। উক্ত গ্রন্থে মহানাদের সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, যোগীরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। নিম্নে এতৎসম্বন্ধীয় কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত হইল:

"অথ মানাতদেশবিবরণম্—
যোগিজাতিগৃহেজাতো ভাগ্যবান সর্ব্বলক্ষণঃ।
মহেন্দ্রনারায়ণ নৃপো মানাত নগরে পুরা॥
মৃত্তিকাময়দুর্গস্থ মর্য্যাদাভিঃ সমন্বিতম্।
স্থাপিত্যা বেণুবৃক্ষাস্তু দুর্গমধ্যে পুরা নৃপৈঃ॥"

By Manata is meant the district of Hughly where there is a famous village called Manad. It speaks of China Akna of Saptagram where in by-gone days, a Vaidya dynasty

of kings is said to have ruled. It further speaks of Triveni where the three rivers meet, of Pedna Pargana and of (45-A) Padanadana where there is a temple of Goddess Visalaksi.

45-1, Colophon. ইতি দেশাবলিবিবৃত্তৌ রাঢ়-দেশমধ্যে মানাত-দেশ বিবরণম্।"

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ভারতসম্রাট দ্বিতীয় ফিরোজ শাহ অর্থাৎ জালালুদ্দীন খিলজী ফিরোজ শাহের ভগ্নী পাণ্ডুয়ায় বসবাস করিতেন। ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই সময় পাণ্ডুয়ার হিন্দু রাজা মহানাদে বাস করিতেন, সম্রাটের ভাগীনেয় শাহ সুফি হিন্দু রাজার দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া দিল্লীতে পলায়ন করেন এবং তাহার মাতুলের সৈন্য সাহায্যে ও সপ্তগ্রামের জাফর খাঁ গাজির সহায়তায় পাণ্ডুয়ার হিন্দু রাজাকে তিনি পরাজিত করেন এবং পাণ্ডুয়া ও মহানাদ মুসলমানদিগের করতলগত হয়।

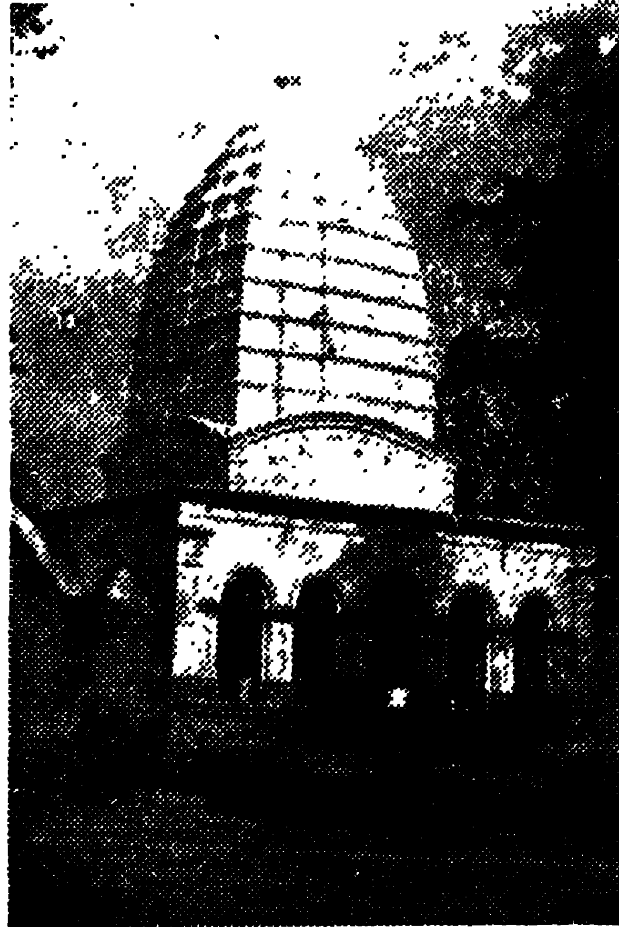
এই সম্বন্ধে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "List of Ancient Manuments in Bengal" নামক সরকারী পুস্তকে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি :

"At the close of the 13th century, Shah Sufi, whose mother was sister to the Emperor Firoz Shah II who died in 1296 A.D., lived at Pandua. At that time the Hindu Pandua Raja ruled over the district and lived at Mahanath (now Mahanad) not far off. Being oppressed by the Raja, Shah Sufi fled to his uncle at Delhi, obtained assistance and with a large army and 2 men of renown, Zafar Khan Ghazi and Bahram Sakka, overthrew the Raja."

---

*Catalogue of Sanskrit Maunscripts, Government Collection, Page 51.

"মহানাদ বা বাঙলার গুপ্ত ইতিহাস" লেখক শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কায়স্থ বংশসম্ভূত রাজা চন্দ্রকেতু সিংহ মহানাদের রাজধানীর স্থাপয়িতা ও বহু বর্ষ যাবৎ তাঁহার বংশধরগণ এই স্থান শাসন করিয়াছিলেন



জটেশ্বরনাথের মন্দির-মহানদ

বলিয়া লিখিয়াছেন। অতঃপর পোস্তার রাজা নরসিংহ দত্তের পূর্ব্বপুরুষ কিছুকাল এইস্থানে রাজত্ব করেন এবং তিনি 'বেণে রাজা' বলিয়া আখ্যাত হন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, "দিগ্বিজয় প্রকাশ" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে "মহাগ্রামো" বলিয়া যে স্থানের উল্লেখ আছে, তাহাও এই মহানাদ

গ্রাম। প্রভাসবাবু কথিত বংশগুলি মহানাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন কিনা, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং "মহাগ্রাম" সিঙ্গুরের পশ্চিমে হরিপাল নামক স্থান, মহানাদ নহে। "দিগ্বিজয় প্রকাশে" লিখিত আছে:

"জ্যেষ্ঠঃ সিঙ্গুর পশ্চিমে স্বনামবসতিং কৃতঃ।
হরিপালো মহাগ্রামো হট্টবাপীসমন্বিতঃ।"

প্রাচীনকালের ইতিহাস কল্পনার সাহায্যে কোন বংশ বিশেষের গৌরবের জন্যে রচিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অতীত কালে মহানাদে কে রাজা ছিলেন, তাহা জানা যায় না। মুসলমান অধিকারভুক্ত হইবার পর এই স্থান পরবর্ত্তীকালে বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের শাসনাধীনে আসে এবং সেই সময়ের পরও এই স্থান যে বিশেষ সমৃদ্ধশালী ছিল, তাহার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায় এবং তাহাই আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু।

মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের পর চিত্রসেন, তৎপর তিলকচাঁদ এবং সর্ব্বশেষে তেজচন্দ্র এই স্থানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং তাঁহারা রাজস্ব আদায় করিয়া নবাব সরকারে প্রেরণ করিতেন। মহারাজ তেজচন্দ্র সময়মত রাজস্ব প্রেরণ করিতে না পারায় বোর্ড অব রেভিনিউ এই মহল বিক্রয় করিয়া দেন এবং তেলিনীপাড়ার জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ মহানাদের কিয়দংশ ক্রয় করেন। বর্ত্তমানে আরও বহু জমিদারের স্বত্ব এই স্থানে আছে।

মহানাদে 'জটেশ্বরনাথ' মহাদেবের মন্দির বহু প্রাচীন; কাহার দ্বারা যে এই মন্দির সর্ব্বপ্রথম নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। এই মন্দিরের মোহান্ত 'যোগীরাজা' বলিয়া খ্যাত। পূর্ব্বোক্ত 'দেশাবলি-বিবৃতি' গ্রন্থে যোগী রাজা মহেন্দ্রনারায়ণের নাম লিখিত আছে; সম্ভবত তিনি এই মন্দিরের মোহান্ত ছিলেন এবং মহানাদ শাসন করিতেন।

জটেশ্বরনাথের মোহান্তগণ নাথপন্থী এবং ইঁহারা গৈরিক বসন পরিধান করেন। ইঁহাদিগকে চিরকুমার থাকিতে হয় এবং মৃত্যুর পর সমাহিত করা হয়। মোহান্তর নির্দ্দেশমত তাঁহার মৃত্যুর পর প্রধান শিষ্য মোহান্তের গদি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই মোহান্তগণ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় ব্যক্তি বাঙালী নহেন।

জটেশ্বরনাথের মোহান্তদের চেষ্টায় এই মন্দির প্রতি বৎসর সংস্কার করা হয়। মোহান্ত খুসীনাথ মন্দিরটি আমূল সংস্কার করেন এবং মন্দিরের



একপাদ ভৈরব মূর্ত্তি ও মকর-শুণ্ডের অগ্রভাগ

চতুর্দ্দিকে লোহার কড়ি দিয়া বারাণ্ডা ও চীনামাটির টালি গ্রথিত করিয়া দেন বলিয়া, পূর্ব্বদিকে মন্দিরগাত্রে তাঁহার নাম উৎকীর্ণ আছে। এইস্থানে মহাকালের পূজা প্রতিদিন হইয়া থাকে এবং মন্দিরের মধ্যে বহু শালগ্রাম শিলা রক্ষিত আছে। একস্থানে এতগুলি শালগ্রাম থাকিবার কারণ এই যে, পূর্ব্বে স্থানীয় গৃহস্থদের বাড়িতে এই শালগ্রামগুলি পূজিত হইতেন; কিন্তু উক্ত গৃহস্থদের কালক্রমে অবস্থা খারাপ হওয়ায়, তাঁহারা পূজা চালাইতে অসমর্থ হইয়া এই মন্দিরে শালগ্রামগুলি পূজার জন্য দিয়া গিয়াছেন।

বহু প্রাচীনকাল হইতে শিবরাত্রির সময় জটেশ্বরনাথের একটি মেলা হয়, ইহা 'মানাদের জাত' বলিয়া খ্যাত। প্রায় মাসাধিককাল ধরিয়া এই মেলা উপলক্ষে বিবিধ দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয় এবং আনন্দবিধায়ক নাচ, গান, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতির অনুষ্ঠানাদি দেখিবার জন্য বহু দেশ-দেশান্তর হইতে এই স্থানে জনসমাগম হইয়া থাকে।

জটেশ্বরনাথের মন্দিরের নিকটে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার মন্দির, শিবমন্দির এবং অন্নপূর্ণার মন্দিরের উত্তরে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মন্দিরগুলি ও শিবলিঙ্গটি পূর্ব্বতন মোহান্তদিগের সমাধির উপর স্থাপিত। এতদ্ব্যতীত নিম্ব ও বটবৃক্ষমূলে বটুক-ভৈরব শিব ও ভগ্ন কয়েকটি প্রাচীন মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। বটুক-ভৈরব শিবের দক্ষিণ পার্শ্বে দুই হাত লম্বা একটি মকরের মস্তকের শুণ্ডের অগ্রভাগ এবং তাহার পার্শ্বে একটি একপাদ ভৈরব মূর্ত্তিকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। মকরের মস্তক ও ভৈরব মূর্ত্তির আলোকচিত্র পাঠকগণের সুবিধার জন্য এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইল। এই স্থানে খিলানের মধ্যে হর-গৌরী মূর্ত্তি ও ভৈরবনাথের মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। বিষ্ণু, শীতলা ও মনসা প্রভৃতির কয়েকটি মূর্ত্তি এই স্থানে আছে। এইস্থানে রক্ষিত অধিকাংশ মূর্ত্তি বশিষ্ঠ গঙ্গা ও স্থানীয় পুষ্করিণী হইতে পাওয়া গিয়াছিল। এই স্থানে একটি সাত হাত লম্বা শিবলিঙ্গের ভগ্ন গৌরীপট্ট পতিত আছে। এত বড় গৌরীপট্ট ভারতের আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

ব্রহ্মময়ী দেবীর কারুকার্য্যখচিত নবচূড়াবিশিষ্ট অত্যুচ্চ মন্দির মহানাদের অন্যতম দর্শনীয় বস্তু। এইরূপ গগনচুম্বী সুবৃহৎ মন্দির বঙ্গদেশের মধ্যে দিনাজপুর, চন্দননগর, তেলিনীপাড়া ও বাক্‌সা ব্যতীত আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। মন্দিরের মধ্যে ব্রহ্মময়ী কালিকা দেবী বিরাজিতা এবং চারি কোণে চারিটি শিবলিঙ্গ ও ত্রিতলে সুবৃহৎ চূড়ার মধ্যে হংসেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ নিম্নোক্ত লিপি দুইটি

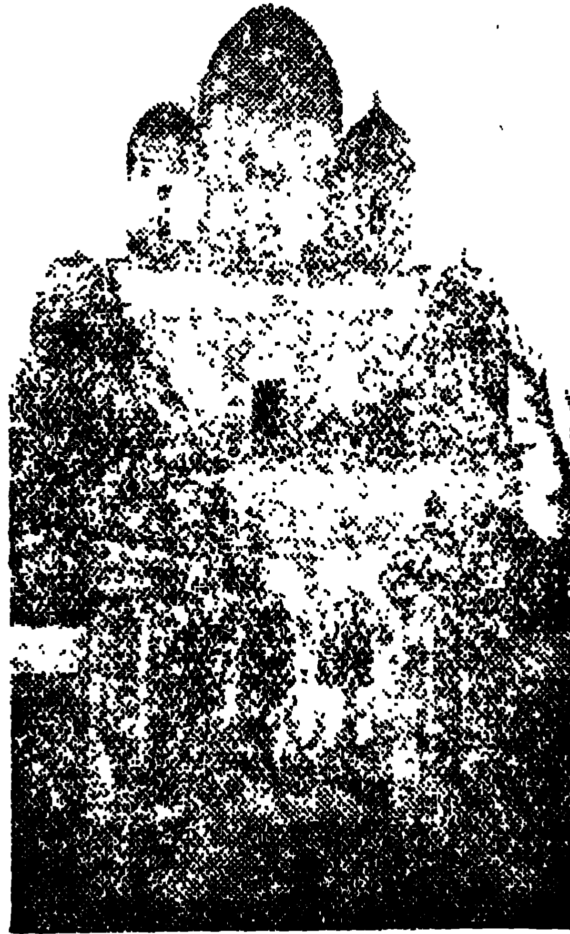
হইতে কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগী কর্তৃক ১২৩৬ বঙ্গাব্দ অথবা ১৭৫১ শকাব্দায় মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। লিপি দুইটি এইরূপ :

"শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং শাকে ভূশর মৌনচন্দ্রগণিতে শ্রীকালিকায়া মঠ। উর্দ্ধে পার্শ্বচতুষ্টয়েষু বিলসৎ হংসেশ্বরাদি শিবঃ। শ্রীকালীং ভবভঙ্গিনীং ভবভয়ং হন্তুং মঠেঽস্থাপয়ৎ। শ্রীসদ্গোপ কুলোদ্ভব গুণবরং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাখ্যকঃ।"

"ব্রহ্মময়ীর বাস জন্য,
নির্ম্মিত নবরত্ন,
পঞ্চশিব তাহাতে বেষ্টিত।
পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ চারি,
উর্দ্ধে এক শ্বেত তারি,
দেখিবারে অতি সুশোভিত।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নাম,
অশেষ গুণে গুণধাম,
সদ্গোপ কুলে উৎপত্তি।
ভবসিন্ধু তরিবারে,
সুযত্ন করি অন্তরে,
কালীপদে করিয়ে প্রণতি।
সন—১২৩৬ সাল"

বীরেশ্বর নিয়োগী মহানাদ নিয়োগী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাহার পৌত্র রাধাকৃষ্ণ কলিকাতার মেকিন্যান মেকেঞ্জি এণ্ড কোং'র অফিসে চিনি সরবরাহ করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন। সেই সময় বঙ্গদেশ হইতে বিদেশে চিনি রপ্তানি হইত। তাঁহার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র বহু অর্থ ব্যয়ে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ মন্দিরটি সুসংস্কৃত রাখিতেছেন এবং পূর্ব্বপুরুষগণের অন্যান্য কীর্ত্তি রক্ষা করিতেছেন।

মহানাদের তাম্বুলী কুলোদ্ভব করবংশ বিশেষ কীর্ত্তিমান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে সপ্তগ্রাম হইতে ইঁহারা মহানাদে আগমন করেন এবং ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লবণের একচেটিয়া ব্যবসায় হইতে প্রচুর ধনলাভ করিয়া বহু জলাশয় ও দেবালয়



ব্রহ্মময়ীর মন্দির—মহানাদ

প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহাদের প্রাসাদোপম মনোরম অট্টালিকাসমূহ আজও জনসাধারণকে করবংশের অতুল বৈভবের বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়। ধ্বংসোন্মুখ জনমানবশূন্য বিরাট অট্টালিকাশ্রেণী দেখিয়া এমন কেহই নাই যে, হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করেন না। বর্ত্তমানে শ্রীযুত শৈলেন্দ্রশিখর কর

এই বংশের প্রধান ব্যক্তি ; তিনি তাঁহার স্বর্গতা সহধর্ম্মিণীর স্মৃতিরক্ষার্থে "মনোরমা লাইব্রেরী" নামক একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছেন এবং গত ২১শে বৈশাখ ১৩৫৩ সালে অক্ষয়-তৃতীয়া দিবসে শ্রীযুত সুধীরকুমার মিত্র কর্ত্তৃক উহার উদ্বোধন হইয়াছে।

"MAHANAD—The villages in India have not forgotton the necessity of having libraries. This was given proof in the village Mahanad, District Hooghly, where Mr. Sudhir Kumar Mitra of Bangabhasa Sanskriti Sammelan performed the opening ceremony on Saturday the 4th May 1946 of "Manorama Library" started by Mr. Sailendra Sekhar Kar in memory of his deceased wife." *

১৭৭৩ শকাব্দায় অর্জ্জুনদাস কর মহানাদে একচূড়াবিশিষ্ট সুউচ্চ "লালজীউর" মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই অভ্রভেদী সুরম্য মন্দির বহু দূর হইতে দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরটি আধুনিক হইলেও ভূমিকম্পে এরূপ ফাটিয়া গিয়াছে যে, ভয়ে কেহ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করেন না। সেই জন্য বিগ্রহ অন্যত্র রক্ষিত হইয়াছে। মন্দিরগাত্রে নিম্নলিখিত কথাগুলি ক্ষোদিত আছে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
পদাশ্রিত
শ্রীশ্রীলালজীউ প্রভুর প্রীত্যর্থে
শ্রীমন্দির প্রস্তুত হয়।
শকাব্দা—১৭৭৩

৺সহজরাম দাস কর ৺রামসুধীর দাস কর
তস্য পুত্র শ্রীঅর্জ্জুনদাস কর তস্য স্ত্রী দ্রবময়ী দাসী।

* Hindusthan Standard. 10th May 1946.



শ্রীশ্রীলালজীউর মন্দির—মহানাদ

প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক পত্র-পত্রিকা ও দ্রব্যাদি সংরক্ষণের জন্য ২২শে বৈশাখ ১৩৫৩ সালে মহানাদে "প্রাচ্য-ভবনের" উদ্বোধন হয়। উক্ত উৎসবে শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র পাল মহাশয় মহানাদ গ্রামবাসীগণের পক্ষ হইতে এই নগণ্য লেখককে যে কাব্যার্ঘ্য দেন, তাহাতে মহানাদের বহু প্রাচীন কথা লিখিত আছে। * নিম্নে উক্ত কবিতাটি উল্লিখিত হইল :

"বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের সম্পাদক ও 'হুগলী জেলার ইতিহাস' লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার মিত্র বিদ্যাবিনোদ মহোদয়কে

কাব্যার্ঘ্য

সুদূর অতীতে শুনিয়া হেথায় মহাশঙ্খের ধ্বনি
ওঙ্কার-নাদ তুলেছিলো মিলি, কত শত ঋষি মুনি ;
আবির্ভিলেন জটেশ্বরনাথ লইয়া বিরাট হিয়া,
পূজিলেন তাঁরে উদার ছন্দে পুষ্পবারি সবে দিয়া।
হেথায় কুষাণ, হেথায় গুপতো, হেথায় পাল বীর
কত শত যোদ্ধা চলে যেতো. সমুন্নত করি শির।
আজি হে সাধক! প্রচারিতে পুরাকীর্ত্তি সারা ভুবন,
পুণ্যক্ষেত্র মহানাদে উদ্বাটিলেন প্রাচ্য-ভবন।
বঙ্গজননীর সন্তানগণ যশের মুকুট পরি,
প্রত্নরত্ন উদ্ধার করুক, যত প্রাচীন স্তূপ খুঁড়ি ;
বঙ্গমায়ের রাখাল ননী দিয়াছিলেন পরিচয়,
মহেঞ্জোদাড়োর সৌধমালা প্রকাশিয়া বিশ্বময়।
স্থাপত্য আজ সাক্ষ্য দিতেছে পঞ্চগৌড়ের ভিত্তি
ধন্য হউক মঠ-মসজিদ, মোদের প্রাচীন কীর্ত্তি। *

* ভারতবর্ষ—আষাঢ় ১৩৫৩, পৃষ্ঠা ৯১

করবংশের কাছারী বাড়ীর একাংশে ভীমচন্দ্র কর, শ্রীশ্রীচন্দ্রশেখর ও শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরের জোড়া শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১২৬৭ বঙ্গাব্দে উক্ত শিবের নামে নদীয়া জেলার পীরপুরদিগর গ্রাম নিত্যপূজার জন্য খরিদ করেন। বর্ত্তমানে উক্ত দেবত্র সম্পত্তি হইতে নিত্য দেবসেবা হইয়া থাকে। শ্রীধর করবংশের প্রাচীন কুলদেবতা। এই বংশের শম্ভু কর, গিরিশ কর, শ্যাম কর ও ভীম কর প্রত্যেকে এক একটি পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহার বাঁধান ঘাট ও সুন্দর চাঁদনী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বর্ত্তমানে সুন্দর চাঁদনীগুলি ভাঙ্গিয়া তাহার কড়ি-বরগা পর্য্যন্ত মাটির দরে বিক্রয় হইতেছে—ইহাই গভীর পরিতাপের বিষয়। নিম্নে একটি চাঁদনীর গাত্রের ক্ষোদিত লিপি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

"মহানাদ নিবাসী ধার্ম্মিক জমিদার
স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র কর মহাশয়ের
স্মরণার্থে
জন্ম – ৬ আষাঢ়, সন ১২৩৭ সাল
মৃত্যু – ৩ অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ সাল
স্মৃতিস্তম্ভ
তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীআশুতোষ কর
ও শ্রীপ্যারীবল্লভ কর কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত
১৩১৪।"

মহানাদে কায়স্থ কুলোদ্ভব দত্তদের বাড়ির নিকট শিবমন্দির তাঁহাদের অতীত অস্তিত্বের কথা আজও স্মরণ করাইয়া দেয়। দত্তবংশীয়গণ কেহই বর্ত্তমানে এ স্থানে বসবাস করেন না। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে পঞ্চানন দত্ত এই শিব-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দিরটির চতুষ্পার্শ্বে ভীষণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ

এবং একটি বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ শীঘ্রই ইহাকে ভূমিস্মাৎ করিয়া দিবে। মন্দিরের একটি দোলমঞ্চ দৃষ্ট হয়; ইহাতেও যেরূপ বৃক্ষাদি জন্মিয়াছে, তাহাতে দত্তদের বাস্তু-ভিটার ন্যায় ইহাও ভূমিসাৎ হইতে আর বিশেষ বিলম্ব নাই। শিবমন্দিরের গাত্রে নিম্নলিখিত লিপি ইষ্টকে উৎকীর্ণ আছে :

নমঃ শিবায় ।
শ্রীপঞ্চানন দত্ত।
শকাব্দা ১৭০৮।

এই স্থানে অগ্নিশ্বর, অখিলেশ্বর, গৌরীশঙ্কর প্রভৃতি আরো বহু দেব-মন্দির আছে। মুসলমানদিগের নিদর্শনের মধ্যে কাজিমন ফকিরের সমাধি-স্তম্ভ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ফকিরের সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহা বিচিত্র বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। কিংবদন্তীটি এইরূপ :

বহু প্রাচীনকাল হইতে মহানাদে "জীয়ৎ-কুণ্ড" নামে একটি পুষ্করিণী ছিল। এই পুষ্করিণীর এইরূপ অলৌকিক শক্তি ছিল যে, রুগ্ন, আহত ও নিহত ব্যক্তিকে এই কুণ্ডে স্নান করাইলে সেই ব্যক্তি পুনর্জীবন লাভ করিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে শাহ সুফির সহিত পাণ্ডুয়া রাজার যুদ্ধ হয় তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই যুদ্ধে নিহত বা আহত হিন্দু সৈন্যগণ জায়ৎ-কুণ্ডের সঞ্জীবনী শক্তিতে পুনর্জীবন লাভ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পুনরায় গমন করিতে লাগিল। ফলে মুসলমান সৈন্যগণ পরাজিত হইতে লাগিল। এই সময় লোকপরম্পরায় উক্ত কুণ্ডের মৃতসঞ্জীবনী শক্তির কথা জানিতে পারিয়া নবাব উহার শক্তি বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই সময় কাজিমন ফকির নামে এক সাধু ঐ অঞ্চলে বাস করিতেন। নবাবের কথামত তিনি অসুস্থতার ভাণ করিয়া সুস্থ হইবার জন্য উক্ত কুণ্ডে স্নান করিবার আদেশপ্রাপ্ত হন এবং তিনি স্নান করিবার সময় গো-মাংস

উহাতে ফেলিয়া দিয়া উহার অলৌকিক শক্তি নষ্ট করিয়া দেন। রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন ও মুসলমানগণ পরে হিন্দু রাজাকে পরাজিত করিয়া এই স্থান অধিকার করিলে, ফকিরকে এই স্থানে সমাহিত করা হয়।

অনুচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত এই স্থান হিন্দু-মুসলমানের নিকট পবিত্র বলিয়া খ্যাত। কারণ কোন কিছু মানত করিলে, বিশেষ করিয়া বাত প্রভৃতি ব্যাধিতে কাজিমন ফকিরকে মাটির ছোট ঘোড়া দিলে ভাল হয় বলিয়া বহু দেশ দেশান্তর হইতে লোক এই স্থানে আসিয়া থাকে। প্রতি বৎসর ১লা মাঘ তাহার সমাধির সম্মুখে একটি মেলা বসিয়া থাকে।

মুসলমানদের অত্যাচারের পর বর্গীর অত্যাচারেও মহানাদের জনসাধারণ যে ভীষণভাবে উৎপীড়িত হইয়াছিল তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নে হারাণচন্দ্র গুহ রচিত 'বর্গীর-পুরাণ' হইতে দুইটি লাইন উদ্ধৃত হইল :

"চন্দ্রকোণা মহানাদ আর দিগলনগর।
খিরপাই পোড়ায় আর ত্রিপিনি সহর॥"

বৌদ্ধ যুগে কায়স্থগণের প্রভাব বিস্তারের সহিত তাহাদের মধ্যে বহু সংখ্যক ধর্ম্মকীর্ত্তি ও ধর্ম্মগ্রন্থ রচয়িতার আবির্ভাব হইয়াছিল। মহাসিদ্ধাচার্য্য বৃদ্ধ কায়স্থ টঙ্কদাস রচিত "সুবিদ সম্পুট" নামে শ্রীহেবজ্রতন্ত্র রাজ্যের টীকা দৃষ্ট হয়। মহানাদ গ্রাম নিবাসী কায়স্থ গদাধর (সিংহ) প্রায় ৫০ খানি তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাকর সিংহ বহু তান্ত্রিক গ্রন্থ ও তন্ত্রের টীকা লিখিয়া গিয়াছেন।

"দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী" গ্রন্থ রাজা ভৈরব সিংহের সময়ে রচিত হয়।

মহানাদ নিবাসী গঙ্গাদাস বসু ঘটক "কায়স্থকারিকা" গ্রন্থ রচনা করেন।

"রসমঞ্জরী" নামক রসতত্ত্ব ও কাব্যের অপূর্ব্ব গ্রন্থ মহানাদ নিবাসী কবি ভানু দত্তের রচিত।

মহানাদের রাজা পূর্ণচন্দ্র সিংহ গুরুগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে "ন্যায়লোক সিদ্ধ" নামক একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়শাস্ত্র ও শব্দ বহুল মহাভাষ্যের অর্থের অল্পতা দেখিয়া "চন্দ্র ব্যাকরণ" নামে ছয় অধ্যায়ে পাণিনির ভাষ্য রচনা করেন।

৯৯১ খৃঃ অব্দে কায়স্থ পাণ্ডুদাসের জন্য শ্রীধর, বৈশেষিক দর্শনের প্রধান ভাষ্য "পদার্থ ধর্ম্ম সংগ্রহের টীকা" লিখিয়া বৌদ্ধগণকে পর্য্যুদস্ত করেন।

শুকদেব সিংহ কুলাচার্য্য বহুতর কুলগ্রন্থ রচনা করেন। জয়হরি সিংহের "কক্ষোল্লাস" নামক একটি গ্রন্থ ছিল এবং রাঘব সিংহ বহুতর কুলগ্রন্থ রচনা করেন।

বৌদ্ধ গ্রন্থ রচয়িতা কায়স্থ চাকা দাস মহানাদবাসী ছিলেন।

১১৯০ খৃঃ অব্দে পুরুষোত্তম নামক বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ মহানাদে "ভাষাবৃত্তি" রচনা করেন।

১২০৫ খৃঃ অব্দে মহানাদ নিবাসী শ্রীধরদাস ৪৪৬ জন পূর্ব্বতন বিভিন্ন কবির রচিত শ্লোক সংগ্রহ পূর্ব্বক "সদুক্তি কর্ণামৃত" নামক পুস্তক রচনা করেন।

মহানাদের হিন্দু স্কুল স্থাপয়িতা ললিতমোহন কর "পার্ব্বতি পরিণয়" নামে একখানি নাটক রচনা করেন। নাটকখানি মুদ্রিতও হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে আর পাওয়া যায় না।

বাঙ্গালা ভাষায় গবাদি পশু চিকিৎসার পুস্তক না থাকায় শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক খণ্ডাকারে "গো-জীবন" নামক পুস্তক প্রকাশিত হইতে থাকে এবং চারি খণ্ড প্রকাশের পর বিগত ১৩৩১ সালে সকল মতে চিকিৎসা সম্বলিত পরিবর্দ্ধিত আকারে

পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠায় একখণ্ডে ৫ম সংস্করণ "গো-জীবন" প্রকাশিত হয়। এই দেশে সাঁওতাল আগমনের পর তাহাদের ভাষা শিখিবার বলিবার ও বুঝিবার সুবিধার্থে সন ১৩২১ সালে "সাঁওতালী-ভাষা" নামক আর একখানি পুস্তক রচিত হয়। এক্ষণে উহার ২য় সংস্করণ চলিতেছে।



শ্রীশ্রীচন্দ্রশেখর ও ভুবনেশ্বরের জোড়া মন্দির

শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র পাল প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক বহু প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তাঁহার আবিষ্কৃত দ্রব্যাদি সারদাচরণ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

বর্দ্ধমানের মহারাজা ঘনশ্যাম রায় কর্পূরও মহানাদ একবার লুণ্ঠন করেন। তারপর কালাপাহাড়ের অত্যাচার হইতেও যে এইস্থান অব্যাহতি পায় নাই, তাহা বিভিন্ন পুষ্করিণী হইতে প্রাপ্ত ভগ্ন দেবদেবীর

মূর্ত্তিগুলি হইতেই প্রমাণিত হয়। মহানাদের কর ও নিয়োগী বংশ এবং অন্যান্য ধনবান ব্যক্তিগণ এই স্থানের আনন্দকোলাহল বহুদিন নিবৃত্ত হইতে দেন নাই, কিন্তু ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের "বর্দ্ধমানের জ্বর" নামক মহামারী ১০৬০ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে প্রথম দেখা দেয় এবং ফলে বহুশত লোকের ইহাতে প্রাণ বিয়োগ হয়। *

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর বঙ্গদেশে ভীষণ ঝড় হয় এবং তাহার ফলে ৪৭৮০০ জন লোকের জীবনান্ত ঘটে এবং ইহাতে এত সম্পত্তি ও অর্থহানি হইয়াছিল যে, সরকার তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। হুগলী শ্রীরামপুর, কালনা, প্রভৃতি অঞ্চলে ঝড়ের বেগ এবং বৃষ্টিপাত অধিক হইয়াছিল। হুগলী এবং কালনার মধ্যস্থিত মহানাদের যে কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। নিম্নে একটি সরকারী গ্রন্থ হইতে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিলাম :

"Here during the night of the 4th it raged with great forces and hence the centre of the storm appears to have travelled northerly, inclining eastward along the right bank of the Hooghly at a pace varying from 8 to 26 miles an hour. The wave rose in some places to a height of 30 feet, sweeping over the strongest embankments, flooding the crops with salt water carrying away entire village and its effect was more disastrous than the voilent wind. The gale was felt severly at Hooghly, Serampore, Kalna, Krishnagar, Rampur Boalia, Pabna and Bogra." †

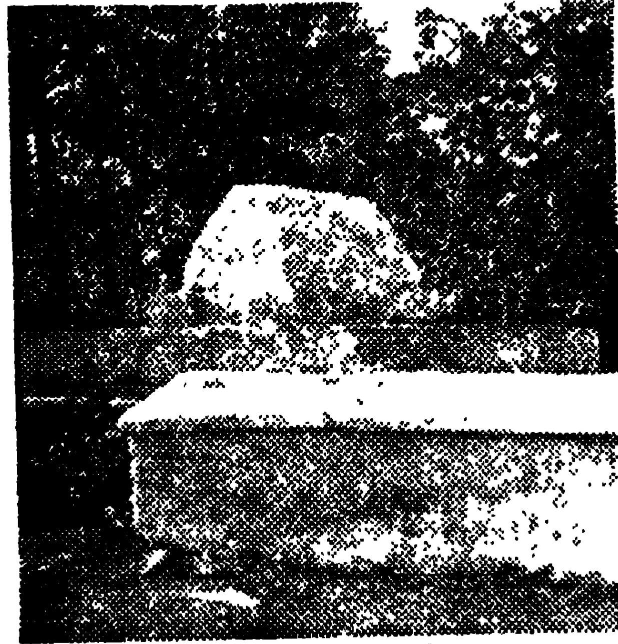
---

* Hunter's Statistical Account of Bengal and Dr. J. Elliot's Report on Epidemic Fever.

† Bengal under the Lieutenant Governors,—By C. E. Buckland.

এতদ্ব্যতীত প্রতি বৎসর ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বর এই অঞ্চলে দেখা দেয় এবং মহানাদের লোকসংখ্যা সেইজন্য দ্রুত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। *

মহানাদ পতনের দিক ধাবিত হইবার পূর্ব্বে 'ফ্রি চার্চ মিশন' এই স্থানে আগমন করেন এবং নিয়োগীদের নিকট হইতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে দলিল করিয়া ডাঃ আলেকজাণ্ডার ডাফ, ডব্লিউ ফাইফ এবং রেভারেণ্ড জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কিছু স্থান সংগ্রহ করেন এবং "ফ্রি চার্চ মিশন স্কুল" নামক



কাজিন ফকীরের সমাধি স্তম্ভ

শিক্ষালয় খোলা হয়। পূর্ব্বোক্ত দলিলে মহানাদে কোন গির্জ্জা নির্ম্মাণ বা মৃত ব্যক্তিকে সমাহিত করা হইবে না, এইরূপে সর্ত্ত ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে এই স্থানে উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে উক্ত মিশন পরিচালিত এণ্ট্রান্স স্কুল ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে উঠিয়া যায় এবং বর্ত্তমানে এইস্থানে মাত্র একটি মাইনর স্কুল বিদ্যমান আছে।

* Hunter's Anuals of Rural Bengal, 1897

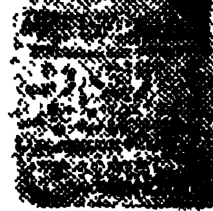
ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মহানাদ খনন করিয়া বহু প্রাচীন দ্রব্যাদি উদ্ধার করিয়াছেন। সেই সমস্ত জিনিস কলিকাতার 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে' রক্ষিত আছে। কয়েকটি স্বুবর্ণ মুদ্রাও এই স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। নিম্নে করেদের লক্ষ্মীর হাঁড়িতে রক্ষিত এবং স্বর্গীয় জিতেন্দ্রনাথ কর কর্ত্তৃক প্রাপ্ত একটি মুদ্রার বিষয় উল্লেখ করিতেছি।

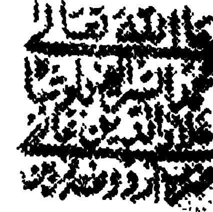
এই মুদ্রাটি চতুষ্কোণ এবং ইহার ওজন এক ভরি এক আনা। আলাউদ্দিন তাঁহার খুল্লতাত জালালুদ্দিনকে হত্যা করিয়া ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হন এবং ১৩১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সেনাপতি কর্ত্তৃক তিনি নিহত হন। মুদ্রাটি তাঁহার সময়ের এবং আরবী অক্ষরে লিখিত কথাগুলির নিম্নলিখিত ভাবে পাঠোদ্ধার করা হইয়াছে :

"হজরত ওমর গসমান
আল আদিন
ইয়া আল্লা মহাম্মাদর রশুল্লাল্লা
আবুবক্কার আলি
সিদ্দিক আলগাজী
ইয়া আল্লা তায়ালা
মহম্মদ আলাওদ্দিন
আলগাজী, আশরফল
বাদসা সারবে আরদো
তায়া আফেরিন"

হুগলী জেলা বলিয়া কোন জেলা পূর্ব্বে ছিল না; ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম হুগলী জেলার সৃষ্টি হইলেও, মহানাদ পূর্ব্বমত বর্দ্ধমানেই ছিল, পরে ইহা হুগলীর মধ্যে আসে। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভেও মহানাদ একটি মহকুমা ছিল, কিন্তু কালের প্রভাবে এই স্থান আজ একটি নগণ্য পল্লীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। মহানাদের সমৃদ্ধির সময় কাগজ, নীল

ও চূণের কাজের জন্য এই স্থান সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে সমস্ত স্থানই অরণ্যময় হইয়া গিয়াছে। সেই নিবিড় অরণ্য মধ্যে সুবৃহৎ অগণিত মন্দিররাজি ও প্রাসাদোপম হর্ম্ম্যশ্রেণীর ভগ্নাবশেষ দণ্ডায়মান থাকিয়া বঙ্গদেশের গ্রামগুলি পূর্ব্বে যে কিরূপ ছিল তাহাই আজ ঘোষণা করিতেছে, আর বিস্মিত পথিকের মনে উদয় হইতেছে, মাইকেলের মেঘনাদ বধ কাব্যের সেই কথা—



কর বংশের লক্ষ্মীর হাঁড়িতে রক্ষিত সুবর্ণ মুদ্রা

"কুসুমদামসজ্জিত, দীপাবলীতেজ
উজ্জলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী।"

গড়-মান্দারণ

আরামবাগ মহকুমায় গোঘাট থানার অন্তর্গত গড়-মান্দারণ একটি প্রাচীন স্থান। আরামবাগ শহরের চারি ক্রোশ পশ্চিমে এই স্থানটি অবস্থিত। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার দুর্গেশ নন্দিনীকে এই মান্দারণের গড়ে বসাইয়া এই স্থানের ঐতিহাসিকত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন : "মান্দারণ এক্ষণে ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু তৎকালে ইহা সৌষ্ঠবশালী নগর ছিল। গড় মান্দারণে কয়েকটি প্রাচীন দুর্গ ছিল এই জন্যই তাহার নাম গড় মান্দারণ হইয়া থাকিবে। নগর মধ্যে আমোদর নদী প্রবাহিত, এক স্থানে নদীর গতি এতাদৃশ বক্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তদ্দ্বারা পার্শ্বস্থ একখণ্ড ত্রিকোণ ভূমির দুই দিক বেষ্টিত হইয়াছিল ; তৃতীয় দিকে মানব-হস্ত লিখিত এক গড় ছিল। এই ত্রিকোণ ভূমিখণ্ডের অগ্রদেশে যথায় নদীর বক্রগতি আরম্ভ হইয়াছে তথায় এক বৃহৎ দুর্গ জল হইতে আকাশপথে উত্থান করিয়া বিরাজমান ছিল। অট্টালিকা আমূল শিরঃ পর্য্যন্ত কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত ; দুই দিকে প্রবল নদীপ্রবাহ দুর্গ মূল প্রহত করিত। অদ্যাপি পর্য্যটক গড় মান্দারণ গ্রামে এই আয়াস লভ্য দুর্গের বিশাল স্তূপ দেখিতে পাইবেন ; দুর্গের নিম্নভাগমাত্র এক্ষণে বর্ত্তমান আছে, অট্টালিকা কালের করাল স্পর্শে ধুলিরাশি হইয়া গিয়াছে। তদুপরি তিন্তিড়ী, মাধবী প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতা সকল কাননাকারে বহুতর ভুজঙ্গ ভল্লুকাদি হিংস্র পশুগণকে আশ্রয় দিতেছে। নদীপারে অপর কয়েকটা দুর্গ ছিল।"

মান্দার নামক এক প্রকার তরু হইতে এই স্থানের নাম মান্দারণ হইয়াছে বলিয়া ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু, গড়-মান্দারণের 'অপর নাম ক্ঠিুর-গড় ; মুসলমানদিগের

আমলে এইস্থানে মৃত্তিকা নির্ম্মিত গড় ছিল, বলিয়া লিখিয়াছেন। * সুদূর অতীতকালে ইহা হিন্দু রাজার রাজধানী ছিল; রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত বর্ত্তমানে আর বিশেষ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। আরামবাগ হইতে বিস্তৃত ভিকদাসের মাঠের পর নবাসন গ্রামের নিকটে যে জরিপ স্তম্ভ আছে, তথা হইতে মান্দারণের দুর্গের প্রাকার আরম্ভ হইয়াছে। এই প্রাকার প্রায় চার-পাঁচ মাইল হইবে এবং উচ্চতা স্থানে স্থানে বিশ ফুট হইতে তিরিশ ফুট পর্য্যন্ত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। আমোদর নদী অদ্যাপি এই দুর্গমূল ধৌত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইলেও পূর্ব্বকার নিদর্শন এখন কিছুই নাই।

হোসেন শাহার সেনাপতি ইসমাইল গাজি মান্দারণের হিন্দু-রাজাকে পরাজিত করিয়া এই স্থানে আধিপত্য বিস্তার করেন। এই স্থানে হজরৎ ইসমাইলের সমাধির উপর রক্ষিত শিলালিপিতে "৯০০ হিজরি" (অর্থাৎ ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দ) উৎকীর্ণ আছে। জনশ্রুতি এইরূপ যে ইসমাইলের দরগা, বর্দ্ধমান জয়ের চিহ্ন স্বরূপ শোভা সিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।†

বঙ্গদেশে হুগলী জেলার গড়-মান্দারণে ইসমাইলের দেহ এবং রঙ্গপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার অন্তর্গত কাটাদুয়ার গ্রামে তাঁহার মস্তক সমাহিত আছে বলিয়া স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন। তিনি কাটাদুয়ার গ্রামে ইসমাইল গাজির সমাধি স্থানে একজন ফকিরের নিকট "রিসাদ-উশ-শুদাহা" নামক একখানি পারস্য গ্রন্থ আবিষ্কার করেন; গ্রন্থখানি উক্ত স্থানে রক্ষিত আছে। উক্ত গ্রন্থানুসারে মান্দারণের রাজা গজপতি বিদ্রোহী হইলে, ইসমাইল রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরিত হয় এবং তিনি রাজা গজপতিকে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন।

* বিশ্বকোষ, নগেন্দ্রনাথ বসু ৫ম ভাগ, পৃষ্ঠা—১০৮

† Medinipore District Gazeeteers. Page 167.

কিন্তু পরে ইসমাইল ঘোড়াঘাটে হিন্দু সেনাপতি ভান্দসী রায়ের চক্রান্তে নিহত হন। উক্ত সময়ে গড় মান্দারণ গঙ্গবংশীয় রাজাগণের অধিকার ভুক্ত ছিল বলিয়া পূর্ব্বোক্ত পুস্তক হইতে জানা যায়। সরকার মান্দারণের অন্তর্গত হানিয়া নামক স্থানে হীরক পাওয়া যাইত বলিয়া আবুল ফজল আইন-ই-আকবরীতে লিখিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র রাজা বীরেন্দ্র সিংহকে মান্দারণের অধিপতি বলিয়া দুর্গেশ-নন্দিনীতে লিখিয়াছেন; কিন্তু উক্ত নামটি কল্পিত বলিয়া আমার বিশ্বাস। কারণ যে সময়ের কথা তিনি লিখিয়াছেন, সেই সময় মান্দারণে মুসলমান ফৌজদার ছিল এবং রাজা টোডর মল পাঠান দলপতি দাউদ খাঁর ন্যায় মান্দারণে আসিয়া কিছু কাল অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি মান্দারণ হইতে মেদিনীপুর চলিয়া যান এবং পরে মেদিনীপুর হইতে চেতুয়ায় গিয়া অপেক্ষা করেন। † সুতরাং সেই সময় মান্দারণ বীরেন্দ্র সিংহ নামক কোন হিন্দু রাজার অধিকার থাকিলে, ইতিহাসে নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইত। একমাত্র মান্দারণের দুর্গ, শৈলেশ্বর শিব এবং মানসিংহের পুত্র জগৎ সিংহের নাম ব্যতীত সমস্তই স্বকপোলকল্পিত।

মান্দারণ হইতে মিঃ জন, বীমস কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত শিলালিপি পারস্য ভাষায় লিখিত এবং তাহাতে মুসলমান ফৌজদারদের কথা লিখিত আছে; কোন হিন্দুর কথা নাই। মান্দারণ দেখিলে উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যের বিজয় প্রয়াসী রাজাদের আক্রমণ নিবারণার্থে, কোন হিন্দুরাজার দ্বারা যে প্রাসাদ ও দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই প্রাসাদ ও দুর্গ নিরাপদে রাখিবার জন্য, চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর ও গভীর

---

* বাঙ্গলার ইতিহাস ২য় ভাগ পৃঃ ২২২।

† Stewart's History of Bengal, Page 139.

খাল খনন করা হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে হিন্দু নরপতির এই কর্ম্মক্ষেত্র বন্য পশুপক্ষীর লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

মান্দারণের একটি তোরণে পারস্য ভাষায় নিম্নোক্ত কথাগুলি উৎকীর্ণ ছিল:

"বিঘাভর জমিন—কুলাভর ধান"

অর্থাৎ এক কুলা মাত্র ধান এক বিঘা জমির রাজস্ব ছিল। মুসলমান রাজত্বকালেও সরকার মান্দারণের মাত্র কুড়ি,পঁয়ত্রিশ ও পঁচাশী টাকা যথাক্রমে রাজস্ব ছিল বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব মান্দারণকে বীরভূমের অন্তর্গত বলিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহা ভ্রমাত্মক; কারণ সরকার মান্দারণের অন্তর্গত স্থান সমূহের নাম ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত গ্রামগুলি পরীক্ষা করিলে মান্দারণ যে বীরভূমে নয় তাহাই প্রমাণিত হইবে।

মান্দারণ বর্ত্তমানে মুসলমানদের দ্বারা অধ্যুষিত একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম; ইহার দুই মাইল দূরে পশ্চিমপাড়া নামক গ্রামে 'ধর্ম্মমঙ্গল' প্রণেতা খেলারাম চক্রবর্ত্তী এবং চার মাইল দূরে বালডিহা গ্রামে মাণিক গাঙ্গুলী জন্মগ্রহণ করেন।*

ইসমাইল গাজির সমাধি সম্বন্ধে সরকারী গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইল:

TOMB OF SHAH ISMAIL GHAZI GHANI LASHKAR. GARH-MANDARAN

In this place, which is the site of a mud fortress of by gone times, there is a brick built tomb, supposed to contain the relics of Shah Ismail Ghazi Ghani Lashkar, a Muhammedan saint held in great veneration by the Muhammedan residents of the place. There is likewise a stone lined entrance leading into the fortress. †

* প্রবাসীতে শ্রীপরমেশ প্রসন্ন রায় লিখিত "গড়-মান্দারণ" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† List of Ancient Monuments in Bengal, Page 48.

সিঙ্গুর

বর্ত্তমানে সিঙ্গুর হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর মহকুমার অধীন একটি গণ্ডগ্রাম হইলেও প্রাচীনকালে ইহা সিংহবাহুর রাজধানী সিংহপুর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল এবং বহু প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতিবর্গ এই স্থানে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। এই স্থান কলিকাতা হইতে মাত্র একুশ মাইল দূরে অবস্থিত এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের তারকেশ্বর শাখায় সিঙ্গুর নামে বর্ত্তমানে একটি ষ্টেশন হইয়াছে।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৭০০ অব্দে মহারাজ সিংবাহু সিংহপুরে রাজত্ব করিতেন বলিয়া ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয়সিংহ অবাধ্যতাদোষে পিতা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইলে তিনি সাতশত যুদ্ধকুশল অনুচর লইয়া সমুদ্রযাত্রা করেন এবং তাম্রপর্ণি দ্বীপে অবতরণ করিয়া তথাকার অধিবাসিগণকে পরাস্ত করেন ও লঙ্কাদ্বীপ অধিকার করেন। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

"একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়।"

বিজয়সিংহ তাম্রপর্ণি বা লঙ্কাদ্বীপ অধিকার করিয়া তত্রত্য রাজকন্যাকে বিবাহ করেন এবং তথাকার রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। বিজয়সিংহ লঙ্কাদ্বীপের রাজা হইবার পর উক্ত দ্বীপের নাম সিংহল নামে রূপান্তরিত হয়। "মহস্থার্যবংশ ভিক্ষু" নামক গ্রন্থ হইতে বিজয়সিংহের সম্বন্ধে বহু কথা জানিতে পারা যায়; নিম্নে উক্ত গ্রন্থ হইতে কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল :

"লঙ্কাদ্বীপে আগত প্রথম রাজকুমার যক্ষলোপকারী বিজয় বাহু বঙ্গ ও

কলিঙ্গদেশের মধ্যস্থিত রাঢ়দেশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন; ইনি সিংহবংশীয় অনুরোধকুমার শাক্যবংশীয়। তাঁহাকে অনুরোধপুর দান করা হইয়াছিল।”

সিংহলের, পালী ভাষায় লিখিত ‘মহাবংশ’ নামক ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, বঙ্গদেশীয় কোন এক রাজার সুপ্রদেবী নামে একটি সুন্দরী কন্যা ছিল; যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও তাহার বিবাহ না হওয়ায়, তিনি পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন এবং পথিমধ্যে এক সার্থপতিকে দেখিয়া রাজকুমারী তাহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সার্থপতির ঔরসে ও সুপ্রদেবীর গর্ভে সিংহবাহু জন্মগ্রহণ করেন। চীন পরিব্রাজক হুয়েন সিয়াং সার্থপতিকে জম্বুদ্বীপের মহাবণিক ও সিংহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

রাজা সিংহবাহু রাঢ়দেশের অন্তর্গত শতযোজনব্যাপী এক অরণ্য পরিষ্কার করিয়া সিংহপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই সিংহপুর রাজ্য পালী ‘মহাবংশ’ নামক গ্রন্থে ‘লাউরটু’ নামেও বর্ণিত আছে। সিংহরণ নদীর তীরে সিংহবাহুর রাজধানী ছিল এবং আজও এই ক্ষীণা নদীর চিহ্ন সিঙ্গুরে দেখিতে পাওয়া যায়।

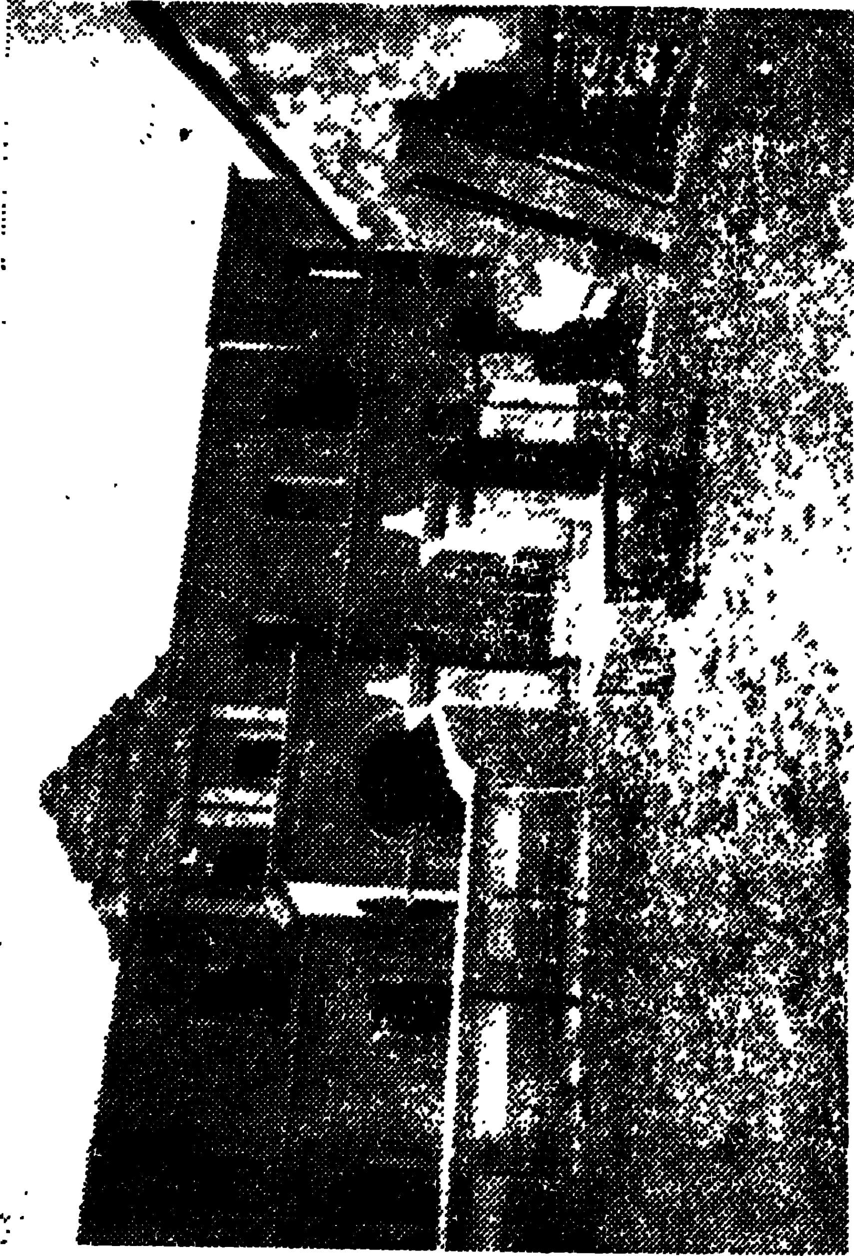
সুপ্রসিদ্ধ কবি কালিদাস সিংহপুর হইতে সিংহলে গমন করিয়া তত্রত্য রাজ-কবি কুমার দাসের রচিত শ্লোকের দুইপদ পূরণ করিয়া বারাঙ্গনা হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। নিম্নে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইল:

“সিয় তাঁবরা, সিয় তাঁবরা, সিয় সেবনী।
সিয় সমুরা নিদিন লেবাতন সেবনী॥”

মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ উক্ত শ্লোকটির পাঠোদ্ধার করিয়া অনুমান করিয়াছেন যে, উহা যদি ষষ্ঠ শতাব্দীর বাঙলা হয়, তাহা হইলে হুগলী জেলা সংস্কৃত ও প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে মহামূল্য মণি প্রসব করিয়াছিল বলিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। নিম্নে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পাঠোদ্ধার উদ্ধৃত হইল:

"ধন কোবরা তল নোতনা রোটন্ বনী।
মন দেদরাপণ গলবা গিয়ে সুবেণী ॥"

সিংহপুরের নাম বহু প্রাচীন গ্রন্থাদিতে লিখিত আছে; 'দীপবংশ'



মদনগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়—বড়া

নামক গ্রন্থে "সিংহবাহুর পুত্র ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিজয় সিংহ লাল প্রদেশের

অন্তর্গত সিংহপুর নামক স্থান হইতে অনুচরবর্গ সহ সিংহলদ্বীপে উপনীত হইয়া তথায় একটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে।"

সিংহপুরে ধর্ম্মাদিত্য, ক্ষেমেশ্বর, হরিবর্ম্মা প্রভৃতি কয়েকজন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ব্রজসিংহের নামাঙ্কিত একটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল ; রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটিতে উক্ত মুদ্রাটি রক্ষিত আছে ; মুদ্রাটি সিংহপুরের কোন রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রা বলিয়া ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মুদ্রাটির মধ্যে সিংহের প্রতি-মূর্ত্তি আছে এবং ব্রজসিংহ এই নামটি উপরে লিখিত আছে—অপর দিকে একটি ত্রিশূল অঙ্কিত আছে। *

কালচক্রে সিংহপুর সিঙ্গুরে পরিণত হইলেও, প্রাচীন গ্রন্থাদিতে সিঙ্গুরের পশ্চিম দিকে রাজা হরিপাল রাজ্য স্থাপন করেন বলিয়া "দিগ্বিজয় প্রকাশে" লিখিত আছে। সিঙ্গুর প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়াই নির্দ্দেশার্থে "সিঙ্গুরের পশ্চিমে" অবস্থিত এইরূপ লিখিত আছে। নিম্নে 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' হইতে দুইটি লাইন উদ্ধৃত হইল :

"জ্যেষ্ঠঃ সিঙ্গুর পশ্চিমে স্বনামং বসতিং কৃতঃ।
হরিপালো মহাগ্রামো হট্টব্যাপীসমন্বিতঃ॥ ৬৭৯।"

পররর্ত্তীকালে ঘটকগণের কুলজিতেও সিংহপুরের উল্লেখ দৃষ্ট হয় ; নিম্নে 'বিশ্বকোষ' সম্পাদক স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিত 'আদিশূর' নামক প্রবন্ধে উদ্ধৃত প্রাচীনকুল-পরিচয় বিষয়ে কবিতাটি লিখিত হইল :

"আকনাতে গেল ঘোষ, মাহিনাতে বসু।
বড়িশা রহিলা মিত্র, দুঃখ রহে কিছু॥
বলিতে রহিলা দত্ত প্রতাপ প্রচুর।
ব্রহ্মগ্রামে গেল সেন, দেও চিত্রপুর॥

* Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, 1870

সিংহপুরে রয় সিংহ, হরিপুরে দাস।
পানিহাটি গত চন্দ্র,গুহ বঙ্গবাস ॥" *

বর্ত্তমান সিংহবংশীয় কেহ সিঙ্গুরে বসবাস না করিলেও, লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে, দশশালা বন্দোবস্তের অব্যবহিত পরেই সিঙ্গুরের দ্বারকানাথ সিংহ যে বোর্ড হইতে জমিদারী ক্রয় করিতে গিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে হাণ্টার সাহেব যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছিঃ

"The principal purchasers of the lats sold on the Board were Dwarka Nath Singh of singur, Chhaku Singh of Bhastara, the Mukherjies of Janai and Banerjies of Talinipara". †

পাঠান রাজত্বকালে সিঙ্গুরে বহু হিন্দুস্থানী আসিয়া বসবাস করেন; তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সেনাবিভাগে কার্য্য করিতেন এবং বৃত্তিস্বরূপ ভূমি ভোগ করিতেন। এতদ্ভিন্ন বহু ভদ্র গৃহস্থ পশ্চিম হইতে এই অঞ্চলে আসিয়া বাস করেন। ইহাদের মধ্যে সিঙ্গুরের বাবুরা বিশেষ প্রসিদ্ধ। কেবল দানশীলতা নয়, ডাকাতের দল রাখিবার জন্যও ইহাদের বিশেষ নাম ছিল। শতবৎসর পূর্ব্বেও সিঙ্গুরের নবাব বাবুকে জানিত না বা তাহার নাম শুনে নাই, এইরূপ লোক বঙ্গদেশে খুব অল্পই ছিল। নবাব বাবুর প্রকৃত নাম শ্রীনাথ রায়। বহুদিন হইতে ডাকাতির জন্য সিঙ্গুর প্রসিদ্ধ ছিল এবং এই স্থানের ডাকাতে-কালীর নিকট প্রতি অমাবস্যায় নরবলি দেওয়া হইত। অদ্যাপি জঙ্গলাকীর্ণ বৃহৎ ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে কালীমাতার ভীষণ মূর্ত্তি বিরাজিতা আছেন দেখিতে পাওয়া যায়।

নর-বলি কেবল যে আমাদের এই দেশে প্রচলিত ছিল তাহা নহে, প্রাচীনকালে পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই প্রথা ছিল। প্রাচীন মিশরীয় সমাজে নরবলী হইত সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। ডায়ডোরাস বলেন,

* পঞ্চপুষ্প—আশ্বিন ১৩৩৭

† Statistical Account of Bengal.

যে, মিশরের নৃপতিগণ লোহিতকেশ লোকদিগকে ওসিরিস দেবতার নিকট উৎসর্গ করিয়া বলি দিতেন। * মিশরের অপেক্ষা সভ্যতায় উন্নত রোমীয় সমাজেও বিজিত বন্দিগণকে হত্যা করিয়া রোমানরা আনন্দ উৎসব করিতেন। বহুকাল এই প্রথা প্রচলিত ছিল কিন্তু রাজকীয় আইন দ্বারা এই প্রথা রোমীয় সমাজ হইতে রহিত করা হইয়াছে। † এতদ্ভিন্ন গ্রীক সমাজে ও এথেন্স নগরে এপেলো দেবতার পূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী বলি দেওয়া হইত। ‡ সুতরাং বঙ্গদেশের কাপালিকগণই যে কেবল নরবলি দিত, তাহা যেন কেহ মনে না করেন।

ডাকাতির জন্য সিঙ্গুর এবং হরিপাল বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। এই ডাকাতি দমন করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও, ইংরাজ সরকার কোন কুলকিনারা করিতে পারেন নাই। ইহা রোধ করিবার জন্য ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে একটি ডাকাতি কমিশন (Dacoity Commission) প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত কমিশনের রিপোর্ট হইতে নিম্নে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিতেছি।

"Gang robbery or dacoity is one of the most prevalent of Indian crimes. Armed with clubs, swords and torches they attack a defenceless family or waylay some unguarded boat...but in this country crime is difficult to reach, more difficult still to erradicate. We have to deal with a people who are too apathetic to exert themselves individually for the suppression of the crime, and with landowners, who too often are more interested in sheltering the criminal than in giving him up to Justice". (Bengal under the Lieutenant Governors. Vol. I. p. 173).

---

* Diodo 1, Page—88
† Pliny—XXX, Page 3
‡ Indo-Aryans, Vol—11, Page 53

সিঙ্গুরের বাবুদের পূর্ব্ব হইতেই ডাকাতির প্রসিদ্ধি ছিল; কেবল সিঙ্গুরের বাবুরা নহেন বাঙ্গলা দেশের বর্ত্তমান বহু প্রসিদ্ধ বংশের পূর্ব্ব-



প্রসন্নময়ী দাতব্য চিকিৎসালয়—বড়া

পুরুষগণ তৎকালে যে ডাকাত ছিলেন, তাহা আজ আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন "আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ের অনেক জমিদারই দস্যু ছিলেন!" যাহা হউক

সিঙ্গুরের বাবুদের বংশে নবাব বাবু ডাকাতদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া, সন্দেহে ঠগী দমনের বড় কর্ত্তা ওয়াকোপ সাহেবের তিনি সুনজরে পড়িলেন এবং সেইজন্য হুগলী জেলে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়।

পাঞ্জাব প্রদেশের সেরিনগাঁও নামক পল্লী হইরে নবাব বাবুর পূর্ব্বপুরুষ গোপীনাথ ওয়ালী বঙ্গদেশে ব্যবসা করিতে আসেন এবং সিঙ্গুরের তৎকালীন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি মহাতাব বাবুর বাড়ীতে বিবাহ করিয়া এই স্থানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন তিনি ইহারা জাতিতে ক্ষত্রিয়। গোপীনাথের পুত্র দ্বারিকানাথ ওয়াহী, সিঙ্গুর জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা ; দান ও বিবিধ ক্রিয়া কলাপাদি করিয়া তিনি তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। দ্বারিকানাথ সিঙ্গুরের নিকটে জলাঘাঠা নামক স্থানে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। সিঙ্গুরের সপ্ত-শিব-মন্দির ও অন্যান্য বহু দেবালয়ও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন।

দ্বারিকানাথের মাতুলবংশ অর্থাৎ মহাতাব বাবুর বংশের উপর, বঙ্গ-দেশের এই অঞ্চলে বর্গী নিবারণের ভার তৎকালীন নবাব কর্ত্তৃক অর্পিত হইয়াছিল এবং সেই জন্য তাহাদের বহু লাঠিয়াল রাখিতে হইত। বহুবার এই স্থান হইতে তাহারা বর্গী বিতাড়ন করেন বলিয়া নবাব তাহাদিগকে "থানদার" উপাধি দেন। বর্ত্তমানে এই বংশ বিলুপ্ত লইয়া যাইলেও, অদ্যাপি তাহাদের ভদ্রাসন "থানদার বাবুদের ভিটা" বলিয়া সিঙ্গুরে প্রসিদ্ধ।

দ্বারিকানাথের চতুর্থ পুত্র (ন' ছেলে) শ্রীনাথ রায় বাবুয়ানার জন্য 'নবাব বাবু' (ন' বাবু হইতে, নবাব বাবু) বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার ন্যায় সুপুরুষ ব্যক্তি তৎকালে বঙ্গদেশে খুব অল্পই ছিল। তাঁহার জমিদারী মধ্যে মেদিনীপুর মণ্ডলঘাট পরগণায়, প্রজাবৃন্দের সুবিধার জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে তিনি রূপনারায়ণ নদীর বাঁধ তৈয়ারী করিয়া দেন। অদ্যাপি উক্ত বাঁধ 'নবাব বাবুদের বাঁধ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহার সময়ে তারকেশ্বরে মোহান্ত স্থাপনের সুত্রপাত হয় এবং তিনি বহু বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও, তিলকদান

পূর্ব্বক বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কমললোচন গিরিকে, তারকেশ্বরের গদিতে বসান। বঙ্গদেশে বর্দ্ধমানের মহারাজার পরেই তাহার স্থান ছিল এবং অপ্রতিহত প্রভাবে তিনি শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। বাৎসরিক প্রায় দশলক্ষ টাকা তাহার জমিদারির আয় ছিল। তাহার বহু লাঠিয়াল ছিল এবং ইংরাজ সরকার সেইজন্য তাহাকে ডাকাতদের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া জেলে আবদ্ধ রাখেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ; তিনি হুগলী জেলেও মহা ধুম-



সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রমুখ-সদন—সিঙ্গুর

ধামের সহিত সর্ব্বপ্রথম কালীপূজা করেন এবং পূজার প্রসাদ হুগলী জেলার সর্ব্বত্র বিতরণ করিয়াছিলেন। হুগলী জেলার সাহেবরা পর্য্যন্ত কালীমাতার প্রসাদ খাইয়া বিশেষ তৃপ্ত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ইহাদের ভগ্নাবস্থা হইলেও গড়খাত সমন্বিত প্রাসাদোপম অট্টালিকা, পুরাতন সপ্ত-শিব-মন্দির, অতিথি সেবার সুবিস্তৃত আঙ্গিনা এখনও ইহাদের পূর্ব্ব

সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। শ্রীযুক্ত অবনীনাথ বর্ম্মণ বর্ত্তমানে এই বংশের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি।

সিঙ্গুরের সহিত বঙ্গ সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এইস্থান প্রসিদ্ধ গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা দলের সঙ্গীত রচয়িতা ভৈরব হালদার বসবাস করিতেন এবং তিনি সিঙ্গুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার গানগুলি অতি সহজ, সরল ও সুললিত ভাষায় রচিত হইত এবং ইতরভদ্র সকল শ্রেণীর লোক তাহার গান শুনিয়া বিমোহিত হইত। তিনি স্বয়ং গান করিতেন এবং তাহার কণ্ঠও অতি সুন্দর ছিল। তাঁহার রচিত গানের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতে খাঁটি বাঙ্গলা ভাষায় ভৈরব হালদার কিরূপ রচনা করিতেন তাহাই দেখা যাইবে।

মাসি, তোমার হদিশ পাওয়া ভার।
নও কাজের কাজী, ভোজের বাজী, সকল ফক্কিকার॥
বরের মাসী, কনের পিসী সেইরূপ প্রকার
দুপক্ষতে আজ যাও সমানে ঢুকাঠি বাজাও
ভানুমতী খেলাও মাসী দেখতে চমৎকার।
কখনও হও সত্তী পীর কখনো পেঁড়োর ফকির
কখনও বা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার॥
বেড়াও তুমি যোগে যাগে
হাড়ে তোমার ভেলকি লাগে
মুখের চোটে ভূতও ভাগে কথায় হীরার ধার।
কখনও হও সিদ্ধির ঝুলি
কখনও শ্যামের মুরলী
কথাই সর্ব্বস্ব তোমার কাজে পাওয়া ভার।
যখন যাহার কাছে থাক্ তখনি হও তার॥

এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত "যাদু এমন কথা কেন বলিলি" নামক গানের প্রথম দুই-তিন লাইন আজও রাখাল বালকগণ মাঠে গরু চরাইতে চরাইতে গাহিয়া থাকে :

"যাদু এমন কথা কেন বলিলি
ভোরের বেলা সুখের স্বপন
এমন সমায় আমায় জাগালি।"

ভৈরব হালদার সম্বন্ধে ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহার কয়েক লাইন উল্লিখিত হইল :

"In Sakher Yatra none achieved so much success as Gopal Ooray. His fame spread from one end of Bengal to the other. He was invited almost from every quarter. The songs of his Vidya-Sunder Pala are still sung in Bengal. Gopal got songs composed in simple language by one Bhairab Haldar of Singur and got them also set to tune by him. With those songs he charmed his audience. The songs were so composed that they were greatly used for dancing." *

বর্ত্তমানে সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত ছয়টি ইউনিয়ন বোর্ড আছে। এই ছয়টি গ্রামের নাম সিঙ্গুর, নসীবপুর, গোপালনগর, বলরামবাটী, আনন্দনগর ও বড়া। এই গ্রামগুলির মধ্যে বহু জমিদার বংশ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তির বসবাস আছে ; তন্মধ্যে সিঙ্গুর ইউনিয়নের মধ্যে অপূর্ব্বপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ্ স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এবং বড়া ইউনিয়নের মধ্যে স্বর্গীয় রায়-সাহেব নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ তাঁহারা দুইজনেই স্ব স্ব পিতামাতার স্মৃতিরক্ষার্থে পল্লীর উন্নতিকল্পে বিদ্যালয়, হাঁসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন করিয়া হুগলী জেলাবাসীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বঙ্গের প্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেটের'

* The Indian Stage. Vol. 1. Page 130.

সম্পাদক গঙ্গাধর ভট্টাচার্য, ছাপাখানার জন্য প্রথম কাঠের অক্ষর প্রস্তুতকারক পঞ্চানন কর্ম্মকার 'রায়-রায়ন' (দিনেমার গভর্ণর তাহাকে 'রায়-রায়ন' উপাধি দিয়াছিলেন), প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার কবি রসিকচন্দ্র রায় অস্ত্রচিকিৎসায় সুনিপুণ রামপুরহাট রেলওয়ে হাঁসপাতালের সুবিখ্যাত ডাক্তার কেদারনাথ মিত্র এবং ইষ্টবেঙ্গল ও আসামের কেমিক্যাল একজামিনার রায় সাহেব ডাঃ প্রিয়নাথ বসু প্রভৃতি বহু কৃতি সন্তান বড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া হুগলী জেলাকে ধন্য করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না।

সিঙ্গুরের ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন; কারণ তিনিই প্রসিদ্ধ কর্ম্মবীর সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের পিতা। রাজেন্দ্রনাথ ভবানীপুরে থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন এবং তৎকালে ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক কলিকাতার শ্রেষ্ঠ ডাক্তার বলিয়া প্রখ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের জীবনের প্রধান সৌসাদৃশ্য যে তাঁহারা যেমন অতি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনই দেশের জন্য দুইজন কর্ম্মবীর আশুতোষ ও সুরেন্দ্রনাথকে তাঁহারা রাখিয়া গিয়াছিলেন। ডাঃ রাজেন্দ্র ও ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদের নামে কলিকাতায় দুইটি রাজপথের নামকরণ হইয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইত এম-এ এবং পর বৎসর আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম বে-সরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এবং তাঁহার কার্য্যকালে চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি যে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, পৌর প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে তাহা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা সরকারের স্বায়ত্বশাসন বিভাগের মন্ত্রী

ও ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বিলাতে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হইয়া বিলাত যাত্রা করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি স্যার সুরেন্দ্রনাথের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। আধুনিক শিক্ষিত ও পদস্থ বাঙ্গালীগণ সাধারণতঃ পল্লীগ্রামের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া সহরের বিলাসিতার মধ্যে ডুবিয়া থাকেন, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ একজন আদর্শ পল্লীসেবক ছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ জেলাম্যাজিস্ট্রেট খগেন্দ্রনাথ মিত্রের কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা দেবীকে বিবাহ করেন এবং এই মহীয়সী মহিলার প্রেরণায় তিনি দেড়লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সিঙ্গুরে ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে রাজেন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল হাসপাতাল ও মাতার নামানুসারে গোলাপমোহিনী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান করেন। সুদূর পল্লী অঞ্চলে আধুনিক যাবতীয় সাজসরঞ্জামে সুসজ্জিত এইরূপ সুরম্য হাসপাতাল নির্ম্মাণ করিয়া তিনি হুগলী জেলার যে প্রভূত উপকার করিয়াছেন, লেখনীতে তাহা প্রকাশ করা যায় না। স্ত্রী শিক্ষার তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং গোপালমোহিনী বালিকা বিদ্যালয় ২০শে মার্চ্চ ১৯৩৫ খৃঃ স্থাপন করিয়া গ্রাম্য বালিকাগণের শিক্ষার তিনি যে সুবিধা করিয়া দিয়াছেন সেইজন্য তাহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এইরূপ প্রথম শ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয় বঙ্গের কোন গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায় না। সিঙ্গুরে মহামায়া ইনস্টিটি-উশন বলিয়া একটি উচ্চ বালকদের বিদ্যালয় বহুদিন হইতেই ছিল; তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের সভাপতিরূপে বহু উন্নতি করিয়া দিয়াছেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তিনি অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তরিত হন।

১৩৩৭ সালের ১৮ই ফাল্গুন তারিখে স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ মল্লিকের ভগ্নী শ্রীমতী গুণময়ী দেবী "রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক চিকিৎসা মন্দিরের" ভিত্তি স্থাপন করেন এবং পর বৎসর ৮ই ফাল্গুন (২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২) তারিখে বঙ্গের তৎকালীন গভর্নর স্যার স্টান্‌লি জ্যাক্‌সন কর্ত্তৃক এই হাসপাতালের উদ্বোধন হয়।

রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক চিকিৎসা মন্দিরের গাত্রে শ্বেত প্রস্তরে নিম্নলিখিত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে :

"৺ রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক

জন্ম—সিঙ্গুর, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১২০০ মৃত্যু—কটক, ২রা আশ্বিন, ১৩০৪

যিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিয়া দরিদ্র লোকের সাহায্যের জন্য নিতান্ত অভাব ও অসুবিধা সত্ত্বেও চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া যশস্বী হইয়া দক্ষিণ কলিকাতা ও সিঙ্গুর ও নানাস্থানের দরিদ্র রোগীগণের চিকিৎসার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন—যাঁহার ভবানীপুরের বসত বাটীতে স্থানীয় ও সিঙ্গুর অঞ্চলের এবং দূর দূরান্তের নিঃস্ব রোগীগণ আশ্রয় ও চিকিৎসালাভ করিতেন, যিনি সর্ব্বপ্রকারে লোক সেবাকেই জীবনের ব্রতস্বরূপ করিয়াছিলেন এবং সিঙ্গুর যাঁহার অতি প্রিয় ছিল

তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার তৃপ্তির জন্য

ও মহৎ জীবনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে

ঈশ্বর প্রীতি কামনায়

এই চিকিৎসামন্দির উৎসর্গীকৃত হইল।

ইতি, ৮ই ফাল্গুন, সন ১৩৩৮ সাল।"

রাজেন্দ্রনাথ হাসপাতাল স্থাপিত হইবার পর বাঙ্গলার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উহা পরিদর্শন করিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উক্ত হাসপাতালের পরিদর্শকের তালিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল। বর্ত্তমানে চুঁচুড়ার ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে এই হাসপাতাল পরিচালিত হইতেছে।

1. Mr. L. A. Chapman, I. C.-, S S. D. O.

Serampur 1. 5. 32.

.........I was very much struck with the order and neatness of the whole place.........thus the hospital at the very

outset of its career is doing most valuable work and the people of the countryside have been quick to learn of the boon which has been conferred upon them and are eager to take advantage of the benefits.........I am proud to be the First President of the Managing Committee of so fine an Institution.

2. Dr. B. Ganguli, M. B., D. P. H. D. H. O.,
Hooghly. 1, 5. 32.

.........The building and equipment are excellent......... I found the place neat and clean.........

3. Mr. T. N. Mukherjee, B. Sc. Chairman, D. B.
Hooghly. 21. 8. 32.

.........The hospital has proved to be a very great boon to the public and has proved to be a very useful Institution.

4. Lt. Col. C. A. Godson, I, M. S., Civil Surgeon,
Hooghly. 14. 9. 32.

I have watched it from the begining and know the care and trouble that has been devoted to this Charitable Institution. The building is good and attractive......... The patients are well treated and cared for........ I consider the Institution is doing excellent work and it shows what can be done in a small village when money is spent on medical needs.

5. Mr. K. L. Goswami, Chairman, Local Board,
Serampore. 13. 11. 33.

.........The doctor and the hospital staff seemed to be looking after the patients properly and taking an interest in the work.........I was thoroughly satisfied with the work of the Hospital.........The efficient management and work-

ing of the Hospital is no less due to the watchful vigilence.........

6. Mr. Hiralal Sen, Dy. Collector & A. S. O. in charge. 6. 7. 34.

I am as a sighteer and am returning with great admiration for all that I saw.........The patients are well looked after and the tidiness maintained in every part of the Hospital.........

7. Mr. Haridas Das, B. E., Ex. Engineer, P. W. D. 26. 7. 34.

.........I have nothing but admiration for the general upkeep and the interest with which the patients are attended to.........

8. Mr. Sailendranath Naha, Dacca.

.........A charitable Institution like this is rarely found even in most of the Sub-Division of Bengal.........

9. Dr. Miss Edith M. Lindsay, Church of Scotland Mission, Kalna 22. 4. 35.

I have visited the Hospital to-day and am greatly pleased with all I have seen.

10. Miss S. B. Gupta, B. A. B. T., M. Ed. (Leeds), Inspectress of Schools Presidency and Burdwan Division.

It gives me pleasure to write about my visit to this beautiful Hospital........... It thrilled me to note the unostentatious dignity of its workers......the co-operation of the staff......neatness, cleanliness and above all the earnestness of every member.........made me feel that the real spirit of India has now started meandering its way into small hamlets.........

11. Sir M. Azizul Haque Esq. B. L., M. L. C. 31. 5. 35.

I was very pleased to see an Institution of this character in an entirely rural area, with most pleasing buildings. This hospital is being very well looked after.........its compound and its inside (are) very neat and clean and cheerful. It is serving the purpose of medical relief to a very wide locality and is a part of rural reconstruction works which Mr. Mallik and his devoted wife have taken up in this area.........

12. Mr. S. B. H. Burnwell, I. C. S. Serampur, 17. 7. 35

The Hospital is very well appointed and as far as I can see has everything that could possibly be desired......the Hospital is certainly very attractive and seems to be doing very good work indeed......

13. Sir John Woodhead, K. C. S. I., I. C. S.

From what I saw I fell certain that the Hospital is doing extraordinarily good work and is a great boon to the local people......

14. Mr. S. K. Mitra, Secretary Baugabhasa Sanskriti Sammelan.

I have never seen such a nice Hospital in any village of Bengal, nay of India.........The Institution is doing excellent work and I am greatly pleased with the management.

সুরেন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পর তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্বামীর স্মৃতি রক্ষার্থে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একটি আদর্শ প্রসূতি-সদন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ্চ তারিখে তৎকালীন বাঙ্গলার

লাট-পত্নী লেডী রবার্ট রিড্ ইহার দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। আমেরিকার রক্‌ফেলার ফাউণ্ডেশনের (Rockfeller Foundation) কর্ত্তৃপক্ষ এবং



সপ্ত শিব মন্দির—সিঙ্গুর

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট ইহার ব্যয় বহন করেন। সিঙ্গুরে "সুরেন্দ্রনাথ মডেল হেল্‌থ ইউনিট্ অ্যাণ্ড মেটার্নিটি ক্লিনিকের" ন্যায় প্রতিষ্ঠান আমেরিকা, বার্ম্মা

ও সিংহল ব্যতীত পৃথিবীর আর কোথাও নাই। লেঃ কর্ণেল এ, সি, চ্যাটার্জ্জির চেষ্টায় ইহা সিঙ্গুরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সিঙ্গুরের উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় স্বর্গীয় মথুরানাথ বর্ম্মণ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহা প্রাচীনতম বিদ্যালয়; অতঃপর ইহা বর্দ্ধমান সিয়ারসোল রাজবংশের মতিলাল মালিয়ার অর্থ সাহায্যে পরিচালিত হইত বলিয়া মতিলাল মালিয়া ইনস্টিটিউশন বলিয়া পরিচিত ছিল। পূর্ব্বে এই জমিদার বংশ এই গ্রামেই বাস করিতেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে চাঁপদানীর স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার মাতা শ্রীমতী মহামায়া দেবীর স্মৃতিরক্ষার্থে বিদ্যালয়ের জন্য সুরম্যভবন নির্ম্মাণ করিয়া দেন; তদবধি ইহা সিঙ্গুর মহামায়া ইনস্টিটিউশন বলিয়া কথিত হইতেছে।

সিঙ্গুরে জৌনপুর নিবাসী বাবুলাল সাহু ১৯৭৭ সম্বতে একটি কালীবাড়ি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরগাত্রে দাতার ও তাঁহার স্ত্রীর নাম এবং নির্ম্মাণের তারিখ হিন্দী ও বাঙ্গলা ভাষায় উৎকীর্ণ আছে।

পূর্ব্বে এইস্থানে বহু পণ্ডিতের বাস ছিল; তন্মধ্যে সীতানাথ তর্কবাগীশ, মদনমোহন তর্কলঙ্কার, এবং ঠাকুরদাস ন্যায়রত্নের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত এই স্থানের ঘোষ বংশ ও চট্টোপাধ্যায় বংশ এবং নসিবপুরের রায় বংশ ও গোপালনগরের মিত্র বংশ বহু প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সিঙ্গুর থানার মধ্যে বড়াগ্রামের নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২১শে ফাল্গুন ১২৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পূর্ব্বপুরুষ কল্যাণচরণ মুখোপাধ্যায় হুগলী জেলার মধ্যে খলসিনী নামক গ্রাম হইতে আসিয়া এই স্থানে বসবাস করেন। বাল্যে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে ইনি সমর্থ হন নাই এবং সরকারী কার্য্যে প্রবিষ্ট হন। স্বীয় অধ্যবসায় ও সকর্ম্মকুশলতায় তিনি ব্রহ্ম সরকারের পূর্ত্ত বিভাগে একটি উচ্চপদ অধিকার করিয়া 'রায় সাহেব' উপাধি প্রাপ্ত হন। সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া

তিনি স্বীয় পল্লী বড়া গ্রামে চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহার পিতা মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে ১৭ই পৌষ ১৩৪০ সালে 'বড়া মধুসূদন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর তাঁহার মাতা প্রসন্নময়ীর স্মৃতি রক্ষাকল্পে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে "প্রসন্নময়ী দাতব্য চিকিৎসালয়" প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুইটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন কার্য্যে তাঁহার সারা জীবনের অর্জ্জিত অর্থ, দেশের কল্যাণকামনায় অর্পণ করিয়া তিনি১৩৪৫ সালে গতায়ু হন। 'মানস সরোবর ও কৈলাস পর্ব্বত ভ্রমণ' নামে একখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বড়া গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ পাঁচালীকার রসিকচন্দ্র রায়ের নিবাস ছিল। হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপালে তাঁহার পূর্ব্ব নিবাস ছিল; কিন্তু তাঁহার পিতা হরিকমল রায় মাতামহের জমিদারী পাইয়া এই গ্রামে বসবাস করেন। ১২২৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কাব্যপ্রতিভার বিকাশ হয়। ১২৪৫ তাহার "জীবন তারা" নামক প্রথম কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হয়; কিন্তু উক্ত পুস্তক আদিরসের মধ্যে অশ্লীলতা থাকায় সরকার হইতে উহার প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর অশ্লীল অংশ পরিহার করিয়া ১২৫০ সালে নব্যজীবন-তারা, ও ছয় খণ্ড পাঁচালী প্রকাশ করেন। ইহার পর তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমাঙ্কুর, হরিভক্তি চন্দ্রিকা, পদাঙ্ক দূত, দশমহাবিদ্যা, বৈষ্ণব মনোরঞ্জন, নবরসাঙ্কুর, কুলীন কুলাচার প্রভৃতি বহু কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া ১২৯৯ সালের ৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে দেহরক্ষা করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল এবং তাঁহার নির্দ্দেশেই বহু বিবাহ নিবারণ কল্পে 'কুলীন কুলাচার' নামক কবিতা পুস্তকখানি রচিত হইয়াছিল। তাঁহার রচনার নিদর্শন স্বরূপ একটি কবিতা উদ্ধৃত হইল :

হায় রে বঙ্গের পদ্য হায়! হায়! হায়!
পূর্ব্বের অপূর্ব্ব মান এখন কোথায়?
কত ছটা কত ঘটা কত দম্ভ ছিল,
পদ রে! তোমার তেজ সকলি ঘুচিল।
বিলাতী খেলাতী পদ্য দেখিয়া বিস্তার
বাঙ্গালী! কাঙ্গালী তোরে করেছে এবার
পয়ার! দয়ার নাই তোর প্রতি টান,
হতিস বিলাতী বরং পেতিস সম্মান!
বঙ্গের রঙ্গের পদ্য থাক্ থাক্ থাক্
বাজুক কত না বাজে গদ্য জয়ঢাক।
ওরব নীরব হবে না রহিবে এদেশে
অক্ষয় মৃদঙ্গ তুই বাজাবি রে শেষে।

দ্বারবাসিনী

দ্বারবাসিনী হুগলী জেলার পোলবা থানার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে এই স্থান রাজা দ্বারপাল নামক এক হিন্দু রাজার রাজধানী ছিল এবং তাঁহার নামনুসারে এই স্থান দ্বারবাসিনী বলিয়া খ্যাত হয়। পাল বংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকালে বঙ্গদেশের বহু স্থানে তাঁহাদের নানা শাখার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা প্রচলিত আছে; তাঁহারা ভূস্বামী বা ভুঁইয়া রাজা নামে খ্যাত ছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন।

হাসপাতাল ও বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী ইংরাজী ভাষায় মুদ্রিত, বঙ্গের পল্লীগ্রামে যে স্থানে শতকরা একজন লোক ইংরাজী ভাষা বুঝিতে পারে, সেই স্থানে ইংরাজী কার্য্যবিবরণীর কোন মূল্য নাই। কর্ত্তৃপক্ষের বঙ্গ ভাষার প্রতি প্রীতি দেখিলে আমরা সুখী হইব।

গৌড়েশ্বর রাজা মহিপাল ৯৮০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন; তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাহার পুত্র দ্বারপাল হিন্দুধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং কিম্বদন্তী এইরূপ যে, সেইজন্য পিতাপুত্রে মতানৈক্য হওয়ায় দ্বারপাল এই স্থানে আসিয়া বসবাস করেন ও পরবর্ত্তীকালে একটা ক্ষুদ্র রাজ্যও প্রতিষ্ঠা করেন।*

রাজা দ্বারপাল ও তাহার বংশধরগণ বহু বৎসর যাবৎ এই স্থানে রাজত্ব করেন কিন্তু পণ্ডুয়া বিজেতা সাহাস্থফি যে সময় মহানাদ আক্রমণ করেন সেই সময় দ্বারবাসিনীর তৎকালীন অধিপতি মহানাদ রক্ষার জন্য সাহাস্থফির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায়, তাহারা যবন হস্তে মৃত্যু অপেক্ষা আত্মদান শ্রেয় বলিয়া সপরিবারে অগ্নি কুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। মহানাদের ন্যায় এই স্থানে জীয়ৎ-কুণ্ড নামক একটি বৃহৎ জলাশয় আছে এবং এই রাজার পরাজয় সম্বন্ধে মহানাদের ন্যায় একটি গল্পও প্রচলিত আছে।

রাজা দ্বারপাল দ্বারবাসিনী নামক এক দেবী প্রতিষ্ঠা করেন উহা বর্ত্তমানে বীরভূম জেলার মল্লারপুর গ্রামে অবস্থিতা আছেন। বর্ত্তমানে রাজবাড়ীর কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তীকালে কুচপালের নবাব বংশের কোন ব্যক্তি এই স্থানে বসবাস করিতেন, তাহার প্রসাদ ও দুর্গের চিহ্ন অদ্যাপি পরিলক্ষিত হয়। গ্রামের মধ্যে প্রাচীন প্রস্তর নির্ম্মিত বরাহ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত এই স্থানে বিষহরী নামক এক জাগ্রতা দেবী আছেন। দেবীর মূর্ত্তি দ্বিভূজা, বর্ণ কৃষ্ণ ও বামে মহাদেব দণ্ডায়মান আছেন। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, সেনহাটির বিশালাক্ষীদেবী ও দ্বারবাসিনীর বিষহরি দেবী দুই ভগিনী। দেবীর সেবার জন্য কুচপালের পূর্ব্বোক্ত নবাবের কিছু জমি দান করা আছে।

* হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ়—অম্বিকাচরণ গুপ্ত, পৃষ্ঠা—১১৫

পূর্ব্বে এই স্থানে নীলের কারখানা ছিল ; অদ্যাপি কারখানার ইষ্টক নির্ম্মিত চিমনী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল কিন্তু ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের "বর্দ্ধমানের জ্বর" নামক মহামারীতে ইহার জনসংখ্যা তিন-চতুর্থাংশ কমিয়া যায়। দ্বারবাসিনী গ্রামে মহামারীতে যত লোক মরিয়াছিল হুগলী জেলার মধ্যে আর কোন গ্রামে এত অধিক সংখ্যক লোকের মৃত্যু হয় নাই। এই মহামারীতে দ্বারবাসিনীর কোন কোন বাটির যাবতীয় লোকের মৃত্যু হইয়াছিল এবং কত শত লোক যে গৃহের মধ্যে মরিয়া তথায় পচিয়া মৃত্তিকার সহিত মিশিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই।

'বর্দ্ধমানের জ্বর' বলিয়া কথিত ম্যালেরিয়া জ্বর আসিবার পূর্ব্বে সুস্থ্য ব্যক্তি ইহার কোন আভাস পাইত না। সুস্থ্য শরীরে হৃৎকম্প দিয়া জ্বর আসিত এবং সে জ্বর প্রাণ বহির্গত হইবার পরও ছাড়িত না। অধিকাংশ স্থলে দশ-বার ঘন্টার মধ্যে মৃত্যু হইত। পল্লীগ্রামে সেই সময় ডাক্তার ছিল না ; হাতুড়ে বৈদ্য ও পাচন বিক্রেতাগণই চিকিৎসার ব্যবস্থা করিত। কিন্তু এই রোগে রোগীকে বৈদ্য দেখিতে আসিবার পূর্ব্বেই তাহার ভবযন্ত্রণা শেষ হইয়া যাইত। গৃহ মধ্যে ও রাস্তার ধারে সে সকল মৃতদেহ পচিয়াছিল, বহু বৎসর যাবৎ সেই নর কঙ্কালগুলি রাস্তায় পড়িয়া তবে মাটিতে মিশিয়াছিল। শৃগাল কুকুর ও শকুনী গৃধিনীর দল গৃহ হইতে শবদেহ টানিয়া রাস্তায় বসিয়া নির্ভয়ে ভক্ষণ করিত। বহু মুমূর্ষু ব্যক্তিকে শৃগাল কুকুর তাহার শেষ নিশ্বাস বাহির হইবার পূর্ব্বেই ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলিয়াছিল। এই মহামারীতে দ্বারবাসিনীর বহু লোকক্ষয় হইয়াছিল—যাহারা গ্রাম ত্যাগ করিয়া, অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল, তাহারাই কোনক্রমে প্রাণে বাঁচিয়াছিল।

দ্বারবাসিনীতে মহামারীর সময় বহু ভৌতিক গল্প রটিয়াছিল ; নিম্নে একটি গল্পের উল্লেখ করিতেছি।

দ্বারবাসিনী গ্রামে জনৈক গুরুদেব তাহার শিষ্য বাটীতে আগমন করেন ; কিন্তু শিষ্যবাটির প্রত্যেক লোকই মহামারীতে প্রাণত্যাগ করে।

শেষ ব্যক্তির লোকাভাবে শবদাহ হয় নাই। গৃহ মধ্যেই শব পড়িয়াছিল। গুরুদেব বাহির হইতে ডাকা ডাকি করিতে লাগিলেন; বহুক্ষণ পরে গৃহ হইতে ক্ষীণ কণ্ঠে ভিতরে যাইবার আহ্বান আসিল। তিনি ভিতরে যাইয়া একজন মহিলাকে শয্যায় শায়িতা দেখিলেন; উক্ত মহিলা তাহাকে বলিলেন যে, আমাদের বাটির সকলেই মহামারীতে মারা গিয়াছেন; আমিও শয্যাগত, উঠিয়া আপনার সেবা করিতে পারিবনা—আপনি কিন্তু অভুক্ত অবস্থায় যাইতে পারিবেন না। হাত মুখ ধুইয়া পাশের ঘরে গুড় ও চিঁড়া আছে দয়া করিয়া আনিয়া আহার করুন।

শিষ্যার কথায় গুরুদেব চিঁড়া গুড় লইয়া আহারে বসিলেন কিন্তু ফলার খাইবার জন্য নেবু পাইলে ভাল হইত বলায়, তাহার শয্যায় শায়িতা শিষ্যা কঙ্কালসার হস্ত ক্রমশঃ লম্বা করিয়া বাগান হইতে নেবু তুলিয়া আনিল। ইহা দেখিয়া গুরুদেব অজ্ঞান হইয়া গেলেন।*

Darbasini according to the map is twelve miles as the crow flies from Tribeni, the nearest point on the river. It was one of the places which suffered most from the fever, the alleged mortality being higher than that of any other village in the Distict. The village had not recovered its former health up to the date of the report (1878) and still (1901) is a very malarious place. †

বৰ্দ্ধমান বিভাগের কমিশানার মিঃ পেলো (**Mr. Pellow**) ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে জ্বরের সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দেন, তাহাতে দ্বারবাসিনী হুগলী জেলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আক্রান্ত স্থান বলিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন।

উত্তরপাড়ার জমিদার স্বর্গীয় জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহামারীর সময় গ্রামবাসীগণকে ঔষধ ও পথ্য দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করেন। মহামারীর পর

---

* পদখালি ও উলায় এইরূপ গল্প প্রচলিত আছে

† **Hooghly Medical Gazetteer.**

সরকার এই স্থানে একটি চিকিৎসালয় খুলিয়াছিলেন এবং জয়কৃষ্ণ বাবু সেনহাটী, মায়াপুর, হাটবসন্তপুর প্রভৃতি গ্রামে, তাঁহার জমিদারী অন্তর্ভুক্ত থাকায় মুক্তহস্তে প্রজাদের জন্য উক্ত স্থান সমূহে কুইনাইন বিতরণ করিয়া জনসাধারণের ধন্যবদার্হ হন।

দ্বারবাসিনী গ্রামে বহু ভদ্রলোক বাস করেন; ইহা বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ের একটি অন্যতম প্রধান ষ্টেশন। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব ৩৯ মাইল; গ্রামের মধ্যে কুমার রাজেন্দ্র উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় নামক একটি বিদ্যালয়, ডাকঘর, পাঠাগার ও পুলিশ ফাঁড়ি আছে। বহু অবস্থাপন্ন লোক এই গ্রামে বসবাস করেন; কিন্তু কিম্বদন্তী এইরূপ যে, কোন সদ্গোপ বাস করিলে, তিনি দৈবধন প্রাপ্ত হইবেন। সেইজন্য কোন সদ্গোপ এই গ্রামে বাস করিতে পায় না। এই স্থান প্রাচীন কালে 'রাঢ়াপুরী' নামক একটি প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র পাল এই স্থান খনন করিয়া পাঁচ প্রকারের বিষ্ণু মূর্ত্তি, বরাহ মূর্ত্তি, সূর্য্য মূর্ত্তি, চণ্ডী মূর্ত্তি প্রভৃতি পাল রাজত্বের কতকগুলি নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন; মূর্ত্তিগুলি আশুতোষ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

There is an ancient site known as Darbasini in the district of Hooghly. Mr. P. C. Paul Archaelogist, the curator of Saradacharan Museum of the District has recently discovered a few broken stone images of Vishnu (of excellent workmanship), Surya, Baraha, and other Gods & Goddesses there. Besides he has found the site of an ancient place where bricks, potshreds and a ring well of good old days are visible. There are seven tanks bearing the memory of the seven queens.

Mr. Paul is of opinion that Darbasani was flourishing seat of Vigraha Pal in the Rarh during invasion by Dhanga

Dev, son of Yasavarman Dev, the king of Chandal, Central India, in the 11th country A.D. *

দ্বারবাসিনীর নিকটস্থ পুনাজগড় একটি অখ্যাত গ্রাম, ইহার প্রাচীনকালের নিদর্শন বর্ত্তমানে কিছুই পবিলক্ষিত না হইলেও সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র পাল এই স্থানে হইতে দুই প্রকারের দুইটি বিষ্ণুমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং উক্ত মূর্ত্তিগুলি দশম শতাব্দীর পাল রাজাগণের নিদর্শন বলিয়া আমরা মনে করি। একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি গ্রামবাসীগণ কর্ত্তৃক স্থানীয় এক প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে সর্ব্বসাধারণের পূজার জন্য সংরক্ষিত হইয়াছে এবং অন্য মূর্ত্তিটি বৈষ্ণবাটী সারদাচরণ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এই সম্বন্ধে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল :

পুনাজাগর

"Mr, Paul has discovered a few other broken stone images including Vishnu of the Pals at Punajgarh near Darbasini" †

গোঁসাই মালিপাড়া পোলবা থানার অন্তর্গত একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম, গোস্বামীদের প্রাধান্য হেতু এই স্থানের নাম গোঁসাই মালিপাড়া হইয়াছে। এই স্থানের গোস্বামী বংশ শ্রীচৈতন্যদেবের অংশ হইতে উদ্ভূত শ্রীমৎ খঞ্জনাচার্য্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গৌড়ীয় শুদ্ধ বৈষ্ণবাচারের জন্য এই স্থান সমধিক প্রসিদ্ধ। এই গ্রামে গোস্বামী-দিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাকান্ত, শ্রীশ্রীমদনমোহন, শ্রীশ্রীবল্লভ-চাঁদ এবং শ্রীশ্রীমদনগোপাল জীউর বিগ্রহগুলি বিশেষভাবে দর্শনীয় বস্তু। বিগ্রহগুলি গোস্বামী বংশের শিষ্যবর্গের দ্বারা সেবিত হইয়া থাকে। প্রাচীন গ্রন্থে এই গ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; এবং মালিদিগের বাসস্থান হেতু ইহা মালিপাড়া বলিয়া খ্যাত হয়। মালিপাড়া নামে অন্যত্র একটি

গোঁসাই মালিপাড়া

* Amrita Bazar Patrika, 1st June 1946.

† Hindusthan Standard, 31st March 1946.

গ্রাম বর্ত্তমান থাকায়, এই স্থান গোঁসাই মালিপাড়া বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই স্থানের শ্রীযুক্ত নবচৈতন্য গোস্বামী পাণ্ডিত্যের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত এবং গোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী, উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন।

মালিপাড়া গ্রামখানি ক্ষুদ্র হইলেও, এত অধিক সংখ্যক ছোট বড় অট্টালিকা আছে যে, সাধারণতঃ কোন গ্রামে তাহা দৃষ্ট হয় না। গ্রামের মধ্যে একটি মাইনর বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, অপেরাপার্টি আছে। পূর্ব্বে এই স্থানে কাগজ প্রস্তুত হইত। গোঁসাই মালিপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য্যালয় এই গ্রামের মধ্যে অবস্থিত।

বায়ড়া

বায়ড়া হুগলী জেলার আরামবাগের দুই মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত একটি সামান্য স্থান বলিয়া পরিগণিত হইলেও, প্রাচীনকালে ইহা একটি হিন্দু রাজার রাজধানী বলিয়া প্রখ্যাত ছিল। রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নরেন্দ্র নারায়ণ বুন্দেলখণ্ড হইতে এইস্থানে আগমন করিয়া স্বীয় ভুজবলে বহু রাজার উপর প্রাধান্য স্থাপন পূর্ব্বক বায়ড়ায় একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন।

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের পুত্রের নাম রাজা জয়নারায়ণ, তাহার পুত্রের নাম রাজা বিজয়নারায়ণ; বিজয়নারায়ণের পুত্র সংগ্রাম সিংহ মুসলমান রাজত্বকালে 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। তাহার পুত্রের নাম রণজিৎ রায়; তিনি একজন সাধক পুরুষ ছিলেন এবং অদ্যাপি তাঁহার নাম লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এই রাজবংশ জাতিতে সদ্গোপ ছিলেন এবং রণজিৎ রায় প্রত্যেককে ভূরিভোজন করাইয়া এক ছড়া স্বর্ণময় হার উপহার দেওয়ায় তাহার জাতিগণ তাঁহাকে 'প্রতিষ্ঠার' উপাধিতে ভূষিত করেন।

রণজিৎ রায় স্বনামখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন এবং কিম্বদন্তী এইরূপ যে বিক্রমপুর গ্রামের জাগ্রতা শ্রীশ্রীবিশালাক্ষী দেবী তাঁহার কন্যার-বেশে রাজবাড়ীতে অবস্থান করিতেন। এই বিষয়ে ক্রফোর্ড সাহেব একটি সুন্দর কাহিনী তাঁহার পুস্তকে * লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, নিম্নে উক্ত কাহিনীটির মর্ম্মার্থ প্রদত্ত হইল :

বাগড়া গ্রামের দক্ষিণে রণজিৎ রায়ের প্রতিষ্ঠিত একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী আছে, ইহার জলকর প্রায় দেড়শত বিঘা। এক সময় এক শাঁখারী আসিয়া রাজার নিকট হইতে একজোড়া শাঁখার মূল্য চাহিল এবং কহিল যে তাহার কন্যা শাঁখা পরিয়া বলিয়া দিয়াছে যে, ঘরের অমুক স্থানে একটি কৌটার মধ্যে তাহার টাকা আছে।

শাঁখারীর কথা শুনিয়া রাজা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, কারণ রাজার কোন কন্যা ছিল না। কিন্তু কৌটার মধ্যে শাঁখারীর কথামত টাকা প্রাপ্ত হওয়ায় রাজা বিশেষ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, এবং কে সে শাঁখা পরিয়াছে, তাহাকে দেখাইবার জন্য তিনি জেদ ধরিলেন।

রাজার কথামত শাঁখারী কাতরকণ্ঠে দিঘীর পাড়ে যাইয়া কন্যাকে ডাকিতে লাগিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত রাজকন্যা পুষ্করিণীর মধ্য হইতে শাঁখা পরা হাত দুইটি রাজাকে দেখাইলেন।

রাজা তখন বুঝিতে পারিলেন যে, বিশালাক্ষী দেবী এই কার্য্য করিয়াছেন এবং আনন্দে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। সেই সময় দৈববাণী হয় যে, অদ্য এই পুষ্করিণীতে গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব হইবে, এবং স্নানার্থীগণ গঙ্গা-স্নানের ফললাভ করিবে। সেই দিন বারুণী ছিল এবং চকিতের মধ্যে দৈববাণী সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া গেল এবং হিন্দুগণ দলে দলে সমাগত হইয়া উক্ত দিঘীতে পুণ্যস্নান করিয়া গেল।

* A Brief History of the Hooghly District By D. G. Crawford, Pages 68-69

উক্ত সময় হইতে প্রতি বৎসর বারুণী এবং মকর সংক্রান্তিতে বহু লোক এই পুষ্করিণীতে স্নান করিতে আসে এবং তদুপলক্ষে এই স্থানে একটী মেলা বসে।

রণজিৎ রায়ের পুত্রের নাম অচ্যুতানন্দ, তাহার পুত্রের নাম হরিশচন্দ্র। এই রাজবংশের বংশধরগণ বায়ড়া ব্যতীত মাধবপুর, দিঘড়া, সালালপুর প্রভৃতি গ্রামে বর্ত্তমানে বসবাস করেন। *

রণজিৎ রায়ের সময় বায়ড়া একটি পরগণা ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দির এবং প্রবাদ অদ্যাপি তাঁহার কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

দীঘা

দীঘা দ্বারবাসিনীর নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র গ্রাম; পূর্ব্বে এই স্থানে বহু লোক বাস করিত, কিন্তু 'বর্দ্ধমানের জ্বর' নানক মহামারীতে এই গ্রামও একপ্রকার জনশূন্য হইয়া গিয়াছে বলিতে পারা যায়। সম্প্রতি একটি ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তি এই গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং উক্ত মূর্ত্তিটি সরদাচরণ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত হইয়াছে। এই গ্রামের সম্বন্ধে কোন নূতন তথ্য অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই এবং মূর্ত্তিটি যে কোন সময়ের তাহাও চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত হয় নাই বলিয়া, এই গ্রাম সম্বন্ধে আমরা কোন অভিমত প্রকাশ করিতে বিরত হইলাম।

পাণ্ডুয়া

পাণ্ডুয়া হুগলী জেলার একটি প্রাচীন স্থান, পূর্ব্বে এই স্থান 'পেঁড়ো-বসন্তপুর' বলিয়া পরিচিত ছিল এবং মুসলমান-রাজত্বকালেও এই স্থান হিন্দু রাজার দ্বারা শাসিত হইত। প্রবাদ এইরূপ যে, বুদ্ধদেবের পিতৃব্য অমৃতদোদনের পুত্র পাণ্ডুশাক্য নামে এক রাজা পাণ্ডু-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পাণ্ডুশাক্যের বংশধরগণের মধ্যে রাজা পাণ্ডুদাস আমতার অধীন পেঁড়ো-

* বঙ্গবীর রণজিত রায়—শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

বসন্তপুরে নিজ রাজ্য স্থাপন করিয়া তথায় রাজত্ব করিতেন। রাজা পাণ্ডুদাস নিজ বংশের নামানুসারে উক্ত স্থানের নাম বদলাইয়া পাণ্ডুয়া নামকরণ করিয়াছিলেন। এই স্থান কলিকাতা হইতে ৪২ মাইল দূরে এবং হাওড়া হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের পাণ্ডুয়া নামক ষ্টেশনের অনতিদূরে অবস্থিত।

পাণ্ডুয়া ঐতিহাসিক স্থান এবং ঐতিহাসিক গৌরবের দিক্ হইতে সপ্তগ্রামের অব্যবহিত পরেই পাণ্ডুয়ার স্থান নিঃসন্দেহে দেওয়া যাইতে পারে। হিন্দু রাজার রাজধানী হইলেও এই স্থান পরবর্ত্তীকালে মুসলমান শাসকগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইয়াছিল বলিয়া হিন্দুদিগের কোন নিদর্শনই বর্ত্তমানে দৃষ্ট হয় না। হিন্দুদিগের মন্দিরগুলিকে রূপান্তরিত করিয়া মসজিদে পরিণত করা হয় এবং হিন্দুদিগের প্রত্যেক দেব-দেবীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া সমস্ত হিন্দুদিগকে এই স্থান হইতে বিতাড়িত করা হয়। ফলে পাণ্ডুয়া হিন্দু রাজার রাজধানী হইলেও হিন্দুদিগের যাবতীয় চিহ্ন এই স্থান হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। এই সম্বন্ধে লেঃ কর্ণেল ক্রফোর্ড লিখিয়াছেন—**"Pandua was once the capital of a Hindu Raja and is famous as the site of a great victory gained by the Musalman und r Shah Safi over the Hindus about 1340 A. D."**

পাঠান রাজত্বকালে দিল্লীর সম্রাট্ দ্বিতীয় ফিরোজ শাহের ভগিনী পাণ্ডুয়ায় বাস করিতেন; তাঁহার এক পুত্র ছিল নাম সাহা সুফি। তিনি এই অঞ্চলের মুসলমানদিগের ধর্ম্মযাজক এবং 'ফকির' বলিয়া সাধারণের নিকট প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। পাণ্ডুয়ার রাজার সহিত মুসলমানদের বিরোধ সম্বন্ধে যে কাহিনী প্রচলিত আছে নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

পাণ্ডুয়ার রাজার এক নবজাত পুত্র হইয়াছিল বলিয়া, তিনি তাঁহার রাজ্যে এক ভোজের বন্দোবস্ত করেন। ভোজের দিবসে রাজার এক

মুসলমান কর্ম্মচারী তাহার বাড়ীতেও ভোজের জন্য একটি গো-হত্যা করিয়া গরুর হাড়গুলি মাটীতে পুঁতিয়া দেয়। কিন্তু রাত্রে কুকুর কর্ত্তৃক উক্ত হাড়গুলি রাজপথে আনীত হয় এবং সেই জন্য হিন্দু প্রজাগণের মধ্যে ভয়ঙ্কর অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। প্রজাবৃন্দ যে মুসলমান গো-হত্যা করিয়াছে, তাহাকে ধরিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বিফল-মনোরথ হয় এবং রাজ-পুত্রের জন্যই এই ভোজের আয়োজন হইয়াছিল বলিয়া ক্রোধবশতঃ তাহারা রাজপুত্রকে হত্যা করে। রাজা মুসলমানদের নিকট হইতে গো-হত্যার জন্য কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠান; কিন্তু সমস্ত মুসলমানগণ ভয়ে তাঁহার রাজত্ব হইতে পলায়ন করে।

সাহা স্থফির মাতুল দিল্লীর সম্রাট্; সাহা স্থফি প্রাণভয়ে দিল্লীতে পলায়ন করেন এবং দিল্লীর সম্রাট্ ফিরোজ শাহ সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত বহু সৈন্য দিয়া তাঁহাকে পাণ্ডুয়ায় পাঠাইয়া দেন। সপ্তগ্রাম বিজয়ী জাফর খাঁ সাহা স্থফির খুল্লতাত; তিনি এবং বহরাম সাক্কা, সাহা স্থফিকে পাণ্ডুয়ার রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করেন। পাণ্ডুয়ার হিন্দু প্রজাবৃন্দ গো-হত্যার জন্য অকারণে রাজার প্রতি বিরূপ ছিল; এই সময়ে সাহা স্থফি সসৈন্যে পাণ্ডুয়া আক্রমণ করিল। হিন্দু রাজার সহিত মুসলমানগণের তুমুল যুদ্ধ হইল এবং কয়েকদিন যুদ্ধের পর রাজা নিহত হইলেন; পাণ্ডুয়া সাহা স্থফির করতলগত হইল।

সাহা স্থফি পাণ্ডুয়ার শাসনভার গ্রহণ করিয়া রাজার প্রাচীন মন্দির ধ্বংস করিলেন এবং সেই স্থানে মন্দিরের উপকরণ দিয়া মসজিদ নির্ম্মান করিলেন। এই মসজিদ 'বাইশ-দরজা' অর্থাৎ বাইশটি বৃহৎ খিলানের দ্বারা এই বাড়ীটি নির্ম্মিত ছিল। ইহা পূর্ব্বে দেব মন্দির ছিল; ইহার মধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত সিংহাসনের ন্যায় একটি 'বেদী' অদ্যাপি দৃষ্ট হয়; এই সিংহাসনের মধ্যে কোন বিগ্রহ-মূর্ত্তি থাকিত বলিয়া ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সিংহাসনের সোপানগুলিও সুন্দর প্রস্তর নির্ম্মিত।

মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বহু মিনার বা স্তম্ভ ছিল; সেকালের হিন্দুরাজাগণ প্রাতঃকালে উচ্চ স্থান হইতে সূর্য্যদেবকে দর্শন করিবার জন্য উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভগুলি বিনষ্ট করিয়া কেবলমাত্র বৃহৎ স্তম্ভটিকে নামাজের আজানের জন্য রক্ষা করা হয়। এই সম্বন্ধে List Of Anc ent Monuments In Beugal নামক পুস্তকে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি:

At the close of the 1 3th century, Shah Sufi, whose mother was sister to the Emperor Firoz Shah 11, who died in 1296 A. D. lived at Pandua. At that time, the Hindu Pandua Raja ruled over the district and lived at Mahanath (now Mahanad) not far off. Being oppressed by the Raja, Shah Sufi fled to his uncle at Delhi, obtained assistance and with a large army and two men of renown Zafarkhan Ghazi and Bahram Sakka, overthrew the Raja. The old temple of Pandua was then destroyed and the present mo-que built with its remains. The large tower was used as a Minarch or a Minaret (call for prayer). Every Hindu was driven out of the town. The vault of Pandua in which SUFI was buried still exists. This story does not give the date of erection of the tower but of its use as a Mazinah, Mr. Blochmann of the East Asiatic Society was of opinion that the tower resembles in structure well-known KUTABMINAR, near Delhi. The town of Pandua consists of a very curious old tower about 125-ft. in height, a large long Masjid and also a square Masjid near the famous tomb of Shah Safi-ud-din.

It is not improbable that the Masjid and Minar might have been built by the nephew of the FIROZ as the style of the long Masjid is very like that of the other mosques

built during his reign. The great tower is the Mazina or Muazzin's Minar; its entrance is on the west towards the Masjid. (General Cunningham thinks that the square Masjid tower belongs to the first half of the 9th century of the Hijra).

The Minar at Pandua is a very curious structure, quite different from all others that are generally to be found.

পাণ্ডুয়া-বিজয়ী সাহা সুফি মন্দিরের সর্ব্বোচ্চ স্তম্ভটি মুসলমানদিগের বিজয় স্তম্ভস্বরূপ রাখিয়া দেন; ইহার উচ্চতা পূর্ব্বে ১৩৬ ফিট ছিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে স্তম্ভের, উপরিভাগের ১১ ফিট বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় বর্ত্তমানে ইহার উচ্চতা ১২৫ ফিট দাঁড়াইয়াছে। ইহার আকার ও গঠন প্রণালী দিল্লীর কুতবমিনারের অনুরূপ এবং ইহা বাঙ্গালার প্রাচীনতম ইমারত। এইরূপ ইমারত বাঙ্গালা দেশে আর দ্বিতীয় নাই। লেঃ কর্ণেল ক্রফোর্ড লিখিয়াছেন, "This minaret is said to be the oldest masonry building of Bengal" পাণ্ডুয়ার মিনারটি পাঁচটি তলায় বিভক্ত প্রথম তলায় ব্যাস ৬০ ফিট, ইহা ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে, পঞ্চম তলার ব্যাস মাত্র ১৫ ফিট। প্রত্যেক তলায় একটি করিয়া বারান্দা আছে এবং উক্ত বারান্দা দিয়া মিনারটির চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করা যায়। নিম্নতলার প্রবেশদ্বার 'বাইশদরজার' পশ্চিম দিকে অবস্থিত এবং নিম্ন হইতে ঘুরাণ-সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়; সর্ব্বশুদ্ধ ১৬১ সিঁড়ি মিনারের মধ্যে আছে। মিনারের চূড়ায় একটি ছড়ি আছে, জনশ্রুতি যে সুলতান সাহা সুফি উক্ত ছড়ি লইয়া ভ্রমণ করিতেন। মিনারের গঠন ও আকার পর পৃষ্ঠায় তালিকাটি হইতে ভাল করিয়া বুঝা যাইবে।

Hooghly Medical Gazetteer

পঞ্চম তলার ব্যাস ১২ ফিট উপরে ও ১৫ ফিট নিম্নে; উচ্চতা ১৮ ফিট
চতুর্থ তলার ব্যাস ২৩ ফিট ১০ ইঞ্চি উপরে ও ২৮ ফিট নিম্নে; উচ্চতা ১৮ ফিট।
তৃতীয় তলার ব্যাস ২৩ ফিট ১০ ইঞ্চি উপরে ও ২৬ ফিট নিম্নে; উচ্চতা ১৮ ফিট।
দ্বিতীয় তলার ব্যাস ৪৭ ফিট ৬ ইঞ্চি উপরে ও ৪৮ ফিট ১ ইঞ্চি নিম্নে; উচ্চতা ২৫ ফিট।
পঞ্চম তলার উপরের চূড়ার উচ্চতা ৯ ফিট।
মিনারের মোট উচ্চতা ১২৫ ফিট।

বহু প্রাচীন কাল হইতে নব-বর্ষের প্রথম দিনে (১লা বৈশাখ) এবং মাঘ মাসের প্রথম দিনে এই স্থানে একটি বৃহৎ মেলা হয়। মেলা উপলক্ষে প্রতি বৎসর প্রায় বিশ হাজার লোক পাণ্ডুয়ায় সমবেত হয়। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে মেলার সময় মিনারের উপর উঠিবার জন্য এরূপ ভীড় হইয়াছিল যে, সিঁড়ি হইতে একটি লোক পড়িয়া লোকের পদতলে পিষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। মিনারের গাত্রে কোন শিলালিপি নাই।

মিনারের উত্তর পশ্চিমে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে একটি প্রাচীন মসজিদ এবং সুলতান সাহা সুফির সমাধি মন্দির আছে। মসজিদটি ছোট ছোট ইট দিয়া গাঁথা হইয়াছে। মসজিদের ফটকে একখানি শিলালিপি গ্রথিত ছিল, কিন্তু ফটকটি পড়িয়া যাওয়ায় শিলাখণ্ডও স্খলিত হইয়া যায় এবং বর্ত্তমানে উহা মসজিদের পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত সাহা সুফির সমাধির মধ্যে রক্ষিত আছে। উক্ত শিলালিপির পশ্চাৎ দিকে একটি ভগ্ন সূর্য্যমূর্ত্তি খোদিত আছে। কৃষ্ণপ্রস্তরের উপর খোদিত সূর্য্যদেবের একটি মূর্ত্তি দ্বিখণ্ডিত করিয়া উহার নিম্নভাগের পশ্চাৎ দিকে আরবী অক্ষরের লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে,—"হিজরী ৮৮২ অব্দে

সামসুদ্দীন ইউসুফ সাহেব সেনাপতি কর্ত্তৃক পাণ্ডুয়ার হিন্দুরাজত্বের বিলোপসাধন এবং হিন্দুদের বিগ্রহগুলির দুরাবস্থা সংঘটিত হইয়াছে।” পাঠকগণের অবগতির জন্য এক দিকে শিলালিপি ও অন্যদিকে সূর্য্যমূর্ত্তি নিম্নাংশের আলোক-চিত্র দেওয়া হইল। এতদ্ব্যতীত আলোকচিত্রে আরও দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলালিপি আছে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, উহাতে আল্লার নামে মসজিদ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে বলিয়া লিখিত আছে। উহাদের অন্য দিকেও হিন্দুমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু মূর্ত্তিগুলির উপর হাতুড়ির ঘা পড়িয়াছে বলিয়া ঐগুলি কোন্‌টা যে কি দেবতার মূর্ত্তি ছিল তাহা সঠিক নির্ণয় করিতে পারা যায় না। মসজিদের সম্মুখে আর একটি সমাধি আছে; অনুসন্ধানে জানা গেল যে, উহা মকদুল সাহেবের সমাধি। উক্ত মকদুল সাহেব কে ছিলেন, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। পাণ্ডুয়ায় বারটি মসজিদ আছে এবং বহু স্থানে ইতস্ততঃ কবরও দৃষ্ট হয়। হিন্দু রাজার সময় হইতে পাণ্ডুয়ার সীমানা পাঁচ মাইলব্যাপী প্রাচীর দিয়া বেষ্টন করা ছিল; প্রায় শতবৎসর পূর্ব্বেকার মানচিত্রেও পাণ্ডুয়ার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বা বাঁধ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমানে কোন প্রাচীর দৃষ্ট হয় না।

সাহ সুফির সমাধি সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কথাগুলি সরকারীগ্রন্থে লিখিত আছে:

Hooghly-Pandua—TOMB OF SHAH SUFI-UD-DIN is a find duilding, 200-ft. long and with 60 tombs.*

এই স্থানে ‘পীরপুকুর’ নামে একটি পবিত্র জলাশয় আছে। ক্রফোর্ড সাহেব ইহা ৫০ ফিট গভীর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পীরপুকুর সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে তাহা অতি বিচিত্র। এই পুকুরের মধ্যে সত্যপীর অবস্থান করেন এবং তাঁহার দুইটি কুমীর আছে। কুমীর দুটিকে

* List of Ancient Monuments in Bengal, Page 36.



দ্বিখণ্ডিত সূর্য্যমূর্ত্তি এবং তাহার পশ্চাতে আরবী অক্ষরের প্রতিলিপি

ডাকিলেই তাহারা আসে এবং তাহাদিগকে সিন্নি দিলে যদি তাহারা সিন্নি গ্রহণ করে তাহা হইলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় মহানাদ ও দ্বারবাসিনীতেও এইরূপ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দুইটি পুষ্করিণী আছে। পাণ্ডুয়ার পুষ্করিণী পাণ্ডুরাজা খনন করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। পাণ্ডুয়ার সমৃদ্ধির সময় কাগজ, নীল, চুণ ও ধানের জন্য এই স্থান বিখ্যাত ছিল। এখনও কাগজিপাড়ায় কোন কোন মুসলমান কাগজ প্রস্তুত করে; ধানের জন্য আজও এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং বহু ধানের কল এই স্থানে আছে। পূর্ব্বে প্রায় দশ হাজার লোক এই ক্ষুদ্র স্থানটিতে বসবাস করিত; কিন্তু ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে 'বর্দ্ধমানের জ্বর' নামক মহামারীতে এই স্থান শ্মশানে পরিণত হয় এবং ৬১৬১ জনের মধ্যে ৫২২২ জনের মৃত্যু হয়। তাহার পর হইতেই এই স্থান জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম রেল-পথ পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৮ শে জুন মিঃ হজসন নামক একজন ইংরেজ প্রথম রেলগাড়ী পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত চালাইয়া পরীক্ষা করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মহামারীর জন্য পাণ্ডুয়ায় একটি সরকারী ডাক্তারখানা খোলা হইয়াছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে যে সকল প্রাচীন স্থান আছে তাহাদের প্রাচীনতা ও সমৃদ্ধি অন্যান্য বহু স্থানের তুলনায় যে অধিক, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়, আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি ভারতের প্রাচীন স্থানগুলির ইতিহাস অসংখ্য রচিত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের গৃহের কোণে হিন্দু-রাজবংশের ও হিন্দু সভ্যতার স্মৃতি-বিজড়িত এই সমস্ত ধ্বংসপ্রায় শ্মশানক্ষেত্রে পদার্পণ না করিলে বাঙ্গালার ইতিহাস মূর্ত্তিমন্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে না। এই সমস্ত প্রাচীন স্মৃতির উদ্ধারসাধন যে মহা পুণ্যজনক কার্য্য তাহা কে অস্বীকার করিবে? স্রষ্টা যায় কিন্তু সৃষ্টি চিরদিন অক্ষয় হইয়া থাকে; আজ এই সমস্ত প্রাচীন স্থানের স্রষ্টাগণ

কেথায় চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের সৃষ্টির বিক্ষিপ্ত কঙ্কালসমূহ ঘোর নীরবতার মধ্যেও তাঁহাদের কৃত কর্ম্মের জন্য অট্টহাস্যে মানব-নশ্বরতা ঘোষণা করিতেছে।

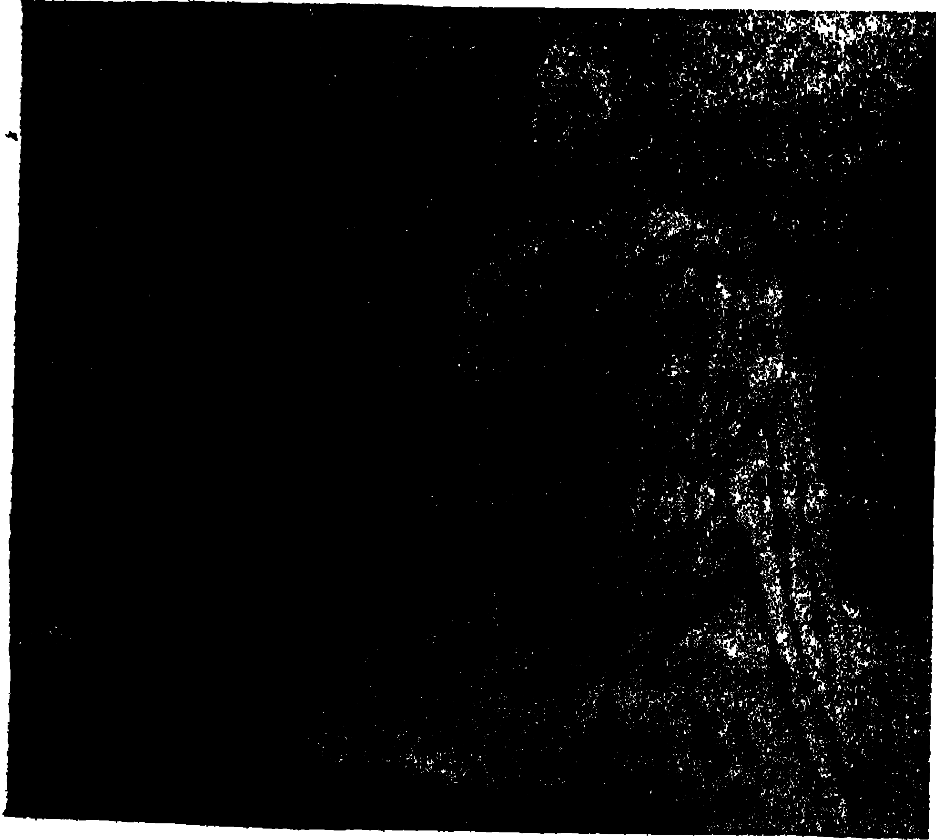
বিপ্লবের দীক্ষাগুরু ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব শুধু বিপ্লবগুরু হিসাবে নয়, সমাজ সংস্কারক ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিরূপেও বাংলার ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই মহাপুরুষের সংস্পর্শে এসে তাঁর চরিত্রগুণে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কত তরুণ, কত প্রবীণ মুক্তিকামী উপাধ্যায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ধন্য হয়েছেন। ব্রহ্মবান্ধবের জীবনের সঙ্গে আজকের ছাত্র-ছাত্রীদের হয়ত পরিচয় নেই; কিন্তু একথা ধ্রুব সত্য—নতুন বাঙ্গলাকে যাঁরা গড়ে তুলেছেন উপাধ্যায় তাঁদেরই একজন। তাঁর বিচিত্র জীবন-কথা উপন্যাসের মত রোমাঞ্চকর, ধর্ম্মপুস্তকের মত মর্ম্মস্পর্শী। চিত্তে অমিত তেজ, মস্তিকে অপূর্ব্ব মনীষা, চরিত্রে অসাধারণ দৃঢ়তা নিয়ে এই প্রতিভাবান পুরুষ হুগলী জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী খন্নিয়ান গ্রামে ১২৬৭ সনের ১লা ফাল্গুন জন্মেছিলেন। এঁদের পরিবার খানাকুল-কৃষ্ণনগরের কুলগৌরব-সম্পন্ন। দেবীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্রই ভবানীচরণ। ইনিই পরে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

শিশুকালে ভবানীচরণ মাতৃহারা হন। পিতামহীর স্নেহ-যত্নে তিনি মানুষ হতে লাগলেন। গ্রাম্য ছড়া, হেঁয়ালি, রামায়ণ, মহাভারত এই মেধাবী শিশুর কণ্ঠস্থ ছিল। অল্পবয়সেই সংগী বালকরা ভবানীচরণকে নেতার মর্য্যাদা দান করেছিল। স্বাধীনতাপ্রিয় এই কিশোর সহজেই সব ব্যাপারে দলপতিত্ব করে বড়দেরও চমৎকৃত করতেন। খেলাধুলা দুষ্টামির সঙ্গে সঙ্গেই পাঠশালা এবং পরে চুঁচুড়ার হিন্দু স্কুলে ও হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে ভবানীচরণ যখন প্রতি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করতেন—তখন

অনেকেই এই বালকের মধ্যে ভাবী দেশনেতার অঙ্কুরোদ্গম লক্ষ্য করেছিলেন।

বাল্যকাল থেকেই ভবানীচরণের ইংরেজী ভাষায় অসামান্য দখল ছিল। কলিকাতার জেনারেল এসেমব্লী স্কুলে পড়বার সময় তিনি স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিতে ইংরেজ শিক্ষককেও বিস্মিত করে তুলতেন। তেরো বছর বয়সে উপনয়নের পর তিনি নিরামিষাশী হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ভাটপাড়ার গিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তিলাভ করলেন। মস্তিষ্ক চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে কুস্তি, জিমন্যাষ্টিক, লাঠি ও ক্রিকেট খেলা প্রভৃতির দিকে তাঁর সমান উৎসাহ। তাঁর শরীরের সুদৃঢ় গঠন ও



ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

তেজোদৃপ্ত কান্তি দেখে তাঁকে উত্তর ভারতের বা পার্ব্বত্যপ্রদেশের অধিবাসী বলে মনে হ'ত। অসাধারণ শারীরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন ভবানীচরণ।

তখনকার দিনে আর্ম্মানী, ফিরিঙ্গী ও গোরারা দুর্ব্বল ভারতীয়দের ওপর অকথ্য অত্যাচার করত। একবার চুঁচুড়ায় এই ইতর প্রকৃতির লোকগুলি পাড়ার স্ত্রীলোকদের প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার করে। তাদের সাবধান করা সত্ত্বেও অভদ্র ব্যবহার বন্ধ হ'ল না। ফলে ভবানীচরণের নেতৃত্বে ছেলের দল তাদের এমনই শিক্ষা দিল যে, কোট-প্যান্টলুন ছিঁড়ে টুপি হারিয়ে, সর্ব্বাঙ্গে আঘাতের চিহ্ন ধারণ করে ফিরিঙ্গি আর্ম্মাণীর দল উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করল। দ্বিতীয়বার গোলমাল করার সাহস তাদের আর কখন হয়নি।

তখন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বাংলার অবিসম্বাদী নেতা। কিন্তু তাঁর বক্তৃতা ভবানীচরণের মনে বিশেষ রেখাপাত করতে পারে নি। আবেদন-নিবেদন, **constitutional agitation** প্রভৃতিতে তাঁর আস্থা ছিল না। এই মুক্তিকামী যুবকের মাথায় এক চিন্তা—আমাদের দেশে এসে, আমাদের অন্নে মানুষ হয়ে, আমাদের সংগে বিবাদ, আমাদের বিরুদ্ধেই লড়াই! ইংরেজের এত তেজ—এত অহঙ্কার! এর ওষুধ দিতেই হবে! ...... প্রথমেই সৈনিক হওয়া প্রয়োজন। যুদ্ধবিদ্যা শিখে লড়াই করে ভারতবর্ষ থেকে বিদেশী তাড়াতে হবে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়!

তরুণ ভবানীচরণ সোজাসুজি কংগ্রেস-সভাপতি আনন্দমোহন বসুর কাছে গিয়ে বললেন—**Not through the pen but through the Sword**, নিজের বাহুবলের ওপর নির্ভর করতে হবে—এই ছিল তাঁর আদর্শ। কিন্তু এই সাংঘাতিক মতবাদকে স্বীকার করে নেবে—এমন মানুষের সন্ধান ভবানীচরণ পাচ্ছিলেন না। তাই "একলা চল রে" মন্ত্র তাঁর দু'কানে বেজে উঠল। তাঁর আয়ত চোখে সৈনিক হবার স্বপ্ন। অন্তরে স্বাধীনতা শক্তিরূপিনী ভারত মাতার প্রতিচ্ছবি।

বাড়ী থেকে পালিয়ে পশ্চিমে কোনো দেশীয় রাজার অধীনে সৈন্য হবার কল্পনা তাঁকে পেয়ে বসল। কলেজের পড়াশোনায় আর মন বসে না। ...যে কথা সেই কাজ! তিনজন সংগী নিয়ে, কলেজের দু'মাসের

মাইনে দশ টাকা সম্বল করে আদর্শবাদী এই তরুণ এঁর গোয়ালিয়র যাত্রা করলেন তখন বয়স সতেরো বছর।……তাঁরা ইটাওয়া ষ্টেশনে নেমে শুনলেন, গোয়ালিয়র সেখান থেকে ৩৬ ক্রোশ দূর। চোখে ভারত-উদ্ধারে স্বপ্ন নিয়ে যুবকদল সেই পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করলেন। এই সম্পর্কে যা বর্ণনা পাওয়া যায় তা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।…"গ্রীষ্মকাল, সকাল বেলা পাঁচটা বাজিয়াছে। চারিজন সতেরো আঠারো বৎসরের বাঙ্গালী যুবক ভারত উদ্ধারের জন্য যাত্রা করিয়াছেন। সঙ্গে চারিটি কি পাঁচটি টাকা আছে। কিন্তু হৃদয়ে সিংহবল। প্রথমেই যমুনা পার হইতে হইল। তারপর অনেক দূর হাঁটিয়া চম্বল নদী পাইলেন। চম্বল পার হইয়া আরও কিছুদূর গিয়া শ্রান্তক্লান্ত হইয়া একটি বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। পরিশ্রমে শরীর অবশ হইয়া আসিয়াছে। চারিজনে পরামর্শ করিলেন, দিনের বেলায় বিশ্রাম করিবেন ও রাত্রিতে পথ হাঁটিবেন। সংগে বিশেষ কিছু আহার সঞ্চয় ছিল না। তেপান্তর মাঠ, বালি আর কণ্টক গুল্মে ভরা। একটা বোতলে কিছু ছোলা ভিজানো ছিল, আর কিছু ছাতু ও গুড় ছিল; তাহাই চারিজনে উদরসাৎ করিলেন।"

কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। আত্মীয় স্বজনরা সন্ধান পেয়ে জোর করে ভবানীচরণকে গোয়ালিয়র থেকে ফিরিয়ে এনে, আবার কলিকাতার মেট্রোপলিটান ইনষ্টিট্যুশনে ভর্ত্তি করিয়ে দিলেন। কিন্তু পড়াশোনা আর ভালো লাগে না। কলমের চেয়ে তরবারির দিকে তাঁর ঝোঁক বেশি। তাই কিছুদিন পরে আবার তিনি গোয়ালিয়র যাত্রা করলেন। এবার একা সংগে ত্রিশ বত্রিশ টাকা। যেমন করে হোক্ ভারত উদ্ধার করতেই হ'বে। পরাধীনতার জ্বালা আর সহ্য হয় না।…উটের গাড়ীতে চড়ে ভবানীচরণ সিন্ধিয়া-রাজ্যের পাহাড়-জঙ্গল পার হয়ে চলেছেন। মনে মনে ভাবছেন—কবে এই বিস্তীর্ণ প্রান্তর মারাঠী অশ্বারোহীতে ছেয়ে যাবে. আর আমি অশ্বপৃষ্ঠে সৈন্য চালনা করব! সূর্য্যের কিরণে কোষমুক্ত তর-

বারি জ্বলে উঠবে। অগণিত শত্রু-নিপাতের দৃঢ়ভিত্তির ওপর স্বাধীন ভারতের জয়পতাকা সগৌরবে উড়তে থাকবে!···তরুণ দেশ প্রেমিকের মনে কত রঙীন কল্পনা, মায়াজাল বিস্তার করতে লাগল।

কিন্তু গোয়ালিয়র মহারাজের সেনাপতির সংগে কথাবার্ত্তা কয়েও যখন তাঁর সাধ অপূর্ণ রইল, তখন কিছুকাল পরে বাধ্য হয়ে ভবানীচরণ পুনরায় কলিকাতায় ফিরে এলেন।

বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যোগ দিয়ে তিনি কিছুদিন আদর্শ শিক্ষা প্রচারে ব্রতী হলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজে কলিকাতায় 'সারস্বত আয়তন' প্রতিষ্ঠা করেন। ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন না নিয়ে উপাধ্যায় মশায় তাদের নানাবিষয়ে শিক্ষাদান করতেন; প্রাচীন আর্য্য ঋষিদের আদর্শে নব-ভারতকে অনুপ্রাণিত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠাই আমাদের কাম্য; নবলব্ধ ইংরেজী জ্ঞান আমাদের ক্রমশঃ আত্মবিস্মৃত করে তুল্‌বে—এই ছিল তাঁর শিক্ষার মূল কথা। রবীন্দ্রনাথ উপাধ্যায় সম্পর্কে একখানি পত্রে যা লিখেছেন, আমরা তার থেকে কিছু উদ্ধৃত করে দিই।

"এমন সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সংগে আমার পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। আমার 'নৈবেদ্য'র কবিতাগুলি প্রকাশ হচ্ছিল তার কিছুকাল পূর্ব্বে এই কবিতাগুলি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁর সম্পাদিত **Twentieth Century** পত্রিকায় এই রচনাগুলির যে প্রশংসা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন, সেকালে সে রকম উদার প্রশংসা আমি আর কোথাও পাইনি।···এই পরিচয় উপলক্ষেই তিনি জান্‌তে পেরেছিলেন আমার সংকল্প, এবং খবর পেয়েছিলেন যে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবে আমি পিতার সম্মতি পেয়েছি ······তিনি তাঁর কয়েকটি অনুগত শিষ্য ও ছাত্র নিয়ে আশ্রমের কাজে প্রবেশ করলেন।··· তখনকার আয়োজন ছিল দরিদ্রের মত, আহার-ব্যবহার ছিল দরিদ্রের আদর্শে। তখন উপাধ্যায় আমাকে যে গুরুদেব

উপাধি দিয়েছিলেন, আজ পর্য্যন্ত আশ্রমবাসীদের কাছে আমাকে সেই উপাধি বহন করতে হচ্চে।"

স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর ব্রহ্মবান্ধব তাঁর অসমাপ্ত ব্রত উদ্‌যাপন করবার মানসে বিলাত-যাত্রার আয়োজন করেন। ভারতের বাণী পাশ্চাত্যে প্রভাব বিস্তার করুক, স্বদেশের গৌরব বিশ্বসমাজে স্বীকৃত হোক্—এই ছিল তাঁর কাম্য। উপাধ্যায়ের বিলাত-যাত্রায় সম্বল মাত্র সাতাশ টাকা। কিন্তু তাঁর অজেয় মনোবলের সাম্‌নে বাধাবিপত্তি, অসুবিধা অকিঞ্চিৎকর সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব কোনমতে পাথেয় সংগ্রহ করে য়ুরোপবিজয় মানসে বোম্বাই থেকে এক বিলাতগামী জাহাজে চড়লেন। সঙ্গে জিনিষপত্র নাই, আছে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতিবাহী আত্মা আর তাঁর মুক্তিকামী সতেজ মন। নিরামিষাশী ব্রাহ্মণ ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর দিগ্বিজয়ে বাহির হলেন!

অক্সফোর্ড হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করার পর তার সুনাম হ'ল। শ্মশ্রুগুম্ফমুণ্ডিত কম্বল মাত্র সম্বল বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর মুখে গভীর তত্ত্বকথা, ভারতপ্রেমের বাণী শুনে য়ুরোপীয় শ্রোতারা বিস্মিত হলেন। উপাধ্যায়ের মহৎ প্রচেষ্টায় ইংরেজরা ভারতীয়দের নামে যে কলঙ্ক রটাতেন তা অনেক মাত্রায় অপনীত হল। হিন্দুস্থানের নরনারীর গৌরব প্রতিষ্ঠিত হ'ল বিলাতের জনসমাজে। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ হিন্দু দর্শনের অধ্যাপক পদ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কার্জন সাহেবের নির্ম্মম অস্ত্রাঘাতে বঙ্গ-খণ্ডনের ব্যবস্থা হ'ল! জনগণ বহুদিনের নিদ্রা ত্যাগ করে "বন্দে-মাতরম" মন্ত্রে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুল্‌ল। বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন করে স্বদেশী ব্রত নিয়ে বঙ্গবাসী নেচে উঠল; ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত বিক্ষোভের তরঙ্গ অপূর্ব্ব উত্তেজনার সঞ্চার করল। উপাধ্যায় সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে জনজাগরণের সিন্ধুমাঝে ঝাপিয়ে পড়লেন। "সন্ধ্যা"য় ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। সরল, সহজ অথচ

তেজোময় নতুন ভাষা সৃষ্টি করে উপাধ্যায় দোকানী, পশারী, মুটে, মজুর আপামর জনসাধারণের প্রাণে সাড়া জাগিয়ে তুললেন। সকলের হাতে "সন্ধ্যা" পত্রিকা। জমিদারের সেরেস্তায়, পাঠশালায়, অন্দরমহলে, বৈঠকখানায় পণ্ডিতের আসরে, পথচারীদের মধ্যে "সন্ধ্যা"র লেখা সম্পর্কে আলোচনা চল্‌তে লাগল। কেশবচন্দ্র সেন প্রচারিত 'সুলভ সমাচারের' পর 'সন্ধ্যা'ই জনগণের সংবাদপত্ররূপে সর্ব্বজনবরেণ্য হয়ে উঠিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ব্রহ্মবান্ধবের দান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এতদিন ধরে ইংরেজ হিন্দুসমাজের উপর যে মায়াজাল বিস্তার করেছিল, "সন্ধ্যা"র কঠোর সমালোচনার আঘাতে তা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল।

নির্ভীক, সত্যপ্রিয় উপাধ্যায় রাজরোষে পড়লেন। অকপটে ন্যায়সঙ্গত কথা বল্‌তেন বলে তিনি অনেকের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। কিন্তু এই তেজস্বী ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্যায়ের সংগে আপোষ মীমাংসা করা অসম্ভব ছিল। তিনি কেন কড়া কথা বল্‌তেন, তার যুক্তি দেখিয়ে লিখেছিলেন —"আমাদের বুলি কেন রূঢ়—কেন এত কড়া। যাঁহারা রুচি রুচি করিয়া বেড়ান, তাঁহাদের কাছে আমি কৈফিয়ৎ দিতে চাহি না। আমরা সাদাসিধে বুলিতে প্রাণের কথা লিখি—তাই সেটা সভ্য বাবুদের ভাল লাগে না। তাঁহারা ছেঁদে-বেঁধে কথা কহেন ও লিখেন। আমরা কিন্তু হৃদয়ের আবেগ অত সভ্যভাবে প্রকাশ করিতে পারি না, তাই আমরা তাঁহাদিগকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া বিদায় লই। কিন্তু যাঁরা আমাদের বুলিটা কিন্তু কড়া বলিয়া নালিশ করেন তাঁহাদের কাছে আমাদের একটি নিবেদন আছে। আমাদের স্বাভাবিক বুলি এত চোয়াড়ে নয়। তবে যখন রাগ দেখাতে হয়—হাঁক ডাক করিতে হয়—তখন মিষ্টি মিষ্টি বলিলে চলে না। দেশের রোগটা কিছু বিষম হইয়াছে, তাই মকরধ্বজেরও উপরে চটী খাওয়াইতে হইবে। এ সময় কি ভেল্‌সায় চলে? দেশে চারিদিকে তমোভাব—অসাড়তা। এখন হাত বুলাইলে চলিবে না—খোঁচা না

দিলে শানাইবে না। আর একটা উপমা দিই। পুকুরের নীচে পচা পাঁক জন্মিয়াছে। সেই জল খাইয়া লোকের জ্বরবিকার ধরিতেছে। ঐ পাঁক একবার ঘাঁটিয়া দিতে হইবে। এখন ঘাঁটিতে গেলেই জল ঘোলা হইবে। এই ঘোলানো দেখিয়া আমাদের সভ্য বাবুরা নাক সেঁটকান। কিন্তু মানুষ যে মরে—সে বিষয়ে তাঁহাদের কোনো সাড়া নাই—ব্যথা নাই। তাঁহারা বুঝেন না যে ঘোলানোটার পরে যখন জল থিতুবে তখন সরোবর নির্ম্মল্ ও স্বাস্থ্যকর হইবে।"

ঘুমন্ত জাতিকে জাগাবার কাজে "সন্ধ্যা"র সঙ্গে যুক্ত হলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, সুরেশ সমাজপতি প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ। তা ছাড়া বহু তরুণ এসে "সন্ধ্যা"র আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারা সকলেই স্বদেশীভাবে উদ্বুদ্ধ। "সন্ধ্যা"র কার্য্যালয় বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠে" রূপান্তরিত হ'ল। হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, মুসলমান, যুবক, বৃদ্ধ সকলের উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের প্রেরণায় স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। মুক্তির ইতিহাসে এই জাগরণ এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

১৩১৩ সনে "সন্ধ্যা" কার্য্যালয় থেকে কিছুদিন ধরে অর্দ্ধ সাপ্তাহিক "করালী" ও সাপ্তাহিক "স্বরাজ" প্রকাশিত হয়েছিল। মুক্তি আন্দোলন প্রচারে অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন পাল প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের নাম চিরতরে যুক্ত হয়ে রইল। আজ উপাধ্যায়ের নাম বিস্মৃত প্রায়। স্বাধীন ভারতে তাঁর কীর্ত্তিকাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত। তাঁর রচনাবলী প্রকাশ করাও আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এ বিষয়ে যত্নবান হবেন, আমরা এই আশা করি।

১৩১৩ সালেই উপাধ্যায় বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে "শিবাজী উৎসবের আয়োজন করেন। তিলক, খাপর্দ্দে, মুঞ্জে প্রমুখ নেতারা কলিকাতায় এলেন। এক সপ্তাহ ধরে সিংহবাহিনী মূর্ত্তির পূজা চল্‌তে লাগল। বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার হ'ল দিকে দিকে। ব্রহ্মবান্ধবই উদ্যোগী হয়ে

"বন্দেমাতরমে"র ঋষি বঙ্কিমের স্মৃতি-উৎসব উপলক্ষে "মাতৃপূজা"র অনুষ্ঠান করেন।

১৩১৫ সনে "এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে" "সিডিসানের (Sedition) হুড়ুম দুড়ুম, ফিরিঙ্গির আক্কেল গুড়ুম" প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে, রাজদ্রোহিতার অপরাধে পুলিশ 'সন্ধ্যা'লয়ে খানাতল্লাসী করল। তাঁর নামে সমন আছে জেনে উপাধ্যায় নিজেই পুলিশকে আহ্বান করে' গ্রেপ্তার হলেন। ফিরিঙ্গির আদালতে পাছে গেরুয়া বসনের অপমান হয় সেজন্য শাদা ধুতি পরে সেখানে গেলেন। বিচারক কিংসফোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে "সন্ধ্যা"র সকল দায়িত্ব নিজের মাথায় নিলেন। আরো বলিলেন, "ভগবৎ প্রেরণায় আমি ভারতে স্বরাজ সংস্থাপনকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছি; এজন্য বিদেশীর নিকট কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিব না।"

অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ উপাধ্যায়ের চিরসঙ্গী ছিল। সিডিসানের মোকদ্দমায় দিনের পর দিন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর সে রোগ আরো বেড়ে গেল। বসবার আসনের প্রয়োজন আছে কি না, এ প্রশ্নের উত্তরে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন,—"ফিরিঙ্গীর'র কাছে ভিক্ষা, কখনই না।"

ক্রমে তাঁর রোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ করল। বন্দী অবস্থায় ক্যাম্বেল হাসপাতালে তাঁর ওপর অস্ত্রোপচার করা হয়। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব বলেছিলেন, "ফিরিঙ্গি" আমাকে কারাগারে রাখে, এমন সাধ্য ফিরিঙ্গির নাই।" শেষ পর্য্যন্ত এই মহাপুরুষের সত্য-বাণীই সফল হ'ল। ১০ই কার্ত্তিক রবিবার সকাল ৮টায় তাঁর চিরমুক্ত আত্মা তেজোময় নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করে' চলে গেলেন। ইংরেজের কারাগার তাঁকে রুদ্ধ করে রাখতে পারল না। বিদেশী বিচারকের দণ্ডকে উপেক্ষা করে হাসিমুখে তিনি অনন্তধামে চলে গেলেন। স্বদেশবাসীর জন্য রেখে গেলেন স্বাধীনতা-মন্ত্রের অমরবাণী। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ তাঁরই প্রতিষ্ঠিত "সন্ধ্যা" পত্রিকায়

এইভাবে ছাপা হয়েছিল—"ইহাই সশরীরে স্বর্গারোহণ—ইহাই তেজস্বীর ইচ্ছা-মৃত্যু—ইহাই কর্মবীরের অবসান!"

দলে দলে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এই শোক সংবাদ পেয়ে প্রিয়তম নেতাকে শেষবারের মত দেখবার জন্য ছুটে এলেন। তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল। মৃত্যুর এক ঘণ্টার মধ্যে আট দশ হাজার লোকের শোভাযাত্রা চলল নিমতলা শ্মশানের অভিমুখে। শবানুগমনে এই বিপুল লোকসমাগম তখনকার দিনে এক অপূর্ব ঘটনা। পাঁচ হাজার লোক সমবেতকণ্ঠে "বন্দেমাতারম" সংগীত গাইতে গাইতে এই মহানায়ককে বহন করে নিয়ে চল্‌লেন। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব জাগ্রত জনতার কত আপন ছিলেন এ ঘটনায় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল। অমর জাতীয় সংগীত শ্মশানের আকাশবাতাস মুখরিত করে তুল্‌ল। স্বদেশপ্রেমিক বীরের চিতায় অগণিত নরনারী শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেন। জ্বলন্ত চিতার ওপর তার অগ্নিশিখার সম্মুখে উপাধ্যায়ের স্বদেশবাসীরা নতুন করে মুক্তি-মন্ত্রে দীক্ষা নিলেন।

দেহত্যাগের একমাস আগে কালীঘাটের নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে উপাধ্যায় বলেছিলেন—"আমি ত মা চিরকালই তোমার দূরন্ত ছেলে—আমি ত কাহারও বন্ধনের মধ্যে কখনও যাই নাই—এই প্রার্থনা তোমার শ্রীচরণে যে, দেশের কাজ করিতে করিতে, সত্যের প্রচার করিতে করিতে, জেলে যাইবার পূর্ব্বে যেন আমার এ দেহ পঞ্চভূতে মিশায়।"

এই তেজস্বী ব্রাহ্মণের একান্ত কামনা পূর্ণ হ'ল। তিনি বলে গেছেন, আবার ফিরে এসে ভারতবর্ষেরই সেবা করবেন। তাঁর এই অভিলাষ সফল হোক্। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রত্যুষে তাঁর অমর বাণী, আদর্শ জীবন আমাদের নবভাবে নব উদ্দীপনায় প্রবুদ্ধ করুক্। *

---

* উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব—শ্রীপ্রভাত বসু লিখিত।

হুগলী জেলার মধ্যে পাণ্ডুয়া থানার অধীন ই, আই, রেল লাইনের পাণ্ডুয়া নামক ষ্টেসন হইতে তিন মাইল পশ্চিমে কাঠাগোড় নামক একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম এখনও বর্ত্তমান আছে এবং তথায় মাহীনগরের বসু বংশীয় অনেক বংশধর এখনও বাস করিতেছেন। পাণ্ডুয়া কলিকাতা হইতে ৪২ মাইল উত্তরে রাঢ়দেশেই অবস্থিত এবং বঙ্গের একটি অতি প্রাচীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ নগর। দুই শতাব্দী পূর্ব্বে পাণ্ডুয়া একটী অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বহু প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাণ্ডুয়ার অনেক ইতিবৃত্ত এখনও পাওয়া যায়। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ব্রাহ্মণ কাণ্ডে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন রাজা আদিশূরের পরে পাল বংশ আসিয়া শূরের শূরত্ব নাশ করিয়া গৌড় অধিকার করিলে পলাতক শূর রাজারা পশ্চিম বঙ্গে আশ্রয় লন। আদিশূরের পুত্র ভূ-শূর রাঢ়ে আসিয়া পুণ্ড্র নামে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান পাণ্ডুয়া বা পেড়োই এই নূতন পুণ্ড্র বলিয়া অনুমিত হয়।

কাঠাগোড়

কান্যকুব্জ হইতে সমাগত পঞ্চ কায়স্থের মধ্যে দশরথ বসু এই বংশের আদি পুরুষ। এই বংশে পুরন্দর খাঁ নামক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রাণ ও সমাজ সংস্কারক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কঠোর বল্লালী প্রথার অনেক অংশের পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া সমাজের বহু উপকার সাধন করেন। বল্লালের নিয়মে কুলীন কায়স্থের কুল কন্যাগত ছিল। ইহাতে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাকে সবিশেষ ক্লেশ পাইতে হইত। পুরন্দর ইহার পরিবর্ত্তন করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রগত কুল প্রবর্ত্তিত করেন। ইহা ভিন্ন তিনি আরো অনেক প্রথার পরিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত প্রথাকে "পুরন্দীর প্রথা" বলে। পুরন্দর মাহীনগর সমাজ-ভুক্ত বসুবংশের শ্রেষ্ঠ রত্ন স্বরূপ। পুরন্দরের সহোদর সুন্দরবর খাঁ মল্লিক ও তদীয় বংশধরগণের যে স্থানে বাস ছিল, ইহা মল্লিকপুর নামে

রাধানাথ বসু মল্লিক

প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই বংশীয় রঘুনাথ বসু বাঙ্গলার তিনজন নবাবের অধীনে দেওয়ানী কার্য্য করিয়া মল্লিক উপাধি প্রাপ্ত হন! ইহার বংশধরগণ অদ্যাপি হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ার অন্তর্গত কাটাগোড় গ্রামে বাস করিতেছেন।

এই রঘুনাথের অধস্তন ৭ম পুরুষ রামকুমার বসু রাধানাথের জনক। ইনি কাটাগোড় গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতার পটলডাঙ্গায় বাস স্থাপন করেন। রাধানাথ বাল্যকাল হইতে মেধাবী শ্রমশীল এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন। ইনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া বিলাত হইতে আগত জাহাজের মুচ্ছদ্দীর কার্য্য করিতে থাকেন এবং স্বীয় অধ্যবসায় বলে জ্যাকস্ এণ্ড কোম্পানি নামক আফিসের মুচ্ছদ্দী হন। ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ বলিয়া তৎকালে অনেক ইংরাজের সহিত সৌহৃদ্য ছিল। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইনি মিঃ রিড নামক সাহেবের সহিত সম্মিলিত হইয়া কলিকাতা হাওড়ায় একটি ডক্ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই ডকের আয়ে ইনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। ডকের অন্যতম অংশীদার রিড সাহেব রাধানাথের সাধুতা ও অধ্যবসায় গুণে মুগ্ধ হইয়া বিলাত প্রত্যাবর্ত্তন কালে রাধানাথকে হুগলী ডকের একমাত্র অংশীদার করিয়া যান। ইংরেজদের সহিত সর্ব্বদা মিশিলেও ইনি কখনও হিন্দুধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য বা ইংরাজী পোষাক পরিধান করেন নাই। ইহার বাটীতে বার মাসে তের পর্ব্ব হইত। স্বীয় চরিত্র গুণে ইনি জনসাধারণের অতুল ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ করেন।

রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক

রাজা সুবোধচন্দ্র কাটাগোড় বসু-মল্লিক বংশ সম্ভূত; ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ইহার জন্ম হয়। সুবোধচন্দ্রের পিতার নাম প্রবোধচন্দ্র। প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ অধ্যয়ন করিতে করিতে তিনি

বিলাতে যান এবং তথায় সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য 'ইনে' প্রবেশ করেন।

তিনি অসাধারণ মেধাবী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন এবং বাঙ্গলা ও ইংরাজী ভাষায় খুব সুন্দর লিখিতে পারিতেন। বিলাতে ব্যারিষ্টারী পাঠ করিবার সময় ১৯৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি একবার কলিকাতায় আসেন, সেই সময় বঙ্গদেশে বিপ্লব আন্দোলনের সূত্রপাত হয়; সুবোধচন্দ্র বিপ্লবীদলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়েন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের ছাত্রদিগকে জাতীয় শিক্ষা দিবার প্রস্তাব হইলে, তিনি এক লক্ষ টাকা দান করেন, এবং উহা হইতেই জাতীয় শিক্ষা পরিষদে সূচনা হয়। বর্ত্তমানে ইহা যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে রূপান্তরিত হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের বিপ্লব আন্দোলনে তাঁহার দান অসামান্য। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিন নম্বর রেগুলেশনে তাঁহাকে আটক করিয়া রাখা হয় এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি মুক্ত হন।

দেশবন্ধু, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শ্রীঅরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর, চক্রবর্ত্তী তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, এবং ইহাদের জন্যই বঙ্গবাসীর হৃদয়ে দেশসেবার স্পৃহা জাগিয়া উঠে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে তাঁহার লোকান্তর হয়। বাঙ্গলার জাতীয় জাগরণে তিনি সারথি ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার পরলোকগমনে একটি সংবাদ পত্রের মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

"...............বাঙ্গলার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যখন সুবোধচন্দ্র প্রতাপ সিংহের ন্যায় দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—যখন তাঁহার দুগ্ধপোষ্য সন্ততিগণের জন্য দুগ্ধ সংগ্রহ করাও কঠিন হইয়াছিল; তখন তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হন নাই—দারিদ্রের কঠোর নিষ্পেষণে তাঁহার ত্যাগ মহিমা মণ্ডিত মুখশ্রী অক্ষুণ্ণই ছিল। তিনি বাঙ্গলাকে ত্যাগ করিতে পারেন না—তিনি মনে প্রাণে বাঙ্গালীকে বুঝিয়াছিলেন—তাহার

দোষকে উপেক্ষা করিবেন, অকৃতজ্ঞতায় নিজের জন্য ব্যথিত হইবেন না। কিসে বাঙ্গালী মানুষ হয়, তাহাই তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল। দেশের কল্যাণের জন্য তাঁহাকে ধীরে ধীরে অকাতরে কত ত্যাগ স্বীকার ও কঠোরতা সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা লেখনী বর্ণনা করিতে অক্ষম।……অদ্য যে সভা হইবে—তাহাতে সকল বাঙ্গালী সম্মিলিত হইয়া সুবোধচন্দ্রের তৃপ্তি বিধানের ব্যবস্থা করুন। তখন তিনি সর্ব্বস্ব দিয়াছিলেন—আজ প্রাণ দিয়া গেলেন। সকল স্বদেশবাসীর আত্মোৎকর্ষ ও চেষ্টায় তাঁহার পবিত্র জীবনের প্রভাব বর্ষিত হউক……"*

ইনি কাটাগোড়ের প্রসিদ্ধ বসু মল্লিক বংশ সম্ভূত। দেহত্যাগ কালে ইনি যে উইল করিয়া যান, তাহার সর্ত্ত মতে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ন্যস্ত মূলধন হইতে বেদান্ত শিক্ষার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তিন বৎসরের জন্য একজন করিয়া অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন তিনি বেদান্ত বিষয়ে ধারাবাহিক উপদেশ দিবেন এবং উক্ত দর্শন সম্বন্ধে মৌলিক তথ্য বাহির করিয়া সংস্কৃত ভাষা বিশেষতঃ বেদান্ত শিক্ষার সহায়তা করিবেন। তিনি ১২৫৲ টাকা হিসাবে মাসিক বেতন পাইবেন এবং তিন বৎসর অন্তে ১৪০০৲ টাকা পাইবেন। এই টাকায় তাঁহার প্রদত্ত উপদেশগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া ৪০০শ খানা পুস্তক বিদ্যালয়কে এবং ১০০শ খানা পুস্তক বন্ধুগণকে বিতরণ করিবার জন্য বসু মল্লিক মহাশয়ের বংশের প্রতিনিধিকে দিতে হইবে। অবশিষ্ট টাকা অধ্যাপক নিজে লইতে পারিবেন। বেদান্ত শিক্ষার জন্য এরূপ দান আর কোন বাঙ্গালী এ পর্য্যন্ত করেননাই। এই দানের জন্য বসু মল্লিক মহাশয়ের নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে।" †

শ্রীগোপাল মল্লিক

---

* নবযুগ, ১০ই অগ্রহায়ণ ১৩২৭

† সরল বাঙ্গলা অভিধান—সুবলচন্দ্র মিত্র, পৃষ্ঠা ১১৬৬

এই বংশের চারুচন্দ্র ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর যে শোক সভার অনুষ্ঠান হয়, ইনি তাহার অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার রূপে পটলডাঙ্গার



চারুচন্দ্র বসু-মল্লিক

তিনি বহু উন্নতি করিয়া দেন এবং দান, ধ্যান ও বিবিধ ক্রিয়াকলাপাদি করিয়া কলিকাতায় বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং বহু নিরাশ্রয় ছাত্র ও বিধবা তাঁহার নিকট হইতে মাসিক বৃত্তি পাইত। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে চারুচন্দ্রের দেহান্তর হয়। *

চুঁচুড়া

চুঁচুড়া হুগলী সদর, কলিকাতা হইতে মাত্র তেইশ মাইল দূরে অবস্থিত। ওলন্দাজগণের ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার জন্য ব্যাটেভিয়ায় ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে 'ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' গঠিত হয় এবং উক্ত বৎসরেই তাঁহারা ব্যবসা করিবার জন্য বঙ্গদেশে আগমন করেন। **Hooghly District Gazetteer** নামক সরকারী গ্রন্থের লেখক মিঃ এল, এস, এস, ওম্যালী (**Mr. L. S. S. Omalley**) উক্ত পুস্তকে লিখিয়াছেন—"**The earliest record of the arrival of watchships in the North of the Bay in 1516.**" দিল্লীর বাদসাহ সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ওলন্দাজদিগেকে ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে একখানি 'ফরমান' দেন এবং উক্ত 'ফরমানের' সর্ত্তানুযায়ী চুঁচুড়া তাঁহাদের সম্পূর্ণ অধিকারে আসে। ব্যবসায়াদির জন্য তাহারা চুঁচুড়া উপনিবেশ স্থাপন করিবার পর হইতে এই স্থানটী বঙ্গদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

আধুনিক চুচুড়া সহর প্রতিষ্টিত হইবার পূর্ব্বে এই স্থান একটী সামান্য পল্লী ছিল এবং এতদ অঞ্চলের যাবতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজকার্য্যাদি সপ্তগ্রাম হইতেই নির্ব্বাহ হইত। ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট্ আকবরের

* বংশ গৌরব—শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র বসু-মল্লিক

রাজস্বসচিব টোডরমল্ল বঙ্গ, বিহার উড়িষ্যার রাজস্ব নির্দ্ধারণকল্পে সুবা বাঙ্গলাকে কয়েকটী সরকারে এবং উক্ত সরকারগুলিকে আবার কতকগুলি পরগণায় বিভক্ত করেন।

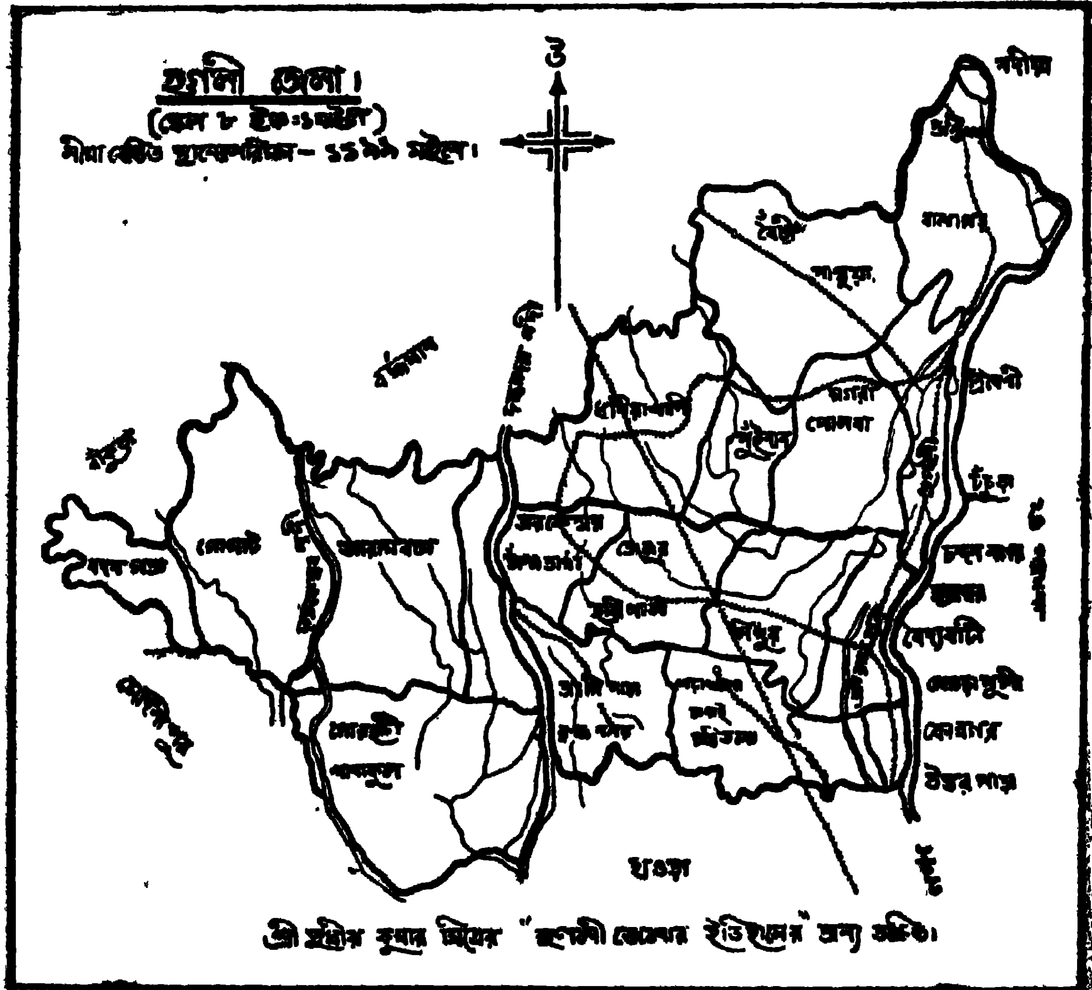
এই স্থান তৎকালে 'সরকার সাতগাঁও'এর অন্তর্গত 'আরসা' পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল (**Pargana Arsha of Satgaon**) এবং 'কুলিহাণ্ডা' বলিয়া এই স্থানটী পরিচিত ছিল। বহু প্রাচীন দলিলাদিতে 'কুলিহাণ্ডা' নামটী অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়; পরবর্ত্তী কালে কুলিহাণ্ডা 'ধরমপুরে' পরিণত হয় এবং হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির চার নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে 'ধর্ম্মপুর' বলিয়া একটী পল্লী এখনও বর্ত্তমান আছে। এই পল্লীর মধ্যে প্রাচীরবেষ্টিত প্রায় বিশ হাত উচ্চ একটী প্রাচীন সমাধি আছে এবং 'বিবির-গোর্' বলিয়া উহা বর্ত্তমানে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাই এই স্থানের প্রাচীনতম স্মৃতিচিহ্ন।

চুঁচুড়া নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলিয়াছিলেন যে, 'ক্ষুদ্র' হইতে চুঁচুড়া নাম আসিয়াছে, কিন্তু ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ওলন্দাজগণ এই নাম দিয়াছিল, কিন্তু কেন এবং ইহার অর্থ যে কি তাহার কোন পূর্ব্বের ইতিহাস পাওয়া যায় না।

ইংরাজদিগের বঙ্গদেশে বাণিজ্য বিস্তার করিবার বহু পূর্ব্বে ওলন্দাজগণ এই দেশে বাণিজ্য করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহারা যে সময় চুঁচুড়ায় উপনিবেশ স্থাপন করেন, সেই সময় ফরাসীগণ চন্দননগরে ছিল; দুইটী স্থান পাশাপাশি বলিয়া সীমা নির্দ্দেশ করিবার জন্য তাঁহারা একটী খাল খনন করিয়াছিলেন। এই সীমানা 'ফরাসীগড়' বলিয়া অদ্যাপি অভিহিত হয়।

১৬৫০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সাজাহানের নিকট হইতে এবং ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের নিকট হইতে ওলন্দাজগণ আরও দুইখানি 'ফরমান' পাইয়াছিলেন।

১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার একজন সামান্ত ভূম্যধিকারী শোভা সিংহ বর্দ্ধমানের জমিদার রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের সহিত সামান্ত বিবাদ উপলক্ষ করিয়া বর্দ্ধমান আক্রমণ এবং বঙ্গালায় মোগল অধিকার উচ্ছেদ করিবার জন্ত অগ্রসর হন এবং বর্দ্ধমানের রাজপ্রাসাদ অধিকারপূর্ব্বক বিদ্রোহীরা রাজা কৃষ্ণরামকে নিহত করেন।* কৃষ্ণরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎরাম রায়



কোন প্রকারে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। নবাব ইব্রাহিম খাঁন এই সময় বাঙ্গলার নবাব এবং নূরউল্লা খাঁ হুগলী, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরের 'ফৌজদার' ছিলেন। বিদ্রোহীগণের উপদ্রবে বঙ্গদেশে হুলুস্থুল পড়িয়া

* বর্দ্ধমানে রাজা কৃষ্ণরামের নামানুসারে 'কৃষ্ণসায়র' নামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

গেল। নবাব ইব্রাহিম খাঁ ফৌজদার নূরউল্লা খাঁকে বিদ্রোহ দমন করবার জন্য নির্দ্দেশ দিলেন। তিনি সহস্র সৈনিকের অধিনায়ক হইলেও কৃষি বাণিজ্যাদি অন্যান্য অর্থকর ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকায় সৈন্যচালনা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। যাহা হউক, নবাবের হুকুম পাইয়া তিনি হুগলীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ইউরোপীয় ব্যবসায়িবৃন্দ তাঁহাদিগের উপনিবেশ ও বাণিজ্য রক্ষা করিবার জন্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি নবাবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন এবং সেই সুযোগে চুঁচুড়ায় ওলন্দাজগণ 'ফোর্ট গ্যাস্‌টেভিস্' (**Fort Gustavas**) দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। নবাবের নিকট হইতে দুর্গ নির্ম্মাণের অনুমতি পাইবার পূর্ব্বেই ওলন্দাজগণ প্রাচীর দিয়া চুঁচুড়াকে সুরক্ষিত করিয়াছিল। কারণ ওলন্দাজ দুর্গের উত্তরদিকে "১৬৮৭ খৃষ্টাব্দ" এবং দক্ষিণ দিকের ফটকে "১৬৯২ খৃষ্টাব্দ" এই সাল দুইটী লিখিত ছিল। উক্ত দুর্গ ঘণ্টাঘাট হইতে ব্যারাক পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; পরে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ চুঁচুড়া অধিকার করিয়া পূর্ব্বোক্ত দুর্গ ভূমিসাৎ করেন।

The Fouzdar was the chief Police Officer and Judge of all crimes not capital. *

যাহা হউক, ফৌজদার নূরউল্লা খাঁ বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য হুগলীর দিকে অগ্রসর হইলেন এবং শত্রুর আগমন-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া হুগলী-দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চুঁচুড়ার ওলন্দাজ বণিক্-সম্প্রদায়ের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। অতঃপর দুর্গমধ্যে থাকা নিরাপদ নহে বলিয়া তিনি ফকিরের বেশে পলায়ন করেন এবং হুগলী শোভা সিংহের হস্তগত হয়। পরে নবাব ইব্রাহিম খাঁ চুঁচুড়ার ওলন্দাজদিগের সহায়তায় হুগলী পুনরুদ্ধার করেন এবং বিদ্রোহীগণ সপ্তগ্রামে পলায়ন করে। বর্দ্ধমানে

* Fields Regulations

রাজ-পরিবারের যে সকল ব্যক্তি বন্দী হইয়াছিল, তন্মধ্যে রাজার এক সুন্দরী কন্যাও ছিলেন। শোভাসিংহ তাহাকে বলপূর্ব্বক অঙ্কশায়িনী করিবার চেষ্টা করিলে, তিনি শাণিত ছুরিকার দ্বারা তাহাকে হত্যা করিয়া পরে নিজেও 'কলঙ্কিণীর দেহ বহন করিব না' বলিয়া আত্মহত্যা করেন।

শোভাসিংহ বর্দ্ধমান জয়ের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ হুগলী জেলার অন্তর্গত মান্দারণ নামক স্থানে যে হজরৎ ইসলাইলেয় দরগা আছে তাহা নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

চুঁচুড়ায় যে-সমস্ত স্থান ওলন্দাজদিগের অধিকারভুক্ত ছিল তাহা হইতে তের হাজার একশত বাইশ টাকা (১৩,১২২৲) তাহাদের রাজস্ব আদায় হইত। বাস্তভিটার উপর তাহারা বিঘা প্রতি সাড়ে বাইশ টাকা খাজনা আদায় করিত এবং চুঁচুড়ায় তৎকালে বাস্ত-ভিটার পরিমাণ ছয়শত আটান্ন বিঘা ছিল। মোগলদের নিকট হইতে চুঁচুড়া ওলন্দাজদের অধিকারে আসবার পর, তাহারা খাজনার হার কিছু বৃদ্ধি করে নাই, তবে নষ্ট জমি বা জমি হস্তান্তর করিবার সময় তাহারা রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার জন্য খাজনা আদায় করিত। চুঁচুড়ার কোষাধ্যক্ষ মিঃ হার্কলোটো (Mr. Herkloto) ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে হুগলীর কালেক্টার সাহেবকে বলেন যে, তিনি বিগত চল্লিশ বৎসরের ওলন্দাজদের দলিলগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রত্যেক জমির খাজনা তখনও যেরূপ ছিল এখনও সেইরূপ আছে।

ওলন্দাজদের সময় একুশ ইঞ্চি মাপে সাধারণতঃ এক হাত ধরা হইত; কিন্তু ইংরাজী মাপে আঠারো ইঞ্চিতে এক হাত হয়। জন ডিঙ্কস (John Dinks) নামক একজন ওলন্দাজের হাতের মাপে জমি মাপা হইত এবং তাহার হাত একুশ ইঞ্চি লম্বা ছিল। চুরাশী ইঞ্চি লম্বা একটি লাঠির দ্বারা জমি মাপা হইত এবং উক্ত লাঠিটী চারিটি ভাগে ভাগ করা ছিল। পরে উক্ত লাঠিটী তিন ইঞ্চি কমাইয়া

দেওয়া হয় এবং সমগ্র লাঠিটীর মাপ সাড়ে চার হাত দাঁড়ায়; এই মাপকে 'রাইনল্যাণ্ড' (Rynland) মাপ বলা হইত। ইংরাজগণ চুঁচুড়া অধিকার করিয়া ওলন্দাজদিগের প্রদত্ত পাট্টা পরিবর্ত্তন করিয়া আঠারো ইঞ্চি হিসাবে মাপিতে আরম্ভ করেন কিন্তু চুঁচুড়ার শীল-বংশ উক্ত পরিবর্ত্তনে বিশেষ আপত্তি জ্ঞাপন করেন। উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উক্ত পরিবর্ত্তন করিবার ভার গ্রহণ করেন এবং হুগলীর কালেক্টার মিঃ এইচ, বেলী (**Mr. H. Balli**) কর্ত্তৃক তিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত হন।

ওলন্দাজদিগের চুঁচুড়া উপনিবেশ ব্যাটাভিয়ার অধীন ছিল এবং চুঁচুড়ায় কোন পদ শূন্য হইলে ব্যাটেভিয়া হইতে উক্ত স্থানে কর্ম্মচারী নিয়োগ হইত। একজন গভর্ণর ও সাতজন কাউন্সিলের সদস্যের উপর চুঁচুড়া-উপনিবেশ পরিচালনের ভার ছিল।উক্ত সাতজন সদস্যের মধ্যে মাত্র পাঁচজন সদস্য ভোটদিবার অধিকারী ছিলেন; বাকী দুইজন সদস্য ভোট দিতে না পারিলেও চুঁচুড়ার গভর্ণরকে মন্ত্রণা দিতে পারিতেন। ওলন্দাজ গভর্ণরগণ বিলাসিতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং বার্ষিক এক লক্ষ টাকা তাঁহারা সংসার-খরচ. করিতেন। চুঁচুড়া গভর্ণরের "তাঞ্জাম" নামে একটি পাল্কী ছিল; উহার মধ্যে চেয়ারে বসিবার ব্যবস্থা ছিল। এইরূপ "তাঞ্জাম" একমাত্র গভর্ণর ব্যতীত আর কাহারও ব্যবহার করিবার ক্ষমতা ছিল না। গভর্ণর যে সময় নগর ভ্রমণে বাহির হইতেন সেই সময় বাদ্যকরগণ বাজনা বাজাইয়া অগ্রে যাইত। চুঁচুড়ার গভর্ণর কর্ত্তৃক টানা-পাখার প্রথম প্রচলন এই দেশে হইয়াছিল এবং বড় বড় তালপাতার পাখাও তাহারা প্রথম ব্যবহার করিত। তৎকালে কাঁচের শার্সির প্রচলন না থাকিলেও চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদিগের বাড়ীতে বেতের জাফ্রি লাগান হইত। ওলন্দাজ গভর্ণরগণের মধ্যে ভার্লেট, ভিনসেণ্ট, সিয়ারম্যান, ওভারব্রিকের নাম পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ওলন্দাজদিগের প্রতিষ্ঠিত চুঁচুড়া

গীর্জার মধ্যে বহু গভর্ণর এবং তাহাদের সহধর্ম্মিণীর তৈলচিত্র রক্ষিত আছে। ওলন্দাজ কাউন্সিলের সাতজন সদস্যের উপর চুঁচুড়া পরিচালনের ভার ন্যস্ত ছিল। তন্মধ্যে একজনের উপর বিচার ও শাসনের ভার ছিল, তিনি জজ্-ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়া অভিহিত হইতেন। তাঁহার অসীম ক্ষমতা ছিল এবং বেত্রাঘাত হইতে আরম্ভ করিয়া জেল ও ত্রিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত তিনি ধনী ব্যক্তিগণকে জরিমানা করিতে পারিতেন। এতদ্ভিন্ন নগরাধ্যক্ষ ও কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি আরও কয়েকটী উচ্চ পদ ছিল। জমি হস্তান্তর করিবার জন্য ওলন্দাজদিগের দুইটি আদালত ছিল; একটী দেশীয় বা জমিদারী আদালত এবং আর একটী ইউরোপীয় আদালত। *

ইংরাজদিগের সহিত ওলন্দাজদিগের বিশেষ প্রীতি ছিল এবং ইংরাজগণ ওলন্দাজ-রমণীদের সহিত নৃত্য-গীত করিবার জন্য চুঁচুড়ায় প্রায়ই যাইতেন। প্রথম ইংরাজ গভর্ণর উইলিয়াম হেজ ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে আসিয়া ওলন্দাজ গভর্ণরের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে হেজ সাহেবের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট মিঃ গাইফোর্ডের (**Mr. Gyford**) মনোমালিন্য হইলে তিনি কিছুদিন চুঁচুড়ায় অবস্থান করেন। এই সম্বন্ধে তাহার ডাইরীতে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহার কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিলাম।

"I went to visit Duch Director and give him thanks for his kindness in so readily in his quarters. †

ওলন্দাজরা এই স্থান হইতে বহুবিধ জিনিষ ইউরোপে চালান দিয়া ধনৈশ্বর্য্যে ইউরোপীয় জাতিগণের মধ্যে তাহারাই প্রধান হইয়াছিল। তন্মধ্যে জাভায় অহিফেন রপ্তানি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ওলন্দাজগণ পাটনা হইতে অহিফেন কিনিয়া জাভায় উহা চালান দিয়া বৎসরে

* শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হুগলীর ইতিহাস' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

† **Hedges Diary, Part I By Col Yule**

চারিলক্ষ টাকা লাভ করিত। এতদ্ব্যতীত বাগানে তাহাদের বিশেষ সখ ছিল এবং কড়াইশুটির চাষ তাঁহারাই এই স্থানে প্রথম করিয়াছিল। 'ওলন্দাশুটি' নামক কড়াই আজও তাহাদের স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দেয়। চুঁচুড়াতে তাহারা এত শাক-সব্জীর বাগান করিয়াছিল যে, উহা হইতে শাক সব্জী বিদেশে রপ্তানি করিয়া তাহারা বহু অর্থ লাভ করিত।

পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজগণ জয়লাভ করিয়া মিরজাফরকে বাঙ্গলার নবাব করেন কিন্তু তাহার শাসনকালে বঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন অরাজকতা বিরাজ করে। একদিকে ইংরাজের প্রভুত্ব ও অন্যদিকে মীরকাযেমের ষড়যন্ত্রে মীরজাফর আর একটি ইউরোপীয় জাতিকে ইংরাজের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে সচেষ্ট হন। ওলন্দাজগণ এতদিন ব্যবসা লইয়াই ব্যস্ত ছিল কিন্তু মীরজাফরের সহায়তার প্রতিশ্রুতিতে তাহারাও রাজ্যস্থাপনে উদ্যোগী হয়। ব্যাটাভিয়া হইতে ওলন্দাজগণ সাতখানি রণতরী আনাইল, উহার তিনখানি জাহাজে ছত্রিশটি করিয়া কামান, আর তিনখানিতে ছাব্বিশটি করিয়া কামান এবং একখানি জাহাজে যোলটি কামান বসান ছিল। এতদ্ব্যতীত সমস্ত জাহাজগুলিতে দেড় হাজার ওলন্দাজ সৈন্য ছিল। তাহারা বাহিরে প্রকাশ করিল যে, জাহাজগুলি করমণ্ডল উপকূলে যাইবে, কোন বিশেষ কারণে কেবল একবার চুঁচুড়ায় থামিবে। ক্লাইভ বিচক্ষণ ব্যক্তি, তিনি অবশ্য যুদ্ধের বিষয় চিন্তা করেন নাই, তথাপি ইংরাজদিগের প্রভাব ও প্রতিপত্তি নষ্ট করিবার জন্য যে, জাহাজগুলি আসিয়াছে সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইয়া কর্ণেল ফোর্ডকে উক্ত নৌবহর ধ্বংস করিবার আদেশ দিলেন। ফরাসীদের ন্যায় ওলন্দাজগণের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ হইল এবং এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাহাদের যাবতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরেই বিনাশ হইল।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই ইংরাজগণ একবার চুঁচুড়া অধিকার করিয়াছিলেন এবং ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর উহা প্রত্যর্পণ করেন।

এই বাইশ বৎসর মিঃ আর ব্রিচ (**Mr. R. Brich**) চুঁচুড়ার কমিশনার রূপে কার্য্য করেন। উক্ত সময় তিনি ইংরাজদিগকে ৮৪৭৲ টাকা রাজস্ব আদায় করিয়া দিতেন। ওলন্দাজগণের ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভ হইলেও 'ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর' কর্ম্মচারীদের অসাধুতায় সমস্ত অর্থ কোম্পানীর নিকটে পৌছাইত না। ওলন্দাজ কর্ম্মচারিবৃন্দের অসাধুতার জন্ত হল্যাণ্ডের রাজা চুঁচুড়া ইংরাজগণকে ছাড়িয়া দেন। ইংরাজদিগেরও সুমাত্রায় লোকসান হইতেছিল বলিয়া ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে একটি সন্ধি হয় এবং উক্ত সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী ওলন্দাজদিগের একশত আশী বৎসরের উপনিবেশ চুঁচুড়া সহর ইংররদিগের অধিকারভুক্ত হয়। উপরোক্ত সন্ধি অনুযায়ী ওলন্দাজগণ ইংরাজদের নিকট হইতে সুমাত্রা দ্বীপ ও ফোর্ট মার্লবো প্রাপ্ত হয় এবং ইংরাজগণ চুঁচুড়া, মালকাপুর, পলতা, বালেশ্বর এবং মালাক্কা দ্বীপ প্রাপ্ত হয়। এই হস্তান্তর সম্বন্ধে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে তারিখের "সমাচার-দর্পণে" যে সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

ইংরাজের হস্তে চুঁচুড়া সমর্পণ

"৭ই মে চুঁচুড়া নগর ইংলণ্ডীয়দের হস্তে সমর্পণ করিবার দিন স্থির হইলে শ্রীযুক্ত বেলাই সাহেব ও শ্রীযুক্ত স্মাইথ সাহেব শ্রীশ্রীযুতের অজ্ঞানুসারে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ঐ দিন অতি প্রত্যুষে চুঁচুড়াতে গিয়া ঐ সহরের বড় সাহেব শ্রীযুক্ত বোমন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। যেহেতুক চুঁচুড়া নগর ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে সমর্পণ করিবার কারণ চুঁচুড়ার বড় সাহেব হলাণ্ডীয় অধিপতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতএব ধারানুসারে সকল কর্ম্ম হইলে এবং তাবৎ কাগজপত্র ঐ দুই সাহেবের হস্তগত হইলে পর চুচুড়ার নিশান কাষ্ঠের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত উঠিত যে হলণ্ডীয় নিশান, সে নিশান নীচে নামান গেল। তখন ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেরা সকলের সম্মুখে এই পাঠ করিলেন যে, এই স্থান এক্ষণে

পর্য্যন্ত হলণ্ডীয়দের অধিকার ছিল, কিন্তু এক্ষণে ইংলণ্ডীয়েরদের হইল। ইহা প্রকাশ হইবামাত্র যে স্থানে হলাণ্ডীয় নিশান উঠিত সেই স্থানে ইংলণ্ডীয় পতাকা উড্ডীয়মানা হইবামাত্র তত্রস্থ সিপাহীরা তিনবার বন্দুকের দেওড় করিল।"

ওলন্দাজগণ খুব মিশুক ছিলেন এবং দেশীয় ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহারা খুবই মেলা-মেশা করিতেন। বহু ওলন্দাজ বঙ্গ-মহিলা বিবাহ করিয়া চুঁচুড়ায় বহু বৎসর যাবৎ বসবাস করেন। তাহাদের বংশধরগণ হুগলীর কালেক্টরের নিকট হইতে পেন্সন প্রাপ্ত হইতেন। চুঁচুড়ার হিন্দুদিগের প্রাচীন বিগ্রহ ষণ্ডেশ্বর জীউর যে পিতলের দুইটি ঢাক অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও ওলন্দাজ গভর্ণর করিয়া দিয়াছিলেন। ওলন্দাজগণ ইংরাজদিগকে চুঁচুড়া অর্পণ করিলেও, ওলন্দাজ গভর্ণর ওভারব্রিক এবং আটজন নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী তাহাদের মহিনার এক-তৃতীয়াংশ পেন্সন পাইতেন। প্রথমে পামার এণ্ড কোম্পানী পেন্সনের টাকা দিতেন; পরে হুগলীর কালেক্টার উক্ত পেন্সন দিতেন।

ইংরাজগণ চুঁচুড়া অধিকার করিয়া ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত "ফোর্ট গ্যাস্‌টোভস্‌" দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং উক্ত দুর্গের কড়ি, বরগা প্রভৃতি লইয়া ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সৈন্যদের জন্য ব্যারাক নির্ম্মাণ করেন। এই ব্যারাক নির্ম্মাণ করিবার জন্য ইংরাজগণ বহু প্রজার বাস উচ্ছেদ করেন এবং সেইজন্য তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল। এই দীর্ঘ অট্টালিকার মধ্যে এক হাজার ব্যক্তির থাকিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়। ইহাই বঙ্গদেশের দীর্ঘতম অট্টালিকা এবং প্রত্যেক তলায় ৬৫টী করিয়া বৃহৎ খিলান আছে। ব্যারাক নির্ম্মাণের পূর্ব্বে, ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবরের "সমাচার দর্পণে" এই সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:

"চুঁচুড়া—সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, চুঁচুড়া ইংলণ্ডীয়দের হস্তগত হইয়াছে। সম্প্রতি শুনা গেল যে, শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুর [illegible]

প্রজাদিগকে উঠাইয়া দিয়া সেখানে সৈন্যের স্থিতির কারণ বারিক বসাইবেন।"

এই অট্টালিকার দ্বিতলে ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষায় নিম্নলিখিত লিপিগুলি খোদিত আছে—"This Barracks were commenced December 1829. The foundation and plinth of the whole and superstructure of the lower storey west wing by Lt. J. A. Crommelin, Executive Engineer, the remainder of the structure and entire finishing by Captain Won Bell of Artillary Ex Officer."

বঙ্গভাষায় লিখিত আছে—"শ্রীযুক্ত কা বেল সাহেবের দ্বারায় সুমতসিদ্ধ শ্রীরামহরি সরকার, সাং চক্রবেড়ে এবং শ্রীসেখ তমু দফাদার, সাং চক্রবেড়ে, ইং সন ১৮২৯ বাঃ সন ১২৩৬।"

বহু প্রজা উচ্ছেদ এবং বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া সৈন্যদের জন্য এই ব্যারাক নির্ম্মিত হইলেও লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক আসিয়া এই স্থান হইতে ব্যয়সঙ্কোচ করিবার জন্য সৈন্য স্থানান্তরের প্রস্তাব করেন। কিন্তু জঙ্গী-লাট তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে বিলাতে এই ব্যাপার নিষ্পত্তির জন্য যায়। বিলাত হইতে সৈন্য স্থানান্তর করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং চুঁচুড়াব যাবতীয় সৈন্য কলিকাতায় চলিয়া আসে এবং ব্যারাক খালি পড়িয়া থাকে। পরবর্ত্তীকালে সরকারী অফিস এবং কোর্ট উক্ত ব্যারাকে প্রতিষ্ঠিত হয়।

চুঁচুড়ার প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ অট্টালিকা হিসাবে ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত আরমেনিয়ানদের গীর্জ্জাটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টানদিগের উপাসনা করিবার ইহা বঙ্গদেশের মধ্যে দ্বিতীয় গীর্জ্জা বলিয়া প্রসিদ্ধ। খোজা জোয়ানিজের পুত্র মার্গার এই গীর্জ্জার ভিত্তি স্থাপন করেন এবং ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে তাহার ভ্রাতা জোসেফ কর্ত্তৃক ইহা সমাপ্ত হয়। প্রতি

বৎসর ২৬শে জানুয়ারী এই স্থানে আরমেনিয়ানগণ 'জন্-দি-ব্যাপ্‌টিষ্টে'র স্মরণার্থে উপাসনা করিয়া থাকেন। মার্গার-বংশের কয়েকটি প্রাচীন সমাধি এই গীর্জ্জার প্রাঙ্গণে আছে। এই প্রাচীন গীর্জ্জা সম্বন্ধে ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ্চ তারিখের "সমাচার-দর্পণে" যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :

"মোং চুঁচুড়াতে এক আরমানী গীর্জ্জাঘর আছে, সে ঘর মার্কার জোহানিস সাহেব আরম্ভ করিয়াছিলেন, পরে তাঁহার ভ্রাতা ১৬৯৬ সালে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে গির্জ্জাঘরের অগ্রভাগ প্রস্তুত হইয়াছিল না, তাহাতে কলিকাতাস্থ এক আরমানী সাহেবের বিধবা স্ত্রী বিবি বেগরাম ঐ গির্জ্জাঘর উচ্চ করিয়া নূতন প্রস্তুত করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন।"

গির্জ্জা

এতদ্ভিন্ন ওলন্দাজ গভর্ণর মিঃ জি, ভারনেট কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গঙ্গার ধারে একটি ওলন্দাজদিগের গির্জ্জা আছে। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে সিয়ারমান কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্থে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়, কিন্তু তিনি গতাসু হইলে মিঃ ভারনেট ইহা সমাপ্ত করেন। ইহার মধ্যে বহু ওলন্দাজ গভর্ণর ও তাহাদের সহধর্ম্মিণীর তৈলচিত্র রক্ষিত আছে। এই গীর্জ্জা সম্বন্ধে **List of Ancient Monuments In Bengal** নামক সরকারী গ্রন্থে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত আছে :

"**Chinsurah Church**—Dutch now English Church. This church was erected in A. D. 1763 by G. Vernet, then attached Governor entirely out of his own means. The steeple had been previously constructed by Mr. Schittermann in 1744 who was Governor at that time. Hung around the inside of the church are the portraits of some of the Dutch Governors and their wives."

চুঁচুড়ায় রোমান-ক্যাথোলিকদের আর একটি গীর্জ্জা আছে। ইহা

সেবেস্তানা সাউ নামক এক মহিলার অর্থে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইংরাজদিগের হস্তে আসিলে চুঁচুড়ার গীর্জাগুলি ও দুইটি সমাধিক্ষেত্র কলিকাতার লর্ড বিশপের হস্তে অর্পণ করা হয় এবং ওলন্দাজগণ দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে যে চারখানি 'ফরমান' পাইয়াছিল তাহাও 'প্রেসিডেন্সী কমিটি অফ রেকর্ডে'র অফিসে (Presidency Committee of Records) পাঠাইয়া দেওয়া হয়। চতুর্থ 'ফরমান' খানি ওলন্দাজগণ ১৭১১ খৃষ্টাব্দে পাইয়াছিল। অন্যান্য তিনখানির বিষয় যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

ওলন্দাজদের শাসনকালে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে "হুগলী মহসীন কলেজের" ভবন নির্ম্মিত হইয়াছিল; ম'সিয়ে পেরন্ (Mons Perron) নামক একজন ফরাসী সামান্য সৈনিকরূপে বঙ্গদেশে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আগমন করেন এবং মহারাষ্ট্রীদের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক উক্ত সুবৃহৎ ভবনটি নির্ম্মাণ করেন। এই বাটী নির্ম্মাণের কিছুদিন পরেই তিনি ইউরোপ যাত্রা করেন এবং প্রাণকৃষ্ণ হালদার নামক চুঁচুড়ার একজন বিলাসী ধনী জমিদার ইহা ক্রয় করিয়া তাঁহার বৈঠকখানা রূপে ব্যবহার করিতেন। এই বাটীর দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে যে বৃহৎ ভবনটি বর্ত্তমানে হুগলী মাদ্রাসার মুসলমান ছাত্র নিবাসরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা পূর্ব্বোক্ত হালদার মহাশয়ের পূজার বাড়ী ছিল এবং পঞ্চ খিলানবিশিষ্ট বৃহৎ দুর্গাপূজার দালানটি অদ্যাপি এই স্থানে দৃষ্ট হয়। তাঁহার ন্যায় দানশীল ব্যক্তি এ অঞ্চলে তৎকালে কেহ ছিল না। ওলন্দাজগণ তাঁহাকে তাঁহার প্রাসাদোপম বাড়ীর সম্মুখে ছয়জন সিপাহী রাখিবার অনুমতি দেন।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি তের হাজার টাকা দিয়া ত্রিবেণীতে সরস্বতী নদীর উপর একটি পুল নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

In 1828 the well known Zaminder Babu Pran Krishna

Haldar made a gift of Rs. 13000 for a masonary bridge over the river Saraswati at Tribeni."*

তৎপরে এই ভবন চুঁচুড়ার জগমোহন শীল ক্রয় করেন এবং ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বিশ হাজার টাকায় এই ভবনটি হুগলী মহসীন কলেজের জন্য ক্রয় করা হয় এবং উক্ত বৎসরের ১লা আগষ্ট তারিখে মহসীন কলেজের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। চুঁচুড়ার উক্ত হালদার বংশে বাবু নীলমণি হালদার এবং বহুভাষাবিদ সুপণ্ডিত নীলরত্ন হালদার জন্মগ্রহণ করেন। নীলরত্ন হালদার কলিকাতা হইতে "বঙ্গদূত" নামক সপ্তাহিক পত্র সম্পাদনা করিতেন এবং এই পত্রিকাখানি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহার সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু যাহা লিখিয়াছিলেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:

"বাবু নীলরত্ন হালদার বঙ্গদূত সম্পাদক ছিলেন। ইনি নানা ভাষায় পণ্ডিত ও সুকবি ও সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন। ইনি চুঁচুড়ানিবাসী প্রসিদ্ধ বাবু, বাবু নীলমণি হালদার মহাশয়ের পুত্র। তৎকালে তাঁহার পিতার ন্যায় কেহ বাবু ছিল না। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের পর টরেন্স সাহেবের আমলে নীলরত্ন বাবু সল্টবোর্ডের দেওয়ান হইয়াছিলেন।"†

বাবু নীলরত্ন হালদার মহাশয়ের রচিত পুস্তকাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' নামক পুস্তকের ১ম খণ্ডে (২য় সংস্করণ পৃষ্ঠা ৪৫৪-৪৫৯) লিখিত আছে।

চুঁচুড়ায় 'হুগলী মহসীন কলেজ' বঙ্গদেশের একটি গৌরব, বঙ্গের প্রাচীনতম কলেজগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। হাজি মহম্মদ মহসীনের 'ফণ্ড' হইতে এই কলেজ ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখে খোলা হয়

* Hooghly Past & Present, page 180.

† সেকাল আর একাল, পৃঃ ৬৭।

এবং ডক্টর টমাস, এ. ওয়াইজ (Dr. Thomas A. Wise) নামক হুগলীর সিভিল সার্জ্জেন এই কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। প্রথম এই কলেজের নাম "কলেজ অফ মহম্মদ মহসীন" (College of Mohammad Mohsin) ছিল এবং প্রত্যেক ছাত্র জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে বিনা বেতনে এই কলেজে শিক্ষা লাভ করিতে পারিত। স্কুল ও কলেজ একই বাড়ীতে হইত এবং পরস্পর সংস্পর্শযুক্ত ছিল। তখন এণ্ট্রান্স বা বি-এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয় নাই বলিয়া ছাত্রেরা জুনিয়ার ও সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষা দিত। তৎকালে এই কলেজের ইংরাজী বিভাগ কলেজ এবং কলেজিয়েট স্কুল এই দুইটী বিভাগে বিভক্ত ছিল। সিনিয়ার ডিভিসান সেকশ্যান 'এ' এবং জুনিয়ার ডিভিসনে সেকশ্যান 'বি', তন্মধ্যে সিনিয়ার ডিভিসানে তিনটি শ্রেণী ও জুনিয়ার ডিভিশানে চারিটি শ্রেণী ছিল।*

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতে 'কাউন্সিল অফ এডুকেশন' বিনা বেতনে শিক্ষা দিবার প্রথা এই কলেজ হইতে তুলিয়া দেন এবং সিনিয়ার বিভাগের ছাত্রদের তিন টাকা এবং জুনিয়ার বিভাগের ছাত্রদের দুই টাকা বেতন ধার্য্য হয়। অক্ষম ও দরিদ্র ছাত্রদের বেতন দিতে হইত না। কিন্তু শিক্ষকগণকে লইয়া একটী কমিটি উক্ত ছাত্রগণ বেতন দিতে অক্ষম কি না তাহা নির্দ্ধারণ করিতেন। এই সময় হইতে এই কলেজের নাম "হুগলী কলেজ" বলিয়া অভিহিত হয়।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার যে জরিপ-কার্য্য (Trigonometrical Survey) অলিভার কর্ত্তৃক আরম্ভ হইয়া ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়; উক্ত জরিপকার্য্যের জন্য এই কলেজের সুপ্রশস্ত ছাদ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।†

* History of Hooghly College By K. Zachariah, Page 45.

† Hooghly Past & Present

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট * বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই কলেজে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভ করেন। চুঁচুড়ার অপর পাড় কাঁটালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করিলেও বঙ্কিমচন্দ্রের আদি নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত দেশমুখো গ্রামে এবং তাঁহার প্র-পিতামহ রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতুলের বিষয় পাইয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করেন। এই সম্বন্ধে "সঞ্জীবনী-সুধায়" তিনি যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি :

"অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেণী ফুলিয়া কুলীনদিগের পূর্ব্ব পুরুষ। তাঁহার বাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো। তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ কাঁটালপাড়া গ্রাম নিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্রজীবন চুঁচুড়ায় অতিবাহিত হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তী কালে এই স্থানে বসিয়া তিনি 'আনন্দমঠ' রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার তত্ত্বাবধানে চুঁচুড়ায় এক সখের নাট্য-সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল এবং দীনবন্ধু মিত্রের "লীলাবতী" নাটক ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা চুঁচুড়ায় অভিনয় করেন। এই সম্বন্ধে ডক্টর হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহার কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিতেছি।

"লীলাবতি মহলায় গিরিশচন্দ্র নানা কার্য্যের ঝঞ্ঝাটে প্রথমে বিশেষ ভাবে যোগদান করিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন সংবাদ আসিল দেশমান্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের তত্ত্বাবধানে চুঁচুড়ায় এক নাট্য সম্প্রদায় গঠিত হইয়া 'লীলাবতী'র মহলা দেওয়া হইতেছে, তখন, অর্দ্ধেন্দুশেখর গিরিশচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন "চুঁচুড়ার দলের কাছে হেরে যাবো, আর তুমি বসে তাই দেখবে?" গিরিশ

* ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এন্ট্রান্স এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অগত্যা অভিনয়ে যোগদান করিয়া ললিতের ভূমিকা গ্রহণ করেন। স্বয়ং গ্রন্থকার লীলাবতীর অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন; অভিনয় দেখিয়া দীনবন্ধু নিজে গিরিশবাবুকে শ্রদ্ধার সহিত সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন— "আমার কবিতা যে এমন করে পড়া যায় তা আমি জানতাম না, **take this complement at least**; অভিনেতাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, এইবার চিঠি লিখবো—তুয়ো বঙ্কিম।" *

লীলাবতীর অভিনয়ের বহু পূর্ব্বে রামনারায়ণ তর্করত্ন বিরচিত "কুলীনকুল সর্ব্বস্ব" নামক বঙ্গদেশের প্রথম অভিনীত নাটক ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই তারিখে, চুঁচুড়ায় নরোত্তম পালের বাড়ীতে অভিনয় করা হয়।† চুঁচুড়ায় এই নাটকের অভিনয়ে তৎকালে কুলীনদিগের মধ্যে ভীষণ ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল। হরিনাভির সুবিখ্যাত পণ্ডিত তর্করত্ন মহাশয় কুলীনগণ বহুবিবাহে রত থাকায় সমাজে যে গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই উক্ত নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন। চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ রূপচাঁদ পাক্ষী উক্ত নাটকের জন্য কয়েকখানি সঙ্গীত রচনা করিয়া দেন। **"Rupchand Pakshee a noted musician of that time, composed songs for the occassion and sang them."**‡

চুঁচুড়ায় কুলীন কুল সর্ব্বস্ব নাটকের অভিনয়ে কুলীন ব্রাহ্মণগণ কিরূপ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন তাহা নিম্নের সংবাদটী হইতে বুঝিতে পারা যায়।

"The acting of the Kulinkulasarvasa Natak at Chinsurah has, it appears given great offence to the Kulins of the locality. The Natak is an illexecuted burlesque.

* গিরিশ-প্রতিভা, পৃষ্ঠা ৬০

† সংবাদ প্রভাকর, জুলাই ১৮৫৮

‡ **Calcutta Review, 1873, Page-275.**

The acting took place in the house of a gentleman of the Baniya caste and Kulin Brahmins* indeed, it is said, to retaliate in kind." †

চুঁচুড়ার গ্রাম্যদেবতা 'শ্রীশ্রীষণ্ডেশ্বরজীউ' নামক মহাদেব বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং জাগ্রত দেবতা। ষোড়শ শতাব্দীতে দিগম্বর হালদার ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালে গঙ্গার ধারে এই স্থানে বহু জঙ্গল ছিল;



শ্রীশ্রীষণ্ডেশ্বরজীউর মন্দির

দিগম্বর হালদারের পুত্র উক্ত বিগ্রহের মন্দির নির্ম্মাণের সময় জঙ্গল কাটিতে কাটিতে একটী বাঘ দেখিতে পান এবং তিনি একপ

---

* Hindu Patriot. 15th July 1858.

† The Indian Stage-Vol. II নামক গ্রন্থে বিস্তারিত বিবরণ আছে।

শক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন যে, একাই ঐ বাঘটিকে মারিয়া ফেলেন। সেই জন্য বাগু হালদার বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পূর্ব্বে ষণ্ডেশ্বর জীউর কাঁচা মন্দির ছিল; সিদ্ধেশ্বর রায় চৌধুরী বর্ত্তমান পাকাবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ষণ্ডেশ্বরের দুইটী পিতলের ঢাক ওলন্দাজ গভর্ণর তৈয়ারী করিয়া দেন। এবং গঙ্গার ধারে 'ষণ্ডেশ্বর তলার ঘাট' নীলাম্বর শীল নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ষণ্ডেশ্বরের পূজার জন্য যে সমস্ত দেবোত্তর জমি আছে তাহা "হালদারইল্যাণ্ড" (Halderiland) বলিয়া অভিহিত। চুঁচুড়ায় শ্যামবাবুর ঘাটে ষণ্ডেশ্বরজীউর প্রতিষ্ঠাতা হালদার-বংশের বংশধরগণ অদ্যাপি বাস কবিতেছেন। বালীর গঙ্গোপাধ্যায় বংশ ষণ্ডেশ্বরজীউর বর্ত্তমান সেবায়েত।

'ষণ্ডেশ্বর জীউর' মন্দিরের পার্শ্বে একটি দুর্গা-মন্দির আছে, চুঁচুড়ার বল্লভ সোম ইহা নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান মন্দিরের উপরে নিম্নলিখিত লেখাগুলি উৎকীর্ণ আছে:

শ্রীশ্রীদুর্গা

শ্রীশ্রীশ্যামাপদারবিন্দ

ভক্ত শ্রীরাধাগোবিন্দ সন ১২৫২ সাল—বৈশাখ।

'এমামবাড়া হাসপাতাল' নামক দাতব্য চিকিৎসালয় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে হুগলীর সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার টমাস ওয়াইজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। হাজি মহম্মদ মহসীনের ফণ্ড হইতে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এই হাসপাতাল বর্ত্তমান বাড়ীতে উঠিয়া আসে। দানবীর হাজি মহম্মদ মহসীন ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে জন্মগ্রহণ করেন। মহসীনের ভগ্নী মন্নু বেগম তাঁহার বার্ষিক, পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি মহসীনকে দিয়া যান। মহসীন উক্ত সম্পত্তি ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে চরম দানপত্র দ্বারা সৎকার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য দান করিয়া যান। মহসীনের মৃত্যুর পর তাঁহার নিযুক্ত মাতোয়ালীদ্বয় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মহসীনের দান নষ্ট

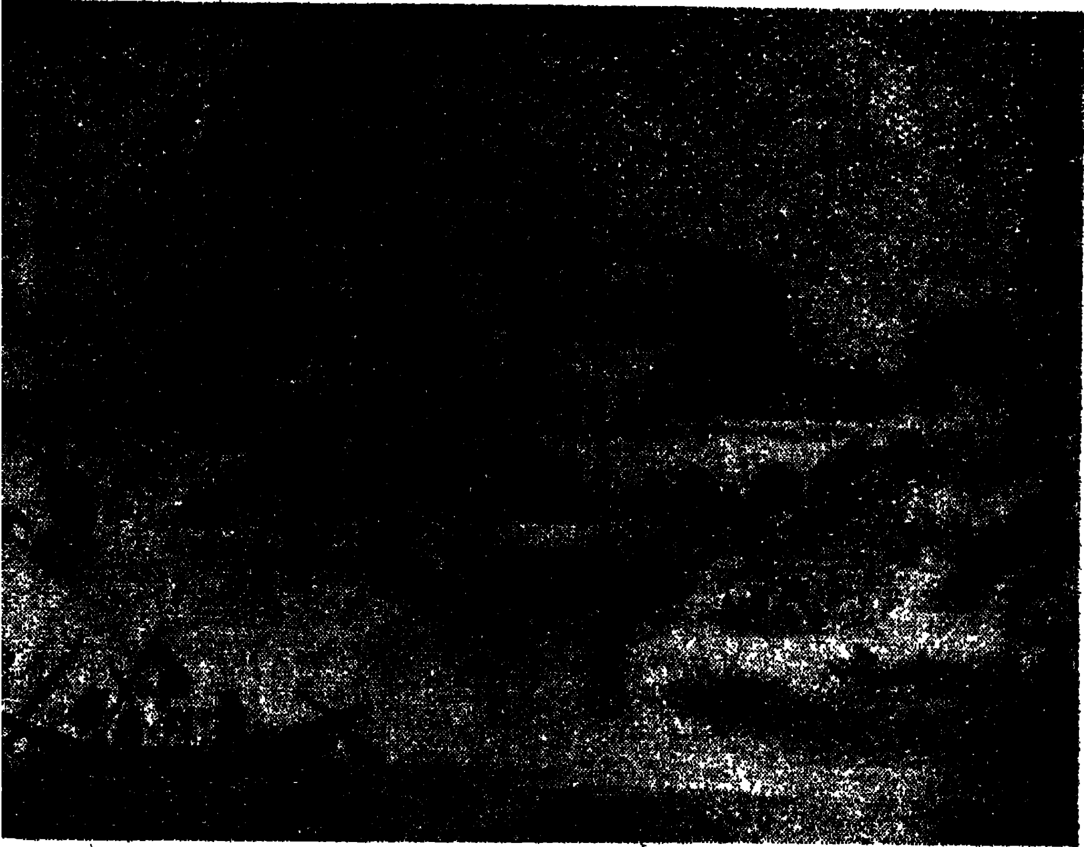
করিবার চেষ্টা করেন। বান্দা আলি খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তি মন্নু বেগমের পোষ্যপুত্র বলিয়া আদালতে নালিশ করেন এবং এই মামলায় ১৮১০ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করেন এবং বিলাতে প্রিভি-কাউন্সিল হইতে আলি খাঁ হারিয়া যায়। এই সময়ে সম্পত্তির আয় নয় লক্ষ টাকা সঞ্চিত হইয়াছিল এবং গভর্ণমেণ্টের হাতে আসিয়া ইহার বার্ষিক আয় দেড় লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। উক্ত অর্থ হইতে এই হাসপাতাল, হুগলী মহসীন কলেজ ও হুগলীতে প্রসিদ্ধ 'এমামবাড়া' নির্ম্মিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত 'মহসীন ফণ্ড' হইতে বহু মক্তব এবং মুসলমান ছাত্র উচ্চশিক্ষার জন্যও অর্থ লাভ করিয়া থাকে।

চুঁচুড়ায় একটী প্রাচীন সূর্য্যমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং উহা ত্রয়োদেশ শতাব্দীর মূর্ত্তি বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'চুঁচুড়ায় সূর্য্যমূর্ত্তি' ও উহার প্রতিষ্ঠাতা সোমবংশ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি :

"চুঁচুড়ায় সোমবংশ যে খুব বিখ্যাত তাহা সকলেই অবগত আছেন। ইঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের মধ্যে একজন ৬৯৯ বর্ষ * পূর্ব্বে বাঙ্গলায় আসিয়া বাস করেন তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধর বলভদ্র সোম গৌড়েশ্বরের প্রধান মন্ত্রী বা 'উজীর মমালক' ছিলেন। গৌড়েশ্বরের অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী পুরন্দর খাঁ বা গোপীনাথ বসু অত্যন্ত ধনাঢ্য এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি আবাল্য সূর্য্যমূর্ত্তির পূজা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার এক পরম রূপবতী কন্যা নিত্য তাঁহার প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরময়ী সূর্য্যমূর্ত্তির পূজা করিতেন। এক-দিন সেই অনিন্দ্যসুন্দরী পূজানিরত হইয়াছেন, এমন সময় বলভদ্র তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হন। তিনি পুরন্দরের নিকট কন্যা প্রার্থনা করেন এবং পুরন্দরও তাঁহাকে জামাতৃরূপে লাভ করিতে ইচ্ছাপ্রকাশ

* সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা, সন ১৩১৮, পৃষ্ঠা—২৩২।

করেন। বিবাহান্তে বলভদ্র ক্রমশঃ সূর্য্যোপাসক হইয়া পড়িলেন। এই বলভদ্রের বংশ-পরম্পরায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সূর্য্যমূর্ত্তির কিছুকাল পূজোপাসনা চলিয়া আসিতেছিল। বলভদ্রের প্রপৌত্র শ্যামরাম মন্ত্রান্তরে দীক্ষিত হন। তদবধি তাঁহাদিগের গৃহস্থিত সূর্য্যমূর্ত্তি অপূজিত থাকে। এই



হুগলী মহসীন কলেজ চুঁচুড়া

শ্যামরাম বাঙ্গালার নবাবের নিকট হইতে 'বাবু' উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সময় তাঁহার নাম-প্রতিপত্তি যথেষ্টই হইয়াছিল। ইনি সাধারণের জন্য দুইটী স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। শ্যামরাম বাবুর বাটীতে কোন এক বৃহৎ কার্য্যোপলক্ষে সূর্য্যমূর্ত্তিটী স্থানান্তরিত হইয়া তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত ঘাটে স্থান লাভ করে।"*

* ১৩১৮ সালে ৩১১ বর্ষ ছিল, বর্ত্তমানে ৪০০ বর্ষ হইবে।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর লিখিয়াছেন—"চুঁচুড়ার সোমবংশ ও বাগ্‌বাজারের মহারাজ রাজবল্লভের বংশ একই। কারণ, লক্ষ্মীনারায়ণ সোম ও কৃষ্ণবল্লভ সোম এই দুই সহোদর যথাক্রমে উক্ত দুই বংশের পূর্ব্বপুরুষ।* সোমবংশব মধ্যে ডাক্তার দয়ালচন্দ্র সোম ও শিক্ষকতা কার্য্যে শিবচন্দ্র সোম বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে দশম আইন অনুসারে 'হুগলী-চুঁচুডা মিউনিসিপ্যালিটী' গঠিত হইলে বলরাম মল্লিক মিউনিসিপ্যালিটীর প্রথম চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন এবং কৃষ্ণদাস লাহা চুঁচুড়ার জলের কষ্টের জন্য একলক্ষ টাকা দান করেন। কলিকাতার বিখ্যাত 'ল'হা-বংশ' চুঁচুডার লাহাবংশ-সম্ভূত। এতদ্ব্যতীত শীল, মণ্ডল, দত্ত প্রভৃতি কয়েকটী বিখ্যাত বংশও এইস্থানে আছে।

প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রথম গদ্যপুস্তক 'প্রতাপাদিত্যচবিত' রচয়িতা রামরাম বসু, স্বনামধন্য মহাত্মা ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার; সুরসিক সাহিত্যিক দীননাথ ধর ঔপন্যাসিক তারকনাথ বিশ্বাস, বিচারপতি আমির আলি, প্রসিদ্ধ গায়ক লালবিহারী পাঠক, মথুরামোহন দত্ত, নিতাইচাঁদ শীল, নন্দলাল দে, দীননাথ মুখোপাধ্যায়, বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়, নিতাইচাঁদ শীল, পদ্মলোচন মণ্ডল, প্রভৃতির আবাসস্থান এই চুঁচুড়ায়। এতদ্ব্যতীত রেভারেণ্ড লালবিহারী দে এবং বৈদেশিকগণের মধ্যে বাঙ্গলার প্রথম প্রোটেষ্ট্যাণ্ট মিশনারী কিরনাণ্ডার (Kiernander ইনি বাঙ্গালীকে প্রথম ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেন) এবং চার্লস ওয়েষ্টন (Charles Weston) নামক অন্ধকূপহত্যার সহিত জড়িত হল্‌ওয়েল সাহেবের বিশেষ বন্ধু এই স্থানে বাস করিতেন। ওয়েষ্টন

* বিশ্ববাণী—১৩৩৭ সাল।

সাহেব ব্যবসায়ের দ্বারা বহু অর্থ উপার্জ্জন করিলেও, প্রতি মাসে ষোলশত টাকা করিয়া তিনি দরিদ্রদিগকে দান করিতেন।

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে বঙ্গদেশের প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। তারপর শ্রীরামপুরের মিশনারীদের চেষ্টায় এবং চুঁচুড়ার রামরাম বসুর উৎসাহে ও আগ্রহে বঙ্গভাষার প্রথম গদ্য-পুস্তক "প্রতাপাদিত্যচরিত" এবং "লিপিমালা"



চুঁচুড়া ব্যারাকের একাংশ—বঙ্গের দীর্ঘতম অট্টালিকা

যথাক্রমে ১৮০১ এবং ১৮০২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রেভারেণ্ড লং সাহেব ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে "কলিকাতা রিভিউ" পত্রিকায় লিখিয়াছেন—"The first

work and the first Historical one that appeared was the life of Protapaditya by Ram Bose" *

তৎকালের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ বঙ্গভাষাকে অবজ্ঞা করিতেন এবং তাঁহারা যাবতীয় চিঠি-পত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই ভাবে চলিতেছিল। তারপর খৃষ্টান মিশনাগণের চেষ্টায় বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার কল্পে পূর্ব্বোক্ত ধারার পরিবর্ত্তন হয়। রামরাম বসুর রচিত প্রথম গদ্য পুস্তক কেরী সাহেবের চেষ্টায় শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয় এবং উক্ত পুস্তকের পত্রসংখ্যা ১৫৬। নিম্নে 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রের' রচনার নমুনা প্রদত্ত হইল :

"নহবৎখানার উপরে ঘড়ি-ঘর। সে স্থানে ঘড়িয়ালেরা তাহাদের ঘড়িতে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে দণ্ড পূর্ণ হবা মাত্রেই তারা তাহাদের ঝাঁজের উপর মুদ্গর মারিয়া জ্ঞাত করায় সকলকে।"

রামরাম বসুর দ্বিতীয় পুস্তক "লিপিমালা" ১৮০২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক কি জন্য রচিত হইয়াছিল তাহা উক্ত পুস্তকের নিম্নোক্ত কয়েক লাইন হইতেই বুঝা যাইবে :

"এ হিন্দুস্থান মধ্যস্থল বঙ্গদেশ কার্য্যক্রমে এ সময় অন্যান্য দেশীয় ও উপদ্বীপীয় ও পর্ব্বতস্থ ত্রিবিধ লোক উত্তম মধ্যম অধম অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে এবং অনেক অনেকের অবস্থিতি ও এই স্থানে এখন এ স্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা তাহারা এ দেশীয় চলন ভাষা অবগত নহিলে রাজক্রিয়াক্ষম হইতে পারেন না ইহাতে তাহাদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলন ভাষা ও লেখাপড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ব্ববিধ কার্য্যক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে ভূমীয় যাবতীয় লেখাপড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গ্রথিত করিয়া লিপিমালা নামক পুস্তক রচনা করা গেল।"

---

* Descriptive Catalogue of Bengali works.

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে চুঁচুড়া নিবাসী মথুরামোহন দত্ত 'মুগ্ধবোধের' বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। এই ব্যাকরণে সন্ধি-প্রকরণ পর্য্যন্ত আছে এবং ইহার পত্রসংখ্যা ৫৫। এতদ্ব্যতীত পরবর্ত্তী কালে বঙ্গসাহিত্যে মহাত্মা ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্র সরকার, দীননাথ ধর প্রভৃতির দান সর্ব্বজনবিদিত।

চন্দননগরের তন্তুবায়বংশীয় একজন অন্ধ স্বভাব-কবি চুঁচুড়ায় বাস করিতেন, লোকে তাঁহাকে 'চণ্ডীকানা' বলিয়া ডাকিত। ভিক্ষা করিয়া তিনি দিনাতিপাত করিতেন; স্বরচিত গান ব্যতীত অন্য কোন গান তিনি গাহিতেন না। আজও চুঁচুড়ার লোকমুখে তাঁহার বহু গান প্রচলিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতের মধ্যে একমাত্র চুঁচুড়ায় প্রাচীনকালে বরফ প্রস্তুত হইত বলিয়া জানা যায়। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে কলিকাতায় সাহেবদের এক নাচের মজলিসে বরফ আসিয়াছিল দেখিয়া 'কলিকাতা গেজেটে' যে সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এইরূপ:

"The ice it is presumed, must have come from the well known ice-field at Hooghly, the only one have existed in the lower provinces." *

ইহার অর্দ্ধশতাব্দী পরেও চুঁচুড়ার বরফ কুণ্ডে বহু বরফ উৎপন্ন হইত দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে একটি সংবাদ উদ্ধৃত হইল:

"চুঁচুড়ায় বরফ।—স্কট সাহেবের গেজেটে প্রকাশিত এক পত্রে দৃষ্ট হইতেছে যে জানুয়ারি মাসের প্রথম ২৯ দিবস পর্য্যন্ত চুঁচুড়ার বরফকুণ্ডে ২১৮৬ মোন বরফ উৎপন্ন হইয়াছে এবং ঐ বরফ মোন করা ১০ টাকা অবধি ১৩ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইতেছে।" †

* Calcutta Gazette, 15th November 1787.

† সমাচার-দর্পণ—৩০শে জানুয়ারী ১৮৩৬।

চুঁচুড়ার প্রাণকৃষ্ণ লাহা ও লালমোহন পাল ১৮২২ খৃষ্টাব্দে লটারীতে একলক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন। এই সম্বন্ধে ১২২৮ সালের ৬ই ফাল্গুন তারিখের "সমাচার দর্পণ" পত্রে নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়:

"কলিকাতা ২৬ লাটরী॥—৮০৯ নম্বর টিকীটে ১০০০০০ এক লক্ষ টাকা চুঁচুড়ার শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ লাহা ও শ্রীযুত লালমোহন পালের নামে উঠিয়াছে এ টাকা তাহারা তুল্যাংশ ক্রমে লইয়াছে এতদ্ভিন্ন অন্য ২ যে টিকীট উঠিয়াছে তাহা নীচের তপশীলে জানা যাইবে।"

বঙ্গ-সাহিত্যের প্রসারে চুঁচুড়াবাসী যে অগ্রণী হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; বঙ্গসাহিত্যের সহিত সাময়িক পত্র-পত্রিকার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সাময়িক পত্রিকার সাহায্যে বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের যে প্রভূত উন্নতি হইয়াছে তাহার ইতিহাস সকলেই জানেন। বঙ্গদেশে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ এই বিষয়ের পথপ্রদর্শক হইলেও চুঁচুড়াবাসিগণও এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। নিম্নে চুঁচুড়া হইতে যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল:

১। এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ—প্রথমে ইহা সরকারী সংবাদপত্র ছিল এবং কলিকাতা হইতে রেভারেণ্ড ওব্রায়ান স্মিথের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইত। পরে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৎপরে প্যারীচরণ সরকার ইহার সম্পাদনা করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্যারীচরণ সরকার শ্যামনগর ষ্টেশনে ই-বি রেলওয়ে দুর্ঘটনার বিষয় লিখিয়াছিলেন বলিয়া সরকারের সহিত তাঁহার মতবিরোধ হয় এবং তিনি ছাড়িয়া [illegible]; পরে ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ইহার সর্ব্বসত্ব দেওয়া হয় এবং তিনি ইহার সম্পাদক হন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়।

২। চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ—১৮৯২ খৃষ্টাব্দে দীননাথ মুখোপাধ্যায় ইহা

প্রথম প্রবর্ত্তন করেন; আজও এই সাপ্তাহিক পত্রখানি নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত ধ্যানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার সম্পাদনা করেন।

৩। বেঙ্গল ম্যাগাজিন—১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে নিমাইচাঁদ শীল কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয় এবং রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ইহা সম্পাদনা করেন।

৪। সুবোধিনী—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্র দীক্ষিতের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

৫। শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার—১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়; চার বৎসর পরে ইহা বর্দ্ধমান মাসিক পত্রের সহিত সম্মিলিত হইয়া "শিক্ষাদর্পণ ও মাসিক পত্রিকা" বলিয়া প্রচারিত হয়।

৬। চিকিৎসা দর্পণ—১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

৭। সাধারণী—১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

৮। পূর্ণিমা—মাসিক পত্র—চুঁচুড়া হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

৯। প্রতিমা—বামাচরণ বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

১০। বাসনা—কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বাহির হয়।

১১। বিনোদিনী—শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবীর সম্পাদনায় বাহির হয়।*

১২। নবজীবন—১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়চন্দ্র সরকার দ্বারা সম্পাদিত হয়।

১৩। বয়স্য—বিপিনচন্দ্র দে কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া বাহির হয়।

---

* মহিলার নাম থাকিলেও ইহা মহিলা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত না। নামটি ছদ্মনাম ছিল।

১৪। মহামায়া— হেমশশী সোমের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

১৫। জননী—প্রসাদদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বাহির হয়।

১৬। শিল্প ও সাহিত্য—নিত্যই মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়।

১৭। জ্যোৎস্নাহার—প্রসাদদাস গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়।

১৮। বঙ্গদর্পণ—নিতাই মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বাহির হয়।

১৯। সনাতন ধর্ম্মকথা—কালীকুমার দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

২০। সমাচার—ব্রজবল্লভ রায় ও সুবোধ রায় কর্ত্তৃক বাহির হয়।

২১। মিতা—অজয় সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

২২। যুগরবি—শ্রীপ্রফুল্ল কুমার সরকারের সম্পাদনায় ১৩৫৩ সালের বৈশাখ হইতে বাহির হয়।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ছত্রিশ আইনানুসারে বর্দ্ধমান জেলাকে দুইভাগে ভাগ করিয়া বর্দ্ধমান ও হুগলী এই দুইটি জেলা গঠিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

জেলা বোর্ড

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে জেলার রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ মেরামত, স্বাস্থ্যোন্নতি, শিক্ষা, পানীয়জল সরবরাহ প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্য করিবার জন্য হুগলী জেলা বোর্ড গঠিত হয়। চুঁচুড়ায় জেলা বোর্ডের কার্য্যালয় অবস্থিত। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জেলা বোর্ডের কার্য্য পরিচালনের জন্য সরকার হইতে একজন চেয়ারম্যানকে মনোনয়ন করিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় স্বায়ত্ব শাসন আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর, মনোনয়ন প্রথা উঠিয়া যায় এবং সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন করিয়া চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে ত্রিশ জন সদস্য লইয়া হুগলী জেলা বোর্ড গঠিত। তন্মধ্যে কুড়ি জন সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং দশজন সদস্য সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হন। জেলাবাসী খাজনার সহিত যে রোডসেস্ (Road Cess) দেন, তাহা হইতে এবং সরকার প্রদত্ত অর্থে ও রেলওয়ে, খেয়াঘাট ও

খোঁয়াড় প্রভৃতির আয় হইতে জেলার যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। নিম্নে জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যানদিগের প্রত্যেকের নাম প্রদত্ত হইল :

মিঃ জি, টয়েনবি—১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

মিঃ এইচ, জি, কুক—১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

স্যার এফ, চিটাক—১৮৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

মিঃ ডি, বি, এ্যালেন—১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

মিঃ এফ, সি, ফ্রেঞ্চ—১৭৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

মিঃ টি, ইঙ্গলিশ—১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

মিঃ এ, জি, হ্যালিফ্যাক্স—১৯০৩ হইতে ১৯০৪ পর্য্যন্ত

মিঃ বি, দে—১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১০ পর্য্যন্ত

মিঃ জে, ল্যাং—১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১২ পর্য্যন্ত

মিঃ ডবলিউ, প্রেন্টিস—১৯১২ হইতে ১৯১৬ পর্য্যন্ত

মিঃ এফ, ব্রাডলি-ব্যার্ট—১৯১৬ হইতে ১৯১৮ পর্য্যন্ত

মিঃ এস, মুখার্জ্জি—১৯১৮ হইতে ১৯১৯ পর্য্যন্ত

মিঃ এ, এন, মবার্লি—১৯১৯ হইতে ১৯২০ (মার্চ্চ) পর্য্যন্ত

* শ্রীবরদা প্রসাদ দে—১৯২০ হইতে ১৯২৪ পর্য্যন্ত

* রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র মুখার্জ্জি—১৯২৪ হইতে ১৯৩১ পর্য্যন্ত

* শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়—১৯৩১ হইতে ১৯৪৮ পর্য্যন্ত

হুগলী জেলা গঠিত হইবার পর বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত যে সকল ম্যাজিষ্ট্রেট এই জেলায় কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম এইস্থানে উল্লিখিত হইল। চুঁচুড়া শহরে কেবল যে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বাস করেন, তাহা নহে, বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার পর্য্যন্ত এইস্থানে বসবাস করেন এবং চুঁচুড়াই বর্দ্ধমান

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট

* ইঁহারা বে-সরকারী এবং নির্ব্বাচিত চেয়ারম্যান

বিভাগের হেডকোয়াটার। ১৭৯৫ হইতে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একই ব্যক্তি জজ্ ও ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে কার্য্য করিতেন বলিয়া তাহারা জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়া কথিত হইতেন; ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট পদটি পরিবর্ত্তন করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়া রূপান্তরিত হয়।



হুগলী জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের একখানি প্রাচীন চিত্র

সরকারী কাগজপত্রে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ আর, হোমস (Mr. R. Holmes) এর অধীনে হুগলী জেলা ছিল বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে হুগলী বলিয়া কোন পৃথক জেলা গঠিত হয় নাই। ওম্যালি সাহেব স্থির করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ রাজস্ব আদায়ের জন্য

বোধ হয় মিঃ হোমস্ হুগলী অঞ্চলে মিঃ রেডফিয়ার্ণ সাহেবের অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"As mentiones in the history, in 1787 R. Holmes was in charge of Hughli, apparently as a sub-district which in March 1787 was combined with Nadiya under Mr. T. Redfearn. The jurisdiction of these officers was that of Revenue Collector than of Magistrate." *

নিম্নে ম্যাজিষ্ট্রেটগণের নাম উল্লিখিত হইল :

মাননীয় সি, এ, ব্রুস (Horible C. A. Bruce) 1795—1799.

মিঃ টমাস ব্রুক (Thomas Brooke) 1799—1802.

মিঃ আর্নেষ্ট (—Ernest) —1809.

মিঃ ডেভিড ক্যাম্পেল (David Campbell) 1812—1814.

মিঃ উইলিয়াম ব্রডি (William Brodie) 1814—1816.

মিঃ হেনরী ওকলে (Henry Oakley) 1816—1826.

মিঃ ডেভিড স্মিথ (David Smyth) 1827—1836.

মিঃ চার্লস মার্টিন (Charles R. Martin) 1837

মিঃ জেমস্ কার্টিস (James Curtis) 1838

মিঃ রবার্ট বার্লো (Robart Barlow) 1839—1841.

মিঃ উইটওার্থ রাসেল (F. Whitworth Russel) 1842—1851

মিঃ টমাস্ ব্রুস (Thomas Bruce) 1852.

মিঃ হেনরী ষ্টেনফোর্থ (Henry Stainforth) 1853

মিঃ জেমস্ প্যাটন (James Patton) 1854—1855.

মিঃ জর্জ্জ ম্যাকিণ্টোশ (George Gordon Mackintosh) 1856.

মিঃ হেনরী বেলী (Henry Vincent Bayley) 1857—1858

---

* Hooghly District Gazetteers.

মিঃ হেনরী হ্যালকেট (Henry Craigie Halket) 1859

মিঃ জন ডালরিম্পল (John Dalrymple) 1860

মিঃ চার্লস বাক্ল্যাণ্ড (Charles Thomas Buckland) 18 1.

মিঃ আর্থার পিজন (Arthur Pigon) 1862—1863.

মিঃ জন এডওয়ার্ড লিলি (John Edward Lilly) 1863.

মিঃ আলেকজান্দার হোপ (Alexander Hope) 1863.

মিঃ আর্থার পিজন (Arthar Pigon) 1864—1866.

মিঃ জন লোইস (John Mangles Lowis) 1866.

মিঃ আর্থার পিজন (Arthur Pigon) 1866—1867.

মিঃ জর্জ্জ ব্রাইট (George Bright) 1867—1869.

মিঃ রোল্যাণ্ড ককরেল (Rowland Cockerell) 1869.

মিঃ জর্জ্জ ব্রাইট (George Bright) 1869—1870.

স্যার উইলিয়াম জেমস্ বার্ট (Sir William James Bart) 1870.

মিঃ জর্জ্জ ব্রাইট (Gorge Bright) 1870—2.12.1871.

মিঃ হেন্রী থোবি প্রিন্সেপ (Henry Thoby Prinsep)
2.12.1871—19.3.1875.

মিঃ উইলিয়াম কর্ণেল (Wiliam Cornell) 20.3. 1875—5.4.1875.

মিঃ উইলিয়াম অর্সকিন (Willam Erskin Ward)
6.4.1875—12.12.1875.

মিঃ হেনরী লফোর্ড (Hewary Lawford)
13.12.1875—19.6.1876.

মিঃ টমাস বাইটন (Thomas Beighton) 20.6.1876—21.7.1876.

মিঃ হেনরী থবি প্রিন্সেপ (Henry Thoby Prinsep)
22.7.1876—14.4.1877

মিঃ জন পিটার গ্রাণ্ট (John Peter Grant)

15.4.1877—6,8.1878.

মিঃ এ্যালফ্রেড ব্রেট (Alfred Corbyn Brett)

7.8.1878—22.3.1882.

মিঃ চার্লস্ গ্যারেট (Charles Bazett Garett)

3.4.1882—20.9.1882.

মিঃ ফ্রান্সিস ব্যাডকক (Francis William Badcock)

21.9.1882—11.11.1882.

মিঃ জন পিটার গ্রাণ্ট (John Peter Grant)

12.11.1882—10.5.1885.

মিঃ হেনরী গিলন (Henry Gillon) 11,5.1885—17.12.1885.

মিঃ জন পিটার গ্রাণ্ট (Johon Peter Grant)

18.12.1885—27.2.1886.

মিঃ রবার্ট রামপিনী (Robert Fulton Rampini)

8.3.1886—20.9.1886.

মিঃ জন পিটার গ্রাণ্ট (John Peter Grant)

21.9.1886—3.9.1887.

মিঃ রবাট রামপিনী (Robart Talton Rampini)

9.9.1887—2.10.1887.

মিঃ জেমস্ কেলেহার (James Kelleher).

3.10.1887—4.3.1889.

মিঃ ফ্রেডরিক ম্যাক্‌লাউগ্লিন (Frederic Mc Laughlin)

5.3.1889—28.3.1890.

মিঃ রবার্ট এণ্ডারসন (Robert Anderson)

29.3.1890—14.5. 1890.

মিঃ জেমস ক্রফোর্ড (James Crawford)

15.5.1890—2.6.1891

মিঃ রিচার্ড রডনি পোপ (Richard Rodney Pope)

3.6.1891—2.9.1891

মিঃ জেমস ক্রফোর্ড (James Crawford) 3.9.1891—21.4.1893

মিঃ জন নক্স উয়াইট (John Knox Wight)

22.4.1893—13.3.1894

শ্রীকেদারনাথ রায় (Kedar Nath Roy) 14.3,1844—17.5.1894

মিঃ আসানুদ্দিন আহম্মদ (Ahsanudin Ahmad)

31.10.1894—31.12.1894.

মিঃ সিসিল মাইকেল ব্রেট (Cecil Michael Brett)

1.1.1895—2.3.1895.

মিঃ জেমস্ ফ্রানসিস ব্র্যাডবারী (James Francis Bradbury.)

3.3.1895—27.9.1897

মিঃ এ্যালফ্রেড এভিলিন ষ্টেলী (Alfred Evelyn Staley)

30.9.1897—5.7.1898.

শ্রীবিহারী লাল গুপ্ত (Bihari Lall Gupta.)

6.7.1898—1.8.1898.

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার শীল (Brajendra Coomar Seal)

2.8.1898—28.11.1898.

শ্রীবিহারী লাল গুপ্ত (Bihari Lall Gupta)

29.11.1898—2.7.1899.

মিঃ জেমস হার্বার্ট টেম্পল (James Herbert Temple)

3.7.1899—19.11.1899.

মিঃ হেনরী রেনেল কক্স (Henry Reynell Coxe)

20.11.1899—21.5.1900.

মিঃ অ্যালফ্রেড এডগার হারওয়ার্ড (Alfred Edgar Harward)

22.5.1900—6.11.1900.

মিঃ ডানকান ক্যামেরণ (Dancam Cameron)

7.11.1900—10.3.1902.

কুমার গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব (Kumar Gopendra Krishna Deb)

11.3.1902—31.3.1904.

———

একাদশ অধ্যায়

হুগলী

পঞ্চদশ শতাব্দীতে হুগলীর অস্তিত্ব ছিল না ; হুগলীর যাবতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য স্মরণাতীত কাল হইতে সপ্তগ্রাম নির্ব্বাহ করিত। সপ্তগ্রামের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে পর্ত্তুগীজ বণিকদের যত্নেই এই শহরের পত্তন হয় ; পর্ত্তুগীজগণ এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গোলাঘাটে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং এই দুর্গ হইতেই আধুনিক হুগলী শহরের উদ্ভব হইয়াছে। ভাগীরথী তীরবর্ত্তী যে সমস্ত স্থানে ইউরোপীয় বণিকগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তন্মধ্যে এই স্থানটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পর্ত্তুগীজদের বাণিজ্যকুঠি এই স্থানে সংস্থাপিত হইবার পূর্ব্বে ইহা একটি নগণ্য স্থান ছিল।

হুগলী নামটি পর্ত্তুগীজের দেওয়া নাম ; তৎকালে ভাগীরথী তীরে বহু হোগলা গাছ জন্মাইত এবং হোগলা হইতেই হুগলী নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর বিভিন্ন পুস্তক ও কাগজপত্রাদিতে হুগলী—ওগোলি, ওগলি, গোলিন, হিউগলি, হাগলে, গুলি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে আখ্যাত হইয়াছে ; কিন্তু ঠিক কোন সময়ে যে, হুগলীর উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা সঠিক নির্ণয় করিতে পারা যায় না।

সাড়ে-চারি শত বৎসর পূর্ব্বে তারকেশ্বরের তিন ক্রোশ দূরে দামুন্যা গ্রামে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত চণ্ডীকাব্যে হুগলীর পার্শ্বে ত্রিবেণী এবং ভাগীরথীর অপর পারে অবস্থিত হালিসহর, গরিফা প্রভৃতির উল্লেখ আছে ; কিন্তু হুগলীর উল্লেখ নাই। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার সময়ে হুগলীর অস্তিত্ব ছিল না।

বঙ্গদেশে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ সর্ব্বপ্রথম বাণিজ্য বিস্তার করে; সেই সময় ভাগীরথীর অগভীর জলে তাহাদের বড় বড় জাহাজ আনিবার সুবিধা হইত না বলিয়া, তাহারা মুচিখোলার নিকটে জাহাজ নোঙ্গর করিত এবং তথা হইতে ছোট ছোট নৌকায় মাল বোঝাই করিয়া সপ্তগ্রামে প্রেরণ করিত। ইহার কিছুদিন পর হইতে গঙ্গার গতি



হুগলী ইমামবাড়ার সম্মুখের দৃশ্য

পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয় এবং সরস্বতী নদীর খরস্রোত ক্রমশঃ মন্দীভূত ও মৃতকল্প হওয়ায়, সপ্তগ্রামে বাণিজ্য করা পর্ত্তুগীজদের

পক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক হইয়া উঠে। সপ্তগ্রামে বাণিজ্য বিস্তার করিবার কয়েক বৎসর পরে ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে সাম্প্রায়ো নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ হুগলীতে একখণ্ড জমি ক্রয় করেন। পর্ত্তুগীজদের এই নূতন উপনিবেশের এক দিকে নদী ও তিন দিকে বিল থাকায় বাণিজ্য বিস্তারের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ সপ্তগ্রামের যাবতীয় বাণিজ্য সেইজন্য এই স্থানেই কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল।

বঙ্গদেশের প্রথম সাময়িক পত্র "দিগদর্শন" নামক মাসিক পত্রে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বাংলার প্রধান নগরগুলির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে উক্ত পত্রিকা হইতে কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল :

"হুগলী শহর ক্ষুদ্র কিন্তু প্রাচীন পূর্ব্বে অতি বড় ছিল এখন তাহার প্রায় কিছুই নাই পূর্ব্বে সে একটা বড় বন্দর ছিল এবং ইউরোপীয় বাণিজ্যের তাবৎ হাঁসিল সেখানে দাখিল হইত এবং ইংলণ্ডীয়েরদিগের বাণিজ্যের স্থান সেই ছিল পরে সেখান হইতে কলিকাতা হইল ইংলণ্ডীয়েরা এদেশের বিবরণ কিছু জানিতেন না তাহাতে গঙ্গানদীর নাম হুগলী নদী কহিতেন।"*

মুসলমান রাজত্বকালে হুগলী বঙ্গের দ্বিতীয় শহর ছিল এবং অনার্য্য রমণীগণের নৃত্যসহকারে গানের সময় তৎকালে হুগলী নামের উল্লেখ করা হইত। নাগর, ধানুক, চাঁই, কোচ, পলে প্রভৃতি অনার্য্য জাতিগণ মধুর কণ্ঠে আজও এই "নাচারি" গাহিয়া থাকে। উক্ত গানের দুইটি পঙ্‌ক্তি শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত লিখিত মালদহের পল্লীভাষা হইতে উদ্ধৃত হইল :

"হুগলী সহড় সতী, আলেচুড়ি হাড়ওয়া।
আহো, পাটনা সহড় চলি যায় মুরলি॥" †

---

* দিগদর্শন, ৫ম ভাগ আগষ্ট ১৮১৮।

† সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—১৩১৮, পৃঃ ১৭

পর্ত্তুগীজদিগের 'গোলিন' (Golin) নামক উপনিবেশের মধ্যে বাবুগঞ্জ, ব্যাণ্ডেল, পিপুলবাতি প্রভৃতি কয়েকটি পল্লী ছিল এবং বন্দর ছিল বলিয়াই 'ব্যাণ্ডেল' নামটির উৎপত্তি হয়। পর্ত্তুগীজদের দ্বারা হুগলী শহরের প্রভূত উন্নতি হয় এবং এই স্থানে তাহারা সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠে। হুগলীতে আধিপত্য স্থাপন করিয়া তাহারা সপ্তগ্রামের ফৌজদারকেই অমান্য করিত। সম্রাট আকবর পর্ত্তুগীজদিগকে সুনজরে দেখিতেন বলিয়া তাহাদের ঔদ্ধত্য ও দুর্ব্বৃত্ততা চরমে উঠিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি করা



হুগলী ইমামবাড়ার ভিতরকার দৃশ্য

হয় না। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত 'আইন-ই-আকবরি' পাঠে জানা যায় যে সপ্তগ্রাম ও হুগলী নামক ক্রোশার্দ্ধ ব্যবহিত দুইটি স্থানই ফিরিঙ্গিদের হস্তে ছিল।

ওলন্দাজ, ইংরেজ প্রভৃতি বণিকগণের সহিত ব্যবসায়ে বিশেষ

সুবিধা করিতে না পারিয়া তাহারা অযথা অন্যায় উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা নবাবের বিনা অনুমতিতে গঙ্গার দুই পার্শ্বে অবস্থান করায়, প্রত্যেক নৌকার যাতায়াতের সময় শুল্ক আদায় করিতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত বালক-বালিকাগণকে হরণ করিয়া দাস-ব্যবসা করিত এবং হুগলী ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের নিরীহ প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগের গৃহে অগ্নিদান করিত। নরহত্যা, নারীর সতীত্ব নাশ প্রভৃতি কোন কুকর্ম্ম করিতেই তাহারা পরাঙ্মুখ ছিল না। তাহাদের অত্যাচারে প্রজাবৃন্দ 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িত এবং 'মগের মুলুক' নামক ঘৃণিত কথা তাহাদের উপলক্ষ্য করিয়াহ বঙ্গভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। ভাগীরথীতে দস্যুবৃত্তি করিত বলিয়া, তৎকালে ভাগীরথীর নাম 'দস্যু-নদী' (**Rogue's River**) ছিল, কর্ণেল ইউল এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। *

পর্ত্তুগীজগণ হুগলী ও বঙ্গের অন্যান্য স্থানে প্রায় শতবর্ষ যাবৎ এইরূপ অখণ্ড আধিপত্য ও দস্যুবৃত্তি করিয়াছিল। তাহারা হিন্দু-মুসলমান, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা যাহাদের পাইত তাহাদের নৌকায় তুলিত; নৌকায় তাহাদের হাতের 'চেটো' ছিদ্র করিয়া, ছিদ্রমধ্যে বেত ঢুকাইয়া নর-নারীকে স্তূপাকারে নৌকার পাটাতনের নিম্নে রাখিয়া দিত এবং সকালে ও সন্ধ্যায় মুরগীকে ধান দিবার মত, তাহাদের মুখের উপর কিছু ভাত ছড়াইয়া দিত। পর্ত্তুগীজদের আগমন-সংবাদ পাইলে পাছে তাহারা কূলে নামিয়া উপদ্রব করে এই ভয়ে স্থানীয় ব্যক্তিগণ কূলে আসিয়া দাঁড়াইতেন এবং তাহাদের নৌকায় লোক পাঠাইয়া দিতেন। দস্যুরা টাকা লইয়া বন্দীগণকে বিক্রয় করিয়া চলিয়া যাইত। †

১৬২২ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র খোরাম উত্তরকালে সম্রাট্ শাহ্

---

* **Hedges Diary. Vol. III, Page 218.**

* **Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1807, P-406**

জাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া হুগলীর পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তা মাইকেল রড্রিকের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। রড্রিক তাঁহাকে সাহায্য দান করিতে অস্বীকার করেন এবং এরূপ অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে, শাহ্‌জাহান তাহাতে বিশেষ অপমানিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী মমতাজ বেগম পৌত্তলিক পর্ত্তুগীজদিগের উপর বিশেষ ভাবে বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন। যাহা হউক, শাহ্‌জাহান বঙ্গের শাসনকর্ত্তা ইব্রাহিম খাঁকে নিবৃত্ত করিয়া দুই বৎসর বঙ্গাধিকারী হইয়াছিলেন এবং সেই সময় পর্ত্তুগীজদিগের অত্যাচার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া যান। পরে পিতা-পুত্রের মিল হইয়া যায়।

পরবর্ত্তীকালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি পর্ত্তুগীজদের অত্যাচার দমন করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং বঙ্গের শাসনকর্ত্তা কাশিম খাঁকে পর্ত্তুগীজদের দূরীভূত করিবার আদেশ দেন। কাশিম খাঁ বিশেষ সতর্কতার সহিত হুগলী আক্রমণের বন্দোবস্ত করেন এবং হুগলীর দুর্গ অবরোধ করিয়া, জয় করিতে তাঁহার সাড়ে তিন মাস সময় লাগিয়াছিল।

১৬৩২ খৃষ্টাব্দে কাশিম খাঁ হুগলী অধিকার করিলে মোগলেরা পর্ত্তুগীজদের প্রধান আড্ডা হুগলী দুর্গ দখল করে। বিজিত পর্ত্তুগীজগণ কেহ মোগলের হস্তে প্রাণত্যাগ করিল এবং অনেকে গঙ্গায় অবস্থিত তাহাদের জাহাজে উঠিতে গিয়া জলে ডুবিয়া গেল। গঙ্গায় পর্ত্তুগীজদের একখানি বড় জাহাজে দুই হাজার নরনারী বহু ধনরত্নাদিসহ উক্ত জাহাজে আশ্রয় লইয়াছিল, কিন্তু মোগলদের হস্তে আত্মসমর্পণ না করিয়া তাহারা আগুন দিয়া নিজেরাই জাহাজখানি পুড়াইয়া দেয়। চৌষট্টিখানি বড় জাহাজ, সাতান্নখানি মাঝারি জাহাজ এবং দুই শত ছোট জাহাজের মধ্যে মাত্র একখানি মাঝারি ও দুইখানি ছোট জাহাজ মোগলদের কবল হইতে পলাইতে পারিয়াছিল। সাড়ে চার হাজার পর্ত্তুগীজ নরনারী ও বালক-বালিকা বন্দী হইয়াছিল, তন্মধ্যে সুন্দরী যুবতীগণকে বাদশাহ ও ওমরাহ-

দিগের অন্তঃপুরে প্রেরণ করা হয় এবং বালক-বালিকাদিগকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষা দেওয়া হয়। যাহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে, তাহাদিগকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

হুগলী অধিকার করিয়া মোগলেরা এই স্থানে একজন 'ফৌজদার' নিযুক্ত করেন এবং সরকারী দপ্তরখানা সপ্তগ্রাম হইতে হুগলীতে স্থানান্তরিত হয়। সপ্তগ্রামের পতনের পর হুগলী রাজবন্দর ও বঙ্গদেশে বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। জলদস্যু মগদিগের আক্রমণ হইতে হুগলী বন্দর রক্ষা করিবার জন্য হিজলীতেও একটি ফৌজদারী স্থাপিত হইয়াছিল। * পর্ত্তুগীজদের নির্ম্মিত দুর্গ হুগলী আক্রমণের সময় মোগলরা ধ্বংস করিয়াছিল বলিয়া হুগলীর ফৌজদার মহম্মদ উল্লা এই স্থানে একটি নূতন কেল্লা নির্ম্মাণ করেন।

ক্রীতদাস ব্যবসা ও জলে দস্যুবৃত্তি পর্ত্তুগীজদিগের কলঙ্ক বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। তাহারা বণিক বেশে এই দেশে আসিয়াছিল; উদ্দেশ্য এই দেশ হইতে অর্থ ও পণ্য লইয়া তাহাদের দেশকে সমৃদ্ধ করা! বহু বৎসর যাবৎ তাহারা বাণিজ্য কার্য্যে ব্যপৃত ছিল এবং পরিণামে উক্ত দুইটি কলঙ্কে কলঙ্কিত হইলেও, তাহারা আমাদের অনেক কিছু দিয়া গিয়াছে। তাহাদের ভাষা, পোষাক-পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি এমন কি তাহাদের রক্ত পর্য্যন্ত অদ্যাপি বঙ্গদেশে বিদ্যমান, তাহা পরে উল্লেখ করিব। পর্ত্তুগীজশক্তি এই স্থান হইতে বিলুপ্ত হইবার পর, বহুদিন পর্য্যন্ত তাহাদের ভাষা অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিদের 'কথ্য-ভাষা' (Lingua-Franca) বলিয়া পরিগণিত ছিল।

১৬৩০ খৃষ্টাব্দে হিজলী রাজ্য মোগল কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়; উক্ত রাজ্যের আয়সঙ্গত অধিকারী কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে

* Hunter's Statistical Account of Bengal. Vol. III, Page 200

তাঁহার রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্য অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই, কারণ হুগলীর ফৌজদার চুঁচুড়ার ওলন্দাজ বণিকগণের সাহায্যে উক্ত রাজাকে পরাজিত করেন এবং পুনরায় তিনি কারারুদ্ধ হন। হুগলীর ফৌজদার সেইজন্য সম্রাট্ আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক "Zeevoogd" নামক উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন এইং হিজলীর শাসনভারও তাঁহার অধীনে জনৈক 'ক্ষুদ্র-রাজা'র (Lesser Chief) উপর ন্যস্ত হইয়াছিল।*

ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ বণিকগণ যত দিন পর্য্যন্ত না নিজেদের নিজস্ব স্থান লাভ করিয়াছিল, তত দিন তাহারা হুগলীতে ব্যবসা করিয়াছিল এবং তাহার ফল স্বরূপ হুগলী বাণিজ্যসম্পদে বিশেষ সম্পৎশালী হইয়াছিল। মোগল শাসনকর্ত্তা সেই সময় হুগলীতে বসবাস করিতেন। সুলতান সুজার রাজত্বকালে তাঁহার নিকট হইতে 'ফারমান' লইয়া ইংরেজগণ হুগলীতে একটি কারখানা স্থাপন করেন এবং বঙ্গে ইংরেজদিগের এই প্রথম বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন। বঙ্গের সুবাদারগণের অনুগ্রহে পূজোপচারে তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া ইংরেজ ব্যবসায়ীগণ হুগলী পর্য্যন্ত মাল বোঝাই করিবার জন্য জাহাজ আনিবার অনুমতি পাইলেন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা ছোট নৌকায় মাল বোঝাই করিয়া আনিয়া নদীর মুখে অবস্থিত জাহাজে বোঝাই করিয়া লইতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাঃ গেব্রিয়েল ব্রোটন সম্রাট্ শাহজাহানের কন্যার চিকিৎসা করিয়া তাঁহাকে নিরাময় করিলে; সম্রাট্ ডাক্তারকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। স্বদেশহিতৈষী ডাঃ গেব্রিয়েল ব্রোটন পুরস্কারের পরিবর্ত্তে বিনা মাশুলে বঙ্গদেশে ইংরেজদের বাণিজ্য করিবার অনুমতি চান এবং সম্রাট্ সেই অনুমতি দান করেন। তারপর কি ভাবে ইংরেজগণ বঙ্গদেশে বাণিজ্য বিস্তার করিয়া 'রাজদণ্ড' গ্রহণ করেন, জগতের ইতিহাসে তাহা এক

* Valentia's Memoirs to Von-Den-Brooke's Map Page 158

অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। ইংরেজ বণিকের সেই প্রথম কালের ইতিহাসের সহিত হুগলীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, কারণ এই স্থানেই ইংরেজের প্রথম বাণিজ্য-কুঠি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কলিকাতা স্থাপয়িতা জব চারণক প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেন্ট হইয়া হুগলীতে ছিলেন। সায়েস্তা খাঁর শাসনকালে জব চারণকের সহিত দেশীয় ব্যক্তিগণের নানা কারণে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় ইংরেজগণের বিশেষ অসুবিধা হইতেছিল কারণ বাণিজ্যের জন্য তাহারা দেশের ক্ষতি করিতেছিল এবং মোগলের সহিতও ইংরেজদের সদ্ভাব ছিল না। এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ মোগলের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করাই সমীচীন মনে করেন। যুদ্ধঘোষণা করিবার পূর্ব্বে মাদ্রাজের 'ফোর্ট-জর্জ্জের' শাসনকর্ত্তাকে সম্রাট্ আওরঙ্গ-জেবের নিকট হইতে 'ফরমান' গ্রহণের আদেশ দিলেন এবং গঙ্গার মধ্যস্থিত কোন দ্বীপ অধিকারের অনুমতি, হিজলীতে দুর্গ নির্ম্মাণ এবং তাঁহার কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক যাহাতে ইংরেজগণ অত্যাচারিত না হয় তদ্বিষয়ে নির্দ্দেশ দিবার জন্যও মাদ্রাজের শাসনকর্ত্তাকে আদেশ দেওয়া হয়। আদেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন নিকলসনের অধীনে দশখানি যুদ্ধজাহাজ হুগলীতে প্রেরিত হয় এবং উক্ত জাহাজে বারটি করিয়া কামান এবং ছয় শত করিয়া সৈনিক ছিল।

নবাবের আদেশে ইংরেজদিগকে বিতাড়িত করা হইবে শুনিয়া, জব চারণক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন; পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণও মোগলদের সহিত যুদ্ধ করিবেন সংবাদ পাইয়া, তিনি সমাগত রণপোত ও ইংরেজ সৈন্যের সাহায্যে নবাবের তিন হাজার পদাতিক ও তিন শত অশ্বারোহী সৈন্যকে বিতাড়িত করিয়া হুগলীর ফৌজদারকে পরাভূত করেন। ইহাই ইংরেজগণের সহিত মোগলদের প্রথম সংঘর্ষ। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর তারিখে হুগলীর রাজপথে এই যুদ্ধ

হয় এবং ইংরেজ বণিকগণ নবাগত সৈন্তের সাহায্যে তোপ দাগিয়া হুগলী শহরের বহুলাংশ উড়াইয়া দেন। তোপের আগুনেই হুগলীর পাঁচ শত বাড়ী এবং পণ্যরাশি-পরিপূর্ণ ইংরেজদিগের গুদামঘর পুড়িয়া যায়, ফলে কোম্পানীর ৪৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। হুগলীর ফৌজদার ইংরেজদিগের অতর্কিত আক্রমণে সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী বাংলার নবাব সায়েস্তা খাঁ ইংরেজদিগকে ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

হুগলী যুদ্ধের পর গঙ্গার উপর ইংরেজদিগের প্রভুত্ব অনেক বাড়িয়া যায় এবং তাঁহাদের যুদ্ধ জাহাজগুলি সমগ্র গঙ্গা নদী অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। নবাব পূর্ব্বেকার প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন নিকলসন নবাবের হুগলীর কুঠি পুড়াইয়া দিয়া হিজলী অধিকার করেন। ইহার পর জব চারণক ইংরেজ সৈন্যকে প্রেরণ করেন এবং বালেশ্বর অধিকৃত হয়। বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর সভা হুগলী লুণ্ঠন, হিজলী অধিকার ও বালেশ্বর ধ্বংসের সংবাদ পাইয়া বিশেষ পরিতুষ্ট হইলেন কিন্তু ভারতসম্রাট্ আওরঙ্গজেব ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। তিনি কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হুগলী, হিজলী ও বালেশ্বরের ন্যায় অপরিচিত স্থানগুলি কোথায়?"

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ এযাবৎ বঙ্গদেশে মাদ্রাজস্থিত কোম্পানীর অধীনভাবে ব্যাণিজ্য করিতেছিলেন; ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা মাদ্রাজ কোম্পানীর অধীনতা-পাশ ছেদন করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর মিঃ হেজেস প্রথম গভর্ণর নিযুক্ত হন ও হুগলীতে তাঁহার আবাসস্থান নির্দ্ধারিত হয়। মিঃ হেজেসের পর মিঃ গিফোর্ড ইংরেজ কোম্পানীর দ্বিতীয় গবর্ণর হইয়া হুগলীতে আগমন করেন এবং হুগলী তখন ইংরেজের ব্যবসায় কেন্দ্রস্থল ছিল। সেই সময় কোম্পানী আটাশ হাজার মণ সোরা বিলাতে প্রতি বৎসর রপ্তানি করিত।

সম্রাট্ শাহ জাহানের রাজত্বকালে ডাঃ ব্রৌটনের চেষ্টায় ইংরেজ বণিকগণ বঙ্গদেশে বিনা শুল্কে ব্যবসা করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই সম্বন্ধে মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার 'মিরকাশিম' নাটকের মধ্যে নবাবের নিজস্ব ডাক্তার মিরকাশিমকে যাহা বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিতেছি :

"আজ আমার স্মরণ হইতেছে বাউটন নামে একজন ইংরেজ ডাক্তার সম্রাট্ সাজিহানের কন্যাকে আরোগ্য করিয়াছিলেন। বদান্য বাদসা তাঁহাকে পুরস্কার প্রার্থনা করিতে বলেন। বাদশাহ পুরস্কারে বাউটন ক্রোড়পতি হইতে পারিতেন, কিন্তু **Trueborn Englishman** আপনার স্বার্থ না দেখিয়া বাংলায় ইংরাজের বিনাশুল্কে বাণিজ্যের সনদ লিখিয়া লইয়াছিলেন। আমিও ডাক্তার, আমিও নবাবের বেগমকে আরাম করিয়াছি, আর স্বদেশীর হত্যা দেখিবার নিমিত্ত আমার প্রাণদণ্ড মকুব হইল"।

শায়েস্তা খাঁর পর নবাব ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গলার সুবেদারী প্রাপ্ত হন; তিনি নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং তাঁহার শাসনকালে ইংরেজ বণিকগণের বিশেষ সুবিধা হয়। * ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে শোভা সিংহ বঙ্গদেশ হইতে মোগল অধিকার উচ্ছেদ করিবার জন্য বিদ্রোহী হন এবং বর্দ্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম রায়কে নিহত করেন।

রাজা কৃষ্ণরামের প্রাণ সংহার করিয়া, শোভা সিংহ বর্দ্ধমান রাজ প্রাসাদ অধিকার করেন, রাজকুমার জগৎরায় নদীয়ায় রাজা রাম কৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। শোভা সিংহ রহিম খাঁ নামক একজন আফগান সর্দ্দারের সহিত মিলিত হইয়া হুগলী অধিকার করে। ইব্রাহিম খাঁ চুঁচুড়ার ওলন্দাজদিগের সাহায্যে বিদ্রোহীগণকে বিতাড়িত করেন এবং তাহারা

* **Wilson's Early Annls of the English in Bengal.**

সপ্তগ্রামে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। অতঃপর তাহারা রহিম খাঁর নেতৃত্বে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ অধিকাব করিবার জন্য প্রেরিত হয়।

বর্দ্ধমান রাজকুমাব নদীয়ায় পলায়ন করেন, কিন্তু রাজকুমারী পলায়ন করিতে সমর্থ হন নাই। শোভা সিংহ রাজকুমারীর, রূপে মুগ্ধ হইযা, তাহার ধর্ম্মনাশ করিবাব চেষ্টা করিলে, তেজস্বিনী রমণী ছুরিকাঘাতে শোভা সিংহকে হত্যা করিয়া, নিজেও আত্মহত্যা করেন। অতঃপর তাহার ভ্রাতা হিম্মত সিংহ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া দেশে ভীষণ অরাজকতার সৃষ্টি করেন এবং ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে বাজমহল হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত ভূভাগ অধিকার করিয়া লন।

দেশে এইরূপ অবাজকতার সুযোগে ইংরাজগণ কলিকাতায ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ, ফরাসীগণ চন্দননগরে আরলাঁ দুর্গ (Fort Orleans) এবং ওলন্দাজগণ চুঁচুড়ায় গেসটোভস্ দুর্গ (Fort Gustove) দৃঢ়তরভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেব বঙ্গদেশে শান্তি স্থাপনার্থ তাহার পৌত্র আজিম ওশ্বানকে প্রেরণ করেন। তিনি বঙ্গে আসিয়া শোভাসিংহ নিহত হইয়াছে এবং নবনিযুক্ত বঙ্গেশ্বব জবরদস্ত খাঁ বিদ্রোহ অনেক দমন করিয়াছেন দেখিয়া তদানীন্তন জমিদারগণের সহিত বর্দ্ধমানে থাকিয়া আনন্দোৎসব করিতে লাগিলেন। বর্দ্ধমানে যখন আনোন্দৎসব চলিতেছিল, সেই সময় বিদ্রোহীগণ পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিয়া হুগলী এবং নদীয়া লুণ্ঠন করে। "Thus while the prince was amusing himself at Burdwan, receiving the congratulations of Zamindars and principal men of the province, the rebels again collected in greatest force and had the audacity, not only to plunder the districts of Nuddeah and Hooghly but to encamp within a few miles of Burdwan." *

* Memoirs of the Mognul Empire by Eradut Khan. Page-34.

পলাশির যুদ্ধ অভিনয়ের পর বঙ্গের শেষ স্বাধীন নরপতি নবাব সিরাজদ্দৌলা নিহত হন; মুর্শিদাবাদের খুসবাগে অদ্যাপি তাহার এবং নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সমাধি দৃষ্ট হয়। নবাব সিরাজদ্দৌলার বংশধরগণ, তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে অদ্যাবধি কি ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইয়া যাইতে হয়। কোন ঐতিহাসিক তাঁহার বংশধরগণের বিষয় কোন কথা আলোচনা করেন নাই বলিয়া, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই স্থলে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল;

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর কোন পুত্র সন্তান হয় নাই, দুইটি কন্যা জন্মিয়াছিল; জ্যেষ্ঠের নাম আমিনা বেগম এবং কনিষ্ঠার নাম ঘষেটি বেগম। আমিনার সহিত নবাব হাইবৎ জঙ্গ এবং ঘষেটির সহিত নবাব সহমৎ জঙ্গের বিবাহ হয় কিন্তু কনিষ্ঠা অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করেন। জ্যেষ্ঠা আমিনা বেগমের মির্জ্জা মহম্মদ ও এক্রামদ্দৌলা নামক দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে এবং মির্জ্জা মহম্মদ পরবর্ত্তীকালে নবাব সিরাজদ্দৌলা নাম ধারণ পূর্ব্বক বঙ্গ-বিহার ও উড়িষ্যার শাসনভার গ্রহণ করেন।

নবাব সিরাজদ্দৌলা মৃত্যুকালে কুদসা বেগম নামে একটি কন্যা রাখিয়া যান, তাঁহার সহিত এক্রামদ্দৌলার পুত্র মুরাতদ্দৌলার বিবাহ হয়। কুদসা বেগমের সামসের আলি খাঁ নামক একটি পুত্র এবং চারটি কন্যা জন্মে; সামসের আলি ইংরাজ সরকারের নিকট হইতে ১৮২৲ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি পান এবং তাহার চার ভগ্নী যথাক্রমে ৯১৲ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। সামসের আলির দুইটি পুত্র জন্মে জ্যেষ্ঠ সৈয়দ লুৎফ আলি ও কনিষ্ঠ সৈয়দ জয়নাল আবেদিন। কনিষ্ঠ অপুত্রক অবস্থায় গতায়ু হন এবং জ্যেষ্ঠ সৈয়দ লুৎফ আলি ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখের সরকারী আদেশে মাসিক ৮০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পান। তাঁহার ফতেমা বেগম নাম্নী একটি কন্যা হয় এবং তিনিও সরকার হইতে মাসিক ১৪১৲ টাকা করিয়া বৃত্তির দ্বারা জীবিকাতিপাত

করেন। * তাঁহার লুৎফন্নেসা বেগম, হাসমৎ আরা বেগম এবং অলফুন্নেসা বেগম নামক তিন কন্যা জন্মে। জ্যেষ্ঠ মাসিক ৮১৲ টাকা করিয়া এবং অন্য দুই কন্যা মাসিক ৩০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পান।

হাসমৎ আরা বেগম, মৌলভী সৈয়দ জাকি রেজা নামক এক পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন, তিনি পরবর্ত্তীকালে মুর্শিদাবাদ জেলার সাব রেজিষ্টারের পদ প্রাপ্ত হইলেও ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চ তারিখে সরকারী নির্দ্দেশানুযায়ী (Govt. Order No. 152.N.) মাসিক ১৫৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পান। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার বিধবা পত্নী, পাঁচ পুত্র ও চার কন্যা অদ্যাপি জীবিত আছেন। তিনটি বিবাহযোগ্যা কন্যার এখনও বিবাহ হয় নাই এবং তাঁহারা মুর্শিদাবাদের মোগলটুলি অঞ্চলের একটি ভগ্ন বাটিতে দুঃখের সহিত যুদ্ধ করিয়া, কি ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাহা দেখিলে পাষাণও বিগলিত হইয়া যায়।

রেজা সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম সৈয়দ গোলাম হায়দর এবং তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের এটওয়াতে ড্রইং অফিসে ড্রাফটসম্যানের অর্থাৎ নকসার কার্য্য করেন। মধ্যম পুত্রের নাম সৈয়দ মহসিন রেজা এবং তিনি এম, ইস্পাহানী লিমিটেডে কার্য্য করেন। তৃতীয় পুত্র গোলাম মোর্ত্তাজা মুর্শিদাবাদে সাব ডিভিস্যানাল অফিসারের দপ্তরে কেরানীগিরি চাকুরী করেন। চতুর্থ পুত্র সৈয়দ গোলাম আহম্মদ মুর্শিদাবাদে কৃষিকার্য্য করেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র সৈয়দ রেজা আলি বি-এ পাশ করিয়া ৭৫৲ টাকা মাহিনায় আবগারি বিভাগের ইন্সপেক্টররূপে কলিকাতায় চাকুরী করিয়া বর্ত্তমানে দিনাতিপাত করিতেছেন। †

---

* Vide Govt: Orders dated 2.10.1833, 25.1.1869 and 28.4 1847.

† Govt Order dated 4.1.1871.)

বাঙ্গলাদেশে কিছুদিনের জন্য মুসলমানদের হস্তে ক্ষমতা আসিয়াছিল সত্য, কিন্তু সেই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার এই নবাব বংশকে রক্ষা করিবার জন্য করা হয় নাই, ইহাই গভীর পরিতাপের বিষয়।

নূরউল্লা খাঁ যে সময় হুগলীর ফৌজদার ছিলেন সেই সময় তাঁহাকে এই বিদ্রোহ দমন করিবার আদেশ দেওয়া হয়। তিনি সৈন্য লইয়া হুগলীর দিকে অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু শোভা সিংহ আসিতেছেন শুনিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পরাভূত হইবার আশঙ্কায়, হুগলী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং রাত্রে ফকিরের বেশে দুর্গ হইতে পলায়ন করেন। হুগলী বিদ্রোহীদের হস্তগত হয়; অতঃপর ইব্রাহিম খাঁ চুঁচুড়ার ওলন্দাজগণের সাহায্যে হুগলী পুনরুদ্ধার করেন। *

হুগলীর ফৌজদার জৈনউদ্দীন ইউরোপীয়ানদের সাহায্য করিতেন বলিয়া মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া ওয়ালিবেগকে হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করেন। জৈনউদ্দীন ফরাসী ও দিনেমারদিগের সহায়তায় ফৌজদারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। মুর্শিদকুলী খাঁ ইউরোপীয় জাতিগুলিকে কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে নিষেধ করেন; কিন্তু তাহারা জৈনউদ্দীনকে সাহায্য করে। ফলে মধ্যস্থতা করিবার জন্য নবাব কর্ত্তৃক প্রেরিত দিলপত সিংহ ফরাসী কামানের গোলায় নিহত হয়। † তৎপরে হাসান আলি খাঁ হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হন।

১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দীন বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সুজা খাঁকে হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করেন। সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে আলীবর্দ্দী খাঁ তাঁহাকে নিহত করিয়া বঙ্গ-বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হন। এই সময় মারহাট্টারা বঙ্গদেশে লুটতরাজ আরম্ভ করে এবং ইহাই 'বর্গীর অত্যাচার'

---

* নদিয়া কাহিনী শ্রীকুমুদনাথ রায় পৃঃ ৩৬

† Historical Sketches of Bengal

বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। বর্গীর অমানুষিক অত্যাচারে পশ্চিম বঙ্গবাসী যেরূপ কষ্ট সহ্য করিয়াছে, ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। বর্গীদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইংরেজ বণিকগণ কলিকাতায় 'মহারাষ্ট্র-খাত' (**Marhatta Ditch**) খনন করিয়া সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পূর্ব্বক কলিকাতাকে সুরক্ষিত করেন। দেশে অরাজকতা বিরাজ করিতেছে দেখিয়া ভাগীরথী ও সরস্বতী তীরবর্ত্তী গ্রামগুলি হইতে অসংখ্য নরনারী তাহাদের ধনপ্রাণ এবং নারীর সম্ভ্রম রক্ষার জন্য বিধর্ম্মী ইংরেজের শরণাপন্ন হয় এবং ইংরেজ বণিকগণের নব-নির্ম্মিত বর্গীদের অনধিগম্য কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করে। যদি হিন্দু মহারাষ্ট্রীয়গণ হিন্দু বঙ্গবাসিগণের প্রতি অত্যাচার না করিয়া কথঞ্চিৎ সাহায্য করিত, তাহা হইলে ভারতের ইতিহাস যে অন্য আকার ধারণ করিত তাহা সুনিশ্চিত। বর্গীদিগের হাত হইতে কেহই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই। "বর্গীরা গ্রাম ও নগর পুড়াইয়া শস্যভাণ্ডারে আগুন লাগাইয়া এবং পুরুষের নাক-কান ও পুরস্ত্রীর স্তন কাটিয়া ও সতীত্ব নষ্ট করিয়া বাংলার প্রজাকুলকে সংহার করিয়াছিল।" *

হুগলীর ফৌজদারের নিকট ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী তৎকালে সুতানটির জন্য ৩০৫ টাকা, গোবিন্দপুরের জন্য ১০ টাকা ও কলিকাতার জন্য ৩৩ টাকা করিয়া কেবলমাত্র খাজনা দিত।

নবাব আলীবর্দ্দী বর্গীদের সহিত পরে সন্ধি করেন যে, তিনি বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা করিয়া তাঁহাদের কর দিবেন; তাহা হইলে তাহারা আর বাংলায় অত্যাচার করিবে না। বর্গী সেনাপতি শিবরাও হুগলী লুণ্ঠন করেন। মীর হবিব হুগলী অধিকার করিবার জন্য বর্গীদের সহিত যোগ দেন এবং তিনি মীর আবুল হাসান ও আবুল কাশিম নামক দুই জন

---

* **Holwell's Interesting Historical Events, Page 153.**

বণিকের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বর্গীদের সাহায্যে হুগলী কিছু দিনের জন্য নিজ অধিকারে রাখেন।

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে হেদায়েৎ আলী হুগলীর ফৌজদার ছিলেন, সেই সময় নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ নন্দকুমারকে হুগলীর দেওয়ানী পদ দেন। এই সময় চতুর্দ্দিকে অশান্তি ও যুদ্ধবিগ্রহের জন্য নবাবের কাছে সকল সংবাদ পৌছিত না। হেদায়েতের সহিত নন্দকুমারের অমিল হওয়ায় তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই সময় হুগলীর ফৌজদারকে বার্ষিক সাতাশ হাজার টাকা রাজস্ব দিতেন।* পরে মহম্মদ ইয়ারবেগ হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হন এবং নন্দকুমারকে পুনরায় হুগলীর দেওয়ানী দেওয়া হয়। ইহার পর হইতে তিনি 'দেওয়ান নন্দকুমার' নামে অভিহিত হন। এই সময় আলীবর্দ্দী সিরাজদ্দৌলাকে তাহার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করেন এবং সিরাজও কিছুদিন হুগলীতে থাকিয়া পুনরায় মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া যান। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল তারিখে নবাব আলীবর্দ্দী গতায়ু হন এবং মৃত্যুকালে তিনি সিরাজদ্দৌলাকে ইংরেজ বণিকদের হইতে সাবধান থাকিতে বলেন।†

নবাব আলিবর্দ্দী সিরাজদ্দৌলাকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন যে, "ইংরাজদের দুর্গ স্থাপন বা সৈন্য সংগ্রহ করিতে দিয়া বিপদে পড়িও না; যদি তাহা করিতে দাও, তাহা হইলে এই দেশ আর তোমার থাকিবে না।"

"Suffer them not, my son, to have fortifications or soldiers ; it you do the country is not yours." *‡

সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহন করিলে রাজা রাজবল্লভ ইংরেজের

---

* Long's Selections.

† Parker's Evidence.)

‡ Ibid II Page 16, Vol I.

সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া সিরাজের মাতৃস্বসা ঘসেটী বেগমের নামে বঙ্গদেশ শাসন করিবার সঙ্কল্প করেন। রাজা রাজবল্লভ তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাসকে সেই জন্য বহু ধনরত্ন দিয়া ইংরেজের নিকট কলিকাতায় পাঠান। সিরাজ-দ্দৌলা এই সংবাদ পাইয়া কলিকাতার চারিদিকের প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলিতে



রাজা গৌরীসেন প্রতিষ্ঠিত দেব-মন্দির

এবং কৃষ্ণদাসকে ফেরত দিতে বলেন। ড্রেক সাহেব কৌশলে কৃষ্ণদাসের কথা চাপিয়া যান এবং কলিকাতাকে প্রাচীরবেষ্টিত করা হয় নাই বলিয়া পত্র দেন। নবাব ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কলিকাতা আক্রমণ করেন এবং ইংরেজগণ পরাজিত হইয়া শিবপুর ও ফলতা নামক স্থানে পলায়ন করে।

নবাব সিরাজদ্দৌলা যে ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করেন, ইহা তাঁহার মাতা আমিনা বেগম পছন্দ করিতেন না। কারণ আমিনা বেগম ও ঘসেটী বেগম ইংরেজের সহিত হুগলীতে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত রাখিতে হইলে ইংরেজের সহিত ঝগড়া করিলে চলিবে না জানিয়াই তাঁহারা বিপদের সময় সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। আফিম ও সোরা জলাঙ্গী দিয়া উমিচাঁদের মারফত হুগলীতে ইহাদের ব্যবসা চলিত। *

মহম্মদ আলি এই সময় হুগলীর ফৌজদার ছিলেন; খোজা ওয়াজিদ নামে একজন ধনী মুসলমান বণিক সেই সময় হুগলীতে বাস করিতেন, দৈনিক এক হাজার টাকা তাঁহার ব্যয় ছিল। তিনি ফরাসী জেনারেল ল' সাহেবকে সিরাজদ্দৌলার সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। মহম্মদ আলি বিশেষ কাজের লোক ছিলেন না বলিয়া, তাঁহার পরিবর্ত্তে নবাব সেখ উমরউল্লাকে হুগলীর ফৌজদার এবং নন্দকুমারকে তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। কলিকাতা আক্রমণের সময় ইংরেজগণ ফলতায় পলায়ন করিয়াছিলে তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, নবাব ভাবিয়াছিলেন যে, ইংরেজগণ আর কিছু করিবে না, সেইজন্য তিনি তাঁহাদিগকে ফলতা হইতে বিতাড়ন করেন নাই। কিন্তু ইংরেজগণ সেই সময় ফলতায় থাকিয়া মাদ্রাজ হইতে সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ঠিক এই সময়ে নন্দকুমার হুগলী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অতঃপর নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার হন; তিনি ইংরেজদের আগমন রোধ করিবার জন্য বজবজ দুর্গের সংস্কার ও কলিকাতার দক্ষিণে একটি নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ এবং শিবপুরের দুর্গটিও সংস্কার করেন। দেওয়ান মাণিকচাঁদের উপর নবাব কলিকাতা রক্ষার ভার দিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস-

* বাংলার-বেগম—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঘাতক দেওয়ান ইংরেজের সহিত মিলিত হন এবং ইংরেজের যাহাতে খাদ্যাভাব না হয় সেইজন্য ফলতায় হাট বসান। ক্লাইভ এই সময় সৈন্য লইয়া মাদ্রাজ হইতে আগমন করেন; দেওয়ান মাণিকচাঁদ বজবজে গিয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধের অভিনয় করিয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসিলেন, বজবজ ইংরেজ সৈন্য দখল করিল। তাহার পর মাণিকচাঁদ হুগলীতে নন্দকুমারকে সংবাদ দিয়া, মুর্শিদাবাদে নবাবকে সংবাদ দিতে চলিয়া গেল; কলিকাতা অরক্ষিত অবস্থায় রহিল এবং ক্লাইভও সেই সুযোগে ইংরেজ সৈন্য লইয়া অবাধে কলিকাতায় উপস্থিত হইল।

নবাব সিরাজদ্দৌলা ইংরেজ কর্তৃক কলিকাতা পুনরধিকারের সংবাদ পাইয়া হুগলী রক্ষার জন্য নন্দকুমারকে তিন হাজার সৈন্য পাঠাইলেন; হুগলীতে নন্দকুমারের দুই হাজার সৈন্য ছিল এবং নূতন তিন হাজার, মোট পাঁচ হাজার সৈন্য দিয়া তিনি হুগলীকে সুরক্ষিত করিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ১০ই জানুয়ারী মেজর কিলপ্যাট্রিক ইংরেজ সৈন্য লইয়া হুগলী আক্রমণ করিল। গোলা বর্ষণে হুগলীর কেল্লার এক স্থান ভাঙিয়া যায় এবং উক্ত স্থান দিয়া ইংরেজ সৈন্য হুগলীতে প্রবেশ করিয়া ব্যাণ্ডেল প্রভৃতি কয়েকটি স্থান লুণ্ঠন ও গ্রামে অগ্নিদান করে। নন্দকুমার যুদ্ধ করিয়া ইংরেজদিগকে হারাইয়া দেন এবং ইরেজগণ কলিকাতায় পলাইয়া আসে। ইহার পর ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীতে যুদ্ধ হয়; বাংলায় কিন্তু উভয় জাতির মধ্যে সদ্ভাব থাকিলেও ক্লাইভ মনে করিলেন যে, যদি ফরাসীগণ নবাবের সাহায্য পায়, তাহা হইলে বাংলার ইংরেজগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে; সেইজন্য ক্লাইভ চন্দননগর আক্রমণ করেন। নবাবেব সহিত ফরাসীদের বিশেষ প্রীতি ছিল, কিন্তু ইংরেজ ও ফরাসীদের যুদ্ধে নন্দকুমার ফরাসীদিগকে সাহায্য না করায়, সিরাজদ্দৌলার নিকট সংবাদ গেল যে, নন্দকুমার ইংরেজের নিকট হইতে ঘুষ লইয়া সাহায্য করিতে বিরত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, নবাব সেই জন্য নন্দকুমারকে পদচ্যুত করেন। এই সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ

ঐতিহাসিক আর্ম্মি সাহেব লিখিয়াছেন—"নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার থাকিলে, ইংরেজ কখনও মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত যাইতে পারিত না।"

পলাশীর রঙ্গমঞ্চে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩ এ জুন যে যুদ্ধের অভিনয় হয় তাহাতে নবাব সিরাজদ্দৌলা রাজ্যচ্যুত ও নিহত হন। ক্লাইভ ভারতে ব্রিটিশ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া মিরজাফরকে বাংলার মসনদে বসান এবং ক্লাইভের অনুমোদনে নন্দকুমার পুনরায় হুগলীর দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন। মিরজাফরকে বাংলার নবাব করিলে তিনি যে টাকা ক্লাইভকে দিবার জন্য প্রতিশ্রুতি ছিলেন, ক্লাইভ সেই টাকা চাহিলে তিনি তাহা দিতে অসমর্থ হওয়ায়, নবাব ক্লাইভকে হুগলী, বর্দ্ধমান ও নদীয়ার রাজস্ব আদায় করিয়া লইতে অনুমতি দেন এবং ক্লাইভ মহারাজ নন্দকুমারকে উক্ত রাজস্ব আদায়ের ভার দেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৯ আগষ্ট নন্দকুমার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'তহশীলদার' হন; হেষ্টিংস সেই সময় বর্দ্ধমানের রেসিডেণ্ট ছিলেন। বর্দ্ধমানের রাজা তাঁহার রাজস্ব হেষ্টিংসকে দিতেন এবং হেষ্টিংসের ঐ স্থানে তখন অনেক উপরি পাওনা ছিল। নন্দকুমার বর্দ্ধমানের রাজাকে রাজস্ব তাঁহার নিকট হুগলীতে পাঠাইতে বলেন এবং সেইজন্য হেষ্টিংস নন্দকুমারের শত্রু হয়। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস ও ভ্যানসিটার্ট নন্দকুমারকে দুই বার বন্দী করেন। দেশের ও দশের উপকারের জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন, কিন্তু হেষ্টিংসের চেষ্টায় মিথ্যা জাল মোকদ্দমায় ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট তাঁহার ফাঁসি হয়। বর্ত্তমানে কলিকাতায় যে স্থানে বিডন উদ্যান হইয়াছে, পূর্ব্বে উক্ত স্থানে মহারাজার সুবৃহৎ অট্টালিকা ছিল।

মিরজাফর ইংরেজের প্রতি বিরক্ত হইয়া চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদিগকে ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করেন। ইংরেজ বণিকগণ তাহা বুঝিতে পারিয়া মিরজাফরকে গদিচ্যুত করেন এবং ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মীরকাশিম নবাব হন পরে তাহার সহিতও ইংরেজের মতানৈক্য হয় এবং

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে পুনরায় মিরজাফর নবাবের গদিতে বসেন। নবাব মীর-কাশিমের শাসনকালে বর্গী-দলপতি শ্রীভট্ট পুনরায় হুগলী লুণ্ঠন করেন। *

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী, মিরজাফর দেহত্যাগ করিল; নন্দকুমার দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে সনন্দ আনাইয়া মিরজাফরের পুত্র নাজিমউদ্দৌলাকে বাংলার সিংহাসনে বসান। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক মতিরাম নামক এক ব্যক্তি হুগলীর ফৌজদার এবং বসন্ত রায় নামক এক ব্যক্তি তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা উভয়েই পরবর্ত্তীকালে কোম্পানীর দ্বারা হঠাৎ কারারুদ্ধ হন।

১১৭৬ সালে বঙ্গদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়, ইহাই ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার পূর্ব্বে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে আর একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল এবং মনুষ্যগণ নরমাংস খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছিল বলিয়া অবুল ফজল কৃত 'আকবরনামায়' লিখিত আছে। †

১৭৭০ খৃষ্টাব্দের মন্বন্তর ইংরেজ বণিকগণ ও রেজা খাঁ সমগ্র বঙ্গের ধান্য একচেটিয়া করিয়া দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে।

এই দুর্ভিক্ষে বঙ্গদেশ শ্মশানে পরিণত হয় এবং শেয়াল কুকুর রাস্তায় বসিয়া শব ভক্ষণ করিত। লক্ষ লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশুর মৃতদেহে গঙ্গা ভরিয়া গিয়াছিল এবং শবদাহ করিবার কোন লোক ছিল না। দুর্ভিক্ষে হুগলীর অবস্থা সম্বন্ধে মেকলে যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম :

"Tender and delicate women whose veils had never been lifted before the public gaze, came forth from their inner chamber in which Eastern jealousy had kept watch

* Long's Records page 264.

† Akbarnama translated by H. Beveridge Vol II, page 56.

over their beauty, throw themselves before the passerby and with loud wailing, implored a handful of rice for their children. The Hooghly rolled down everyday thousands of crops closed to the porticos and garden of the English conquerors".*

. বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"১১৭৬ সালে বাংলা প্রদেশ ইংরাজের শাসনাধীন হয় নাই, ইংরেজ তখন বাংলার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও বাঙালীর প্রাণ, সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরাজের আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ, নরাধম, বিশ্বাসহন্তা, মনুষ্যকুলকলঙ্ক মিরজাফরের উপর।† মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাংলা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলী খায় ও ঘুমায়। ইংরাজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌প্যাচ লেখে। বাঙালী কাঁদে ও উৎসন্ন যায়।" ‡

এদেশীয় লেখকগণ এই দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নাই, ইহাই গভীর পরিতাপের বিষয়। স্যার জন শোর (পরবর্ত্তীকালে লর্ড টেনমাউথ) সেই সময় বঙ্গদেশে ছিলেন। তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বিষয় কবিতাকারে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। পাঠকগণের অবগতির জন্য পর পৃষ্ঠায় উক্ত কবিতা হইতে কয়েক ছত্র উল্লিখিত হইল :

---

* Eassy on Lord Clive, Page 135.

† ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মিরজাফরের মৃত্যু হয় ; তাহার পর নাজিমদ্দৌলা নবাব হন এবং তৎপরে (১৭৬৬—১৭৭০) নবাব মিরজাফরের পুত্রদ্বয় সেফাউদ্দৌলা ও মুবারকউদ্দৌলা ইংরেজ কোম্পানীকে শাসনভার দিয়া পেনসন প্রাপ্ত হন। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র মিরজাফর শব্দটি বঙ্গের ইংরেজ তাবেদারী নবাব এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

‡ আনন্দমঠ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

"Still fresh in memory's eye the scene I view,
The shribelled limbs, sunk eyes and lifeless hue;
Still hear the mother's shrieks and infants moans,
Cries of despair and agonizing groans,
In wild confusion dead and dying lie;
Hark to the jackal's yell and vulture's cry,
The dog's fell howl, as midst the glare of day
They riot unmolested on their prey!
Dire scenes of horror, which no pen can trace,
Nor rolling years from memory's page efface." *

১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকগণ হুগলীকে "বঙ্গদেশের চাবি কাঠি" (Key of Bengal) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন; ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের পর, প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ষ্ট্রাভোরিনাস (Stravorinus) এই স্থান পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে, হুগলীর মধ্যে নবাবের বাড়ি ও হস্তিশালা ভিন্ন আর বিশেষ কিছু দ্রষ্টব্য স্থান নাই। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হুগলীকে শ্মশান করিয়া দিয়া গিয়াছে। পর্ত্তুগীজ, মোগল, ইংরেজ, বর্গী প্রভৃতির অত্যাচার যাহা করিতে সমর্থ হয় নাই, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গোমস্তাগণের আত্মঘাতী নীতির ফলে, হুগলীর সেই সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছিল।

নবাব খাঞ্জা খাঁ হুগলীর শেষ ফৌজদার, তিনি হুগলীর মোগল দুর্গের একটি বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে বসবাস করিতেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস হুগলীর ফৌজদারের পদ তুলিয়া দেন এবং সেইজন্য তাঁহার আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়। তাঁহার ন্যায় বিলাসী ব্যক্তি তৎকালে বঙ্গদেশে কেহই ছিলেন না। আজও বঙ্গদেশে কোনও ব্যক্তি বাবুয়ানা করিলেও তাহাকে "নবাব খাঞ্জা খাঁ" বলিয়া অভিহিত করা হয়। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তিনি গতাসু হইলে, তাঁহার স্ত্রী যত দিন

* Memoir of the life and correspondence of John Lord Teignmouth.

জীবিত ছিলেন, তত দিন ইংরেজ সরকারের নিকট হইতে একশত টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর মোগল দুর্গের শেষ



আর্মেনিয়ান গীর্জ্জা হুগলী

চিহ্ন পর্য্যন্ত ধূলিসাৎ করিয়া লুপ্ত করা হয় এবং দুর্গের ভগ্নস্তূপ পরে দুই হাজার টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল।

হুগলীতে ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে একটী ভীষণ বন্যার সংবাদ "হেজেস ডায়েরী" হইতে পাওয়া যায়। **"September 3rd 1684—The river of**

Ganges is risen so high as it has not been known in ye memory of man—the water being 3 or 4 foot high in ye Bazaar. It is reported more than 1000 houses are fallen down ye Dutch quarters and boats may row round their factory in Hougly,"

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ প্রবর্ত্তিত প্রথম মুদ্রাযন্ত্র হুগলীতে স্থাপিত হয় এবং বঙ্গভাষায় প্রথম মুদ্রিত পুস্তক "A Grammar of the Bengal Language" ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে মিঃ ন্যাথনেল ব্রাসী হ্যালহেড (Nathaniel Brassey Halhed) কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়া, হুগলীর উইলকিন্স সাহেবের ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত হয়। সেই সময় বঙ্গদেশে বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা হইত না বলিয়া, তিনি বঙ্গভাষার শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য সাধনের এবং ইংরেজ বণিকগণের বঙ্গভাষা শিক্ষার নিমিত্ত এই ব্যাকরণখানি রচনা করেন; কারণ সেই সময় বিচারাদি ও জমিদারী কার্য্যের যাবতীয় কাগজ-পত্র পূর্ব্বের ন্যায় বঙ্গভাষায় লিখিত হইত। সেই জন্য ইংরেজগণ বঙ্গদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া বঙ্গভাষায় অজ্ঞতার দরুণ তাহাদিগকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইত। কোম্পানীর কর্ম্মচারিবৃন্দের অসুবিধা দূরীকরণার্থে তিনি এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করেন।

হুগলী-নিবাসী এস, কে, ধর সর্ব্বপ্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈয়ারী করেন। * ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে ভারতে বরফ আসিবার পূর্ব্বে হুগলীতে বরফ প্রস্তুত হইত; যে স্থানে বরফ তৈয়ারী হইত, উক্ত স্থানটি অদ্যাপি 'বরফ তোলার মাঠ' বলিয়া খ্যাত। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ডাক বিভাগের কার্য্য আরম্ভ হয় এবং হুগলীতে আড়াই তোলা ওজনের একখানি পত্র পাঠাইতে এক আনা এবং কাশীতে ঐ ওজনের পত্র পাঠাইতে সাত আনা ব্যয় হইত। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ৬ই জানুয়ারী

* Hooghly District Gazetteer, Page-186.

ভ্রমণের জন্য 'ডাক-চৌকি খোলা হয়। উক্ত চৌকিতে জলপথে বজরা করিয়া এবং স্থলপথে পালকি করিয়া ভ্রমণের ব্যবস্থা সুরু হয়। কলিকাতা হইতে ডাক-চৌকিতে হুগলী যাইতে ৪৬।০ খরচা পড়িত।

বঙ্গবিশ্রুত দাতা গৌরী সেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে হুগলীর অন্তর্গত বালি নামক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুবর্ণবণিক বংশসম্ভূত এবং তাঁহার পিতার নাম ছিল হরেকৃষ্ণ মুরারিধর সেন। তাঁহার দানশীলতার কথা বঙ্গের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। পরের অর্থ ব্যয় বা দাতার অসাধারণ ব্যয় প্রসঙ্গে অদ্যাপি "লাগে টাকা—দেবে গৌরী সেন" বলিয়া প্রবাদ বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। একমাত্র গৌরী সেনের প্রতিষ্ঠিত গৌরীশঙ্কর দেবের মন্দির ব্যতীত বর্ত্তমানে এই স্থানে আর কিছুই নাই, তবে গৌরী সেনের বংশধরগণ এখনও হুগলীতে বর্ত্তমান আছেন।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের দ্বিতীয়া পত্নী তৎকালীন বিদেশীয় সুন্দরীগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান মাদাম্ গ্রাণ্ড (**Madam Grand**) এই স্থানে বাস করিতেন। এতদ্ব্যতীত প্রথম ইংরেজ পরিব্রাজক র‍্যালফ্ ফিচ্, পার্কাশ, হ্যামিল্টন প্রভৃতি পর্য্যটকগণ এই স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। হুগলীর সেন, মল্লিক, চৌধুরী, মিত্র প্রভৃতি কয়েকটি প্রসিদ্ধ বংশের নাম উল্লেখযোগ্য। মল্লিক বংশ খুব প্রাচীন এবং এই বংশের ব্রহ্মমোহন মল্লিক-চৌধুরী ও মিত্র বংশের ঈশান চন্দ্র মিত্র পরবর্ত্তীকালে হুগলীর বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি হইয়াছিলেন। মুসলমান অধিবাসিগণের মধ্যে কাশিম আলি মল্লিক, মির্জ্জা সালেউদ্দিন, মহম্মদ খাঁ আশারুল্লা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

হুগলীর ইমামবাড়া ভারতের অন্যতম দর্শনীয় বস্তু; ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে বাংলার গৌরব হাজি মহম্মদ মহসীনের সম্পত্তির অংশ হইতে ইহার

* **Calcutta Gazette, 1785.**

নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয় এবং ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই সুন্দর ভবনের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হয়। ইমামবাড়ার সম্মুখের বৃহৎ ঘড়িটি বিলাত হইতে আনাইতে ১১৭২১ টাকা এবং গঙ্গার ধার ইট দিয়া বাঁধাইতে ষাট হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এইরূপ সুন্দর অট্টালিকা বঙ্গদেশে তৎকালে খুব অল্পই ছিল। গঙ্গার ধারে ইমামবাড়ার গাত্রে ইংরেজী ভাষায় হাজি মহম্মদ মহসীনের দানপত্রখানি উৎকীর্ণ আছে। মহরমের সময় এই স্থানে বহু লোকের সমাগম হয়।

১৭৩০ খৃষ্টাব্দে দানবীর মহাত্মা হাজি মহম্মদ মহসীন হুগলীতে জন্মগ্রহণ করেন। যে কয়জন মহাত্মার আবিভাবে বঙ্গজননী গৌরবান্বিত মহম্মদ মহসীন তন্মধ্যে অন্যতম। বাল্যকালে তিনি সিরাজী নামক এক পণ্ডিতের নিকট আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। তাহার মাতার দুই বিবাহ, প্রথম পক্ষের সন্তানের নাম মন্নু বেগম, মন্নুর পিতা আগা মোতাহার বহু সম্পত্তি রাখিয়া গতাসু হইলে, মন্নুর মাতা ফৈজুল্লাকে বিবাহ করেন এবং মহসীন তাঁহার মাতার দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান মির্জ্জা সালাউদ্দিনের সহিত মন্নুর বিবাহ হয়, কিন্তু তিনি অল্প বয়সেই বিধবা হন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মন্নু তাহার ভ্রাতা কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী ফকির মহসীনকে অর্দ্ধ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া যান।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মহসীন তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি সৎকার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য দানপত্র করিয়া যান। পরে উক্ত সম্পত্তির বার্ষিক আয় দেড় লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। উক্ত 'মহসীন-ফণ্ড' হইতে হুগলী মহসীন কলেজ, ইমামবাড়া হাসপাতাল, হুগলীর ইমামবাড়া, বহু মক্তব ও পাঠশালা স্থাপিত হয়। ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। গঙ্গাতীরে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। পূর্ব্বে সমাধিস্থলে কোন আচ্ছাদন ছিল না কিন্তু ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে খাঁ বাহাদুর আল্লাউদ্দীন আহম্মদের চেষ্টায় এবং জনসাধারণের অর্থে তাঁহার সমাধির

উপর একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মহসীনের জন্মে হুগলী ধন্য ও পবিত্র হইয়াছে এ কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

মহসীনের সমাধি মন্দিরটি আধুনিক হইলেও একটি দর্শনীয় বস্তু; এই মন্দিরের মধ্যে ছয়টি সমাধি বিদ্যমান আছে। শ্বেত প্রস্তরের



হাজি মহম্মদ মহসীনের সমাধি-স্তম্ভ

আড়ম্বর-বিহীন সমাধিগুলির শীর্ষদেশে মার্ব্বেল প্রস্তরের এক একখানি ফলক আছে এবং প্রতি ফলকের উপর মৃত ব্যক্তির পরিচয়-লিপি উর্দ্দুভাষায়

উৎকীর্ণ আছে। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে তরুছায়া সমাচ্ছন্ন উদ্যানের মধ্যে হাজি মহম্মদ মহসীন, তাঁহার ভগ্নীপতি সালাউদ্দীন খাঁ, ভগ্নী মন্নু বেগম, মাতা জনাব বেগম, পিতা আগা মহম্মদ মুতাহার এবং গুরুদেব সৈয়দ কামালউদ্দীন ঠিক যেন এক বিছানায় শয়ন করিয়া আছেন, আর ভাগীরথীও যেন প্রতি উচ্ছ্বাসে মহসীনের পবিত্র নাম বঙ্গবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিতেছে—

"মুক্ত বেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে,
সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ ভঙ্গে,
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।"*

১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল তারিখে তিনি নিম্নলিখিতরূপ দানপত্র সুসম্পন্ন করেন। এই দান পত্র হুগলী ইমামবাড়ার ধনভাণ্ডারে সযত্নে রক্ষিত আছে। উহাই ইংরেজী অনুবাদ বর্ত্তমান ইমামবাড়ার গঙ্গার তীরবর্ত্তী প্রাচীর গাত্রে খোদিত রহিয়াছে, আমরা এখানে মূল দানলিপির বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম।

"আমি হাজি মহম্মদ মহ্‌সীন বন্দর হুগলী নিবাসী হাজি ফৈজুল্লার পুত্র এবং আগা ফৈজুল্লার পৌত্র স্বজ্ঞানে স্ববুদ্ধিতে স্বেচ্ছাক্রমে নিম্নলিখিত সত্য এবং ন্যায্য কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি। যশোহর জিলার সংলগ্ন কিস্‌মত সৈয়দপুর এবং হুগলী অবস্থিত ইমামবাড়া নামক বিখ্যাত বাড়ী ইমামবাজার এবং হাট ও স্বতন্ত্র তালিকাভুক্ত ইমামবাড়া সংলগ্ন সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি যে সকল আমি উত্তরাধিকারী-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ইহার দখল সত্ত্ব বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছি, আমার কোন পুত্র, পৌত্র এমন কি ন্যায্য আইনসঙ্গত কোন উত্তরাধিকারী

* বিস্তারিত বিবরণ রায় বাহাদুর মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র রচিত মহসীনের জীবনীতে লিখিত আছে।

পর্য্যন্ত না থাকায় এবং আমাদের বংশের চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে হজ-রতের 'ফতে' ইত্যাদি পর্ব্বোপলক্ষে দানকার্য্য ও অন্যান্য রীতিনীতি রক্ষা করিবার আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকায় আমি পূর্ব্বোক্ত সমুদয় সম্পত্তি সর্ব্ববিধ অধিকার সহ নিম্নসর্ত্তানুরূপ ব্যয়নির্ব্বাহার্থ খোদার নামে স্থায়ী ভাবে দান করিয়া যাইতেছি।

"সেখ মহম্মদ সাদিকের পুত্র রাজবউলিখাঁ ও আমাদ খাঁর পুত্র সকিরউলি খাঁর বিদ্যা বুদ্ধি ধর্ম্ম-প্রবণতা এবং সাধুতা দেখিয়া আমি ইহা দ্বারা তাহাদিগকে উক্ত কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য আমার সম্পত্তির মাতোয়ালি বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিতেছি। তাঁহারা পরস্পরের উপদেশ এবং সাহায্য গ্রহণান্তর পরামর্শ করিয়া ও একমত হইয়া উক্ত কার্য্য একত্রে নিম্ন-লিখিত ভাবে সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করিবেন। পূর্ব্বোক্ত মতোয়ালিগণ রাজস্ব প্রদানপূর্ব্বক অবশিষ্ট উপসত্ব নয়ভাগে বিভক্ত করিবেন। তাহা হইতে তিন ভাগ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি হজরত সৈয়দ ইকায়ুনত এবং নিষ্পাপ ইমামগণের 'ফতে'র জন্য মহরম উলহরাম, উস্রা ও আন্যান্য পর্ব্ব, পর্ব্বদিন উপলক্ষে এবং ইমামবাড়া ও সমাধি স্থান সংস্কারের জন্য ব্যয় করিবেন! দুইভাগ সমভাবে বিভক্ত করিয়া মাতোয়ালিগণ নিজ নিজ খরচের জন্য রাখিবেন। অবশিষ্ট চারিভাগ কর্ম্মচারিদিগের মাহিয়ানা ও তৎসংক্রান্ত নানাবিধ খরচাদি এবং যাহাদের নাম আমার স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত করিয়া ভিন্ন তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে, তাহাদের জন্য প্রদান করিবেন। দৈনিক ব্যয়ও মাসিক বৃত্তি বা বেতন বিষয়ে সর্ত্ত রহিল যে উক্ত বৃত্তি বা বেতনধারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, প্যায়াদাগণ ও অন্যান্য নিযুক্ত ব্যক্তিগণের যোগ্যতা ও উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া উক্ত মাতোয়ালীগণ স্বেচ্ছামত তাহাদিগকে কর্ম্মে বহাল দিম্বা কর্ম্মচ্যুত করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন। আমি সর্ব্বজনসমক্ষে এই অধিকার উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের হস্তে প্রদান করিয়াছি। যদি কোন সময়ে কোন মাতোয়ালী এই দলিলোক্ত

কার্য্য করিতে অক্ষম বোধ করেন তাহা হইলে তিনি একজন উপযুক্ত এবং সুদক্ষ ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিয়া তাহার পক্ষ হইতে মাতোয়ালির কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেন উল্লিখিত সর্ত্তগুলি আজ হিজিরা ১১২১, বাঙ্গলা ১২১৩ সনের বৈশাখ মাসের ১৯শে তারিখে এই দলিল লিখিয়া দেওয়া গেল এবং প্রয়োজন হইলে উক্ত দলিলই আমার ন্যায়ানুমোদিত কার্য্যের যথার্থতা সপ্রমাণ করিবে।"*

হুগলীর প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে পর্ত্তুগীজদিগের নির্ম্মিত ব্যাণ্ডেল গীর্জ্জা বাংলাদেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন খৃষ্টীয় উপাসনাগার। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে এই গীর্জ্জা নির্ম্মিত হয় এবং মোগল কর্ত্তৃক হুগলী আক্রমণের সময় ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে ইহা ধ্বংস করা হয়। পরে ফাদার ডি-ক্রুজ (**Father De-Cruz**) নামক এক ধর্ম্মযাজক দিল্লীর বাদশাহের অনুগ্রহলাভে সমর্থ হইয়া গীর্জ্জা পুনর্নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি ও ৭৭১ বিঘা নিষ্কর জমি প্রাপ্ত হন। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে গোমেস্ ডি সোটো (Gomes De Soto) এই ব্যাণ্ডেল গীর্জ্জা পুনরায় নির্ম্মাণ করেন। *

এই সম্বন্ধে **List of Ancient Monuments in Bengal** নামক গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, তাহা উদ্ধৃত হইল:

"This Church was founded in 1599 A. D. and the oldest Christian Church in Bengal. The church was burnt during the siege of Hooghly but the key stone with the year 1599 inscribed on it remained in tact and this key stone was used when the church was rebuilt in A. D. 1661 by a Portugese gentleman named Gomes De Soto.

* সাহিত্য সাধনা—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

* "The Protuguese in North India." Calcutta Review 1846.

who lies buried within the precincts of the church along with other relations. When Hooghly was taken, the Mahammadans destroyed the images and books of this church. The Emperor of Delhi subseequently made a grant of 771 bighas of land, rent free, to the church. In November of each year there is a celebrity at this church the disciple of Novena to which the Roman Catholics largely resort from Calcutta."

ইহার নিকটেই গঙ্গার উপর "জুবিলী-ব্রীজ" অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও এখানকার একটি দর্শনীয় বস্তু। এই সেতু লম্বায় বার শত ফুট এবং ইহা নির্ম্মাণ করিতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানীকে নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল নামক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় বর্দ্ধমানের মহারাজা, স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির সংগৃহীত অর্থে হুগলীর তৎকালীন জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ স্মিথ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ভ্রাতা মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পড়িয়াছিলেন। ঈশানবাবু বাঙালীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম 'higher graded service' পাইয়াছিলেন এবং তৎকালে ৭৫০৲ বেতনে অবসর গ্রহণ করেন। হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল হইতে তিনি হুগলী কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত কর্ম্মবহুল জীবনের ঘটনাবলী 'গুপ্তিপাড়া' অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে রাজকিশোর রায় নামক এক ব্যক্তি দেওয়ান হইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় সম্ভ্রান্ত এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাকে

লক্ষ্য করিয়া সাধক রামপ্রসাদ সেন তাঁহার কালীকীর্ত্তনের এক স্থলে লিখিয়াছেন ঃ

"শ্রীরাজকিশোরদেশে শ্রীকবিরঞ্জন
রচে গান মহা অন্ধের ঔষধ অঞ্জন ॥"

ভূকৈলাসের মহারাজা উক্ত সময়ে ভারতের তীর্থগুলি পর্য্যটন করেন এবং ভারতের সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান ও দর্শনীয় বস্তুসমূহের বিবরণ তাঁহার আদেশে বিজয়রাম সেন 'তীর্থমঙ্গল' নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে রাজকিশোর রায় সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা উল্লিখিত হইল।

"চলাচল আইলা নৌকা হুগলী সহরে।
সে রাত্রি বঞ্চিলা কর্ত্তা নৌকার ভিতরে॥
হুগলীর দেওয়ান রাজকিশোর রায়।
বজরাতে আসিয়া তাঁহে প্রণমিল পায়॥
বৈদ্যের প্রধান তিনি বড় কুলবান।
এ দেশে নাহিক লোক তাঁহার সমান॥
ক্ষণেক কর্ত্তার সঙ্গে আলাপ কথনে।
নৌকা হৈতে উঠি গেলা সহর ভুবনে॥"

হুগলীতে আর এক জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি দেওয়ান হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম কৃষ্ণরাম বসু। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার তড়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র পনর বৎসর বয়সে পিতার সহিত কলিকাতায় আসিয়া ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত লবণের ব্যবসা করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। পরে মাসিক দুই হাজার টাকা বেতনে তিনি হুগলীর দেওয়ান হন। হুগলী, যশোহর ও বীরভূম জেলায় তিনি বহু জমিদারী ক্রয় করেন এবং উক্ত স্থানগুলিতে দেবকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া দেবসেবার জন্য বহু জমি বন্দোবস্ত করিয়া যান। মাহেশে ও পুরীতে জগন্নাথদেবের

রথযাত্রার খরচের জন্য তিনি বহু অর্থ বন্দোবস্ত করিয়া যান এবং তাঁহারই প্রদত্ত দেবসেবা হইতে মাহেশের রথযাত্রা অদ্যাপি মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইতেছে। দানশীলতার জন্য তিনি তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। রাধানগরের যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের রচিত 'তীর্থ ভ্রমণ' নামক গ্রন্থে (১৭৪ পৃষ্ঠা) কৃষ্ণরাম বসুর উল্লেখ আছে।

ব্যাণ্ডেল হুগলী জেলার অন্যতম স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল; এবং ইউরোপীয়গণ কলিকাতা হইতে ব্যাণ্ডেলে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য প্রায়ই যাইত বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের 'কলিকাতা গেজেটে' সুপ্রিম কোর্টের জজ স্যার রবার্ট চ্যাম্বারস্ পর্য্যন্ত এই সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর ব্যাণ্ডেলে ছুটি উপভোগ করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে সংবাদটি উদ্ধৃত হইল :

"Sir Robert Chambers, Judge of the Supreme Court, had gone to spend the vacation at the pleasant and healthy settlement of Bandel." *

পর্ত্তুগীজদের ব্যাণ্ডেল গীর্জ্জা বঙ্গদেশের প্রথম গীর্জ্জা বলিয়া, বিভিন্ন স্থানের ইউরোপীয়গণ ভজনা করিবার জন্য এই স্থানে সমবেত হইতেন; কিন্তু বহু অসৎপ্রকৃতির ইউরোপীয় উক্ত ভজনাগারে যাইয়া নানা প্রকারের গোলমাল করিয়া প্রায়ই বিঘ্ন সৃষ্টি করিত।

এই সম্বন্ধে 'কলিকাতার গেজেটের' নিম্নোক্ত সংবাদটি হইতে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যাইবে।

"Caution—Bandel, 10th November 1804. Every person present at Bandel Church while divine service is performing from the 15th fo the 24th current, are requested to behave with every due respect as in their

* Calcutta Gazette, dated 3rd September 1799.

own churches, on the contrary, they shall be compelled to quit the temple inmediatety, without attending the the quality of person." †



ব্যাণ্ডেল গির্জ্জার পিছনের 'গ্রোটোর' (Grotto) দৃশ্য: ইহা বঙ্গের প্রাচীনতম ভজনাগার

ব্যাণ্ডেলের প্রশংসা করিয়া জনৈক ইংরাজ কবি ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দের ৩ই আগষ্ট তারিখের 'কলিকাতা গেজেটে' একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, পর পৃষ্ঠায় উক্ত কবিতাটী উদ্ধৃত হইল:

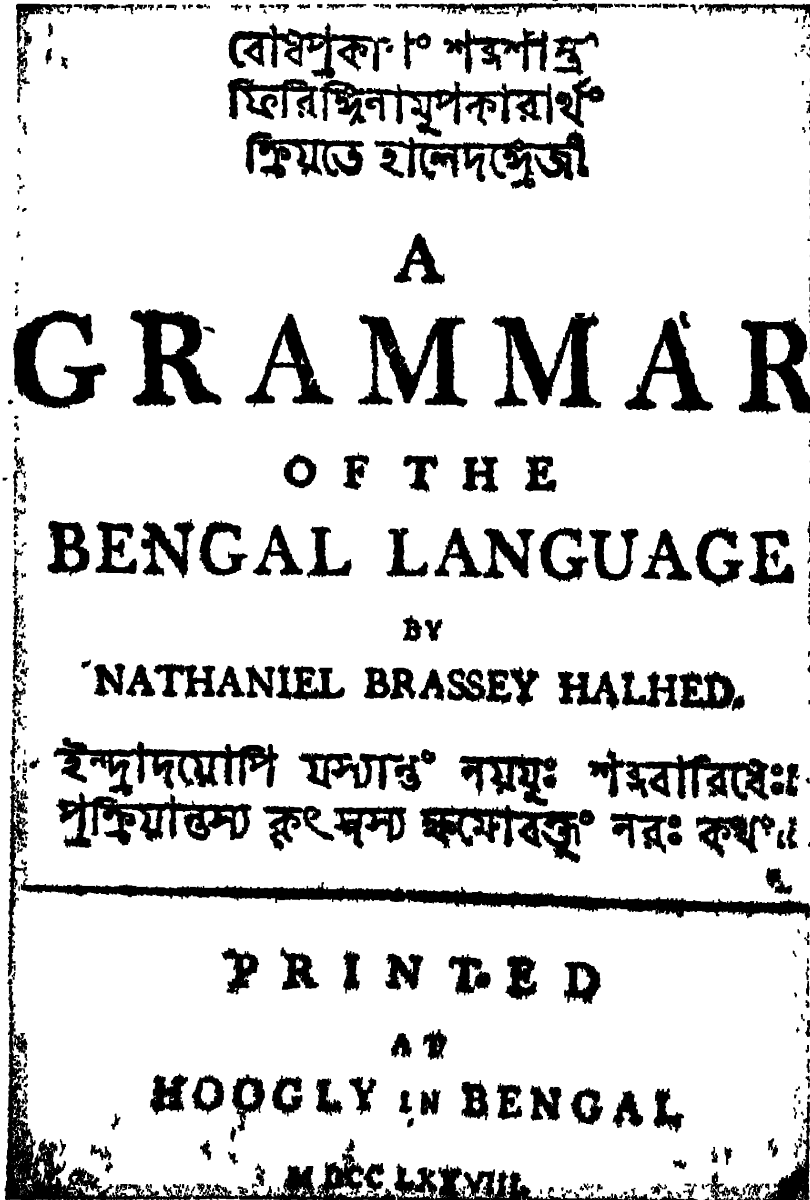
† Calcutta Gazette 15th November 1804.

BANDEL

Come listen to me, whilst I tell,
In pleasing lines the objects fell,
There's Hughli mounted on a swell[1]
Here the bank rises, there's a dwell.
Water you'll find in many a well
No dirty roads or stinking smell
All billious gloom you'll soon dispel
And now here meet with the parcil
'Tis fine to hear the Padre's bell
Would you be known to many a belle
Ask......................who loves to dwell
Lives like a hermit in his cell
I thought to have found there madame Pelle
Each other place is hot as hell
I'm sure no argument can quell
I'll kick the rogue and make him yell
Had I ten houses, all I'd sell
Come let's away there ; haste pelmel
The charms I found at fair Bandel
In propect viewed from high Bandel
To improve the scenery round Bandel
A change peculiar to Bandel
That's clear and sweet about Bandel
Will e'er offened you at Bandel
By a short sejour at Bandel
Of healthy air that's at Bandel,
Summon tc vespers at Banbel.
Whose beauty charms you at Bandel,
And scribble verses at Bandel ;

বাঙ্গলার প্রথম মুদ্রিত পুস্তক

ভারতবর্ষে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম ইংরাজ প্রবর্ত্তিত মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়; সর্বপ্রথম হয় বাঙ্গলায়, পরে হয় বোম্বাই সহরে। প্রায় একই সময়ে



বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী

A
GRAMMAR
OF THE
BENGAL LANGUAGE
BY
NATHANIEL BRASSEY HALHED.

ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং নযযুঃ শব্দবারিধেঃ।
প্রক্রিয়ান্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমোবক্তুং নরঃ কথং।

PRINTED
AT
HOOGLY IN BENGAL
M DCC LXXVIII.

প্রথম মুদ্রিত পুস্তকের আখ্যাপত্র

প্রথম মুদ্রাযন্ত্র উভয় স্থানে স্থাপিত হইলেও, বঙ্গদেশ হইতে সর্বপ্রথম ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত পুস্তক প্রকাশিত হয়।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গদেশের দেওয়ানী ভার

গ্রহণ করিয়া এই দেশের সম্পূর্ণ আধিপত্য গ্রহণ করেন। এই সময় ইংরাজগণ দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলেও তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই এক দেশে কোম্পানীর বাণিজ্যকার্য্য পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল। তৎকালে যাবতীয় চিঠিপত্র ও হিসাবনিকাশ বঙ্গভাষায় পরিচালিত হইত। গোমস্তা, আমীন মাল খরিদারগণের প্রতি আদেশও বঙ্গভাষায় লিখিত হইত এবং জমিদারী কার্য্যের কাগজপত্র ও বিচারাদিও বঙ্গভাষায় লিখিত হইত। অথচ এই সময় গদ্য রচনার কোন সুবিধা ছিল না বলিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিদিগকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। ইংরাজদিগের উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে হুগলীর তৎকালীন সিভিল কর্মচারী মিঃ ন্যাথনেল ব্রাসি হালহেড (**Nathaniel Brassey Halhed**) বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন।

কেবল বাণিজ্য বিস্তার নহে, খৃষ্টধর্ম প্রচার ও তাহার প্রসারও ইংরাজদিগের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। উক্ত উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য খৃষ্টান মিশনারী বেণ্টো "প্রশ্নোত্তরমালা" শীর্ষক খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে একখানি গদ্যপুস্তক ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভাষায় রচনা করেন এবং এইস্থানে মুদ্রাযন্ত্র না থাকায় লণ্ডনে এই পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়াছিল। ইংরাজ অভ্যুদয়ের প্রারম্ভে উক্ত পুস্তকখানিই প্রথম গদ্যপুস্তক বলিয়া খ্যাত। বর্ত্তমানে উক্ত পুস্তকখানি দুঃপ্রাপ্য হইয়াছে।

হালহেড সাহেব অল্পদিনের মধ্যেই বঙ্গভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং ইংরাজদিগের শিক্ষার নিমিত্ত "**A Grammar of The Bengal Language**" বঙ্গভাষার একখানি ব্যাকরণ প্রনয়ণ করেন। তখনও বাঙ্গলাদেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় নাই; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিবৃন্দ বঙ্গভাষা শিক্ষার নিমিত্ত বাঙ্গলা পুথি পাঠ করিতে চেষ্টা করিতেছিল। অবশেষে কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী বিখ্যাত পণ্ডিত স্যার চার্লস উইলকিন্স ইংলণ্ড হইতে আসিয়া ১৭৭৮

খৃষ্টাব্দে হুগলীতে কোম্পানীর আমলের প্রথম মুদ্রাযন্ত্র ভারতে প্রতিষ্ঠা করেন। সেইজন্য স্যার চার্লস উইলকিন্সকে ভারতের 'কেক্সটন' (Caxton) বলিতে পারা যায়।



স্যার চার্লস উইলকিন্স*

উইলকিন্স সাহেব হুগলীতে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করিলেও বাঙ্গলা অক্ষর তখনও প্রস্তুত হয় নাই। তিনি প্রাচীন পুঁথির অক্ষর ও খুসখৎ মুন্সির হস্তাক্ষর দেখিয়া কাঠে খোদাই বাঙ্গলা অক্ষর প্রস্তুত করিতে ব্রতী হন। পঞ্চানন কর্ম্মকার নামক এক ব্যক্তি উইলকিন্স সাহেবকে কাষ্ঠের খোদাই করা অক্ষর প্রস্তুত কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করেন এবং পরবর্ত্তীকালে এই পঞ্চানন কর্ম্মকার ছাপাখানার কার্য্যে, একজন বেশ পাকা লোক হইয়া উঠে।

* ভ্রমক্রমে ২৭২ পৃষ্ঠায় ইহার চিত্রখানি কেরী সাহেবের নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

উইলকিন্স সাহেবের হুগলীর ছাপাখানা হইতে প্রথম যে পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়া ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল সেই পুস্তকখানি হ্যালহেড সাহেবের পূর্বোক্ত বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ এবং উহাই বঙ্গদেশের প্রথম মুদ্রিত পুস্তক—সর্বাপেক্ষা পুরাতন। পঞ্চানন কর্ম্মকারের প্রস্তুত কাঠের অক্ষর দিয়া এই ব্যাকরণখানি মুদ্রিত হইয়াছিল। এই পুস্তকখানির আখ্যাপত্রের (**Title Page**) উপরে লিখিত আছে :

"বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী"

পরে ইংরাজী ভাষায় **A Grammer of the Bengal Language —By Nathaniel Brassey Halhed** এবং তৎপরে,

"ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং নয়য়ুঃ শব্দবারিধেঃ।
প্রক্রিয়াস্তস্য কৃৎসস্য ক্ষমোবক্তুং নরঃ কথং ॥"

এবং পরিশেষে নিচের দিকে **Printed at Hooghly in Bengal** ও রোমান টাইপে **MDCCLXXVIII** অর্থাৎ ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ইহাই লিখিত আছে।

পুস্তকের ভূমিকার শেষ ভাগে হ্যালহেড সাহেব একটি বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, উক্ত বিজ্ঞাপনে তিনি লিখিয়াছেন যে, বর্ষাকালে পুস্তকখানি মুদ্রিত হওয়ায় গ্রীষ্মারম্ভে যেন পুস্তক বাঁধান হয়। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :

"It is recommended not to bind this book till the setting in of the dry season as the greatest part of it has been printed during the rains."

হ্যালহেড সাহেব যে বঙ্গভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা উক্ত ব্যাকরণখানি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। তিনি গ্রীক,

লাটিন, সংস্কৃত, পারসী ও আরবী ভাষার ব্যাকরণের সহিত তুলনা করিয়া এই ব্যাকরণ রচনা করেন। ইহাতে বঙ্গভাষার তৎকালিক ও আধুনিক বাক্যপদ্ধতির বহু উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। যে সময় বাঙ্গলা দেশে বঙ্গ সাহিত্যের কোনরূপ আলোচনা হইত না, সেই সময় একজন ইংরাজ ভদ্রলোক বঙ্গীয় লিখন ভাষায় ও কথন ভাষায় বিশেষ অধিকার লাভ করিয়া একখানি ব্যাকরণ রচনার দ্বারা বঙ্গভাষার শৃঙ্খলা ও গদ্য রচনার সৌকর্য্য সাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহাই বঙ্গভাষার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট ঘটনা।

তিনি উক্ত পুস্তকে লিখিয়াছেন, "আমি এই ব্যাকরণ প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণের পুস্তক হইতে যে সকল উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে বাঙ্গালা ভাষায় যথেষ্ট গৌরব রহিয়াছে বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য, বিজ্ঞান ইতিহাসাদির যে কোন বিষয়ের যথাযথ রূপ বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালীরা এ সম্বন্ধে কোন যত্নই করেন নাই। তাহাদের হাতের লেখা, তাহাদের বর্ণবিন্যাস এবং তাঁহাদের শব্দ-নির্ব্বাচন—সকলই ভ্রমাত্মক ও অসঙ্গত। ইহারা না জানেন একটা শব্দের রূপ, না জানেন বাক্যগ্রন্থন প্রণালী। ইহাদের লেখা আরবী, পারসী, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গলা শব্দের একটা জগাখিচুড়ী; তাহার না আছে শৃঙ্খলা, না আছে কোন অর্থ। উহা অতি অস্পষ্ট, অবোধ্য এবং ক্লেশপাঠ্য।"

হ্যালহেড সাহেবের বিষয়কার্য্যের যে সকল কাগজপত্রাদি দৃষ্টিগোচর হইত, তাহাতে বঙ্গভাষার গদ্য রচনার তৎকালে কোন গদ্য-সাহিত্য আছে কি না, তদ্বিষয়ে বহু অনুসন্ধান করিয়াছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি একখানিও গদ্য সাহিত্যের নাম শুনিতে পান নাই। গদ্য-সাহিত্য সংগ্রহের বিশেষ চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য না হওয়ায় কাশীরাম দাসের মহাভারত, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, মহাপ্রভুর লীলাময় বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহ হইতে উক্ত ব্যাকরণে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কোন গদ্য সাহিত্যের

উদাহরণ উল্লিখিত ব্যাকরণ দিতে পারেন নাই। তিনি এই সম্বন্ধে ব্যাকরণে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"থিউসিডাইডের পূর্ব্বে গ্রীস দেশের সাহিত্যের যে দশা ছিল বঙ্গীয় সাহিত্যেরও এখন সেই দশা। গ্রন্থকারগণ কেবল পদ্যেই পুস্তক রচনা করিয়া আসিতেছেন। গদ্য এ দেশের সাহিত্যে একেবারেই অপ্রাপ্য। বিষয়-কার্য্যের চিঠিপত্র, আবেদন এবং বিজ্ঞাপনী (ইস্তাহার) প্রভৃতি অবশ্য পদ্যে লিখিত হয় না, কিন্তু এই সকল রচনাতেও গদ্যের কোন নিয়ম নাই, ব্যাকরণসঙ্গত বাক্যগ্রন্থনের কোন প্রণালী নাই। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মতত্ত্ব বল, ইতিহাস বল, নীতিকথা বল—যে সকল বিষয়ে পুস্তক রচনা করিলে গ্রন্থকারগণের নাম চিরস্মরণীয় হয়, তৎসমস্তই পদ্যে লিখিত হইয়া আসিতেছে।"

বঙ্গীয় গদ্য-সাহিত্যের উন্নতিকল্পে সে সময় হালহেড সাহেবের হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়েই প্রকৃত গদ্য-সাহিত্যের প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায় হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে আবির্ভূত হন। তিনি প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে মাত্র ষোড়শ বৎসর বয়সে "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী" নামক পুস্তক ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রনয়ণ করেন। সুপ্রসিদ্ধ পাদরী শ্রীরামপুরের কেরী সাহেবের মতে এই পুস্তকখানিই বঙ্গদেশের প্রথম মুদ্রিত গদ্য গ্রন্থ; কিন্তু রেভারেণ্ড লং সাহেব ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের "কলিকাতা রিভিউ পত্রিকায় **A Descriptive Catalogue of Bengali Works** নামক গ্রন্থ তালিকায় রাম বসুর "প্রতাপাদিত্য-চরিত্র"কে প্রথম গদ্য-গ্রন্থ বলিয়া লিখিয়াছেন।

"The first prose work and the first Historical one that appeared was the life of Protapaditya by Ram Bose."

ইংরাজ অভ্যুদয়ের প্রারম্ভে কোনখানি প্রথম গদ্য পুস্তক এই সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে, এবং সেই সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে বঙ্গভাষার গদ্য-

সাহিত্যের উদ্বোধনে যে সকল ইংরাজ বঙ্গসাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে অগ্রণী হইয়াছিলেন, আজ তাহাদিগের প্রতি শ্রধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

বাঙ্গলায় প্রথম গদ্য পুস্তক

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গদেশের দেওয়ানী ভার গ্রহণ করিয়া এই দেশের সম্পূর্ণ আধিপত্য গ্রহণ করেন; অথচ গদ্য রচনার বিশেষ সুবিধা না থাকায়, কোম্পানীর কর্মচারীদিগকে বিশেষ অসুবিধায়



উইলিয়াম কেরী

পড়িতে হইত, কারণ তৎকালে জমিদারী কার্য্যের কাগজপত্র বঙ্গভাষায় লিখিত হইত। কোম্পানীর ভূতপূর্ব কর্মচারী স্যার চার্লস উইলকিন্স ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে কোম্পানীর আমলের প্রথম মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং মিঃ হালহেড ইংরাজদের পূর্বোক্ত অসুবিধা দূরীকরনার্থে উক্ত

মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাঙ্গলা ব্যাকরণ প্রকাশ করেন তাহা পুর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানিই বঙ্গদেশের প্রথম মুদ্রিত পুস্তক।

১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী কেরী সাহেব ওয়ার্ডের সহিত শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর তাঁহাদের চেষ্টায় শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস নামক মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয় এবং রামরাম বসু কৃত 'প্রতাপাদিত্য-চরিত্র' শীর্ষক পুস্তক ১৮০১ খৃষ্টাব্দে মিশন প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহাই বঙ্গের প্রথম মুদ্রিত গদ্য পুস্তক বলিয়া খ্যাত।

বাঙ্গলা টাইপের জন্মকথা প্রসঙ্গে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের **The Calcutta Christian Observer** নামক পত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা উল্লিখিত হইল :

"India had never seen printing in her own indigenous characters, till about twelve years before the arrival of the brethren Carey, and Thomes in India. She was indebted for its existence to the ingenuity and unceasing efforts of Lieut, Wilkins, then a young man in the Bengal Army, and now, the justly celebrated Dr, Wilkins. The attachment of this young man to Indian literature is testified both by Sir William Jones and by Nathaniel Brassey Halhed Esq, the author of the first and the most elegant grammer of the Bengalee language, which has yet appeared. This was printed at Hooghly in 1784 * with the first complete fount of Bengalee Types Lieutenant Wilkins fabricated............" (page—451).

রেভারেণ্ড লং সাহেব ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকায় **A descriptive Catalogue of Bengali works** নামক গ্রন্থ তালিকায় রামরাম বসুর "প্রতাপাদিত্য চরিত্র"কেই প্রথম মুদ্রিত গদ্য ও

* বাঙলা ব্যাকরণ ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু ভ্রমক্রমে এই স্থানে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ লেখা আছে।

ঐতিহাসিক পুস্তক বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কেরী সাহেব এই সম্বন্ধে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি ভিন্ন মত প্রকাশ করিলেও, "প্রতাপাদিত্য চরিত্র"কেই বঙ্গের প্রথম গদ্য গ্রন্থ বলিয়া ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। "প্রতাপাদিত্য চরিত্রে"র দুইটি আখ্যাপত্র আছে একটি ইংরাজিতে ও একটি বাঙলায়; ইংরাজি আখ্যাপত্রে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ও বাঙলা আখ্যাপত্রে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত বলিয়া লেখা আছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে পুস্তকখানি যে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া কখনই বলিতে পারা যায় না।

১৩৫৩ সালে, হুগলী জেলার ইতিহাস সঙ্কলনের জন্য আমাকে বহু ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয় এবং বহুস্থানে যাইতে হয়। সেই সময় ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ও শ্রীরামপুর হইতে মুদ্রিত একখানি সুবৃহৎ গদ্য-পুস্তক আমি শ্রীরামপুরের উকিল শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট দেখি; উহার নাম "ধর্মপুস্তক"। পুস্তকখানি দেখিয়া উহা বঙ্গের প্রথম মুদ্রিত গদ্য পুস্তক বলিয়া আমার ধারণা হয় এবং এই সম্বন্ধে ১৩৫৩ সালের ১৮ই শ্রাবণ তারিখের "দেশ" পত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি। ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে উক্ত পুস্তকখানির কথা বলিলে, তিনিও পুস্তকখানি দেখিয়া উহার সম্বন্ধে ১৩৫৩ সালের ভাদ্রমাসের "বঙ্গশ্রী" পত্রে একটি প্রবন্ধে "ধর্ম্মপুস্তক"কেই প্রথম গদ্যপুস্তক বলিয়া ঘোষণা করেন এবং তল্লিখিত "সাহিত্যের কথা" নামক পুস্তকেও তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু অদ্যাবধি উহার কোন প্রতিবাদ হয় নাই।

'ধর্ম্মপুস্তকের' পরিচয় পৃষ্ঠার (title page) উপর নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত আছে :

ধর্ম্মপুস্তক

যাহা ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য

যাহা প্রকাশ করিয়াছেন মনুষ্যের ত্রাণ ও কার্য্য

শোধনার্থে

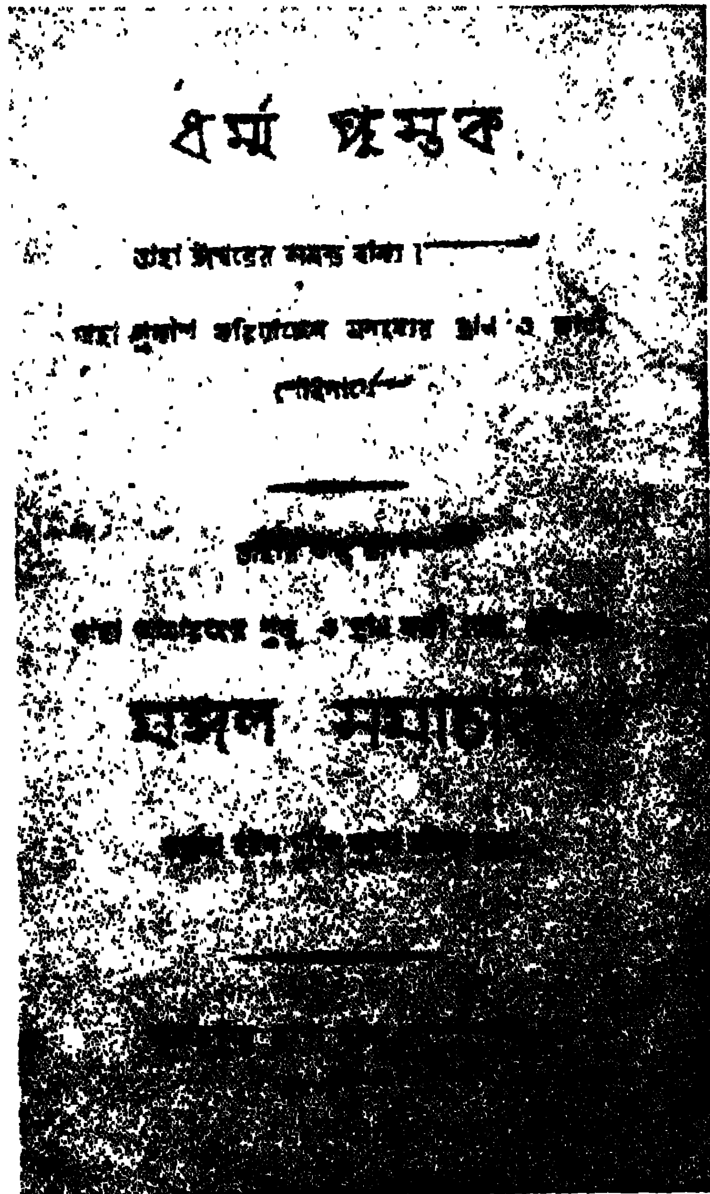
তাহার অন্তভাগ

তাহা আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যেশু খ্রীষ্টের

মঙ্গল সমাচার

তর্জ্জমা হইল গ্রীক ভাষা হইতে

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল—১৮০১


ধর্ম্ম পুস্তক

ধর্ম্ম পুস্তকের আখ্যাপত্র

রামরাম বসু ও টমাস কর্ত্তৃক অনুদিত এবং কেরী সাহেব কর্ত্তৃক সংশোধিত "মঙ্গল সমাচার মতিয়ের রচিত" (মেথু লিখিত সুসমাচার নহে) ও ধর্ম্মপুস্তক এক বলিয়া শ্রীযুত নিরঞ্জন কুমার ঘোষ লিখিয়াছেন কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কেরীর পুস্তক খানি ডিমাই আটপেজি ১২৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এবং উহার একটি মাত্র কপি শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। উক্ত পুস্তকে এবং আলোচ্য ধর্ম্মপুস্তকে মূল বাইবেল হইতে কিরূপ বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছিল, তাহার একটি প্যারার নিদর্শন নিম্নে প্রদত্ত হইল :

16. Moreover when ye fast, be not, as the hypo-critics of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may appear into men to fast, verily I say unto you, they have their reward.

কেরীর পুস্তকের বঙ্গানুবাদ : —১৬—

অপর যখন তোমরা উপবাস কর তখন কপটীবর্গের মত বিষণ্ণ বদন হইও না কেননা তাহারা মনুষ্যেরদিগকে উপবাসী দেখাইবার কারণ আপনারদের মুখ বিকৃত করে সত্য আমি তোমারদিগকে কহি তাহারা আপনারদের প্রতিফল পাইয়াছে।

নবাবিষ্কৃত ধর্ম্মপুস্তকের বঙ্গানুবাদ :—১৬—

পূনর্ব্বার যখন তোমরা উপবাস কর তখন ক্লিষ্ট মুখ হইও না কাল্পনিকের মত এ কারণ তাহারা মুখ বিশ্রি করে উপবাসী দেখনের জন্য সত্য আমি বলি তোমারদিগকে তাহারা পায় আপনারদের ফলোদয়।

আলোচ্য ধর্ম্মপুস্তকখানি ডিমাই আটপেজী ৮০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এবং এবং ইহাতে নিউ টেষ্টমেণ্ট এবং ওল্ড টেষ্টমেণ্ট অর্থাৎ সম্পূর্ণ বাইবেলখানির বঙ্গানুবাদ আছে। কেরীর পুস্তকের এবং ধর্ম্ম- পুস্তকের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি আমার নিকট রহিয়াছে তাহাতে দেখা যাইবে যে, কেরীর পুস্তকে ইংরাজীতে পৃষ্ঠার নম্বর দেওয়া আছে ও পৃষ্ঠার শীর্ষে "মতিউ

ষষ্ঠ অধ্যায়" এবং ৯ হইতে প্যারার বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে। কিন্তু 'ধর্ম্ম-পুস্তকের' পৃষ্ঠার কোন ক্রমিক নম্বর নাই; পৃষ্ঠার শীর্ষে "৬ষ্ঠ পর্ব্ব মাতিউর রচিত" এবং ১৬ হইতে ২৪ প্যারার বঙ্গানুবাদ একটি পৃষ্ঠায় আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য দুইটি পৃষ্ঠার আলোকচিত্র প্রদত্ত হইল।

১৮০১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী টমাস-বসু-কেরী-ফাউণ্টেন অনুদিত এবং কেরী সাহেব কর্ত্তৃক সম্পাদিত সমগ্র নিউ টেষ্টামেণ্টের বঙ্গানুবাদ "ধর্ম্মপুস্তক" নামে প্রকাশিত হয়; পূর্ব্বোক্ত 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' নামক পুস্তক সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হয় কিন্তু উহার আখ্যাপত্রের সহিতও নবাবিষ্কৃত ধর্ম্মপুস্তকের আখ্যাপত্রের কোন মিল নাই। কেরী সাহেবের পুস্তকের আখ্যাপত্রটি নিম্নে প্রদত্ত হইল:

ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য বিশেষত যাহা মনুষ্যের ত্রাণ ও কার্য্যশোধনার্থে প্রকাশ করিয়াছেন / তাহাই ধর্ম্ম পুস্তক / তাহার অন্তভাগ তাহা আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা যিশুখৃষ্টের / মঙ্গল সমাচার গ্রীক ভাষা হইতে তর্জ্জমা হইল / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল / ১৮০১ /

কেরী সাহেবের পুস্তক সম্বন্ধে **The Christian Observer** নামক পত্রে, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহা হইতে দেখা যাইবে যে; ১২৫ পৃষ্ঠার এই পুস্তকখানি ছাপাইতে এগার মাস সময় লাগিয়াছিল; সুতরাং আট শত পৃষ্ঠার "ধর্ম্মপুস্তক" নামক বৃহৎ গ্রন্থ ছাপাইতে কত বৎসর যে লাগিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

"The New Treatment was brought through the press within eleven months, Carey having taken an impression of the first page, March the 18th, 1800, and the last page being printed February the 10th * 1801," (Page 454).

* বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লেখক সজনীবাবু এই পুস্তকের প্রকাশ কাল ৭ই ফেব্রুয়ারী বলিয়াছেন; কিন্তু উহা ১০ই ফেব্রুয়ারী হইবে।

দের কিং আবশ্যক আছে তাহা তোমারদের যাচনের
৯ পূর্ব্বে তোমারদের পিতা জানেন। অতএব তোমরা
এই মত প্রার্থনা করহ হে আমারদের স্বর্গস্থ পিতঃ
১০ তোমার নাম পুণ্য করিয়া মান্য থাওক। তোমার
রাজ্য আইসুক তোমার ইচ্ছা যে মত স্বর্গেতে সেই
১১ মত পৃথিবীতে পালিত হওক। আমারদের দিব
১২ সিক খাহার এই দিবসে দেও। ও যেমত আমরা
আপনারদের দায়ীরদিগকে ক্ষমা করিতেছি সেই
১৩ মত আমারদের দাওয়া সকল ক্ষমা করহ। এবং
আমারাদিগকে পরীক্ষায় লওয়াইও না কিন্তু মন্দ
হইতে রক্ষা করহ কেননা রাজত্ব ও পরাক্রম ও
১৪ গৌরব তোমার সদা সর্ব্বক্ষণে আমেন। অতএব
যদি তোমরা মনুষ্যেরদের অপরাধ ক্ষমা করহ তবে
তোমারদের স্বর্গীয় পিতা তোমারদিগকেও ক্ষমা
১৫ করিবেন। কিন্তু যদি তোমরা মনুষ্যেরদের অপরাধ
না ক্ষমহ তবে তোমারদের পিতা তোমারদের অপ
১৬ রাধও ক্ষমা করিবেন না। অপর যখন তোমরা
উপবাস কর তখন কপটীবর্গের মত বিষণ্ণ বদন হইও
না কেননা তাহারা মনুষ্যেরদিগকে উপবাসী দেখাই
বার কারণ আপনারদের মুখ বিকৃতি করে সত্য
আমি তোমারদিগকে কহি তাহারা আপনারদের
১৭ প্রতিফল পাইয়াছে। কিন্তু যখন তুমি উপবাস করহ
তখন আপন মস্তকে তৈলমর্দ্দন কর ও মুখপ্রক্ষালন
১৮ করহ। তাহাতে যেন তুমি মনুষ্যেরদের প্রতি উপবাসী

কেরী সম্পাদিত মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত পুস্তকের ১৯শ পৃষ্ঠার প্রতিলিপি (৯—১৮ প্যারা)

ঙ মথু পর্ব্ব মাত্তিওর রচিত

১৬ পুনর্ব্বার যখন তোমরা উপবাস কর তখন ছিষ্ট মধ
মুইও না কাল্পনিকের মত একারণ তাহারা মুখ বিশি
করে উপবাসি দেখানের জন্য সত্য আমি বলি
তোমারদিগিকে তাহারা পায় আপনারদের ফলোদয়।
১৭ কিন্তু যখন তুমি উপবাস কর তখন তোমার মস্তকে
১৮ তৈল মর্দ্দন কর এবং মুখ প্রক্ষালন কর ইহাতে তুমি
উপবাসি দেখা যাইবা না মনুষ্যেরদের দৃষ্টে কিন্তু
তোমার পিতার দৃষ্টে যিনি আছেন অপ্রকাশ স্থানে
এবং তোমার পিতা যিনি দেখেন অপ্রকাশে তিনি
ফলোদয় দিবেন তোমাকে প্রকাশ করিয়া
১৯ আপনারদের জন্য ধন সঞ্চয় করিও না পৃথিবীর উপর
যে স্থানে কীট ও কলঙ্ক খায় এবং যেখানে চোরে সিঁদ
২০ দিয়া চুরি করে। কিন্তু আপনারদের জন্য ধন সঞ্চয়
কর স্বর্গে যে স্থানে কীট ও কলঙ্ক না খায় এবং যে
২১ স্থানে চোরে সিঁদ দিয়া না লইয়া যায় একারণ যে স্থানে
২২ তোমারদের ধন সে স্থানে তোমারদের অন্তঃকরণ। চক্ষু
সরীরের প্রদীপ অতএব যদি তোমার চক্ষু জ্যোতি তবে
২৩ তোমার সকল সরীর পূর্ণ দীপ্তি হইবেক কিন্তু যদি
তোমার চক্ষু মন্দ তবে তোমার সকল সরীর পূর্ণ অন্ধকার
অতএব যদি সে দীপ্তি যাহা তোমার মধ্যে অন্ধকার
হয় তবে কি মত বড় সে অন্ধকার
২৪ কোন মনুষ্য দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না
একারণ এক জনকে ঘৃণা করিয়া আর এক জনকে প্রেম
করিবেক কিম্বা এক জনের অনুগত হইয়া তুচ্ছ করিবে
অন্য

"ধর্ম্ম পুস্তকের" একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি (১৬—২৪ প্যারা)

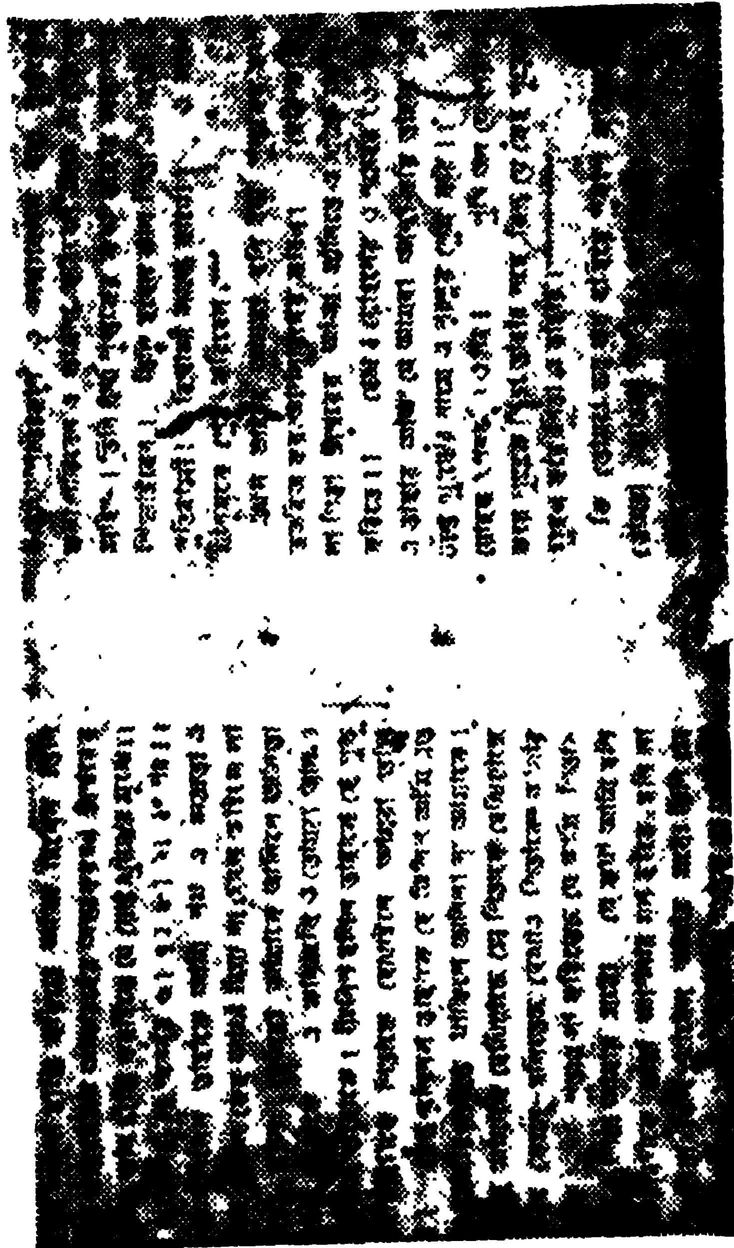
আলোচ্য পুস্তকখানি আবিষ্কৃত হওয়ায় ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী তারিখে কেরী সাহেব কর্ত্তৃক ব্যাপটীষ্ট মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেও যে শ্রীরামপুরে ছাপাখানা ছিল, তাহাই প্রমাণিত হয়। আর একটি প্রমাণ ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে জন মিলার কর্ত্তৃক "The Tutor বা সিক্ষাগুরু" শীর্ষক একখানি ওয়ার্ডবুক শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয় বলিয়া উল্লিখিত আছে। সুতরাং শ্রীরামপুরে পাদ্রীগণ আসিবার পূর্ব্বেও যে দিনেমার গভর্ণমেণ্টের বা বাঙ্গালীদের পরিচালনায় মুদ্রাযন্ত্র শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। নচেৎ শিক্ষাগুরু বা ধর্ম্মপুস্তক শ্রীরামপুর হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকশিত হইল কিরূপে ?

"ধর্মপুস্তক" ব্লটিং কাগজের ন্যায় পুরু কাগজে কাঠের অক্ষর দিয়া মুদ্রিত ও পত্র সংখ্যা আটশতের উপর। ওল্ড টেষ্টামেণ্টের ধারা অনুসারে পুস্তকখানির বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে এবং প্রথমে ম্যাথু, মার্ক, লুক, জন ও পরে করিনথিয়ানস্, গ্যালেসিয়ানস্, কলোসিয়ানস্, থেসালোনিয়ানস, টিমোথি টিটাস, ফিলেমন, পিটার ১ম ও ২য়, জন ১ম, ২য় ও ৩য়, জুড়া এবং জনের কাহিনী বর্ণিত আছে। পুস্তকখানির কোন ক্রমিক পত্র সংখ্যা নাই, নিম্নে পুস্তকখানির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিলাম।

"নিত্য নিত্য প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল ধর্মপুস্তকের কথা পড়িবেন ও কামনা করিবেন নিজ পরিজনের সহিৎ। তিনি ধর্ম্মপুস্তকের কথা তাহার সন্তানকে শিক্ষাইবেন। তিনি হবেন ভাল পিতা ও স্বামী ও প্রতিবাসী। বিশ্বাসী সমস্ত কার্য্যে। ও সকল মানুষকে প্রেম করিবেন।

"এখন ভাইর আমরা বলি ধর্ম্মপুস্তকের কথা তজবিজ কর আপনারদের কারণ। দেরী করিও না পিতা ঈশ্বরের আজ্ঞা মানিতে ও খ্রীষ্ট আশ্রয় করিতে॥ দেখ ১ যোহনের ৩ পর্বের ২৩ পদ। এ তাহার আজ্ঞা যে আমরা আস্থা করি তাহার পুত্র যেশু খৃষ্টের নামে ও পরস্পর প্রেম করি।

যোহন ২ পর্ব ২৩ পদ। প্রতি জন যে নৈরাস করে পুত্রকে গ্রহণ করে পিতাও তাহার।



ধর্মপুস্তকের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

"তোমরা কথনও পিতাকে ভয় করিও না। তোমরা কি করিবা, কোথায় পলাইবা খৃষ্ট আশ্রয় না করিয়া॥ ব্রাহ্মণ ও যজমানের মত

তোমরাও অনন্ত নরকে পড়িবা ॥ দেখ মার্ক ১৬ পর্বের ১৫।১৬ পদ ॥ খৃষ্ট বলিলেন তাহাদিগকে যাও সমস্ত জগত দিয়া এ মঙ্গল সমাচার ঢেড়ি দিও সকল লোকের শ্রবণে যে জন প্রত্যয় করিয়া তুবিং হয় সে ত্রাণ পাইবেক, কিন্তু যে আস্থা করে না সে আকল্প-নারকী হইবেক। ও প্রকাশিতের ২১ পর্বের ৮ পদ ॥ কিন্তু ভীরু ও অনাস্থিক ও ঘৃণিত কর্ত্তা ও কসবিবাজ ও গুণি ও প্রতিমাপূজক ও গন্ধক প্রজ্জলিত সমুদ্রে যাহা দ্বিতীয় মৃত্যু ॥"

আলোচ্য "ধর্ম্মপুস্তকে" কোন ব্যক্তির নাম মুদ্রিত নাই, কিন্তু শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হইল কেবল এই কথাই আখ্যা-পত্রে লিখিত আছে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেও যে, শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্র ছিল, ধর্ম্মপুস্তক তাহার জলন্ত নিদর্শন। ডিমাই সাইজের আটশত পৃষ্ঠার একখানি পুস্তক প্রকাশ করিতে অন্ততঃ যে দুই বৎসর সময় লাগিয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত। "প্রতাপাদিত্য চরিত্রে"র পূর্ব্বে "ধর্মপুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা কেরীর পরলোকগমনের পর "সমাচার দর্পণের নিম্নোক্ত সংবাদটি হইতেও প্রমাণিত হয় :

"১৮০০ সালের ১০ই জানুয়ারীতে ডাক্তার কেরী সাহেব শ্রীরামপুরে সমাগত হইয়া শ্রীযুত ডক্টর মার্সমন ও শ্রীযুত উয়ার্ড সাহেব ও তৎসময়ে আগত ইউরোপীয় অন্যান্য সাহেবদের সঙ্গে মিলিয়া যে মিসনারী সমাজ পরে শ্রীরামপুর মিশন নামে বিখ্যাত হইল তাহা স্থাপিত করিলেন। যে বৎসরে শ্রীরামপুরে আসিয়া ডাক্তর কেরী সাহেব বাস করিলেন, সেই বৎসরে ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ বঙ্গভাষাতে অনুদিত হইয়া প্রায় তাবদংশই মুদ্রাঙ্কিত হইল।"*

"ধর্ম্মপুস্তক" ১৮০০ খৃষ্টাব্দে 'মুদ্রাঙ্কিত' হইয়াছিল বলিয়া সমাচার দর্পণে দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং ইহাই বঙ্গের প্রথম গদ্য পুস্তক বলিয়া

* সমাচার দর্পণ, ১১ই জুন—১৮৩৪।

সিদ্ধান্ত করিতে হয়। যাঁহারা এই বিষয়ে অনুরাগী, তাহাদিগকে শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট উক্ত পুস্তকখানি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

ধর্ম্মপুস্তকখানির শেষে কালি দিয়া জনাই নিবাসী শ্রীচন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম এবং ৪ঠা ফাল্গুন ১২০৯ সাল এই কথা লিখিত আছে। ইহা ফণীন্দ্রবাবু বেগমপুরের এক তন্তুবায়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি দুষ্প্রাপ্য এবং যতদূর মনে হয়, কলিকাতার কোন গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থখানি নাই।

বাঙ্গালা ভাষায় ছেনি-কাটা হরফে স্যার চার্লস উইলকিন্স ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী শহরে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রণ-কায্য আরম্ভ করেন এবং **A Grammar of the Bengal Language** বঙ্গের প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গলা পুস্তক। ইহার পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজগণ গোয়া শহরে ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ ভাষায় রোমান অক্ষরে খৃষ্টবিষয়ক একখানি পুস্তক মুদ্রিত করেন; ইহাই ভারতের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। ইহার পূর্ব্বে কাষ্ঠের ব্লকের অক্ষর করিয়া যে ছাপিবার ব্যবহার ভারতবর্ষে ছিল, তাহার প্রমাণ ১২৮৪ সালের 'নব- বার্ষিকী' পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

"বহুকাল পূর্ব্বেও যে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র ছিল তাহার একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনকালীন তিনি দেখিতে পান যে বারাণসী জেলার একস্থলে মৃত্তিকার কিছু নীচে পশমের ন্যায় আশাল একরূপ পদার্থের একটি স্তর রহিয়াছে। মেজর রবেক ইহার সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হন এবং সে স্থান খনন করিয়া একটি খিলান দেখিতে পান। পরিশেষে খিলানের অভ্যন্তর দেশে প্রবেশ করিয়া দর্শন করেন যে তথায় একটি মুদ্রাযন্ত্র ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষর মুদ্রাঙ্কণের নিমিত্ত সাজান রহিয়াছে, মুদ্রাযন্ত্র ও অক্ষর পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত হয়, সে সকল একালের নয়, অন্যূন এক সহস্র বৎসর এই অবস্থায় রহিয়াছে।"*

* বাঙ্গালা গদ্যের প্রথম যুগ পৃঃ ৩১—৩২।

দ্বাদশ অধ্যায়

চন্দননগর *

ফরাসী চন্দননগরের বিশিষ্টতা ফুটিয়াছিল এখানকার শিল্প ও বাণিজ্যে,—কিন্তু ফরাসীদের সহিতই ইহার পরিচয়। ইংরাজী ১৪৯৫ অব্দে কবি বিপ্রদাস রচিত মনসা-মঙ্গলে ও কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতিতে বা প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত পাণ্ডব-দিগ্বিজয়-প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভৌগলিক গ্রন্থে, ইহার অন্তর্গত কোন কোন স্থানের উল্লেখ দৃষ্টে ইহার প্রাচীনতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইলেও, কতিপয় পল্লী একত্র করিয়া চন্দননগর নামের উৎপত্তি হইয়াছিল সম্ভবতঃ ফরাসীদের উপনিবেশ স্থাপনের পর।

গঙ্গা-বক্ষ হইতে ধনুরাকৃতি ধূর্জ্জটি-ললাটে চন্দ্রকলার ন্যায় সহরের আকৃতি থাকায় চন্দ্র হইতে চন্দ্রনগর এবং তাহা হইতে চন্দননগর, অথবা চন্দন কাষ্ঠের ব্যবসা বা প্রচুরতা হইতে চন্দননগর নামের উৎপত্তি হয়।† শেষোক্ত কারণ হওয়াও বিচিত্র নহে; কারণ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে এখানে চন্দন কাষ্ঠের কাজ ছিল, সে প্রমাণ পাওয়া যায়। ‡ চন্দননগর নামের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়, ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বরে এখানকার কর্ত্তৃপক্ষ মার্টিন্, দেলান্দ (Andre Boureau Deslande) এবং পেল্এ

---

* চন্দননগরের প্রসিদ্ধ জননায়ক ও সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ কর্ত্তৃক এই অধ্যায় লিখিত।

† প্রজাবন্ধু, ২৭ কার্ত্তিক, ১২৮৯ সাল ও Hooghly Past and Present.

‡ La Compagine des Indes Orientales.

(Palle) স্বাক্ষরিত তদানীন্তন প্যারিস্থ ডিরেক্টরকে লিখিত এক পত্রে।

ফরাসী কোম্পানীর প্রথম অধিনায়ক মঁসিয়ে দেলান্দ মোগল বাদসার নিকট হইতে ৪০,০০০৲ মুদ্রা বিনিময়ে ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরে কুঠি স্থাপন ও তথাকার মালিকত্ব লাভের অনুমতি প্রাপ্তির অনেককাল পূর্ব্বে দুপ্লেসি (Du Plessis) নামক এক ব্যক্তি ১৬৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে সহরের উত্তর প্রান্তে বোড় কিষণপুর নামক পল্লীতে প্রথম এক খণ্ড প্রায় ১০ আরপাঁ (arpents) পরিমিত জমি ৪০১৲ টাকা মূল্যে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। *

দেলান্দ এখানে কুঠি স্থাপনের পর এই নূতন উপনিবেশে কোম্পানীর কার্য্য-পরিসর দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। এই সময় কোম্পানী বলিতে ডিরেক্টর ১ জন, ৫ জন সভ্য লইয়া এক কাউন্সিল্, ব্যবসাদার ও দোকান-দার ১৫ জন, নতের ২ জন, পাদরি ২ জন, ডাক্তার ২ জন ও সূত্রধর ১ জন মাত্র ছিল; এবং পদাতিক ১০৩ জন, তন্মধ্যে ২০ জন ভারতীয়—ও ৩টি কামান ছিল। † চন্দননগরের সুপ্রসিদ্ধ আরলাঁ দুর্গ (Fort de Orleans) ১৬৯৬-৯৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। ইহা সহরের মধ্যস্থলেই ছিল এবং হুগলীর ওলন্দাজ দুর্গ ও কলিকাতার পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম্ দুর্গ অপেক্ষাও অধিকতর মজবুত ও জমকাল ছিল। ‡ কিন্তু উহার প্রসিদ্ধ ইহাতে নহে। আজ যে পরাক্রান্ত বৃটিশ জাতি জগতের মধ্যে অদ্বিতীয় জাতি, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ্চ এই দুর্গপাদমূলেই তাঁহাদের ভাগ্য

---

* ফ্রান্সের পূর্ব্বেকার জমির এক প্রকার মাপ; এক আরপাঁ প্রায় তিন বিঘার সমান।

† La Mission du Bengale Occidental, Vol. I,

‡ Hughly Past and Present ও Calcutta Past and Present.

পরীক্ষিত হইয়াছিল। ফরাসী গভর্ণর ডুপ্লে যে নীতি ধরিয়া এই চন্দননগরে বসিয়া এক দিন ভারতে সাম্রাজ্য-স্থাপনের কল্পনা করিয়াছিলেন,



পুরাতন চন্দননগর

সেই নীতি গ্রহণ করিয়াই আজ তাঁহারা ভারতের অধীশ্বর হইয়া পৃথিবীর সর্ব্ব প্রধান জাতি। ভাগ্যচক্রের গতি ভিন্নরূপ হইলে আজ ভারতেতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত।

ফরাসীদের প্রথম অভ্যুদয়ের পর ফ্রান্সের মূল কোম্পানীর অমনোযোগিতা ও এখানকার অর্থাভাবে কোম্পানীর অবস্থা খারাপ হইতে থাকে তৎপরে কিঞ্চিদধিক প্রায় সিকি শতাব্দী গত হইলে ইংরাজি ১৭৩১ অব্দে ডুপ্লের ডাইরেক্টররূপে এখানে আগমনের সহিত শিল্পে, বাণিজ্যে, সম্পদে, সম্ভ্রমে দশ বৎসরের মধ্যে যেন যাদুকরের ঐন্দ্রজালিক দণ্ডস্পর্শে এ স্থান নবীন শ্রী ধারণ করিয়া ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী অপর সকল পাশ্চাত্য জাতি সকলের ঈর্ষার কারণ হইয়া উঠে। এই সময় এখানকার সহিত সুরাট জেডো, বসোরা, তিব্বত, পারস্য এমন কি সুদূর চীন পর্য্যন্ত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। এক কথায় তখন সমস্ত বাঙ্গলার উপর এখানকার বাণিজ্য-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তখন এই উন্নতিশীল উপনিবেশটিকে বেশ সুরক্ষিত দেখিয়া এবং এখানে ব্যবসাদি কার্য্যের সুবিধা বিবেচনায় অন্যান্য স্থান হইতে বহু লোক এখানে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিল। তখন কলিকাতার শোভা-সম্পদ-বাণিজ্য সর্ব্ব বিষয়ই এ স্থানের তুলনায় হীন ছিল। এই সময় এখানে সুন্দর রাজবর্ত্ম বেষ্টিত ন্যূনাধিক দুই সহস্র ইষ্টক-নির্ম্মিত অট্টালিকা ছিল, ও এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা এক লক্ষ ছিল। *

ডুপ্লের সময় এবং তাঁহার অব্যবহিত পর পর্য্যন্ত এ স্থানের উন্নতি হইয়াছিল। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধের পর ইহা বৃটিশদের হস্তগত হয় এবং সেই সঙ্গে ফরাসী জাতির ভারতে প্রতিষ্ঠালাভের আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্তই চিরতরে বিলুপ্ত হয়। ক্লাইভের আদেশে দুর্গের তলদেশ পর্য্যন্ত তুলিয়া ফেলা হয় এবং সহরের প্রায় সমস্ত অট্টালিকা ধ্বংস করিয়া সহরের পূর্ব্ব শ্রী লুপ্ত করা হয়। ইংরাজী ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা ইংরাজদের অধিকারে থাকে। তৎপরে ইংলণ্ডের

* History of the French in India.

ইতিহাসের সুপ্রসিদ্ধ সাতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহা প্রত্যার্পিত হয়। এইরূপ আরও কয়েকবার ইংরাজ হস্তে পুনঃ ফরাসীদিগের হস্তে যাওয়ার পর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইহা শেষবার ফরাসীদিগের হস্তে আসিয়াছে। এবং সেই পর্য্যন্ত ইহা ফরাসীদিগের হাতেই আছে। ভাগীরথীতীরে যে সকল পাশ্চাত্য জাতি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, ইংরাজদের কথা ছাড়িয়া দিলে, এক্ষণে কেবল মাত্র ফরাসীরা ভিন্ন তাঁহাদের আর সকলেই চলিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বকালে এখানে অহিফেন, বস্ত্র, নীল, রেশম, চাউল, দড়ি, চিনি প্রভৃতির কাজ খুব বেশী ছিল। এখানকার সূক্ষ্ম বস্ত্র তখন ইউরোপে পর্য্যন্ত রপ্তানি হইত। চন্দননগরের গৌরবময় যুগে যে সকল শ্রীসম্পন্ন লোকের উদ্ভব হইয়াছিল, তন্মধ্যে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী প্রধান। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তৎকালে সম্ভ্রমে ও সম্পদে এ প্রদেশের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ লোক ছিলেন বলা যাইতে পারে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজারাম যশোহরের কোন স্থান হইতে তাঁহার বিধবা মাতার সহিত এখানে মাতুলালয়ে আগমন করেন। তিনি নিজ চেষ্টায় ফরাসী কোম্পানীর অধীনে সামান্য চাকরীতে প্রবেশ করিয়া শেষে প্রধান সহায় রূপে কোম্পানির বিশেষ প্রিয় হইয়াছিলেন; এবং কোম্পানির মাল খরিদ-বিক্রয় দ্বারা প্রভূত সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। রাজ সম্মানেও তিনি সম্মানিত হইয়াছিলেন এবং দুইটি সুবর্ণ পদক পাইয়াছিলেন। কথিত আছে, ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর বৎসর চন্দননগর অবোরোধের পর ইংরাজ সেনা কেবল তাঁহার আবাস লুণ্ঠন করিয়াই প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকার অলঙ্কার ও নগদ টাকা লইয়া যায়। * এই সময় ক্লাইভের গোলায় তাঁহার বিশাল বাসভবন চূর্ণ হইয়া যায়।

* ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—প্রবর্ত্তক, ফাল্গুন সন ১৩১৮ সাল।

ইহার পর হইতে চৌধুরী-বংশ একেবারে হতশ্রী হইয়া যায়। এখন তাঁহাদের সবই গিয়াছে ; আছে কেবল তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "চৌধুরী ঘাট" "নন্দদুলালের মন্দির" প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ মাত্র। কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কর্জ্জ করিবার জন্য সর্ব্বদা তাঁহার নিকট আসিতেন এবং কবি গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় চাকুরীর উমেদারীর জন্য আসিতেন।

উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্ব হইতে খলিসানীর বসু ও গোন্দলপাড়ার হালদার মহাশয়েরাই এখানকার মধ্যে ধনী জমিদার বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বসু মহাশয়দিগের পূর্ব্বপুরুষ করুণাময় বসু ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে তাম্রলিপ্ত হইতে আসিয়া প্রথমে বেলকুলি, পরে বেলকুলির নবাবের প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ হইয়া তাঁহার প্রদত্ত জমিতে খলিসানী গ্রামে বাস স্থাপন করেন। এই বংশ প্রাচীনতায় ও ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য এখানে বিশেষ খ্যাত। দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, পথ ঘাট প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্যের জন্য ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সাধারণের যথেষ্ট শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে বসু-বংশ অনেকটা হীনপ্রভ হইয়া যাইলেও যথারীতি দোল, দুর্গোৎসব ও পূর্ব্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺বিশালাক্ষী, নন্দনন্দন, বিষ্ণু গোপাল প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা হইয়া থাকে। হালদার মহাশয়ের আদি পরিচয় কিছুই জানিতে পারা যায় না।

এখানকার গ্রাম্য দেবতা শ্রীশ্রী৺বড়াইচণ্ডী ও শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী অতি প্রাচীন ও জাগ্রত। এখানকার অন্যান্য প্রাচীন বর্দ্ধিষ্ণু বংশের মধ্যে বারাশতের শ্রীমানী ও দে, বাগবাজারের সরকার, নেড়োরমনের চট্টোপাধ্যায় ও ঘোষ, পালপাড়ার পাল, বেড়োর পালিত, পাল, বসু ও কুণ্ডু প্রভৃতি এবং দেওয়ান রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়, দেবী সরকার, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মোল্লা হাজি, কাশীনাথ কুণ্ডু, রামকানাই সরকার, নবকৃষ্ণ দে দুর্গাচরণ রক্ষিত, শম্ভুচন্দ্র শেঠ, অদ্বৈত্যচরণ মণ্ডল প্রভৃতি ব্যক্তিদের নাম শুনা যায়।

পূর্ব্বকালে কবিওয়ালা, পাঁচালীওয়ালা, কথক, যাত্রাওয়ালা এখানে যত ছিল এত আর কোথাও ছিল না। সুপ্রসিদ্ধ রাম্বু, নৃসিংহ, আণ্টুনি ফিরিঙ্গী, গোরক্ষনাথ, নিত্যানন্দ বৈরাগী, নীলমণি পাটুনী, বলরাম কপালী প্রভৃতি কবিওয়ালা; চিন্তে মালা, নবীন গুঁই প্রভৃতি পাঁচালীওয়ালা; রঘুনাথ শিরোমণি, উদ্ধব চূড়ামণি, তমাল অধিকারী প্রভৃতি কথক এবং মদন মাষ্টার, বৌ মাষ্টার, মহেশ চক্রবর্ত্তী, ব্রজ অধিকারী প্রভৃতি যাত্রাওয়ালাগণ, এই স্থানেই বাস করিতেন। এই সহরে এতাবৎ যতগুলি শিল্পী, চিত্রকর, গায়ক, লেখক ও গ্রন্থকারের উদ্ভব হইয়াছে, অন্যত্র তাহা কুত্রাপি দেখা যায় না। বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম পুস্তকত্রয়ের অন্যতম "কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ" নামক গ্রন্থ চন্দননগরের পাদরি গের‍্যাঁ (J. F. M. Guerin M. A. S.) দ্বারা শ্রীরামপুর হইতে মুদ্রিত হইয়া এই স্থান হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

কবি ভারতচন্দ্র রায়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, ম্যাডাম্ গ্রাণ্ড, বর্ম্মার রাজকুমার মাইন্‌গুন্, ম্যাডাম্ ওয়াটস্, জাল প্রতারচাঁদ, জন্ বৃষ্টো (John Bristow), মহারাজ নন্দকুমার, বৈকুণ্ঠ মুন্সি, বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ ও দর্পনারায়ণ ঠাকুর প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এখানে বাস করিয়াছেন। বিশপ কুরি (Daniel Currie) হিবার (Reginald Heber), গ্রাঁপ্রে (L. De Grandpre), ষ্ট্রাভোরিনাস্ (Stravorinus), হ্যামিল্টন (Hamilton) প্রভৃতি পর্য্যটকগণও এ স্থানে আসিয়াছিলেন।

পুরাতন চন্দননগরের গৌরবময় স্মৃতিচিহ্ন এখন অতি অল্পই আছে। যাহা আছে তন্মধ্যে কোম্পানীর সময়ের গোরস্থান, সুবৃহৎ জলাশয় 'লালদীঘি', ১৭২০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত কনভেণ্ট সংলগ্ন গির্জ্জা, শ্রীশ্রীনন্দদুলাল মন্দির, শ্রীশ্রীদশভুজা দেবীর মন্দির, তায়ৎখানা বাগানের ডাচ নির্ম্মিত ভজনাগারের ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানকার ফরাসী

জাতীয় উৎসব ফ্যাস্তা (Fete National), যাত্নঘোষের রথ ও বারো-য়ারীর সুপ্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীজগধাত্রী পূজাও বহু দিনের। ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার দিনটি স্মরণীয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই ফ্যাস্তার উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

পল্লীপরিচয়

সমস্ত সহরটি বহু পল্লীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে গোন্দলপাড়া, বারাষত, দিনেমারডাঙ্গা, হাটখোলা, হাজিনগর মানকুণ্ডা, দিগলসপটী, বড়বাজার, বাগবাজার, লালবাগান, উড়েপাড়া, হালদারপাড়া, ভাঁকুণ্ডা, খলসানি, কলুপুকুর, নাড়ুয়া, পালপাড়া, বোড়, সরিষাপাড়া, গোস্বামীঘাট, কাবারিপাড়া, বক্সীর বেড়, চাঁপাতলা, বোড়াই চণ্ডীতলা, হরিদ্রাডাঙ্গা, সুরের পুকুর, কাঁটাপুকুর প্রভৃতিই প্রধান। অন্যান্য বহরের পল্লী সকলের নাম যেমন দেব-দেবী, ব্যক্তি, জাতি, বৃক্ষ, জলাশয় বা ঘটনাবিশেষের নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এখানেও সেইরূপে অনেক-গুলি পল্লীর নাম হইয়াছে, গোন্দলপাড়া, খলিসানী ও বোর্ড নামক স্থানগুলি অতি পুরাতন। গোন্দলপাড়া নবাব খান্‌জা খাঁর নিজস্ব সম্পত্তি ছিল, দিনেমাররা উহা ছাড়িয়া দিবার পর ফরাসীরা ইজারা লয়।*

দিনেমারডাঙ্গা নাম—দিনেমাবদের শ্রীরামপুর যাইবার পূর্ব্বে প্রথম ঐ স্থানে বসবাস ও কুঠীস্থাপনা হইতে। মানকুণ্ডা,—রাজা মানসিংহের উড়িষ্যা যাত্রাকালে এই স্থানে আগমন হইতে। মানসিংহের স্মৃতি-বিজড়িত একটি পুষ্করিণীর সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তি শুনা যায়। দিগলেসপটী তুপ্লেক্সের নাম হইত। লালবাগান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর পুত্র লালমোহনের নাম হইতে। † পালপাড়া, গোস্বামীঘাট, কাবারিপাড়া, বক্সীর বেড় কুতুঘাট প্রভৃতি পাল, গোস্বামী, কাবারি, বক্সী প্রভৃতি হইতে নামের

* Hughly past and present.

† ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবর্ত্তক, ফাল্গুন ১৩২৮।



ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রতীক

উৎপত্তি। বেহারা বা উড়েপাড়া নামটি ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর উড়িষ্যা হইতে আনীত পাল্কীর বেহারাদের বাসস্থান হইতে।

সেইরূপ রথের সড়ক নামোৎপত্তি ইন্দ্রনারায়ণের রথ হইতে হইয়াছে। পঞ্চাননতলা, ষষ্ঠিতলা, বোড়াইচণ্ডী তলা, কালীতলা, বিশালক্ষীতলা, সনাতনতলা প্রভৃতি স্থানগুলি ঐ সকল নামীয় দেবদেবীর নাম হইত। চাঁপাতলা, বাদামতলা, শাউলিবটতলা, খেজুরতলা প্রভৃতি গাছের নাম হইতে। সুরের পুকুর, বেণেপুকুর, পদ্মপুকুর, কলুপুকুর, বিদ্যালঙ্কার পুকুর ও মুন্সীপুকুর প্রভৃতি স্থানগুলি এবং ঐপার্ক, মেরি, পুলিস আফিস বড় বড় হোটেল প্রভৃতি প্রায় সমস্তই এই স্থানে। পূর্ব্বকালেও এই স্থানে বহু অট্টালিকা প্রভৃতির দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল। যে সময়ের কথা বলিতেছি, ঠিক তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে চন্দননগরের অবস্থা ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল, এ কথাও এক জন লেখিকা বলিয়াছেন।

এখানে কয়েকটি বেশ প্রশস্ত এবং সোজা বড় রাস্তা আছে। সুপ্রসিদ্ধ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড এই সহরের ভিতর দিয়া গিয়াছে। সমস্ত সহরটিতে পাকা পথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০ মাইল এবং কাঁচা পথ মোট ১০ মাইল। ১৭৫১—৫২ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে দেখা যায়, তখন পাকা পথ প্রায় ১০ মাইল এবং কাঁচা পথ প্রায় ১½ মাইল মাত্র ছিল।

এখানকার বিশেষত্বের কথা বলিতে হইলে পুষ্করিণীর আধিক্যের কথা উল্লেখ করিতেই হয়। পূর্ব্বোক্ত মানচিত্র হইতে গণনায় মোট প্রায় ১ হাজার ৪শত ৫০ জলাশয় পাওয়া যায়। বোধ হয়, এত অধিকসংখ্যক পুষ্করিণী এ প্রদেশে এই পরিমাণ স্থানের মধ্যে অন্যত্র নাই। দেবমন্দির ও ভাগীরথীরতীরে ঘাটের সংখ্যাও অধিক। ছোট বড় মন্দিরের

* A Journal from the year 1811 till the year 1825 by Maria Lady Nugent.

† সীমা নির্দ্ধারণ জন্য প্রস্তুত মাপ, ১৭৫১-৫২।

সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ১ শতের কম নহে এবং বাঁধাঘাটের সংখ্যা মোট ২৯টি।* গৃহাদির সংখ্যা যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা দেখা যায়, কিন্তু পুষ্করিণীর সংখ্যা আর বৃদ্ধি পাইতেছে না, বরং কিছু কমিয়াই থাকিবে।

কতিপয় ব্যবসার জন্য চন্দননগরের এখনও খ্যাতি আছে। সে সম্বন্ধে পরে বলা হইবে। দেশী মদ, গুলীর আড্ডা, তুরংও কতকটা বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে এ স্থান যাত্রা, কবি পাঁচালীর জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ১৪ই জুলাইয়ের জাতীয় উৎসব ফ্যান্তা (Fete Natonal) স্বর্গীয় যাদবেন্দু ঘোষ প্রতিষ্ঠিত "যাদু ঘোষের রথ," ৺রাজেন্দ্রনাথ গোস্বামী (গাঙ্গুলী) প্রতিষ্ঠিত খুস্তির মহোৎসব নামক মেলা এবং সর্ব্বোপরি শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজার ধুম এখানকার বিখ্যাত বাৎসরিক উৎসবরূপে উল্লিখিত হইতে পারে। যাদু ঘোষের উপর জগন্নাথদেবের স্বপ্নাদেশ হওয়ায় এই রথ প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া একটা কিংবদন্তী আছে। এখানে যেরূপ বৃহদায়তনেব সুন্দর জগদ্ধাত্রী প্রতিমা গঠিত হইয়া মহাসমারোহে ৩দিন পূজা হইয়া বিসর্জ্জন হইয়া থাকে, তাহা কুত্রাপি দেখা যায় না। উপস্থিত এরূপ ঠাকুর বহু পুরাতন। চাউল-ব্যবসায়ীদেব দ্বারা উহা প্রতিষ্ঠিত হইলেও, প্রথম প্রতিষ্ঠাতা কে এবং কোন্ সময় হইতে এই পূজা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা ঠিক জানা যায় না। শুনা যায়, কাপড়েপটীর ঠাকুরের প্রতিষ্ঠাতার নাম শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি একজন বস্ত্র-ব্যবসায়ী ছিলেন। প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি চাঁদা সংগ্রহ করিয়া প্রথম এই পূজা আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে সহরের উত্তরাংশে গোয়ালপাড়া ও ডাঁশ-পুকুর নামক স্থানে আর দুইখানি বড় বড় ঠাকুর হইত। এখানে কার্ত্তিক ও সরস্বতী পূজায়ও যথেষ্ট ধুম আছে। তদ্ভিন্ন চড়ক, পাটভাঙ্গা, স্নানযাত্রা

---

* সার্ভে মানচিত্র ১৮৭০—৭১।



প্রাচীনকালে চন্দননগরের একদল সিপাহী

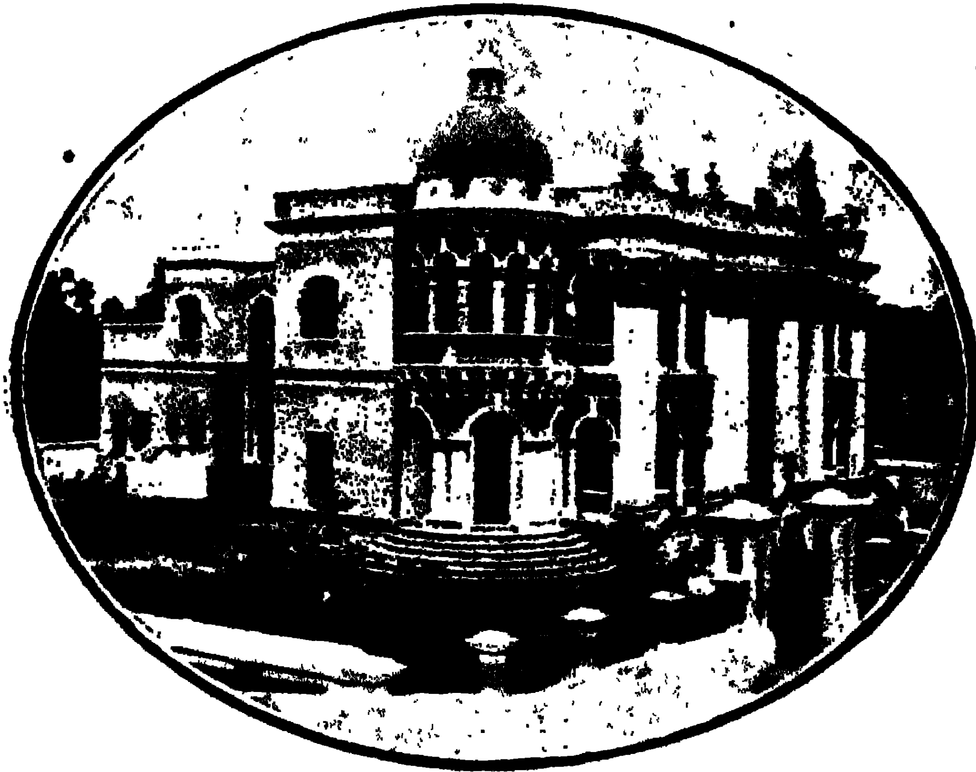
দ্বাদশ গোপাল, ঝাঁপান প্রভৃতিতেও পূর্ব্বে বেশ লোক-সমাগম হইত, এখন পর পর কমিয়াই যাইতেছে। ভাল আম্রের জন্যও চন্দননগরের একটু প্রসিদ্ধি আছে। সুপ্রসিদ্ধ 'বিশ্বনাথ চাটুয্যে' নামক আম্রের উৎপত্তি এই স্থানেই এবং 'হিমসাগর' নামক অত্যুৎকৃষ্ট আমের আদিস্থান গরুটির বাগান বলিয়া শুনা যায়।

চন্দননগরের অবস্থা সম্বন্ধে যত দূর বুঝিতে পারা যায়, বর্ত্তমানে এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী স্থান-সমূহের তুলনায় অনেক বেশী হইলেও ইহার উন্নতি যুগের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। সহরের সৌন্দর্য্য ও পরিচ্ছন্নতা অনেক অংশেই এক্ষণে পর পর বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু অন্য দিকে কতকগুলি স্থান ক্রমশঃ লোকশূন্য হইয়া জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইতেছে। শত বৎসর পূর্ব্বে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে, যখন বিশ্‌প হিবার (Bishop Heber) এই স্থান দর্শন করেন, তখন ইহাকে জনবিরল, কর্ম্মবিরল, নিস্তব্ধ, নিভৃত স্থান বলিয়া গিয়াছেন।* বৃটিশ সংঘর্ষে উহার পতনের পর হইতেই ক্রমে এই দশা প্রাপ্ত হয়। উহার অদূর ভবিষ্যৎ হইতেই চন্দননগর পুনরায় ধীরে ধীরে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে থাকে। উহার প্রাচীনকালের প্রনষ্ট গৌরব ফিরিয়া পাইতে এখনও অনেকটা বাকী থাকিলেও, বহুদিন হইতেই নগর ভাগীরথী তীরবর্ত্তী অন্যান্য নগর-সমূহের তুলনায় শোভা, সৌন্দর্য্য ও সুবিধায় উন্নত।

প্রজাতন্ত্র চন্দননগরে প্রজার অধিকার, রাজ্যপরিচালনা-পদ্ধতি, বিচার শাসন প্রভৃতি বৃটিশ ভারতের লোকের কৌতূহল উদ্দীপিত করিয়া থাকে এখানে যাতায়াতের জন্য রেল, নৌকা ও স্থলযানাদিই প্রধান। কিছু দিন হইতে ষ্টীমারের ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার নিকট

* Heber's Journey through the Upper Provinces of India.

যাতায়াতের স্থবিধা, বাৎসরিক রাজস্ব পাইয়া থাকেন। খোদ ফরাসী গবর্ণমেণ্টও বৃটিশ গবমেণ্টকে বাৎসরিক কিছু খাজনা দিয়া থাকেন। এই খাজনা কিসের জন্য দিতে হয়, তাহা ঠিক মত জানিতে পারা যায় না। দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এক সময় চন্দননগরের সমস্ত জমী ইজারা লইবার কালে গবর্ণমেণ্টের সহিত যে সব সর্ত্ত নির্দ্ধারিত হয়, তন্মধ্যে একটি সর্ত্ত ছিল, মোগল সম্রাটকে যে রাজস্ব দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা ইজারাদারদের দেওয়ানী প্রাপ্তির সহিত পুরাতন স্বত্বে স্বত্ববান্ হইয়া, তাঁহারা



নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির ও চন্দননগর পুস্তকাগার

এই রাজস্ব প্রাপ্তির অধিকারী হইয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। যে ৬০ বিঘার কথা উল্লিখিত হইল, উহাই সম্ভবতঃ সেই ৬০ বিঘা,—যাহা জলের কল, বৈদ্যুতিক আলো, বাসের স্বল্প ব্যয় সাধারণতঃ সকল দ্রব্যই পাওয়া যায় ও অন্যান্য বিবিধ স্থবিধা হেতু এখানে সময় সময় বহু লোক আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। শত বৎসর পূর্ব্বেও এখানে বাসের

খরচ ও দ্রব্যাদির মূল্য খুবই কম ছিল। তখন এক জন বিশিষ্ট ক্রিয়াবান্ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের মাসিক সংসার-খরচ দেড় শত টাকায় সুনির্ব্বাহ হইত * একজন সাহেবের মদ ছাড়া থাকিবার ও খাইবার খরচ মাসে ৩৫৲ টাকাতেই হইত জানা যায়।†

ফরাসীদের চন্দননগরের প্রকৃত রাজস্বত্ব সম্বন্ধে শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ২ হাজার ৩ শত ৭৭ একারের মধ্যে প্রায় ৬০বিঘা মাত্র জমী ফরাসীদের কতকটা নিজস্ব বলিতে পারা যায়। অবশিষ্টের জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বাৎসরিক রাজস্ব পাইয়া থাকেন ঔরঙ্গজেবের নিকট হইতে কুঠীস্থাপনের জন্য ফরাসীরা প্রথম জমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার ভিতরেই ফরাসীরা তখন দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন, বাকী তালুকদারী জমি ছিল। সে সময় বোড় বিশনপুর, চক নসিরাবাদ, সাবিনাড়া এই কয়টি মহল লইয়া সেই তালুকদারী। কেহ কেহ বলেন, ফরাসীদের ঠিক নিজস্ব বলিতে মাত্র ৭ বিঘা। ‡ যাহা হউক, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত লেখালেখি করিয়া সমস্ত সহরটির শাসনাধিকার এক্ষণে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের হস্তেই ন্যস্ত আছে। এক্ষণে উভয় সরকারের মধ্যে সদ্ভাব ও বন্ধুত্বের কোন অভাব পরিলক্ষিত হয় না। উভয়েই উভয়ের শাসনকার্য্যে যে সহায়তা করা সম্ভব, তাহা করিয়া থাকেন।

এখানে এখন গভর্ণমেণ্টের মোট আয় প্রায় সওয়া ৫ লক্ষ টাকা। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ৫ লক্ষ ২২ হাজার ৭ শত ৪৮, উহার পূর্ব্ব বৎসর ছিল ৪ লক্ষ ৭৩ হাজার ৯৫ টাকা। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ৩২ হাজার ১ শত ৫৪ টাকা রাজস্ব পাওয়া যাইত জানা যায়। § ১৭৩২।৩৩ খৃষ্টাব্দে সমস্ত

* একখানি পুরাতন দলিল—শ্রীহরিহর শেঠ। প্রদীপ, ভাদ্র ১৩১১।

† The good old days of Honourable John Company.

‡ Chandernagore—The Calcutta Review 1918.

§ A Gazetteer of the world.

চন্দননগর ইজারা দিয়া বৎসরে প্রায় ১২ হাজার টাকা আয় হইত। * এখানে কার্য্যক্ষম ব্যক্তির বৎসরে ৮ আনা হেড ট্যাক্স ভিন্ন আয়কর, বাড়ীর কর প্রভৃতি অন্য কোন কর দিতে হয় না। এমন কি,পার্শ্ববর্ত্তী বৃটিশ মিউনিসিপ্যাল নগর সমূহে আলো, জল, পথ প্রভৃতির যে ট্যাক্স আছে, এখানে ঐ সকল সুবিধা থাকিতেও কোন ট্যাক্স নাই। তাহা সত্বেও এখানে মিউনিসিপ্যালিটীর আয় কম নহে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে মিউনিসিপ্যাল আয় ৯৪ হাজার ৬ শত ৪৮ টাকা, পূর্ব্ববৎসর ছিল ৮২ হাজার ৯ শত ৬২ টাকা। এই আয়ের মধ্যে বাজার, খেয়াঘাট, কসাইখানা, জমীর জমা, বাড়ীর ভাড়া, আমদানী মালের উপর খাজনা প্রভৃতিই প্রায় ৬৫—৭০ হাজার টাকা। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে ৬৮ হাজার ১ শত ৭ ফ্রাঙ্ক মিউনিসিপ্যালিটীর আয় ছিল। *

সরকারী আয়ের প্রধান অংশ আবগারী বিভাগ হইতে পাওয়া যায়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের যে যে বিষয়ে যে আয় হইয়াছিল, তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইতেছে।

বিভিন্ন রাজস্ব	২৩৯০৬৲
আবগারী ও অন্যান্য	৪৩৯৮৫৫৲
রেজেষ্টারী ফি	৪১৭৲
জল কলের ট্যাক্স	১১০৫৭৲
ইংরাজ গভর্মেণ্টের নিকট আফিং ও লবণের দরুণ পাওয়া	২৮৪০৮৲
বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেতন	১১৩৯২৲
মিউনিসিপ্যালিটীর দেয়	৭৬৫৭৲
অন্যান্য	৬৯৲
	৫২২৭৫২৲

* ফরাসী কোম্পানীর সহিত ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর ইজারা সংক্রান্ত দলীলে ইহা পাওয়া যায়।

* প্রজাবন্ধু—২৩শে ফাল্গুন ১২৮৯ সাল।

চন্দননগরের সমস্ত আয় যদি এই স্থানে ব্যয় হইত, তাহা হইলে এখানকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সৌন্দর্য্য আরও বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাইতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় না। ১৯২১, ২২ ও ২৩ খৃষ্টাব্দে২লক্ষ ৯ হাজার ৭ শত ৫৯৲, ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৫শত ৭৭৲ ও ২লক্ষ ১শত ৩৫৲ টাকা



যোগীন্দ্রনাথ সেন—ইনি প্রথম বাঙ্গালী প্রথম মহাযুদ্ধে প্রাণ দান করেন।

যথাক্রমে এখানে মোট ব্যয় হইয়াছে। এখানকার অবশিষ্ট আয়ের টাকা ফরাসী ভারতের অন্যান্য নগরীতে ব্যয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বেও চন্দন

নগরের আয় হইতে অন্য উপনিবেশে ব্যয় হইত। ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে এখানকার আয় ছিল ১লক্ষ ৯৮হাজার ৪শত ৫ ফ্রাঙ্ক, ব্যয় ১৪ হাজার ১১ ফ্রাঙ্ক। *

ভারতের অন্য তিনটি ফরাসী অধিকৃত উপনিবেশের ন্যায় চন্দননগর পণ্ডীচেরীর অধীন। সমগ্র ফরাসী ভারতের গভর্ণর এক জন মাত্র। তিনি প্রধান নগরী পণ্ডীচেরিতে থাকেন, কখনও কখনও উপনিবেশ সকল পরিদর্শনার্থ গমন করিয়া থাকেন। গভর্ণরের অধিনে প্রত্যেক উপনিবেশে এক একজন এডমিনিষ্ট্রেটর আছেন। এখানে আদালত ও হাকিম থাকিলেও সেসন মোকর্দ্দমার জন্য পণ্ডীচেরী হইতে স্বতন্ত্র বিচারক আসিয়া থাকেন। আপিলের জন্য পণ্ডিচেরীতে উচ্চ আদালত আছে। কালেক্টরি, শিক্ষাবিভাগ, পূর্ত্তবিভাগ প্রভৃতি সমস্তই পণ্ডিচেরীর উক্ত বিভাগের অধীন। সমস্ত বিষয় পরিদর্শনের জন্য প্রতি বৎসর ফ্রান্স হইতে এখানে এক জন ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া থাকেন। কলিকাতায় যে ফরাসী কঁন্সুল থাকেন, চন্দননগরের শাসন বিষয়ে তাঁহার সহিত কোন সম্পর্ক নাই।

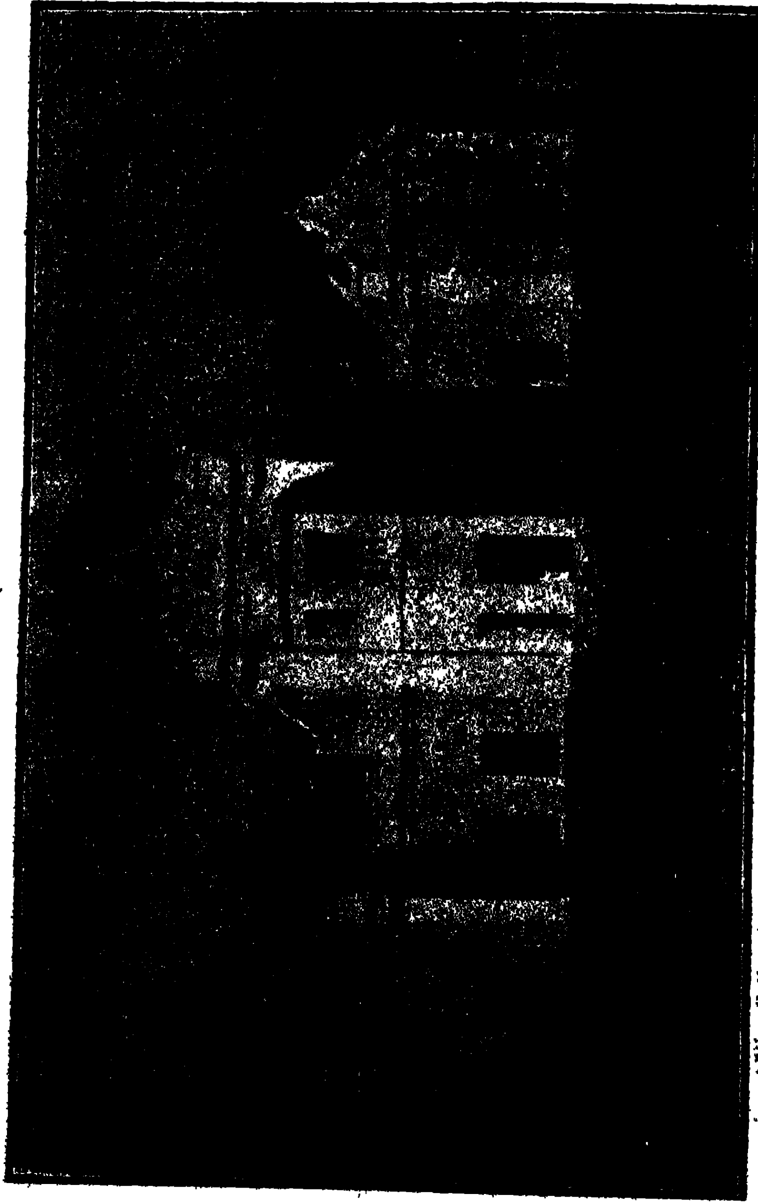
সহরের শান্তিরক্ষার সহায়তাকল্পে গবর্মেণ্ট এখানে পূর্ব্বে এক দল সিপাহী রাখিতেন, এখন কতকগুলি পুলিসের কনেষ্টবল ভিন্ন আর কিছু থাকে না। ইহাদের সংখ্যাও অধিক নহে। এক্ষণে মোট প্রায় ৫০ জন মাত্র হইবে। প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বেও এখানে কতকগুলি সিপাহী থাকিতে দেখিয়াছি। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই পণ্ডিচেরী বা ঐ দিকের লোক। ১৭৪৩—৪৫ খৃষ্টাব্দে এখানে দুই দল পদাতিক সৈন্য ছিল জানা যায়। † সন্ধির সর্ত্তানুসারে এক্ষণে ১৫টির অধিক সৈন্য রাখিবার চন্দননগরে উপায় নাই। ‡

* প্রজাবন্ধু ২৭শে ফাল্গুন, ১২৯৮ সাল

† La. Compagnie Faancaise des Indes.

‡ L, Indes des Rajas par Louis Rousselet. (1604-1875)

এখানকার আইন স্বতন্ত্র নহে, সমস্ত উপনিবেশের জন্য আইন একই এবং উহা প্রধানতঃ ফ্রান্সেরই মিনিষ্টার অব দি এ্যান্তিরিয়ার দ্বারা প্রণয়ন হইয়া থাকে। ফ্রান্সের দেপুতে ও সেনেতার সভায় ফরাসী ভারতের নাগরিক ও উহাদের প্রতিনিধি দ্বারা নির্ব্বাচিত এক জন করিয়া প্রতিনিধি



প্রবর্ত্তক সেবাশ্রম।

থাকেন। এ পর্য্যন্ত কোন ভারতবাসী সে পদে স্থান না পাইলেও, চন্দননগরের নাগরিকদেরও সেই পদে নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার আছে।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ১লা আগষ্ট এখানে মিউনিসিপ্যালিটির সৃষ্টি হয়। প্রথম মেয়র হন চর্লেস ডুমেন (C. Doumaine)।

বৃটিশ ভারতের রেজেষ্টারের ন্যায় এখানে 'নতের' বলিয়া একটি পদ আছে। ইহার দ্বারা উইল খরিদ-বিক্রয়, দেনা-পাওনা প্রভৃতি সকল প্রকার লেখাপড়া হইয়া থাকে।

এখানে এখন মোট ৮টি থানা আছে। এক জন পুলিশ কমিশনার ও তদধীনে ১জন কোতোয়াল এখানকার প্রধান পুলিস কর্ম্মচারী। সকল বিভাগেই কর্ম্মচারীদের মধ্যে অধুনা কয়েক বৎসর হইতে সাহেবের পরিবর্ত্তে পণ্ডিচেরীর লোকই অধিক দেখা যায়। তাঁহারা অবশ্য ভারতবাসী, সে হিসাবে আমাদের এখানে কতকটা স্বরাজ পাওয়া গিয়াছে বলিতে পারা যাইলেও, এখানকার সাধারণ অধিবাসীগণ পণ্ডিচেরীর লোকদের এতাধিক প্রভুত্ব আদৌ ভালবাসেন না।

এখানে বিচারে প্রাণদণ্ডের আদেশ খুব কমই হয়। প্রাণদণ্ডের জন্য গিলোটিন নামক এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহার দ্বারা শিরচ্ছেদন করা হয়। পূর্ব্বে প্রাণদণ্ডের আদেশপ্রাপ্ত অপরাধীকে রি-ইউনিয়নে লইয়া যাওয়া হইত। গিলোটিন যন্ত্র ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুলাই শেষবার এখানে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এখানে সেখ আবদুল পাঁজারি ও হীরু বাগ্‌দী নামক দুই ব্যক্তির ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী প্রথম প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। * পূর্ব্বে যে তুরুণ্ডের কথা উল্লেখ হইয়াছে, জেলখানার বা কোন মাতাল বা ধৃত অপরাধীকে আটকাইয়া রাখিবার জন্য উহা ব্যবহৃত হয়। উহা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত এক প্রকার যন্ত্রবিশেষ, উহার মধ্যে ছিদ্র আছে, তাহাতে অপরাধীর পদদ্বয় ঢুকাইয়া দেওয়া হয়।

যত দূর জানিতে পারা যায়, এক শত বৎসর পূর্ব্বে এখানে শিকার

---

* প্রজাবন্ধু, ১৬ই ফাল্গুন ১২৮৯ সাল

ব্যবস্থা প্রধানতঃ স্থানীয় গুরুমহাশয়দের পাঠশালাতেই নিবদ্ধ ছিল এবং সেরূপ পাঠশালার অভাবও ছিল না। তৎপরে ক্রমে যুরোপীয় পাদ্রী মিশনারীরা এখানে শিক্ষাবিস্তার মানসে চেষ্টা করেন ও দুই একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়ও তাঁহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল বিদ্যালয়েও প্রথম একমাত্র বাঙ্গলাই শিক্ষার বিষয় ছিল। পরে ক্রমে ফরাসী ভাষা শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়।

বর্ত্তমান কনভেন্টের দক্ষিণে—যে স্থানে এক্ষণে স্বর্গীয় ছক্কনলাল সিংহ রায় মহাশয়ের বাটী আছে, শুনা যায় ঐ স্থানে বাঙ্গালীর ছেলেদের জন্য মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত একটি ছোট বিদ্যালয় ছিল। লালদিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে যে বিদ্যালয়ের কথা জানা যায়, উহা সম্ভবতঃ এক শত বৎসর পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল। ঐ স্থানে অবৈতনিক ভাবে বাঙ্গালা ও ফরাসী পড়ান হইত। পিরু সাহেব নামক ঐ বিদ্যালয়ের এক জন শিক্ষকের নাম পাওয়া যায়। বর্ত্তমান ডুপ্লে কলেজ—যাহার প্রথম নাম ছিল সেণ্ট মেরিস ইনষ্টিটিউশন, উহাও মিশনারীদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যূন নব্বুই বৎসর পূর্ব্বে ফাদার বার্থের দ্বারা স্থাপিত হয়। প্রথম বর্ত্তমান রু জেনারেল মারত্যাঁ যাহার পূর্ব্বে রুদে বড়বাজার নাম ছিল, ঐ রাস্তার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত ছিল। কেহ কেহ বলেন, লালদিঘীর কোনের বিদ্যালয়টিই ঐ স্থানে উঠিয়া আসিয়াছিল। ডুপ্লে কলেজ নামক বিদ্যালয় এক্ষণে গবর্মেণ্টের অধীন। ইহাতে একটি ফরাসী বিভাগ আছে, তাহা সম্পূর্ণ অবৈতনিক। প্রথমাবস্থায় বিদ্যালয়টির উন্নতির জন্য লটারী করা হইয়াছিল। ইহার উন্নতি-প্রসঙ্গে ফাদার বার্থে ও ফাদার আলফন্সোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় লোকের মধ্যে নন্দদুলাল বসু ইহার উন্নতিকল্পে সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। *

* 'সারস্বত সম্মিলনী' সভায় পঠিত স্বর্গীয় নন্দলাল বসু মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী। ১৩১৩ সাল।

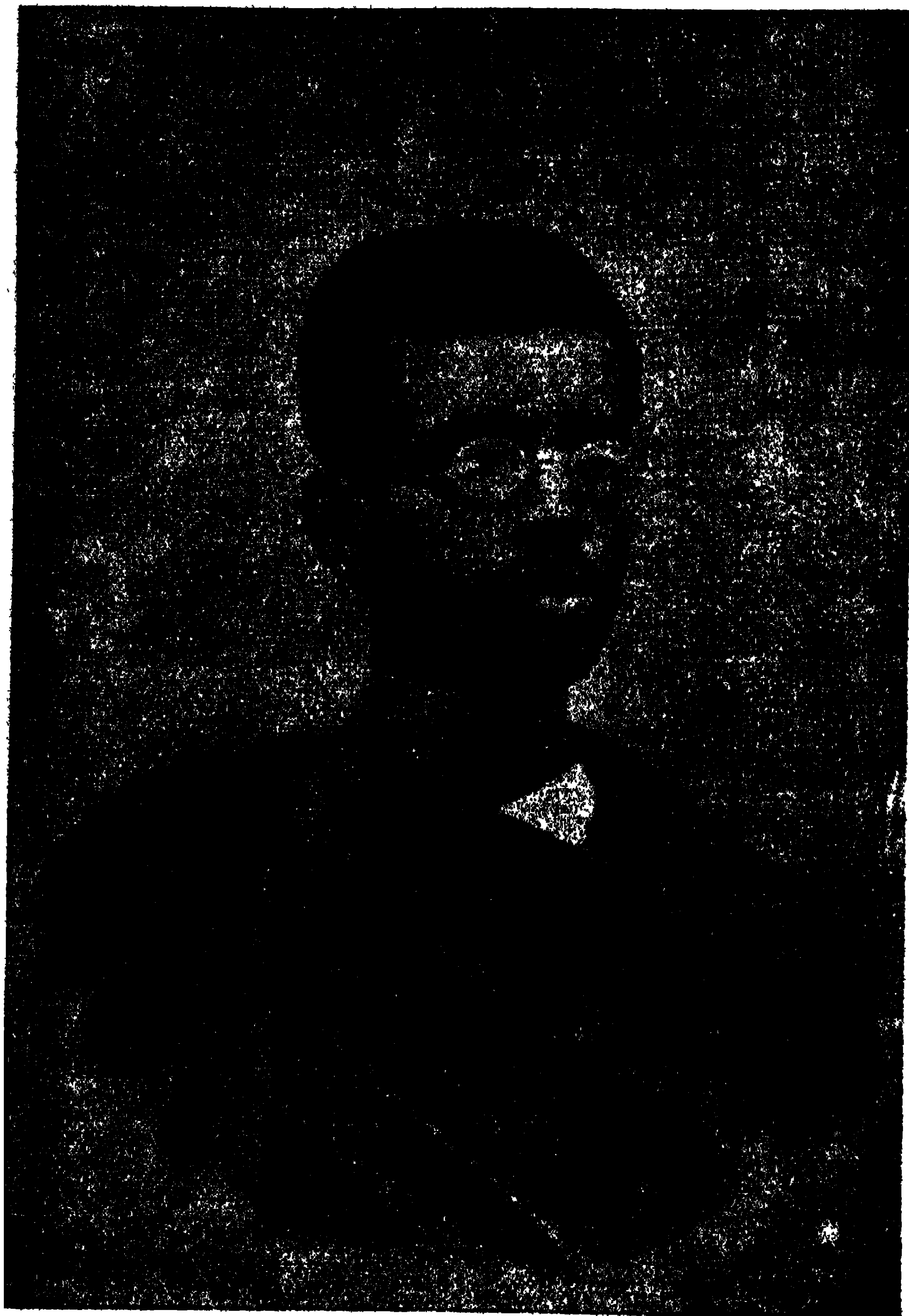
বর্ত্তমান আদালতের পশ্চাতে একটি বিদ্যালয়ের অস্তিত্বের কথা মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উহার সম্বন্ধে প্রাচীন লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াও কিছু জানিতে পারি নাই *

এখানে পাশ্চাত্য ধরণে শিক্ষাপ্রবর্ত্তন প্রসঙ্গে ফাদার ফ্রিচ্, ফাদার বার্থে ফাদার এলফন্সো ও ব্রাদার হানোরিয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শুনা যায়, ফাদার ফ্রিচ্ এখানে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রথম উদ্যোগী। অন্যান্য কোন কোন স্থানের ন্যায় এখানেও মিশনারীরাই পাশ্চাত্য ধরণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় ভূদেব বাবু এখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ডুপ্লে কলেজের পর 'বঙ্গবিদ্যালয়' এখানকার প্রধান বিদ্যালয়। ১২৮৮ সালের ২০শে বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন বারাসত তে-মাথায় ৺কানাইলাল খাঁ মহাশয়ের একটি ক্ষুদ্র ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ৩টি মাত্র বালক লইয়া উহা স্থাপিত হয়। বারাসত নিবাসী স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয় প্রথম ৺গিরিশচন্দ্র শ্রীমানী মহাশয়ের আস্তাবলে একটি পাঠশালা স্থাপন করেন। সাধারণের সহানুভূতি অভাবে তিনি নিজে উহা পরিচালনে সমর্থ না হওয়ায়, স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে স্থানীয় বালকদের শিক্ষাবিষয়ে সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করেন। রাখাল বাবু গোন্দলপাড়া-নিবাসী ৺কালিদাস বসু, ৺শ্রীশচন্দ্র বসু, ৺রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তেলেনীপাড়া নিবাসী ৺অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তায় এই প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। স্বর্গীয় দীননাথ মুখোপাধ্যায় ইহার প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান বিদ্যালয়ভবন নির্ম্মাণকল্পে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৺গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৺দুর্গাচরণ রক্ষিত ও ৺কানাইলাল খাঁ মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

---

* ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দের সার্ভে ম্যাপ।



Kanailal Dutt

প্রথম ইহা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, এক্ষণে এখানে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর পাঠ্য পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্রসংখ্যা অন্যূন ২৫০। একটি বে-সরকারী কমিটির দ্বারা উহা চালিত হইয়া থাকে। গবর্মেণ্ট ও মিউনিসিপ্যালিটি এই বিদ্যালয়ে সামান্য সাহায্য করিয়া থাকেন।

দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয় দ্বারা ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার নিজ নামে এবং "নিত্যগোপাল শেঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়" নামে আর দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। উভয় বিদ্যালয়ই অবৈতনিক এবং গবর্মেণ্টের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। শেষোক্তটি শ্রীযুত হরিহর শেঠের দ্বারা ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতৃদেবের নামে প্রতিষ্ঠিত।

এখানে বেসরকারী ছোট ছোট পাঠশালা অনেক আছে, তন্মধ্যে শ্রীযুত আশুতোষ নিয়োগী মহাশয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যে দুইটি পাঠশালা আছে, তাহাই উল্লেখযোগ্য। আশু বাবুর পাঠশালাটি অবৈতনিক, বালকদিগের সহিত ছোট মেয়েরাও এখানে শিক্ষা পাইয়া থাকে।

প্রসিদ্ধ বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত চন্দননগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং দেশদ্রোহী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে জেলের মধ্যে হত্যা করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।*

মেয়ে এবং ছোট ছেলেদের জন্য এখানে কনভেণ্টে একটি শিক্ষালয় আছে, তাহা রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত নানদের দ্বারা পরিচালিত। ইহার সহিত ছাত্র-ছাত্রীদের থাকিবার আবাস সংযুক্ত আছে। এখানে সকল জাতির ছেলেমেয়েদের প্রবেশাধিকার থাকিলেও সাধারণতঃ সাহেবদের ছেলেমেয়েরাই শিক্ষার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। দশ বৎসরের অধিকবয়স্ক বালকদিগকে এই বিদ্যালয়ে লওয়া হয় না। মেয়েরা অনেক বড় বয়স পর্য্যন্ত এখানে থাকে। বাঙ্গালার মধ্যে এই শ্রেণীর শিক্ষালয়

---

* মৃত্যুঞ্জয়ী কানাই—শ্রীসুধীরকুমার মিত্র, দ্রষ্টব্য।

যে কয়টি আছে, তাহার মধ্যে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ। মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার মত শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও এখানে আছে। এই প্রতিষ্ঠানটি যে বাটীতে আছে, তাহা এল্‌ফ্রেড কুর্জ্জন নামক চন্দননগরবাসী এক জন প্রসিদ্ধ ধনী জমিদার দান করিয়াছিলেন।

কেবলমাত্র বালিকাদের জন্য উপস্থিত এখানে সরকারী একটি অবৈতনিক এবং 'কাশীশ্বরী পাঠশালা' নামে আর একটি বেসরকারী পাঠশালা আছে। প্রথমটি সর্ব্বৈব গবর্মেণ্টের দ্বারা এবং দ্বিতীয়টি 'চন্দননগর শিক্ষাসমিতি' নামে একটি কমিটির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। শেষোক্তটি গোন্দলপাড়া নিবাসী ম্যাণ্ডালের এড্‌ভোকেট শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দুই সহস্র টাকা অর্থ-সাহায্যে উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কতিপয় ভদ্রলোকের চেষ্টায় ১৩১৮ সালের ২৫শে শ্রাবণ স্থাপিত হয়। ইহার বর্ত্তমান বাটীটি স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত জমীতে, প্রধানতঃ শ্রীযুত কমলকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। স্থানীয় বালিকাদের জন্য এইটিই প্রধান বিদ্যালয়। সম্পাদক শ্রীযুত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় ইহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে।

এই দুইটি ভিন্ন পালপাড়া ও বিবিরহাট নামক স্থানে আর দুইটি মেয়েদের অবৈতনিক ছোট পাঠশালা আছে। প্রথমটি পালপাড়া সুহৃদ্ সমিতি এবং দ্বিতীয়টি সন্তানসঙ্ঘ দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। এই উভয় পাঠশালাই দুইটি মহীয়সী রমণীর যত্নে ও পরিশ্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এই রমণীদ্বয় হইতেছেন শ্রীযুত আশুতোষ দত্ত মহাশয়ের পত্নী এবং স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পত্নী। পালপাড়ার পাঠশালাটি প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম স্বর্গীয় কৃষ্ণকিশোর দত্ত মহাশয়ের দ্বারা ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য একটি সাধারণ পাঠশালারূপেই সৃষ্ট হইয়াছিল। দ্বিতীয়টি শরৎ বাবুর পত্নীর দ্বারাই ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

'অঘোরচন্দ্র শেঠ প্রাথমিক বালিকা-বিদ্যালয়' নামে এখানে আর একটি অবৈতনিক বালিকা-বিদ্যালয় এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহার পরিচালনভার গবর্মেণ্টের উপরেই ন্যস্ত আছে। বালিকা এবং অপেক্ষাকৃত বড় মেয়ে, এমন কি, বয়স্থা রমণীগণও যাহাতে বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা পাইতে পারেন, সে জন্য ছাত্রী আবাস-সংবলিত একটি নারীশিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছে। উহার জন্য সহরের মধ্যস্থলে সম্প্রতি মিউনিসিপ্যালিটির নিকট হইতে কিছু কম ৪ বিঘা জমি খরিদ করা হইয়াছে। শীঘ্রই উপযুক্ত আবাসাদি নির্ম্মিত হইবার ব্যবস্থা হইতেছে। এই সমস্ত ভিন্ন প্রবর্ত্তক-সংঙ্ঘের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত একটি বিদ্যাপীঠ আছে। এখানে ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই থাকিবার ও শিক্ষালাভ করিবার ব্যবস্থা আছে।

এখানে যে যে বিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্যের কোন ব্যবস্থা আছে, সেই সেই স্থানেই কিছু ফরাসী শিক্ষার ব্যবস্থাও নির্দ্দিষ্ট আছে। ফরাসী আইন, চিকিৎসা বা উচ্চশিক্ষার জন্য এখান হইতে পণ্ডিচেরীতে যাইতে হয়। কিন্তু ঐ সকল শিক্ষার দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের বিশেষ সুবিধা না থাকায় কেবল আইন পরীক্ষা দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ যাইয়া থাকেন।

বৈদ্য-বেদ বিদ্যালয় নামে ১৩২৮ খৃষ্টাব্দে কবিরাজ শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের দ্বারা এখানে একটি প্রাচ্য প্রতীচ্য সমন্বয়ে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই স্থানে ছাত্রদিগের থাকিবার এবং আয়ুর্ব্বেদের সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কতিপয় ডাক্তার, কবিরাজ প্রভৃতি ভদ্রলোক বিনা পারিশ্রমিকে এখানে শিক্ষা দিয়া থাকেন।

প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে এখানে একটি সঙ্গীত-বিদ্যালয় ছিল। উহা ৺বসন্তলাল মিত্রের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম শিক্ষক ছিলেন ৺রাজারাম

বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২৯০ সালে উহা উঠিয়া যাওয়াতে চন্দননগরের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

সংস্কৃত শিক্ষার জন্য এখানে চতুষ্পাঠি পূর্ব্বকাল হইতেই আছে। শুনা যায়, ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত লালবাগানে, যে স্থানে এক্ষণে



কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষামন্দির ও তারকদাসী নারীকল্যাণ সদন।

ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের উদ্যান আছে ঐ স্থানে একটি টোল ছিল। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে নন্দদুলালের মন্দিরে ঈশ্বরচন্দ্র

ভট্টাচার্য্য নামক এক পণ্ডিত একটি টোল স্থাপন করিয়াছিল। হাটখোলার ভৈরবচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও পঞ্চাননতলার শিরোমণির টোল প্রসিদ্ধ ছিল। নাড়ুয়া অঞ্চলে 'ভবদেব শিরোমণি টোল' নামে একটি টোল ছিল। অনেক দিন পূর্ব্বে শেষোক্ত পল্লীতে শ্যামাচরণ গোস্বামী ও তৎপূর্ব্বে তাঁহার পিতার টোল প্রসিদ্ধ ছিল। এই গোস্বামী মহাশয়েরা পিতা-পুত্র উভয়েই বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত ছিলেন। সহরের মধ্যে গোস্বামীঘাট নামক স্থানেই শিক্ষিত ও শাস্ত্রজ্ঞ লোকের বাস সর্ব্বাপেক্ষা বরাবরই অধিক। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে গোলন্দপাড়া পল্লীতে ন্যায়শাস্ত্রের যথেষ্ট অনুশীলন হইত। জানা যায়, তৎকালে এখানে দশটি ন্যায়ের বিদ্যালয় ছিল। *

এক্ষনেও এখানে দুই পাঁচটি ছাত্রকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, এমন ভট্টাচার্য্যের অভাব না থাকিলেও অধুনা একমাত্র কালিদাস-চতুষ্পাঠীই উল্লেখযোগ্য। ইহা শ্রীযুত কালীচরণ দাস মহাশয়ের দ্বারা ১৮৩২ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। দাশ মহাশয় এই কার্য্যে ৩০।৩২ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। তিনি এক জন বিশিষ্ট ধনী নহেন, অল্পশিক্ষিত ব্যবসাদার কিন্তু ইদানিং শিক্ষার জন্য তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ এখানে এককলীন এতাদৃশ দান করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ নাই। শ্রীযুত সাধুচরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত চারুচন্দ্র রায় ও শ্রীযুত ভূপেশ্বর শ্রীমানী মহাশয়েরা এক্ষণে এই চতুষ্পাঠির ট্রাষ্টি।

পুস্তকাগার বলিতে 'চন্দননগর পুস্তকাগারই' সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। উহা ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় যদুনাথ পালিত মহাশয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত পালিত মহাশয়, মহেন্দ্রনাথ নন্দী, শ্রীযুত

* Adam's Report on Vernacular Education in Bengal! Behar.

মতিলাল শেঠ প্রভৃতি কতিপয় মহোদয়ের চেষ্টায় এখানে একটি সখের থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইয়া উহাতে 'প্রণয়পরীক্ষা' নাটক অভিনীত হইয়াছিল। অভিনয়-সমিতির অভিনয় স্পৃহা শেষ হইলে উহার ষ্টেজ ও সরঞ্জামাদির বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা স্বর্গীয় ত্রিগুণাচরণ পালিত, মহেন্দ্রনাথ নন্দী, হরিমোহন সুর প্রভৃতি মহাশয়গণের উদ্যোগে এই পুস্তকাগারের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার দীর্ঘজীবনের বিবিধ অবস্থার ইতিহাস বিবৃত করিবার স্থান নাই। ইহার শৈশবাবস্থা হইতে আজি পর্য্যন্ত সকল সময়েই সহরের শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের হস্তে ইহার পরিচালনের ভার ন্যস্ত থাকিলেও, মধ্যে অবস্থা বিশেষ খারাপ হইয়া যায়। তৎপরে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ইহার নবগঠিত কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে আসার পর হইতে ইহা পুনরুন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া, উক্ত বৎসর ডিসেম্বর মাসে ইহার ৫০ বৎসর বয়সের সহিত ক্রমে এখন চন্দননগরের মধ্যে পুস্তকাগার একটি গৌরবের বস্তু হইয়াছে। ইহার হিতৈষী ও বন্ধুগণের মধ্যে আমি এখানে এক জনের নাম করিব,—যিনি সুদীর্ঘকাল ইহার সুখ-দুঃখের সহিত বিজড়িত থাকিয়া, ইহার সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের দিনে ইহাকে বুকে করিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি স্বর্গীয় প্রমথনাথ মিত্র। তাঁহার বড় সাধের পুস্তাকাগারের জন্য তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহার কতটা ভগবান্ দিয়াছেন, দুরদৃষ্টক্রমে তিনি তাহা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পুস্তকাগার এখানে ওখানে কতিপয় ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকিয়া, এক্ষণে সহরের মধ্যস্থলে, 'নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির ও চন্দননগর পুস্তকাগার' নামে ইহার আপন বাড়ী হইয়াছে। অর্থভাণ্ডারের অবস্থাও অসচ্ছল নহে এবং পুস্তকের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার সহিত যে পাঠাগার আছে, তাহাও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। লোকশিক্ষা, বালক এবং যুবকদিগের মধ্যে পাঠস্পৃহাও মৌখিক রচনার

উৎকর্ষ-লাভের জন্যও কর্ত্তৃপক্ষগণ যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিয়াছে ও ও করিতেছেন। বর্ত্তমানে সর্ব্বপ্রকারে সভ্যসংখ্যা মোট প্রায় ৬ শত ৫০ হইয়াছে। এক্ষণে মফস্বলের বে-সরকারী পুস্তকাগারসমূহের মধ্যে ইহা একটি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। এমন কি, ইহার সমকক্ষ পুস্তকাগার এখন এ প্রদেশে আছে কি না সন্দেহ।

এখানে অন্য উল্লেখযোগ্য পুস্তকাগারের মধ্যে 'দশভুজাসাহিত্য-মন্দিরের' নাম করা যায়। ইহা ১৩২৯ সালে শ্রীযুত ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুত সাতকড়ি সুর প্রভৃতি কতিপয় স্থানীয় ভদ্রলোকের উদ্যোগে মানকুণ্ডা নামক পল্লীতে শ্রীশ্রী৺দশভূজা দেবীর মন্দির সান্নিধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

চন্দননগর পুস্তকাগারের পূর্ব্বে অন্য কোন সাধারণ পুস্তকাগার এখানে ছিল বলিয়া জানা যায় না। শুনা যায়, বড়বাজার নামক পল্লীতে এক সাহেবের একটি পুস্তকাগার ছিল। উহা সাধারণের জন্য কি পারিবারিক, তাহা বলা যায় না। পরে উহা খরিদ করিয়াই তদ্দ্বারা ও যদুনাথ পালিত মহাশয়ের সংগৃহীত গ্রন্থ-সমূহের দ্বারা চন্দননগর পুস্তকাগার আরম্ভ হয়। উহা সম্ভবতঃ দেড়শত টাকায় ক্রীত হইয়াছিল।

এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে এখানে যে সকল লাইব্রেরীর উদ্ভব ও লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে গোন্দলপাড়ার 'বান্ধব লাইব্রেরী, কাঁটাপুকুরের 'ন্যাসন্যাল লাইব্রেরী', সাউলির 'সরস্বতী লাইব্রেরী, এবং 'বীণাপাণি লাইব্রেরীর' নাম করা যাইতে পারে।

দীর্ঘকালস্থায়ী পাঠাগার বা শিক্ষাবিষয়ক অন্য সমিতি এখানে একটিও ছিল না এবং এখনও নাই। আনুমানিক শত বৎসর পূর্ব্বে বড়বাগান পল্লীতে শ্রীযুত মতিলাল শেঠ মহাশয়ের বাড়ীতে সম্ভবতঃ 'চন্দননগর লিটারেরি সোসাইটি' নামে একটি সমিতি ছিল বলিয়া জানা যায়।

স্বর্গীয় রায় প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ বাহাদুর, সিদ্ধেশ্বর বসু ও ডাক্তার নিত্যানন্দ নন্দী যথাক্রমে উহার সভাপতি, সহকারী সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন। উহা ৩ বৎসর মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় উহার এক উৎসব সভায় আগমন করিয়াছিলেন। এই সময়েই বাদামতলা নামক পল্লীতে আর একটি শিক্ষানুশীলনের জন্য সমিতি ছিল, তাহার নাম জানিতে পারা যায় নাই। প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে 'সাহিত্য-সভা' নামক একটি সাহিত্য বিষয়ের সমিতি স্থাপিত হইয়াচিল। উহা উঠিয়া যাইবার অনেক পরে আরও দুইটি সভা ঐ নামে গঠিত হইয়াছিল। প্রথমোক্ত সভার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। শেষবার যে সাহিত্য সভার সৃষ্টি হইয়াছিল, স্বর্গীয় প্রাণধন ভড় মহাশয় তাহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। 'লিটারেরি সোসাইটি' নামে সহরের উত্তরাংশে আর একটি শিক্ষা বিষয়ক সমিতির কথা শুনা যায়। ইহার সম্পাদক ছিলেন সম্ভবতঃ শ্রীযুত সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়। 'গোন্দলপাড়া হিতসাধিনী সভা' নামে একটি সভা ছিল। উহাতে সাহিত্যবিষয় আলোচনা হইত শুনা যায়, 'প্রজাবন্ধু' নামক সংবাদপত্র প্রকাশে এই সভার বিশেষ উদ্যোগ ছিল এবং স্বর্গীয় ডাক্তার শ্রীশরৎচন্দ্র বসু উহার অন্যতম পরিচালক ও সম্পাদক ছিলেন।

'গোন্দলপাড়া রিডিং ক্লাব' নামে আর একটি সমিতি ছিল, শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উহার সম্পাদক ছিলেন। এতদ্ভিন্ন 'বান্ধব-সম্মিলনী' নামে গোন্দলপাড়ায় আর একটি সমিতি ছিল। উহা প্রধানতঃ শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন ডিবেটিং ক্লাব, সারস্বত সম্মিলনী, পালপাড়া সান্ধ্যসমিতি ও কতিপয় ডিবেটিং ক্লাব প্রভৃতি ছিল।

একণে চন্দননগর পুস্তকাগার সংশ্লিষ্ট পাঠাগার বা 'দশভুজা সাহিত্য-

মন্দির’ ভিন্ন চন্দননগর শিক্ষা সমিতি, সন্তান-সম্প্রদায় ও পালপাড়া সুহৃদ্ সমিতি নামে তিনটি সমিতি আছে। প্রথমটি ১৩১৮ সালে বালকবালিকাদের প্রয়োজনীয় বিদ্যা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। ‘কাশীশ্বরী পাঠশালা’ নামক বালিকা বিদ্যালয়টি এই সমিতির দ্বারা চালিত হইতেছে। কর্ম্মজীবনকে আদর্শ করিয়া, দেশ সেবার উদ্দেশ্য লইয়া ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুত অরুণচন্দ্র দত্তের দ্বারা সন্তান সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার দ্বারা একটি মেয়েদের পাঠশালা পরিচালিত হইতেছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতি ইহার লক্ষ্য। পালপাড়া সুহৃদ সমিতি ১৩২৮ সালে শ্রীযুত হরিহর শেঠের উদ্যোগে এবং শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন বসু, মাণিকলাল বড়াল, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও প্রিয়নাথ দত্তের সহায়তায় স্থাপিত হয়। শিক্ষার উন্নতি ও সহায়তা ভিন্ন দুঃস্থ ব্যক্তির সাহায্য প্রভৃতির এই সমিতির কার্য্যান্তর্ভুক্ত। এই সমিতির চেষ্টায় ও ব্যয়ে এক্ষণে একটি ছেলেদের ও একটি মেয়েদের পাঠশালা পরিচালিত হইতেছে এবং পালপাড়া ‘বালক-সম্মিলন’ নামক বালক ও কিশোর-দের একটি সান্ধ্য পাঠাগার পরিচালনার সহায়তা হইতেছে। ‘গোন্দল-পাড়া-সম্মেলন’ নামে আর একটি সমিতি কয়েকটি যুবক দ্বারা কয়েক বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহারা ‘প্রথম স্রোতের ফুল’ নামে একখানি হস্তলিখিত মাসিক নিজেদের মধ্যেই প্রকাশ করিতেন। এক্ষণে একটি পাঠাগার ও নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। চন্দন-নগরের মধ্যে ইহাই একমাত্র নৈশ বিদ্যালয়। গোন্দলপাড়ায় ‘শিশু-সাহিত্য সংসদ’ বারাসতে ‘সাহিত্য সংসদ’ ও সাউলিতে ‘বালক সঙ্ঘ’ নামে আর তিনটি ছেলেদের সমিতি আছে। শিশু-সাহিত্য সংসদ হইতে ‘অরুণ’ নামে একখানি হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা পরিচালিত হইত।

চন্দননগরের “অঞ্জলি-সমিতি” শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষের পরিচালনায় প্রায় দশ বৎসর যাবৎ সুন্দর ভাবে চলিতেছে। এই প্রতিষ্ঠান প্রতি বৎসর



শ্রীহরিহর শেঠ

বিতর্ক প্রতিযোগীতার অনুষ্ঠান করিয়া এই অঞ্চলে বেশ সুনাম অর্জন করিয়াছে।

গোন্দলপাড়ার "ফ্রেণ্ডস ক্লাবও" একটি প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান। কয়েক বৎসর যাবৎ ইহারা নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শরীর চর্চ্চা, ব্রতচারী, ও সাংস্কৃতিক যাবতীয় কার্য্যেও ইহারা অগ্রণী। ইহাদের একটি থিয়েটার ক্লাবও আছে এবং প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার সময় ইহারা অভিনয় করিয়া থাকেন। শ্রীপ্রভাত বসু'র সম্পাদনায় "সংহতি" বলিয়া একখানি পাক্ষিক পত্রও ইহারা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

গোন্দলপাড়ার বসু বংশ সম্ভূত স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র বসু প্রথম জীবনে একজন সরকরী কর্ম্মচারী ছিলেন পরে ইনি চিকিৎসা-ব্যবসায়ে ব্রতী হইয়া বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। প্রজাবন্ধু নামক সংবাদপত্রের একজন সহায় এবং Amateur Workshop নামক পত্রের অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। 'লীলা' (১২৯৫) নামক একখানি প্রবন্ধ-পুস্তক ও 'প্রতাপ' নামক একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। 'সংসার' নামে আর একখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তিনি মাসিক পত্রেও প্রবন্ধাদি লিখিতেন। স্বর্গীয় রায় রাধা চরণ পাল বাহাদুরের ইনি গৃহচিকিৎসক ছিলেন। চিকিৎসা বিষয়ে দু-একখানি পুস্তকও রচনা করেন, কিন্তু সম্ভবতঃ তাহা প্রকাশিত হয় নাই। দারিদ্রের দুঃখে ইহার হৃদয় সর্ব্বদা দ্রবীভূত হইত।

রাসবিহারী বসু গুড়ে কালনার নিকটবর্ত্তী সুবলদহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করিলেও, তাঁহার পিতৃদেব চন্দননগরে স্থায়ীভাবে বসবাস করায় এই স্থানেই তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা হয়। তাঁহার জীবনী "মহাবিপ্লবী-রাসবিহারী" নামক গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে।*

* মহাবিপ্লবী রাসবিহারী—শ্রীসুধীর কুমার মিত্র

শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় প্রতিষ্ঠিত "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ" কেবল বাঙ্গলা দেশের নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব। এই প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে হুগলী জেলার শিল্প বাণিজ্য অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে বলিয়া, এই স্থলে আর পুনরুল্লেখ করা হইল না।

চন্দননগরবাসীদের জ্ঞান ও শিক্ষার উন্নতি কল্পে পূর্ব্বোক্ত নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে পুস্তকাগারের জন্য নির্দ্দিষ্ট অংশ ভিন্ন সাধারণের ব্যবহারের জন্যও একটি সুবৃহৎ হল আছে। এই স্থানে



ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ধ্বংশাবশেষ
এই স্থানেই তাঁহার কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়।

সর্ব্বদা সভাসমিতি হইয়া থাকে। শিক্ষাপ্রদ বা নির্দ্দোষ আমোদের জন্যও স্থান আছে। ইহার ভিতর প্রায় ৭শত ৫০ জন লোকের একসঙ্গে স্বচ্ছন্দে বসিবার ব্যবস্থা আছে। ভদ্রমহিলাদের আসন

সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কর্ত্তৃপক্ষের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া শিক্ষার্থী বিদেশীয় ভদ্রলোকদের অল্পদিন থাকিবার জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট কক্ষ আছে। শ্রীযুত হরিহর শেঠের দ্বারা ১৩২৭ সালে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীযুত সাধুচরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র দে ও শ্রীযুত যজ্ঞেশ্বর শ্রীমানী মহাশয়েরা ইহার বর্ত্তমান ট্রাষ্টি। স্বর্গীয় তিনকড়িনাথ বসু মহাশয় ইহার আর একজন ট্রাষ্টি ছিলেন, স্মৃতিমন্দিরের দ্বারোদঘাটনের পূর্ব্বেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

চন্দননগরের যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক অধিবেশন এই "নৃত্য-গোপাল স্মৃতিমন্দিরে" অনুষ্ঠিত হয়। এমন কি ১৩৫০ সালে শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ কর্ত্তৃক আহূত বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে মহাসমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত অধিবেশনেই বঙ্গভাষাভাষী স্থানগুলি বঙ্গদেশে প্রত্যর্পণ করিবার প্রস্তাব সর্ব্বপ্রথম গৃহীত হয়। সম্মেলনে আগত সাহিত্যিকবৃন্দের একখানি আলোকচিত্র এই স্থানে প্রদত্ত হইল। শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার মিত্র উক্ত সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক।

বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এখানে অনেক আছেন এবং পূর্ব্বেও ছিলেন। প্রত্যেকের বিষয় এই স্থলে না বলিলেও একজনের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। তিনি হইতেছেন রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান বাহাদুর সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়। তিনি কাব্যনন্দ ও মহীশূর দরবার হইতে প্রাপ্ত রাজ-মন্ত্র-প্রবীণ উপাধিভূষিত হইয়াছিলেন এবং রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির ফেলো ছিলেন। তিনি যে কোন পরীক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাতেই অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন ও বৃত্তি পাইয়াছিলেন্। গণিত, সংস্কৃত ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের কথা, তাঁহার রচিত বহু গবেষণাপূর্ণ অন্যান্য গ্রন্থাদির কথা, কতিপয় কলেজ অধ্যাপকরূপে



বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনে আগত সাহিত্যিকবৃন্দ

কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিয়া মহীশূর রাজার অর্থসচিব ও মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে যুক্তপ্রদেশের কণ্ট্রোলার জেনারেলের পদ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত তাঁহার সমস্ত কৃতিত্বের কথা বলিয়া শেষ করিবার এখানে স্থান নাই। বাঙ্গালীর মধ্যে কণ্ট্রোলারের পদ খুব অল্প লোকই পাইয়াছেন। তাঁহার



দেওয়ান জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী

জীবনকালের মধ্যে অনেক গ্রন্থাদিতে তাঁহার সংক্ষিপ্ত কথা এবং একখানি জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল। * মৃত্যুর পর বহু সংখ্যাক সংবাদ পত্রাদিতে তাঁহার জীবন-কথা প্রকাশিত হইয়াছে।

---

* At home and abroad By M. Venkata Krishnayya and C M Raghavendra Rao.

বর্ত্তমানে চন্দননগরের বিভিন্ন পল্লীর নির্ব্বাচক সংখ্যা যেরূপ লিখিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

১।	বিবিরহাট	৬৬০
২।	বোড় পশ্চিম	৮৯১
৩।	বোড় পূর্ব্ব	১৩০৩
৪।	নাড়ুয়া	৭৬০
৫।	গঞ্জ	১০০৪
৬।	খলিসানি	৮৮৩
৭।	লালবাগান	৮২৭
৮।	যুগীপুকুর	১০০৩৬
৯।	হাটখোলা পশ্চিম	৫৯৬
১০।	হাটখোলা পূর্ব্ব	৬৯২
১১।	গোন্দলপাড়া	১৬৭৪
১২।	বারাসাত	১৩০৬

* সুসন্ধিৎসু পাঠকগণ শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ কর্ত্তৃক লিখিত চন্দননগরের সম্বন্ধে বিবিধ প্রবন্ধাদিতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে পারিবেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

গুপ্তিপাড়া

বর্ত্তমানে ইহা একটি গণ্ড গ্রাম হইলেও, প্রাচীনকালে ইহা সংস্কৃত শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ষ্টোভোরিনাসের মানচিত্রে গুপ্তিপাড়া গঙ্গার পূর্ব্বদিকে ছিল বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় নবদ্বীপের ন্যায় এই স্থান গঙ্গার পশ্চিম দিকে আসিয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, চোর-ডাকাত এবং বাঁদরের জন্য এই স্থান প্রাচীনকালে বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতেও এই স্থানে ১৫টি ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষার জন্য টোল ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। রথযাত্রা ও স্নানযাত্রা এই স্থানে খুব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইত এবং দেশদেশান্তর হইতে উক্ত উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলায় বহু যাত্রী সমাগত হইত বলিয়া জানিতে পারা যায়। অদ্যাপি উক্ত অনুষ্ঠানাদি হয়। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত চিরঞ্জিব ভট্টাচার্য্য দর্শন শাস্ত্রের উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ "বিদ্যোন্মাদ তরঙ্গিনী" রচনা করিয়া ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ হন। ১২৩২ সালে রাধামোহন সেন উক্ত গ্রন্থের পদ্যানুবাদ এবং ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে মহারাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর উহার সংস্কৃত শ্লোক সমন্বিত ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:

"শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সংপ্রতি হিন্দুদিগের দর্শনশাস্ত্রের মতঘটিত বিদ্বন্মোদতরঙ্গিনী নামক এক পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাতে ইংরেজী অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে আসল সংস্কৃত শ্লোক অর্পিত

হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ অনুমান বৎসর ষাইট সত্তর হইল গুপ্তপল্লিনিবাসি চিরঞ্জিব ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক রচিত হয় এবং তাহা পণ্ডিতেরদের কর্ত্তৃক অতিমান্য তাহার ঐ অনুবাদ অতি উত্তম নৈপুন্যরূপে প্রস্তুত হইয়াছে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুবাদাপেক্ষা তাহা অত্যুৎকৃষ্ট।"

রাধামোহন সেন দাস উক্ত গ্রন্থের পদ্যে যে অনুবাদ করেন, নিম্নে তাহার নিদর্শন প্রদত্ত হইল:

একদিন ভূপতি বিক্রমসেন রায়।
পাত্র মিত্র সভ্যগণে বেষ্টিত সভায়॥
হেনকালে স্বসজ্জায় হইয়া মণ্ডিত।
ক্রমে উপস্থিত হৈলা বিবিধ পণ্ডিত॥
প্রথমতঃ পরম বৈষ্ণব একজন।
সভামধ্যে আসিয়া দিলেন দরশন॥
সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ সভ্য কোনজন।
রাজাকে শুনান ক্রমে সবার বর্ণন॥

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ১৩৩৭ সালে 'চিরঞ্জিব শর্ম্মা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন।

গুপ্তিপাড়া একটি প্রাচীন স্থান; কবিকঙ্কন মুকুন্দ রাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীকাব্যেও এই স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়:

বাহ বাহ বল্যা ঘন ঘন পড়ে গেল সাড়া।
বাম ভাগে শান্তিপুর ডাহিনে গুপ্তিপাড়া॥
উলা বাহিয়া খিসমার আশে পাশে।
মহেশপুর নিকটে সাধুর ডিঙ্গা ভাসে॥

দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রচিত 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী' কাব্যে গুপ্তিপাড়া সম্বন্ধে পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল:

অম্বিকা পশ্চিম পারে শান্তিপুর পূর্ব্বধারে,
রাখিল দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া ;
উল্লাসে উলায় গতি বটমূলে ভগবতী।
চণ্ডিকা নহেন যথা ছাড়া।

গুপ্তিপাড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বাঁদর এবং চোর ডাকাতের জন্য প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ। সমগ্র বঙ্গদেশ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে "উলোর পাগল, গুপ্তিপাড়ার বাঁদর ও হালিশহরের তেঁদড়" অর্থাৎ উলায় বলু পাগল, গুপ্তিপাড়ায় অসংখ্য বানর ও হনুমান ও হালিসহর মাতালের জন্য বিখ্যাত। গুপ্তিপাড়ায় বহু ও বাঁদরের জন্য বিদ্রূপ করিয়া এই স্থানের লোকদিগকে "গুপ্তিপাড়ার বাঁদর" বলিয়া অদ্যাপি পরিহাস করিয়া থাকে।

"As Guptipara is noted for its monkey, Halisbahar for its drunkards so is Ulla for fools, as one man said to become a fool every year at the mela" *

কিম্বদন্তী আছে যে একবার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্তিপাড়া হইতে বানর বানরী আনাইয়া অর্দ্ধলক্ষ টাকা ব্যয় পূর্ব্বক তাহাদের বিবাহ উপলক্ষে তিনি নদীয়া, শান্তিপুর, উলা, গুপ্তিপাড়া হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনাইয়া তাহাদিগকে ভুরি ভোজনে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। †

সার্ব্বজনীন পূজা আজ বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র প্রলিত ; কিন্তু সর্ব্বপ্রথম এই সার্ব্বজনীন বা বারোয়ারী পূজা ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে গুপ্তিপাড়া হইতে প্রথম সুরু হয়। এই সম্বন্ধে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের মে মাসের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' **'On the present celebration of the Hindoo Poojas'**

---

* The Banks of the Bhagirathi by Rev. J. Long.

† Travels of a Hindoo By Bhola Nath Chandra.

(পৃষ্ঠা ১২৯—১৩০) শীর্ষক প্রবন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত হইল :

"A new species of Pooja which has been introduced into Bengal within the last thirty years called Barowaree. About thirty years ago at Gooptipara near Santipoora, a town celebrated in Bengal for its numerous colleges, a number of Brahmins formed an association for the celebration of a pooja independently of the rules of the shastras. They elected twelve men as a committee, from which circumstance it takes its name, and soticited subscriptions in all sorrounding villages. Finding their collections inadequate, they sent men into various parts of the country to obtain further supplies of money, of whom many according to current report, have never returned. Having thus obtained about 7000 Rupees, they celebrated the worship of Juguddhatree for seven days with such splendor, as to attract the rich from a distance of more than a hundred miles. The formulas of worship were of course regulated by the established practice of the Hindoo ritual, but beyond this the whole was formed on a plan not recognised by the shastrs, They obtained the mont excellent simgers to be found in Bengal, entertained every Brahmun who arrived and spent the week in all the intoxication of festivity and enjoyment. On the succesful termination of the scheme, they determined to render the Pouja aunnal, and it has since been celebrated with undeviating regularity."

আশানন্দ ঢেঁকি গুপ্তিপাড়ায় বিবাহ করিয়া এই স্থানের বৃন্দাবনচন্দ্র নামক বিগ্রহের বাড়ীতে গোমস্তাগিরি চাকুরী করিতেন। তাঁহার ন্যায়

বলবান ব্যক্তি তৎকালে খুবই অল্প ছিল; একদিন তিনি বৃন্দাবনচন্দ্রের কয়েকশত টাকা লইয়া হুগলী হইতে গুপ্তিপাড়ায় প্রত্যাগমন কালে ডুমুরদহের দীঘির ধারে বসিয়া ফলার করিতেছিলেন, এমন সময়ে পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন, দুইজন লাঠিয়াল দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের দাঁড়াইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলে যে ডুমুরদহে কিসের ভয় তাহা কি জান না? আশানন্দ তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহাদের হাত হইতে লাঠিগুলি কাড়িয়া লন এবং তাহাদিগকে দুই বগলে করিয়া গুপ্তিপাড়ায় লইয়া আসেন। তাহার বগলের চাপে লাঠিয়ালদ্বয় অচৈতন্য হইয়া পড়ে; পরে মুখে জলের ছিটা দিয়া তাহাদের চৈতন্য সম্পাদন করা হয়। *

ডুমুরদহের বিশ্বনাথবাবু আশানন্দের অপূর্ব্ব শক্তি দেখিয়া তাহাকেও ডাকাতের দলভুক্ত করিয়া লন বলিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন। ইহারা অগ্রে সংবাদ দিয়া শিবিকারোহণে ডাকাতি করিতে যাইতেন। বিশ্বনাথবাবু 'বিশে ডাকাত' বলিয়া আজও বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন; ডুমুরদহের বিষয় আলোচনাকালে তাঁহার সম্বন্ধে উল্লিখিত হইবে।

গুপ্তিপাড়ায় রাধাবল্লভ জাগ্রত দেবতা; কারুকার্য্যখচিত সুবৃহৎ মন্দির এই অঞ্চলের প্রধান দ্রষ্টব্য এবং স্থাপত্য শিল্পের এক অপূর্ব্ব নিদর্শন। মন্দির প্রতিষ্ঠাতার পুত্রগণ অতিথি অভ্যাগতের পানাহারের সুব্যবস্থা জন্য বহু ভূ-সম্পত্তি ও অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন, উক্ত সম্পত্তির আয় হইতে অদ্যাপি অতিথিসেবা সুসপন্ন হইয়া থাকে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে এই স্থানের রথযাত্রা উপলক্ষে এক মেলায় লক্ষাধিক যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল এবং ৪৫ জন স্ত্রীলোক মেলা দেখিতে আসিবার সময় নৌকা উল্টাইয়া যাওয়ায় গঙ্গায় ডুবিয়া প্রাণ হারাইয়াছিল।†

* দেবগণের মর্ত্তে আগমন—দুর্গাচরণ রায়, পৃষ্ঠা—৩১৭

† Calcutta Review—1846.

বঙ্গের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা ভোলানাথ মোদকের (ভোলা ময়রা) আদি নিবাস গুপ্তিপাড়া; তাঁহার পিতার নাম রামগোপাল মোদক। রামগোপালের বাগবাজারে একখানি খাবারের দোকান ছিল এবং এই স্থানে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ভোলানাথ জন্মগ্রহণ করেন। ভোলানাথের চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করে—তাহাদের নাম চিন্তামণি, চন্দ্রনাথ, রসিকলাল ও মাধবচন্দ্র। একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্র ব্যতীত অন্যান্য পুত্রগণের কোন সন্তানাদি হয় নাই। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ভোলানাথের পুত্র হয়। তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে রায় সাহেব দিবাকর দে এবং ডাক্তার অতুলকৃষ্ণ দে এম-বি মহোদয়ের নাম উল্লেখ্যযোগ্য। বাগবাজারের রসগোল্লার আবিষ্কারক স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র দাশ (নবীন ময়রা) তাঁহার নাৎ-জামাই হইতেন।

স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন "কবি পাঁচালী ও বুলবুলীর লড়াই" তৎকালে ধনীগণের মধ্যে প্রধান আমোদের সামগ্রী ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কলিকাতা সহরে হরু ঠাকুর, ও তাঁহার প্রধান চেলা ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর, নিতাই বৈষ্ণব প্রভৃতি কবিওয়ালাগণ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। এই সকল দলে প্রায় এক এক জন দ্রুত কবি থাকিত। ইহাদের নাম সরকার বা 'বাঁধনদার'। বাঁধনদারেরা উপস্থিত মত তখনি তখনি গান বাঁধিয়া দিত।"

মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ভোলানাথকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং অল্প বয়সেই স্বীয় প্রতিভাবলে মহারাজাকে তিনি প্রীত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভোলানাথ স্বয়ং সুকবি এবং তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অদ্ভুত ছিল; বিশেষ করিয়া গালাগালির গান বাঁধিতে তাঁহার ন্যায় কেহই দক্ষ ছিল না। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন যে "বাঙ্গলা দেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তার, হুতোম-প্যাঁচার লেখকের ন্যায় রসিক

লোকের এবং ভোলা ময়রার ন্যায় কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।"

ভোলানাথ কিরূপ সংহত ও তীব্র ভাবে গালাগালি দিতেন তাহার একটি নিদর্শন উল্লেখ করিতেছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র দে-উদ্ভটসাগর লিখিত ভোলা-ময়রা নামক প্রবন্ধ হইতে অনেক তথ্য অবগত হইতে পারিবেন।

কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে ভোলানাথ কবিগান করিতে গিয়াছেন। তাঁহার বিপক্ষে ছিল কলিওয়ালা রাম বসুর রক্ষিতা যজ্ঞেশ্বরী; তিনি মহিলা হইলেও রাম বসুর ন্যায় সুকবি ছিলেন এবং তাহারও একটি কবির দল ছিল। আসরে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞেশ্বরী দেখিলেন যে, অন্যকার আসরে ভোলানাথের হস্তে নিষ্কৃতি লাভ করা অসম্ভব। সেইজন্য তিনি সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ্য ভাবে কহিলেন "ভোলানাথ আমার পুত্র এবং আমি ভোলানাথের মাতা"। যজ্ঞেশ্বরীর এইরূপ বলিবার অর্থ যে, তাহা হইলে ভোলানাথ আর তাহাকে বিশেষ গালাগালি দিতে পারিবে না। যাহা হউক ভেলানাথ পুত্র সাজিয়াও কিরূপ কৌশলে শাস্ত্র রক্ষা করিয়া যজ্ঞেশ্বরীকে তীব্রভাবে গালাগালি দিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত ও তাহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। ভোলানাথ আসরে গিয়াই কহিলেন :

তুমি মাতা যজ্ঞেশ্বরী সর্ব্বকার্য্যে শুভকরি
তোমার ঐ পুরানো এঁড়ে রাম বোস বাপ।
যেমন পিতা তেমনি মাতা ভোলানাথের অভয়দাতা
মা-বাপ ঠিক লাগিয়ে দিলে থাপ॥
এখন মা! সুধাই তোরে কেন এসে এই আসরে
ঘন ঘন দিচ্ছ জোরে ডাক।

বুঝি তোমার হয়েছে কাল বেহায়ার নাই কালাকাল
তাই বাবুদের সভায় এত হাঁক ॥
তোমার পুত্র ভোলানাথ গুণধর সকল কাজেই অগ্রসর
তোমার মত মাতার দুঃখ দেখিতে না চাই।
পঞ্চপিতা, সপ্তমাতা * শাস্ত্রে শুনতে পাই,
তুমি আমার গাভী মাতা, চল তোমায় ধরাতে যাই ॥

স্বর্গীয় বিজয় রাম সেন ১১৭৭ সালে তীর্থ-মঙ্গল রচনা করেন; ভূকৈলাসের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের সহিত তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া উক্ত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তিনি গুপ্তিপাড়া সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার কয়েক পদ্ধতি উদ্ধৃত হইল:

"সেই দিন বলাগড়ি মোকাম করিয়া।
সোমড়া বামেতে রাখি দিনেক বাহিয়া ॥
পাত্রাগ্রাম বামে রাখি করিলা গমন।
গুপ্তিপাড়ায় আনি নৌকা দিল দরশন ॥
গুপ্তিপাড়ায় ব্রাহ্মণের কি কহিব নীত।
মহাতেজ ধরে তারা বিচারে পণ্ডিত ॥"

---

* পঞ্চপিতা—অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, শ্বশুর, উপনয়ন, কর্ত্তা ও জন্মদাতাকে পঞ্চপিতা বলে।

"অন্নদাতা ভয়ত্রাতা যস্য কন্যা বিবাহিতা।
উপনেতা জনয়িতা পঞ্চৈত পিতরঃ স্মৃতা ॥"

সপ্তমাতা—গর্ভধারিণী, গুরুপত্নী ব্রাহ্মণ পত্নী, রাজপত্নী, গবী, ধাত্রী ও পৃথিবীকে সপ্তমাতা বলে।

"আত্মমাতা গুরোপত্নী ব্রাহ্মণী রাজ পত্নীকা।
গবী ধাত্রী তথা পৃথ্বী সপ্তৈতা মাতরঃ স্মৃতা ॥"

মহাশয়ের আগমন সকলে শুনিয়া।
আশীর্ব্বাদ করিলেন বেদ উচ্চারিয়া ॥
মহা আনন্দিত হয়্যা ঘোষাল তনয়।
কিছু কিছু দিয়া বিপ্রে করিলা বিদায় ॥"

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মন্দিরের সেবায়েৎ শ্রীমদ কৃষ্ণানন্দের বিরুদ্ধে নারী হরণ, নৌকায় দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি কয়েকটি অত্যাচারের জন্য হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট স্মিথ সাহেব তাঁহাকে মোহান্তের গদি হইতে অপসারিত করিয়া তিস মাস কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। এই সম্বন্ধে ১২৪২ সালের ৩১শে জ্যৈষ্ঠ 'তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে "কস্যচিৎ গুপ্তিপাড়ানিবাসিনঃ" যে পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল; ইহা হইতে সকল বিষয় সম্যক অবগত হইয়া যাইবে। *

আপনকার দর্পনে অনেকানেক বিষয় প্রকাশ হইয়া জনপদের বহুবিধ উপকার হইতেছে বিষেশতঃ যাহারা নিরুপায় তাহাদের সদুপায় দর্পন দ্বারা হয় এ বিষয়ে আমরা কয়েক পংক্তি লিখিয়া পাঠাইতেছি দর্পণে অর্পণ করিয়া মানদান করিবেন। জিলা হুগলীর অন্তঃপাতি মোকাম গুমিপাড়ায় শ্রীশ্রী৺ বৃন্দাবনচন্দ্র ঠাকুর প্রকাশ আছেন তাঁহার সেবাৎ গাদি নশীন শ্রীকৃষ্ণানন্দ নামে একজন দণ্ডী ছিলেন তিনি প্রজাদিগের উপর যে সকল অত্যাচার করিতেন তাহা লিখিয়া শেষ করা অসাধ্য। এবং তাহাতে প্রজাসকল যেরূপ কাতর ছিলেন তাহাও বর্ণণে বর্ণাভাব। যাহা হউক শ্রীযুত দাউদ স্মিথ সাহেব বাহাদুর অতি ধার্ম্মিক সদ্বিবেচক তৎকালীন জিলার জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। দণ্ডীমজকুরের নানা দৌরাত্ম্য তাঁহার কর্ণগোচর হইবার তিন চারি মিছিলে তাহার অপরাধ সাব্যস্থ করেন। প্রথমতঃ গৃহস্থের কন্যা বাহির করা। দ্বিতীয়তঃ দুষ্ট লোক সমভিব্যাহারে রাত্রিতে ভ্রমণ।

* সংবাদপত্রে সে কালের কথা, ২য় খণ্ড।

তৃতীয়তঃ দুর্জ্জনের সঙ্গে সহবাস। চতুর্থ নৌকারোহণে রাত্রিতে দস্যুবৃত্তি এই সকল অত্যাচার সপ্রমাণ হওয়াতে দণ্ডীমজকুরকে পদচ্যুত করিয়া তিন মাস কারাবদ্ধ রাখেন। তাহাতে ঐ সকল অত্যাচারের অনেক হ্রাস হইয়াছিল এবং লোকেরাও পরম সুখে কালযাপন করিতেছিল।

সংপ্রতি শুনিতেছি দণ্ডীমজকুর সদরবোর্ডে দরখাস্ত করিয়াছিল তাহাতে বোর্ডের সাহেবেরা তজবিজ করিয়া ঐ গাদির উত্তরাধিকারী কোন বিজ্ঞ দণ্ডিকে সেবাত করিতে জিলায় কালেক্টারীতে অনুজ্ঞা করেন কিন্তু কালেক্টর সাহেব ঐ আজ্ঞাপ্রমাণ ইশতেহার জারী করাতে তিন জন দণ্ডী উপস্থিত হইলেন তাহার একজন পরমানন্দ নামে অতি জ্ঞানবান। দ্বিতীয় অচুত্যানন্দ ঐ দুষ্কর্ম্মান্বিত দণ্ডির চেলা। তৃতীয় জ্ঞানানন্দ নামে এক দণ্ডী গোবিন্দানন্দের চেলা এই কয়েক জন উপস্থিত হইবার কালেক্‌টুর সাহেব পরীক্ষায় পরমানন্দ দণ্ডীকে অতি বিজ্ঞ দেখিয়া নিযুক্ত করিবার মানস গ্রাহ্য করতঃ অচুত্যানন্দকে অনুপযুক্ত দেখিয়া কহিলেন যে তোমার গুরু যে পথে গিয়াছেন তুমি সেই পথাবলম্বন কর। তাহাতে আমলাসকল কৌশল করিয়া মফঃসল সুরতহালের অনুমতি লইয়া কএকজন মফঃসলে তদারক করিয়া কৈফিয়ৎ দেন। হে সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে কৃষ্ণানন্দ দণ্ডী যাহাকে মাজিস্ট্রেট সাহেব গাদিচ্যুত করেন তাহাকে কোন হুকুম প্রমাণে এ বিষয়ের মধ্যে বসাইয়া সুরতহাল করিলেন। এবং যে ব্যক্তিকে মোকাম মজকুরে থাকিবার সাহেবের আজ্ঞা নাই তাহাকে সরেকাছারিতে কি প্রকারে বসাইয়াছিলেন ফলতঃ আমলারদিগের সহিত কৃষ্ণানন্দ দণ্ডীর এরূপ পরামর্শ করাতে এই জনরব উঠিল যে তাহার চেলা গাদি নশীন পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে তাবল্লোকই ভীত ও দুষ্ট লোক সকলে তাহার সহিত মিলিয়া পূর্ব্বপ্রায় লোকের উপর দৌরাত্ম্য

আরম্ভ করিয়াছে। এবং গত বৈশাখ মাহার মধ্যে মাকাম সোশাই-ডাঙ্গার নিকটে দুই তিন থান মহাজনী নৌকা মারা পড়িয়াছে যে ব্যক্তি এইক্ষণকার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অতি সদ্বিবেচক কিন্তু ঐ দণ্ডির চেলা পুনর্ব্বার গাদি প্রাপ্ত হইল এই জনরব ক্রমে কোন লোকেই ভয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জানাইতে অক্ষম। হে সম্পাদক মহাশয় যদ্যপি অনুগ্রহ পূর্ব্বক দর্পনপার্শ্বে এই পত্রখানি প্রকাশ করেন তবে আমরা চিরবাধিত হই যেহেতুক পরোপকারে ধর্ম্ম আছে অলমতিবিস্তরেন। কস্যচিৎ গুপ্তিপাড়নিবাসিনঃ।

গুপ্তিপাড়ায় সিরাজ-সেনাপতি মোহনলাল, সুবিখ্যাত মন্ত্রী রাজা মানিকচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস বজরায় এই স্থানে বিপর্য্যস্ত হন। গোপাল ভাঁড়, আশানন্দ ঢেঁকি এবং কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এই স্থানে শ্বশুরালয় ছিল এবং প্রায়ই তাহারা এইস্থানে আসিতেন।

খানাকুল-কৃষ্ণনগরের স্বর্গীয় যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী ১২৬২ সালে ভারত পরিভ্রমণ করিয়া, তাঁহার তীর্থ ভ্রমণ গ্রন্থে গুপ্তিপাড়ার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন ; তাহার কয়েক লাইন নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"এইখানে হাট বাজার করিয়া বেলা দুই প্রহর গতে নৌকা খুলিয়া এক ক্রোশ পরে সাতগেছে, ২ ক্রোশ পরে গুপ্তিপাড়া। আড়পার শান্তিপুর অতি বৃহৎ গ্রাম, অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস। অনেক ধনাঢ্য মনুষ্য শান্তিপুর গুপ্তিপাড়াতে আছে। সকল সুভদ্র গ্রাম। প্রায় দুই ক্রোশ মধ্যে এক ক্রোশ এক চড়া হইয়াছে। দুই দিকে দুই গঙ্গার প্রাবাহ। এই গুপ্তিপাড়ার নীচে চড়াতে আহারাদি করিয়া ২ ক্রোশ আসিয়া গুপ্তিপাড়ার বাজারের ঘাটে সন্ধ্যার পূর্ব্বে লাগান করিয়া থাকা হইল।"

গুপ্তিপাড়ার মেয়েরা বাচাল, শান্তিপুরের মেয়েরা মুখরা, উলার মেয়েরা কুলের বড়াই করে এবং নদীয়ার মেয়েরা খোঁপার পরিপাট্যের

গর্ব্ব করে বলিয়া একটি প্রবাদ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়; নিম্নে বচনটি উদ্ধৃত হইল:

"উলার মেয়ে কুল কুঠুটি।
নদের মেয়ের খোঁপা॥
শান্তিপুরে নথ নাড়া দেয়।
গুপ্তিপাড়ার চোপা॥" *

গুপ্তিপাড়ার সন্দেশ 'গুপো' বলিয়া খ্যাত এবং বঙ্গদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এইরূপ সন্দেশ বঙ্গের আর কোন স্থানে পাওয়া যায় না। এখনও কলিকাতার বহু ধনাঢ্য ব্যক্তি তাহাদের কাজে-কর্ম্মে গুপ্তিপাড়া হইতে সন্দেশ আনাইয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদগণ দ্বাদশ পাঠে শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন; দ্বাদশ পাঠের মধ্যে চারটি পাঠ হুগলী জেলায় অবস্থিত। তাঁহাদের ভক্তগণ বঙ্গদেশে আরে সতেরটি পাট-বাটি প্রতিষ্ঠা করিয়া বঙ্গদেশে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত করেন। গুপ্তিপাড়ায় সত্যানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবনচন্দ্রের, সেবা করিতেন এবং এই অঞ্চলে তাহার বহু শিষ্য ও ভক্ত ছিল। এই সম্বন্ধে পাট-পর্য্যটনে লিখিত আছে:

"বেলুনে অনন্তপুরী মহিমা প্রচুর।
বগনপাড়াবাসী শ্রীরামঞি ঠাকুর॥
গোপতিপাড়াতে সত্যানন্দ সরস্বতী।
বৃন্দাবনচন্দ্র সেবেন করিয়া পিরীতি॥
জিরাটে মাধবাচার্য্য আর গঙ্গাদেবী।
যশড়াতে জগদীশ: নিত্য বিনোদী॥" †

* নদীয়া কাহিনী—শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক, পৃষ্ঠা ১৭৬

† সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা, ১৩১৮ সাল, পৃষ্ঠা ১১০

গুপ্তিপাড়াতে বহু দেবায়তন আছে, তন্মধ্যে "বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির" সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ; ইহা "গুপ্তিপাড়ার মঠ" বলিয়া খ্যাত। সেওড়াফুলির রাজা হরিশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এই সুন্দর মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়। ইহার কারুকার্য্য অতি অপূর্ব্ব। লাল ইট দিয়া নির্ম্মিত মন্দিরগাত্রে গ্রথিত বহু দেব-দেবীর মূর্ত্তি, রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাবলী এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনের ঘটনাবলী ও তাঁহার জীবনী সংক্রান্ত কয়েকটি দৃশ্য দর্শকমাত্রকেই মুগ্ধ করে। এই মন্দিরের ছাদ বাঙ্গলা দেশের চালঘরের ধরনে নির্ম্মিত; তাহার উপর একটি ছোট থাক ও তদুপরি তিনটি কলসী স্থাপন করা আছে।

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত গুপ্তিপাড়ার গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামনি দেবীকে বিবাহ করেন।

স্বর্গীয় দুর্গাচরণ রায় লিখিয়াছেন যে, শান্তিপুরের পরপারে গুপ্তিপাড়া। গুপ্তিপাড়ার লোকেরা স্বভাবতঃ বেশ চালাক। পূর্ব্বে এই স্থানে বেশ রহস্য আলাপ হইত। মাতালেরা মদ খাইয়া এক্ষণে ঐরূপ করিয়া থাকে। গ্রামটি বানরের জন্য বিখ্যাত। বানরেরা বড় উপদ্রব করে এমন কি স্ত্রীলোকের কক্ষ হইতে জলের কলসী লইয়া ভাঙ্গিয়া দেয়। কোন লোককে 'তুমি কি গুপ্তিপাড়া হইতে আসিতেছ ?' বলিলে বানর বলা হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একবার গুপ্তিপাড়া হইতে একটি বানর লইয়া গিয়া অতি সমারোহে তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। ঐ বানরের বিবাহে তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করেন এবং নবদ্বীপ, শান্তিপুর, উলা, গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি হইতে বিস্তর ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। গুপ্তিপাড়ায় কয়েকটি দেবালয় আছে, তন্মধ্যে বৃন্দাবনচন্দ্র নামক বিগ্রহ বড় জাগ্রত। কেহ ইহার জমী, কি বাগান ও পুষ্করিণী ফাঁকি দিয়া লইয়া ভোগ করিলে নির্ব্বংশ হয়। বৃন্দাবনচন্দ্রের রথে বড় সমারোহ

হইয়া থাকে। এই গুপ্তিপাড়ায় বানেশ্বর বিদ্যালঙ্কার জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রামদেব তর্কবাগীশ। ইনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাষদ ছিলেন। রাজা কলিকাতায় শোভাবাজারে বিদ্যালঙ্কারকে একটি বাড়ী কিনিয়া দেন। ইনি কলিকাতায় বসাক বাড়ী শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ যাওয়ায় রাজা কিছু অভক্তি প্রকাশ করেন। ইহাতে বাণেশ্বর কৃষ্ণনগর পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানে যান এবং তথাকার রাজা চিত্র সেন ইহাকে সাদরে নিজ সভার প্রধান পণ্ডিত করেন।*

ভোলা ময়রা বঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ 'কবি' তিনি হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়ার অধিবাসী ছিলেন তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে এবং কবি-গান করিবার জন্য বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র তিনি পরিভ্রমণ করেন। একবার বঙ্গদেশের কোন স্থানে কি ভাল জিনিষ পাওয়া যায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে; তিনি যাহা বলেন নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইল:

ময়মনসিংহের মুগ ভাল, খুলনার ভাল খই,
ঢাকার ভাল পাত-ক্ষীর, বাঁকুড়ার ভাল দই।
কৃষ্ণনগরের ক্ষীর-পুলী ভাল, মালদহের ভাল আম,
উলোর ভাল বাঁদর-বাবু, মুর্শিদাবাদের জাম।
রংপুরের শ্বশুর ভাল, রাজসাহীর জামাই,
নোয়াখালির নৌকা ভাল, চট্টগ্রামের ধাই।
শান্তিপুরের শালী ভাল, গুপ্তিপাড়ার মেয়ে,
মাণিককুণ্ডের মুলো ভাল, চন্দ্রকোণা ঘিয়ে।
দিনাজপুরের কয়েৎ ভাল, হাবড়ার ভাল শুঁড়ি,
পাবনা জেলার বৈষ্ণব ভাল, ফরিদপুরের মুড়ি।

* দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন—পৃষ্ঠা ৭৬৯—৭৭০

বর্দ্ধমানের ঢাকী ভাল, চব্বিশ পরগণার গোপ,
পদ্মানদীর ইলিশ ভাল, কিন্তু বংশ লোপ,
হুগলীর ভাল কোটাল-লেঠেল, বীরভূমের ভাল ঘোল,
ঢাকের বাদ্যি থামলেই ভাল, হরি হরি বোল। *

চাঁপদানী হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর মহকুমার একটি প্রাচীন স্থান। ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গলে' এই স্থানের উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র স্থানটি বৈদ্যবাটী ও গৌরহাটীর মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং বঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসের সহিত ইহার কিঞ্চিৎ সম্পর্ক আছে।

চাঁপদানী

চাঁপদানী, বাঙ্গলার নবাব নাজিম মিরজাফরের নিকট হইতে ভারতের প্রধান সেনাপতি স্যার আয়ার কুট যৌতুক প্রাপ্ত হন এবং তিনি তাঁহার সুন্দরী যুবতী স্ত্রী মিসেস সুসন্না হাচিন্সনের সহিত এই স্থানে বহু বর্ষ যাবৎ বাস করেন।

"It was granted by Mirjafor, the Nawab Nazim of Bengal to Colonel Coote, afterwards Sir Eyre Coote, Commander in chief of India. *

কর্ণেল কুটকে মিরজাফর এই স্থান উপহার দেওয়ায়, স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস বিশেষভাবে আপত্তি করেন কিন্তু ওয়ারেন হেষ্টিংস স্যার ফিলিপের আপত্তিতে কর্ণপাত করেন নাই। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল পিয়ার্সের নেতৃত্বে হায়দর আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে মেদনীপুরে প্রেরিত অবশিষ্টাংশ সেনাবাহিনী পরিদর্শন করিবার জন্য ওয়ারেন হেষ্টিংস স্বয়ং চাঁপদানীতে আসিয়াছিলেন। †

* ভোলা ময়রা—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর, বসুমতী—১৩৩৬ সাল।

† Hedges Dairy, Vol III, page—217.

* Bengal past & present,

বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম চটকল ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং ডাকাতির জন্যও এই স্থান হুগলী জেলায় বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ ছিল।

"The Jnte Mill at Champdani is one of the oldest in the province having been built in 1872. *

হাতনী বৈঁচী ষ্টেশনের অনতিদূরে অবস্থিত একটি নগণ্য পল্লীগ্রাম; এই গ্রামে উল্লেখযোগ্য কোন প্রাচীন নিদর্শন না থাকিলেও সম্প্রতি শ্রীযুত প্রভাস পালের যত্নে একটি চতুর্ভুজ ভগবতীর মূর্ত্তি ও কতিপয় বিষ্ণুমূর্ত্তির আবিষ্কারের ফলে, এই অঞ্চল যে প্রাচীন কালে সুসমৃদ্ধ ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ভগবতীর মূর্ত্তিটি বৈদ্যবাটিতে অবস্থিত সারদাচরন মিউজিয়ামে এবং বিষ্ণুমূর্ত্তিগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত হইয়াছে।

হাতনী

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এই দেশে প্রথম ভারতীয় ইংরাজী-অধ্যাপক, প্রথম হেড-মাষ্টার, প্রথম অধ্যাপক গুপ্তিপাড়া গ্রামের আয়দা পল্লীর বন্দোপাধ্যায় বংশের সুসন্তান ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গঙ্গা বেহুলার সঙ্গম সন্নিকটে অদ্যাপি তাঁহার ভদ্রাসনের ভগ্নবশেষ বিদ্যমান আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

গুপ্তিপাড়ার ঐতিহাসিক খ্যাতি চির প্রসিদ্ধ; এই স্থানের পণ্ডিতগণ বহু প্রাচীন কাল হইতে সমগ্র বঙ্গদেশে বিশেষ ভাবে সম্মানিত হইতেন। তন্মধ্যে পণ্ডিত শোভাকর, পণ্ডিত দেবীবর ও পরে পণ্ডিত বাণেশ্বর, পণ্ডিত মাথুরেশ প্রভৃতি মনীষীগণ বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে (১৮১৪

* Hooghly District Gazeteers, page—248.

খৃষ্টাব্দে) ২৬শে ভাদ্র ১৭৩৬ শকাব্দে ঈশানচন্দ্র গুপ্তিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন ; তাঁহার পিতার নাম বদনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

তৎকালীন প্রাচীন রীতি অনুসারে হাতে খড়ির পর, গুরু মহাশয়ের



ঈশানচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়

কাছে বাঙ্গলা এবং মুন্সী বাবুর কাছে ঈশানচন্দ্রের পারসী শিক্ষা সুরু হয়। বার বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতায় আসিয়া বাগবাজারে চিৎপুর রোডের

উপর রেভারেণ্ড পিয়ার্স সাহেবের স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া জন পামার এণ্ড কোম্পানীতে চাকুরী সুরু করেন। সেই সময় উচ্চ শিক্ষা লাভে তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া তথাকার জনৈক সাহেব তাঁহাকে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন।

অতঃপর তিনি অধ্যাত্ম-তত্ত্ব শিক্ষার্থে জেনারেল এ্যাসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে ভর্ত্তি হন এবং রেভারেণ্ড ডাফ সাহেব, তাঁহার অপূর্ব্ব মেধাশক্তি দেখিয়া বিশেষ প্রীত হন এবং পরবর্ত্তীকালে ঈশানচন্দ্রের চেষ্টায় গুপ্তিপাড়ায় ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালে, তিনি তাঁহাকে যথেষ্ট সহায়তা করেন।

তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীরামপুরের ডাক্তার ম্যাকে সাহেবের নিকট তিনি ইংরাজী ও গ্রীক ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রে (Astronomy) বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি হাজারিবাগ মিশন স্কুলে চাকুরী লইয়া হাজারীবাগ চলিয়া যান এবং তথায় এডুকেশন সার্ভিসের প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক স্থানে শিক্ষা বিভাগে কার্য্য করেন এবং বহরমপুর ও কৃষ্ণনগর কলেজে সাময়িক ভাবে কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হন।

অতঃপর তিনি সরকারের কয়েকটি প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকার কর্ত্তৃক স্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া হুগলী কলেজ সংস্থাপন উদ্দেশ্যে অন্যতম প্রধান ঋত্বিক রূপে চুঁচুড়ায় প্রেরিত হন।

"His career at this time attracted the attention of the Government, and they so much appreciated the distinction he had earned that they promotod him to the 4th grade Subordinate Educational Servico, an honour especially acceptable to him, as being the first time offered to a native of India.

He successfully competed in an examination for teachership with European candidates. and obtained promotion

to the chair of the Headmaster, a position never before filled by any of our countrymen. His success in imparting sound knowledge to those who had the good fortune to come uuder his tution is most amply testified to by his pupils thmselves, who however the most part are holding with credit the highest appointments of the land." *

তাঁহাকে সারা জীবন ধরিয়া বহু পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল এবং প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ইউরোপীয়দের তখন যে সমস্ত পদ একচেটিয়া ছিল, তিনি উক্ত পদে প্রথম ভারতীয় নিয়োজিত হন এবং ইংরাজগণ তাঁহাকে বিব্রত কবিবাব বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হয় নাই।

ঈশানচন্দ্র হুগলী কলেজে ইংবাজী অধ্যাপক ছিলেন কিন্তু গণিত ও জ্যোতিষেও তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল বলিয়া, আর্ক ডেকন প্রাট্ সাহেব লিখিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের প্রথম গ্রাজুয়েট সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহার ছাত্র এবং তাঁহার ভ্রাতা মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহশিক্ষক ছিলেন। তখনকার দিনেব অধিকাংশ পণ্ডিতবর্গের সহিত তাহাব বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং একমাত্র রাজা রামমোহন রায় ব্যতীত প্রত্যেকেই তাঁহার পরবর্ত্তী কালের লোক ছিলেন।

তৎকালে পণ্ডিত হিসাবে তিনি সকলের অগ্রণী ছিলেন, এবং অধ্যাপক হিসাবে তিনি অনন্যসাধারণ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড যখন যুবরাজ হিসাবে কলিকাতায় আগমন করেন, তখন তিনি ঈশানচন্দ্রের অধ্যাপনা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যান এবং কোন ভারতীয়ের পক্ষে ঐরূপ শুদ্ধ ইংরাজী অধ্যাপনা করা সম্ভব দেখিয়া, তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন।

*The Englishman. 19th June 1892

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ১৭ই জুন তারিখের "রেইস এ্যাণ্ড রায়ত" (**Reis & Rayyet**) পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত হইয়াছিল :

"He was one of the Bengalis who, before the Uuiversities were established, distinguished thmselves by their proficiency in the English language. An old Calcutta Reviewer, he wrote English like an acomplished Englishman."

সাংবাদিক ও সাহিত্যিক মহলে তিনি "জ্যোরিয়ান" বলিয়া খ্যাত ছিলেন এবং তাঁহার প্রবন্ধাদি ইণ্ডিয়ান মিরার, ইণ্ডিয়ান খৃষ্টিয়ান হেরাল্ড, রেইস-এ্যাণ্ড-রায়ত, ইণ্ডিয়ান নেশন, হিন্দু পেট্রিয়ট, ষ্টেটসম্যান, ইংলিশম্যান, পাইওনিয়ার, বেঙ্গলী, সংবাদ ভাস্কর, সংবাদ প্রভাকর, ফরাসীভাষায় প্রকাশিত লা-পাঁতি (**La Patit**) প্রভৃতি পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। তাঁহার সেই সমস্ত অমূল্য রচনাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিলে দেশের তৎকালীন অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য অবগত হওয়া যাইবে।

"He devoted his whle life to literary pursuits and was largely connected with the press, being a regular contributor to some of the dailies of his time under nome-de-plume of "Zarian." *

ছত্রিশ বৎসর সরকারী কার্য্যের পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন তারিখে এক পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া পরলোকগমন করেন। তাঁহার ন্যায় সরকারী মহলে বা সাধারণ মহলে শ্রদ্ধা আকর্ষণ খুব অল্প ভারতীয়ের ভাগ্যেই তখন ঘটিত। একবার স্যার রোপার লেথব্রীজ কে-সি-আই-ই কে, তিনি ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন।

মৃত্যুকালে ঈশানচন্দ্র এক পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া যান; পুত্রের

*The Indian Mirror, 18th June 1892.

নাম সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি ধলপুর ষ্টেটে স্কুলে ইন্সপেক্টারের কার্য্য করিতেন, পরে "টেলিগ্রাফ" নামক একটি পত্রের সহকারী সম্পাদনা করিতেন। ঈশান বাবুর বর্ত্তমানে কয়েকজন দৌহিত্র আছেন, তন্মধ্যে শ্রীযুত অমরনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

তাঁহার কলিকাতায় ১০ নং ঠাকুরদাস পালিত লেনে, যেখানে তাঁহার নিজস্ব বাড়ি সেই স্থানে তাঁহার শ্রাদ্ধ-বাসরে ইংরাজী ভাষায় লিখিত যে কবিতাটি বিতরিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

AN ANGEL'S WELCOME

(Written on the occasion of Baboo Eshan Chundra Banerjy'ys Srddha.)

HAIL, holy man ; soul to truth was firm !
Revolving earth, the place of thy sojurn,
Unsteadied not thy feet : full eighty years
Thou hast through storm and rain unbeaten passed,
Led by thy guide , and when the shade of night
In dismal darkness dimmed thy sight, adherest
To his support. They thus have travelled straight
To this abode of bliss, who naught but truth
Had followed: hence to fairer regions go
Who prosper most and develop their soul.
Perfection on perfection thus accrues.

বৈদ্যবাটী

বৈদ্যবাটী হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন স্থান ; অক্ষাঃ ২২° ৪৭' ২৫" উত্তর এবং ৮৮° ২২' ২০' পূর্বে অবস্থিত। বৈদ্যবাটী নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পূর্ব্বে এই স্থানে বহু চিকিৎসক বা

বৈদ্য বাস করিতেন বলিয়া এই স্থান বৈদ্যবাটী বলিয়া খ্যাত হয়। ভাগীরথী তীরবর্ত্তী এই প্রাচীন স্থানটি কলিকাতা হইতে মাত্র চৌদ্দ মাইল দূরে অবস্থিত।

বৈদ্যবাটী নামটি খুব প্রাচীন না হইলেও এই স্থানটি খুব প্রাচীন কারণ



শ্রীশ্রীনিস্তারিণী দেবী

এই স্থানের প্রসিদ্ধ নিমাই-তীর্থের ঘাট সম্বন্ধে বঙ্গের প্রাচীন কবিরা সকলেই কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানের নিম গাছে জবা ফুল ফুটিয়াছিল বলিয়া, এই স্থান তীর্থে পরিণত হইয়াছিল।

কথিত আছে যে, শ্রীচৈতন্যদেব পুরীতে জগন্নাথ দর্শন করিবার জন্ত যখন গিয়াছিলেন, সেই সময় ভাগীরথী তীরের এই ঘাটে কিছুদিন তিনি বিশ্রাম করিয়াছিলেন সেইজন্য তাঁহার অন্য নাম 'নিমাই' হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার জীবনচরিতে লিখিত আছে। *

চারিশত বৎসর পূর্ব্বে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার চণ্ডীকাব্যে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে ত্রিবেণী এবং নিমাই তীর্থের ঘাটের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু হুগলী, চুঁচুড়া, চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর, শ্রীরামপুর প্রভৃতির কোন কথা নাই। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তৎকালে একমাত্র ত্রিবেণী ও নিমাইতীর্থ ✦ ব্যতীত এই অঞ্চলে অন্য কোন প্রসিদ্ধ স্থান ছিল না। কবিকঙ্কনের চণ্ডী হইতে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইল:

"বামদিকে হালিসহর, দক্ষিণে ত্রিবেণী।
দুকুলে যাত্রীর রবে কিছুই না শুনি॥
গরিফা বাহিয়া সাধু বাহে ভাগীরথী।
কপোত এড়ায়ে সাধু পাইল সরস্বতী॥
উপনীত হইল সাধু নিমাই তীর্থের ঘাটে।
নিমের বৃক্ষেতে যথা ওর ফুল ফুটে॥"

বৈদ্যবাটী ও সেওড়াফুলি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং একটি মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত, কেবল ডানকুনীর খাল পূর্ব্বোক্ত স্থান দুইটিকে পৃথক করিয়া দিয়াছে। এই স্থানের ইতিহাস প্রসিদ্ধ সেওড়াফুলি রাজবংশ অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বলিয়া খ্যাত এবং ইহাদের গৌরবে বৈদ্যবাটি গৌরবান্বিত। সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা মনোহর রায় এই

---

* Hughly District Gazetteers.

✦ শ্রীচৈতন্তের জীবনী, ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, অযোধ্যা রামের সত্যনারায়ণের পাঁচালী কাব্য, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন প্রভৃতি গ্রন্থে নিমাতীর্থের নাম আছে।

রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাদের আদি নিবাস ছিল কাটোয়ার অনতিদূরে পাটুলি নামক গ্রামে; পৈত্রিক সম্পত্তি বণ্টনানুসারে ইনি সেওড়াফুলিতে বাস করেন এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ বংশবাটী, শিবপুর, রাজহাট প্রভৃতি স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।

দিনেমারগণ প্রথমে বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে গোন্দলপাড়ায় বাস করেন; পরে ফরাসী এজেণ্ট মাসিয়ে ল'র (**Mons Law**) চেষ্টায় নবাবের অনুমতিক্রমে রাজা মনোহর রায়ের নিকট হইতে আকনা ও পেয়ারাপুর গ্রাম বন্দোবস্ত করিয়া শ্রীরামপুরে বাস করেন। অতঃপর ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে তাহার পুত্র রাজচন্দ্রের নিকট হইতে ষাট বিঘা জমি বার্ষিক ১৬০১৲ টাকা খাজনায় বন্দোবস্ত করিয়া কুঠি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ব্যবসা আরম্ভ করেন। *

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে দিনেমারগণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সাড়ে বার লক্ষ টাকায় তাহাদের ভারতীয় অধিকার বিক্রয় করেন; বিক্রয়ের সন্ধিপত্রের ৬ষ্ঠ দফায় ভারতীয় সম্পত্তির মধ্যে তাঞ্জোরের রাজাকে বার্ষিক এক শত ষাট সিক্কা (কোম্পানির ১৭০৮৲ টাকা) রাজস্ব দেওয়া ব্যতীত ইংরাজদের আর কোন দায়িত্ব রহিল না বলিয়া লিখিত আছে। †

বর্ত্তমানে শ্রীরামপুরের বিচারালয় ও তৎপার্শ্বস্থিত সামান্য কিছু স্থান ব্যতীত ইহাদের হস্তে আর অন্য স্থানগুলি নাই বলিয়া ইহারা অদ্যাপি পূর্ব্বোক্ত সর্ত্তানুযায়ী ইংরাজ সরকারের নিকট হইতে বার্ষিক ৪৮।১০ রাজস্ব পাইয়া থাকেন।

সেওড়াফুলি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মনোহর রায়, দান ও বহু দেব-দেবীর বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

---

* **Treatise, Sanads & C. of Bengal & Neighbouring Countries, Vol. 1.**

† **Toynbee's Administration of the Hooghly District.**

১১৪১ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তিনি রাজবাটীতে শ্রীশ্রীসর্ব্বমঙ্গলা দেবীর সেবা প্রতিষ্ঠান করেন এবং তাহার পূজা নির্ব্বাহের জন্য শ্রীরামপুরের বহু সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া দেন; বর্ত্তমান শ্রীরামপুর কোর্ট প্রভৃতি উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তির অন্তর্ভূক্ত। তাঁহার পিতা বাসুদেব রায়ের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি বাসুদেবপুর নামে একটি গ্রাম তাহার পিতার নামে স্থাপন পূর্ব্বক তথায় একটি মন্দিরে স্বীয় পিতার একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেবা ও পূজাদির জন্য এক শত কুড়ি বিঘা ভূমি দান করেন। এতদ্ব্যতীত তাহার পিতামহ রাজা রাঘবেন্দ্র রায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে বৈদ্যবাটিতে রাঘবেশ্বরের শিব মন্দির স্থাপন করেন। বর্ত্তমানে ইহার চূড়াটি ভাঙ্গিয়া যাইলেও, এই সমস্ত প্রাচীন মন্দিরগুলি অদ্যাপি তাহার পুণ্যকীর্ত্তির সাক্ষ্য দান করিতেছে।

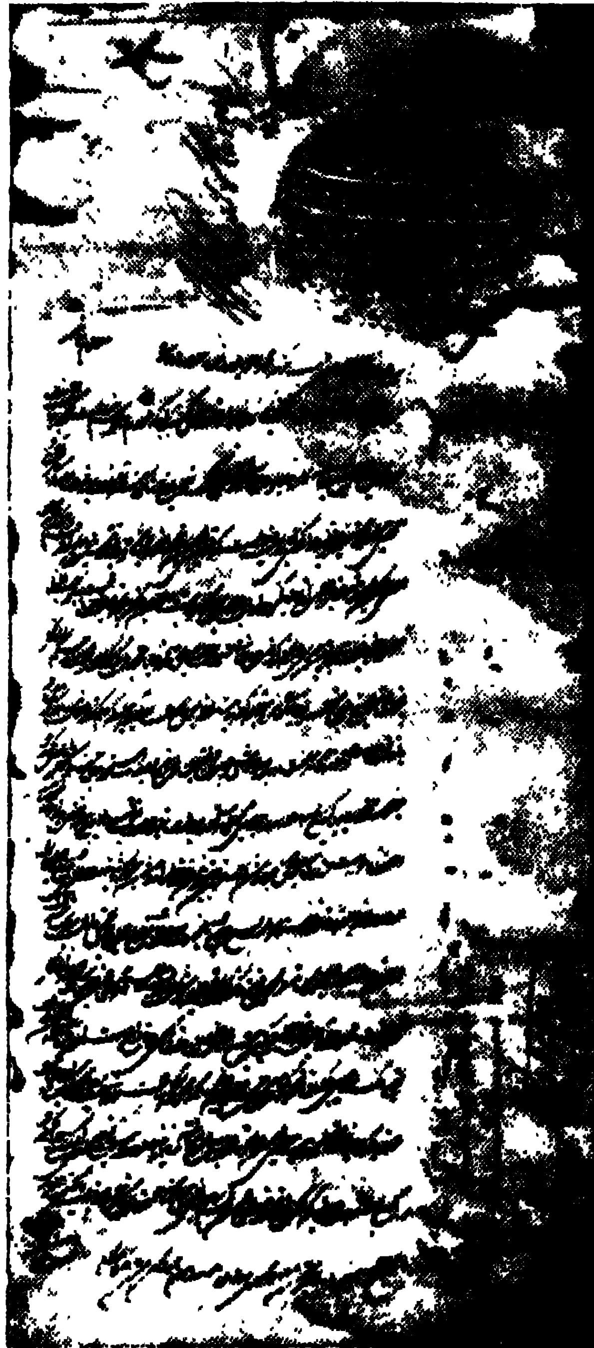
মাহেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা পরিচালনের জন্য রাজা মনোহর রায় জগন্নাথপুর নামক পল্লী দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। সেই জন্য স্নানযাত্রা উপলক্ষে সেওড়াফুলি রাজাদের অনুমতি ব্যতীত অদ্যাপি ঠাকুরের স্নান আরম্ভ হয় না। *

এতদ্ভিন্ন গুপ্তিপাড়ায় শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির তিনি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ১১৫০ সালে তিনি পরলোকগমন করিলে শুকদেব সিংহ একটি "মনোহরাষ্টক" রচনা করেন; উহা হইতে জানা যায় যে, তিনি প্রত্যহ ভূমি দান করিতেন এবং এইরূপ ভূমি দান করিতে করিতে শেষ জীবনে এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, তাঁহার রাজ্যে এমন কোন গ্রাম ছিল না, যাহার অর্দ্ধেক ভূমি তিনি নিষ্কর দান করেন নাই।

রাজা মনোহরের পুত্র রাজা রাজচন্দ্র রায় পিতৃ-পিতামহের পদাঙ্ক

* Toynbee's Administration of the Hooghly District.

অনুসরণ পূর্বক বহু দেব কীর্ত্তি স্থাপন করেন। দিনেমারদের ফেড্রিক-নগরে তিনি 'শ্রীরামসীতার' সেবা প্রতিষ্ঠা করিয়া তিন শত বিঘা



রাজা রাজচন্দ্র রায়ের বাদশাহী সনদ : ইহাতে ওয়ারেন হেষ্টিংসের স্বাক্ষর আছে

দেবোত্তর ভূমি প্রদান করায় এই স্থান শ্রীরামপুর নামে প্রখ্যাত হয়।

ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন যে, শ্রীপুর, মোহনপুর এবং গোপীনাথপুর শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহের সেবায় দেবোত্তর করিয়াছিলেন বলিয়াই গঙ্গাতীরস্থ শ্রীরামপুর তীর্থস্থান। কলিকাতায়ও উনি শ্রীশ্রীচিত্রেশ্বরী দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ ও তজ্জন্য বহু জমি দান করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গলার দেওয়ানী ভার গ্রহণ করিবার পর ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে, সম্রাট ২য় সাজাহানের মোহরাঙ্কিত এবং ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি বাদশাহী সনন্দ তিনি প্রাপ্ত হন। এই সনন্দে তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় রাজস্ব আদায় করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। মূল সনন্দখানি শ্রীরামপুরের উকীল শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট আছে। সনন্দখানি পাঠোদ্ধার করিয়া নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল :

"উত্তরাধিকার ক্রমে দশ আনার সরিক রাজচন্দ্র চৌধুরীকে জানান যাইতেছে, মহম্মদ আমীনপুর ও গয়রহ, মহালের তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত ও মালগুজারী যেরূপ ছিল, তদনুসারে তিনি কার্য্য করিবেন এবং প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিয়া মাস মাস নিজের স্বাক্ষরে বা তাঁহার মুন্সীর স্বাক্ষরে রাজস্ব পাঠাইবেন। তিনি অন্যায়রূপে এক দিরহামও কর বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। বাঙালা ১১৮৩ সন পর্য্যন্ত যে ভাবে কর আদায় হইয়া আসিয়াছে সেইভাবেই খাজনা আদায় করিতে পারিবেন। যে সকল জমি জলকর দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর মহত্তর আয়মা মদ্দমাস বা পীরোত্তর—এই সকল নিষ্করের উপর কোনও বন্দোবস্ত বা হুজুরেব অনুমতি ভিন্ন কোনও প্রকার বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন না। সীমা সহরদ্দ ঠিক রাখিবেন এবং চোর ডাকাতের হাত হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবেন। প্রজারা কিস্তি কিস্তি যে সকল টাকা দিবে, তাহা বর্ষে বর্ষে রাজ কোষাগারে চালান দিতে হইবে। সেলামী, নজর বা তহরী লইতে পারিবেন না। রাজকর

বাকী পড়িলে প্রাপ্য করের পরিমাণ জমি বিক্রয় করিয়া রাজ কর লওয়া হইবে।"

সম্রাট সাজাহানের শিলমোহর

(স্বাঃ) **ওয়ারেন হেষ্টিংস**

১০ই ডিসেম্বর, ১৭৭৮

১১৮৫ সাল ২৭ অগ্রহায়ণ।

পরবর্ত্তীকালে লর্ড ওয়ারেণ হেস্টিংসের বিরুদ্ধে যখন বিলাতে পার্লিয়ামেণ্টে মোকদ্দমা চলিতেছিল, তখন হেষ্টিংসের স্বপক্ষে এই দেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির প্রশংসাপত্র লওয়া হইয়াছিল। উক্ত মোকদ্দমার 'পেপার বুকে' রাজচন্দ্র হেষ্টিংসকে প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজচন্দ্রের পৌত্র হরিশ্চন্দ্র সেওড়াফুলিতে ভাগীরথী তীরে তাঁহার প্রথমা স্ত্রী, সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর অপমৃত্যু হওয়ায় উক্ত পাপ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য ১২৩৪ সালে পাষাণময়ী নিস্তারিণী নামক দক্ষিণ কালিকার মূর্ত্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেবা পরিচালনার্থে বহু দেবোত্তর সম্পত্তি দান করিয়া যান। মন্দির গাত্রে নিম্নোক্ত শ্লোকটি উৎকীর্ণ আছে ঃ

"স্বীয়ে রাজ্যে ভুজঙ্গশ্রুতিশিখরি
ধরা গণ্যমানে শকাব্দে।
কালী থাদাভিলাসী স্মরহরমহিষী
মন্দিরং তৎপ্রতিষ্ঠাং॥
চক্রে গঙ্গা সমীপে বিগতভল
ভয়ঃ শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্তঃ।
সম্মতির্যস্য রামেশ্বর ইতি
নৃপস্মৈত্রী-যত্নেন সার্ধং॥"

বৈদ্যবাটীর শ্রীযুক্ত পশুপতি বসু, তাঁহার পিতা শরৎচন্দ্র বসুর স্মৃতিরক্ষার্থে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে একটি সুন্দর ভবন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ ইহার উদ্বোধন করেন।

বৈদ্যবাটীর হাট বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ; এইরূপ হাট হইতে বহু অর্থ উপার্জ্জন হয় দেখিয়া ১২২৭ সালে মুন্সি গোলাম হোসেন নামক এক ধনী ব্যক্তি বৈদ্যবাটীর উত্তরে এক নূতন হাট বসান। হরিশচন্দ্র তাঁহার হাটটি বজায় রাখিবার যথেষ্ট চেষ্টা করেন, কিন্তু পরে উক্ত হাট রাখিতে অকৃতকার্য্য হওয়ায়, তিনি সেওড়াফুলিতে একটি নূতন হাট প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্বন্ধে ১২২৭ সালের ২২শে শ্রাবণ সমাচার দর্পণে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল; নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

"শ্রীযুক্ত মুন্সী গোলাম হোসেন মোং বৈদ্যবাটীর উত্তরে কোম্পানীর বাঁধা রাস্তার পূর্ব্বে গঙ্গার পশ্চিম তীরে নূতন গঞ্জ ও হাট বসাইতেছেন সেখানে দেকানঘর প্রায় দশবারখান প্রস্তুত হইতেছে আরও অনেক এমত উদ্যোগ অনেক হইতেছে এবং সেখানকার গঙ্গার পোস্তা বাধান যাইবে সেখানকার প্রজা লোকেরদিগকে আপন আপন ঘর বাড়ীর মূল্য দিয়া উঠাইয়া দিতেছেন তাহারা তাহার উত্তর চাপদানির মাঠে গিয়া বসতি করিতেছে এবং আপন অধিকারস্থ প্রজাদিগকে এমত শাসন করিয়া দিয়াছেন যে তাহারা কোন প্রকারে বৈদ্যবাটীর পুরাণ হাটে না গিয়া ঐ নূতন হাটে যায় এবং আপনার নূতন হাটে যদি কাহারও দ্রব্যাদি বিক্রয় না হয়, তবে সে দ্রব্য আপনি মূল্য দিয়া লইবার স্বীকার করিয়াছেন এবং কলিকাতায় ব্যাপারী লোকেরা যে জিনিষ পুরাণ হাটে খরিদ করিয়া নৌকা বোঝাই করিত ও কলিকাতাতে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া মুনফা করিত, তাহারা যদি পুরাণ হাটে না গিয়া নূতন হাটে যায় এবং সেরূপ জিনিষ না পায় তবে ঐ ব্যাপারিদের যে মুনফা তাহাতে লইত তাহা আপন সরকার হইতে দিবেন। ইহার দুই ফল নূতন গঞ্জ বসান ও পুরাণ গঞ্জ নষ্ট করা এবং বৈদ্যবাটীর জমিদারও পুরাণ হাট বাজায় রাখিবার কারণ অনেক চেষ্টা করিতেছেন।"

১২৩৯ সালের ফাল্গুন মাসে হরিশচন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন

করিলে তাঁহার দুই রাণী শ্রীমতী হরসুন্দরী দেবী ও শ্রীমতী রাজধন দেবী তাহার অনুমতি অনুসারে দুইটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন; এই দুইজন হইতেই বড় তরফ ও ছোট তরফ হইয়াছে। ছোট তরফের সম্পত্তি বর্ত্তমানে দৌহিত্রগণ ভোগ দখল করিতেছেন এবং কলিকাতার প্রসিদ্ধ এ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ এই রাজবংশের প্রধান ব্যক্তি। তিনি কৃতবিদ্য এবং বঙ্গের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। তিনি বহু দিন বৈদ্যবাটী মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন এবং নিজ ব্যয়ে সেওড়াফুলিতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

বৈদ্যবাটীর হাট বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ হাট ছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শত বৎসর পূর্ব্বেও কলিকাতার যাবতীয় তরিতরকারী, পাট, মাদুর, গুড়, নীল, আলু প্রভৃতি এই হাটে বিক্রয় হইত। পর্ত্তুগীজ ব্যবসায়ীগণ এই স্থানকে দীর্ঘাঙ্গ বা দিগঙ্গ বলিত বলিয়া, পূর্ব্বে এই স্থান উক্ত নামে পরিচিত ছিল বলিয়া মনে হয়। বৈদ্যাটীর হাট সেওড়ফুলিতে রাজা হরিশচন্দ্র স্থানান্তরিত করেন; তিনি পরলোকগমন করিলে কলিকাতার আশুতোষ দেব (সাতুবাবু) সেওড়াফুলিতে দেবগঞ্জ নামে একটি হাট প্রতিষ্ঠা করেন। সাতুবাবু * উক্ত স্থানে হাট প্রতিষ্ঠা করায় বঙ্গদেশে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ আন্দোলন হয়। আজও উক্ত গঞ্জ ছাতুগঞ্জের বাজার বলিয়া চলিতেছে। এই গঞ্জ প্রতিষ্ঠার সময় 'সমাচার দর্পণ' পত্রে (৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৪৫) যে সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত হইল। এই সংবাদ পাঠে তৎকালীন বঙ্গের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ কিরূপ উৎপীড়ন করিতেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

"জিলা হুগলীর সেওড়াফুলির জমিদার ৺প্রাপ্ত হরিশচন্দ্র রাজা

* ইহারাই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশে 'বাবু' বলিয়া অভিহিত হন; তৎকালে বাবু বলিলে কেবল সাতুবাবু, লাটুবাবু ইহাদের দুই ভাইকেই বুঝাইত।

বৈদ্যবাটীর পুরাতন হাটের স্থান সঙ্কীর্ণ প্রযুক্ত অথবা ঐ হাটে দুই তিন জমিদারের সম্পর্ক থাকাতে বা অন্য কোন কারণ প্রযুক্তই হউক অনেক ব্যয় ব্যসনপূর্ব্বক দরবার করত আপনার জমিদারী সেওড়াফুলিতে ঐ পুরাণ হাট ভাঙ্গিয়া বসান। বিশেষত রাজা অনেক টাকা ব্যয় পূর্ব্বক বহু সংখ্যক ঘর প্রস্তুত করিয়া ঐ সোনার হাট বসাইবা মাত্র, স্বর্গীয় হাট করিতে গেলেন। এইক্ষণে মোদের বিষয় যে, এই হাটের উত্তরাধিকারিণী দুই রাজ মহিষী দুই পোষ্য পুত্র করিয়াছেন ঐ বালকেরা এইক্ষণে নাবালক এবং রাণীরাও অবলা জমিদারীও হস্তান্তর ইতিমধ্যে কলিকাতা নিবাসী অতি ধনাঢ্য বাবু শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব মহাশয় ঐ হাটের নিকটস্থ দেবগঞ্জ নামক এক গঞ্জ বসাইয়াছিলেন, কিন্তু অনেক টাকা ব্যয়ভূষণ করিয়াও তাহাতে প্রায় তাদৃশ্য কৃতকার্য্য না হওয়াতে এইক্ষণে ঐ নাবালক বালক ও ঐ অবলারদের হাটের উপর বলপ্রকাশ করত ঐ হাট ভাঙ্গিয়া আপনারদের ভগ্ন দেবগঞ্জ পুরণ করিতেছেন এবং শুনা গিয়াছে কলিকাতাস্থ ব্যাপারী লোকেরদিগকে অনেক টাকা দিয়া ঐ দেবগঞ্জের নীচে ভূরি নৌকা শনি মঙ্গলবারে বন্ধন করিয়া রাখেন যদ্যপি কলিকাতাস্থ ব্যাপারি লোক রাজার হাটে না যায়, সুতরাং রাইয়ত লোকের দ্রব্যাদি বিক্রয় না হইলে দেববাবুর হাটে আসিতেই হইবেক। ইহাতে দেববাবুর কিছু পৌরুষ নাই উক্ত রাজা বর্ত্তমান থাকিলে প্রশংসা হইত।"

১২৬২ সালে যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থগুলি পরিভ্রমণ করিয়া "তীর্থ ভ্রমণ" শীর্ষক একখানি পুস্তক রচনা করেন, উক্ত পুস্তকে বৈদ্যবাটী সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

"এই চড়াতে আহারাদি করিয়া ১ ক্রোশ আসিয়া গরুটির বাগ, পূর্ব্বপাড় নবাবগঞ্জ তাহার পর পাণ্ডার ঘাট, পরে এক ১ ক্রোশ বৈদ্যবাটী। এই স্থানে নিমাই তীর্থের ঘাট, ইহার পার্শ্বে দীর্ঘাজ বা

দিগঙ্গ কহে। তরকারীর হাট—কলা, আলু, অধিক বিক্রয় হয়। পূর্ব্ব পাড় টিটাগড় বাগান, পশ্চিম পাড়ে সেওড়াফুলি, নিস্তারিণীর বাটী। তারপর দেবগঞ্জ, সাতুবাবুর বাজার।"

সুদূর অতিতকাল হইতে নিমাইতীর্থের ঘাটে স্নান করা এক মহাপুণ্যজনক ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত। নিমাইতীর্থকে কেন্দ্র করিয়া এই স্থানে তিনটী মেলা প্রতি বৎসর হইয়া থাকে, তন্মধ্যে পৌষ সংক্রান্তি ও বারুণী উপলক্ষে একদিন এবং মাঘী পুর্ণিমায় এক সপ্তাহ যাবৎ মেলা বসিয়া থাকে। উক্ত মেলায় দ্রব্যাদি ক্রয় ও স্নান করিবার জন্য প্রতি বৎসর বিশ হাজারের অধিক যাত্রীর সমাগম হয়। পূর্ব্বে যাত্রী সংখ্যা আরও অধিক হইত এবং একমাত্র উড়িষ্যা প্রদেশ হইতেই আট দশ হাজার যাত্রী আসিত। ১২২৭ সাল হইতে ১২৩০ সাল পর্য্যন্ত বারুণী উপলক্ষে কলেরায় উড়িষ্যার শত শত ব্যক্তি বৈদ্যবাটীতে পরলোকগমন করে; এই সম্বন্ধে ১২২৭ সালের ২৬শে চৈত্র তারিখে প্রকাশিত সমাচার দর্পণের একটী সংবাদ পাঠকগণের অবগতির জন্য উদ্ধৃত হইল:

মহামহাবারুণী

"গত শনিবারে মহামহাবারুণীর যোগে গঙ্গাস্নানে অনেক ২ দেশীয় লোক আসিয়াছিল তাহারা অধিক পথ গমনেতে দুর্ব্বল হইয়া অতিশয় প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপেতে উত্তপ্ত জল পান করিয়া ওলাউঠা রোগে অনেক লোক পথে ও মোকাম বৈদ্যবাটিতে মরিয়াছে এবং তদ্দেশস্থ লোকেরা অতিশয় নির্দ্দয় ঐ বৈদ্যবাটিতে যে ২ লোকের ওলাউঠা হইয়াছিল, তাহারা অবসন্ন হইলে তাহার সঙ্গী লোকেরা ত্যাগ করিয়া পলাইল। ইহাতে গঙ্গার তীরে যে ২ অবসন্ন লোক ছিল, তাহার মধ্যে অনেকে জোয়ার সময়ে সজীব গঙ্গা পাইয়াছে।"

নিমাইতীর্থের পুরাতন ঘাটটী ভগ্ন হইলে চন্দননগরের কাশীনাথ কুণ্ডু উক্ত ঘাটটি সংস্কার করিয়া ঘাটের উপর যাত্রিগণের সুবিধার্থে একটী

সুবৃহৎ চাঁদনী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কাশীনাথ কুণ্ডুর দলিলখানি ২৮শে বৈশাখ ১২৩২ সালে লিখিত হইয়াছিল। ১৩৪৮ সালে এই ঘাট হইতে দশম শতাব্দীর পাল রাজত্বকালের একটি অনাদৃত সূর্য্যমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কৃষ্ণপ্রস্তরে খোদিত সূর্য্যমূর্ত্তিটি উচ্চতায় প্রায় দুই হাত এবং সূর্য্য বা বিষ্ণু



সূর্য্য মূর্ত্তি

রথে আরোহণ করিয়াছেন এবং সপ্তাশ্ব রথখানি বহন করিতেছে, ইহাই মূর্ত্তিটিতে প্রকটিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে বিষ্ণুই সূর্য্য দেবতারূপে

ভারতে পূজিত হইতেন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে মাক্সমূলার সাহেব ঋগ্বেদের ইংরাজি অনুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন :

"The stepping of Vishnu is emblematic of the rising, the culminating and setting of the sun."

পাল রাজত্বকালের এই সূর্য্যমূর্ত্তিটি আবিষ্কৃত হওয়ায় এই স্থানে যে পূর্ব্বে পাল রাজত্বে সমৃদ্ধ ছিল, তাহাই প্রমাণিত হয়। বর্ত্তমানে এক সন্ন্যাসী উক্ত সূর্য্যমূর্ত্তি প্রত্যহ পূজা করেন; বহুবার উহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে; কিন্তু সন্ন্যাসী মূর্ত্তিটিকে স্থানান্তরিত করিতে দেন নাই। সারদাচরণ প্রত্নশালার কর্ত্তৃপক্ষ ইহার তত্ত্বাবধান করেন।

হুগলী জেলায় পূর্ব্বে ডাকাতির প্রকোপ ছিল। এই প্রসঙ্গে পুরাতন সংবাদপত্র হইতে একটা সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি : *

"চাতরা হইতে এক ক্রোশ ব্যবহিত পশ্চিমাংশে হরিপুর নামক গ্রামে ২০শে চৈত্র রবিবার রাত্রিযোগে কার্ত্তিক পোদ্দারের বাড়ীতে অতি নিদারুণ ডাকাইতি হইয়াছে। দস্যুরা তকমাচাপরাশ বন্দুকাদি সহিত রাত্রি একাদশঘণ্টাকালে গ্রামের নিকট যাইয়া বন্দুকধ্বনী করিয়া চৌকিদার চৌকিদার বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করে এবং কোম্পানী বাহাদুরের লোক বলিয়া পরিচয় দেয় তাহাতেই চৌকিদার ও ফৌজদারী গোমস্তা আসিয়া উপস্থিত হয়, দস্যুরা তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া কহিল কি করিস্ নানা স্থানে ডাকাইতি কেন হয়, দারোগা কোথায়, চৌকিদার কহিল এখান হইতে সিঙ্গুরথানা দেড় ক্রোশ ব্যবহিত···দস্যুরা চৌকিদারকে ও ফৌজদারী গোমস্তাকে বন্ধন করিয়া ফেলিল।······ফৌজদারী গোমস্তা চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল গ্রামস্থ লোকসকল বাহির হও আর কমলা পাইক আরকি দেখিস ইহারা সরকারী লোক নহে।···কমলা পাইক পূর্ব্বে চাতরা

* "সংবাদ ভাস্কর"—১লা চৈত্র, ১২৫৫—৫৮৪ সংখ্যা—১৮৪৯, ১৩ই মার্চ।

নিবাসী গোস্বামী বাবুদিগের বাটীতে চাকর ছিল।…দারোগা কমলা পাইক সহিত তাহারদিগকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং ঐ গোলমালে দুই দস্যু বহুগুনা পরিপূর্ণ আভরণ লইয়া উত্তরাভিমুখে পলায়ন করিয়াছিল কিন্তু শেওড়াফুলির দশ আনির জমিদার যোগীন্দ্রচন্দ্র রায়ের চৌকিদাররা



মধুসূদন গুপ্ত

তাহাদের ধৃত করিয়া দারোগার হস্তে দিয়াছে শুনিলাম দস্যুদলের মধ্যে কোম্পানী বাহাদুরের নামকাটা সিপাহি বিমা কোম্পানিদিগের এবং বৈকুণ্ঠবাসী ককরেল হৌসের চাপরাশধারি লোক।"

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের লইয়া ডানকুনীর খাল খননের আয়োজন করা হয়। "মিঃ পি এস, ল্যাউডন এসিস্টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হুগলী, শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন সিংহ, শিবপুর, শ্রীযুক্ত বাবু হরিশচন্দ্র দে শ্রীরামপুর, শ্রীযুক্ত বাবু গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী শ্রীরামপুর, শ্রীযুক্ত বাবু কালীধন চট্টোপাধ্যায় উত্তরপাড়া"*

* "সাধারণী" ১২৮১।২৩শে ফাল্গুন হইতে গৃহীত।

এই স্থানের শ্রীশ্রীভদ্রকালী অতি প্রাচীন ও জাগ্রত দেবতা। পুষ্করিণী খননকালে এই মূর্ত্তিটি আবিষ্কৃত হয় এবং এক সন্ন্যাসী উহাকে পূজা করিতেন। সন্ন্যাসী পরলোকগমন করিলে রাজা মনোহর রায় উক্ত স্থানে ভদ্রকালীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তারকেশ্বরের মোহান্তের হস্তে ইহার পরিচালনার ভার দেন। তারকেশ্বরের খাতাপত্রে ইহা বৈদ্যবাটীর মঠ বলিয়া লিখিত আছে। পরিচালকদের অবহেলায় ইহার যাত্রীনিবাস বর্ত্তমানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

বাঙ্গলার বাহিরে বৈদ্যবাটীর রায় সাহেব গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক অতুলচন্দ্র দত্ত রায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। গিরিশ বাবু সিমলা কালীবাড়ি ও তত্রস্থ দুর্গাপূজার প্রাণ স্বরূপ ছিলেন। অতুল বাবু আগ্রা সেণ্ট জন্স কলেজে অধ্যাপক করিতেন এবং তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হইলে সর্ব্বপ্রথম যিনি শবব্যবচ্ছেদ করিয়াছিলেন, সেই পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত এই স্থানের বক্সী-বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষাকল্পে বৈদ্যক-শ্রেণী ছিল। পণ্ডিত মধুসূদন উক্ত বৈদ্যক শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। পরে বৈদ্যক শ্রেণীর অধ্যাপক ক্ষুদিরাম কবিরাজ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিলে মধুসূদন গুপ্ত ৬০৲ বেতনে তাহার স্থলে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জানুয়ারী সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক শ্রেণী লোপ পায় এবং মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হইলে, তিনি ইহার সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন মেডিক্যাল কলেজ খোলা হয় এবং যাহারা কলেজে ভর্ত্তি হন, তাহারা মাসিক সাত টাকা হইতে বার টাকা পর্য্যন্ত বৃত্তি পান। বিদেশী চিকিৎসাবিদ্যা শিখিতে সর্ব্বপ্রথম কেহই অগ্রসর হন নাই। সেইজন্য মাসিক বৃত্তি দিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা হয় এবং পঞ্চাশটি

যুবক প্রথম কলেজে ভর্ত্তি হন। যাঁহারা সর্ব্বপ্রথম ভর্ত্তি হন তাহাদিগকে ফাউণ্ডেশন সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

পণ্ডিত মধুসূধনের ছাত্রবন্ধু শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী (শ্রীরামপুর) এবং তাঁহার পুত্র গোপালকৃষ্ণ গুপ্ত মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসের ছাত্র ছিলেন এবং উভয়ে কলিকাতা হইতে পদব্রজে তিরিশ মাইল পথ হাঁটিয়া প্রত্যহ দেশে যাতায়াত করিতেন। তাঁহাদের একটি ডায়েরী শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তীর পৌত্র শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট আছে।

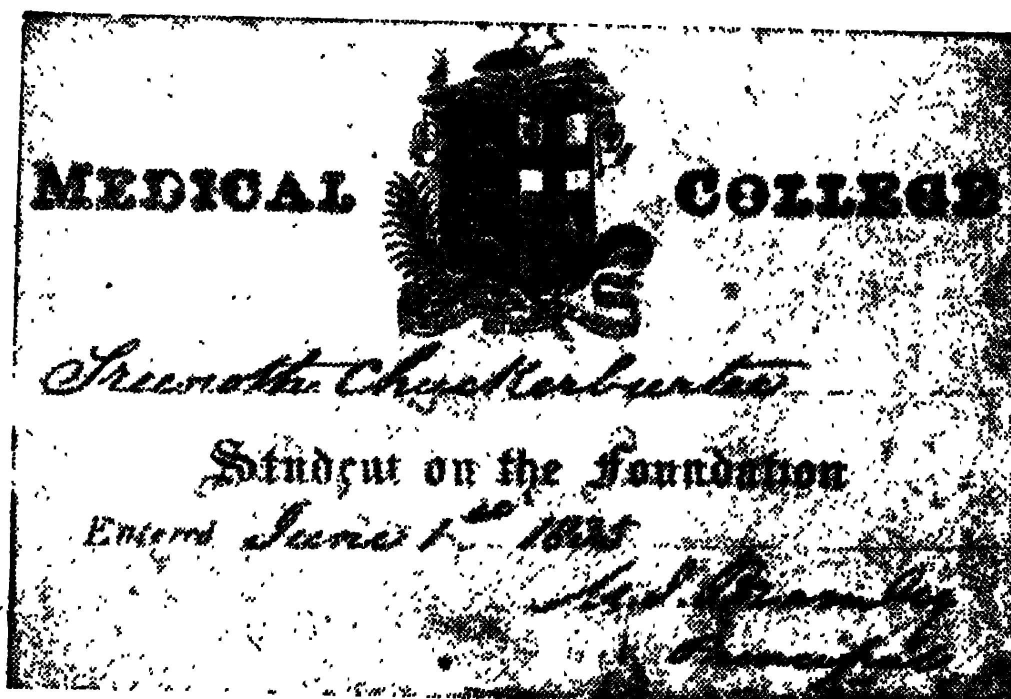
১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী মধুসূদন তাঁহার উমাচরণ শেঠ, দ্বারকারাথ গুপ্ত; রাজকৃষ্ণ দেব *ও অন্য একজন ছাত্রকে লইয়া শবব্যবচ্ছেদ করেন। মেডিক্যাল কলেজে সেইজন্য মধুসূদনের একটি তৈলচিত্র রক্ষিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে কলেজের শতবার্ষিকীতে প্রকাশিত বিবরণী হইতে নিম্নোক্ত কথাগুলি জানা যায়:

"It was in commemoration of this act that Dr. Drinkwater Bethune, a member of the Supreme Council of India presented to the college, in 1850. a potrait of Madhusudan painted by Mrs. Belnos" (page 13).

মধুসূদন হুপারের একখানি চিকিৎসা-গ্রন্থ (Hoopers Anatomists Vade-Mecum") সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া একসহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। এতদ্ব্যতীত ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে 'লণ্ডন ফার্মাকোপিয়া' ও ১২৫৯ সালে এনাটোমির বঙ্গানুবাদ করিয়া শারীরবিদ্যা ১ম ভাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি গতায়ু হন। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি বৈদ্যবাটিতে প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব করিয়া থাকেন।

* ছাত্রদের মধ্যে প্রথম রাজকৃষ্ণ দেব শব ব্যবচ্ছেদ করেন।

পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার জন্য বৈদ্যবাটী হইতে বিলাতে যান এবং ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতায় ব্যবসা করেন। তৎকালে কলিকাতার তিনি অন্যতম প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। **Original Abode of Indo-Aryan Races** নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি পরলোকগমন করেন। ইহার পর ডাঃ শ্যামাপ্রসন্ন গুপ্তও বিলাত হইতে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের গৃহ শিক্ষক সাব-জজ বিহারীলাল বন্দোপাধ্যায়, ডাঃ মনোহর মুখোপাধ্যায় (সিভিল-



মেডিক্যাল কলেজের 'প্রতিষ্ঠা দিবসে' ছাত্রদিগকে প্রদত্ত সার্টিফিকিটের প্রতিলিপি

সার্জেন), কেশবচন্দ্র হাজরা (জামতাড়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক) ক্ষেত্রকুমার গুপ্ত, সূর্য্যকুমার আঢ্য, নিখিলেশ সেন প্রভৃতি ব্যক্তিগণ এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈদ্যবাটীতে পূর্ব্বে মুন্সেফ কোর্ট ছিল এবং এই স্থানের পণ্ডিত অভয়চরণ তর্কপঞ্চানন ১৮৩১ হইতে ১৮৩৬

খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৈদ্যবাটীতে মুন্সেফ ছিলেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তিনি হুগলী কলেজের সুপারেণ্টেণ্ডিং পণ্ডিত নিযুক্ত হন এবং ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নবেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি 'দায়রত্নাবলী' নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

টেকচাঁদ ঠাকুরের (প্যারীচাঁদ মিত্র) নিবাস হুগলী জেলার পানিশেওলায় হইলেও, এই বৈদ্যবাটী গ্রামে বসিয়া তিনি বঙ্গভাষায় প্রথম উপন্যাস "আলালের ঘরের দুলাল" রচনা করেন।* আলালের ঘরের দুলাল সরল বাঙলা গদ্যের আদর্শ, ইহার ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এতই প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন যে, উত্তরকালে তিনি লিখিয়াছিলেন—"যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন।"

টেকচাঁদ ঠাকুরের রচনার নিদর্শন নিম্নে কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল:

"কিয়ৎক্ষণ পরে বর মণিরামপুরে গিয়া উত্তীর্ণ হইল—বর দেখতে রাস্তার দোধারি লোক ভেঙ্গে পড়িল—স্ত্রীলোকেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—ছেলেটির স্ত্রী আছে বটে—

"বৃষ্টি খুব এক পশলা হইয়া গিয়াছে পথঘাট পেঁচ পেঁচ সেঁত সেঁত করিতেছে। আকাশ নীল মেঘে ভরা, মধ্যে হড় মড় শব্দ হইতেছে বেঙগুলা আশেপাশে বাঁওকো বাঁওকো করিয়া ডাকিতেছে।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া হইতে প্রথম বারোয়ারী বা সর্ব্বজনীন পূজা আরম্ভ হয়। ১২২৮ সালের শ্রাবণ মাসে বৈদ্যবাটীতে সর্ব্বজনীন মাতঙ্গী পূজার অনুষ্ঠান হয় এবং হাজার হাজার নরনারী বহু দূরদেশ হইতে উক্ত পূজা দেখিতে আসেন। এই পূজার

* Hooghly District Gazetteers.

সম্বন্ধে ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট তারিখের 'সমাচার-দর্পণে' যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

"বৈদ্যবাটীর বারএয়ারী মাতঙ্গী পূজা হইতেছে ২৩শে শ্রাবণ সোমবার পূজা হইয়াছিল কিন্তু ২৬ রোজ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত প্রতিমা ছিলেন তাহাতে প্রতিমার সৌন্দর্য্য অতি আশ্চর্য্য এবং পূজার পারিপাট্য বিত্তশাঠ্য ও চিত্তকাপট্য রহিত এবং গীতাবাদ্য প্রতিবাদ্যকরণ নিষ্প্রয়োজন, সেই ইহার আদ্য প্রয়োজন। এই পূজার পূর্ব্বাপর পাঁচ সাতদিন রথযাত্রার মত লোকযাত্রা হইয়াছিল বিশেষত ইহাতে আটপ্রকার সং হইয়াছিল সে অতি অদ্ভুত তাহা দেখিলে কৃত্রিম জ্ঞান প্রায় হয় না।"

শেওড়াফুলির হাটে বহু প্রাচীন কাল হইতে "ব্রহ্মা পূজা" অনুষ্ঠিত হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। তদুপলক্ষে হাটে যাত্রা, পুতুল নাচ প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয়।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যবাটী মিউনিসিপ্যালিটি প্রথম স্থাপিত হয় এবং শেওড়াফুলি রাজবংশের গিরীন্দ্রচন্দ্র রায় এই মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। শ্রীযুক্ত অমর সেন মিউনিসিপ্যালিটির বর্ত্তমান চেয়ারম্যান। মিউনিসিপ্যাল সীমাবেষ্টিত স্থানের পরিমাণ মাত্র সাড়ে তিন বর্গমাইল এবং ইহা চারিটি ওয়ার্ডে বিভক্ত। ইহার মধ্যে দশ মাইল পাকা রাস্তা ও কুড়ি মাইল কাঁচা রাস্তা আছে এবং চারি হাজার বাড়ি আছে। 'অকল্যাণ্ড-হাউস' নামক এক ইতিহাস প্রসিদ্ধ ভবন এই স্থানে আছে; নীলকর সাহেবগণ এই ভবন নির্ম্মাণ করেন। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু বৎসর এই সুরম্য বাগান-বাটীতে বাস করিয়াছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক বিজলী বাতির প্রবর্ত্তন হইলে ডক্টর মেঘনাদ সাহা সর্ব্বপ্রথম এইস্থানের আলো জ্বালাইয়া ছিলেন।

বৈদ্যবাটীর বনমালী মুখার্জ্জী ইনষ্টিটিউসন, কো-অপারেটিভ সোসাইটি, [illegible]মিক নাট্য সমিতি, সারদাচরণ মিউজিয়ম, মহামায়া সাহিত্য-মন্দির,

হবিসাধন সমিতি, যুবক সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি এই স্থানের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন 'কেয়া' নামে একখানি মাসিক সাময়িকী এই স্থান হইতে ১৩৪৭ সাল হইতে প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় ইহা সম্পাদনা করেন। বর্ত্তমানে চণ্ডিচরণ কুণ্ডু, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সুরেন রায়, কিশোরীমোহন দাস ও রামবিচ আগরওয়ালা স্থানীয় হাটের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী।

পূর্ব্বে পদব্রজে দেশদেশান্তর হইতে হিন্দুগণ তারকেশ্বরে তীর্থ করিতে যাইত বলিয়া, এই স্থানে যাত্রীদের জন্য ডাক বাংলো স্থাপিত হইয়াছিল, * ইহাই এই অঞ্চলের প্রাচীনতম বাংলো, আজো বহু যাত্রী বৈদ্যবাটী হইতে গঙ্গাজল লইয়া পদব্রজে তারকেশ্বর যাতায়াত করেন। পূর্ব্বে এই স্থানে বড় থানা (Police Station) ছিল, কিন্তু শ্রীরামপুরে থানা স্থাপিত হইলে, এই স্থানের থানা সিঙ্গুরে স্থানান্তরিত হয় এবং বর্ত্তমানে মাত্র একটি ক্ষুদ্র ফাঁড়ি (Police Out Post) বৈদ্যবাটীতে আছে।

আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত একটি গ্রাম। ইহা অক্ষাংশ ২২°৪৯' উত্তর এবং ৮৭°৪৬' পূর্ব্বে অবস্থিত। দারকেশ্বর নদীর দক্ষিণ তীরে এবং আরামবাগ হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। এই

বালি

স্থানটিকে অনেক সময় 'বালি দেওয়ানগঞ্জ' বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই গ্রামের পার্শ্বে দেওয়ান গঞ্জে সপ্তাহে দুইবার করিয়া একটি বৃহৎ হাট বসে, সেইজন্য বহু লোক ইহাকে বালি-হাট বলিয়াও অভিহিত করিয়া থাকে। ইহা গোঘাট থানার অন্তর্গত এবং সিল্ক ও সুতার কাপড় প্রস্তুতের জন্য এই স্থান পূর্ব্বে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও কিছু কিছু কাপড় এই অঞ্চলে প্রস্তুত হয়। গ্রামবাসীগণ অধিকাংশই চাষবাসের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

---

* Rural Annals in Bengal

ভুরিশ্রেষ্ঠ

১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে পাটনার স্থবেদার বিজলদেব নামে এক রাজার আজ্ঞায় ভারতবর্ষের ভৌগলিক বিবরণ ও সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত সমন্বিত একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল; গ্রন্থখানির নাম 'দেশাবলী বিবৃতি' এবং পণ্ডিত জগমোহন ইহা রচনা করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় স্বর্গতঃ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত গ্রন্থখানি আবিষ্কার করেন। এই গ্রন্থখানি আবিষ্কারের ফলে দক্ষিণ রাঢ়ের কিয়দংশ হিন্দু রাজত্বকালে যে ভান দেশ নামে পরিচিত ছিল তাহা জানিতে পারা যায়।

"কংসাবত্যাহি সরিতঃ শিলাবত্যা হি ভূমিপ।
উভয়োর্ম্মধ্যবর্ত্তী চ ভানকো বিশ্রুতো ভুবি॥
বকদ্বীপাৎ পূর্ব্বভাগে মণ্ডলঘাটস্থ পশ্চিমে।
ত্রয়োদশ যোজানৈশ্চ মিতো হি ভানদেশকঃ॥"

অর্থাৎ কংসাবতী, শীলাবতী, বকদ্বীপ ও মণ্ডলঘাট, এই চতুঃসীমান্তবর্ত্তী প্রদেশ তৎকালে ভানদেশ নামে পরিচিত ছিল।

ভানদেশে চন্দ্রকোণা, ভূরিশ্রেষ্ঠ ও বলিয়ার নামে তিনটি নগর ছিল; উক্ত নগরগুলির মধ্যে চন্দ্রকোণা এবং ভূরিশ্রেষ্ঠ অদ্যাপি মেদিনীপুর জেলায় ও হুগলী জেলায় যথাক্রমে বিদ্যমান আছে; কিন্তু বলিয়ার নগর যে কোথায় ছিল, ঐতিহাসিকগণ তাহা এখনও সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই।

দামোদর তীরে অবস্থিত ভূরিশ্রেষ্ঠ বর্ত্তমানে ভূরসুট নামে একটি সামান্য গ্রাম হইলেও, প্রাচীনকালে ইহা দক্ষিণ রাঢ়ের রাজধানী এবং একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-বন্দর বলিয়া খ্যাত ছিল। ভূরিশ্রেষ্ঠ শব্দের অর্থ 'বহু বণিকের বসতি'; ভূরি অর্থাৎ বহু, শ্রেষ্ঠী মানে বণিক্ (ভূরি+শ্রেষ্ঠী) অর্থাৎ যে স্থানে একত্র বহু বণিক্ বসবাস করেন।

পরবর্ত্তীকালে ভূরিশ্রেষ্ঠের অপভ্রংশে ভূরস্থট নামের উৎপত্তি হইয়াছিল, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

একাদশ শতাব্দীতে রচিত কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নামক নাটকেও ভূরিশ্রেষ্ঠ নামটি দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বেও যে এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল তাহা সুনিশ্চিত। নিম্নে 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটক হইতে দুই লাইন উদ্ধৃত হইল :

"গৌড়ং রাষ্ট্রমুত্তমং নিরুপমা তথাপি রাঢ়াপুরী
ভূরিশ্রেষ্ঠিক নামধামপরমং তত্রোত্তমা ন পিতঃ।"

মুসলমান রাজত্বকালে ভূরস্থট একটি পরগণা হইয়াছিল; ৯১৩ শকে এই স্থানে পাণ্ডুদাস নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে গৌড় পাল রাজাগণের অধীনে ছিল, কিন্তু পাণ্ডুদাস স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন কি না, বর্ত্তমানে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি কাহাকেও কর দিতেন না। রাজা পাণ্ডুদাসের রাজ্য পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং তাঁহার নামানুসারে পরবর্ত্তীকালে পাণ্ডুয়া নামের উৎপত্তি হইয়াছিল। তিনি বুদ্ধদেবের পিতৃব্য অমৃতোদনের পুত্র পাণ্ডুশাক্যের বংশধর ছিলেন।

রাজা পাণ্ডুদাসের উৎসাহে বলরাম পণ্ডিতের পুত্র শ্রীধর পণ্ডিত বৈশেষিক দর্শনের প্রশস্তপাদ ভাষ্যের "ন্যায়কন্দলী" নামক একখানি টীকা রচনা করেন। উক্ত টীকা অদ্যাপি বৈশেষিক দর্শনের একখানি প্রধান গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত। ১০৯২ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণমিশ্র চণ্ডেল রাজার অভ্যর্থনার্থ যখন "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" নামক নাটক রচনা করেন, তখন ভূরিশ্রেষ্ঠে নানা শাস্ত্রের আলোচনা হইত। ভূরিশ্রেষ্ঠের ব্রাহ্মণগণ কুমারিলের মত মানিতেন না; প্রভাকর মতের শালিকনাথী পুঁথি তাঁহাদের পাঠ্য ছিল এবং তাঁহারা আপনাদিগকে অতি পবিত্র ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেন। মধ্যদেশী ব্রাহ্মণগণ এই স্থানের প্রধান অধিবাসী

ছিলেন ; এই সম্বন্ধে 'দেশাবলী-বিবৃতি'তে লিখিত আছে যে, "মধ্যদেশী ব্রাহ্মণোণাং বসতির্ব্বৈ পুরা কৃত্য।"

মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণ ও মধ্যশ্রেণী কায়স্থ বঙ্গদেশের মধ্যে একমাত্র মেদিনীপুর জেলায় দৃষ্ট হয়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশনে, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছিলেন—"রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক ভিন্ন অনেক ব্রাহ্মণ বল্লাল সেনের পূর্ব্বেও মধ্যদেশ হইতে আসিয়া দক্ষিণ রাঢ় ও উড়িষ্যায় বাস করিয়াছিলেন। ইহারাই আমাদের মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণের আদি বৃত্তান্ত লইয়া অনেক জল্পনা-কল্পনা শুনা যায়। সে সব ঠিক নয়। রাঢ়ী শ্রেণীদের সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই। রাঢ়ে ও বরেন্দ্রে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানেরা বসতি করার পর মধ্যদেশ হইতে আসিয়া যে সকল ব্রাহ্মণ এদেশে আসিয়া বাস করেন, তাম্রপট্ট ও শিলালিপিতে উহাদিগকে 'মধ্যদেশবিনির্গত' বলিয়া লেখা আছে।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও ভূরসুট একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল ; বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্র রায় ভুরসুট রাজ্য অধিকার করিয়া এই স্থান মুসলমান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। সেই সময়ে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ভুরসুটের শাসনকর্ত্তা ছিলেন ; বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তার সহিত তাঁহার মনান্তর হওয়ায়, মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্র ভূরসুট দুর্গ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া এই স্থানকে মুসলমানদের হস্তে তুলিয়া দেয়। নরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র বঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকর এই স্থানে ১৬৩৪ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'অন্নদামঙ্গলে' নিম্নোক্ত পিতৃপরিচয় দিয়াছেন :

"ভুরসুট পরগণায় নৃপতি নরেন্দ্র রায়
মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে।
ভারত তনয় তাঁর অন্নদা মঙ্গল সার
কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥"

বৰ্দ্ধমানরাজ কর্ত্তৃক ভূরস্থট পরগণা বাজেয়াপ্ত করা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইল :

Kirtti Chanda Rai inherted the ancestral Zamendari and added to it the Parganas of Chetwa, Bhursut, Barda and Manohar Sahi. He was bold and adventurous and fought with the Rajas and dispossessed them of their petty Kingdoms.*

ষোড়শ শতাব্দীতে মদন মুখোপাধ্যায় ভূরস্থটে রাজত্ব করিতেন। তিনি পরলোকগমন করিলে, তাঁহার পুত্র রাঘব মুখোপাধ্যায় শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন। তৎপরে দেবানন্দ ও তাঁহার পুত্র প্রয়াগ যথাক্রমে শাসনভার গ্রহণ করেন। প্রয়াগ মুসলমান সম্রাটের নিকট হইতে 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। তাহার পর তৎপুত্র জগদীশ এবং জগদীশের পুত্র গোপাল এই স্থানে রাজত্ব করেন। গোপালের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র রামনারায়ণ শাসনকার্য্য চালনা করেন। অতঃপর রামনারায়ণের পুত্র রমাকান্ত সর্ব্বপ্রথম রাজ্যাধিকার স্থাপিত করেন। তিনি গতাসু হইলে তাহার পুত্র নরেন্দ্রনারায়ণ রায় শাসনভার গ্রহণ করেন, কিন্তু বর্দ্ধমানের মহারাজা এই রাজ্য যে বাজেয়াপ্ত করেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শোভা সিংহের হস্তে বর্দ্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম রায় নিহত হয়। তাঁহার পুত্র জগৎরাম বর্দ্ধমানের শাসনভার তৎস্থলে গ্রহণ করেন এবং ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহ রক্ষা করিলে, তাঁহার পুত্র কীর্ত্তিচন্দ্র রায় বর্দ্ধমানের শাসন ভার প্রাপ্ত হন। মুসলমান রাজত্বকালে বঙ্গদেশে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য হিন্দুদিগের দ্বারা শাষিত হইত, কিন্তু কীর্ত্তিচন্দ্র উক্ত হিন্দু রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত করিয়া উহার বহুলাংশ মুশলমান শাসনকর্ত্তার অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন এবং বহু জমিদারী তিনি নিজ জমিদারীভুক্ত করিয়া লন।

* Statistical Account of Bengal, Page 41

ভূরস্নুটের শাসনকর্ত্তা নরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র ভারতচন্দ্র রায় তাঁহার পিতৃসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইলে, মাতুলালয়ে গমন করিয়া বিদ্যাভ্যাস করেন। মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জমিদার রামরাম দত্ত মুন্সী মহাশয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি পারসী অধ্যায়ন করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে তিনি ১১৩৪ সালের রচিত "সত্যপীরের কথা" নামক পাঁচালী কবিতায় যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি ঃ

দেবের আনন্দ ধাম, দেবানন্দপুর গ্রাম
কহে অধিকরী রাম-রাম দত্ত মুন্সী।
ভারতে নরেন্দ্র রায় দেশে যার যশ গায়,
হয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াইল পারসী ॥

ভারতচন্দ্র কুড়ি বৎসর বয়সে পুনরায় তাঁহাদের রাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য ভূরস্নুটে যান, কিন্তু তথায় তিনি বর্দ্ধমানের রাজা কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হন। কিছুকাল পরে তিনি কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া কটকে চলিয়া যান এবং তথায় মাহারাষ্ট্রীয়দের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ফরাসীদের অধিকৃত চন্দননগরে দেওয়ান ইন্দ্রচন্দ্রের আশ্রয় লাভ করেন। এই স্থান হইতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে মাসিক চল্লিশ টাকা বৃত্তি দিয়া নিজ রাজসভায় লইয়া যান এবং 'অন্নদামঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর' শ্রবণে প্রীতি হইয়া 'রায়গুণাকর' উপাধি এবং মূলাজোড়ে বহু নিষ্কর সম্পত্তি প্রদান করেন। ভারতচন্দ্র 'রসমঞ্জরী' নামক আর একখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে ১৬৮২ শকাব্দে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

ভূরস্নুটে রায় বংশের বংশধরগণ অদ্যাপি সামান্য ব্রাহ্মণরূপে বসবাস করিতেছেন দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্দ্ধমানাধিপতি তেজচন্দ্র বাহাদুরের দেওয়ান প্রাণচন্দ্র 'হরিহর মঙ্গল' সংগীত নামক একখানি সুবৃহৎ মঙ্গলকাব্য মহারাজের আদেশে রচনা করেন ; এই কাব্যে তেজচন্দ্রের জমিদারী বর্দ্ধমানের একটি কবিতা আছে, তন্মধ্যে হুগলী জেলার বহু স্থানের নাম আছে। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে 'হরিহর মঙ্গল সংগীত' প্রকাশিত হয়। নিম্নে কবিতাটি উদ্ধৃত হইল :

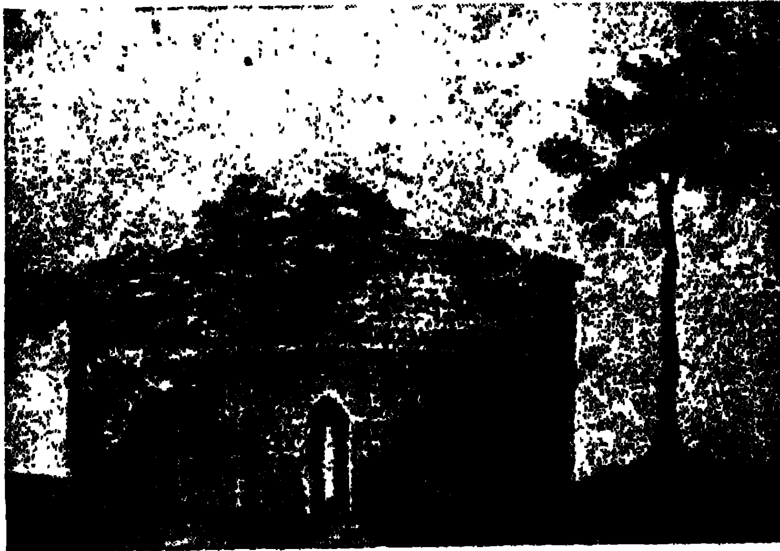
রাগিনী পূরবী॥ তাল ধামার॥

জমিদার বর্দ্ধমান জগতে প্রধান নাম শ্রীল তেজসচন্দ্র যার পতি।
মহারাজ বাহাদুর যশে পূর্ণ মহীপুর যার গুণে ধন্য বসুমতী॥
বর্দ্ধমান চাকলার যতদূর অধিকার সংক্ষেপেতে নাম শুন তার।
দক্ষিণের সীমা তাব কাঁসাই নদীর ধার পূর্ব্বসীমা পশ্চিমে গঙ্গার॥
উত্তরে রাজ্যের সখ্যা শুন কহি তার লেখা মুরশিদাবাদের দক্ষিণে।
পশ্চিমে গণনা এই পঞ্চ কূট পূর্ব্ব যেই এই চতুঃসীমার গণনে॥
ইহার সামিল আর নাম শুন পরগণার অভয়া আপনি অধিষ্ঠান।
শেরগড় সেনপাহাড়ী শ্যামরূপার গড়বাড়ী শ্রীযুত ধীরাজে কৃপাবান॥
বাঘা মুজঃফর শাহী হাবেলী আজমত শাহী গোপভূম চাম্পাই নগরী।
স্বয়ম্ভুরে সর্ব্বক্ষণে পূজে যথা চাঁদ বেনে চাঁদ সহ দ্বন্দ্ব বিষহরি॥
বায়ড়া মনোহর শাহী সমর শাহী নলহি ইন্দ্রানী পাটুলী জাহাঙ্গীরাবাদ।
রাণীহাটি রায়পুর বরদা সেলামপুর বালিগড় চেতো শাহাবাদ॥
আরসা আর আম্বুয়া বামুন ভূম বলিয়া চন্দ্রকোনা চৌম্বাহ ঘাটাল
খণ্ডঘোষ খরিদা ধরি বিষ্ণুপুর বারহাজারি পাণ্ডুয়ায় মানাদ জাঙ্গাল॥
জাহানাবাদ জয়পুর লিখিলাম দূরাতুর ভূর শিট আদি মণ্ডল ঘাট।
অপর তরফ যত বিস্তার লিখিব কত ধাঞা যথা যুগাদ্যার পাট॥
বর্দ্ধমান তুল্য পুরী তুলনা দিবার নারি সর্ব্বমঙ্গলা যেই পুরে।
রাজা অতি পুণ্যবান হরিভক্তিপরায়ণ লক্ষ্মীনারায়ণ যার ঘরে॥ *

* হরিহর মঙ্গল সংগীত, পৃষ্ঠা ১৭

শ্রীরামপুর

শ্রীরামপুর হুগলী জেলার একটি মহকুমা এবং শ্রীরামপুর শহর উক্ত মহকুমার প্রধান নগর; অক্ষাঃ ২২°৪৫´২৬´´ উত্তর এবং দ্রাঘিঃ ৮৮°২৩´ ১০´´ পূর্ব্বে অবস্থিত। ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে অবস্থিত এই স্থানটির প্রাচীনতা ও সমৃদ্ধির বিষয়, বৈদেশিক শাসনাধিকারের পূর্ব্বের ঘটনা অবশ্য বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না। তবে মগধাধিপতি বৈজাল রাজের সভাপণ্ডিত 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' নামক প্রাচীন সংস্কৃত ভৌগলিক গ্রন্থের কিলকিলা বিবরণে শ্রীরামপুরের সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে: "শিবপুরং



শ্রীরামপুরের এই বাড়ীতে কেরী সাহেব পরামর্শ করিবার জন্য মিলিত হইতেন

সমারভ্য বালুকো হি দ্বিজাপদঃ শ্রীরামাদিপুরং দিব্যং ভদ্রেশ্বরস্য সন্নিধৌ॥ ৬৬৯"; এবং বিপ্রদাস কৃত 'মনসা মঙ্গলে' ও এই স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে গোন্দলপাড়া হইতে দিনেমারগণ ব্যবসা করিবার জন্য শ্রীরামপুরে প্রথম আগমন করে বলিয়া জানা যায়। তাহাদের

ব্যবসার সুবিধার জন্য ফরাসী এজেণ্ট মঁসিয়ে ল'র (Mons Law) চেষ্টায় নবাবের নিকট হইতে তাহারা শ্রীরামপুরে ষাট বিঘা জমি প্রাপ্ত হইয়াছিল। বাংলার নবাবের নিকট হইতে জমি সংগ্রহ করিতে ও ফরমান পাইতে তাহাদের ষোল হাজার পাউণ্ড ব্যয় করিতে হইয়াছিল। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর তারিখে এই স্থানে দিনেমারদিগের পতাকা প্রথম উড্ডীন হয় এবং উক্ত পতাকা রক্ষা করিবার জন্য ডেনিশ গবর্ণমেণ্ট চারজন পাইক নিযুক্ত করিয়াছিল। নবাব সিরাজদ্দৌলা ইহাদিগকে বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিবার অনুমতি দিয়া যে বহু অর্থ পাইয়াছিলেন তাহাও জানিতে পারা যায়।

"It is recorded that the previous year had brought Siraj-ud-Dowlah a good deal of money owing to the business of establishing the Danes in Bengal,"

ডেনমার্কের তৎকালীন রাজা পঞ্চম ফ্রেডিকের নামানুসারে তাহারা 'ফ্রেড়িকনগর' বলিয়া শ্রীরামপুরের নূতন নামকরণ করে। শ্রীপুর, আকনা, গোপীনাথপুর, মোহনপুর ও পেয়ারাপুর এই স্থান লইয়াই ফ্রেডিকনগর গঠিত হইয়াছিল। দিনেমারগণ ব্যবসা আরম্ভ করিবার অল্পদিন পরে নবাব সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করেন এবং আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে, তিনি দিনেমারদিগের নিকট হইতে কয়েকখানি জাহাজ চাহিয়া পাঠান; কিন্তু জাহাজ তাহারা না দেওয়ায় নবাব বিশেষ ক্রুদ্ধ হন এবং কলিকাতা আক্রমণ সমাধা করিয়া, তিনি দিনেমার ব্যবসায়ীদিগকে পঁচিশ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

ভারতে তিনটি স্থানে দিনেমারগণের কুঠী ছিল। দক্ষিণ-ভারতে তাঞ্জোরের নিকট ট্রানকোয়েবারে (Tranquebar), উড়িষ্যার বালেশ্বরে এবং বঙ্গদেশে শ্রীরামপুরে। শ্রীরামপুরে একখানি চালাঘরে তাহারা প্রথমে কার্য্যারম্ভ করে। তাহাদের শ্রীরামপুরের কুঠির অধ্যক্ষ ছিল মিঃ

সোয়েটম্যান (Soetman); তাহারা এই স্থানে কারবার চালাইয়া সবিশেষ উন্নতি সাধন করে। কেবলমাত্র ব্যবসা করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হন নাই—শ্রীরামপুরের বহু জনহিতকর কার্য্য করিয়া তাহারা বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করেন। গঙ্গার তীরে এই সুন্দর শহরটি তৎকালে ইউরোপীয়দের একটি বিশেষ বিহার-ক্ষেত্র ছিল। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনের চেষ্টায় তাহারা সেণ্ট ওলাফস্ গীর্জ্জা (St. Olf's Church) নির্ম্মাণ করে। বিশপ হেবার শ্রীরামপুরকে একটি ইউ-রোপীয় শহরের কত দেখায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন:

"It looked more of an European twn than Calcutta."

খৃষ্টধর্ম্ম ভারতে প্রচার করিবার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে বহু সম্প্রদায়-ভুক্ত খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ ভারতবর্ষে আসিতেছিলেন। ডেনমার্কের রাজা চতুর্থ ফ্রেড্রিক কর্তৃক ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভারতে :প্রোটেষ্টাণ্ট মিশনারী প্রেরিত হইয়াছিল। যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম আসিয়াছিলেন তাহার নাম জিগেনবাল্গ (Zigenbalg)। তিনি একজন ভারতীয়কে খৃষ্টান করিয়া ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে ফিরিয়া যান। প্রথম প্রোটেষ্টাণ্ট মিশনারী জন কির্নণ্ডার (John Kiernander) ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে সরকারী ধর্ম্ম-যাজকরূপে বঙ্গদেশে আগমন করেন।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ডাঃ মার্শম্যান ও ওয়ার্ড এবং তাহাদের দুই জন বন্ধু খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য শ্রীরামপুরে আগমন করেন। তদানীন্তন গবর্ণর লর্ড ওয়েলেসলী তাঁহাদিগকে ফরাসী গুপ্তচর ভাবিয়া দেশে ফিরিয়া যাইবার আদেশ করেন, কিন্তু রেভারেণ্ড ডেভিড ব্রাউনের চেষ্টায় ওয়েলেসলীর ভ্রম দূরীভূত হয় এবং মিশনারীগণ বঙ্গদেশে বসবাসের অনুমতি প্রাপ্ত হন। ডাঃ কেরী ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বাংলায় আসিয়াছিলেন; সেই সময় তিনি মালদহে অবস্থান করিতেছিলেন। বন্ধুগণসহ মার্শম্যান ডাঃ কেরীর নিকট যাইবার চেষ্টা করিলে ইংরেজ সরকার কর্তৃক

বাধাপ্রাপ্ত হন এবং সেইজন্য তাঁহারা শ্রীরামপুরে বসবাস করিতে বাধ্য হন। তারপর ডাঃ কেরী আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন এবং এই তিন জনে মিলিয়া পরে শ্রীরামপুর-মিশনে'র প্রতিষ্ঠা করেন।* কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের জীবনী নামক গ্রন্থে এই তিন জন লোক-হিতৈষী ধর্ম্মপ্রচারকের কার্য্যাবলীর বিশেষ বিবরণ পাওয়া যাইবে।

শ্রীরামপুর মিশনের অধ্যক্ষ কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড সাহেবের প্রযত্নে এই স্থানে গীর্জ্জা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে স্কুল কলেজ পুস্তকালয় ও মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের আগ্রহে ও উৎসাহে শ্রীরামপুর হইতে প্রথম মুদ্রিত 'সাময়িক দিগদর্শন' ও সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' এবং 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' বাহির হইয়াছিল। শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ও বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে তাঁহারা যে অক্লান্ত প্রচেষ্টা করিয়া গিয়াছেন সেজন্য শ্রীরামপুরের সহিত তাঁহাদের নাম বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

শ্রীরামপুর মিশনের চেষ্টায় কৃষ্ণদাস পাল নামক শ্রীরামপুরের জনৈক সূত্রধর বাংলাদেশে সর্ব্বপ্রথম খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে শ্রীরামপুরের দিনেমার গবর্ণরের এবং বহু হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানের সমক্ষে গঙ্গাতীরে এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ সম্পন্ন হয়। শ্রীযুত হরিহর শেঠ "পুরাতনী"তে লিখিয়াছেন যে, কেরী সাহেব এই কার্য্যের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। গঙ্গাতীরে এই দীক্ষাকার্য্য সাধিত হওয়ায় পাছে কেহ মনে করেন যে, গঙ্গার পবিত্রতার জন্য এই স্থান মনোনীত হইয়াছে, সেই জন্য কেরী সাহেব জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "গঙ্গার পবিত্রতা তাঁহারা স্বীকার করেন না, উহার জলকে

* The Life and Times of Carey, Marshman and Ward.

দিগ্দর্শন।—

প্রথম ভাগ।—

আমেরিকার দর্শন বিষয়।—

পৃথিবী চারি ভাগে বিভক্ত আছে ইউরোপ ও আসি
ও আফ্রিকা ও আমেরিকা। ইউরোপ ও আসিয়া
আফ্রিকা এই তিন ভাগ এক মহাদ্বীপে আছে ইহারা কো
সমুদ্রদ্বারা বিভক্ত নয় কিন্তু আমেরিকা পৃথক এক দ্বীপ
প্রথম দ্বীপহইতে সে দুই হাজার ক্রোশ অন্তর। অনুমা
হয় তিন শত ছাব্বিশ বৎসর হইল আট শত আটা
লাকে আমেরিকা প্রথম জানা গেল তাহার পূর্বে আমে
রিকা কোন লোককর্ত্তৃক জানা ছিল না এই নিমিত্তে
তাহার প্রথম দর্শনের বিবরণ লিখি।—

যেহেতুক পৃথিবীর মধ্যে যে কর্ম্ম হইয়াছে সে
কর্ম্মহইতে এ কর্ম্ম বড়। অনুমান পাঁচ শত বৎসর গ
হইল চুম্বক পাথরের গুণ প্রথম জানা গেল তাহার গু
এই যে তাহাকে কোন লৌহে ঘষিলে সে লৌহ মার্গ
কেন্দ্র অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে থাকে সেই লৌ
কোম্পাসের মধ্যে দিলে সমুদ্রে কিম্বা মৃত্তিকার উপরে
কোন স্থানে কোন লোক থাকে সেই কোম্পাসের দ্বারা
দ্বার সকল ভাগ সে জানিতে পারে। কোম্পাসের গঠন
[illegible] এক কাগজের উপরে মণ্ডলাকৃতি করিয়া [illegible]
[illegible] করিয়া চতুর্দ্দিকে সকল দিগ ও বিদিগ এ [illegible]

প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র 'দিগ্দর্শনে'র একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

সাধারণ জল বলিয়াই জানেন।" উক্ত দিবস অপরাহ্নে অভিষেক-কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং বঙ্গভাষায় যাবতীয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। খৃষ্টান মিশনরীগণ কর্ত্তৃক দেশীয়দের ধর্ম্মান্তরিত করার ক্ষেত্রে,বঙ্গভাষার ব্যবহার ইহাই প্রথম। কৃষ্ণদাসের স্ত্রী, কন্যা এবং গোলক নামক আর এক ব্যক্তিও এই সঙ্গে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদের খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বনে শ্রীরামপুরে হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং পরদিন প্রাতে দুই সহস্র ব্যক্তি উহাদিগকে নিজ নিজ বাটি হইতে ধরিয়া বিচারকের নিকট লইয়া যায়। দিনেমার বিচারক ধর্ম্মান্তর গ্রহণকারীদের কার্য্যের প্রশংসা করিয়া জনতাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেন এবং পাছে জনসাধারণ উহাদের কোনপ্রকার অনিষ্ট করে সেইজন্য কৃষ্ণ, গোলক ও মিশনারীদের বাটিতে দিনেমার গবর্ণর পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে দেশীয় খৃষ্টানদের প্রথম বিবাহ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণপ্রসাদ নামক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী জনৈক ব্রাহ্মণের সহিত কৃষ্ণের কন্যার বিবাহ বাংলায় প্রথম খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতে পরিণয় এবং এই বিবাহের যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি বঙ্গভাষায় সম্পন্ন হইয়াছিল। বর ও কন্যা উভয়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন এবং কেরী, মার্শম্যান প্রমুখ পাদ্রীগণ স্বাক্ষীস্বরূপ উক্ত পত্রে সহি করেন।

দেশীয় খৃষ্টানদের সমাধি নির্ম্মাণও প্রথম শ্রীরামপুরে হয়। গোকুল দাস নামক জনৈক ব্যক্তি, মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার সমাধিই বঙ্গদেশে দেশীয় খৃষ্টানদের সর্ব্বপ্রথম সমাধি; গোকুল দাসের মৃত্যুর চারদিন পূর্ব্বেই তাঁহার সমাধির জন্য মিশনরীগণ জমি ক্রয় করেন। প্রথম দেশীয় খৃষ্টান কৃষ্ণ পাল নিজ ব্যয়ে গোকুলের শবাধার মসলিনে আবৃত করিয়া দিয়াছিলেন। হিন্দুদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে বিশেষ সফলতা দেখিয়া পাদ্রীগণ কালীঘাটে লোক পাঠাইয়া

পাঁচশত টাকার পূজা দিয়াছিলেন। মুসলমানগণও খৃষ্টান হইবার জন্য শ্রীরামপুরে আসিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে উক্ত মিশনের চেষ্টায় শ্রীরামপুরে একখানি বাড়ী ক্রয় করা হয় এবং ঐ বাড়ীতে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়; কাষ্ঠে খোদাই করা বাংলা অক্ষর শ্রীরামপুরে প্রস্তুত হয় এবং উক্ত অক্ষরে বাইবেলের বঙ্গানুবাদ এই স্থান হইতে তাঁহারা প্রথম প্রকাশ করেন। দুই হাজার খণ্ড বাইবেল বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিতে মোট ব্যয় হইয়াছিল ৬১২ পাউণ্ড; কেরী সাহেবের বাঙ্গলা ব্যাকরণ উক্ত বৎসরে প্রথম মুদ্রিত হয় এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা ব্যকরণের চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙালী রচিত ব্যাকরণ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়।

রামবসুর "প্রতাপাদিত্য" এবং খৃষ্টচরিত ১৮০১ খৃষ্টাব্দে মিশন প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়; রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত্র বঙ্গভাষার প্রথম মুদ্রিত গদ্য গ্রন্থ বলিয়া খ্যাত হইলেও এই সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যথেষ্ট মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ৫৪৪ পৃষ্ঠায় প্রথম গদ্য পুস্তক সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

রামরাম বসু অষ্টদশ শতাব্দীর শেষভাগে হুগলী জেলার অন্তর্গত চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বঙ্গজ-কায়স্থ বংশীয় ছিলেন। ২৪ পরগণায় অন্তর্গত নিমতা গ্রামে তাহার বাল্যশিক্ষা সমাধা হয়। বাল্যকালে ইনি আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। কেরী সাহেবের লিখিত কাগজপত্রাদি হইতে জানা যায় যে, ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বেই তিনি উপরি উক্ত ভাষা দুইটিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হইবার পর, তিনি উক্ত কলেজে বঙ্গভাষা শিক্ষা দিতেন। তিনি অতিশয় শিকারপ্রিয় ছিলেন এবং কেরী সাহেব

লিখিয়াছেন যে বসু মহাশয়ের ন্যায় প্রগাঢ় অধ্যায়নপটু লোক তিনি আর কখনও দেখেন নাই।*

১৮০১ খৃষ্টাব্দে কেরী সাহেব ইংরেজদিগকে বঙ্গভাষা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত "কথোপকথন" বলিয়া আর একখানি পুস্তক রচনা করেন এবং শ্রীরামপুর হইতে উহা প্রকাশিত হয়। জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত অর্থাৎ সহজ সরল চলিত ভাষায় পুস্তকখানি লিখিত এবং প্রত্যেক বাংলার অনুচ্ছেদের সহিত তাহার ইংরাজী অনুবাদও পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। উক্ত পুস্তকে তৎকালের স্ত্রীলোকদিগের কলহবিষয়ক বর্ণনা হইতে নিম্নে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইল :

"আর শুনছিস নির্ম্মলের মা। এই যে বেণে মাগী অহঙ্কারে আর চক্ষে মুখে পথ দেখে না। হ্যা দ্যাখ কালি যে আমার ছেল্যা পথে দাঁড়িয়াছিল, তা ঐ বুড়া মাগী তিন চার ছেল্যার মা,—করিল কি, ভরন্ত কলসিডা অমনি ছেল্যার মাথায় উপর তলানি দিয়া গেল। সেই হইতে ঘাটের বাছা জরে ধ্যাঁঙরে পাড়ছে। এমন গরজ সুখী, বল্লে আবার গালাগাল ঝগড়া করে। এ ভাতার খাগি সর্ব্বনাশির পুতটা মরুক। তিন দিনে উহার তিনটা বেটার মাথা খাউক, ঘাটে বসে মঙ্গল গাউক।"

কেরী সাহেব পনর বৎসর পরিশ্রম করিয়া একখানি সুবৃহৎ বাংলা ও ইংরাজী অভিধান সঙ্কলন করেন, ইহাই বঙ্গভাষার প্রথম শোভন ও বিরাট্ অভিধান এবং ইহাতে আশী হাজার শব্দ আছে। ইহার পূর্ব্বে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজী হইতে বাংলা (১ম খণ্ড) ও ১৮০২ খৃষ্টাব্দে বাংলা হইতে ইংরেজী (২য় খণ্ড) মিঃ এইচ, পি, ফরস্টর (**Mr. H. P. Forster**) বাহির করেন। এই অভিধান সম্বন্ধে "সমাচার দর্পণে" (১৮ই জুন ১৮২৫—৬ই আষাঢ় ১২৩২) যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা উল্লিখিত হইল :

* বিশ্বকোষ—নগেন্দ্রনাথ বসু

"বাঙ্গালা-ডেকসিয়ানরি—আমার অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে শহর শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ডাক্তার কেরি সাহেব পোনর বৎসর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া যে বাংলা ও ইংরাজী ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা শহর শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় ছাপা হইয়া গত সপ্তাহে সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং গ্রাহকদের নিকট প্রেরিতও হইতেছে। এই পুস্তক তিন বালামে সংপূর্ণ হইয়াছে ইহার পত্রসংখ্যা ক্বার্টো পেজের অর্থাৎ বড় পৃষ্ঠার ২০৬০ দুই সহস্র ষষ্টি পৃষ্ঠা হইয়াছে এবং অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে ও উত্তম কাগজে ছাপা হইয়াছে। ইহার মূল্য চামড়া বাইণ্ড



শ্রীরামপুর সমাধিক্ষেত্রে ওয়ার্ড সাহেবের সমাধিস্তম্ভ

সমেত ১১০ এক শত দশ টাকা নিরূপিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে যত শব্দ চলিত আছে সে তাবৎ শব্দ প্রায় ঐ অভিধানের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রথম ইংরেজি অর্থের সহিত বোপদেব কৃত গণ আছে তৎপরে আকারদিক্রমে তাবৎ শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে।"

১৮২২ খৃষ্টাব্দে মেণ্ডি সাহেব, (ইনি চল্লিশ বৎসর শ্রীরামপুর মিশন

প্রেসে কর্ম্ম করেন) একখানি ইংরেজী ও বাংলা অভিধানে সঙ্কলন করেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে মার্শম্যান সাহেবও বাংলা-ইংরেজী ও ইংরেজী-বাংলা এই দুই প্রকারের অভিধান প্রকাশ করেন ; এতদ্ব্যতীত কেরী সাহেব ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে "এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা"র পঞ্চম সংস্করণ হইতে (শারীরস্থান বিদ্যা) Anatomyর বঙ্গানুবাদ করেন ; চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে এইখানিই বঙ্গভাষার প্রথম গ্রন্থ ; ইহার পত্রসংখ্যা ৬৩৮ এবং মূল্য ৬৲ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

১৮১২ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ মিশনের প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানায় আগুন লাগিয়া সমস্ত ভস্মসাৎ হইয়া যায় * এবং সেইজন্য তাঁহাদের সাতহাজার পাউণ্ড ক্ষতি হয়। এই অগ্নিকাণ্ডে রামায়ণের বঙ্গানুবাদ, অভিধান ও একখানি তেলেগু ব্যাকরণের পাণ্ডুলিপি পুড়িয়া যাওয়ায় তাঁহারা বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন।

শ্রীরামপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ম্যাক (John Mack) "Principles of Chemistry" শীর্ষক একখানি ইংরেজী পুস্তক প্রণয়ন করেন। ম্যার্শম্যান সাহেবের অভিপ্রায় অনুসারে উক্ত ইংরেজী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ করা হয়। পুস্তকখানির নাম দেওয়া হয় "কিমিয়া বিদ্যাসার"। এই পুস্তকখানিই বঙ্গভাষায় রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে আদি গ্রন্থ, পত্র-সংখ্যা ১৬৯। কি ভাবে বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছিল, তাহা নিম্নের কয়েক পঙ্‌ক্তি হইতে প্রতীয়মান হইবে :

"সোদিয়ামের খোলরিন অর্থাৎ সামান্য লবণের ৭ ঔন্স আর গুঁড়াকৃত মাঙ্গানীসের কালা অক্সিজেনের ৩ ঔন্স হামামদিস্তাতে গুঁড়া করিয়া তাহা রিটোর্টের মধ্যে রাখিয়া ও জলের ৪ ঔন্সের মিশ্রিত গান্ধাকিকারের

* Life & Times of Carey, Marshman & Ward, Vol. I

৪ ঔন্স ঠাণ্ডা হইলে তাহার উপর ঢালিয়া সে সকল অল্প অল্প উত্তপ্ত কর তাহাতে খোলরিন আকাশ নির্গত হইবে।" *

ম্যাকের চেষ্টায় ১৮২২ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভারতবর্ষের মানচিত্র বাংলা অক্ষরে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন কাগজের কল চালাইবার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম শ্রীরামপুরে ষ্টিম ইঞ্জিন আনীত হয়।

শ্রীরামপুর কলেজ মিশনরীদের অন্যতম কীর্ত্তিস্তম্ভ; ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কলেজের বাড়ীর জন্য জমি ক্রয় করা হয় এবং ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ খুলিবার জন্য ডেনমার্কের রাজকীয় সনন্দ পাওয়া যায়। তাঁহাদের যত্নে এই কলেজের তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা বিভাগটি সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। এই কলেজের সুদৃশ্য ভবনটি আজও দিনেমার শিক্ষাবিৎদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই কলেজের গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা বিশ হাজার। কলেজের মিউজিয়ামে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত প্রথম মুদ্রিত বাংলা বাইবেল সযত্নে রক্ষিত আছে।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই স্থান হইতে মিশনরীগণ "দিগ্দর্শন—অর্থাৎ যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ" নামে একখানি বাংলা মাসিকপত্র প্রকাশ করেন; ইহার ২৬শ সংখ্যা পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছিল, পরে এই পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়া যায়। ইহার ইংরেজী সংস্করণ ১৫শ সংখ্যা পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছিল। *

অতঃপর মিশন "সমাচার দর্পণ" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে (১০ই জ্যৈষ্ঠ ১২২৫) তারিখে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশ করেন; মার্শম্যান এই পত্রের সম্পাদক হন। ইহাই বাংলা

---

* কিমিয়া বিদ্যাসার, পৃষ্ঠা ৭২।

* Bengali Literature in the Nineteenth Century.

ভাষার প্রথম সংবাদ পত্র বলিয়া অনেকের ধারণা। রেভারেণ্ড লং সাহেবও সমাচার দর্পণকে বাংলার আদি সংবাদপত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। *

সমাচার দর্পণ প্রতি শনিবার প্রকাশিত হইত এবং দেশ-বিদেশের সংবাদ ছাড়া জনহিতৈষণামূলক প্রবন্ধাদিও ইহাতে স্থান পাইত। এই পত্রের চতুর্থ সংখ্যায় যে "ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি:

"এই সমাচারের পত্র তিন সপ্তাহ বিনামূল্যে দেওয়া গিয়াছে এবং ইহার মূল্য সামান্যমত ১॥০ টাকা প্রতি মাস লেখা গিয়াছে কিন্তু ইহার বিশেষ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে জ্ঞাত হইয়া এই সমাচারের পত্র যে ব্যক্তি কেবল এক মাহার কারণ লইবেক তাহার মাসে মাসে ১॥০ টাকা যে ব্যক্তি এক বৎসরের কারণ লইবেক তাহার মাস মাস এক টাকা দিতে হবেক।"

'সমাচার দর্পণের' উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় যে বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:

"সমাচার দর্পণ।

কথক মাস হইল শ্রীরামপুরের ছাপাখানা হইতে এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক মাস ২ ছাপাইবার কল্পও ছিল তাহার অভিপ্রায় এই যে এতদ্দেশীয় লোকরদের নিকট সকল প্রকার বিদ্যা প্রকাশ হয় কিন্তু সে পুস্তকে সকলের সম্মতি হইল না। এই প্রযুক্ত যদি সে পুস্তক মাস ২ ছাপা যাইত তবে কাহারও উপকার হইত না অতএব তাহার পরিবর্ত্তে এই সমাচারের পত্র ছাপাইতে আরম্ভ করা গিয়াছে। ইহার নাম সমাচার দর্পণ।

---

* (Early Bengali Literature and Newspapers Calcutta Review 1850p. 145.)

এই সমাচারের পত্র প্রতি সপ্তাহে ছাপান যাইবে তাহার মধ্যে এই ২ সমাচার দেওয়া যাইবে।

সমাচার দর্পণ।

১ এতদ্দেশের জজ ও কলেক্তর সাহেবদের ও অন্য রাজকর্ম্মাধ্যক্ষেদের নিয়োগ।

২ শ্রীশ্রী যুত বড় সাহেব যে ২ নূতন আয়িন ও হুকুম প্রভৃতি প্রকাশ করিবেন।

৩ ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্য ২ প্রদেশ হইতে যে ২ নূতন সমাচার আইসে এবং এই দেশের নানা সমাচার।

৪ বাণিজ্যাদির নূতম বিবরণ

৫ লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া।

৬ ইউরোপ দেশীয় লোক কর্ত্তৃক যে ২ নূতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই সকল পুস্তক হইতে ছাপান যাইবে এবং যে ২ নূতন পুস্তক মাসে ২ ইংগ্লণ্ড হইতে আইসে সেই সকল পুস্তকে যে ২ নূতন শিল্প ও কল প্রভৃতির বিবরণ থাকে তাহাও ছাপান যাইবে।

৭ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও বিদ্যা ও জ্ঞানবান লোক ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ।" প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি পাঠকবর্গের অবগতির জন্য ৬৫৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল।

এই সাপ্তাহিক পত্র ক্রমশঃ অর্দ্ধ সাপ্তাহিকে পরিণত হইয়াছিল, সপ্তাহে দুইবার অর্থাৎ প্রতি শনিবার ও বুধবারে প্রকাশিত হইত। উক্ত সময়ে বাঙালীদের মধ্যে ইংরাজী ভাষা শিখিবার প্রবল আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছিল, সেইজন্য শ্রীরামপুর মিশন এই কাগজখানাকে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরাজী ও বাংলা এই উভয় ভাষায় প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করেন।

মার্শম্যান সাহেব ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই তারিখে "গভর্ণমেন্ট-গেজেট" নামক একখানি সরকারী সংবাদপত্রের সম্পাদক হইলেন; তিনখানি সংবাদপত্র পরিচালনা করা দুরূহ ব্যাপার বলিয়া তিনি ২৫শে ডিসেম্বর ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে সমাচার দর্পণ বন্ধ করিয়া দেন। সম্পাদকের কর্ম্ম-বাহুল্যের জন্যই যে সমাচার দর্পণ বন্ধ হইয়া যায়, তাহা শ্রীরামপুর হইতে

প্রকাশিত The Friend of India নামক সাপ্তাহিক পত্রে (৩০ ডিসেম্বর ১৮৪১) লিখিত আছে :

"The editor of the Samachar Darpan finds himself under the necessity of closing that journal with the termination of the present year. With two other journals the Friend of India and the Bengalee Government Gazette to attend to, it is not possible to do that justice to the Darpan whether in refernce to the supply of editorial observations and intelligence, or to the translation of them into Bengalee, which a due regard for the interests of his subscribers and his own reputation require."

মিশনের কর্ত্তৃপক্ষগণ সমাচাব দর্পণ বন্ধ কবিয়া দিলেও দীননাথ দত্তেব চেষ্টায় ইহা পুনঃপ্রকাশিত হয, এবং ভগবতীচবণ চট্টোপাধ্যায ইহার সম্পাদনা করেন, কিন্তু কিছুদিন পব ইহাও বন্ধ হইয়া যায। অতঃপর ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে তাবিখে টাউনসেণ্ড সাহেব কত্তৃক তৃতীযবাব সমাচার দর্পণ 'শ্রীরামপুরেব যন্ত্রালয' হইতে প্রকাশিত হয়। এই সম্বন্ধে 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিযা' যাহা লিখিযাছেন (১৫ই মে ১৮৫১) তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :

"The Sumachar Durpun—We are happy to perceive that this native journal has been revived. It was discontinued in 1841, or rather transferred to a native editor in Calcutta, in whose hands it soon drooped or died."

তৃতীয় পর্য্যায়ের সমাচার দর্পণ দেড় বৎসর চলিবার পর একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। ১লা বৈশাখ ১২৬০ (১২ই এপ্রিল ১৮৫৩) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন, "সমাচার দর্পণ পত্র শ্রীরামপুরে গঙ্গার জলে প্রাণত্যাগ করে।"

সমাচার দর্পণ ব্যতীত 'আখবারে শ্রীরামপুর নামক পারসী ভাষায়

একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখে (২৫শে বৈশাখ ১২৩৩) শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' যে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হইত, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই সংবাদপত্রখানি নবকলেবরে 'ষ্টেটস্‌ম্যান' (The Statesman) নামে আজও কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

বাঙালী কর্ত্তৃক পরিচালিত "জ্ঞানারুণোদয়" নামক একখানি মাসিকপত্র ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী (১৯শে মাঘ ১২৫৮) শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হয়, কালিদাস মৈত্র পত্রিকাখানি সম্পাদনা করিতেন। পর বৎসর উক্ত পত্রিকা বন্ধ হইয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত "চন্দ্রোদয় যন্ত্রালয়" ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মকার কর্ত্তৃক স্থাপিত হয় এবং এই প্রেস হইতেই শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ পঞ্জিকা বাহির হইত। 'জ্ঞানারুণোদয়' সম্বন্ধে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের 'সংবাদ-প্রভাকরে' নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল :

"শ্রীরামপুরের মধ্যে এতদ্দেশীয় মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রকাশ্য পত্র প্রকাশের সূত্র এই প্রথম হইল।"

জ্ঞানারুণোদয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই (২৪শে আষাঢ় ১২৫৯) চন্দ্রোদয় যন্ত্রালয় হইতে "সংবাদ শশধর" নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রে "এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকার" বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইত। কিছুদিন চলিবার পর ১২৫৯ বঙ্গাব্দেই 'সংবাদ শশধর' বন্ধ হইয়া যায়। এই বিষয়ে ১২৬০ সালের ১লা বৈশাখ তারিখের "সংবাদ প্রভাকরে" নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল :

"গত বৎসর কয়েকখানি পত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে। 'শশধর' নামে শ্রীরামপুরে যে এক বারোইয়ারী পত্র হয়, সেই শশধর একেবারে মেঘাচ্ছন্ন হইলেন।"

১২৬৪ সালের ২রা বৈশাখ শ্রীরামপুর 'তমোহর' যন্ত্রে জে, এচ, পিটার্স কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া "বিজ্ঞান-মিহিরোদয়" নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। পরে এই পত্রিকা পাক্ষিকে পরিণত হইয়াছিল।

শ্রীরামপুর যন্ত্রালয় হইতে শ্রীমেরিডিথ টৌন্সেণ্ড কর্ত্তৃক "সত্যপ্রদীপ" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে প্রকাশিত হয় এবং এক বৎসর চলিবার পর ইহা বন্ধ হইয়া যায়। ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২৬শে এপ্রিল ১৮৫১।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শ্রীরামপুর যন্ত্রালয় হইতে "The Evangelist মঙ্গলোপাখ্যান পত্র" নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়, এই পত্রিকাখানি ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ইহার বামদিকে ইংরেজী অংশ ও ডানদিকে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইত।

শ্রীরামপুরে দিনেমারগণ ব্যবসায় চালাইয়া বেশ লাভবান হইতেছিলেন, সেই সময় ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সহিত ডেনমার্কের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। পাছে এতদ্দেশস্থ দিনেমারগণেও ইংরেজদিগের বিরুদ্ধাচরণ করেন সেইজন্য ব্যারাকপুর হইতে এক দল সৈন্য আসিয়া শ্রীরামপুর দখল করে এবং উক্ত স্থান ইংরেজদিগের হস্তগত হয়। অল্পদিন পরে এই শহর দিনেমারদিগকে প্রত্যর্পণ করা হয়। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ এই শহর আবার দখল করেন এবং সাত বৎসর ইহা তাঁহাদের অধীনে থাকে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে এই উভয় জাতির মধ্যে যুদ্ধবিরতি হইলে পুনরায় ইহা দিনেমারদের প্রত্যার্পিত হয়। কিন্তু এই সময়ে দিনেমারদিগের ব্যবসায়ের বাজার মন্দা হওয়ায় দিনেমার সরকারের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। সেইজন্য ডেনমার্কের রাজা শ্রীরামপুর বিক্রয়ের সঙ্কল্প করেন। হরিনারায়ণ গোস্বামী দিনেমার

কোম্পানীর দেওয়ান ছিলেন, তাঁহার ভ্রাতা রঘুনাথ গোস্বামী কোম্পানীর মুৎসুদ্দি হইয়া ব্যবসায়াদির দ্বারা প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। ডেনমার্কের অধিপতি যখন শ্রীরামপুর বিক্রয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন গোস্বামী ভ্রাতৃগণ দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রায় শ্রীরামপুর খরিদ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিবন্ধকতায় তাহা হইয়া উঠে নাই।*

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর তারিখে ডেনমার্কের রাজা শ্রীরামপুর, ট্রানকোয়েবার ও বালেশ্বর সাড়ে বার লক্ষ টাকায় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নিকট বিক্রয় করেন এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে দিনেমারদের সম্পর্ক চিরদিনের জন্য লুপ্ত হয়। শ্রীরামপুর হইতে দিনেমারগণ চলিয়া গেলেও তাঁহাদের নির্ম্মিত গঙ্গাতীরস্থ সুরম্য অট্টালিকাসমূহ আজও তাঁহাদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। শ্রীরামপুরের যে ভবনটি বর্ত্তমানে আদালত-গৃহ রূপে ব্যবহৃত হইতেছে উহা পূর্ব্বে দিনেমার গবর্ণরের আবাসস্থল ছিল। এতদ্ব্যতীত কোর্ট লেন, চার্চ্চ ষ্ট্রীট প্রভৃতি কয়েকটি রাস্তারও তাঁহারা নামকরণ করিয়াছিলেন। এই রাস্তাগুলি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জা ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ১৩,৩৮৬৲ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করা হয়। কনভেণ্টটি অপেক্ষাকৃত নূতন, সম্ভবতঃ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের পর ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হয়।

"Serampore was a Danish settelment from 1755 to 1845 when it was taken over by the English.

The Roman Catholic Chapel in Serampore was originally erected in 1764 but it was found too small for the increasing community. It was therefore taken down in 1776 wten the present edifice was erected in its state at

---

* **Hughly District Gazetters.**

the expense of Rs. 13,306, undor the auspicious of the Baretto family. Serampore is best known as the residence of the 3 celebrated Baptist Missionaries Carey, Marshman and Ward."*

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত কানাইলাল গোস্বামী দিনেমারগণের ব্যবহৃত পনরটি কামান একত্রে



ডেনমার্কের অধিপতি ৬ষ্ঠ ফ্রেডারিক কর্ত্তৃক ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের প্রদত্ত গীর্জার মধ্যস্থিত 'টব'

সেণ্ট ওলাফস্ গির্জ্জার সম্মুখে স্থাপন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া একটি প্রস্তরফলকে শ্রীরামপুরের সহিত দিনেমারদিগের সম্পর্কের বিষয় সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিয়াছেন। উহাতে উৎকীর্ণ কথাগুলি যথাযথভাবে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"This tablet has been erected to commemorate the

* List of Ancient Monuments in Bengal.

connexion with Serampore of the Danes who after acquiring 60 bighas of land as a basis for their trading activities in Bengal governed this town and district then called Fraderecknagore, from 1755 to 1845 when they sold this property to the British. In spite of the poverty of the colony it had a reputation for great charm and ceanliness.

"The cannon were employed for the firing of salutes when no longer required for this purpose, they were for many years scattered round the town and used as lamp posts until they were reassembled and set up in the neighbourhood of the old Danish Government House and of St. Olaf in the year 1940."

উত্তরে চাতরা ও দক্ষিণে মহেশ বল্লভপুর নামক স্থানগুলি শ্রীরামপুরের চৌহদ্দির অন্তর্ভুক্ত। বর্ত্তমানে এই দুইটি জায়গা শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীন। চাতরা একটি প্রাচীন স্থান, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মন্দিরের জন্য এই স্থান বিখ্যাত। এই মন্দির কাশীশ্বর পণ্ডিতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রবাদ এইরূপ যে, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের এক-জন পার্শ্বচর ছিলেন। এই মন্দিরের এক দিকে গৌরচন্দ্র ও অন্য দিকে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান। কাশীশ্বর পণ্ডিতের বংশ অধুনা চৌধুরী বংশ বলিয়া খ্যাত। কাশীশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব উপলক্ষে এই স্থানে অদ্যাপি উৎসবাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন চাতরার শীতলা দেবীও জাগ্রতা দেবী বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই স্থানে বৈশাখ মাসের প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবারে বহু ভক্ত সমাগম হইয়া থাকে। দেওয়ান ঘাট নামে এই স্থানে গঙ্গার প্রসিদ্ধ ঘাট আছে; রংপুরের দেওয়ান রামহরি চক্রবর্ত্তী এই ঘাটটির প্রতিষ্ঠা করেন, ইহার সোপানাবলীর নির্ম্মাণকৌশল চমৎকার। বহুকাল যাবৎ চাতরা বাণিজ্য প্রধান স্থান বলিয়া বিখ্যাত এবং এই স্থানের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ও বহু প্রাচীন। স্বর্গীয় অশ্বিনী–

কুমার দত্ত ও ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার এই বিদ্যালয়ে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। দশম শতাব্দীতে রচিত বিপ্রদাস কৃত মনসা-মঙ্গলে চাতরার উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

মাহেশও একটি প্রাচীন স্থান। এখানকার রথের খ্যাতি দূর দূরান্তরে প্রচারিত। মাহেশের জগন্নাথদেবের মন্দির প্রাচীন মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম। কলিকাতার বড়বাজারের মল্লিক-বংশোদ্ভব নিমাইচরণ মল্লিক (ইহাদের আদি নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামে ছিল) পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের অনুকরণে ১২৬৫ সালে সত্তর ফুট উচ্চ এই সুন্দর মন্দিরটি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। নিমাইচরণ মল্লিক প্রভৃত বিত্তশালী দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ বদান্য ব্যক্তি ছিলেন। পিতৃবিয়োগের পর উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি চল্লিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তির মালিক হইয়াছিলেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি লোকান্তরিত হন এবং উইল করিয়া বত্রিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বিভিন্ন জনহিতকর কার্য্যে ও দেবসেবায় ব্যয় করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়া যান।

মাহেশের জগন্নাথদেবের মন্দির সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে, পুরী হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া এখানে মন্দির নির্ম্মাণ এবং তন্মধ্যে দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং উপরি-উক্ত দেব ঘটনার স্মরণার্থেই প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে স্নানযাত্রা উৎসব মহা ধূমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। আবার ভিন্ন জনশ্রুতি এই যে, ধ্রুবানন্দ নামে এক ব্রহ্মচারী পুরী তীর্থে গমন করিলে, তিনি স্বপ্নে মাহেশে ফিরিয়া আসিবার জন্য আদিষ্ট হন। মাহেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি গঙ্গাতীরে বালুকার মধ্যে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন এবং তিনিই উক্ত মূর্ত্তিগুলির প্রতিষ্ঠা করেন। *

* পুরাতত্ত্বী, শ্রীহরিহর শেঠ, পৃষ্ঠা ৯৪।

বিগ্রহের বেদীতে নিম্নলিখিত লেখাগুলি উৎকীর্ণ আছে ঃ

৺রামতনু মল্লিক ও
শ্রীমতি পার্ব্বতী দাসী
১২৬৫

জগন্নাথদেবের মন্দিরের সেবায়েতগণের বর্ত্তমান উপাধি 'অধিকারী'। মাহেশের প্রথম রথখানি এক মোদক নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন * ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা লিখিয়াছেন যে জগন্নাথের নিত্য ভোগের জন্য নিমাই মল্লিকের দান বার্ষিক ১৯২৲ ও রামমোহন মল্লিকের ট্রাষ্ট ফাণ্ডের দান ১৫০৲, খিচুড়ী ভোগের জন্য নিমাই মল্লিকের স্বতন্ত্র দান বার্ষিক ৪৩৬৲। নিমাইচরণের কনিষ্ঠ পুত্র মতিলাল মল্লিক গঙ্গার ধারে সুদৃশ্য রাসমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। †

মাহেশ-বল্লভপুরের দেবসেবা ও নিমাইচরণ মল্লিক সম্বন্ধে "সংবাদ-প্রভাকরে" (১৭ই ফাল্গুন ১২৬৪) যে সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল ঃ

"প্রাতস্মরণীয় সমূহ সংক্রিয়ান্বিত বিপুল বিভবশালী ৺নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয় ইংরাজী ১৮০৬ সালে ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য ৩২০০০০০ বত্রিশ লক্ষ টাকা ন্যস্ত করিয়া পুত্রগণের প্রতি ভারার্পণ করত আপমার উইলে শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, বাল্মীকি পুরাণ প্রদান এবং অম্বিকায় মহাপ্রভুর মন্দির, কলিকাতার গঙ্গাতীরে কটি ঘাট, বৃন্দাবনে দুইটা কুঞ্জ, জগন্নাথক্ষেত্রে মঠ স্থাপন আর মাহেশ, বল্লভপুর কাঁচড়াপাড়ায় দেবসেবা প্রভৃতি কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণে অনুমতি করেন।...এই স্থলে ৺নিমাইচরণ মল্লিকের নামোল্লেখপূর্ব্বক এই মাত্র কহিতেছি, তিনি যথার্থ মানব-দেহ

---

* **Hughly District Gazetteers.**

† সুবর্ণ বণিক কথা ও কীর্ত্তি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯

ধারণ করতঃ মানবজন্মের ও ধনের সার্থকতা করিয়াছেন এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণেরাও সাধু কেননা পৃথ্বীব্যাপিনী কীর্ত্তি স্থাপনে অনুরত হইয়া কুলের, ধনের, মনের এবং জীবনের সার্থকতা করিতেছেন।”



শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউর মন্দির

জগন্নাথের মন্দির সম্বন্ধে **List of Ancient Monuments in Bengal** (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) নামক সরকারী গ্রন্থে যাহা আছে পর পৃষ্ঠায় তাহা উদ্ধৃত হইল :

"MAHESH—Temple of Jagannath—It is said that the Jagannath of Mahesh is about the same date with the Radhaballaph of Vallabhpur, i.e. more than 350 years old. Tpe idol Jagannath, along with Subhadra and Valarama is made of neem wood. It has a little zamindary to meet its expenses. On the occasion of Snanjatra and Car festivals, much numbers of people gather here. On the Sunday intervening between the Rathjatra and the Ultarath, this place is crowded annually by the Babus of Calcutta. This occasion is ordinarily called the Dvadasa Gopal Festival of Mahesh."

হাণ্টার সাহেবের Statistical Account of the Hooghly District নামক গ্রন্থে (পৃঃ ৩০৬) জগন্নাথ ও রাধাবল্লভের মন্দিরের বিষয় লিখিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

মাহেশের নিকট বল্লভপুর শ্রীশ্রীরাধাবল্লভের বিগ্রহের জন্য প্রসিদ্ধ এবং রাধাবল্লভের নামানুসারেই এই স্থানের নাম বল্লভপুর হইয়াছে। কথিত আছে যে, চাতরার রুদ্র পণ্ডিত দেববিগ্রহ নির্ম্মাণের প্রত্যাদেশ লাভ করেন এবং সেই অনুযায়ী গৌড়ের রাজপ্রতিনিধির ভগ্ন প্রাসাদ হইতে আনিত প্রস্তর দ্বারা তৎকর্ত্তৃক বল্লভজীউ ও রাধিকার যুগলমূর্ত্তি গঠিত হয়। আবার কাহারও মতে খড়দহের বীরভদ্র গোস্বামী এই যুগল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন কিন্তু বিগ্রহ তাঁহার মনোমত না হওয়ায়, তিনি উক্ত বিগ্রহ স্থানীয় লোকেদের হস্তে দিয়া দেন। কাল কষ্টিপাথরে নির্ম্মিত যুগল মূর্ত্তি এবং বল্লভজীউর বিরাট মন্দির একটি দর্শনীয় বস্তু। আবার এরূপও শোনা যায় যে, প্রস্তরখণ্ডখানি গঙ্গার উপর দিয়া ভাসিয়া বল্লভপুরের ঘাটে আসিয়া উঠে এবং বিগ্রহও নাকি ঘাটের ধারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত নিমাইচরণ মল্লিকের পিতা নয়ানচাঁদ মল্লিক বর্ত্তমান সুন্দর মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়া গঙ্গার ধার হইতে বল্লভজীউ ও

রধিকার যুগলমূর্ত্তি স্থানান্তরিত করেন। মন্দিরের উচ্চতা ৬০ ফুট, দৈর্ঘ্য ৫০ ফুট এবং প্রস্থ ৪০ ফুট; মন্দিরের প্রবেশপথ দক্ষিণ মুখে এবং ইহার সম্মুখে একটি সুবৃহৎ নাটমন্দির আছে। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর রাধাবল্লভজীউর এক জন ভক্ত ছিলেন এবং দেবসেবাদির জন্য তিনিও বহু অর্থ ব্যয় করেন। মন্দিরগাত্রে দাতা ও শিল্পির নাম এবং মন্দির নির্ম্মাণের সময় উৎকীর্ণ আছে।

"রাধাবল্লভের মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দুই দফার ৮৩৬৲ পাওয়া যায়, এতদ্ভিন্ন নিমাইচরণ বিগ্রহের নিত্য সেবার জন্য ৩৬৲ আয়ের স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।" * ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা "হুগলী জেলার বল্লভপুরে নয়নচাঁদ 'বল্লভজী ও রাধিকা'র যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন" বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিগ্রহ বহু প্রাচীনকাল হইতেই ছিল; নয়নচাঁদ কেবল মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

বল্লভপুরের মন্দির সম্বন্ধে **List of Ancient Monuments in Bengal** নামক সরকারী গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

"VALLABHAPUR—Temple of Radhavallabha—The temple of Radhavallabh is situated in the village of Vallabhpur, about a mile and a half from Serampure Station, in the sub-division of Serampore.

There is a tradition that Virbhadra Goswami of Khardah brought a piece of stone from the Nawab of Gaur. Out of this stone, the first image that was hewn was that of Radhavallabh and as the idol was not to his liking, he made it over to the people of Vallabhpur. According to this tradition, Radhavallabh must be more

* সুবর্ণ বণিক কথা ও কীর্ত্তি, পৃঃ ২

than 350 years old. But its present temple is comparatively of very recent date. Some say that it is only some 70 or 80 years old. The ruins of the old temple on the side of the river Hooghly are visible even at the present day. Of the festivals performed in honour of this deity, Snanjatra and the Car festival are very famous. Formerly on the occasions of these festivals, the idol of Jagannath of Mahesh used to come here but owing to dispute, that practice has been discontinued and a new Jagannath made by the order of late Siva Krishna Datta is exhibited at the time of its own to meet its expenses. The temple of Radhavallabh is of an ordinary character, having only one steeple in it." (Page 46).

শ্রীরামপুর রেল ও ষ্টেশনের অনতিদূরস্থ গোরস্থানে ডাক্তার উইলিয়াম কেরী, জন মার্শম্যান ও জন ওয়ার্ড এই তিন জন লোকহিতৈষী মহাত্মার সমাধি বিদ্যমান। এই স্থানে শ্রীরামপুরের সেণ্ট ওলাফ গির্জ্জায় একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরফলকেও উঁহাদের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত আছে :

"In addition to their many other labours in the cause of religion and humanity from the opening of the church in 1805 to the end of their lives gave their faithful and gratuitous ministrations to the congregation here assembled."

উক্ত সমাধিক্ষেত্রে আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাধি আছে। তিনি হইতেছেন দিনেমার গবর্ণমেণ্টের বিচারক এবং তৎকালীন শ্রীরামপুরের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি জে এস হলেনবার্গ (J. S. Hohlenburg)। তিনি ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কোপেনহেগেনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁহার সমাধি-গাত্রে এই কথা লিখিত আছে :

"Chief of Danish Majesty's Settlement of Fredericknagore. It was erected by a number of European and Native inhabitants in commemoration of his singular worth both public and private . . . He was distinguished for every virtue which belongs to a good Magistrate." *

শ্রীরামপুরে দিনেমারগণের বিচার পদ্ধতি একটু অদ্ভুত রকমের ছিল; বিচারপতিকে মুখে গিয়া বলিলেই দিনেমার জজ বিচার করিতেন এবং বিচারের সময় বাদী বা প্রতিবাদীর জবানবন্দী লওয়া হইত না বা কোন কোর্ট-ফীর প্রয়োজন হইত না। বিচারপতি উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া বিচার নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন। এই সম্বন্ধে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত দিনেমার-জজের বিচার সম্বর্দ্ধে একটি গল্প নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

কোন সময়ে শ্রীরামপুরের গোস্বামী মহাশয়দিগের সহিত একটি লোকের বিবাদ হইয়াছিল; সেই লোকটি বিচারকের নিকট গিয়া নালিশ করিলেন এবং নালিশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিচারককে বিলক্ষণ উপহার সামগ্রীও দিলেন। তৎকালে তাহার গাত্রে একখানি লাল রঙের শাল ছিল। জজ-সাহেব উপহার পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কহিলেন 'মিস্তে তুমি ঘরে জেতে কর।' গোস্বামী মহাশয় এই সন্ধান পাইয়া জজসাহেবকে অধিকতর উপহার সামগ্রী দেওয়ায় তিনি কহিলেন 'বাবা তোর ডর নাই, তোর ডিক্রী তোর লাকে (Luck) ঝুলিতেছে।' পরদিন বাদী গঙ্গাজলী সাদা শাল এবং প্রতিবাদী লাল শাল গায়ে দিয়া জজ-সাহেবের নিকটে গিয়া হাজির হইল।

জজ-সাহেব দেখিলেন বাদীর গায়ে সাদা শাল ও প্রতিবাদীর গায়ে লাল শাল; বিশেষতঃ প্রতিবাদী (গোস্বামী মহাশয়) তাহাকে অধিকতর

* শ্রীরামপুর—শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

উপহার-সামগ্রী দিয়াছেন। ইহা চিন্তা করিয়া তিনি মাটির দিকে চাহিয়া রায় দিলেন যে 'রাঙা শাল ডিক্রী।' তখন বাদী জজ-সাহেবের নিকট গিয়া দুঃখ জানাইয়া কহিলেন 'হুজুর কি হইল?' তাহাতে হাকিম কহিলেন 'বাবা আমি কি করিতে পারি; তুমি পূর্ব্ব দিন লাল শাল গায়ে দিয়া আসিয়াছিলে, তাহাতে তোমাকে বাদী মনে করিয়া লাল শাল ডিক্রী দিয়াছি। এখন হাকিম লড়ে ত হুকুম লড়ে না—আমি কি করিব, তুমি নিজের দোষে লজ্জা পাইলা। *

শ্রীরামপুরের গোস্বামী বংশ, সাহাবংশ ও দে বংশ বহু প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ। গোস্বামী বংশের আদি নিবাস পাটুলি গ্রাম, সেওড়াফুলি রাজার নিকট হইতে জমি লাভ করিয়া তাঁহারা এই স্থানে বসবাস করেন এবং বিষ্ণুপুরের রাজার অনুগ্রহে শ্রীশ্রীরাধামোহন, গোপালজীউ ও শ্রীরাধিকা এই তিন দেববিগ্রহের সেবাতে নিযুক্ত হইয়া বহু নিষ্কর দেবোত্তর জমি প্রাপ্ত হন; ইঁহাদের কৌলিক উপাধি চক্রবর্ত্তী। এই বংশে রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে "রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী মেমোরিয়াল হল" নির্ম্মিত হইয়াছে।

এই রাজ-বংশে বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। পরে আলিপুরের প্রসিদ্ধ বোমার মামলায় তিনি রাজসাক্ষী হওয়ায় বহু নির্দ্দোষী ব্যক্তির ধৃত হইবার সম্ভাবনা হয়। তাহার এই দেশোদ্রোহীতার জন্য জেলের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ী বীর কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাহাকে রিভলবারের গুলিতে হত্যা করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনায় বঙ্গদেশে তুমুল আন্দোলন হয়। নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ "মৃত্যুঞ্জয়ী কানাই" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে।

পূর্ব্বোক্ত ভবনে মিউনিসিপ্যালিটির আপিস ও শ্রীরামপুর পাবলিক

* বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে, পৃষ্ঠা ৮৮



নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

লাইব্রেরী অবস্থিত। শ্রীরামপুরের সাহাবংশও বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও দান ধ্যানের জন্য বিখ্যাত; এই বংশের ক্ষেত্রমোহন সাহা শিবরাত্রি উপলক্ষে মেলার অনুষ্ঠান ও অনাথদিগের সেবার জন্য ট্রাষ্ট করিয়া বহু অর্থ দান করিয়া যান। শ্রীরামপুরের দে-বংশও সঙ্গতিপন্ন এবং ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীরামপুরের যাবতীয় জনহিতকর কার্য্যে ইহার অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। ইঁহারা তিলি বংশোদ্ভব। এই বংশের রামচন্দ্র দে ১২৩০ সাহের আষাঢ় মাসে পরোলোকগমন করিলে তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর সহিত অনুমৃতা হন। ইহাই সম্ভবতঃ শ্রীরামপুরের শেষ সহমরণ। আর এক জন মহাপ্রাণ ব্যক্তির নামোল্লেখ না করিলে শ্রীরামপুরের কাহিনী অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে, তিনি হইতেছেন স্বর্গীয় মাণিকলাল দত্ত; ১৩৩৪ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি পাঁচ লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকার যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি দেবসেবার ও শ্রীরামপুরের বহু জনহিতকর কার্য্যের জন্য দান করিয়া যান।

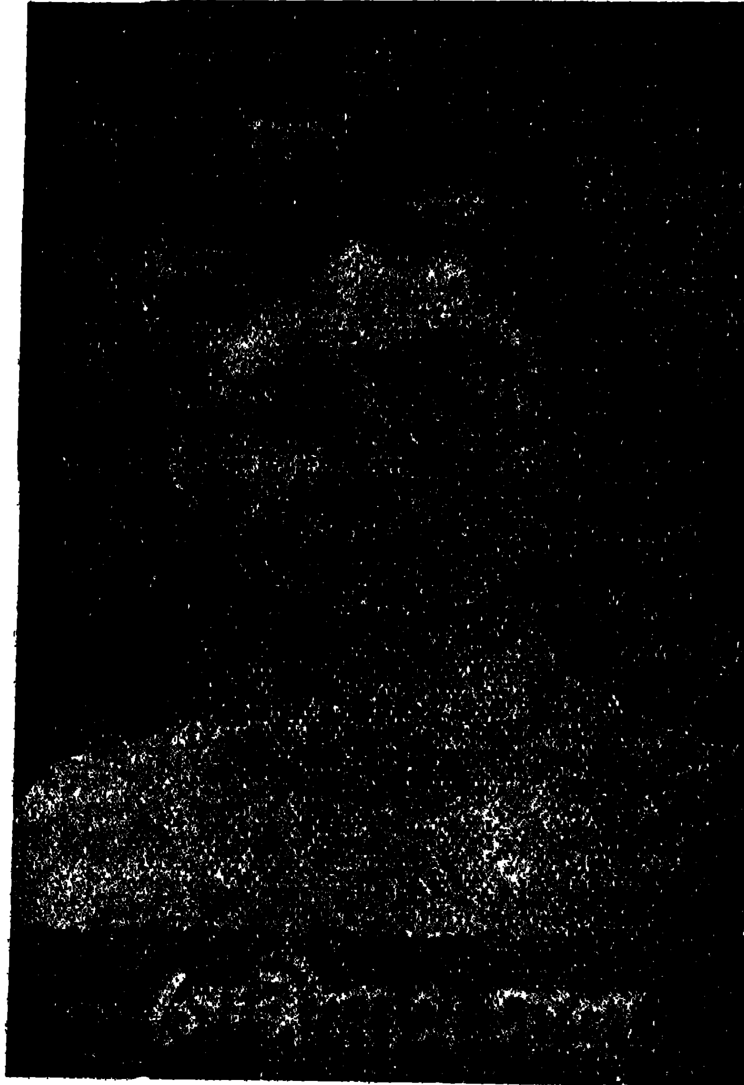
গোপীনাথ সাহা

শ্রীরামপুরের স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ সাহার পুত্র গোপীনাথ সাহা ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে, তৎকালীন কলিকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্ট ভ্রমে, মিঃ ডে নামক জনৈক সাহেবকে হত্যা করেন। সেই জন্য গোপীনাথের প্রাণদণ্ড হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে বাঙ্গলা দেশে শাসননীতির নিষ্ঠুর পীড়নে বহু ব্যক্তি কারাবাস করেন। ইহাদের বিনা বিচারে কারাবাস লইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে সরকারের বিরুদ্ধে এক দফা বাক্‌যুদ্ধ হয় এবং দেশবন্ধু জয়ী হন। পরে সিরাজগঞ্জে জাতীয় সম্মেলনে দেশবন্ধু গোপীনাথের দেশপ্রেমের উল্লেখ করিয়া একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন।

বিপ্লবী গোপীনাথ সাহার জবানবন্দির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম :—"আজ বড় শুভদিন। মা তাঁহার বক্ষে চিরদিনের তরে বিশ্রাম লাভের জন্য আমাকে ডাকিতেছেন, তাই আমি যাইতে চাই। মায়ের কাজে জীবন উৎসর্গ মানসেই আমি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বাঙ্গালার বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। আমি গত বৎসর সংবাদপত্র পড়িয়া জানিতে পারি, মিঃ টেগার্ট নামক জনৈক ইউরোপীয় ভদ্রলোক পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রভূত অভিনব জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া আমাদের প্রচেষ্টার বাধা দিবার জন্যই ভারতে ফিরিয়া আসিতেছেন। সেই সময় হইতেই আমাদের স্বাধীনতা ও তাহার প্রতিবন্ধক সম্বন্ধে নানারূপ চিন্তা আমাকে উত্তেজিত করে; এই চিন্তার মাঝে মাঝে আমার মাথা এরূপ গরম হইয়া থাকিত যে, আমার আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত বন্ধ হইবার উপক্রম হইত। রাত্রিতে আমি ছাদের উপর পাইচারি করিতাম, ঘুম আসিত না। আমার যখন এই অবস্থা তখন আমি মায়ের ডাক শুনিতে পাই; আদেশ হইল, "উহাকে অনুসরণ কর, ছাড়িস্ না।"

সেই সময় হইতে আমি টেগার্ট সাহেবের সম্বন্ধে যথাসাধ্য তথ্য সংগ্রহ করিতে লাগিয়া গেলাম। ক্রমে জানিতে পারিলাম, তিনি বাংলার স্বদেশীযুগে কলিকাতায় পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। সেই সময় তিনি যে ভীষণ অত্যাচার ও নির্য্যাতন চালাইয়া ছিলেন, তাহা হইতে কি দেশ-সেবক কি নিরপরাধ কাহারাও নিস্তার ছিল না। বহুলোক বিনা বিচারে অন্তরীণে প্রেরিত হইয়াছিল, এমন কি রাজনীতির সহিত ঘুণাক্ষরেও সম্বন্ধ ছিল না, এমন লোকেরও নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা স্বয়ং টেগার্ট করিয়াছিলেন। অতঃপর আরও অনুসন্ধানের পর জানিতে পারি যে টেগার্ট—যিনি বালেশ্বরে পুলিশ ও জনসাধারণের মধ্যে যে স্মরণীয় সংঘর্ষ হয়, তাহাতে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, অতএব আমার শ্রদ্ধাস্পদ, পূজনীয় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিতও তাঁহার একটি বিশেষ

সম্বন্ধ দেখিতে পাইলাম। আরও জানিতে পারিলাম, টেগার্ট একজন সিনফিন আয়র্লণ্ড নিবাসী। তিনি স্বদেশবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামেও বাধা দিতে ত্রুটি করেন নাই, যদিও তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।



এই সমস্ত প্রায়ই যখন গভীর ভাবে চিন্তা করিতাম তখন যেন মায়ের ডাক শুনিতাম,—মা যেন বলিতেছেন "লোকটাকে জগৎ থেকে সরিয়ে দে।" টেগার্টকে আমার প্রথম দেখা লালবাজারে পুলিশদিগকে

রাজকীয় পুলিশ মেডাল বিতরণ অবস্থায়। তারপর নিউ মার্কেটে ফুলের ষ্টলের নিকট বহুবার দেখি। অনেকবার আমি আগ্নেয় অস্ত্রাদি সঙ্গে লইয়া ইডেন গার্ডেন ও অন্যান্য অনেক স্থান পর্য্যন্ত উহার অনুসরণ করি, বহুবার লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িতেও উদ্যত হইয়াছি, কিন্তু মায়ের নিকট হইতে শেষ আদেশ না পাওয়ায়, এই কার্য্য হইতে বিরত হইতে বাধ্য হই। আমি প্রায়ই চিন্তা করিতাম, লোকটাকে খুন করিব কি না। গ্রেপ্তার হইবার দুই তিন দিন পূর্ব্বে আমার আবার পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসিল। মাথা আবার গরম হইয়া উঠিতে লাগিল—না পারি নিদ্রা যাইতে, না থাকে ক্ষুধা তৃষ্ণা। মাত্র ঐ এক চিন্তা। কিছুতেই যেন স্বস্তি পাই না। মনে হয় আমার ঘরের মধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছে, দৌড়াইয়া ছাদের উপর যাই, ও বহুক্ষণ পায়চারী করি। আমি যেদিন ধৃত হই, সেইদিন অতি প্রত্যুষে গৃহত্যাগ করিয়া অন্যমনস্ক ভাবে ময়দানে আসিয়া পড়ি। মনে হইল এই মিঃ টেগার্ট এবং তখনই গুলি চালাই। কত বার গুলি ছুঁড়িয়াছিলাম ঠিক স্মরণ নাই, কিন্তু বহুবার যে ছুঁড়িয়াছি, তাহা আমার বেশ মনে আছে। বড় আশঙ্কা ছিল, পাছে লোকটা আবার বাঁচিয়া উঠে। গুলি করিবার পূর্ব্বে বা পরে আমি বাঁচিব কি মরিব, এ চিন্তা আমার আদৌ আসে নাই। তারপর ডাকাত, ডাকাত, হত্যা, হত্যা, পাকড়ো পাকড়ো ইত্যাদি বলিয়া যখন জনস্রোত চিৎকার করিয়া উঠিল, তখন আমি দৌড় দিতে আরম্ভ করি। মনে হইতে লাগিল, যেন রাস্তাগুলি আমায় চারিদিকে ঝুলিতেছে। লোকজনের চিৎকারে ক্রমেই আমি অতিষ্ঠ হইয়া পড়ি, আমার জিহ্বা শুকাইয়া যায়, আর দৌড়ান অসম্ভব হইয়া পড়ে। এমন সময় একখানি টমটম দেখিতে পাইয়া টমটম ওয়ালাকে দ্রুতবেগে চালাইতে অনুরোধ করি, চীৎকার করিয়া বলি "হাঁকাও, আমি দেশের কাজ করিয়াছি, বেশ ভাল কাজ করিয়াছি; ইহাতে আমার কিছুমাত্র অন্যায় হয় নাই।" আমি

টমটমের পাদানিতে দাঁড়াইয়া গাড়োয়ানের সহিত কথা বলিতেছি, এমন সময় জনতা আসিয়া আমাকে গ্রাস করে। আমি ধৃত হইলাম। অতঃপর এই সমস্ত ব্যাপারে যাহা হয় তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি হইল না—বেশ উত্তম মধ্যম খাইলাম। তাহাতেই আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি। তারপর যখন চৈতন্য ফিরিয়া পাইলাম—তখন আমি থানায়।

থানা এবং মেডিকেল কলেজের সমস্ত বৃত্তান্ত শেষ করিয়া গোপী নাথ বলে, "ইহার পর আমাকে লালবাজার পুলিশ কমিশনারের কক্ষে লইয়া যাওয়া হইল। আমার তখনও ধারণা, পুলিশ কমিশনার আর ইহলোকে নাই। কিন্তু তাঁহাকে যখন আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিলাম, হতভম্ব হইলাম, কি করিতে কি করিয়াছি ভাবিয়া আকুল হইলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ভুল করিয়াছ নয় কি ?" আমি জবাব দিলাম, "কি করিয়া এটি সম্ভব হইতে পারে, আমার এখনও মনে হয় যে, আমি সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল গুলী ছুঁড়ি সে গুলী একটি প্রবাহের সৃষ্টি করিয়া মিঃ টেগার্টের অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। আমার নাম জিজ্ঞাসা করাতে আমি কিছুই জবাব দিলাম না। ইহার পরে ইলিসিয়াম রোডে কলিকাতা পুলিশের প্রধান আড্ডাতে নীত হইলাম, সেখানে একটি রথযাত্রা উৎসবে বহু সাহেব ও বাঙ্গালী পুলিশ কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। আমি ভূপেন চট্টোপাধ্যায়কে বলিলাম, যে "এখন আমাকে বিরক্ত করিবেন না, আমার শরীর তত সুস্থ নয়। যাহা বক্তব্য তাহা কাল ১২টা কি ১২॥ টার সময় বলিব। এখন বিরক্ত করলে কিছুই ফল পাবেন না।"

সেদিন রাত্রি আট ঘটিকার সময় স্বয়ং টেগার্ট সাহেব আসিয়া হাজির। এবারও ঐ এক প্রশ্ন—"কেমন ভুল করিয়াছ কিনা ?" তখন ভাবিলাম, "কথা না বলিয়া আর লাভ কি !" বলিলাম "হাঁ আপনাকে হত্যা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ভগবানের অশেষ করুণায় আপনি এ যাত্রায়

রক্ষা পাইলেন।” পর দিন বেলা বারটা বা একটার সময় গোয়েন্দা পুলিশের আড্ডায় লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে আমি ভূপেন চট্টোপাধ্যায়ের নিকট বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে বলিলাম “দেখুন বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে আপনাকে একটি প্রতিশ্রুতি দান করিতে হইবে—আমার বক্তব্য বলিবার পর, কেহ যেন আসিয়া এবং প্রশ্ন করিয়া বিব্রত না করে।” আমি বলিলাম “নাম গোপীনাথ সাহা, বাড়ী শ্রীরামপুর ক্ষেত্রমোহন ষ্ট্রীটে, যে রাস্তার ভূতপূর্ব্ব নাম ছিল অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট, আমার পিতার নাম স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ সাহা।” পরদিন পুনরায় টেগার্টের নিকট আসি। সেখান হইতে আমাকে ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট পুলিশ আদালতে ও পরে প্রেসিডেন্সি জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

আমার সম্বন্ধে ব্যক্তব্য ইতি। জনৈক নির্দ্দোষ সাহেবকে যে খুন করিয়াছি, সেজন্য যারপর নাই মর্ম্মাহত, সাহেব হইলেই যে আমার শত্রু হইবে তাহা আমি মনে করি না। যাহারা এই ব্যাপারে আহত তাহাদের জন্যও আমি বিশেষ দুঃখিত। কোন কাজ করিবার সময় দেশীয় হোক আর বিদেশীই হোক যেই বাধা দিতে আসে, সেই শত্রুর চেয়ে বেশী। মৃত সাহেবের আত্মার মুক্তির জন্য আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি। এখন আমার ইহার অতিরিক্ত বলিবার কিছুই নাই তবে বিচার শেষ হইয়া গেলে, দণ্ডাঘাত পাতিয়া লইবার পূর্ব্বে আমি দেশবাসীকে সামান্য কিছু বলিবার ইচ্ছা করি। আশা করি, প্রার্থনা মঞ্জুর হইবে। ইহার জন্য অধিক সময়েরও প্রয়োজন বোধ করি না, পাঁচ মিনিটেই যথেষ্ট। আমি জেল হইতে মায়ের নিকট একখানা চিঠি লিখিতে চাই। আশা করি এই অনুমতি আমাকে দেওয়া হইবে।

আমি দেশমাতৃক্রোড়ে আশ্রয় ভিক্ষা করি, এই কথা স্মরণ রাখিয়া দণ্ডের বিধান দিলে ভাল হয়, “আমি কিছুতেই জেলে থাকিতে পারিব না। আমি মায়ের নিকট যাইতে চাই।”

প্রতিদিন প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিবার সময় বিচারপতির কথা শেষ হইতে না হইতেই গোপীনাথ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠে—"আমি চলিলাম, আমার রক্তের প্রতিবিন্দু যেন ভারতের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজ বপন করে।" অতঃপর বিচারপতি ও জুরীরা আসন পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, গোপীনাথ আবার বলিয়া উঠে—"যতদিন পর্য্যন্ত জালিনওয়ালাবাগ ও চাঁদপুরের ঘটনা ঘটিবে, আপনারা মনে রাখিবেন যতদিন Repression চলিবে, ততদিন এইরূপই হইবে।

এমন একদিন আসিবে, যে দিন সরকারকে ইহার ফলাফল চূড়ান্তরূপে ভোগ করিতে হইবে। টেগার্ট আমার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন বলিয়া নিজেকে যেন নিরাপদ বলিয়া না মনে করেন, কারণ আমার অসমাপ্ত কার্য্য অন্যের জন্য রাখিয়া গেলাম।"

হুগলী জেলার মধ্যে মাহেশ একটি প্রাচীন স্থান; বিশেষ করিয়া এই স্থানের জগন্নাথ দেবের রথের খ্যাতি দূর-দূরান্তরে প্রচারিত। কোন সুদূর অতীত কাল হইতে যে, এই রথযাত্রা উৎসব মহাসমারোহের সহিত হইতেছে, বর্ত্তমানে তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, প্রাচীনকালে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব শ্রীক্ষেত্র হইতে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া এইস্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া, মাহেশে মন্দির নির্ম্মাণ এবং দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত ঘটনার স্মরণার্থে সেই জন্য অদ্যাবধি জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা তিথিতে স্নানযাত্রা উৎসব মহা ধুমধামের সহিত প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

জগন্নাথদেবের মন্দির

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব, তাঁহার **Statistical Account of the Hooghly District** নামক গ্রন্থে, মাহেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির ষোড়শ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া লিখিয়াছেন। এই সম্বন্ধে জনশ্রুতি যে, ধ্রুবানন্দ নামে এক ব্রহ্মচারী গঙ্গাতীরে বালুকার মধ্যে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন এবং তিনিই উক্ত মূর্ত্তিগুলি

জগন্নাথদেবের স্বপ্নাদেশ পাইয়া মাহেশে প্রতিষ্ঠা করেন। হুগলী কালেক্টরী হইতে গৃহীত একখানি দেবোত্তর সম্পত্তির তায়দাদের নকলে সেওড়াফুলি রাজবংশের যাট দফায় দেবোত্তর সম্পত্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত বিবরণী মধ্যে জগন্নাথপুর নামক পল্লী শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সেবার জন্য দান করা হয় বলিয়া উল্লিখিত আছে। সেওড়াফুলি রাজবংশের রাজা মনোহর রায়, মাহেশে জগন্নাথদেবের মন্দির প্রথম নির্ম্মাণ করিয়া দেন বলিয়া স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (৩য় খণ্ড) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

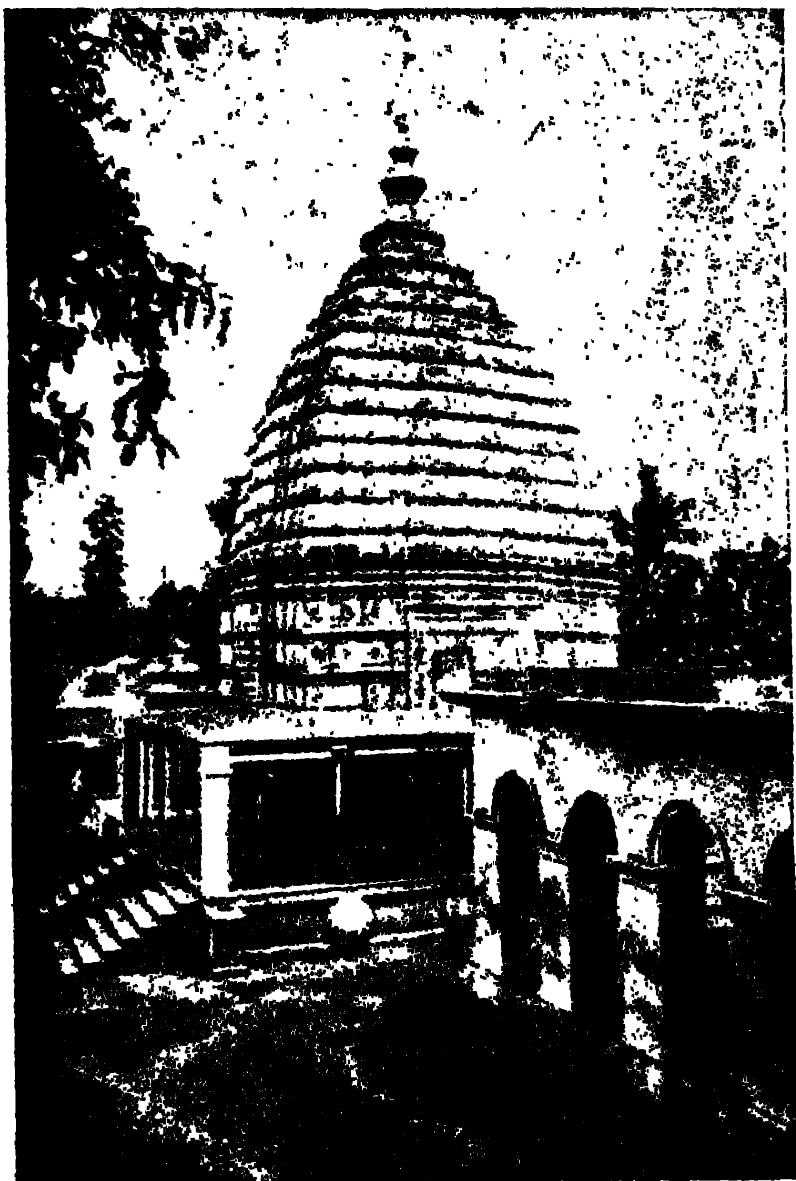
জগন্নাথদেবের মন্দির সম্বন্ধে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত **List of Aacient Monuments in Bengal** নামক সরকারী গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

"It is said that the Jagannath of Mahesh is about the same date with the Radhahallabh of Vallbhpur. i. e. more than 320 years old. The idol Jagannath along with Subhadra and Valarama is made of neem wood. It has a little Zamindory to meet its expenses. On the occasion of Snanjatra and car festivals much numbers of people gather here."

শত বৎসরের পূর্ব্বেও স্নানযাত্রা এবং রথযাত্রা উপলক্ষে এই স্থানে তিন লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল বলিয়া ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন তারিখের 'সমাচার দর্পণে' দেখিতে পাওয়া যায়। পুরীর পর রথযাত্রা উপলক্ষে এইরূপ জনসমাগম ভারতবর্ষে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। ১২২৫ সালে রথযাত্রা উপলক্ষে রথের চাকা রাস্তায় বসিয়া যাওয়ায়, রথ আর যাইতে পারে নাই; এই সম্বন্ধে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুলাই তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

"২ রবিবার রথযাত্রা হইল তাহাতে মাহেশের রথ অতি বড় এক

বড় রথ এতদ্দেশে নাই লোক যাত্রাও অতি বড় হয় এইরূপ প্রতি বৎসর রথ চলিতেছে কিন্তু এ বৎসর রথ চলন স্থানে নূতন রাস্তা হওনে



মাহেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির

অধিক মৃত্তিকা উঠিয়াছে এবং অতিশয় বৃষ্টি প্রযুক্ত কর্দ্দম হইয়াছে তাহাতে রথ কতক দূর আসিয়া রথের চক্র কর্দ্দমে মগ্ন হইল কোন প্রকারেও লোকেরা উঠাইতে পারিল না শেষে লোকযাত্রা ভঙ্গ হইল ইহাতে রথ

চলিল না। তাহাতে লোকেরা আপন বুদ্ধি মত নানা প্রকার কহিতে লাগিল—কেহ কেহ ঠাকুরের প্রতিবর্ষ সোনার হাত আসিত এ বৎসর রূপার হাত আসিয়াছে। আর কেহ কহিল যে উড়িষ্যাতে রথ চলে নাই অতএব এখানেও চলিল না। যে হউক রথ না চলাতে অনেকের অনেক ক্ষতি হইল যে ব্যক্তি বাজার ইজারা করিল এবং যে ব্যক্তি ঠাকুরের মন্দির ইজারা করিল তাহাদিগের লাভ কিছুমাত্র হইল না এবং দোকানি-পসারী কলিকাতা হইতে এবং অন্য অন্য স্থান হইতে আসিয়াছে তাহাদিগেরও সামগ্রী বিক্রয় না হওয়াতে যথোচিত ক্ষতি হইল। যখন নিতান্ত রথ না চলিল তখন ২৪ আষাঢ় মঙ্গলবার বিকালে জগন্নাথদেবকে রথ হইতে নামাইল ও রাধাবল্লভ ঠাকুরের বাটী শ্রীমণ্ডিরে লইয়া রাখিল ও মেলাতে লোক যাত্রার অভাব প্রযুক্ত জিনিস অতি সস্তা হইয়াছে অধিক কি লিখিব ১ পয়সাতে আনারস চারিটা পাওয়া যাইতেছে।"

মাহেশের জগন্নাথদেবের প্রথম রথখানি স্থানীয় এক মোদক নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া ওম্যালী সাহেব তাঁহার **Hughly District Gazetters** নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন।

বহুদিন অবধি জগন্নাথদেব মাহেশ হইতে রথে করিয়া বল্লভপুরে যাইয়া নয়দিন যাবৎ রাধাবল্লভের মন্দিরে থাকিতেন; যে স্থানে থাকিতেন তাহার নাম গুঞ্জবাড়ী। কিন্তু কোন কারণে জগন্নাথদেবের সেবায়েতগণের সহিত বল্লভজীউর সেবায়েতগণের ঝগড়া হয় এবং পূর্ব্ব প্রথানুযায়ী জগন্নাথের বল্লভজীউর মন্দিরে থাকা বন্ধ হয়।

স্বর্গীয় শিবকৃষ্ণ দত্ত, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া আর একটি জগন্নাথ তৈয়ারী করিয়া দেন এবং উক্ত মূর্ত্তি তদবধি রথযাত্রার দিন হইতে উল্টারথ পর্য্যন্ত রাধাবল্লভের মন্দিরে প্রদর্শিত হয়। এই সম্বন্ধে **List of Ancient Mouuments in Bengal** নামক সরকারী গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, তাহা ৬৬৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইয়াছে।

১৬৪০ খৃষ্টাব্দের নবাব গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করিবার সময় হঠাৎ ভীষণ ঝড়ে আক্রান্ত হইয়া জগন্নাথদেবের মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন।



১৬৪১ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত জগন্নাথ দেবের সেবার জন্য দেবোত্তর সম্পত্তির প্রাচীন দলিলের প্রতিলিপি

মন্দিরের সেবায়েত রাজীব অধিকারী নবাবকে আদর আপ্যায়ন করায়, তিনি বিশেষ প্রীত হন এবং সেবায়েৎগণকে "অধিকারী" উপাধি দেন। জগন্নাথপুর নামক পল্লী জগন্নাথদেবের সেবার জন্য সেওড়াফুলি রাজ-বংশের কোন ব্যক্তি দান করিয়া যান, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি; নবাব বাহাদুর সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তাকে জগন্নাথপুরের রাজস্ব রহিত করিয়া উক্ত মহাল নিষ্কর দেবোত্তর করিয়া দিবার নির্দ্দেশ দেন। জগন্নাথপুরের রাজস্ব রহিত করিয়া "দেবোত্তর" করিয়া দেওয়ায়, এই মহালের যে রাজস্ব কমিয়া গেল, তাহা আর্যা পরগণা হইতে আদায় করা হইবে বলিয়াও এই দলিলে * লেখা আছে দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, নবাবের এই দানের পর হইতেই জগন্নাথদেবের মন্দিরের এবং রথযাত্রার খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া যায়।

সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা নবাব খাঁন আলি খাঁন ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথের সেবার জন্য জগন্নাথপুর মহালের রাজস্ব মকুব করিয়া যে ছাড়পত্র দেন উক্ত দলিলখানির প্রতিলিপি ৬৮০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল। দলিলখানি বঙ্গভাষায় লিখিত এবং শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট ইহা রক্ষিত আছে। এই প্রাচীন দলিলে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহা পাঠোদ্ধার করিয়া উদ্ধৃত হইল:

"৺জগন্নাথদেব ঠাকুর

নওবাব খাঁনে আলি খান—

লিখিতং চৌধুরিয়াং ও কানগুয়ানপরগণা বোড়ো দরুন সরকার ষাতগাউ জায়গীরী শ্রীযুত ৺সাহেবজীউ মৌজে জগন্নাথপুর খারিজ জমা শ্রীযুত ৺সেবার অর্থে দরোবস্থ (১) হাসীল ও জঙ্গল বস্তসীমা (২) বছিপু

* দলিলের প্রতিলিপি শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ কর কর্ত্তৃক গৃহীত

(১) 'দরোবস্ত' অর্থাৎ সমস্ত (taking as a whole)

(২) 'বস্তসীমা' অর্থাৎ চোহদ্দী বা সীমানাগুলি ঠিক রাখিয়া (preserving the boundry in tact)

(৩) সজলস্থলে দেবোত্তর দিলাম জুতিয়া জোতাইয়া শ্রীরাজীব অধিকারী সেবা করহ কস্মিন কালে ইহার জমার সহিত দায় নঞ্রি হাত সনে জমা ছিল তাহা আসরা (৪) পরগণায় দিলা ইতি—১০৬০ হাজার ষাটি ১৯ রমজান।

[সাক্ষী]—অস্পষ্ট, শ্রীপ্রানকৃষ্ণ সেন, শ্রীসেবারাম রায়, শ্রীরাঘব দত্ত"

দলিলের শীর্ষে তিনটি শিলমোহর দেওয়া আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই দেশের দেওয়ানী ভার গ্রহণ করিলে, ইহা তাহাদের নিকট দাখিল করা হয় এবং তাহারা জগন্নাথপুর মহাল নিষ্কর বলিয়া মঞ্জুর করেন ও দলিলের উপর তাহা বাঙ্গলায় লিখিয়া দেন। দলিলের পশ্চাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শীলমোহর এবং মেজর কোর্টের সাক্ষর আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজা মনোহর রায় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত জগন্নাথের মন্দির ভগ্ন হইয়া যাইলে ১২৬৫ সালে সপ্তগ্রামের মল্লিক বংশোদ্ভব নিমাইচরণ মল্লিকের নির্দ্দেশানুযায়ী পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের অনুকরণে সত্তর ফুট উচ্চ বর্ত্তমান মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়। তিনি ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে বড়বাজারে জন্মগ্রহণ করেন এবং নানা সংকার্য্য ও তীর্থস্থানাদিতে ধর্ম্মশালা, স্নানের ঘাট, দেবমন্দিরাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি হিন্দু-ধর্ম্মোক্ত বিবিধ কার্য্যের জন্য বত্রিশ লক্ষ টাকা তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টে গচ্ছিত রাখিয়া ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পরলোকগমন করেন। কিন্তু তাঁহার পরলোকগমনের পর তাহার পুত্র-পৌত্রগণ দান করিবার ন্যস্ত অর্থ লইয়া বিবাদ করিলে পরিশেষে মামলা হয় এবং তাঁহার পঞ্চম পুত্র রামমোহনের হস্তে যাবতীয় ব্যয়ভার বিচারপতি অর্পণ করেন। এই সম্বন্ধে ১২৬৩ সালের ২২শে

(৩) 'বহিপু' অর্থাৎ ঠিক করিয়া রাখা (keeping in tact)

(৪) 'আসরা' অর্থাৎ আর্যা পরগণা।

ফাল্গুন তারিখের "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়" পত্রিকায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"স্বর্গবাসী পুণ্যবাসী নিমাইচরণ,
মল্লিক আখ্যাতে যে খ্যাত ত্রিভূবন।
পুণ্যশীল দানশীল যার সম নাই,
পৃথিবী মধ্যেতে যার তুলনা না পাই ॥
অপ্রমিত দান করি যেই মহাজন,
তথাপি না হৈল তার চিত্ত বিনোদন।
এ কারণে মহামতি থাকিতে জীবন,
রাজহস্তে বহু ধন কৈলা সমর্পণ ॥
ন্যস্তধন সূত্রে কৈলা বিবাদ ঘটন,
স্বর্গ গমন পরে তাঁর পুত্র পৌত্রগণ ॥
এইরূপ বিবাদেতে বহুদিন গেল,
তথাপি সে ন্যস্তধন সদগতি না হৈল।
পরে বিচারকগণ করিয়া বিচার,
শ্রীরামমোহন হস্তে দিল ব্যয়ভার ॥"

নিমাইচরণ মল্লিকের অর্থে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইলে, বিগ্রহের বেদীতে তাঁহার তৃতীয় পুত্র এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নাম উৎকীর্ণ আছে। নিমাইচরণের কনিষ্ঠ পুত্র মতিলাল মল্লিক গঙ্গার ধারে সুদৃশ্য রাসমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

১২৯৫ সালে ডাঃ আশুতোষ দাস শ্রীরামপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আই-এম-এস হন, কিন্তু পরে সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া বহু ছাত্রকে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দিয়া হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রামে চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেন। এই নিরহঙ্কার চিরকুমার দেশসেবক ১৩৪৮ সালে পরলোকগমন করেন।

রথযাত্রা উপলক্ষে এইস্থানে মেলা বসিয়া থাকে এবং সেইজন্ত মাসাধিক কাল যাবৎ দেশ-দেশান্তর হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। পূর্ব্বে এই স্থানের মেলায় নর-নারী পর্য্যন্ত বিক্রয় হইত; ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে রথযাত্রা উপলক্ষে জনৈক ব্যক্তি জুয়াখেলার জন্ম মেলায় তাহার স্ত্রী বিক্রয় করিয়াছিল বলিয়া ১২২৬ সালের ৬ই আষাঢ় তারিখের "সমাচার দর্পণ" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে উক্ত সংবাদটি উদ্ধৃত হইল:

"১১ই আষাঢ় (২৪শে জুন) বৃহস্পতিবার রথযাত্রা হইবেক। অনেক অনেক স্থানে রথযাত্রা হইয়া থাকে কিন্তু তাহার মধ্যে জগন্নাথক্ষেত্রে রথযাত্রাতে যেরূপ সমারোহ ও লোকযাত্রা হয় মোং মাহেশের রথযাত্রাতে তাহার ন্যূন নহে এখানে প্রথম দিনে অনুমান এক দুই লক্ষ দর্শনার্থে আইসে এবং প্রথম রথ অবধি শেষ রথ পর্য্যন্ত নয়দিন জগন্নাথদেব মোং বল্লভপুরে রাধাবল্লভের ঘরে থাকেন, তাহার নাম গুঞ্জবাড়ী ঐ নয়দিন মাহেশ গ্রামাবধি বল্লভপুর পর্য্যন্ত নানাপ্রকার দোকান পসার বসে এবং সেখানে বিস্তর বিস্তর ক্রয় বিক্রয় হয়। ইহার বিশেষ বিশেষ কত লিখা যাইবেক। এমত রথযাত্রার সমারোহ জগন্নাথক্ষেত্র ব্যতিরিক্ত অন্যত্র কুত্রাপি নাই।

এবং ঐ যাত্রার সময় অনেক স্থান হইতে অনেক অনেক লোক আসিয়া জুয়া খেলা করে ইহাতে কাহারো কাহারো সর্ব্বস্ব নাশ হয়। এইবার স্নানযাত্রার সময়ে দুইজন জুয়া খেলাতে আপন যথাসর্ব্বস্ব হারিয়া পরে অন্য উপায় না দেখিয়া আপন যুবতী স্ত্রী বিক্রয় করিতে উদ্যত হইল এবং তাহার মধ্যে একজন খানকীর নিকটে দশটাকাতে আপন স্ত্রী বিক্রয় করিল। অন্য ব্যক্তির স্ত্রী বিক্রীতা হইতে সম্মতা হইল না তৎপ্রযুক্ত ঐ ব্যক্তি খেলায় দেনার কারণ কএদ হইল।"

মাহেশে জগন্নাথের মন্দিরের সহিত বল্লভপুরে রাধাবল্লভ জীউর মন্দির অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। রাধাবল্লভের নামানুসারেই এই স্থানের নাম

বল্লভপুর হইয়াছে। কথিত আছে যে, চাতরার রুদ্রপণ্ডিত দেববিগ্রহের প্রতিষ্ঠার্থে প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া, গৌড়ের রাজপ্রতিনিধির ভগ্ন প্রাসাদ হইতে আনীত প্রস্তরদ্বারা বল্লভজীউ ও রাধিকার যুগলমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। আবার কাহারও মতে খড়দহের বীরভদ্র গোস্বামী এই যুগলমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। এই সম্বন্ধে সরকারী গ্রন্থে লিখিত আছে :

"There is a tradition that Virbhadra Goswami of Khardah brought a piece of stone from the Nawab of Gaur. Out of this stone, the first image that was hewn was that of Radhavallbh and as the idol was not to his liking, he made it over to the people of Vallabhpur. According to this tradition, Radhavallabh must be more than 350 years old."

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গার ধারে বল্লভ জীউর মন্দির ছিল; উক্ত মন্দির ভগ্ন হওয়ায় ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে নয়ানচাঁদ মল্লিক বর্ত্তমান মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। মন্দিরগাত্রে দাতা ও শিল্পীর নাম এবং মন্দির নির্ম্মাণের তারিখ উৎকীর্ণ আছে। মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে বাৎসরিক ৮৩৬৲ আয়ের ব্যবস্থা আছে, এতদ্ভিন্ন নিমাই চরণ মল্লিকও নিত্য সেবার জন্য ৩৬৲ আয়ের স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা, নয়ানচাঁদ বল্লভজীও রাধিকার যুগলমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন লিখিয়াছেন কিন্তু মূর্ত্তি বহু প্রাচীনকাল হইতেই ছিল, (প্রায় পাঁচশত বৎসর) নয়ানচাঁদ কেবল বর্ত্তমান মন্দিরটি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

রাধাবল্লভের পুরাতন মন্দিরের নিকট ১২২৯ সালে শ্রীমতী টুনুমনী দাসী দ্বাদশ মন্দির ও গঙ্গারঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই সম্বন্ধে ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে 'সমাচার দর্পণের' নিম্নোক্ত সংবাদ উল্লিখিত হইল :

"মোকাম বল্লভপুরে রাধাবল্লভ ঠাকুরের পুরাতন মন্দিরের নিকট

"পুরাতন এক ঘাট বাঁধা ছিল সে ঘাট ভগ্ন হইয়াছে তাহাতে কলিকাতার গৌর সেটের স্ত্রী বিধবা শ্রীমতী টুমুমনী সেই ভগ্ন ঘাটের নিকট দক্ষিণে অতি উত্তম এক ঘাট বাঁধিয়াছেন সে ঘাট দীর্ঘে ও প্রস্থে বড় এবং শক্ত ও সুদৃশ্য হইয়াছে এবং সেই ঘাটে উপযুক্তমত দ্বাদশমন্দির প্রস্তুত হইয়াছে। *

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মাহেশের 'স্নানযাত্রা' সম্বন্ধে একটি কবিতা রচনা করেন; এই কবিতা হইতে তৎকালে স্নানযাত্রায় কিরূপ লোকসমাগম হইত এবং বঙ্গবাসী তদুপলক্ষে কি ভাবের আমোদ-প্রমোদ করিত, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। কবিতাটির স্থানে স্থানে অশ্লীলতা থাকিলেও, তৎকালীন সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা দেখাইবার জন্য নিম্নে কবিতাটি আংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল :

বৃষপূর্ণিমার দিবা, অপার আনন্দ কিবা
মাহেশে সুখের মহামেলা
স্নানযাত্রা প্রতি বর্ষে, এই দিন মহা হর্ষে,
মেলা পেয়ে করে সব খেলা ॥
হাড়ি মুচি যুগী জোলা, কত বা সেখের জোলা
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে চলে।
ঠেলাঠেলি চুলো চুলি, কাঁকে কাঁকে ঝুলোঝুলি
লোকারণ্য জলে আর স্থলে ॥
আগে পাছে পাকাপাকি আঁকা আঁকি তাকা তাকি
ঝাঁকা ঝাঁকি স্থান নাহি পায়।
এসে বাড়ী যত রাড়ী কাঁকে ক'রে কেলে হাঁড়ি
হাতে পাখা কাঁটাল মাথায় ॥

* সমাচার দর্পণ, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮২৩

ভদ্র যত মন শাদা, পরস্পর করি চাঁদা,
রুচির তরণী লয়ে ভাড়া।
যাহাতে আসক্তি যাঁর, সেই শক্তি সঙ্গে তার,
গরবেতে গোঁপে দেয় চাড়া॥
* * গায়ে বাটি তবলার মুখে চাঁটী,
পরিরাটী খান কসে কসে।
পূর্ণ হ'লে ইচ্ছা যেটা, স্নান আর দেখে কেটা
স্নান পান এক ঠাঁই বসে॥
লম্পট যুবক যারা বাচ করে ফেরে তারা
ধীরে ধীরে তীরে চালে ডিঙ্গে।
যেখানে * * সেইখানে গায় সারি
কাকের পশ্চাতে যেন ফিঙ্গে॥

ভাণ্ডারহাটি

ভাণ্ডারহাটি সদর মহকুমার একটি গণ্ডগ্রাম; বহু সুবর্ণ বণিক এই স্থানে বসবাস করেন। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, বালিকা বিদ্যালয়, পোষ্ট অফিস, প্রভৃতি এই গ্রামে আছে। এই স্থানের স্বর্গীয় নৃসিংহনাথ আড্ডি, তাঁহার মাতার স্মৃতি রক্ষার্থে ভাণ্ডারহাটি হইতে হরিপাল ষ্টেশন পর্য্যন্ত একটি পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দেন, বর্ত্তমানে উক্ত রাস্তায় বাস সার্ভিস চলিতেছে। এই স্থানের চৌধুরী বংশে অতুলচন্দ্র চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন, এবং জাহাজে রসদ জোগাইয়া তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

বিবিধ

সেনহাটী হুগলী জেলার পোলবা থানান অন্তর্গত একটি গণ্ড গ্রাম; জাগ্রতা বিশালাক্ষী দেবীর জন্য বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ। দেবীর বিরাট দ্বিভূজা মৃন্ময়ী মূর্ত্তি এই অঞ্চলের একটি দর্শনীয় বস্তু।

সেনহাটী

প্রাচীন কালে স্থানীয় হালদার বংশীয়গণ কর্ত্তৃক এই দেবী প্রতিষ্ঠিত হন এবং পরবর্ত্তী-কালে বর্দ্ধমানের মহারাজা ও উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায়গণ কর্ত্তৃক দেবীর সেবাদির সুব্যবস্থা হয়।

বর্ত্তমান মন্দিরের পার্শ্বে পুরান-পুকুর বলিয়া একটি জলাশয় আছে কিম্বদন্তী এইরূপ যে, দেবী একটি মহিলার বেশে এক শাঁখারীর কাছে শাঁখা পরিয়া, তাঁহাদের বাটী হইতে (অর্থাৎ হালদার বাড়ী) মূল্য লইবার কথা বলিয়া অদৃশ্য হন। শাঁখারী হালদার বাড়ীতে যাইয়া তাঁহার কন্যা শাঁখা পরিয়াছে বলিয়া মূল্য চাহিলে, বাড়ীর কর্ত্তা ভীষণ আশ্চর্য্য হইয়া যান, কারণ তাঁহার কোন সন্তানাদি ছিল না। পরে তিনি স্বপ্নে জানিতে পারেন যে, দেবী স্বয়ং শাঁখা পরিয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত পুরান-পুকুরে তাঁহার শাঁখা পরা হাত দেখিয়া তিনি ওই পুষ্করিণীর তীরেই বিশালাক্ষীদেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন। অনুরূপ কাহিনী বায়ড়া গ্রামের রণজিৎ রায়ের বিশালাক্ষী দেবী সম্বন্ধেও প্রচলিত আছে।

মন্দিরের আকৃতি কতকটা দো-চালা খড়ের ঘরের ন্যায় এবং মন্দির গাত্রে মন্দির প্রতিষ্ঠার তারিখ "সন ১২২৯ সাল" উৎকীর্ণ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দির মধ্যে প্রথম স্তরে দেবীর দক্ষিণপার্শ্বে মহাদেব বামপার্শ্বে শ্রীরামচন্দ্র এবং পশ্চাদ্দিকে ভূত প্রেতাদি আছে। দ্বিতীয়

স্তরে দক্ষিণ পার্শ্বে লক্ষ্মী ও বামপার্শ্বে সরস্বতী এবং তৃতীয় স্তরে দক্ষিণ পার্শ্বে গণপতি ও বাম পার্শ্বে কার্ত্তিকের মূর্ত্তি আছে।

বঙ্গবাসীর সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতলের বহু প্রকারের শিল্পকার্য্য এই স্থানে বহু



পুরাণ পুকুর

প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে ঘুঘুর, নুপুর, কজ্জা, ছিটকিনী প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বহু কাংস্য বণিক এই গ্রামে বাস করেন এবং তাঁহারাই এই শিল্পে অদ্যাপি লিপ্ত আছেন। এই গ্রাম সেনহাটীর অপভ্রংশ 'সেনেট' বলিয়াও কথিত হইয়া থাকে। গ্রামের মধ্যে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যতীত আর কোন প্রতিষ্ঠান নাই। পূর্ব্বে দ্বারবাসিনী হইতে সেনহাটী পর্য্যন্ত কেদারমতী নদী নামে একটি

বেগবতী নদী ছিল, বর্ত্তমানে তাঁহার চিহ্ন ব্যতীত আর কিছু দৃষ্ট হয় না। জলাভাবের জন্য বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক বর্ত্তমানে গ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বসবাস করিতেছেন।

রাজবলহাট

দামোদর নদীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত একটি প্রকাণ্ড গ্রাম; ব্যবসার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'কমার্শিয়াল রেসিডেন্সী' পূর্ব্বে এই স্থানে ছিল; পরে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে হরিপালে চলিয়া যায়। স্বর্গীয় পণ্ডিত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণের স্মৃতি রক্ষার্থে রাজবলহাটে "অমূল্যচরণ প্রত্নশালা" স্থাপিত হইয়াছে এবং হুগলী জেলা হইতে সংগৃহীত বহু প্রাচীন দ্রব্য এই প্রত্নশালায় রক্ষিত হইয়াছে। এই স্থানে "হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার" নামে একটি বড় গ্রন্থাগার আছে এবং রাজবল্লভী দেবী মূর্ত্তি বিখ্যাত।

দ্বারহাট্টা

শ্রীরামপুর মহকুমার হরিপাল থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। হরিপাল হইতে চার মাইল দূরে অবস্থিত। বহু প্রাচীন কাল হইতে এই গ্রাম সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই গ্রামে ওলন্দাজ ও দিনেমারদের বাণিজ্য কুঠি ছিল এবং তাঁহারা গোমস্তার দ্বারা চতুঃস্পার্শ্বস্থিত গ্রাম হইতে নানা প্রকার কাপড় সংগ্রহ করিয়া বিদেশে চালান দিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'আড়ং' এই গ্রামে ছিল এবং তাহারা দাদন দিয়া কাপড় তৈয়ারী করিয়া লইত। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর কর্ম্মচারী "দারহাট্টার কার্য্য খুব খারাপ হইতেছে এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা তাঁতিদের নিকট পড়িয়া আছে" বলিয়া রিপোর্ট দেন দেখিতে পাওয়া যায়। "At Doorhatta the Company's affairs in a distressed situation." এই গ্রামের আশে পাশে প্রচুর পরিমাণে নীল চাষ হইত বলিয়া এই স্থানে একটি নীলকুঠি ছিল; উক্ত কুঠি অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় পাঁচশত তাঁতি এই গ্রামে বসবাস করে এবং তাঁতের কাপড়ের জন্য আজও এই স্থান প্রসিদ্ধ।

আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত একটি প্রাচীন স্থান; বহু পণ্ডিত এই স্থানে একসময় বসবাস করিতেন। আরামবাগ সহরের ছয় মাইল উত্তর-পূর্ব্ব কোনে মলয়পুরের নিকটে এই গ্রামখানি অবস্থিত। প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদি নিবাস এই গ্রামে ছিল, কিন্তু তাহার পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ, অন্যান্য ভ্রাতৃবৃন্দের অপমানসূচক কথায় ব্যথিত হইয়া দেশত্যাগ করিলে, তাঁহার স্ত্রী পিত্রালয় বীরসিংহ গ্রামে বসবাস করেন। এই সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার স্বরচিত চরিত-কথায় লিখিয়াছেন :

বনমালীপুর

"বীরসিংহ গ্রামে আমার জন্ম হইয়াছে; কিন্তু এই গ্রাম আমার পিতৃপক্ষীয় পূর্ব্ব পুরুষদের বাসস্থান নহে। জাহানাবাদের ঈশান কোণে, তথা হইতে প্রায় তিন ক্রোশ অন্তরে বনমালিপুর নামক যে গ্রাম আছে, উহাই আমার পিতৃপক্ষীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের বহুকালের বাসস্থান।"

গোঘাট থানার অন্তর্গত একটি সুবৃহৎ গ্রাম; ইহা বদনগঞ্জের এক মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। পূর্ব্বে সিল্ক ব্যবসার জন্য এই স্থান বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ ছিল, বর্ত্তমানেও কিছু কিছু সিল্কের বা তসরের কাজ এই স্থানে হইয়া থাকে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই গ্রামে "মিউনিসিপ্যাল ইউনিয়ান" ছিল (**under act XX of 1865**) কিন্তু পরে তাহা উঠিয়া যায়।

শ্যামবাজার

আরামবাগ মহকুমার কুমারগঞ্জ গ্রামের নিকটে আগাইগড়ে প্রাচীন কালে এক রাজা ছিলেন বলিয়া জানা যায়। অদ্যাপি আগাই গ্রামের চতুর্দ্দিকে পরিখাবেষ্টিত গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজার কি নাম ছিল তাহা কেহ বলিতে পারে না। বর্ত্তমানে ইহা একটি সামান্য গ্রামে পরিণত হইয়াছে।

আগাইগড়

হুগলী সদর মহকুমায় ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম।

বহু সম্ভ্রান্ত বংশ এই গ্রামে আছে, তন্মধ্যে রায়, বসু প্রভৃতি বংশগুলি বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ। মেদিনীপুর জেলার ধারেন্দা রাজ-বংশের পূর্ব্ব পুরুষ নারায়ণ চন্দ্র পাল মুসলমান রাজকর্ম্মচারীদিগের অত্যাচারে দশঘরা ত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর জমিদারী সনন্দ গ্রহণ করেন। উক্ত পাল বংশ 'সেঙ্গাই-বেঙ্গাইর জমিদার' বলিয়া পূর্ব্বে খ্যাত ছিল।* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক মন্মথ মোহন বসু এই গ্রামের অধিবাসী। স্থানীয় বিপিন রায় বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই স্থানে বাংলো, রাস্তা প্রভৃতি নির্ম্মাণ কয়িয়া যশস্বী হন। অদ্যাপি দশঘরায় উত্তম হস্তে প্রস্তুত কাগজ তৈয়ারী হয়। এই স্থানে রথ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

দশঘরা

শ্রীরামপুর মহকুমার জেজুর ইউনিয়ানের অন্তর্ভুক্ত একটি মুসলমান প্রধান গ্রাম। সুলতান গাছার জমিদার মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের নামানুসারে পূর্ব্বে এই গ্রামের নাম 'মধুয়াবাটী' ছিল, পরে ইহা শুভিপুর বলিয়া খ্যাত হয়। বর্ত্তমানে ইহা কলাছড়া বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্থানের রজব আলী সরকার ১২৭৬ সালে মেডিক্যাল কলেজের যাবতীয় কাণ্ট্রাক্ট লইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাহার পুত্র মৌলভী আবদুল গণি সরকার তিরিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া গ্রামে একটি হাসপাতাল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন; এতদ্ব্যতীত গ্রামের উন্নতি কল্পে পুষ্করিণী খনন, বিদ্যালয় স্থাপন, চন্দনপুর ষ্টেশন হইতে জেজুর পর্য্যন্ত একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ হন।

কলাছড়া

আরামবাগ মহকুমায় পুরশুড়া থানার অন্তর্গত শোঙালুক বা শ্যামালোক নামক গ্রাম অবস্থিত। প্রাচীনকালে এই স্থানে এক হিন্দু রাজা রাজত্ব করিতেন এবং তিনি এই অঞ্চলে 'মুণ্ডই' রাজা বলিয়া প্রখ্যাত ছিলেন। রাজার নাম ছিল দেবী সিংহ এবং

শোঙালুক

* মেদিনীপুরের ইতিহাস—শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু, পৃষ্ঠা ৫৩৯

তাঁহার মল্লিকা নামে এক রূপলাবণ্যবতী কন্যা ছিল; তিনি এই গ্রামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেন, ইহা অদ্যাপি 'মলকে পুকুর' বলিয়া খ্যাত। মলকে পুকুরের উত্তর দিকে রাজা দেবী সিংহের প্রাসাদ ছিল বলিয়া গ্রামবাসীগণ দেখাইয়া দেয় এবং এই স্থানের ডোবা হইতে কেহ কেহ প্রাচীন মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া থাকে। প্রাচীন নিদর্শন বর্ত্তমানে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।

রামনগর

আরামবাগের দুই ক্রোশ দক্ষিণে শালেপুর রামনগর গ্রামে প্রাচীন কালে শালিবাহন নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। রাজার বাড়ি বর্ত্তমানে ধ্বংস হইলেও, উহার ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমানে স্তূপে পরিণত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রামে শালিবাহন রাজার গড় অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। কোন প্রাচীন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া না যাইলেও গ্রামবাসীগণ এই স্থানে যে রাজা বাস করিতেন সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে বলিয়া থাকে।

শ্যামবাটী

রামনগরের নিকটে শ্যামবাটী নামক গ্রামে আয়ুবল ও বাহুবল নামে দুইজন রাজা বাস করিতেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। গ্রামবাসীগণ একটি ভূখণ্ডকে রাজাদের বাস্তভূমি ছিল বলিয়া দেখাইয়া দেয়, কিন্তু কোন প্রাচীন নিদর্শন বর্ত্তমানে দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন পুরাতন চিহ্ন বর্ত্তমানে আরামবাগের প্রাচীন স্থান গুলিতে কেন দেখিতে পাওয়া যায় না, সে সম্বন্ধে ওম্যালী সাহেব লিখিয়াছেন—"**No old remains however have survived, presumably on account of the encroachment of the river.**" *

আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত বদনগঞ্জ একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম;

* **Hooghly District Gazeetters. Page 244**

ইহা হুগলী জেলার পশ্চিমদিকে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থান তসর ও সিল্কের ব্যবসায়ের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল এবং বহু কাঠ এই স্থান হইতে বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হয়। এই স্থানে একটি প্রাচীন 'মরাই' দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহার গাত্রে '১১২৫ হিজরা' (১৭১৩ খৃষ্টাব্দ) এই সালটি উৎকীর্ণ আছে। আউলিয়া মনোহর দাস এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার রচিত চারখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। সুসাহিত্যিক তারকনাথ বিশ্বাস বদনগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। এই স্থানে একটি পান্থনিবাস আছে।

বদনগঞ্জ

ফুরফুরা-শরীফ হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন স্থান; পূর্ব্বে ইহা 'বালিয়া বাসন্তী' বলিয়া পরিচিত এক বাগ্দী রাজার রাজধানী ছিল। সম্ভবতঃ (৭৯৬ হিজরীতে) সুলতান গিয়াসুদ্দীন বঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীগণকে দমন করিয়া তাঁহাদের রাজ্য নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য যুদ্ধ করেন। সেই সময় সুলতানের আদেশে হজরত শাহ সুফি, বালিয়া-বাসন্তী আক্রমণ করিয়া বাগ্দী রাজাকে পরাজিত করেন এবং এই স্থানে মুসলীম গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহা 'ফুরফুরা শরীফ, নামে অভিহিত হয়।

ফুরফুরা শরীফ

ফুরফুরা বঙ্গের মুসলমানদিগের একটি প্রসিদ্ধ পীঠস্থান; এবং বর্ত্তমান প্রধান পীর মৌলানা আবু বক্কার সাহেবের ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং পবিত্র চরিত্রের জন্য প্রায় পাঁচলক্ষ মুসলমান তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। ইনি স্বয়ং সাম্প্রদায়িকতা পছন্দ করেন না বলিয়া ইহার শিষ্যবর্গও সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে আছেন বলিয়া প্রকাশ আছে। এই স্থানের পীরবংশ সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বাগদাদ হইতে দিল্লীতে সর্ব্বপ্রথম আগমন করেন এবং সম্রাট তাহাদের ধর্ম্মপ্রবণতা দেখিয়া তাহাদিগকে নিষ্কর জায়গীর আয়মা প্রদান করিয়া ফুরফুরায় প্রেরণ করেন। সেই সময় প্রায় সাতশত ঘর মুসলমান এই স্থানে বসবাস করেন এবং মুসলমান

রাজত্বকালে তাঁহাদের প্রত্যেকেই প্রায় বিচারকের (কাজীর) কার্য্য করিতেন বলিয়া জানা যায়।

ফুরফুরা পীরবংশে বহু ভগবদ্ভক্ত ফকীর ও মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করায় এই স্থান বঙ্গের মুসলমানদিগের নিকট তীর্থক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই স্থানে হজরত মৌলানা জোবের শাহ নামক এক যোগসিদ্ধ ফকীর বাস করিতেন। কিংবদন্তী এইরূপ যে, লর্ড ক্লাইভ ইহার নিকট হইতে পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হইবার জন্য আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলে, তিনি 'জয়ী হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। তিনি ইংরাজদিগকে আশীর্ব্ববদ করায় তাঁহার এক শিষ্য ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন; তদুত্তরে তিনি বলেন যে, ধ্যানে তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে ঈশ্বরের লোক বিজয় পতাকা লইয়া ইহাদের অগ্রে যাইতেছি সুতরাং তিনি আশীর্ব্বাদ না করিলেও তাহাদের জয় কেহ রোধ করিতে পারিবে না।

এই বংশে বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; তন্মধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার কিউ, এ, রহমান, রেজিষ্ট্রার-অফ এসিওরেন্স মহম্মুদর রহমান প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বৈঁচী

হুগলী সদর মহকুমার পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত বৈঁচী একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম, ষ্টেশন হইতে প্রায় একক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহা কলিকাতা হইতে প্রায় ৪৪ মাইল। এই গ্রামের জমিদার বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার দেড়লক্ষ টাকা দানে এই স্থানে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং একটি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বিহারী বাবুর সহধর্ম্মিনীর মৃত্যুর পর বঙ্গীয় সরকার পূর্ব্বোক্ত দুইটি প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে জমিদার বাবুর প্রাসাদোপম বাড়ীতে বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হইয়াছে। বর্ত্তমান স্কুলভবনের মধ্যে দুইটি প্রাচীন মন্দির আছে; তন্মধ্যে একটির গাত্রে 'শকাব্দা ১৬০৪' অর্থাৎ ১৬৮২

খৃষ্টাব্দ লিখিত আছে। এই স্থানে পূর্ব্বে একটি থানা ছিল বলিয়া রেনেলের মানচিত্রে লিখিত আছে। প্রাচীন কালে এই স্থান ডাকাতির জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। গোবিন্দ চন্দ্র বসু **Laws relating to Munsiffs** নামে একখানি ইংরাজী পুস্তক প্রণয়ণ করেন। স্বর্গীয় দুর্গাচরণ রায় লিখিয়াছেন যে এই স্থানের নাম বৈঁচি; এইস্থানে ও ইহার সন্নিকট দুই একটি পল্লীগ্রামে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার আছেন। এই স্থান হইতেই বর্দ্ধমান জেলা আরম্ভ হইয়াছে। * দৈনিক বঙ্গনিবাসী সংবাদ পত্রের সম্পাদক রামদেব দত্ত এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

হুগলী সদর মহকুমার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম; কলিকাতা হইতে মাইল দূরে অবস্থিত। এই গ্রামের জনসংখ্যা ১৯০১ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৭৬৩ জন ছিল দেখা যায়। চরে বহু প্রকারের শাক-সব্জীর ফসল এই স্থানে হয় বলিয়া ইহা প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে চন্দ্রা গ্রামে থানা ছিল, বর্ত্তমানে এইস্থানে থানা হইয়াছে। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী তেঁতুলিয়া গ্রামে একটি চিকিৎসালয় আছে। রেনেলের মানচিত্রে এইস্থান গঙ্গার ধারে বলিয়া অঙ্কিত আছে, কিন্তু গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তন হওয়ায় বর্ত্তমানে এই স্থান গঙ্গা হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত। বহু ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ এক সময় এই স্থানে বসবাস করিত। এইস্থানের রাধাগোবিন্দ জীউর মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ; এতদ্ব্যতীত একটি চণ্ডীর মন্দির আছে। এই মন্দিরের ইষ্টকগুলি দুই ফুট লম্বা এবং এক ফুট চওড়া, সম্ভবতঃ ভগ্ন কোন প্রাচীন মন্দিরের মাল মশলা লইয়া ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। কাঠের 'পিলারে' বহু কারুকার্য্যও দেখিতে পাওয়া যায়। সুসাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এই স্থানে নৌকা তৈয়ারী হয়।

বলাগড়

---

* দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন—পৃঃ ৩২১

খানাকুল থানার অধীন পাতুল একটি গণ্ড গ্রাম এবং বহু ভদ্র ব্যক্তি এই স্থানে বসবাস করেন। পাতুল ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ১৬ খানি গ্রাম আছে। বিগত আগষ্ট আন্দোলনে এই গ্রামের 'নয়াদলের' বহু সভ্য কারাবরণ করেন। ১৩০০ সাল হইতে একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় এই স্থানে চলিতেছে। দাতব্য চিকিৎসালয়, আশুতোষ গ্রন্থাগার, নারী সমিতি, ফ্রেণ্ডস্ ড্রামাটিক ইউনিয়ন, পোষ্টাফিস প্রভৃতিও এই গ্রামে অবস্থিত এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আত্মীয় পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতি এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বসন্তসেনা ও পল্লীমঙ্গল নামে তাহার দুইখানি পুস্তক আছে। ফ্রেণ্ডস্ ড্রামাটিক ইউনিয়ন ক্লাব স্বর্গীয় বিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং ডাঃ কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী ও শ্রীবিভূতিভূষণ হাজরা ইহার পরিচালক। এই অঞ্চলের মধ্যে ইহা প্রসিদ্ধ ক্লাব বলিয়া খ্যাত। এই প্রতিষ্ঠানের শিল্পীগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত কানাই হাজরা, শৈলেন পাল এবং বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় গণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই স্থানের বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

পাতুল

সদর মহকুমায় পাণ্ডুয়া থানার মণ্ডলাই একটি গ্রাম। পাণ্ডুয়া রেল ষ্টেশন হইতে মাত্র ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থান ইলছোবা মণ্ডলাই বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গ্রামে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসালয় আছে; ইহা ফরিদপুরের চিফ মেডিকেল অফিসার ডাঃ ভোলানাথ বসুর ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার প্রদত্ত অর্থেই পরিচালিত হইতেছে। এই গ্রামে তাহার শ্বশুর বাড়ী ছিল এবং তাঁহার স্ত্রীর কথায় তিনি ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। পাণ্ডুয়া ইঞ্জুড়া রোড এই গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। পণ্ডিত রামপতি ন্যায়রত্ন এবং গোঁসাই দাস সরকার এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

মণ্ডলাই

আরামবাগ থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম। ওল্ড বেনারস রোডের

উপর এবং আরামবাগ শহর হইতে পাঁচ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। খানাকুলের মধ্য দিয়া জগৎপুরের রাস্তা এই গ্রাম হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

মায়াপুর

কবিকঙ্কনের চণ্ডীতে এই গ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রামে মামুদ শরিফ নামক এক ব্যক্তির (head quarters) প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এই গ্রাম সিল্কের জন্য খ্যাত ছিল। বর্দ্ধমানের জ্বর নামক মহামারীতে এই গ্রামের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি এবং জনসংখ্যা সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদ ছিল, বর্ত্তমানে তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় এবং জনপ্রবাদ যে, উক্ত মসজিদ প্রস্তর নিৰ্ম্মিত ছিল। এই সম্বন্ধে সরকারী গ্রন্থে লিখিত আছে:

MAYAPUR—Mosque. The site of a mosque is which according to local tradition was built of stone. *

আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত গৌরহাটী একটি বৰ্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। ইহার আয়তন দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫ মাইল ও প্রস্থে ৩ মাইল। এখানকার বহু

গৌরহাটী

প্রাচীন কীৰ্ত্তির ধ্বংশাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে সরকার মনোনীত নৈশ বিদ্যালয়, মধ্য ইংরাজী, উচ্চ ও নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, ডাকঘর, ইউনিয়ন বোর্ড, সাধারণ পাঠাগার হাট বাজার ইত্যাদি বহুবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান আছে। এতদ্ব্যতীত সরকার মনোনীত একটি পল্লী সংস্কার সমিতি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই প্রতিষ্ঠানের সহিত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি জড়িত আছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুত বলাইচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সিংহরায়, শ্রীযুত সাতকড়িচরণ সিংহরায় এবং ডাঃ অতুলচন্দ্র কুণ্ডুর নাম উল্লেখযোগ্য। এখানকার লোকবসতি প্রায় ৪।৫ হাজারের উপর। অধিকাংশ লোকই কৃষিকার্য্যে, কুটির শিল্পে এবং

* List of Ancient Monuments in Bengal, Page 48.

ব্যবসা বাণিজ্যে জীবিকা অর্জ্জন করেন। এখানকার উচ্চ শ্রেণীর তাঁতের শাড়ী ও চাবি তালা বিখ্যাত।

নয়া সরাই

নয়া সরাই (Naya—new, Sarai—inn) অর্থাৎ নূতন সরাই। সদর মহকুমার অন্তর্গত বলাগড় থানার মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ষ্টাভোরিনাস ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জানুয়ারী এই স্থান পরিদর্শন করিয়া ইহাকে "Channel of Niaserai" বলিয়া উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—"Pleasant plains of aralde and pasture land, intermixed with groves of cocoanut, Suri, mango and other trees. The sugarcane was likewise cultivated in many places and flourished luxuriantly." †

মগরা খাল যে স্থানে গঙ্গায় পড়িয়াছে তাহার নিকটেই এই স্থান অবস্থিত; ত্রিবেণী হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় দুই মাইল। গুপ্তিপাড়া রোড ও মগরা খালের মধ্যে একটি পুল আছে। প্রাচীনকালে নয়া সরাই দিয়া বর্দ্ধমানে যাইতে হইত, কারণ দামোদরের প্রধান স্রোত এই খাল দিয়া প্রবাহিত হইত; কালক্রমে দামোদরের গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় মগরা নদীয়া মুর্শিদাবাদ যাইবার রাস্তাও নয়াসরায়ের মধ্য দিয়া গিয়াছে। ক্লাইভ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জুন পলাশী যাইবার পথে এই স্থানে অবস্থান করেন * এবং নবাব সিরাজদ্দৌলাও ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী হুগলী অধিকার করিবার জন্য, এই স্থানে রাত্রিবাস করিয়া ছিলেন।

বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার মিঃ পেলো (ইনি কিছুকাল হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন) ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বর্দ্ধমানের জ্বর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"In Naya Sarai and Tribeni the water supply is doubtful, a *char* in the river having formed in

† Travels, 1 Page 129,

* Bengal in 1756-57 By Hill. Vol 11 Page 110, 175.

front of them, in the rest good river water. All these villages are old and overpopulated. The attack was violent but short. Naya Sarai sufferd most."

উনবিংশ শতাব্দীতে ডাকাতির জন্য এই অঞ্চল বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। নয়া সরাইয়ের নিকটস্থ চন্দ্রহাটী গ্রামে দস্যুতা সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত সংবাদ ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের "সমাচার দর্পণ" পত্র হইতে উদ্ধৃত হইল:

মোকাম কালনার নিকটবর্ত্তি দারেটন নামে এক গ্রামের এক জন তিলি মোকাম কলিকাতা হইতে বাটী যাইতেছিল তাহাতে ২৯ আগস্ত বুধবার বাঙ্গালা ১৫ ভাদ্র মোকাম ত্রিবেণীর উত্তরে নওয়া সরাইয়ের দক্ষিণে চন্দ্রহাটী গ্রামের নীচে গঙ্গা-তীরের রাস্থা দিয়া তিলি একাকী যাইতেছিল তখন সূর্য্য প্রায় অস্তগত। এই সময়ে দুই জন দস্যু আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল ওরে তোর ঠাঁই কি আছে। তিলি কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া উত্তর করিল যে আমার স্থানে চারি আনা পয়সামাত্র আছে আর কিছু নাই। পরে ঐ দুষ্ট দুই জন তাহা লইয়া বার২ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে তোর ঠাঁই আর কি আছে। তাহাতে ঐ তিলি রাগাপন্ন হইয়া নীচে লোকের ব্যবহারানুসারে কহিল যে আমার ঠাঁই অমুক আছে তাহা কাটিয়া লইবি। ইহা শুনিয়া ঐ দুই জন কহিল যে হাঁ কাটিয়া লইব ইহা কহিয়া এক জন তাহাকে ধরিল অন্য ব্যক্তি অস্ত্র লইযা তাহার অর্দ্ধ পুরুষাঙ্গচ্ছেদন করিল। সে তিলিও বলবান আপনার নিতান্ত অনুপায় ভাবিয়া যথাশক্তি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরে তিন জন মারামারি করিতে২ জলে পড়িল। তখন ঐ দুষ্ট ব্যক্তি তাহাকে অতিশক্ত বুঝিয়া তাহার গলায় এক ছোরা মারিল সে ছোরা তাহার গলায় না লাগিয়া কেবল ঘাড়ের যৎকিঞ্চিৎ স্থান কাটিল কিন্তু তাহারা জানিল যে নিশ্চয় তাহার গলায় ছোরা

পুরুষাঙ্গচ্ছেদন

লাগিয়াছে ইহাতেই শালা মরিবেক। তিলিও জলে ডুব দিয়া তাহাদের হাত ছাড়াইল এবং একটানা গঙ্গার আনুকুল্যে ভাসিতে ২ অত্যল্প ক্ষণের মধ্যে ত্রিবেণীর ঘাট পাইল। সেখানে জল হইতে উঠিয়া ত্রিবেণীর থানায় গিয়া তাবৎ বৃত্তান্ত জানাইল ও প্রত্যক্ষতা দেখাইল। পরে তথাকার দারোগা অনেক লোক সরঞ্জাম সমেত সেই রাত্রিতে ঐ চন্দ্রহাটী গ্রাম ঘিরিয়া প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত রহিল পর দিন প্রাতে ঐ গ্রামের তাবৎ পুরুষেরদিগকে ত্রিবেণীর হাটখোলায় আনিল এবং ছয় সাত লোক একত্র আনিয়া ঐ তিলিকে দেখাইতে লাগিল অনেক ক্ষণ পরে তিলি সেই দুই জনকে চিনিয়া ধরাইয়া দিল। দারোগা ঐ দুই জনকে শক্ত কএদ করিয়া ঐ তিলির সহিত সদরেতে চালান করিয়াছে। এই রাহাজানি হওয়া অবধি সে গ্রামের নাম অমুক কাটা চন্দ্রহাটী বলিয়া খ্যাত হইয়াছে।

ইঞ্চুড়া (**Inchura**) বলাগড় থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম এবং ইহা সদর মহকুমার উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। ত্রিবেণী হইতে কালনা হইয়া যে পুরাতন রাস্তাটি মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত গিয়াছে তাহা এই স্থানের মধ্য দিয়া যাওয়ায় এইখানে একটি জেলা বোর্ডের বাংলো এবং একটি ছোট পুলিশ ফাঁড়ি আছে। রেনেলের মানচিত্র এই স্থানের উল্লেখ আছে। প্রতি বৎসর ঝাঁপানের মেলায় ইঞ্চুড়ায় অদ্যাপি বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

ইঞ্চুড়া

কামারপুকুর

কামারপুকুর হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম হইলেও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মে এই নগণ্য স্থান আজ পৃথিবীর নিকট সুপরিচিত এবং ভারতবাসীর নিকটও ইহা অন্যতম তীর্থক্ষেত্র রূপে প্রখ্যাত। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের গড়বেতা হইতে গোশকট বা পদব্রজে এই গ্রামে যাইতে হয়। ইহা কলিকাতা হইতে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত।

কামারপুকুর

গ্রামের চতুর্দ্দিকে শস্যাদি পূর্ণ শ্যামল ক্ষেত্র এবং ভূতির খাল নামক একটী স্রোতস্বিনী নদী গ্রামখানির সৌন্দর্য্য যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছে।

কামারপুকুর আজ বিশ্বের তীর্থক্ষেত্র; রামায়ণের মত কামারপুকুরের কাহিনী চিরনূতন। তাঁহার আবির্ভাবে ও চরণ ধূলির পরশে এই স্থান আজ বাঙ্গালীকে প্রাণ দেয়, শক্তি দেয়, জ্ঞান দেয়, বাঙ্গালীকে নব নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। তিনি মর্ত্ত্যে জীব উদ্ধারের জন্য উদাত্ত কণ্ঠে যে বাঁশি বাজাইয়া ছিলেন, তাহা গঙ্গার তরঙ্গে তরঙ্গে ঝঙ্কার দিয়া, সমগ্র বিশ্বে উথলিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার মর্ত্ত্যলীলা বর্ণনা করিবার ভাষা আমার নাই; কেবল ভাষা নয়, সে পরম জ্ঞানই বা আমার কোথায়? তাঁহার এক অজ্ঞাত ভক্ত কর্ত্তৃক রচিত একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া ঠাকুরের উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করিতেছি; তিনি আমাদের কেবল আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন তাঁহার যোগ্য দেশবাসী হইতে পারি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব

দণ্ডী হয়ে ভ্রম নাই পথে পথে জটাচীর বেশে,
প্রচার করনি, কোন নব ধর্ম্ম তুমি দেশে।
গ্রন্থ পাঠে শিক্ষাপীঠে কোন জ্ঞান করনি অর্জ্জন,
কর্ম্মক্ষেত্রে কোলাহলে কোনদিন করনি গর্জ্জন।
অসভ্য পূজারী ছিলে এ সুসভ্য বঙ্গের দেউলে,
অমার্জ্জিত মাতৃভাষা পুঁজি ছিল তব কণ্ঠমূলে।
কোন মহাশক্তি তায়পুঞ্জীভূত ছিল ভগবান,
লভিল ভারতভূমি যাতে মুক্তি পথের সন্ধান?
এ দেশে সাহিত্য, ধর্ম্ম, লোকযাত্রা, সমাজ, সংসার,
সবারি মাঝারে দেখি সঞ্চারিত শকতি তোমার।

দীনতার ছদ্মতলে কোন্ শক্তি এনেছিলে বহি'।
নিঃশব্দে জিনিলে তুমি সারা দেশ স্থাণু হয়ে রহি।
ধর্ম্মের কঙ্কালে নব-কলেবর করিয়া গঠন,
তব কথামৃত তায় সঞ্চারিল—নবীন জীবন!

হুগলী জেলায় এই কামারপুকুর গ্রামে ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন বুধবার, শুক্লপক্ষ, দ্বিতীয়া তিথিতে চন্দ্রমণি দেবীর গর্ভে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব জন্মগ্রহণ করেন। চন্দ্রমণি দেবীর পূর্ব্বে দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা হইয়াছিল,—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান। ক্ষুদিরাম তাঁহার এই কনিষ্ঠ পুত্রটির নাম রাখিয়াছিলেন গদাধর।

রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ দুই সহোদরের নাম ছিল,—রামকুমার ও রামেশ্বর ও ভগ্নীর নাম ছিল কাত্যায়নী। রামকৃষ্ণের বয়স যখন সাত বৎসর তখন তাঁহার পিতা ক্ষুদিরাম দেহত্যাগ করেন। ক্ষুদিরামের দেহত্যাগের পর সংসারের ভার তাঁহার জ্যেষ্ঠ দুই পুত্র রামকুমার ও রামেশ্বরের উপর পড়িল। দুই ভাই তখন সংসার চালাইবার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন, কিন্তু উপার্জ্জন তেমন না হওয়ায় সংসারে বড়ই টানাটানি হইতে লাগিল। সংসার ঘাড়ে পড়িবার পর রামকুমারের কিছু ঋণও হইয়া পড়িল। কেমন করিয়া এই ঋণ শোধ করিবেন, কেমন করিয়া সংসারে আবার সচ্ছলতা আনিবেন রামকুমারের তখন তাহাই একমাত্র চিন্তা হইল। তিনি অনেক চিন্তার পর কলিকাতায় গিয়া অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করিবেন স্থির করিলেন এবং একটা শুভ দিন দেখিয়া জননীর পদধূলি লইয়া কলিকাতা রওনা হইলেন।

কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া রামকুমার ঝামাপুকুরে একটি টোল খুলিলেন। তখন রামকৃষ্ণের বয়স চৌদ্দ বৎসর। রামকুমার কলিকাতা আসিবার পর তাহাদের বাটীর গৃহ-দেবতা রঘুবীরের পূজা রামকৃষ্ণই

করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ সে সময়ে তাঁহাদের গ্রাম্য পাঠশালায় লেখা পড়া শিখিতেছিলেন বটে, কিন্তু লেখা পড়ায় তাঁহার আদৌ ঝোঁক ছিল না। তাঁহার কণ্ঠটি ছিল অতি সুমিষ্ট। অতি বাল্যকাল হইতেই তিনি গান গাহিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। রামকৃষ্ণেরও কোন বাদ-বিচার ছিল না, আদর করিয়া তাঁহাকে যে ডাকিত, তাহারই বাড়ী গিয়া তাঁহার মধুর গানে তাহাদের একেবারে মোহিত করিয়া দিতেন।

রামকৃষ্ণের বয়স যখন সতের বৎসর তখন রামকুমার ভ্রাতার লেখাপড়া গ্রামে কিছুই হইতেছে না দেখিয়া, রামকৃষ্ণকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। রামকুমার চেষ্টার কোনই ত্রুটি করিলেন না, কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, বাল্যকাল হইতেই রামকৃষ্ণের ধর্ম্ম বিষয় ভিন্ন অপর কোন বিষয়েই মন বসিত না।

রামকৃষ্ণ কলিকাতায় আসিবার কিছুদিন পরে, কলিকাতার জানবাজার নিবাসী রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র দাসের বিধবা পত্নী রাণী রাসমণি কলিকাতা হইতে তিন মাইল দূরে দক্ষিণেশ্বর নামক স্থানে গঙ্গাতীরে কয়েক বিঘা জমি কিনিয়া এক ঠাকুর বাড়ী নির্ম্মাণ করিলেন ও তথায় কালী ও রাধা-গোবিন্দের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া যথাবিহিত পূজার ব্যবস্থা দিবার জন্য যাবতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া বলিলেন, "রাণী কৈবর্ত্ত,—কাজেই কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ পূজা করিতে পারে না।"

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এই মত শুনিয়া রাণী সত্যই বড় মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের মতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। নিশ্চয়ই শাস্ত্রে ইহার কোন ব্যবস্থা আছে ভাবিয়া রাসমণি দেশ-বিদেশে পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা চাহিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। ক্রমে এই কথা রামকুমারের কানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তখনই ব্যবস্থা দিয়া পাঠাইলেন যে, রাণী গুরুকে তাঁহার ঠাকুর বাড়ী দান করুন, তাহা হইলে কালী

ও রাধা-গোবিন্দের পূজার কোন বাধাই থাকিবে না। রামকুমারের এই ব্যবস্থা পাইয়া রাণী রাসমণির আর আনন্দের সীমা রহিল না। অবিলম্বেই রামকুমারের ব্যবস্থা অনুসারে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার একটি দিন স্থির হইল এবং রাণীর বিশেষ জেদাজেদিতে রামকুমারকেই সেই কাজের ভার লইতে হইল।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১২৬২ সালে মহা ধূমধামের সহিত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত রামকৃষ্ণও দক্ষিণেশ্বরে মহোৎসব দেখিতে গিয়াছিলেন;—কিন্তু কৈবর্ত্তের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর বাড়ীতে অন্নগ্রহণ করা ধর্ম্মসঙ্গত নহে ভাবিয়া তিনি সে দিন বাজারে গিয়া মুড়ি-মুড়কি কিনিয়া খাইয়াছিলেন।

ঠাকুর বাড়ীতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াই রামকুমার অব্যাহতি পাইলেন না,—রাণীর জেদাজেদিতে পড়িয়া বিগ্রহের পূজার ভারও তাঁহাকেই গ্রহণ করিতে হইল। রামকৃষ্ণ কৈবর্ত্ত প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর বাড়ীতে প্রথম থাকিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন,—কিন্তু রামকুমার যখন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে ইহা অন্যায় নহে, তখন আর তিনি কোন আপত্তি করিলেন না। সেই হইতে রামকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত দক্ষিণেশ্বরেই বাস করিতে লাগিলেন। রাণী তাঁহার জামাতা মথুরমোহন বিশ্বাসের উপর ঠাকুরবাড়ীর তত্ত্বাবধানের ভার প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণের সরল মূর্ত্তিখানি দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং ঠাকুর সেবার কোন একটা কাজে তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ প্রথমে ঠাকুর সেবার কাজেই হাত দিতেন না। শেষে ভ্রাতার অনুরোধে ও মথুরবাবুর জেদাজেদিতে বাধ্য হইয়া ঠাকুরের বেশকারীর পদ গ্রহণ করিলেন। বেশকারীর পদগ্রহণ করিবার পর হইতেই রামকৃষ্ণের প্রাণের ভিতরটা কেমন যেন এলোমেলো হইয়া যাইতে লাগিল। মাকে বেশ পরাইতে তিনি ভাবে বিভোর হইয়া

পড়িলেন, মায়ের স্বরূপ মূর্ত্তি দেখিবার জন্য দিন দিন তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই সময় সামান্য কয়েক দিনের পীড়ায় রামকুমার দেহত্যাগ করিলেন। রামকুমারের মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণের উপরেই কালীপূজার ভার পড়িল। কয়েকদিক পূজা করিতে করিতেই রামকৃষ্ণের কেমন যেন ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি ঠাকুরবাড়ীর যেখানে সেখানে ধূলায় পড়িয়া 'মা-মা' বলিয়া গভীর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। পূজার সময় পূজা করিতে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তিনি নৈবেদ্য কাক-বিড়ালকে খাওয়াইয়া দেন, আর কেবলই 'মা-মা' করিয়া কাঁদিতে থাকেন। ঠাকুর বাড়ীর সকলে রামকৃষ্ণের এই অবস্থা দেখিয়া স্থির করিলেন, রামকৃষ্ণ বদ্ধ পাগল হইয়াছেন। এ সংবাদ মথুরবাবু ও রাণী রাসমণি অবিলম্বেই পাইলেন। তাঁহারা দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া রামকৃষ্ণের কার্য্যকলাপ দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিলেন,—রামকৃষ্ণ সাধারণ পাগল নহেন, তাঁহার পাগলামির ভিতর এমন একটি জিনিস আছে, যাহা সাধারণ পাগলের ভিতর নাই। তিনি যে একজন মহাপুরুষ,—তিনি যে সত্য সত্যই মায়ের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, এটুকু বুঝিতেও রাণী রাসমণির বিলম্ব হইল না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, এতদিনে তাঁহার মন্দির-প্রতিষ্ঠা সার্থক হইল।

দিন দিন রামকৃষ্ণের অবস্থা এমন হইল যে, তাঁহার দ্বারা মায়ের পূজা হওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। তখন তাঁহাকে যে দেখিত সেই ভাবিত, তিনি একেবারে বদ্ধ পাগল হইয়া গিয়াছেন। চন্দ্রমণি দেবী পুত্রের এই অবস্থার কথা শুনিয়া তাঁহাকে বাড়ীতে আনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, মথুরবাবুও রামকৃষ্ণের মাতার ইচ্ছার কথা শ্রবণ করিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রামকৃষ্ণকে কামারপুকুরে পাঠাইয়া দিলেন। কামারপুকুরে আসিয়া রামকৃষ্ণ কিছু প্রকৃতিস্থ হইলেন। চন্দ্রমণি দেবী আত্মীয়-স্বজনের সহিত পরামর্শ করিয়া পুত্রের একটী বিবাহ দিবেন স্থির করিলেন।

কামারপুকুরের নিকটে জয়রামবাটি গ্রামে রামকৃষ্ণের বিবাহ স্থির হইল। ঐ গ্রামে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার একটি পাঁচ বৎসরের কন্যা ছিল, তাহারই সহিত রামকৃষ্ণের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

বিবাহের কিছুদিন পরে রামকৃষ্ণ আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন। দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া আবার তাঁহার ভাবান্তর হইল, আবার তিনি 'মা-মা' বলিয়া পাগল হইলেন। এই সময় একজন সন্ন্যাসিনী দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন। ইনি তন্ত্র শাস্ত্রে অদ্বিতীয়া পণ্ডিত ছিলেন। ইনি রাম-কৃষ্ণকে দেখিয়াই মহাপুরুষ বলিয়া চিনিলেন এবং তাঁহাকে তন্ত্র প্রণালীতে সাধনা-শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এই সন্ন্যাসিনীর নিকট রামকৃষ্ণ তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে তোতাপুরী স্বামী পরমহংস পরিব্রাজক দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং রামকৃষ্ণকে দেখিয়াই বেদান্ত সাধনার শ্রেষ্ঠ অধিকারী বলিয়া চিনিতে পারেন; তোতাপুরীর নিকটেই রামকৃষ্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ কালে তিনিই তাঁহার নাম দেন রামকৃষ্ণ। এইভাবে বার বৎসরের ভিতর রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব ভারতবর্ষে যত প্রকার ধর্ম্ম মত প্রচলিত আছে, তাঁহার সবগুলিতেই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যখন যে সাধনা আরম্ভ করিতেন একেবারে তখন সেই সাধনায় বিভোর হইয়া পড়িতেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যে একজন মহাপুরুষ, অতি শীঘ্রই এ কথা চারি-দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাঁহার হিতোপদেশ শুনিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে জড় হইতে লাগিল। ভাবের প্রাবল্যে মাঝে মাঝে তাঁহার সমাধি হইত। ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ তিনি মহা সমাধিতে নিমগ্ন হন। সে সমাধি আর তাঁহার ভাঙ্গে নাই।



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

মহাপুরুষ চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আজও তাঁহার শত সহস্র ভক্ত শিষ্য তাঁহার হিতোপদেশগুলি সমগ্র পৃথিবীতে প্রচার করিতেছেন। *

কিম্বদন্তী যে, মাণিক রায় নামক এক রাজা প্রাচীনকালে এই গ্রামে বসবাস করিতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আম্রবাগান ও আমোদর ব্যতীত অন্যান্য কোন নিদর্শন বর্ত্তমানে দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বে গ্রামে অনেক বড় দীঘি ও পুষ্করিণী ছিল; কিন্তু কালের অপ্রতিহত প্রভাবে বর্ত্তমানে উহা মজিয়া যাইতেছে। এই গ্রামে বহু সমাধি মন্দির ও দেউল ছিল, কিন্তু একমাত্র 'হালদার বংশ' ও রামানন্দ শাঁখারীর ভগ্ন দেউল ব্যতীত অন্যগুলি ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। গ্রামখানি ক্ষুদ্র হইলেও একসময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ ছিল এবং তুতির খাল গ্রামের দক্ষিণ দিক ধৌত করিয়া কুলু কুলু স্বরে আমোদর নদের সহিত মিলিত হইবার জন্য প্রবাহিত হইত। গ্রামবাসীগণের দেহে সুন্দর স্বাস্থ্য ও গৃহে ধন ও ধান্য সম্পদে পরিপূর্ণ থাকিত। কিন্তু প্রলয়ঙ্করী মহামারী ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এই গ্রামের যাবতীয় সৌন্দর্য্য বিনষ্ট করিয়া গ্রামবাসীগণকে নিঃস্ব করিয়া দিয়াছে।

মহামারীর কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই গ্রামে একটি সরকারী চিকিৎসালয় খুলিয়া রাখা হইয়াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় মহামারীতে গ্রামখানি উজাড় করিয়া দেয়। সরকারী রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, আরামবাগের মধ্যে এইরূপ মৃত্যুহার অন্য কোন গ্রামে দেখা যায় নাই।

গ্রামের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্গোপ, তাঁতি, জেলে প্রভৃতি নানা জাতীয় লোকের বসতি আছে। এই গ্রামে জেলা বোর্ডের একটি বাংলো আছে এবং হুকা ও আবলুস কাঠের নলের জন্য কামারপুকুর প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমানে কয়েকটি ভগ্ন ও জীর্ণ মন্দির এবং জঙ্গলাকীর্ণ ইষ্টক স্তূপাদি গ্রামের পূর্ব্ব সমৃদ্ধির কথা জনসাধারণকে কেবল স্মরণ করাইয়া দেয়।

* গল্পে রামকৃষ্ণ—শ্রীশিশিরকুমার মিত্র

গৌরহাটী নামক স্থানটি চাঁপদানী ও ভদ্রেশ্বরের মধ্যে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান; ইহার উত্তরাংশ ফরাসী ও দক্ষিণাংশ ইংরাজদের দ্বারা অধিকৃত। এই স্থানকে কেহ গিরটি, গিরোটা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বোণ্টের মানচিত্র বা জোসেফের সার্ভে মানচিত্রে এই স্থান 'ফ্রেঞ্চ গার্ডেন' বলিয়া উল্লিখিত আছে, দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেইজন্য বোধহয় এই স্থানটি 'ফরাসগঞ্জ' বলিয়া কথিত হইত। বর্ত্তমানে ইহা গৌরহাটীর অপভ্রংশ 'গরুটি' বলিয়া খ্যাত।

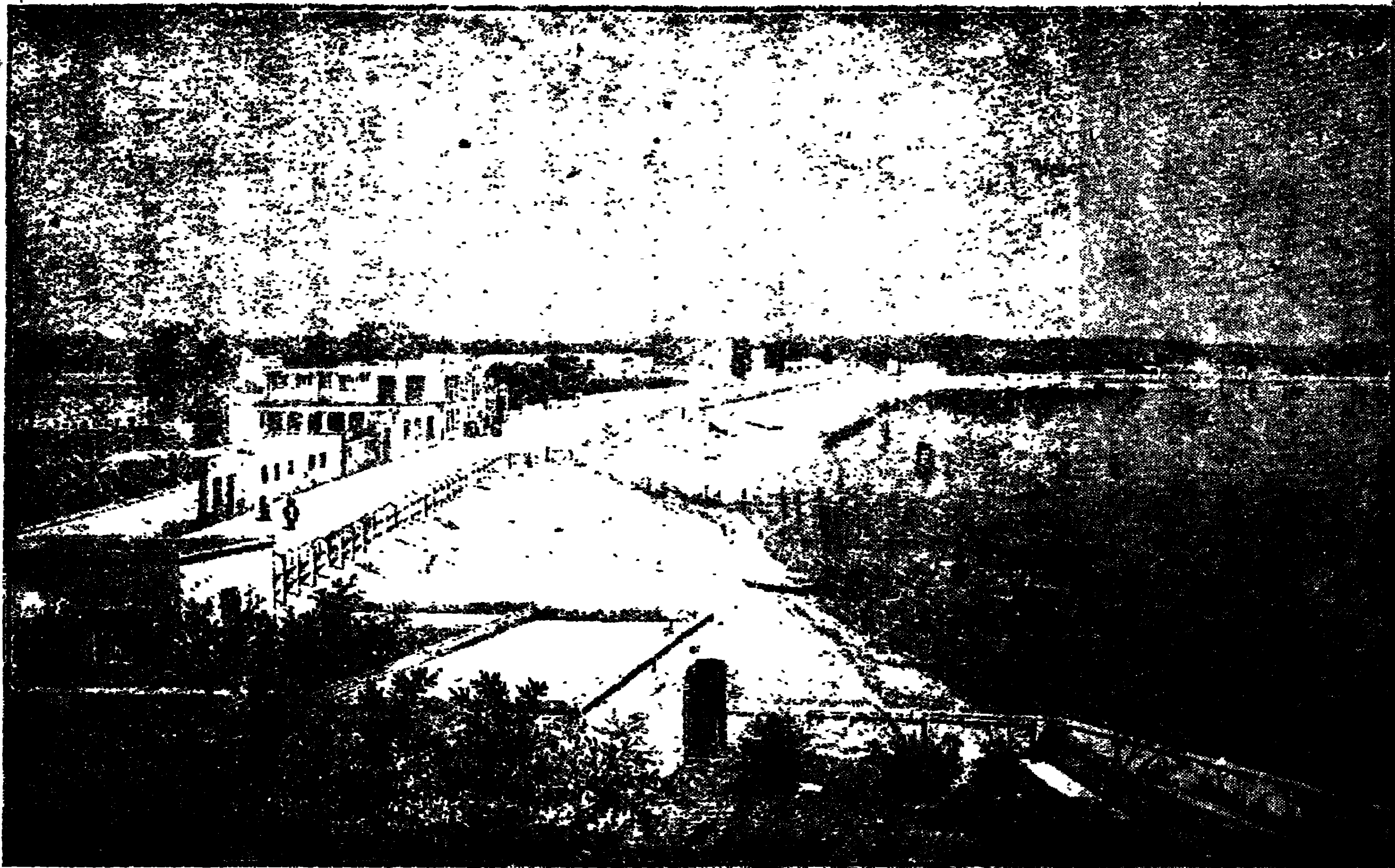
গরুটি

চন্দননগরের ফরাসী গভর্ণর ডুপ্লের একটি সুরম্য উদ্যানভবন এই স্থানে ছিল এবং তাঁহার নিমন্ত্রণে ক্লাইভ, ভিয়ারলেণ্ট, হেষ্টিংস, স্যার উইলিয়াম জোন্স, ফিলিপ ফ্রান্সিস্ এবং চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর ও কলিকাতার ইউরোপীয় সৌখীন নরনারীগণ এই স্থানে সম্মিলিত হইত। প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান পার্শ্বস্থ সুবিস্তৃত বৃক্ষবীথিকা সময় সময় নিমন্ত্রিতগণের শতাধিক যানাদিতে পরিপূর্ণ থাকিত বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। * এই প্রাসাদ কেবল যে আনন্দ আড়ম্বরে মুখরিত থাকিত তাহা নহে; রাজ্য সংক্রান্ত গোপন পরামর্শাদির জন্য এই ভবন তৎকালে মিলনের অন্যতম প্রধান স্থান ছিল।

গৌরহাটী প্রাসাদের মধ্যে এরূপ একটি সুবৃহৎ হল ছিল, যাহার মধ্যে অনায়াসে একসাথে শতাধিক নরনারী পান ভোজন করিতে পারিত। ইহার উচ্চতা ছত্রিশ ফুট অর্থাৎ ত্রিতল অট্টালিকার মত ছিল এবং সুসজ্জিত অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, অকস্মাৎ ফ্রান্সের ভার্সাই নগরের কোন সম্ভ্রান্ত পল্লী নিবাসের কথা মনে হইত। এই স্থানের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া গ্রাঁপ্রি (Grandpre) এই প্রাসাদকে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

---

* **Selections from unpublished Records of Government for the years 1748 to 1767.**



কে ছুপ্লেক্সের পুরাতন দৃশ্য

ভবন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। * রেভারেণ্ড ডানিয়েল কুরি (Rev. Daniel Currie) এই ভবনকে ইউরোপীয় ধরণের অট্টালিকা সমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া লিখিয়াছিলেন। †

পরবর্ত্তীকালে এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ পল্লী-আবাসের ভগ্নাবস্থা দেখিয়া প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মার্শম্যান সাহেব দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে গৌড়ের ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাসাদ ও মসজিদ সমূহ দর্শন করিয়া, দর্শকের মনে উহার পূর্ব্ব গৌরবের কথা উদিত হইয়া যে একটা গভীর দুঃখে হৃদয় ভরিয়া উঠে, যদি এইরূপ দুঃখের নিদর্শন বঙ্গে আর কোথাও থাকে, তবে তাহা ফরাসী গভর্ণরের ভগ্ন প্রাসাদ-পূর্ণ এই গরুটির বাগান।

বিশপ কুরি ভারত ভ্রমণ কালে এই পরিত্যক্ত অসংস্কৃত প্রাসাদের সুন্দর সোপান, বৈচিত্রময় ভগ্নপ্রায় উচ্চ স্তম্ভসকল, বিবিধ কারুকার্য্য বিশিষ্ট পেডিমেণ্ট প্রভৃতি দেখিয়া বিলাতের শ্রপসায়ারের ধ্বংস প্রায় 'মোরেটন কবরেট' (Moreton Corbet) নামক সুপ্রসিদ্ধ অট্টালিকার কথা তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন এই প্রদেশের মধ্যে ইহাই পতনোন্মুখ উন্নতির একমাত্র নিদর্শন। * ফরাসী গভর্ণর মঁসিয়ে শেভালিয়ে ইহার প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধারের জন্য ইহাকে একবার সুসংস্কৃত করিয়াছিলেন। পরে ইংরাজ কর্ত্তৃক ইহা আক্রান্ত হইলে, তিনি এই স্থান হইতেই গোপনে পলায়ন করিয়াছিলেন।

গৌরহাটীর পূর্ব্ব কথা, এবং কিরূপে তাহা ফরাসীদের হস্তগত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ফরাসী গভর্ণরের প্রাসাদের সহিত গৌরহাটীর ইতিহাস বিজড়িত। এতদ্ভিন্ন ক্লাইভের সময় বাঙ্গলার সৈন্যদলের অধিকাংশই, সময় সময় এই স্থানে থাকিত বলিয়া জানা যায়।

* A Voyage in the Indian Ocean and Bengal undertaken in the years 1789 and 1790.

† Heber's Journey through Upper Provinces of India.

ষ্ট্যাভোরিনাস ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে ইংরাজদিগের সহস্রাধিক লোক থাকিতে পারে, এইরূপ একটি দুর্গ দেখিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের মে-জুন মাসে মিরজাফরের সহিত গোপন সন্ধির উদ্দেশ্যে ক্লাইভ এই স্থানে অপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং ১২ই জুন এই স্থান হইতেই মুর্শিদাবাদ অভিমুখে সৈন্য চালনা পূর্ব্বক পলাশী প্রাঙ্গণে জয় লাভ করিয়া ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। *

প্রাচীনকালে এই স্থানে ফরাসীদের একটি নাট্যশালা ছিল; ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। "মোং গরেটির বাগানের বড়নাচ ঘর অতি পুরাতন হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত তাহা ভাঙ্গিবার কারণ অনেক রাজ মজুর লাগিয়াছে" বলিয়া একটি সংবাদ ৫ই আগষ্ট ১৮২০ খৃষ্টাব্দের সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বর্গীয় যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী ১২৬২ সালে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া 'তীর্থ-ভ্রমণ' নামক গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন। বর্ত্তমানে গরুটির প্রসিদ্ধ প্রাসাদ ও বাগানের কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু সর্ব্বাধিকারী মহাশয় প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বেও 'গরুটির বাগ' দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন। †

এই স্থানে প্রসিদ্ধ কবি এণ্টনি ফিরিঙ্গি বসবাস করিতেন; এণ্টনী জাতিতে পোর্ত্তুগীজ হইলেও এক বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার সহিত স্বামী-স্ত্রী রূপে গরুটির এক বাগান বাড়ীতে বসবাস করেন। উক্ত স্ত্রীলোকটির নাম নিরুপমা। বঙ্গভাষায় এণ্টনী সাহেবের বিশেষ বুৎপত্তি ছিল এবং তিনি এক কবির দল করিয়া দ্রুত কবি গান রচয়িতা হিসাবে বঙ্গদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করেন।

---

* শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ লিখিত 'পুরাতনী' নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

† তীর্থ ভ্রমণ—যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী, পৃষ্ঠা ১১ ও ৫৬১

"The Kavi is sung between two parties relating to Sakti, Krishna and other mythical topics. Towards the first half of the nineteenth century Haru Thakur, Ram Basu, Antony Feringee, Sadhu Roy and others were greatly popular." *

কবি গানের আসরে এণ্টনী সাহেব মাথার টুপি ও কোট-প্যাণ্ট খুলিয়া, ধুতি পরিধান পূর্ব্বক খালি:গায়ে গান করিতেন; কিন্তু তাহাকে হারাইবার জন্ম প্রায়ই তাঁহার ব্রাহ্মণীর কথা আসরে বলা হইত। নিম্নে, একবার ভোলা ময়রা ও এণ্টুনী সাহেবের কবির গানে, ভোলা ময়রা তাহাকে যাহা বলিয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত হইল। এই গান হালসী বাগানে হইয়াছিল এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন।

ওরে সাহেবের পো এণ্টনি!
তোর কটা বাপ বল শুনি।
না বলতে পারলে দেখবি আজ, ভোলার কেমন শক্ত ঘানি॥
বিলাতে তোর আসল বাবা, এখানে তোর পাদরী বাবা।
তোর মত হাবা-গোবা, আমি আর দেখিনি॥
পথে ঘাটে দেখিস যারে, বলিস বাপ অমনি তারে।
যেতে হবে শীঘ্র গোরে, তার কিছু তুই করলিনি॥
শোন রে গুণধর, তোর নাই বংশধর,
তোর বংশরক্ষার বন্দোবস্ত করবে তোর বামনী।

এণ্টনী সাহেব তাহার সামাজিক ধর্ম্ম ও বর্ণ বৈষম্য একপ্রকার ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। তিনি একবার আসরে রাম বসুকে বলিয়াছিলেন:

---

* The Indian Stage, Vol-1, By Dr. H. N. Das gupta.

"আমি ভজন সাধন জানি না মা নিজেত ফিরিঙ্গী।
যদি দয়া করে কৃপা কর মোরে, হে শিবে মাতঙ্গী ॥"

গৌরহাটীর মিত্র বংশ একটি প্রাচীন বংশ, এই স্থানে বহু দিন হইতে তাঁহারা বসবাস করিতেছেন।

গৌরহাটীতে সেওড়াফুলি রাজবংশের কোন ব্যক্তি 'হরগৌরীর' মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও তাহার সহিত একটি হাট বসান। উক্ত হাটের জন্যই এই স্থান পরবর্ত্তীকালে 'হরগৌরীর হাট' নামে খ্যাত হয়। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, হরগৌরীর হাট কালক্রমে 'গৌরীর হাট' ও তৎপরে লোকমুখে বিকৃত হইয়া 'গৌরহাটী' ও বহু লোকে পরে 'গরুটী' বলিয়াও:অভিহিত করে। হরগৌরীর মন্দিরের কোন নিদর্শন এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। জনশ্রুতি যে, এইস্থানে পাটের কল স্থাপনের সময় উক্ত মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়; কিন্তু এই জনশ্রুতি আমরা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করিনা।

ইলছোবা

ইলছোবা হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম; প্রাচীন কালে ইহা একটি সুসমৃদ্ধ নগরী ছিল। এই স্থানে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন জন্মগ্রহণ করেন; তিনি ইলছোবা নামক একটি উপাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত পুস্তক হইতে এই স্থানে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া ইলছোবার পূর্ব্ব সমৃদ্ধির বিষয় পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

অদ্য ফাল্গুনের শুক্লা চতুর্দ্দশী, প্রতি বৎসর এই দিনে এই স্থানে (ইলছোবায়) যাত হইত। ঐ যাতের নাম ভগবতী যাত্রা। ভগবতী যাত্রা চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও প্রতিপদ এই তিন দিন থাকিত। কত দেশের কত লোক কতরূপ দ্রব্য লইয়া আসিয়া এই যাতে ক্রয় বিক্রয় করিত। তখন এই থানে যেন একটি নবনির্ম্মিত নগর হইত। তখন কত রোগী আরোগ্য লাভাশয়ে, কত কন্যা পুত্র কামনায় এবং কত লোক অন্যান্য

অভীপ্সিত সিদ্ধির বাসনায় আমার দ্বারে হত্যা দিত এবং সিদ্ধমনোরথ হইলে কত সমারোহে পূজা দিয়া যাইত। তখন কত স্থানে নৃত্যগীত বাদ্য, কত স্থানে অশ্বধাবন, কত স্থানে মল্লক্রীড়া কত স্থানে মেষ, কুক্কুট প্রভৃতি পশুপক্ষীর যুদ্ধ, কত স্থানে কবিতা পাঠ ও কত স্থানে কত প্রকার আমোদ হইত। প্রান্তরের নিম্নভাগেই যে বিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র সকল দেখিতেছ, ঐ স্থানে তখন প্রবাহিনী নদী ছিল ; ঐ নদীর তীরে বিস্তর কঙ্ক পক্ষী দৃষ্ট হইত, এইজন্য উহাকে কঙ্কনদী কহিত। এই নদীতে বার মাসই জল থাকিত। তবে বর্ষাকালে যেরূপ বড় বড় নৌকা আসিত, অন্যকালে সেরূপ নৌকা আসিতে পারিত না।

তৎকালে নদীর তীরভুক্ত এই প্রান্তরের মধ্যে নানাজাতীয় লোকের বসতি ছিল। ঐ পৃষ্ঠ দিকে, এক্ষণে যে স্থানে ঝিটকীপোঁতা নামে খ্যাত ঐ স্থানে কয়েকঘর কুম্ভকারের বাস ছিল। তাহারই অব্যবহিত পূর্ব্বে নদীর ধারে ধারে পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত রাজ-ভবন। রাজভবনে হস্তী, অশ্ব, গো, মেষ, মহিষ, প্রভৃতি নানা পশু ও নানা জাতীয় বহু সংখ্যক নরনারী অবস্থান করিত। নদীগর্ভ হইতে সুধা-ধবলিত বিস্তৃত সৌধমালা কি সুন্দরই দেখাইত। পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শে জটা-ভস্মধারী কত অবধূত সন্ন্যাসী বাস করিত। যাত্রিকদিগের প্রদত্ত পূজোপকরণ দ্বারাই তাহাদিগের সুনির্ব্বাহ হইত। বৎস! তুমি বুঝিতে পারিবে যে নদী, বন, গ্রামাদির অবস্থা চিরকাল একভাবে থাকে না। সময়ে নদী তট হয়—তট নদী হয়—নগর বন হয়—বন নগর হয়—মরু জলাশয় হয় এবং জলাশয় মরু হইয়া যায়। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তোমাদিগের গণনায় তাহা হয়ত ৫০০ বৎসর হইবে—কিন্তু আমার যেন সেই সৌন্দর্য্য—সেই সমৃদ্ধি—সেই জনাকীর্ণতা চক্ষে দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু সে সকল আর কিছুই নাই—এ স্থান এখন জনশূন্য প্রান্তর হইয়াছে।

শ্রীপুর হুগলী জেলার বলাগড় থানার অন্তর্গত ভাগীরথীতীরস্থ একটি প্রসিদ্ধ গণ্ড গ্রাম; প্রাচীনকালে ইহা "আঁটিশেওড়া" নামে খ্যাত এবং পরবর্ত্তী কালে বেনীপুর নামক থানার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১১১৪ সালে উলার প্রসিদ্ধ রঘুনন্দন মুস্তৌফী বংশবাটীর রাজা রঘুদেব রায়ের নিকট পঁচাত্তর বিঘা মহত্তরাণ ভূমি প্রাপ্ত হইয়া তৎকালীন আঁটিশেওড়া গ্রামে বসবাস করেন এবং তিনিই এই প্রাচীন বৈষ্ণব নাম পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীপুর নামকরণ করেন।

শ্রীপুর

"Ramesvar had ten sons Raghunandan, Anantaram, Shivaram and Mukundaram were highly reputed for their wealth, liberality, love of learning and devotion to the Hindu religion. Raghunandan and Anantaram first separated from their brothers and settled in zilla Hughli, the former in Sripur and the latter in Sukria. Raghunandan was a good Sanskrit scholar and astronomer of his day." *

পূর্ব্বে শ্রীপুরের পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত হইয়া যাইত; কিন্তু বর্ত্তমানে উহা প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। গঙ্গাতীরে হাট গোবিন্দগঞ্জ নামক একটি বাজার আছে; উহা শ্রীশ্রী৺গোবিন্দদেব বিগ্রহের দেবত্র সম্পত্তি এবং উহা রাজা রাজবল্লভের মহত্তরাণ বলিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাচীন পুঁথি পত্রে লিখিত আছে। শ্রীপুরে গোবিন্দজীউর মন্দির একটি দর্শনীয় বস্তু। মন্দিরটি একচূড় বিশিষ্ট এবং সম্মুখে দুর্গা দালানের ন্যায় প্রশস্ত চাতাল আছে। বর্ত্তমান মন্দির ১৭১৯ শকাব্দে নিধিরাম মুস্তৌফী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত গোবিন্দজীউর ও অষ্টধাতু নির্ম্মিত শ্রীরাধিকার বিগ্রহ মন্দির মধ্যে বিদ্যমান

---

* The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars part 11, by Loke Nath Ghosh. pages 364-366.

আছে এবং রঘুনন্দন ইহা প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া, বিগ্রহের পাদদেশে 'রঘুনন্দন মিত্র দাসস্য' এই নামটি উৎকীর্ণ আছে। এই অঞ্চলে গোবিন্দজীউ অতীব জাগ্রত দেবতা বলিয়া প্রখ্যাত। স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলন, জন্মাষ্টমী ও দোল উপলক্ষে গোবিন্দজীউর মন্দিরে বহু জনসমাগম অদ্যাপি হইয়া থাকে। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, বর্গীর আক্রমণকালে গোবিন্দ জীউকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হয়; পরে তিনি ধীবরের জালে উঠিয়াছিলেন বলিয়া, প্রতিবৎসর গোষ্ঠযাত্রার দিন গোবিন্দজীউ গ্রাম প্রদক্ষিণ কালে জেলেপাড়ার মধ্য দিয়া গমন করেন। সচ্চিদানন্দ দাস "মোগল সম্রাট আকবরের সময় রঘুনন্দন মুস্তৌফী শ্রীশ্রী৺ গোবিন্দরায় জীউকে স্থাপনা করিয়া সমারোহে রাস যাত্রাদি উৎসব প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন" * বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা ভ্রমাত্মক; কারণ আকবরের রাজত্বের বহু পরে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে রঘুনন্দন শ্রীপুরে বাস করেন।

গোবিন্দজীউর মন্দিরের নিকটে একটি সুন্দর দোলমঞ্চ আছে; ইহা রুদ্ররাম মুস্তৌফীর সহধর্ম্মিনী ১৬৬৮ শকাব্দে নির্ম্মাণ করিয়া দেন। দোলমঞ্চের গাত্রে মর্ম্মর প্রস্তরে নিম্নোক্ত লিপি খোদিত আছে:

১৬৬৮ শক

শাকাব্দে রসসম্বতু ক্ষিতি মিতে গোবিন্দপাদাম্বুজে
ন্যস্ত স্বান্ত বিশুদ্ধ মিত্র কুলজ শ্রী রুদ্ররামান্বয়ঃ।
জায়া তস্য সুশীলশীলনবতী সাধ্বী বিচিত্রংহরে
দোলার্থং গৃহমিষ্টিকাদিভিরিদং নির্ম্মায় তস্মৈ দদৌ॥

দোলমঞ্চের উত্তরে ইষ্টক নির্ম্মিত বারোয়ারী গৃহ ও তাহার নিকটে একটী শিবমন্দির আছে। শ্রীপুরের বারোয়ারী বা সার্ব্বজনীন পূজা বঙ্গদেশের প্রাচীনতম বারোয়ারীর মধ্যে অন্যতম বলিয়া খ্যাত।

* স্বর্গভূমি পরিক্রম—সচ্চিদানন্দ দাস, পৃষ্ঠা ৩

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রথম বারোয়ারী পূজা গুপ্তিপাড়ায় প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি ; পরে গুপ্তিপাড়ার অনুকরণে উলা, চাকদহ ও শ্রীপুরে বারোয়ারী পূজার প্রবর্ত্তন হয়। অদ্যাপি শ্রীপুরের বারোয়ারী গৃহে মহাসমারোহে গ্রামবাসীগণ কর্ত্তৃক রাস-পূর্ণিমা হইতে তিন দিবস কার্ত্তিক গণেশ সহ জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিয়া থাকেন।

গ্রামের মধ্যে কারুকার্য্য খচিত দক্ষিণ দুয়ারী পঞ্চচূড় বিশিষ্ট দুইটি ভগ্ন শিব মন্দির বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ এইরূপ সুন্দর মন্দির এই অঞ্চলে খুব অল্পই আছে। মন্দির মধ্যে শিবলিঙ্গের গাত্রে "১৭২২ শকাব্দে দুর্গাচরণ মিত্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত" এই কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। ১২০৭ সালে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাইগ্রাম নিবাসী ধর্ম্মদাস বসুর পিতামহ তাঁহার মাতামহের নামে প্রতিষ্ঠা করেন এবং উহার সেবার জন্য যশোহর জেলার গঙ্গানন্দপুর নামক তালুক দান করিয়া যান। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার বংশধরগণ উক্ত তালুকের আয় হইতে বঞ্চিত করায় বর্ত্তমানে এই মন্দিরের এইরূপ দুরবস্থা হইয়াছে এবং শীঘ্রই ইহা ধূলিস্মাৎ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বর্ত্তমানে শ্রীপুর বনজঙ্গলে পূর্ণ একটি সামান্য স্থান হইলেও এক সময় ইহা সুসমৃদ্ধ পল্লী বলিয়া পরিগণিত ছিল। মুস্তৌফীদিগের গৌরবে এই গ্রাম পূর্ব্বে গৌরবান্বিত ছিল। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে উক্ত বংশের কেহই বর্ত্তমানে গ্রামে বাস করেন না।

শ্রীপুরের পার্শ্বস্থিত তেঁতুলিয়া গ্রাম এক সময় ডাকাতির জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল এবং এই স্থানের বাগ্দী জাতীয় ব্যক্তিগণ লাঠি খেলায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। এই গ্রামের ধীবরগণ প্রাচীনকালে সুন্দর সুন্দর নৌকা নির্ম্মাণ করিত।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মহামারী ভাগীরথী পার হইয়া সর্ব্বপ্রথম শ্রীপুর ও বলাগড় প্রভৃতি স্থানে দেখা দেয় এবং এই স্থানগুলিকে বিধ্বস্ত করে।

মুস্তৌফীদিগের দেবত্তর সম্পত্তির আয় হইতে শ্রীপুরের পূজা পার্ব্বণ পূর্ব্বের ন্যায় সম্পন্ন হইলেও, পূর্ব্বেকার সে শ্রীপুর আর বর্ত্তমান নাই ; প্রাচীন ভগ্ন দেবালয়গুলি দেখিয়া হৃদয় বিষাদিত হইয়া উঠে।

"A new species of Pooja which has been introduced into Bengal within the last thirty years called **Burowaree**...... within a few miles of the metropolis, more than ten of these subscription assemblies are annally formed. The most renowned are those at Bulbh-poora, Kon-nnagra, Ooloo, Gooptipara, Chugda, and Shree-pore."*

পানশেওলা

জেজুর ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত পানশেওলা একটি ক্ষুদ্র গ্রাম হইলেও এই স্থানের মিত্র বংশে স্বর্গীয় বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র জন্মগ্রহণ করার ইহা বঙ্গের সর্ব্বত্র খ্যাত হয়। 'আলালের ঘরের দুলাল' রচয়িতা টেকচাঁদ ঠাকুর ও কিশোরী চাঁদ মিত্রের আদি নিবাস এই গ্রামে ছিল। এই স্থানের বসু বংশও প্রাচীনকালে খুব প্রখ্যাত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে হীনাবস্থা হওয়ায় তাহাদের বাটী কেহ কেহ কিনিয়া লইয়াছেন। সারদাবাবুর চেষ্টায় গ্রামের বহু উন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু ভদ্র ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ায়, বর্ত্তমানে ইহা হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে।

জাঙ্গীপাড়া

ইহা শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত এবং উক্ত থানার সদর ষ্টেশন। এখানে সাবরেজেষ্ট্রী অফিস, ডাকঘর, উচ্চ ইরাজী বিদ্যালয় প্রভৃতি আছে। এই স্থানে উৎকৃষ্ট তাঁতের কাঁপড় প্রস্তুত হয়। নিকটবর্ত্তী বোড়াল গ্রামে হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাসের পৈতৃক বাসভূমি।

*** The Friend of India, May 1820. Pages 126-30.**

কৈকালা

হরিপাল থানার অন্তর্ভুক্ত কৈকালা একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই স্থানের বসু বংশ ও বিশ্বাস বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কৈকালা তাঁতের জন্য এক সময় খুব প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও কিছু কিছু তাঁতের কাপড় এই স্থানে প্রস্তুত হয়। কৈকালায় পোষ্ট অফিস ও রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। পূর্ব্বে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল, বর্ত্তমানে উঠিয়া গিয়াছে। এই স্থান কলিকাতা হইতে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত।

জিরাট

ইহা ব্যাণ্ডেল-বারহারোয়া লুপের জিরাট ষ্টেশন হইতে পূর্ব্বদিকে কিছু দূরে গঙ্গার তীরে অবস্থিত। বাংলার গৌরব মাননীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আদি বাড়ী এইস্থানে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমানে এখানে আশুতোষ স্মৃতি মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে।

দিঘানেশ্বর

গোলবা থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম। জেলাবোর্ডের সুযোগ্য ভাইস চেয়ারম্যান ও প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের জন্মভূমি।

গড়বাটী

এই স্থান আরামবাগ হইতে পূর্ব্বে ১ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে বিখ্যাত সদ্‌গোপ জমিদার রণজিৎ রায় বাস করিতেন। ইনি বাড়ীর চতুর্দ্দিকে গড় নির্ম্মাণ করিয়া এই স্থানের নাম গড়বাটি দিয়াছিলেন। গড়বাটির দক্ষিণে ডিহিবায়ড়া গ্রামে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ দীঘি এখনও বিদ্যমান আছে। প্রতি বৎসর বারুণীর সময় এখানে প্রকাণ্ড মেলা বসে।

আঁটপুর

জাঙ্গীপাড়া থানার অন্তর্গত এবং মার্টিন কোম্পানীর রেলওয়ের একটি ষ্টেশন। এই গ্রামের অধিবাসী প্রেমানন্দ মহারাজ ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এখানে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে; এখানকার তাঁতের কাপড় বিখ্যাত। আঁটপুরের মিত্র বংশও বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ত্রিবেণীর অনতিদূরে ভাগীরথী তীরে অবস্থিত। এখানে একখণ্ড পাথর আছে, ইহাকে নেতা ধোপানীর পাঠ বলিয়া থাকে। বেহুলার স্বামী লখিন্দর এখানে পুনর্জ্জীবন পান বলিয়া কথিত আছে।

বন্দীপাড়া

জাঙ্গীপাড়া থানার আঁটপুরের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন গ্রাম। এই স্থান স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের পৈতৃক বাসভূমি। ইঁহার রচিত ইংরাজী ফার্ষ্ট-বুক আজ পর্য্যন্ত সমাদরে চলিতেছে। ইনি এডুকেশন গেজেট নামক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। এই স্থান স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের আদি নিবাস।

ভড়া

দামোদর নদের তীরে অবস্থিত। ইহা হাওড়া-আমতা-লাইট রেলওয়ের চাঁপাডাঙ্গা শাখার শেষ ষ্টেশন। প্রসিদ্ধ অহল্যাবাঈ রোড্ এই স্থানের উপর দিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে এই স্থানটি বাণিজ্য-প্রধান স্থান হইয়া উঠিয়াছে। এখানে ডাকবাংলো, দাতব্য চিকিৎসালয়, ডাকঘর ও ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি আছে। এখানকার হাট এই অঞ্চলে খুব বিখ্যাত।

চাঁপাডাঙ্গা

খানাকুল—কৃষ্ণনগর

খানাকুল আরামবাগ মহকুমার একটি প্রাচীন স্থান; অক্ষাংশ ২২°৪৩′ উত্তর ও দ্রাঘিমাংশ ৮৭°৫২′ পূর্ব্বে অবস্থিত। এই গ্রামে ঘণ্টেশ্বর শিব আছেন বলিয়া বহু দূর দেশ হইতে যাত্রিগণ সমাগত হয়। আরামবাগের মধ্যে খানাকুলের হাট সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং পিতলের বাসন, কাপড়, সিল্ক, চাউল, তরিতরকারি প্রভৃতির জন্য এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ।

খানাকুল

খানাকুলের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ বঙ্গদেশে বিশেষ ভাবে খ্যাত। প্রাচীন কালে এই স্থানের ব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই

অঞ্চলের কোন ব্যক্তিই রঘুনন্দনের দায়ভাগের মতে চলিতেন না। বহু পণ্ডিত ব্যক্তি এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং এক সময়ে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য খানাকুল-কৃষ্ণনগর বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ ছিল। খানাকুলের পণ্ডিত ঠাকুর নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় রঘুনন্দনের মত খণ্ডন করিয়া এই স্থানে নিজ মত সংস্থাপিত করেন। তাঁহার সঙ্কলিত স্মৃতির নাম "স্মৃতিসর্ব্বস্ব"। কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীতে এই গ্রন্থখানি বর্ত্তমানে সংরক্ষিত আছে। বহু প্রাচীন কাল হইতে এই স্থানের পণ্ডিতগণ পঞ্জিকা প্রস্তুত করিতেন বলিয়া জানিতে পারা যায়।

"পঞ্জিকা—এতদ্দেশে নবদ্বীপ ও মোলা ও বারইখালি ও বাকলা ও খানাকুল ও বজরাপুর ও বালি ও গণপুর এই সকল গ্রামে পঞ্জিকা প্রস্তুত হয় ইহার মধ্যে কতক আমারদের নিকট পৌঁছিয়াছে সকল পঞ্জিকা আইলে আগামী বৎসরের গ্রহণাদি ছাপান যাইবেক।'*

"খানাকুলের নিকটবর্ত্তী বেড়াবাড়ী গ্রামে পণ্ডিত চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের কন্যা দ্রবময়ী দেবী একজন বিদ্যাবতী মহিলা ছিলেন এবং তাহার টোলে বহু ছাত্র অধ্যয়ন করিত। এই বিদুষী মহিলা সম্বন্ধে পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর' হইতে উদ্ধৃত হইল :

"খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত বেড়াবাড়ী গ্রাম নিবাসি···শ্রীযুত চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের কন্যা শ্রীমতি দ্রবময়ী দেবী···বালিকা কালে বিধবা হইয়া পিতা চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের টোলে পড়িতে আরম্ভ করিলেন তাহাতে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের সাতখানা মূল সাতখানা টীকা এবং অভিধান পাঠ সমাপ্ত হইলে চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার স্বকন্যার ব্যুৎপত্তি দেখিয়া কাব্যালঙ্কার পড়াইলেন এবং ন্যায় শাস্ত্রের কিয়দংশও শিক্ষা দিলেন, পরে দ্রবময়ী গৃহে আসিয়া পুরাণ মহাভাগবতাদি দেখিয়া হিন্দুজাতির প্রায়

* সমাচার দর্পণ—১৭ই ফাল্গুন ১২২৫

সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা হইলেন, এইক্ষণে দ্রবময়ীর বয়ঃক্রম চৌদ্দ বৎসর পুরুষেরা বিংশতি বৎসর শিক্ষা করিয়াও যাহা শিক্ষা করিতে পারেন না, দ্রবময়ী চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে ততোধিক শিক্ষা করিয়াছেন, এইক্ষণে তাঁহার পিতা চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার বৃদ্ধ হইয়াছেন, সকল দিন ছাত্রগণকে পড়াইতে পারেন না, তাঁহার টোলে ১৫।১৬ জন ছাত্র আছেন, দ্রবময়ী কিঞ্চিৎ ব্যবধানে এক আসনে বসিয়া পিতার টোলে ছাত্রগণকে ব্যাকরণ, কাব্যালঙ্কার ব্যাকরণ শাস্ত্র পড়াইতেছেন, তাঁহার বিদ্যার বিবরণ শ্রবণ করিয়া নিকটস্থ অধ্যাপকেরা অনেকে বিচার করিতে আসিয়াছিলেন, সকলে পরাজয় মানিয়া গিয়াছেন, দ্রবময়ী কর্ণাটরাজার মহিষীর ন্যায় যবনিকান্তরিতা হইয়া বিচার করেন না, আপনি এক আসনে বৈসেন, সম্মুখে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বসিতে আসন দেন, তাঁহার মস্তক এবং মুখ নিরাবরণ থাকে, তিনি চার্ব্বঙ্গী যুবতী, ইহাতেও পুরুষদিগের সাক্ষাতে বসিয়া বিচার করিতে শঙ্কা করেন না, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত বিচার কালীন অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় কথা কহেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহার তুল্য সংস্কৃত ভাষা বলিতে পারেন না, গৌড়িয় ভাষায় বিচারেতেও পরাস্ত হয়েন, দ্রবময়ীর ভাব দেখিতে বোধ হয় লক্ষ্মী কিম্বা সরস্বতী হইবেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে ভক্তি প্রকাশ পায় এ স্ত্রীলোককে দেখিবার জন্য কাহার উৎসাহ না হয় এবং তাঁহার আহারাচ্ছাদনাদির সাহার্য্যার্থ কোন দয়াশীল মহাশয় ব্যাগ্র হইবেন না, প্রত্যক্ষের অপলাপ নাই, যাঁহার ইচ্ছা হয় বেড়াবাড়ী গ্রামে যাইয়া দ্রবময়ীকে দেখুন, তাঁহার সহিত বিচার করুন আমরা দ্রবময়ীর বিদ্যা শিক্ষার বিষয়ে যাহা লিখিলাম যদি ইহার এক বর্ণ মিথ্যা হয় তবে আমারদিগকে মিথ্যাজল্পক বলিবেন, এরূপ সতী বিদ্যাবতী স্ত্রীলোক কেহ লীলাবতীর পরে এদেশে জন্ম গ্রহণ করেন নাই।"

সিল্কের জন্য, এই স্থান প্রসিদ্ধ ছিল। "The East India Company had large aurrangs or factories for these textures.

at Khirpai and Radhanagar and we find that in 1759 Mr Walts, resident of the Guttual complained that the gomostas of Connakool had detained some silk windes who were indebted to Heir" *

সাহিত্যিক ঠাকুরনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, প্রফুল্লকুমার গোস্বামী, ভোলানাথ দত্ত (মথুরাবাটী গ্রাম) প্রভৃতি বহু সুসন্তান এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। অভিরাম স্বামীর শিষ্য যদু হালদার রাধানগরে বাস করিতেন এবং তাঁহারও বহু ভক্ত ছিল। পাট-পর্যাটনে "রাধানগরে বাস যদু হালদার "বলিয়া লিখিত আছে।

কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর খানাকুলের দুই মাইল দূরে দ্বারকেশ্বর নদী দক্ষিণ দিকে অবস্থিত এবং ইহা খানাকুলের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং 'খানাকুল-কৃষ্ণনগর' বলিয়া সমগ্র বঙ্গদেশে খ্যাত। এই স্থানের গোপীনাথজীউর মন্দির বহু প্রাচীন এবং ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর এই মন্দির দর্শন করিতে আসেন। ইহার অনতিদূরে রঘুনাথপুরে রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন, এতদ্ব্যতীত বঙ্গের বসু-সর্ব্বাধিকারী বংশের বহু সুসন্তানের জন্মে এই স্থান ধন্য ও পবিত্র হইয়াছে। ইহার নিকটে নাপতিপাড়া গ্রামে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের আদি নিবাস ছিল।

প্রাচীন বহু মন্দির এই স্থানে আছে এবং জেলাবোর্ড এই স্থানের অনতিদূরে গোপালনগর গ্রামে একটি বাংলো নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ ছিল; অদ্যাপি কয়েকটি টোল আছে দেখিতে পাওয়া যায়। একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। প্রাচীন স্থান হইলেও অদ্যাবধি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট বা জেলাবোর্ড

* Hooghly District Gazetters, Page 295

যাতায়াতের জন্য বিশেষ কিছু সুবিধা করিয়া দেন নাই। 'তীর্থ-মঙ্গল' রচয়িতা যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত দ্বাদশগোপালের অন্যতম শ্রীমদ অভিরাম গোস্বামীর শ্রীপাঠ এই স্থানে অবস্থিত। কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী বিরচিত অভিরাম লীলামৃতে ইহার চরিতাখ্যায়িকা বিবৃত আছে এবং শ্রীচৈতন্যাবতারে ইনি অভিরাম গোপাল ও শ্রীদামের অবতার বলিয়া পূজিত হন। কিম্বদন্তী যে, ইঁহারই অভিশাপে রত্নাকর নদীর তেজ কমিয়া গিয়া 'কানানদী' বলিয়া পরবর্ত্তীকালে খ্যাত হয়। ইঁহার শিষ্য কৃষ্ণদাস ঠাকুরও এই স্থানে বাস করিতেন।

"অভিরাম পূর্ব্বে সুদাম খানাকুলে স্থিতি।
খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রাম নাম খ্যাতি॥
খানাকুল কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বাস।
কৈয়ড় গ্রামেতে বেদগর্ভ পরকাশ॥ *

প্রসিদ্ধ পাঁচালী ও যাত্রাকার গোবিন্দ অধিকারী এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি 'কালীয়দমন' প্রভৃতি বার খানি পুস্তক রচনা করেন। বিশ্বনাথ পাল, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, সহদেব চক্রবর্ত্তী, হারাধন রায়, রায় বাহাদুর ডাঃ সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, যতীন্দ্রনাথ বসু, ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

কৃষ্ণনগরের তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত সিকান্দরপুরের স্বর্গীয় জমিদার রায় বাহাদুর ক্ষিরোদপ্রসাদ পাল, ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী এই স্থানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

---

* সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—১৩১৮ সাল, পৃষ্ঠা ১০৮, ১১১

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে এই স্থানের সর্ব্বাধিকারী মহাশয়েরা সুপ্রসিদ্ধ কায়স্থ বসু বংশ। তাঁহারা মাইনগরের বসু। মূল দশরথ বসু হইতে যিনি ১২ নম্বরে তিনি উড়িষ্যায় যান এবং সেখানকার স্বাধীন হিন্দু রাজার সর্ব্বাধিকারী হন। সেটা কোন শতাব্দী তাহা কোথাও লেখা নাই। তবে ১২ নম্বর হইলে ১২০০ হইতে ১৩০০ মধ্যে সম্ভব। ইহার পূর্ব্বেই জগন্নাথের মন্দির প্রস্তুত হইয়াছিল, সেটা বোধ হয় ১০৩৮ হইতে ১১১৮ পর্য্যন্ত। তাঁহার পর ভোগের ও পূজার বন্দোবস্ত। তাহাতে অনেক পুরুষ লাগে। মাইনগরের সর্ব্বেশ্বর বসু মহাশর, বোধ হয় এই সময়েই উড়িষ্যার অথবা জগন্নাথ-ক্ষেত্রের সর্ব্বাধিকারী হন। কারণ জগন্নাথ-মন্দিরে তাঁহার ও তাঁহার বংশধরগণের অনেক অধিকার এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। তাঁহারা তাঞ্জামে চড়িয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারেন। ছাতা মাথায় দিয়াও প্রবেশ করিতে পারেন। এটা একটা বড় রাজসম্মান। মন্দিরের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্টতা না থাকিলে এ সকল অধিকার পাওয়া যায় না। এই সময়ে তাঁহারা উড়িষ্যার রঘুনাথপুরের তালুক পান। ঐ তালুকের সত্ত্ব এখনও সর্ব্বাধিকারী বংশ ভোগ করিতেছেন। তবে অনেক ভাগ হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বাধিকারীরা অনেক পুরুষ ধরিয়া রঘুনাথপুরে বাস করিতেছিলেন। উনিশ পর্য্যায় রত্নেশ্বর বসু সর্ব্বাধিকারীকে আনিয়া যাদবেন্দ্র চৌধুরী মহাশয় কন্যা সম্প্রদায় করেন এবং কৃষ্ণনগরে বাস করান। তাঁহার আর দুই ভাইও এই সময়ে আসিয়া কৃষ্ণনগরে বাস করেন। তাঁহাদের বংশধরেরা আজিও উড়িয়া সর্ব্বাধিকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সর্ব্বেশ্বর বসু

সর্ব্বাধিকারী মহাশয়েরা যখন উড়িষ্যার রাজার কর্ম্মচারী ও জগন্নাথ-মন্দিরের সেবক ছিলেন তখন যে তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা এখনও বৈষ্ণব ধর্ম্মে পরম আস্থাবান্। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়

রামনারায়ণ মুন্সী

খানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজের অনেক কথাই লিখিয়াছেন, তাহাতে আপনারা অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। ইংরাজ রাজত্বের প্রথমে সর্ব্বাধিকারী বংশের রামনারায়ণ মুন্সী কলিকাতায় আসিয়া খুব পসার প্রতিপত্তি করেন। তিনি একবার ভূ-কৈলাসের ভূ-সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দিয়া বিশেষ যশোলাভ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মথুরামোহন সর্ব্বাধিকারী মিউটিনির পূর্ব্ব বৎসর হাঁটিয়া তীর্থ করিতে যান এবং মিউটিনি শেষ হয় হয় এমন সময় ফিরিয়া আসেন। তাঁহার এই তীর্থ-ভ্রমণের এক বিবরণ আছে। ঐ বিবরণ ১৮৫৮ সালে লেখা হয়। উহা গদ্যে লেখা এবং একখানি বড় বই। এত বড় এবং এমন সুন্দর গদ্যে লেখা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বাঙ্গালা ভাষায় আর আছে কি না সন্দেহ। যদুনাথ পায়ে হাঁটিয়া বদরিকাশ্রম, জ্বালামুখী প্রভৃতি তীর্থস্থানের বিবরণ দিয়া গিয়াছেন। কোথায় কি কি পুণ্য কার্য্য করিতে হয়—কোথায় কিরূপ থাকিবার স্থান পাওয়া যায়, এ সব কথা বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় বেশ পরিষ্কার করিয়া লেখা আছে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই "তীর্থ-ভ্রমণ" প্রকাশ করিয়াছেন। যদুনাথ সর্ব্বাধিকারীর ছেলেরা সকলেই সুপরিচিত। প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধকারী মহাশয় অধ্যাপক ছিলেন, আমরা তাঁহার কাছে পড়িয়াছি। তাঁহাকে গুরুর ন্যায় মান্য করিয়া আসিয়াছি। তাঁহার সদ্‌গুণ সমূহের অনুকরণ করাই জীবনের সার বস্তু বলিয়া মনে করি।

সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী

২য় সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী নিজে ত স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন, তাহার পর "পুত্রে-যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্।"—তাঁহার পুত্রেরা সকলেই কৃতী। দেববাবু ও সুরেশ ত জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। দেববাবু উপস্থিত আছেন। তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তির বিষয় আপনারা সকলেই অবগত আছেন। সুরেশ অল্পভোগী ছিল, অল্প বয়সেই ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেল। আমি তাহাকে অতি অল্প বয়স হইতেই জানিতাম। সে যে কাজেই লাগিত প্রাণপণে তাহা

সুসিদ্ধ করিত। কি অস্ত্র-চিকিৎসায়, কি অন্য চিকিৎসায় তাহার মত তাহার সময়ে আর কয়জন ছিল? তাহার পর এই যে 'বেঙ্গলী কোর' এটা ত সেই করিয়া গিয়াছে। সে পরলোকগত হইয়াছে; আমরা পরলোকে তাহার আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

যদুনাথ সর্ব্বাধিকারীর আর এক পুত্র রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমেই সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার পাইয়া রীতিমত সস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। এবং সংস্কৃতের অধ্যাপকতা করিয়াই জীবনের অধিকাংশ কাটাইয়া গিয়াছেন। তাহার উপর রাজ-নীতি ক্ষেত্রে তিনি ত একজন পাইওনিয়ার। কত কাজই যে করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী

১৩৩০ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এই স্থানের প্রাচীন কথার যে আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহার অংশবিশেষ এই স্থানে উল্লিখিত হইল।

এক সময় এই কৃষ্ণনগর বিশাল নদীগর্ভে বিলীন ছিল। এই নদী রামগড় হইতে উৎপন্ন হইয়া রূপনারায়ণ নদে পতিত হইত। ইহার দৈর্ঘ্য বহুযোজনব্যাপী ও ইহার প্রশস্ততাও যথেষ্ট ছিল। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, এই নদীর একপার্শ্বে পাতুল ও অন্যপার্শ্বে ধামলা অবস্থিত ছিল। মধ্যে অগাধ জলরাশি। সুদৃঢ় ও সুবৃহৎ নৌকা সাহায্যে এই জলরাশি অতিক্রম করিতে হইত। বর্ত্তমান খানাকুল গ্রামে যে ৺ঘণ্টেশ্বর মহাদেবের মন্দির, তাহারই পাশ দিয়া এই স্রোতস্বতী প্রবাহিতা হইত। শুনা যায় নবীন রত্নাকর (অর্থাৎ এখানে রত্নাকর নামে যে নদী বর্ত্তমান) এবং বহুদূরব্যাপী রড়াখাল ("রত্নাকরের" অপভ্রংশ "রড়া") আমাদের পুরাতন রত্নাকর বিলোপের চিহ্ন। আরও এরূপ কিম্বদন্তী শুনা যায় যে, কৃষ্ণনগরের উত্তরে যে স্থান এক্ষণে মাজপুর নামে অভিহিত, সেখানে তৎকালে মধ্যমপুর নামে এক সমৃদ্ধ নগর ছিল। নৌকা সাহায্যে

পণ্যাদি আমদানি রপ্তানি করা হইত। নদীগর্ভ হইতে ক্রমশঃ গ্রামের উদ্ভব হইলে কোন কোন স্থানে পণ্যবাহী জলযানের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। কৃষ্ণনগরের উত্তর-পূর্ব্ব নাংড়ীক্ষেত্র নামক স্থানে ভূগর্ভে প্রোথিত মাস্তুল, এবং ঐ স্থানের প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণে ভগবতীতলা নামক স্থানে পুষ্করিণী খননকালে নৌকার অনেক অংশ পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে থানাকুল কৃষ্ণনগর ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে আরম্ভ করে।

শ্রীযাদবেন্দু

ইঁহার আদিবাস জাহানাবাদের সন্নিকট গড়মান্দারণে বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেখানে কিছুদিন বাস করিবার পর ধামলায় আসেন। ধামলার নিকট এক স্থানে তিনি ঈশ্বরী সারদাদেবীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত করেন। ঐ দেবীর নামনুসারে এক্ষণে ঐ গ্রাম সারদা নামে অভিহিত। এই সময় রত্নাকর নদী ক্রমশঃ মজিয়া এক অতি বিস্তৃত ভূভাগের সৃষ্টি হয়। এই নূতন উৎপন্ন দেশে বাস করিবার অভিপ্রায়ে তিনি মধ্য বয়সে কৃষ্ণনগরে আগমন করেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক ও ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন। নবাবের একজন প্রধান কর্ম্মচারী বলিয়া তাহার প্রতাপ বা বৈভব কম ছিল না, কিন্তু তিনি সামান্যভাবে জীবন যাপন করিতেন। বিলাসিতা বা অনর্থক ব্যয়বাহুল্য কিছুই তাঁহার ছিল না। তাঁহার উৎসব আনন্দ ছিল দেবপূজায় এবং দেবতাকে নিবেদিত ভোগের প্রসাদে দরিদ্রনারায়ণের সেবায়। কিম্বদন্তী এই যে, তিনি একদিন স্বপ্ন দেখেন, যেন তাঁহার অভীষ্ট দেবতা প্রত্যাদেশ করিতেছেন, "যাদবেন্দু তুই এই রমণীয় দেশে আমারই মূর্ত্ত্যন্তর রাধাবল্লভের প্রতিষ্ঠা কর, নবাবের তোরণ-স্তম্ভের প্রস্তর হইতে ঐ মূর্ত্তি প্রস্তুত করাস"। ক্ষণেক পরেই দেবমূর্ত্তি অন্তর্হিত ও যাদবেন্দুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। পর দিনই তিনি শ্রীমূর্ত্তি গঠনের জন্য প্রস্তর সংগ্রহের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে মন্দির নির্ম্মাণেরও সমস্ত আয়োজন হইতে

লাগিল। অনতিবিলম্বেই প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া তিনি সুদক্ষ ভাস্কর দ্বারা সুচারু দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিলেন। মূর্ত্তি নির্ম্মাণ প্রায় শেষ হইয়াছে কিন্তু মন্দির তখনও অর্দ্ধনির্ম্মিত। এরূপ অবস্থায় তাঁহার শত্রুপক্ষ নবাবকে সংবাদ দিল যে, যাদবেন্দু তাঁহার তোরণস্তম্ভ হইতে বহুমূল্য প্রস্তর লইয়া তৎস্থানে অন্য প্রস্তর বসাইয়া দিয়াছে। তৎক্ষণাৎ নবাবের একেবারে চরম আদেশ হইল, "হস্তী দ্বারা যাদবেন্দুর মুণ্ড ছিন্ন করিয়া আন"। হস্তিপক পরিচালিত মদমত্ত হস্তী আসিয়া শ্রীমন্দিরের বহির্ভাগস্থ প্রাঙ্গণে যাদবেন্দুর মুণ্ড ছিন্ন করিল। ভূতলে পতিত হইবামাত্র ছিন্নমুণ্ড বলিয়া উঠিল, "বড় সাধ রইল মনে, রাধাকান্ত রাধাবল্লভকে বসাতে পারলুম্‌নি নবরতনে"। তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল যে, নয়চূড়াবিশিষ্ট নব-মন্দিরে শ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীরাধাবল্লভের প্রতিষ্ঠা করেন। এই অলৌকিক ব্যাপার শ্রবণে নবাব বিস্ময়বিমূঢ় হইলেন এবং পরে বিদ্বেষ ভুলিয়া তাঁহার পুত্র কৃষ্ণরামকে পিতৃপদাভিষিক্ত করেন। তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাঁহার সম্বন্ধে এই মত প্রচলিত যে, তিনি কোনরূপে মন্দির নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন মাত্র। নবাবের ভয়ে পিতার অভিপ্রায় মত মন্দিরটিকে নয়চূড়া-মণ্ডিত বা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারেন নাই। যাদবেন্দুর এই মন্দির এখনও বিদ্যমান এবং মন্দিরাভ্যন্তরে মধুর মনোমোহন শ্রীমূর্ত্তি আজিও বিরাজিত।

যাদবেন্দুর পৌত্র গুণগ্রাহী বংশীধর বহুদেশ হইতে শ্রেষ্ঠ কুলীন আনাইয়া তাঁহাদের বাসের জন্য কৃষ্ণনগরে ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। এক স্থানে বন্দ্যোপাধ্যায়গণকে, অন্যস্থানে ভট্টাচার্য্যগণকে, কোথাও বা চক্রবর্ত্তীগণকে, এইভাবে বসবাস করাইয়া ক্রমশঃ তাঁহাদের বংশীয়গণ বাঁড়ুয্যে পাড়া প্রভৃতি এক একটি পাড়ার সৃষ্টি করিলেন। তন্তুবায় প্রভৃতি শ্রমজীবিগণের বাসস্থানও বংশীধর বৃত্তাকারে স্থাপিত করেন।

তাঁহার বংশধরগণ সকলেই মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার প্রপৌত্র শিবচরণ ৯ শত বিঘা ভূমি ও ৯টী পুষ্করিণী দান করিয়াছিলেন। এই জলাশয় এখনও বিদ্যমান আছে, যদিও সংস্কারাভাবে ইহাদের অবস্থা শোচনীয় এবং যৎসামান্য জল আছে তাহাও জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ। রাজা রামমোহন রায়ের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র খানাকুল কৃষ্ণনগরের চৌধুরী মহাশয়দিগের জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য নবাব কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। কারণ, তাঁহারা সুবিধা বুঝিলেই নবাবের ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করিয়া কর প্রদান বন্ধ করিয়া দিতেন। উক্ত চৌধুরী বংশই এখানকার প্রাচীনতম জমিদার। তাঁহারা কতদূর তেজস্বী ছিলেন তাঁহার পরিচয় পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে। সর্ব্বাধিকারী বংশ তাহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া এই স্থানে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। সর্ব্বাধিকারীদিগের পূর্ব্বপুরুষ রত্নেশ্বর প্রথম এখানে আসিয়া বাসস্থান স্থাপন করেন।

কৃষ্ণদাস ঠাকুর ও যদু হালদারের ন্যায় ব্যক্তিগণ যে অভিরামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেও এ অঞ্চলে অভিরামের প্রভাব বুঝা যায়। উক্ত দুই মহাত্মার কোন বংশধর এখন জীবিত নাই। যদু হালদারের শ্রীবিগ্রহ অভিরামের গোপীনাথ মন্দিরে সেবিত হইতেছেন। বর্ত্তমান শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ ভাগে পুরাতন নবরত্ন মন্দির বিরাজিত। ঐ স্থান অভিরাম ঠাকুর খড়ের ঘরে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্ত্তমান মন্দির ১২১৯ সালে নির্ম্মিত হয়। মন্দির মধ্যে অভিরাম ঠাকুরের শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর শ্রীমূর্ত্তি একখানি কষ্টি প্রস্তরের উপর খোদিত। প্রস্তর খানিতে বস্ত্রহরণ-লীলার চিত্রও উৎকীর্ণ। নিম্নে যমুনা প্রবাহিতা, উচ্চে পর্ব্বতে ধেনু চরিতেছে, কদম্ববৃক্ষোপরি শ্রীগোপীনাথ বংশীধ্বনী করিতেছেন, গোপীগণ চতুর্দ্দিকে বস্ত্র ভিক্ষা করিতেছেন। চিত্রের পরিকল্পনা এইরূপ। উক্ত শ্রীবিগ্রহ ব্যতীত বলরাম, মদনমোহন,

গোপাল ও অভিরাম ঠাকুরের মূর্ত্তি মন্দির মধ্যে অবস্থিত। কথিত আছে, উপাস্য শ্রীকান্তকে হারাইয়া অভিরাম ঠাকুর দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কোথাও তাঁহার হৃদয়-দেবতার দেখা পাইলেন না। কোন বিগ্রহে সর্ব্বব্যাপী তাঁহার শক্তি নিহত করিলেন। সাধকের প্রণাম জাগ্রত বিগ্রহ ভিন্ন কে সহ্য করিতে পারে? অভিরাম দেবমূর্ত্তি দেখিলেই দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করেন, আর সেই প্রণামরূপ দণ্ডাঘাতে বিগ্রহ চূর্ণ হইয়া যায়। কথিত আছে, রাধানগরে সর্ব্বাধিকারীদিগের বিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধাকান্ত তাঁহার এই অসহ্য প্রণামের তাড়নায় শালগ্রাম শীতলকায় হইলেন। সেই হইতে তিনি শীতলানন্দ নামে খ্যাত।

খানাকুল-কৃষ্ণনগর-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুর এ অঞ্চলের অন্যতম গৌরব। তিনি কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সঠিক জানা যায় না। 'অভিরাম-লীলামৃতের' ৭ম পরিচ্ছেদ উদ্ধৃত তাঁহার বাণী অনুসারে তাঁহাকে সপ্তদশ শতাব্দীর লোক বলা যাইতে পারে। ঐ স্থানে তিনি কাশীধামের বিচার-সভায় নিজের পরিচয় দিয়া বলিতেছেন:

"গোপীনাথো মহাপ্রভুর্বিজয়তে যাত্রাভিরামো মহান্, গোস্বামী শতবাহ্য দরুমুরলীং কৃত্বা সমবাদয়ৎ যং ব্রুয়ুর্ব্রজবাসিবৈষ্ণবগণাঃ শ্রীগুপ্তবৃন্দাবনম্ তস্মিন্ শ্রীমতি চারুকৃষ্ণনগরে বাসোমদীয়োঽধুনা।"

স্মার্ত্তরঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি-তত্ত্বের মধ্যে যে যে স্থানে অযৌক্তিকতা আছে বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন, সে সকল তিনি খণ্ডন করেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম "স্মৃতি-সর্ব্বস্ব"। তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

তিনি প্রায় তিন শত গ্রাম লইয়া প্রভূত শক্তিশালী খানাকুল-কৃষ্ণনগর-সমাজ প্রতিষ্ঠাকার্য্যে বংশীধর রায়ের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। ভাগীরথীর পশ্চিমপারে এত বড় সমাজ আর কোথাও নাই; তিনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন গভীরদর্শী মনীষী ছিলেন। ইঁহার পিতা শ্রীরাম

বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার সন্নিকট বালীগ্রামে বাস করিতেন। নারায়ণ ঠাকুর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। শৈশবেই মাতৃহীন হওয়ায় কিছুদিন মাতামহ চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ের আলয়ে প্রতিপালিত হন। নয় দশ বৎসর বয়সে একমাত্র সহোদরার মৃত্যুর পর তিনি বিদ্যালাভের জন্য কাশীধাম গমন করেন। তথায় ১৮ বৎসর বাস করিয়া বেদবেদান্ততর্ক-মীমাংসাদি নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কাশীতে অধ্যয়ন শেষ হইলে তিনি প্রয়াগাদি নানাতীর্থ ও বিদ্বজ্জনসেবিত মিথিলাদি নানাস্থান পরিদর্শন করিয়া অবশেষে কৃষ্ণনগরে আসিয়া উপস্থিত হন। কৃষ্ণনগরের সন্নিকটস্থ রামনগর গ্রামে রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ নামে এক অতি সুপণ্ডিত বাস করিতেন। তাঁহার সহিত ঐ স্থানে ইঁহার প্রথম আলাপ ও শাস্ত্রীয় বিচারাদি হয়। তাহার ফলে রাজেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বহুদর্শী বিচক্ষণ প্রগাঢ় পণ্ডিত বলিয়া বুঝিতে পারেন ও তাঁহাকে এস্থানে রাখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই সময়ে যাদবেন্দুর পৌত্র বদান্য বংশীধর কৃষ্ণনগর-সমাজ স্থাপন নিমিত্ত নানাদেশ হইতে সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ কুলীন-গণকে আনাইয়া এস্থানে বাস করাইতেছিলেন। শুনা যায়, পণ্ডিতপ্রবর রাজেন্দ্রনাথ তাঁহারই আনীত। তিনি নবাগত মহাপুরুষের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও কৌলীন্যের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে কৃষ্ণনগরে বাস করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। নারায়ণ ঠাকুর তাহাতে স্বীকৃত হন ও চৌধুরী বংশের গুরু পঞ্চানন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেন। দানগ্রহণে পাতিত্য জন্মে বলিয়া তিনি দানগ্রহণে কোন ক্রমেই সম্মত হন নাই। অবশেষে বংশীধর ভূমি ও বাসস্থানাদি তাঁহার গুরুকে অর্পণ করেন এবং তিনি পরে কন্যা বিবাহের যৌতুকরূপে ঐ সমস্ত বিষয় জামাতা নারায়ণ ঠাকুরকে দান করেন।

সকল শাস্ত্রেই তাঁহার অসামান্য জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। সর্ব্বপ্রথমে তিনি 'সারাবলী' নামে একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ণ করেন। ১৫৮৯

শকে 'ধাতু-রত্নাকর' নামে আর একখানি পুস্তক রচনা করেন। ইহাতে ধাতুরূপ অতি সুন্দরভাবে ছন্দে লিখিত হয়। ইহা ব্যাকরণ-শিক্ষার্থীর অবশ্যপাঠ্য। অতঃপর তিনি অশৌচ ব্যবস্থাবলী শ্লোকনিবদ্ধ করিয়া "শুদ্ধিকারিকা" নামে এক পুস্তক লেখেন। তাঁহার "সবচন নির্ব্বাচন স্মৃতিসর্ব্বস্ব" তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। "খানাকুল কৃষ্ণনগর মত" বলিয়া যে মত প্রচলিত এবং বাঙ্গালার বহুলোক যে মতাবলম্বী তাহা নারায়ণ ঠাকুরেরই প্রবর্ত্তিত। সে মত প্রচলিত সঙ্কীর্ণ ও রঘুনন্দনের স্মার্ত্ত মতের স্থানে স্থানে বিরোধী হইলেও বিচার যুক্তি ও যথার্থ শাস্ত্রমর্ম্মসম্মত এবং সহৃদয়তারূপ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

'বেদান্তবাদ' নামে তিনি শেষ বয়সে একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে বেদান্তদর্শনের সারমর্ম্ম ও নিজের ধর্ম্মমত অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন এবং সে সম্বন্ধে তাঁহার একখানি গ্রন্থও ছিল।

এ অঞ্চলের অন্যতম গৌরবস্তম্ভ কণাদ তর্কবাগীশ বৈশেষিক দর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন, ইনি 'ভাষারত্নের' মঙ্গলাচরণে আপনাকে সিদ্ধান্তমঞ্জরীর গ্রন্থকার জানকীনাথ চূড়ামণির ছাত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, যথা—

"চূড়ামণিপদাম্ভোজভ্রমরীভূতমৌলিকা

সংক্ষিপ্য শ্রীকণাদেন ভাষারত্নংবিতন্যতে।"

কণাদ তর্কবাগীশ

কণাদ তর্কবাগীশ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আবির্ভূত হইয়া "মণিব্যাখ্যা" নামে চিন্তামণির টীকা রচনা করেন। ইনি কৃষ্ণনগরের ভট্টাচার্য্যবংশের আদি পুরুষ। বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী জৌগ্রাম কুলীনগ্রাম হইতে বংশীধর রায় ইহাকে আনয়ন করেন। ইনি একজন সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ও শক্তি-উপাসক ছিলেন। বাসনা শ্যামামূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া পঞ্চমুণ্ডের আসনে আসীন

হইয়া তন্ত্রোক্তমন্ত্রে দেবীপূজা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। ইনি "মহর্ষিকণাদ" নামে অভিহিত। ইঁহার বংশধরগণের মধ্যে হরিদাস তর্কালঙ্কার ও তারকনাথ তর্করত্ন সমধিক বিখ্যাত হন।

রাধানগর গ্রাম সিদ্ধ আগমবাগীশের বাসস্থান। রত্নাকর নদীতটে ৺ঘণ্টেশ্বর মহাদেবের বিকট এক তন্ত্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী আগমন করেন।

রত্নগর্ভ আগমবাগীশ

আগমবাগীশ মহাশয় তাহার নিকট দীক্ষিত হইয়া বহু বৎসর কঠোর সাধনার পর সিদ্ধিলাভ করেন। ইনিও মহর্ষি কণাদের ন্যায় তান্ত্রিক ও শক্তি উপাসনা করেন। তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, কোন সময়ে রত্নগর্ভ কারণ-বারি লইয়া আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার আচরণে হতশ্রদ্ধ হইয়া মদ্যপ ব্রাহ্মণজ্ঞানে তাঁহাকে ঘৃণার সহিত তিরস্কার করেন। জিতক্রোধ সিদ্ধ রত্নগর্ভ মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন "হে ব্রাহ্মণ, আপনি অশান্ত হইবেন না। যাহা দিতেছি, হস্ত প্রসারিত করিয়া গ্রহণ করুন" এই বলিয়া তাঁহার হস্তে দুগ্ধ ঢালিয়া দেন। ব্রাহ্মণ নিশ্চয় জানিতেন যে, পাত্রে সুরা ছিল, তাহার এরূপ রূপান্তরে তিনি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার ক্ষমাপ্রার্থী হইলেন। আগমবাগীশ প্রান্তরমধ্যে ত্রিকোণ গৃহে কালিকা-মূর্ত্তি ও পঞ্চমুণ্ডী আসন স্থাপন করেন। উহা রাধানগরের প্রান্তরে এখনও বর্ত্তমান। শুনা যায়, ইঁহার বাক্যমাত্রেই অনেক দুরারোগ্য রোগী রোগমুক্ত হইয়াছেন। ইনি অণিমা-লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করায় সিদ্ধ আগমবাগীশ নামে প্রসিদ্ধ হন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "খানাকুল কৃষ্ণনগর ১৪০০ হইতে ১৫০০ পর্য্যন্ত একশত বৎসরের মধ্যে স্থাপিত হয়। এখানে অভিরাম গোপাল পুরাণ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন পরে চৈতন্যদেব অবির্ভুত হইলে তাঁহার সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশিয়া যান। তিনি খুব উৎসাহী পুরুষ ছিলেন; তিনি আপন শিষ্য

প্রশিষ্য দ্বারা নানাস্থানে বিষ্ণু মন্দির স্থাপন করিয়া ও তাহার নিত্য সেবার ব্যবস্থা করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম খুব প্রচার করিয়া যান। খানাকুল কৃষ্ণনগরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অনেক গ্রামে এইরূপ অনেক মন্দির আছে। তাঁহার পর কণাদ তর্কবাগীশ মিথিলায় পড়িয়া আসিয়া 'তত্ত্বচিন্তামণি-টীকা' লিখেন। তাঁহার শিষ্য বাঁড়ুয্যে ঠাকুর এক নূতন স্মৃতির মত চালাইয়া যান। তাহার পর রত্নেশ্বর আগমভূষণ তান্ত্রিক মত প্রচলন করেন। সুতরাং একশ বা দেড়শ বৎসরের মধ্যে এই সমাজে বৈষ্ণবশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র সবই প্রচলিত হয়। সমাজটী সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর করিয়া উঠিতে থাকে।" *

রাধানগর

আরামবাগ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত রাধানগর একটি গণ্ড গ্রাম হইলেও রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান হিসাবে এই স্থান জগদ্বিখ্যাত। বঙ্গের বহু মনীষী এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়। খানাকুল কৃষ্ণনগরের সহিত ক্ষুদ্র রাধানগর গ্রাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ১৩৩১ সালে রাধানগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়; উক্ত সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ বসুর অনুপস্থিতিতে এই গ্রামের অন্যতম সুসন্তান স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী অভ্যর্থনা সমিতির সহকারী সভাপতি হিসাবে, এবং মূল সভাপতি পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রাধানগর ও খানাকুল কৃষ্ণনগর সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য কথা বলিয়াছিলেন।

রসরাজ স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু মহাশয় রাধানগর সাহিত্য সম্মেলনের জন্য একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত কবিতায় রাধানগর এবং রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় কথা লিখিত আছে বলিয়া পর পৃষ্ঠায় উক্ত কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল :

---

* রাধানগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ

ওগো জাগো রাধানগরী

সাড়া দে গো, সাড়া দে গো, গা নাড়া দে ওঠ্ ।
রামমোহনের মা বোলে তোর হচ্ছে নামের ঘোঁট ॥
পাড়াগেঁয়ে মেয়ে বোলে সহরঘেঁসা লোক ।
তোমার পানে এদ্দিন ধোরে চায়নি মেলে চোখ ॥
তোমার ধানের মরাই দুধোলো গাই পুকুরভরা মাছ ।
তাল তেঁতুল কুল পেয়ারা আম কাঁঠালের গাছ ।
আর দুর্ব্বাগুচ্ছ তুচ্ছ কোরে পল্লীবাসী জন ।
পাথরপাতা কলকেতাতে পেতেছে আসন ॥
সেথা গ্যাসের আলো বিজলী-বাতি কলের পাখার হাওয়া ।
বালাম খেতে গোলামগিরি আর ভাগাড়-ভরা গাওয়া ॥
মজিয়ে মন ঝাঁঝিয়ে ওজন চড়ায় মোটার ট্রাম ।
নব্যমনে সভ্যভব্য লাগে না আর গ্রাম ॥
তাই, সুখের সাগর রাধানগর রামমোহনের আঁতুড় ।
গয়নাগাঁটি খুলে আজ গা কোরেছে আদুড় ॥
এখন চালার তলায় জ্বরের জ্বালায় ছটফটায় যে চাষী ।
খাওয়ায় খাবী ওলাবিবি যমরাজার সে মাসী ॥
গোষ্ঠহারা গরু এখন কষ্টে টানে হল ।
চেষ্টা কোরে মেলে না গাঁয় তেষ্টা ভাঙ্গা জল ॥
খুদ খেতে পায় না বুঝি দুধ দেবে সে কিসে ।
খাবলে খায় কাবলে-ওলা সুদে পিষে পিষে ॥
তবু, তোমার ধূলোর কোলে শুয়ে আর দড়ির দোলায় দুলে ।
কত কবি সাজিয়ে গেছেন বঙ্গ-অঙ্গ ফুলে ॥

তুমি, রাম বোলে রায়েদের ছেলে পেয়েছিলে কোলে।
ওগো, আজও তাই গরব তোমার রাধানগর বোলে ॥
আপনি এসে কণ্ঠে রাজার বসলেন বীণাপাণি।
এই ধর্ম্মভ্রষ্ট বঙ্গে দিতে শ্রেষ্ঠ আশার বাণী ॥
বেদহীন দীন দ্বিজ গেছল হোয়ে বঙ্গে।
হ'ল তন্ত্র শুধু মন্ত্র গত পঞ্চ'ম'কার রঙ্গে ॥
আবার, ভাড়াকরা পাদরীপাড়া কোল্লে দাড়ীনাড়া সুরু
হলেন ইংলিসে সাঁত্‌লান ছেলে তাঁরাই ধর্ম্মগুরু ॥
কেষ্ট নষ্ট কালী মাতাল চোল্লো গালাগালির পালা।
হিঁদুর সিঁতের সিঁদুর কুসংস্কার মায়ের নোয়ার বালা ॥
তাই চাঁদের মতন ছেলে কত ছেড়ে মায়ের কোল।
খৃষ্ট ভ'জে মোজলো খেতে মিষ্ট ফাউল-ঝোল ॥
মেরী-শিশু মুখে নাম সুখে শেরী পান।
শ্রদ্ধার আদ্যশ্রাদ্ধ খাদ্যে শুচি বলিদান ॥
আর্কফলা তর্কজাল পুরোহিতের পুঁজি।
ছুৎমার্গে যাবে স্বর্গে তাই নে যোঝাযুঝি ॥
এই অসময় রামমোহন রায় না এলে হায় বঙ্গে।
সারা দেশটা শেষে ভেসে খৃষ্টানি-তরঙ্গে ॥
বুঝে আর্য্যধর্ম্ম বেদমর্ম্ম কোরে ব্রহ্ম-বোধ সার।
'একমেব অদ্বিতীয়ম্' শুদ্ধ মন্ত্র রাজা করে সুপ্রচার ॥
এই নূতন শিক্ষা নতুন দীক্ষা নয় পরের ভিক্ষা করা ধন।
শুধু ঘরের আলো জ্বল্‌লো ভাল রামমোহনের একা আয়োজন ॥
এই যে অন্ত বাংলা গদ্য-পদ্য-পদ্ম-মধুকর।
কল্লেন সভার শোভায় মনোলোভা এ রাধানগর ॥

সেই রামমোহন-ই মোহন বেণু ধোরে আপন অধরে।
গাইল তত্ত্বগীতি ধর্ম্মনীতি মাতিয়ে ক্ষিতি সুস্বরে॥
না পোহাতে রাতি, দিব্য মালা গাঁথি,
জ্বালি পূতবাতি রাজা মহামতি।
পদ্মসরোধারে গন্ধ-উপচারে
সরস্বতী মা'রে করেন আরতি॥
তাই, বাণীপুত্র সব করিতে উৎসব
জয় জয় রবে এসেছে তোমার ধামে।
করেছিলে পুণ্য, ছেলে ছিল ধন্য, তাই কত গণ্যমান্য
এসেছে অরণ্যে পূজিতে সে রামে॥
আজ দুঃখ ভুলে যা, রামমোহনের মা
পূজতে তোমার পা দাঁড়িয়ে দেশের ছেলে।
মেরে গুঁড়ি গুঁড়ি উঠে এসে বুড়ী,
দেখ কুঁড়েয় কুঁড়েয় ঢুঁকে, কে খেলে কি না খেলে॥
তোর শেষ বয়সের আশা দেশের ভালবাসা
ভূপেন বোসের আসা হয়নি দেহের দায়।
তাই, ভাইপো দেছে পাঠিয়ে কুঁযো ফুঁয়ো কাটিয়ে
সবার সাধ মিটিয়ে পূজতে ঠাকুরমায়॥

রাজা রামমোহন রায়

ইংরাজ রাজত্বের প্রথম অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল মহাপুরুষ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে মহাপুরুষ রাজা রামমোহন রায়ের নাম স্মরণ করিতে হয়।

রামমোহন আনুমানিক ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলায় রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রামমোহন বিশেষ সম্পন্ন পরিবারে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃ-পিতামহ সকলেই বিষয়ী ভদ্রলোক ছিলেন।

রামমোহনের বাল্য-জীবন সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানিতে পারি না। তবে সে সময়েও শিক্ষা সম্পর্কে তিনি অসাধারণ মনীষার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি বিষয়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অল্প বয়স হইতেই বিষয় বুদ্ধিতে প্রবীণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। পরজীবনে শাস্ত্রালোচনায়, ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারে যেমন আমরা তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাই, তেমনই অর্থোপার্জ্জন, মোকদ্দমা ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণেও তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেখিতে পাই। এই ক্ষমতা তাঁহার বাল্য-শিক্ষার ফল। রামমোহনের মাতা তারিণী দেবী—তেজস্বিনী, প্রখর বুদ্ধিশীলা ও নিষ্ঠাবতী মহিলা ছিলেন। রামমোহনের চরিত্রের অনেক গুণ সম্ভবতঃ তাঁহার মাতার নিকট পাইয়াছিলেন।

রামমোহন ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতাতে স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। এ সময়ে তিনি ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি অগণিত দেবদেবীর পূজাকে নিম্নস্তরের অধিকারীর উপযুক্ত মনে করিতেন। তিনি নিজে এক ও অভিন্ন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন ও বলিতেন, এইরূপ ধর্ম্মই প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত। রামমোহন সংস্কৃতশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। সে-সময়ে বাঙ্গালাদেশে বেদ, উপনিষদ প্রভৃতির চর্চ্চা ছিল না বলিলেই হয়। রামমোহনই প্রথম এই সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া হিন্দুদের প্রকৃত ধর্ম্ম ও দর্শন কত উন্নত তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দুদের প্রাচীন দর্শন পাঠ রামমোহনের ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তনের একটি কারণ।

রামমোহন আরবী ও ফারসী ভাষায়ও এমন সুপণ্ডিত ছিলেন যে, সকলে তাঁহাকে মৌলবী রামমোহন রায় বলিত। প্রথম জীবনে তিনি ইংরাজী জানিতেন না, সুতরাং মুসলমানী বিদ্যাই তাঁহার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সেজন্য পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তিনি প্রথম যে গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন, তাহা আরবী ও ফারসী ভাষায়ই লিখিত হইয়াছিল। এই পুস্তকটির নাম—তুফান-উল-মুয়াহ্‌হিদীন। উহা খুব সম্ভব ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং এই সময় বা তাহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই রামমোহনের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

রামমোহন আমাদের সকল উন্নতি ও সুখ সৌভাগ্যের বিধায়ক একথা বলিতে পারা যায়। তাঁহার পূর্ব্বে আমাদের দেশে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। তাঁহার সময় প্রথম মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হয়। তিনি নিজ ব্যয়ে নানাবিষয়ে পুস্তক লিখিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন।

রামমোহনের যেরূপ পাণ্ডিত্য ছিল, তেমনি মতের প্রসার ছিল। সেজন্য তিনি কোন সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রাখিয়া ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, বাংলাভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই উন্নতি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ধর্ম্মসংক্রান্ত আন্দোলনই তিনি সর্ব্ব প্রথম আরম্ভ করেন। রামমোহন একেশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি তাঁহার এই ধর্ম্মমত প্রচার করিবার জন্য চারি প্রকার পথ অবলম্বন করিলেন—(১) পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ (২) কথোপকথন ও আলোচনা (৩) সভা-স্থাপন এবং (৪) বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

কলিকাতাতে আসিয়া তিনি "আত্মীয়সভা" স্থাপন করেন। এই সভায় বেদপাঠ ও ব্যাখ্যা, ব্রহ্মসঙ্গীত প্রভৃতি হইত। পরে ব্রহ্মোপাসনার জন্য তিনি একটি সভা স্থাপন করিলেন। এই সভার প্রথম অধিবেশন

হয় ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট। এইরূপে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল। কিন্তু সে সময়ে লোকে এই সভাকে ব্রহ্মসভা বলিত।

ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারে ও রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি অনেক মহৎ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। সে সকলের মধ্যে—সহমরণ প্রথা-নিবারণের জন্য আন্দোলন সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই প্রথা আইন বিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন।

বাংলা ভাষার উন্নতি ও প্রচারের জন্য রামমোহন যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজে বাংলা ভাষার একটি ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সে যুগে বাংলা-গদ্যে সংস্কৃত শব্দের খুব বাহুল্য থাকিত। সেজন্য সাধারণ লোকের উহা বুঝিতে কষ্ট হইত। রামমোহন এই রীতির বিরোধী ছিলেন। তিনি বাংলা রচনা যাহাতে সাধারণ বোধগম্য হয় তাহার পক্ষপাতী ছিলেন। অবশ্য তাঁহার নিজের লেখাও আজকালকার বাংলা গদ্যের তুলনায় বেশী সংস্কৃতবহুল ও আড়ষ্ট! তবু তিনি সে-যুগের যে একজন বিশিষ্ট বাংলা গদ্য-লেখক, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালীদের মধ্যে রামমোহন রায়ই সর্ব্ব প্রথম বিলাত যাত্রা করেন। তিনি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর যাত্রা করিয়া, পর বৎসরের ৮ই এপ্রিল লিভারপুল সহরে জাহাজ হইতে অবতরণ করেন। দিল্লীর নামে মাত্র সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের দূত স্বরূপ তিনি বিলাত গিয়াছিলেন। দিল্লীর কাছে কতকগুলি জমীদারীর রাজস্বে অধিকার আছে বলিয়া বাদশা কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন, সেই আবেদন নিষ্ফল হওয়ায় দিল্লীশ্বর তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি দিয়া বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। মোগল বাদশাহের প্রদত্ত উপাধির জন্যই আমরা তাঁহাকে "রাজা রামমোহন" বলিয়া থাকি।

সেই সময়ে দিল্লীশ্বরের দৌত্য ব্যতীত সহমরণ-প্রথা রহিত করিবার

বিরুদ্ধে গোঁড়া হিন্দুরা যে আপীল করিয়াছিলেন, রামমোহন বিলাতে গিয়া ঐ সকল বিষয়েও নিজের মতামত ব্যক্ত করেন ও যাহাতে এদেশের শাসনপ্রণালীর বিধি-ব্যবস্থা ভাল হয় তাহার জন্য চেষ্টা করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে ব্রিষ্টল নগরে রামমোহন পরলোকগমন করেন।

রামমোহন দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার চেহারা যেমন দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ, তেমনি গৌরকান্তি, সুন্দর, উজ্জ্বল মুখশ্রী, প্রশস্ত ললাট, এবং প্রকাণ্ড সুগঠিত মস্তক ছিল। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বীরমূর্ত্তি বাঙ্গালীর মধ্যে বড় দুর্লভ। যেমন সুন্দর মূর্ত্তি তেমনি তাঁহার দেহেও ছিল অসাধারণ বল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহনকে বাল্যকালে অনেক বার দেখিয়াছিলেন, তাঁহার মতে রামমোহনের মত তেজস্বী অথচ মধুর স্বভাবের লোক ভারতবর্ষে অতি অল্পই দেখা যায়।

রামমোহন কি ধর্ম্ম জীবনে, কি রাষ্ট্রীয় জীবনে, কি সমাজ ও সাহিত্য-সংস্কারে বাংলাদেশে এক অভিনব যুগ আনয়ন করিয়া অমর-কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার নাম বাংলার ইতিহাসে চিরদিন স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। *

"Fifty years after this, Raja Ram Mohan Roy was born in Hooghly and from this time on, the present national history of India begins. When Ram Mohan Roy first sowed this seed of nationalism, the whole of Bengal, was in the hands of the English......and the whole of India has been just going to be under their clutches culturally, politically and economically.

Ram Mohon did not forego his national dress even while in London. He took with his Brahmin cook and his old servant Haridas and did not give up his national

* সাহিত্য সাধনা—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

convention, even at the banquet on invitation from the French Emperor Louis Phillip. It is Ram Mohan who was the pioneer to draw the picture of Independent India of to day. He wanted to see our land as an "Independent India, Friend of the United Kingdom, and Ireland and enlightener of Asia".*

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে বিলাতে যে স্থানে সমাহিত করা হয় উক্ত সমাধি স্থানের দুর্গতির বিষয় Mr. John Mack নামক একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক ৮ই জানুয়ারী ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের Friend of India পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, প্রসিদ্ধ রচনা লেখক জন ফষ্টারের সহিত আমি যখন দেখা করিতে যাইতাম, তিনি তখন Stapleton Groveএ বাস করিতেন। তাঁহার বাটির ঠিক পার্শ্বেই রামমোহন রায়ের কবর ছিল। তিনি রামমোহনের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং তাঁহার অশেষ গুণকীর্ত্তন করিতেন। তিনি বলিতেন, যেখানে রামমোহনের কবর ছিল, তাহা অন্য কে একজন কিনিয়া লইয়াছে—বর্ত্তমানে কবরের চিহ্ন মাত্র নাই। যাহা হউক, দ্বারকানাথ ঠাকুর উক্ত বৎসরের ৯ই জানুয়ারী বিলাত যাত্রা করেন এবং ১০ই জুন তারিখে লণ্ডনে উপনীত হইয়াই উক্ত স্থান হইতে রামমোহন রায়ের মৃতদেহ তুলিয়া লইয়া যান এবং "আর্নোস-ভেল" নামক স্থানে রাজার একটি মনোহর সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। †

সম্প্রতি লণ্ডনের ঠাকুর সোসাইটি রাজা রামমোহনের দেহাবশেষ ভারতবর্ষে প্রেরণের জন্য চেষ্টা করিতেছেন; এই সম্বন্ধে রয়টারের যে সংবাদ ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত হইল :

* The Indian National Congress, Vol. I, By Dr. H. N. Das Gupta. Pages 6-8.

† রামমোহন রায়ের জীবন রচিত—পৃষ্ঠা ৩৮৪

"স্বর্গত রাজা রামমোহন রায়ের দেহাবশেষ ভারতে প্রেরণের উদ্দেশ্যে লণ্ডনস্থ ঠাকুর সোসাইটির পক্ষ হইতে প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রার্থনা করিয়া ভারত সচিব ও ব্রিষ্টলের মেয়রের সহিত কথাবার্ত্তা চালান হইতেছে। স্বর্গগত রামমোহনকে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ব্রিষ্টল সমাধি-ক্ষেত্রে সমাহিত করা হয়। তাঁহার দেহাবশেষ ভারতে প্রেরণের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া ভারতে এক আন্দোলন হইয়াছে। বহু গ্রেট বৃটেন প্রবাসী ভারতীয়ও ঐ আন্দোলন সমর্থন করেন। সহকারী ভারত সচিব মিঃ হেণ্ডারসনের প্রাইভেট সেক্রেটারী ঠাকুর সোসাইটির সম্পাদককে পত্রযোগে জানাইয়াছেন যে, এই সম্পর্কে শীঘ্রই সোসাইটির নিকট আরো পত্র প্রেরণ করা হইবে। *

নারী জাতির মুক্তির জন্য তাঁহার অসাধারণ পরিশ্রম, প্রচলিত সমাজের সঙ্কীর্ণ বিধান ভাঙ্গিয়া কুললক্ষ্মীদের মুক্ত আলো ও হাওয়ার পরশ দিবার জন্য তাঁহার প্রাণপাত আয়াস, অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া বিদ্রূপ করিবার জন্য বাঙ্গলার সর্ব্বত্র তখন এই গানটি প্রচলিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়:

"সরাই মেলের কুল
বেটার বাড়ী খানাকুল,
বেটা সর্ব্বনাশের মূল,
ওঁ তৎ সৎ বলে বেটা বানিয়েছে কুল
ও শালা জেতের দফা করলে রফা
মজালে মোদের তিন কুল।"

* আনন্দ বাজার পত্রিকা—২৩শে নভেম্বর ১৯৪৬ সাল

জয়রামবাটী

জয়রামবাটি হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত একটি সামান্য স্থান হইলেও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সারদামণি দেবীর জন্মে এই স্থান আজ বিশ্বের সর্ব্বত্র পরিচিত। ১৩২৯ সালে শ্রীশ্রীমা, যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথায় ঠাকুরের ভক্তগণ কর্ত্তৃক একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, উহা 'মাতৃমন্দির' বলিয়া খ্যাত। জয়রামবাটীর স্বর্গীয় রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাই পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্ম্মিণী। এই মহীয়সী নারী চিরব্রহ্মচারিণীরূপে স্বামীর ধর্ম্মানুগামিনী ছিলেন। তাঁহার পবিত্রতম জীবনযাত্রার প্রণালী বাংলার নারী-সমাজের আদর্শ-স্বরূপ। বাংলার পুরুষ শক্তিরূপিণী নারীকে আবার মহামায়ারূপে পূজা করিতে শিখিয়া স্বয়ং ধন্য হইতেছে—জাতিকে নবভাবে গঠিত করিয়া তুলিবার অবকাশ দিতেছে। পরমহংসদেবের সাধনা যে ব্যর্থ হয় নাই, জয়রামবাটী পল্লীতে মাতৃ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার ভক্তগণ অব্যর্থ প্রমাণ দিয়াছেন। যে গৃহে রামকৃষ্ণ-সহধর্ম্মিণী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, জীবনের অনেক কাল যেখানে যাপন করিয়াছিলেন, সেই পল্লীকুটীরকে পবিত্র তীর্থ মনে করিয়া রামকৃষ্ণের ভক্ত সেবকগণ তথায় বহু ব্যয়ে নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় মাতৃ-মন্দিরে পূজা অর্চ্চনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দেশদেশান্তর হইতে শত শত ভক্ত, সেবক ও অনুরাগী পল্লীর উৎসবক্ষেত্রে—মন্দির প্রতিষ্ঠার যজ্ঞে যোগদান করিয়াছিলেন। বহু বহু শতাব্দীর পর বাংলার পল্লী প্রান্তরে নারী-শক্তির, মাতৃপূজার উদ্বোধন-মন্ত্র বাঙ্গালীর কণ্ঠে নূতন সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে। পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদের মত এই নারী পূজার মন্ত্র—মাতৃ-নামগান সমগ্র বাঙ্গালীর হৃদয়ে প্রতিধ্বনি তুলিবে কি? বাঙ্গালী নারী জাতিকে মা বলিয়া ডাকিতেও যেন এখন কুণ্ঠা বোধ করে, নারী জাতিকে

জয়রামবাটী



শ্রীশ্রীমা

মাতৃভাবে চিন্তা করিতেও অধঃপতিত বাঙ্গালী যেন ভুলিয়া গিয়াছে। এই বোধনমন্ত্র সমগ্র বঙ্গে ব্যপ্ত হইয়া বিলাস ব্যসন ক্লিষ্ট, আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতিকে নারী শক্তি পূজায় অবহিত করিয়া তুলিবে কি? নারী জাতিকে আবার মা বলিয়া ভাবিতে ও ডাকিতে শিখাইবে কি? হিন্দু যতদিন শক্তি পূজায় অবহিত ছিল, ততদিন সে তাহার বৈশিষ্টের সঙ্গে সঙ্গে প্রাধান্যও রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। বিশেষ বাঙ্গালী-হিন্দু দশভূজার পূজাই তাহার প্রধান পূজা বলিয়া মনে করিত। "মা দশপ্রহরণধারিনী"—আবার মা বারাভয়প্রদায়িনী। বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠে সেইজন্য গীত হইয়াছিল :

বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি

হিন্দুর পুরাণে কীর্তিত হয় যে কাজ দেবতার সাধ্যাতীত হইয়াছিল—দেবী তাহাই সম্পন্ন করিয়া, অনাচার দানব নষ্ট করিয়া, ত্রিভুবন নিঃশঙ্ক করিয়াছিলেন। বাংলার রামপ্রসাদ মা নামে অজ্ঞান হইতেন; বাঙ্গালী কি সেই মাতৃমন্ত্র কখনও ভুলিতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মঠের স্বামী অসিতানন্দ শ্রীশ্রীমা-সারদামণি দেবীর উদ্দেশ্যে ১৩৫৪ সালের ১৮ই পৌষ তারিখে যে কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

শ্রীশ্রীসারদামণি দেবী

তুমিও স্বপন-লব্ধ আনন্দের খনি,
রামকৃষ্ণ সহচরী মা সারদামণি,
শৈশবে অঙ্গুলী তুলি' চিনাইয়া তারে,
চিরন্তন সম্মিলন জানাও সাকারে,

শক্তি ব্রহ্ম ভেদ নহে, এক চিরকাল,
ভেদ বুদ্ধি রচিয়াছে, সূক্ষ্ম মায়াজাল ॥
পঞ্চম বরষে দেবী পঞ্চতপ পূতা,
হলে যুক্ত তার সনে যাতে নিত্যযুতা,
পরিজনে চেনে নাই, যার তুমি তিনি,
ধরিলেন বরহস্ত ধ্যান যোগে চিনি,
করে কর রাখি সূক্ষ্মে তপস্যা আ'হবে,
বিজয়ের কি দৃষ্টান্ত দেখালেন ভবে,
তুলনা নাহি মা তার, শাস্ত্র ইতিহাসে,
সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় ফলের বিকাশে ॥
ত্রয়োদশ বর্ষে গেল মিলন বাসরে,
দেহাতীত সুধাঘট স্থাপিত আদরে,
তোমার হৃদয় কক্ষে, প্রেমের বেদীতে,
আনন্দ উদ্বেল হলো বিকশিত চিতে ॥
সমন্বয় তীর্থে এলে ষোড়শী জননী,
অপূর্ব্ব মিলন যাগ আরম্ভিতখনি,
পূর্ণরে জানালে পূর্ণ পরিপূর্ণ ভাবে,
স্থিতপ্রজ্ঞ একবোধ কভু নাহি যাবে,
শয়নে স্বপনে কিম্বা লীলায় খেলায়,
এক দৃষ্টি এক স্মৃতি রাখিয়া হেলায় ॥
যজ্ঞারম্ভ পূজারম্ভ হলো অভিনব,
ভাবের উৎসব ভাষে কি করিয়া কব,
অন্তরে বাহিরে তত্ত্ব জানাবে যাহারে,
সেই যাবে ডুবিয়া মা আনন্দ পাথারে,

যে আনন্দ ছিল আছে থাকিবে সদাই,
সে আনন্দে প্রকটিত সারদা গদাই ॥
আনন্দ ভৈরবী সনে আনন্দ ভৈরব,
স্তূপাকার করি রাখ আনন্দ বৈভব,
ভারতের ত্যাগ পথে নূতন পাথেয়,
নূতন আহার্য্য দিলে নবতম পেয়।
সেবা যাগে যুগান্তর আসিল ঘুরিয়া,
হিরণ্ময়ী, দীর্ঘতাপে, গণ্ডিটি পুড়িয়া,
গেল মাগো জ্ঞানানলে, হেরি ভূমা স্নেহে,
বন হ'তে ব্রহ্মবিদ্যা ফিরে এলো গেহে ॥
এক হলো দুই তনু রহিলে একাকী,
স্নেহ দৃষ্টি মাতারূপে বিশ্ব মাঝে থাকি,
জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে বিশ্ব নিল বুকে,
কবে মা লভিব শান্তি সে সম্বিত সুখে,
পতিতের মুক্তি লাগি তব কাতরতা,
চিরসত্যে প্রতিষ্ঠিত নহে উপকথা,
মঙ্গল সাধন করি, দিয়েছ মঙ্গল,
শুন সর্ব্ব সুমঙ্গলা, অনন্ত সম্বল,
যাহা রাখি দিয়া গেলে কর্ম্মভক্তি জ্ঞানে,
জানিবার দাও শক্তি অনুরাগ ধ্যানে,
আর দাও সেই মন প্রণমিতে পায়ে,
নির্ভর করিতে মাগো জীবনের দায়ে ॥ *

---

* শ্রীশ্রী সারদামণি দেবী সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য লিখিত "শ্রীশ্রী সারদাদেবী" নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পুরাতন স্থানের বিবরণ

ভদ্রেশ্বর হুগলী জেলার একটি প্রাচীন স্থান; ভদ্রেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ হইতে এইস্থান ভদ্রেশ্বর বলিয়া প্রখ্যাত হয়। 'বুদেসী' নামেও এই স্থানের উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। বিপ্রদাসের কবিতায় ভদ্রেশ্বরের নাম উল্লিখিত আছে; ভদ্রেশ্বর দেবের উৎপত্তির বিবরণ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত; জনসাধারণের ধারণা যে, ইনি কাশীর বিশ্বেশ্বর ও দেওঘরের বৈদ্যনাথদেবের ন্যায় স্বয়ম্ভু। *

ভদ্রেশ্বর

সংস্কৃত শিক্ষার চর্চ্চা ও ব্যবসায়াদির জন্য এই স্থান অতীত কাল হইতে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। অ্যাডম সাহেব ১৮৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলা দেশে শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট সরকারের নিকট দাখিল করিয়াছিলেন, তাহাতে এই স্থানে দশটি চতুষ্পাঠী ছিল বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। †

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীরামপুরের পাদরি উইলিয়ম ওয়ার্ড তাঁহার **A view of the History, Literature and Mythology of the Hindoos** নামক পুস্তকের চতুর্থ খণ্ডে নদীয়া, কাশী বাঁশবেড়িয়া প্রভৃতি স্থানে যে সকল চতুষ্পাঠী ছিল, তাহার বিবরণ ও অধ্যাপকবৃন্দের নাম দিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, "ভদ্রেশ্বরে ৮টি ন্যায়-চতুষ্পাঠী আছে।"

কালনা হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যে ভদ্রেশ্বরের ন্যায় বড়

---

* পুরাতনী—শ্রীহরিহর শেঠ, পৃষ্ঠা ১১৬।

† **Adam's Report on Vernacular Education in Bengal**

গঞ্জ পূর্ব্বে আর কোথাও ছিল না। ভদ্রেশ্বরের চতুষ্পার্শ্বস্থ ত্রিশ-চল্লিশ মাইলের সকল ধান ও চাউল এই স্থান হইতে সরবরাহ হইত।

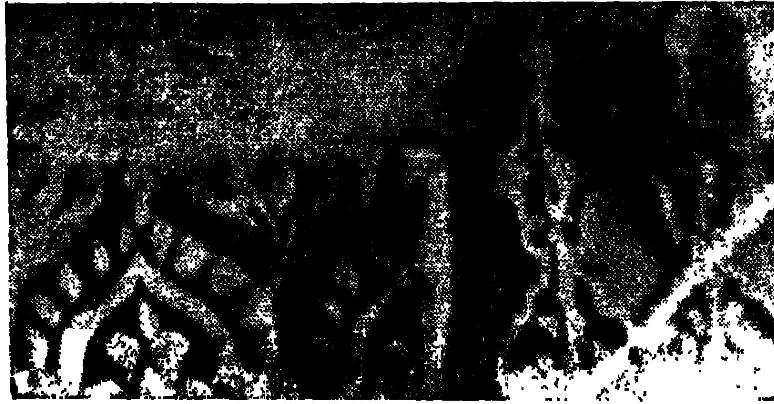


শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার মন্দির

ভদ্রেশ্বরের উত্তরে ফরাসী সীমানার যে গড় আছে, উহা পূর্ব্বে ফরাসীদের অধিকারে ছিল না, ইংরাজদের অধিকারে ছিল। বর্ত্তমান ভদ্রেশ্বরের অন্তর্গত কৃষ্ণপটি গ্রাম পূর্ব্বে ফরাসীদের অধিকারে ছিল। ইংরাজ ও ফরাসীদের সীমানা বক্রভাবে ছিল বলিয়া, তাঁহারা পরস্পরের

সম্মতিক্রমে গড়টি সোজা করিয়া লন, ফলে:কৃষ্ণপটি গ্রাম ইংরাজদের হইয়া যায়। এই কৃষ্ণপটি গ্রামে ফরাসীদের তেলেঙ্গী সৈন্য থাকিত বলিয়া এই অঞ্চল তেলেঙ্গীপাড়া বলিয়া প্রখ্যাত হয়; পরবর্ত্তী কালে তেলেঙ্গী-পাড়ার অপভ্রংশ হিসাবে এই পাড়া তেলেনীপাড়ায় পরিণত হয়।

মুসলমান রাজত্বকালে যে সকল ইউরোপীয় জাতি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এই দেশে আসিয়াছিল, দিনেমারগণ তাহাদের অন্যতম। শ্রীরামপুরে কুঠি নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে ফরাসী সীমানার গড়ের নিকট তাঁহারা



কারুকার্য্যখচিত দুইখানি ইষ্টকের আলোকচিত্র *

একটি স্থান অধিকার করে। কালক্রমে ইংরাজ ও ফরাসীদের সহিত ব্যবসায় পাল্লা দিতে না পারায়, তাহারাও ভারতে ব্যবসা করা বন্ধ করিয়া দেয়।

১৭২৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের সনন্দ লইয়া জার্ম্মান সম্রাটের অধীন বেলজিয়ামের কতকগুলি বণিক হুগলীর নিকটে বাঁকিবাজারে (ভাগীরথীর অপর পারে) একটি কুঠি স্থাপন করেন। †

* এই ইষ্টকগুলি সপ্তগ্রাম হইতে প্রাপ্ত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ইহা সংরক্ষিত হইয়াছে।

† বাংলার ইতিহাস—শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভদ্রেশ্বরে দিনেমারগণ প্রথম কুঠি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থান অদ্যাপি দিনেমারডাঙ্গা বলিয়া খ্যাত। জার্ম্মাণগণ **Eastern German Prusion Company** নাম দিয়া এই দেশে যখন ব্যবসা করিতেন. তখন পূর্ব্বোক্ত দিনেমার-ডাঙ্গার পূর্ব্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে কুঠি নির্ম্মাণ করিয়া তাহারা অবস্থান করিত। চতুর ইংরাজ-বণিকগণের চক্রান্তে জার্ম্মাণ ব্যবসায়িগণ নবাবের বিষ-নজরে পড়ায়, ভারতবর্ষ হইতে তাঁহারা বিতাড়িত হন। জার্ম্মাণ ও অষ্ট্রিয়ান জাতি এই স্থানে কুঠি নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ব্বে ব্যবসায়াদি করিত।

অষ্টেণ্ড কোম্পানীর বণিকগণ অন্যান্য ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের অপেক্ষা অল্পমূল্যে জিনিষপত্র বিক্রয় করিত বলিয়া তাহাদের ব্যবসা বাঙ্গলা দেশে খুব প্রসার লাভ করে। সেই জন্য অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া, তাঁহারা যাহাতে আর সনন্দ না পান, তদ্বিষয়ে বহু প্রকার চেষ্টা করেন; কিন্তু চতুর নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় বাণিজ্য বাঙ্গলা দেশের মঙ্গল জানিয়া, অষ্টেণ্ড কোম্পানীকে কুঠি নির্ম্মাণের অনুমতি দেন।

ইংরাজ ও ওলন্দাজ বণিকগণ একযোগে ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ কামনায় কয়েকখানি যুদ্ধ-জাহাজ নিযুক্ত করেন এবং জার্ম্মানদের একখানি মালবোঝাই জাহাজও তাঁহারা অধিকার করিয়া লন।

১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে পীর খাঁ কালোয়াৎ হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হন; তাঁহাকে ইউরোপীয়, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকগণ উৎকোচে বশীভূত করিয়া ফেলেন এবং তিনি রাজকীয় প্রধান বন্দর হুগলীর এত নিকটে অষ্টেণ্ড কোম্পানীর দুর্গ নির্ম্মাণের এক অতিরঞ্জিত সংবাদ নবাবের নিকট প্রেরণ করেন। ইহাতে অষ্টেণ্ড কোম্পানীর সহিত হুগলীর ফৌজদারের বিবাদের সূত্রপাত হয়। জার্ম্মাণগণ সেইজন্য গঙ্গায় নবাবের নৌকা যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেয়।

অষ্টেণ্ড কোম্পানীকে সায়েস্তা করিবার জন্য নায়েব ফৌজদার মীরজাফরের অধীনে এক দল সৈন্য প্রেরীত হয়। মীরজাফর দুর্গ অধিকার অসম্ভব বিবেচনা করিয়া তাহাদের কুঠির সম্মুখে গড়বন্দী করিয়া সৈন্য সমাবেশ করিলেন। ফরাসীগণ এদিকে গোলা-বারুদ দিয়া অষ্টেণ্ড



রামসীতার মন্দিরের গাত্রে ইষ্টকের কারুকার্য্য

কোম্পানীকে সাহায্য করিবার ভান করিয়া শেষ পর্য্যন্ত যখন কিছুই করিল না, তখন খাদ্যাভাবে তাহারা মহাবিপদে পড়িল; বাহির হইবার কোন উপায় করিতে না পারিয়া, তাহারা ভিতর হইতে কামান চালাইতে লাগিল। দেশীয় সৈন্যগণ খাদ্যাভাবে পালাইতে লাগিল; কিন্তু তেরজন জার্ম্মান বণিক্ সুকৌশলে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদের অধ্যক্ষের হাতে গোলা লাগায়, তাঁহারা বিফল-মনোরথ হইয়া রাত্রে পলায়ন করেন এবং মীরজাফর তাঁহাদের দুর্গ অধিকার করিয়া পরে তাহা ভূমিস্মাৎ করিয়া দেন। জার্ম্মানদের বাঙ্গলাদেশে ব্যবসায় চিরতরে নষ্ট হইয়া যায়।

তেলিনীপাড়ায় বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ ; বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশের বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হইতেই এই বংশের উন্নতি হয়। ইহাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার মন্দির এই অঞ্চলের একটি দর্শনীয় জিনিষ। নয়টি চূড়া-বিশিষ্ট এইরূপ বিরাট মন্দির একমাত্র মহানাদ ও বাকৃসা বতীত অন্যত্র আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানে সংস্কারাভাবে মন্দিরটি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে ; দেবসেবা পালাক্রমে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ সুচারুরূপে করিয়া থাকেন।

দশশালা বন্দোবস্তের পর হইতে বন্দ্যোপাধ্যায়গণের সৌভাগ্য-রবি উদিত হয় ; এই সম্বন্ধে হাণ্টার সাহেবের গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে ; তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

জমিদারী ব্যতীত দান, বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি বহু সৎকীর্ত্তি তাঁহাদের ছিল। বহু চতুষ্পাঠী এই স্থানে ছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কালক্রমে সংস্কৃত শিক্ষার প্রচলন কমিয়া যাইলে, এই দেশে যখন ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন হয়, তখনও এই বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ অগ্রণী হন দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সম্বন্ধে ১২৪৬ সালের ৩০শে আষাঢ় তারিখের "সমাচার দর্পণে" প্রকাশিত একটি সংবাদ নিম্নে উল্লিখিত হইল ঃ

"ইংরেজী পাঠশালা স্থাপন—জিলা হুগলীর অন্তঃপাতি তেলেনীপাড়াস্থ ধনী জমিদার মহাশয়েরা ঐ স্থানে এক ইংরেজী পাঠশালা স্থাপনার্থ মনস্থ করিয়াছেন, ঐ বিদ্যালয়ের তাবদ্বয় তাঁহারাই নির্ব্বাহ করিবেন।"

এই স্থানের মুখোপাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায় বংশও বিশেষ সম্ভ্রান্ত ; মুখোপাধ্যায় বংশের স্বর্গীয় ডাক্তার সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় চক্ষু-চিকিৎসক হিসাবে সমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট দেওয়ান আত্মারাম সরকার এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন।

জেলে এই স্থানের আদিম অধিবাসী। ভাগীরথী এই স্থান হইতে বাঁকিয়া যাওয়ায় গ্রামের তিন দিক দিয়াই ভাগীরথী প্রবাহিতা দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ স্থান মৎস্য ধরিবার পক্ষে বিশেষ অনুকূল বলিয়া সুদূর অতীতকাল হইতে এই অঞ্চলে মৎস্যজীবিগণ বাস করিতেছে। মুসলমান রাজত্বকালে বহু অ-বাঙ্গালী মুসলমান সৈনিকের কার্য্য লইয়া বঙ্গদেশে আগমন করে এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই এই গ্রামে স্থায়ী ভাবে বসবাস করে। বর্ত্তমানে গ্রামের পূর্ব্বাঞ্চলে মুসলমান এবং মধ্যভাগে মৎস্যজীবিগণ বাস করে। মুসলমানগণ যে অঞ্চলে বাস করে, তাহা পাইকপাড়া বলিয়া খ্যাত।

মুসলমান-অধ্যুষিত পাইকপাড়ায় এক অপূর্ব্ব 'রামসীতার' মন্দির আছে। এই মন্দিরটিরও নয়টি চূড়া আছে; কে যে এই সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তাহা জানিতে পারা যায় না। পূর্ব্বে এই মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত হইত, কালক্রমে ভাগীরথীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় মন্দির হইতে প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে ভাগীরথী সরিয়া গিয়াছে।

মন্দিরের পূর্ব্ব দিকের প্রবেশপথটি বুজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই প্রবেশপথের উপরে কারুকার্য্য খচিত ইষ্টকে সমগ্র কৃষ্ণলীলা অঙ্কিত আছে। কালক্রমে যত্নাভাবে বহু ইষ্টক নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, সাধারণ ইষ্টকদ্বারা সেইগুলি পূরণ করা হইলেও, এখনও সহস্রাধিক ইষ্টকের উপর অঙ্কিত চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুস্তকের ৭৬০ পৃষ্ঠায় একখানি ইষ্টকের আলোকচিত্র প্রদত্ত হইল, ইষ্টকখানির এক চতুর্থাংশ ভাঙ্গিয়া যাইলেও শ্রীকৃষ্ণ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া আছেন, তাহা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় বালকগণ মন্দিরের চিত্রিত ইষ্টকগুলি খুলিয়া যে ভাবের খেলা করিতে সুরু করিয়াছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে এই মন্দিরের কারুকার্য্য খচিত ইষ্টকগুলি যে সমস্ত অদৃশ্য হইয়া যাইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে অ-বাঙ্গালী মোহান্তগণ এই মন্দিরের অধিকারী ছিলেন। এক



রামসীতার মন্দির—পাইকপাড়া

মোহান্ত পরলোকগমন করিলে তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্য হইতে নূতন মোহান্ত নির্ব্বাচিত হইতেন। পরে স্থানীয় গোস্বামীগণ এই মন্দিরের উত্তরাধিকারী হন, বর্ত্তমানে শ্রীমতী গিরিবালা দেবী এই মন্দিরের সেবাকার্য্যে ব্রতী আছেন।

মন্দিরের মধ্য হইতে অষ্টধাতু নির্ম্মিত রামসীতার মূর্ত্তি বর্ত্তমান গিরিবালা দেবীর গৃহে স্থানান্তরিত হইয়াছে। রামসীতার মূর্ত্তি দুইটি প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা, সুন্দর একটি সিংহাসনের মধ্যে দণ্ডায়মান আছেন। গিরিবালার অবস্থা খুবই খারাপ বলিয়া, প্রত্যহ বিগ্রহের সেবা পর্য্যন্ত এখন হয় না; আর মন্দিরের অবস্থার বিষয় পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। বর্ত্তমানে সরকারের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ হইতে এই প্রাচীন মন্দিরের সংরক্ষণ করা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া আমি বিবেচনা করি। কারণ, হুগলী জেলার মধ্যে একমাত্র বংশবাটীতে বাসুদেবের মন্দির এবং গুপ্তিপাড়ায় ব্যতীত এইরূপ কারুকার্য্য খচিত ইষ্টকের দ্বারা নির্ম্মিত মন্দির আর কোথাও নাই।

এই স্থানে অন্নপূর্ণা গ্রন্থাগার, খেয়ালী সঙ্ঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি হুগলী জেলার গৌরব বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। প্রতিবৎসর খেয়ালী-সংঙ্ঘ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত আবৃত্তি, বিতর্ক, বক্তৃতা, সমালোচনা প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় বহু প্রতিযোগী যোগদান করেন। খেয়ালী সঙ্ঘ হইতে 'আহুতি' নামক একখানি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়।

এই স্থানটি ক্ষুদ্র হইলেও একটি মিল থাকায় জনসংখ্যা এই স্থানের খুব বেশী। এই স্থানে মিউনিসিপ্যালিটি, পোষ্ট অফিস, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, পাঠাগার, প্রভৃতি আছে।

ডাক্তার সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

অত্যন্ত সামান্য অবস্থা হইতে স্বীয় চেষ্টায় ও অধ্যবসায় গুণে যে সমস্ত ব্যক্তি যশের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, সুশীলকুমার তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইংরাজী ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে (১২৯২ সালের আষাঢ় মাস) কেদিহাটি গ্রামে মাতুলালয়ে সুশীলকুমারের জন্ম হয়। তাঁহার মাতার নাম উন্মাদিনী দেবী ও পিতার নাম শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায়, সুশীলকুমারের

পিতা শৈশবে পিতৃ মাতৃহীন হইয়াও কিরূপ অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতায় দ্বারা লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। হরিপদবাবু বি, এল পাশ করিয়া হুগলী কোর্টে ওকালতি করিতেন, কিন্তু যে কারণেই হউক ওকালতিতে তাহার বিশেষ পসায় না হওয়ায় সুশীল কুমারের ধনীর সন্তান হওয়ার সৌভাগ্য হয় নাই; হরিপদবাবু অত্যন্ত শিক্ষানুরাগী ও পুত্রদের লেখাপড়া শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন।

ভদ্রেশ্বর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় হইতে সুশীলকুমার ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং হুগলী কলেজ হইতে এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার কলেজে ভর্ত্তি হন; মেডিকেল কলেজে **First year**এ পাঠকালে ভবানীপুর চক্রবেড়ে নিবাসী আলিপুর জজ আদালতের উকিল গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী হেমনলিনী দেবীর সহিত বিবাহ হয়। সুশীলকুমার যখন মেডিকেল কলেজে পড়েন, তখন তাঁহার পত্নী বিয়োগ হয়, হেমনলিনীর কোন সন্তানাদি হয় নাই, এই ঘটনার এক বৎসর পরে সুশীলকুমারের জেলা হুগলীর অন্তর্গত থানা পাণ্ডুয়া এলাকাধীন দমদমা গ্রাম নিবাসী বাবু হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা শ্রীমতী স্নেহলতা দেবীর সহিত বিবাহ হয়। মেডিক্যাল কলেজে পাঠকালে তিনি সরকারী বৃত্তি ও অনার্স সার্টিফিকেট পান। তন্মধ্যে **optholmic surgery** সম্বন্ধীয় পরীক্ষাটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনার্স্ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া স্বর্ণ পদক পান। এল, এম, এস পরীক্ষায় পাশ করিবার পর মেডিকেল কলেজের চক্ষু চিকিৎসার হাঁসপাতালে কিছুদিন কার্য্য করেন, পরে কলিকাতা মেয়ো হাসপাতালে চাকুরি পান। এই চাকুরি করিতে থাকা কালে মেডিকেল কলেজের চক্ষু চিকিৎসালয়ে প্রধান চিকিৎসকের পদ শূন্য হইলে মেয়ো হাসপাতাল হইতে মেডিকেল কলেজে প্রধান চিকিৎসক হইয়া আসেন। কিছুদিন পরে সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া কলিকাতায় চক্ষু

চিকিৎসকরূপে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর কলিকাতায় বেলগেছিয়া নামক স্থানে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ঐ কলেজের কর্তৃপক্ষগণ সুশীলকুমারকে উক্ত কলেজে প্রধান চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত করেন।

১৯১৯ অব্দের ডিসেম্বর মাসে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হইতে এক বৎসরের ছুটি লইয়া বিলাত যান। কলিকাতা হইতে ২৪শে ডিসেম্বর তিনি বিলাত যাত্রা করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে **F. R. C. S.** পরীক্ষায় পাশ করেন। তদনন্তর বিলাতে আসিয়া **London**এর **Moorfield Eye Hospital**এ ভর্ত্তি হন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে অক্সফোর্ডের **D. O.** পরীক্ষায় পাশ হন এবং ইহার অল্পদিন পরে বিলাতের **D. O. M. S.** পরীক্ষায় পাশ করেন, **D. O.** পরীক্ষা চক্ষুরোগ সম্বন্ধে বিলাতের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা; লণ্ডনে চক্ষুরোগ সম্বন্ধে কোন আলাদা পরীক্ষা তখন ছিলনা। ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা করিতে থাকেন।

বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সুশীলকুমার পুরাপুরি ভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন এবং বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হইয়া দশের ও দেশের কার্য্যে মনোনিয়োগ করেন। তিনি একই সময়ে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ ও কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের হাউস সার্জ্জেন ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের **Final M. B.** পরীক্ষার পরীক্ষক ও ট্যাবুলেটর ছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত **State Medical Faculty of Bengal'**র সদস্য ও পরীক্ষক ছিলেন। তিনি কলিকাতার টাউন স্কুলের সহকারী সভাপতি এবং বাঙ্গলা দেশে অন্ধতা নিবারণী সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

ইহা ভিন্ন গ্রামের তেলেনীপাড়া ভদ্রেশ্বর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

গ্রামের অনাথ ভাণ্ডার, গ্রামের লাইব্রেরী (অন্নপূর্ণা পুস্তকাগার) ও অন্যান্য ছোট বড় প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগাযোগ ছিল। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের জন্য সমভাবে কাজ করিয়া এতগুলি প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগ রক্ষা কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল তাহা সত্যই চিন্তার বিষয়। ইহাদের জন্য তাহাকে তাহার সময়ের প্রায় সমস্তটিই ব্যয় করিতে হইত ও প্রচুর পরিশ্রম করিতে হইত। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের মতে তাহার এই অতিরিক্ত পরিশ্রমই তাহার অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল।

গ্রামে ফিরিয়া যাও "**go back to village**" এই বাক্যে তাঁহার আস্থা ছিল এবং দেশের মেরুদণ্ড সেই গ্রাম সমূহের উন্নতি ভিন্ন দেশের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়, একথা তিনি হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কায়রোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চক্ষু চিকিৎসা সম্মেলনীতে তিনি ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন (**He represented the Government of India at the 15th International Opthelmological Congress held at Cairo in December 1937**) ও সেখান হইতে পরে ইউরোপের অন্তর্গত জুরিচ ভিনো ও ইউট্রেচট প্রভৃতি বড় বড় চক্ষু-চিকিৎসালয় পরিদর্শন করিয়া, প্রায় এক বৎসর পরে আবার দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ইহার প্রায় দুই বৎসর পরে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সাম্প্রদায়িক অবিচারের প্রতিবাদে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে তেলিনীপাড়াতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার ন্যায় চক্ষু চিকিৎসক তৎকালে ভারতবর্ষে কেহ ছিল না।

ভাগীরথী তীরস্থ সোমড়া ও বলাগড়ের মধ্যস্থিত সুখড়িয়া হুগলী জেলার

একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। বহু প্রাচীন দেবালয় অদ্যাপি এই স্থানে বিদ্যমান আছে দেখিতে পাওয়া যায়। উলার মুস্তৌফী বংশের একটি শাখা এই স্থানে বসবাস করায়; এই গ্রাম প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। সুখড়িয়া হইতে প্রাপ্ত একটি প্রাচীন কাগজে লিখিত আছে নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত আনন্দরাম মুস্তৌফীর মনোমালিন্য ঘটায়, বৰ্দ্ধমানাধিপতি তিলকচাঁদ তাঁহার বাসস্থানের জন্য তদানীন্তন বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সুখড়িয়া, গোপীনগর প্রভৃতি স্থানগুলি তাঁহার পুত্রের নামে বিক্রয় কোবালা লিখিয়া দেন। তিনি সম্ভবতঃ ১১৬৭ সালে এই গ্রামে বসবাস করেন এবং নিজ নামানুসারে অনন্তদেব নামক বহুচক্র শোভিত একটি শালগ্রাম শিলা, শ্যামরায় রায় নামক যুগল রাধাকৃষ্ণ মূৰ্ত্তি এবং দ্বাদশটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন; সেগুলি অদ্যাপি এই স্থানে বিদ্যমান আছে।

সুখড়িয়া

সুখড়িয়া গ্রামে গঙ্গেটিয়া নামক খালের ধারে নিস্তারিণী কালীর সুবৃহৎ মন্দির একটি দর্শনীয় বস্তু। মন্দির আধুনিক হইলেও, মন্দির মধ্যে দেবীর কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত মূৰ্ত্তি সজীব বলিয়া ভ্রম হয়। কাশীগতি মুস্তৌফী ১২৫৪ সালে অৰ্দ্ধ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইহা নির্ম্মাণ করেন; মন্দিরের উচ্চতা প্রায় পঞ্চাশ ফুট হইবে।

এই স্থানের আনন্দময়ীর মন্দির বঙ্গদেশের মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ মন্দির বলিয়া খ্যাত। ১৭৩৫ শকাব্দে লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া বীরেশ্বর মুস্তৌফী ইহা নির্ম্মাণ করেন। মন্দিরটি ৭০ ফুট ৮ ইঞ্চি উচ্চ এবং ইহার পঁচিশটি চূড়া আছে। মন্দির গাত্রে টালির উপর নানা দেবদেবীর মূৰ্ত্তি খোদিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। খোদিত মূৰ্ত্তিগুলির মধ্যে রাধাকৃষ্ণ, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, সিংহবাহিনী, রামসীতা প্রভৃতির মূৰ্ত্তিগুলি উল্লেখ-যোগ্য। মন্দির মধ্যে বেদীর উপর শায়িত শিবের বক্ষোপরি উপবিষ্টা আনন্দময়ী কালী আছেন; দেবীর উচ্চতা প্রায় তিন ফুট হইবে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে মন্দিরের সর্ব্বোচ্চ পাঁচটি চূড়া ভাঙ্গিয়া যাইলে, পরবর্ত্তী

কালে রাধাজীবনের দৌহিত্রগণ চূড়াগুলি পুনরায় নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

হরসুন্দরী কালীর মন্দিরও এক সময় দেখিবার জন্য দেশ-দেশান্তর হইতে যাত্রী সমাগম হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে মন্দিরটি ভগ্ন হওয়ায় ইহার শোভা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মন্দিরটি দ্বিতল ও নয়টি চূড়ায় শোভিত ছিল এবং ইহার উচ্চতা প্রায় ষাট ফুট ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে মন্দিরের উপরের সমস্ত চূড়াগুলিই ভূমিস্মাৎ হইয়া গিয়াছে। হরসুন্দরী কালী মন্দিরের উঠানের মধ্যে দুইটী পঞ্চচূড়া বিশিষ্ট মন্দির এবং দুই সারিতে বারটি মন্দিরের মধ্যেই শিবলিঙ্গ আছে। তোরণ দ্বারের বহির্গাত্রে কৃষ্ণ প্রস্তর ফলকে নির্ম্মাতার নাম নিম্নোক্তরূপে খোদিত আছে :

"শ্রীশ্রী দুর্গা শরণং
এ দেবালয় দেওয়ান রামনিধি মুস্তৌফী
শকাব্দা ১৭৩৫"

এতদ্ব্যতীত গ্রামের মধ্যে বহু ভগ্ন শিবের মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন; তন্মধ্যে গীতবাদ্যবিশারদ যোগীন্দ্রগতি মুস্তৌফী, গুরুদাস মুস্তৌফী বিখ্যাত ব্যবসায়ী নলীন্দ্রনাথ মুস্তৌফী, ক্ষেত্রগতি মুস্তৌফীর নাম উল্লেখযোগ্য। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী লিখিত "উলার মুস্তৌফী বংশ" নামক গ্রন্থ পাঠ করিলে শ্রীপুর ও সুখড়িয়ার বিষয় অনেক তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। *

---

* ২০শে নভেম্বর ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে শ্রীপুরের বারোয়ারী পূজা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল।

"মোকাম বলাগড়ের নিকটবর্ত্তী শ্রীপুর গ্রামে প্রতিবৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে বারোয়ারি পূজা হইয়া থাকে। তাহাতে অনেক সমারোহ হয়। এবং বাজী পোড়ানোর অনেক বাহুল্য হইয়া থাকে।"

হরিপাল

মহারাজ শশাঙ্কের রাজত্বের পর হইতে পাল রাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ বহু বিদেশী রাজা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল, বলিয়া জানা যায়। সেই জন্য উক্ত সময়ে বঙ্গদেশে কোন প্রকারের শান্তি ছিল না। সেই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করিয়া সন্ধ্যাকর নন্দী বঙ্গদেশকে 'মাৎস্যন্যায়ের' সহিত তুলনা করিয়াছেন। 'মাৎস্যন্যায়' বলিতে অরাজকতা বুঝায়। দেশে নানারূপ বিদ্রোহ ও অশান্তি চলিতেছিল বলিয়া শাসনকার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালন করিবার জন্য প্রজাপুঞ্জ পাল বংশের প্রথম রাজা গোপালদেবকে রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনেও তিনি যে, অরাজকতা হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্য জনসাধারণ কর্ত্তৃক অষ্টম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আছে।

ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেন "Bengal suffered from prolonged anarchy which become so intolerable that the people (C. A. D. 750) elected as their King Gopal, of the race of the sea, in order to introduce settled Government." *

গোপালদেব পাল বংশের প্রথম রাজা; তিনি প্রৌঢ় বয়সে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন এবং অতি অল্প কাল রাজ্য শাসন করিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন। গোপালদেব ৭৯০—৭৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দেহত্যাগ করেন বলিয়া মনে হয়। †

গোপালদেবের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ধর্ম্মপাল রাজা হন। তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন, এবং পাল রাজাদের গৌরব তাঁহার দ্বারাই সারা

* The Oxford History of India, Page 185.

† বাঙ্গলার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৫

ভারতময় প্রচারিত হয়। সমগ্র উত্তর ভারত তিনি জয় করেন এবং তাঁহাকে বঙ্গ, বিহার ও উত্তর ভারতের নৃপতি বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। তিনি কিরূপ দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন, তাহা ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রাপ্ত খালিমপুর তাম্রশাসন হইতে সম্যক জানিতে পারা যায়।

ধর্ম্মপাল বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং মগধ, বঙ্গ ও বরেন্দ্রভূমে তিনটি বৌদ্ধ-বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

"Dharmapal was a Budhist and built a celebrated monastery at Vikramsila on the bank of the Ganges. He seems to have enjoyed a very long reign probably of forty-five years. (A. D. 770-815)." *

ধর্ম্মপালের পর দেবপাল এবং দেবপালের পর বিগ্রহপাল রাজা হন। বিগ্রহপাল বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন বলিয়া তাঁহার পুত্র নারায়ণ পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎপরে ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহীপাল ৯৮০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। তিনি জনপ্রিয় নৃপতি ছিলেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে বিবিধ গীতাবলী অদ্যাবধি বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র শ্রুত হইয়া থাকে। †

পালবংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকালে বঙ্গদেশের বহু স্থানে তাঁহাদের নানা শাখার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা প্রচলিত আছে; তাঁহারা ভূ-স্বামী বা ভুঁইয়া নাম জনসাধারণে পরিচিত হইয়াছিলেন। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে হুগলী জেলায় রাজা কুলপাল সতীদেবীর বরে সেইরূপ একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

যে সময় পাল নৃপতিগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সেই সময় পালবংশীয় কুলপাল ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'মহাবলবান' ও 'দেশপালক' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।

* The Cambridge Shorter History of India, Page-143.

† Rajshahi District Gazetteer, page 26

তাঁহার দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, জ্যেষ্ঠ হরিপাল এবং কনিষ্ঠ অহিপাল। জ্যেষ্ঠ হরিপাল হুগলী জেলার অন্তর্গত সিঙ্গুরের পশ্চিমে নিজে নামানুসারে হট্টবাপিযুক্ত একটি মহাগ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় ব্রাহ্মণ, তন্তুবায় ও সাঙ্গাইদিগের রাজা হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এই সম্বন্ধে 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' নামক প্রাচীন গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, তাহা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

"সতীদেব্যা বরনৈব ভীমভুজবল পুত্রকঃ॥ ৬৭৭
কুলপালো দেশপালো বিখ্যাতঃ পশ্চিম তটে।
কুলপালস্য দ্বৌ পুত্রৌ হরিপালো অহিপালকৌ॥ ৬৭৮
জ্যেষ্ঠঃ সিঙ্গুর পশ্চিমে স্বনামবসতিং কৃতঃ।
হরিপালো মহাগ্রামো হট্টবাপীসমন্বিতঃ॥ ৬৭৯
হরিপালো হি তত্রৈব তন্তুবায়স্য গোষ্ঠীষু।
রাজা বভূব বিপ্রেষু সাঙ্গাপি সংজ্ঞকেষু চ॥" ৬৮০

রাজা হরিপালের কানড়া নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল, তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য গৌড়েশ্বর রাজা হরিপালের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং রাজকুমারী বৃদ্ধ রাজাকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন বলিয়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়া যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এই সম্বন্ধে স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিতেছি।*

"হরিপাল রাজার কন্যা কানড়া পরমা সুন্দরী; বৃদ্ধ গৌড়াধিপ, হরিপালের নিকট তদীয় কন্যার পাণীপ্রার্থী হইয়া দূত প্রেরণ করেন। বৃদ্ধ রাজার হস্তে তরুণী সুন্দরী কন্যাকে প্রদান করিতে হরিপাল অনিচ্ছুক, কিন্তু গৌড়েশ্বরের অসীম পরাক্রম স্মরণ করিয়া ভীত। রাজকুমারী কানড়ার প্ররোচনায় রাজা অবশেষে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া উত্তর দিলেন।

* 'বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়' (১ম খণ্ড—পৃষ্ঠা ৪৪৪)

গৌড়েশ্বরের সৈন্য হরিপালের রাজ্য অবরোধ করিল এবং রাজকুমারী স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলেন। তাঁহার সাহায্যার্থে স্বয়ং চণ্ডীদেবী তদীয় ডাকিনী ধুমসীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং গৌড়েশ্বরের সৈন্য পরাজিত হয়।"

১৭১৩ খৃষ্টাব্দে ঘনরাম চক্রবর্ত্তী রচিত 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে' রাজকুমারী কানড়ার যুদ্ধের একটি বিবরণ আছে। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম:

"সেনাগণ দানাগণ সমরে নিদারুণ
দু দলে করে হানাহানী ॥
রঙ্গিনী রণজয়ী দুন্দুভি বাজই
ঘন ঘোর গাজই দামা।
রাজপুত্র মজবুত যৈছন যমদূত
সমযুত বুঝে খানসামা ॥
ঘুঁড়ী পীঠে কানড়া ঝাঁকে ঝাঁকে ঝকড়া
ঝাপটে ঝিকে ঝুপ ঝুপ।
না মানিয়া সংশয় রণজিৎ রণজয়
রোষে বীর রণভীম ভূপ ॥
করয়ে অর্জ্জন ঘোরতর গর্জ্জন
দুর্জ্জন দানাগণ দর্পে।
সংগ্রামে সেনাগণ সংহারে যৈছন
ক্ষুধিত খগপতি স্বর্পে ॥"

ময়নাগড়ের রাজা কর্ণসেনের পুত্র লাউসেনের সহিত রাজকুমারী কানড়ার বিবাহ হইয়াছিল। ধর্ম্মমঙ্গল সমূহে ইহাদের বিষয় লিখিত আছে।

বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে সম্যক কিছু জানিবার উপায় নাই—

কারণ এখানকার জলবায়ুর প্রভাব এবং ধ্বংসলীলার জন্য প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহ অধিকাংশ স্থানেই মৃত্তিকাভ্যন্তরে নিহিত আছে। বগুড়া জেলার মহাস্থান, দিনাজপুর জেলার বাইগ্রাম এবং হুগলী জেলার মহানাদ খনন করিয়া প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সমস্ত আবিষ্কারের ফলে বাঙ্গলার প্রাচীন ইতিহাসের অনেক প্রয়োজনীয় কথা জানা গিয়াছে।

হরিপাল বর্ত্তমানে হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম; কলিকাতা হইতে ২৮ মাইল দূরে অবস্থিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের তারকেশ্বর লাইনের একটি প্রধান ষ্টেশন। ধর্ম্মমঙ্গল সমূহে রাজা হরিপালের প্রভাবের যথেষ্ট পরিচয় থাকিলেও, হরিপালে তাঁহার কোন ঐতিহাসিক নিদর্শন বর্ত্তমানে দেখিতে পাওয়া যায় না।

হরিপালের চতুঃপার্শ্বস্থিত কয়েকখানি গ্রামের নাম হইতে শিলস্ ফ্রি কলেজের হেড মাষ্টার এবং ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পর 'সংবাদ প্রভাকরের' সম্পাদক কবি রাধামাধব মিত্র ১২৯৯ সালে 'তোমার কথা' নামক একটি কবিতায় এই স্থান যে পূর্ব্বে রাজধানী ছিল তাহা লিখিয়াছিলেন। নিম্নে উক্ত কবিতাটীর কয়েক ছত্র 'জেজুরের মিত্র-বংশ' নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল :

"সমীপস্থ গ্রামের অভিধান,
তাতে রাজধানী ছিল, সপ্রমান।
'বন্দীপুর' কারাগার বুঝা যায় ভাবে,
'হাতশেওলা' হাতীশাল লোকে অনুভবে।
'নইটি' যে নবহাট কে আর না কয়,
'চিত্রশাল' ছবিঘর অমূলক নয়।
রাজার নিশ্চয় ছিল, প্রকাণ্ড ভাণ্ডার
তাইতো 'ভাণ্ডারহাটী' নাম হয় তার।

প্রতিষ্ঠিত ভগবতী দেবীর ভবন,
'ভগবতীপুর' নাম হয়েছে গ্রহণ।
ছিল বলি নৃপতির জামাতার-বাটী,
তাইতো হয়েছে নাম 'জামাই-বাটী'।
ছিল বলি নৃপতির বড় আম্রোদ্যান,
হইয়াছে 'আম্রোগেছে' সেতো আখ্যান।
'জেজুরে' যে পূর্ব্বে ছিল রাজার ভবন
লক্ষণেতে হ'লো প্রায় সংশয় ভঞ্জন।
রাজধানী ছিল বটে, বুঝা যায় ভাবে
বলিতে না পারা যায় কোন কালে কবে ?"

রাজা হরিপালের রাজ্য ষোল ক্রোশ ব্যাপী বিস্তৃত এবং ইহা সাতাইশটি পটিতে বিভক্ত ছিল। বর্ত্তমানে এক একটি পটি এক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হইয়াছে এবং পূর্ব্বের বহু নামও বর্ত্তমানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কৌশিকী নদীতীরে অবস্থিত এই সুন্দর স্থানটীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতীব মনোরম ছিল। এই সম্বন্ধে মাণিক গাঙ্গুলী ধর্ম্মমঙ্গলে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইল :

"নগরের শোভা স্বর্গ সম কিবা
দেখে মনে মোহ পায়।
শ্রীধর্ম্ম চরণ, করিয়া স্মরণ,
দ্বিজ শ্রী মানিক গায়॥"

হরিপাল নামক স্থান পূর্ব্বোক্ত সাতাইশটি পটির অন্যতম প্রধান পটি ছিল এবং ইহার পূর্ব্ব নাম 'সিমুলাই' বলিয়া খ্যাত ছিল। সূক্ষ্ম কার্পাস সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্রের জন্য এই স্থান বহু প্রাচীন কাল হইতেই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। অদ্যাপি হরিপালে বহু তন্তুবায় বাস করেন,

এবং এই স্থানের প্রস্তুত বস্ত্রাদি 'সিমুলাই কাপড়' বলিয়া বঙ্গের সর্ব্বত্র পরিচিত। তৎকালে সিমুলাই যে সমৃদ্ধশালী নগর ছিল, তাহা নিম্নোক্ত দুইটি পঙক্তি হইতে প্রতীয়মান হইবে :

"সাক্ষাৎ সোনার লঙ্কা সিমুল নগর।
ব্রাহ্মণী বেষ্টিত তায় যেমন সাগর ॥"

হরিপালের ষোল ক্রোশ ব্যাপী রাজ্যের মধ্যে পাঁচটী গড় ছিল—বাহির গড়, পাথর গড়, লোহার গড়, তাম্বার গড়, এবং ভিতর গড়। এই গড়গুলি বর্ত্তমানে বিভিন্ন গ্রামে পরিণত হইয়াছে। বাহির গড় অধুনা বাহির গড়া নামক গ্রামে পরিণত হইয়াছে এবং ইহা জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত। এই গ্রামে বর্ত্তমানে রাজা বিষ্ণুদাসের বংশধরগণ বাস করেন। এই সম্বন্ধে ঘনরাম চক্রবর্ত্তী যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

"ধন কড়ি ধান্য কেহ রাখে মাটি খুঁড়ে।
সভয় সকল লোকে ষোল ক্রোশ জুড়ে ॥
রাজার মোকামে সবে দেখে শূন্যাকার।
চীল উড়ে গগনে বাহির গড় পার ॥"

গৌড়ের রাজার সহিত হরিপালের যুদ্ধ সম্বন্ধে রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন :

"He (Emperor of Gauda) also sent Lau Sen to punish King Haripal who had refused the old Emperors proposal to marry his young and beautiful daughter Kaneda. A battle ensued in which the army was led to the field by the lovely princess herself. The encounter between her and our hero was sharp and aniented, but she could not long withstand the superior skill and heroism of Lau Sen

and king Haripal was ultimately forced to submit. Kaneda was, however, given in marriage to Lau Sen with the consent of the Emperer." *

হরিপাল রাজার প্রতিষ্ঠিত বিশালক্ষী দেবীর মূর্ত্তি অদ্যাপি এই গ্রামে বিদ্যমান আছে এবং ইহা বর্ত্তমানে চণ্ডালকন্যা বিশালক্ষী বলিয়া প্রসিদ্ধ; এই স্থানে বহু নরবলী হইয়াছে। বিশালক্ষী দেবীর 'চণ্ডালকন্যা বিশালক্ষী' নামকরণ সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী আছে। বহুদিন পূর্ব্বে এই স্থানে বহু চণ্ডাল রাজার সৈনিকের কার্য্য করিত। জনৈক চণ্ডাল দলপতি তাহার পুত্রের বিবাহ দিয়া দেবীকে প্রণাম করিবার জন্য বর ও কন্যাকে লইয়া মণ্ডপে উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহার নিকট প্রণামী না থাকায় বর-কন্যাকে তথায় রাখিয়া সে প্রণামী আনিতে যায়; কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া আর কন্যাকে দেখিতে পায় না। অথচ দেবীর মুখে চেলীর কিয়দংশ ঝুলিতেছে দেখিতে পায়। চণ্ডাল ক্রন্দন করিতে করিতে প্রার্থনা জানাইল—"মা কন্যাকে ফিরাইয়া দেন।" প্রত্যাদেশ হইল "আমি কন্যাকে খাইয়া ফেলিয়াছি—আজ হইতে আমাকে যেন চণ্ডালকন্যা-বিশালক্ষী বলিয়া অভিহিত করা হয়।" অদ্যাপি উক্ত বিশালক্ষী দেবী এই স্থানে দৃষ্ট হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেও হরিপাল একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল এবং ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে রাজবলহাট হইতে এজেন্সী হরিপালে স্থানান্তরিত হয়। হরিপালে কোম্পানীর অধীনে একজন ইংরাজ 'রেসিডেন্ট' ও একজন ইংরাজ ডাক্তার থাকিতেন। ইহাদের কতকগুলি গোমস্তা ও সরকার সোনামুখী, কৈঁকালা, দ্বারহাট্টা প্রভৃতি স্থানে তাঁতীদিগকে দাদন দিয়া তসর, গরদ ও নানাবিধ সূতার কাপড় বুনাইয়া লইত। হুগলীর কালেক্টর সাহেবের তত্ত্বাবধানে এই এজেন্সী পরিচালিত হইত; ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে

* Bengali Language & Literature. P-49-50.

কোম্পানী স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ করিলে এই এজেন্সীগুলি উঠিয়া যায় এবং ওয়াটসন কোম্পানী উহা চালাইবার ব্যবস্থা করেন।

হরিপাল ও তাহার পার্শ্বস্থিত গ্রামগুলিতে বহু প্রসিদ্ধ ও ধনাঢ্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র, বিচারপতি হরিনাথ রায়, মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ, টেকচাঁদ ঠাকুর, নীলকমল মিত্র, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের এই অঞ্চলে বাসস্থান। হরিপালের রায় বংশ ও ভড় বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। রায় বংশের বহুকীর্ত্তি অদ্যাপি এই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী উমাচরণ ভড় হরিপালের মৃতকল্পা কৌসিকী নদীর সংস্কারের জন্য এক সময় ত্রিশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।

হরিপালে গুরুদয়াল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, দাতব্য চিকিৎসালয়, বালিকা বিদ্যালয়, সাব-রেজেষ্ট্রী অফিস, থানা প্রভৃতি সমস্তই আছে। এই থানার অধীনে আটটি ইউনিয়ন বোর্ড বর্ত্তমানে আছে; ইউনিয়ন বোর্ডগুলির নাম জেজুর, কৈকালা, ফরিদপুর, এলাহিপুর, বন্দীপুর দ্বারহাট্টা, হরিপাল ও নালিকুল। প্রত্যেকটি ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনস্থ গ্রামগুলি এক সময় বিশেষ সমৃদ্ধ ও সঙ্গতিপন্ন লোকের আবাসস্থল ছিল; কিন্তু ম্যালেরিয়া মহামারীরূপে এই অঞ্চলে দেখা দিবার পর হইতেই গ্রামগুলির অবস্থা খারাপ হইয়া যায়। ১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে মহামারীর সময় এই স্থানে একটি সরকারী চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছিল; কিন্তু ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণের সহানুভূতির অভাব বলিয়া উক্ত চিকিৎসালয় সরকার বাহাদুর বন্ধ করিয়া দেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে জেলাবোর্ডও এই স্থানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়া ছিলেন, কিন্তু অর্থের অনটন বলিয়া কিছুদিন পর তাহা তুলিয়া দেন।

হরিপালের কার্পাস-সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্র অদ্যাপি 'সিমলাই কাপড়' বলিয়া বঙ্গদেশে খ্যাত। বর্ত্তমানে বালির জন্যও এই স্থান প্রসিদ্ধ।

দ্বীপা

দ্বীপা নামক গ্রাম হরিপাল হইতে মাত্র চার মাইল দূরে অবস্থিত একটি নগণ্য স্থানে হইলেও, মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ শ্রীশ্রী কৃষ্ণানন্দ পুরী এই স্থানে হরিনাম বিতরণ করিয়া এই অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার পূর্ব্বক মহাপ্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করায়, বৈষ্ণবদিগের নিকট ইহা অন্যতম পূণ্য পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বলিয়া খ্যাত। কৃষ্ণানন্দ পুরী হইতেই দ্বীপা গ্রামের ইতিহাস আরম্ভ হয়।

প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে এই স্থান জঙ্গলাবৃত ছিল এবং ইহার তিন দিক বেষ্টন করিয়া কৌশিকী, বিমলা ও দামোদর নদী প্রবাহিত হইত বলিয়া স্থানটিকে দ্বীপের ন্যায় দেখাইত এবং সেইজন্যই ইহার 'দ্বীপ' নামকরণ হয়। পরবর্ত্তী কালে 'দ্বীপ' নামটি 'দ্বীপায়' পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ইহা দ্বীপগ্রাম বলিয়া উল্লিখিত আছে ঃ

"ডাঙ্গামোড়াতে বাস সুন্দরানন্দ নাম।
পরম বিদ্বান বিপ্র পণ্ডিত আখ্যান ॥
দ্বীপগ্রামে স্থিতি কৃষ্ণানন্দ অবধূত।
সোনাতলা রঙ্গাদেশে রঙ্গনকৃষ্ণ দাস নিশ্চিত ॥" *

কিম্বদন্তী এইরূপ যে, মহাপ্রভুর তিরোধানের পর কৃষ্ণানন্দ পুরী এই দ্বীপের জঙ্গলে আগমন করিয়া, নিজ হস্তে তাঁহার একটি সুন্দর গৌর-গোপাল বিগ্রহ প্রস্তুত করেন এবং উক্ত বিগ্রহের সেবা করিয়া তিনি বিরহ যন্ত্রণা লাঘব করেন। প্রবাদ এইরূপ যে, দামোদর নদের প্রবল স্রোতে তাঁহার পূজার ব্যাঘাত হওয়ায়, তিনি দামোদরকে অভিশাপ দেন যে আমার পূজার দ্রব্যাদি তুই ভাসাইয়া দিলি, দেখিতে পাইলি না;

* সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা

তোর চক্ষু কাণা হইয়া যাক। তদবধি দামোদর 'কাণা দামোদর' বলিয়া এই অঞ্চলে খ্যাত এবং এই স্থান হইতে বর্ত্তমানে দামোদর নদও প্রায় ছয় মাইল দূরে চাঁপাডাঙ্গার নিকট সরিয়া গিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন দামোদর এই স্থান দিয়া যে প্রবাহিত হইত, তাহা অনেকেই বিশ্বাস করেন না; কিন্তু সহদেব চক্রবর্ত্তী, তাঁহার 'ধর্ম্মমঙ্গলে' লিখিয়া গিয়াছেন।

"বন্দীপুরে বন্দিব ঠাকুর শ্যামরায়।
দামোদর যাহার দক্ষিণে বয়্যা যায়॥"

বস্তুতঃ দামোদর বর্ত্তমান খাতে প্রবাহিত হইবার পূর্ব্বে যে খাতে প্রবাহিত হইত তাহা পাড়াম্ব, সাহাবাজার, দ্বীপা, জগৎবল্লভপুর প্রভৃতি গ্রাম দিয়া হরিপালের উত্তর দিয়া পূর্ব্বমুখে বন্দীপুরের পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল এবং সেইজন্যই হরিপালে এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে আজও প্রচুর পরিমাণে বালি পাওয়া যায়।

কৃষ্ণানন্দ পুরীর তিরোভাবের পর, হরিপালের সন্নিকট জ্যোত-সিন্দুর গ্রামের বিষ্ণুদেব সিদ্ধান্ত নামক এক ভক্ত স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া দ্বীপগ্রামে আসিয়া মহাপ্রভুর গৌরগোপাল বালগোপাল মূর্ত্তির সেবাভার গ্রহণ করেন। অতঃপর দ্বারহাট্টার জমিদারগণের সাহায্যে বনজঙ্গল কাটাইয়া তিনিই প্রথম এই গ্রামে স্থায়ী ভাবে বসতি করেন এবং পরবর্ত্তীকালে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হরিদেব ঠাকুরকে দ্বীপায় আনাইয়া প্রভুর সেবায় নিয়োজিত করেন। ইহাদের বহু শিষ্য ও ভক্ত আছেন এবং ইহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি এই স্থানে বসবাস করিয়া মহাপ্রভুর সেবা কার্য্য বিশেষ অনুরাগের সহিত নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত এই স্থানে নিত্যানন্দ, রাধাবিনোদ ও রাধারাণীর তিনটি বিগ্রহ আ[illegible] প্রতিবৎসর রথযাত্রার সময় বার্ষিক মহোৎসবের সময় এই গ্রামে বহু জ[illegible]াগম হইয়া থাকে।

'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে' ভক্তিকল্প বৃক্ষের যে বর্ণনা আছে, তন্মধ্যে

কৃষ্ণানন্দ পুরীর নাম দৃষ্ট হয়। ইনি ভক্তিকল্প বৃক্ষের নবমূলের একটি মূল ছিলেন বলিয়া গ্রন্থে লিখিত আছে। নিম্নে উক্ত গ্রন্থ হইতে কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত হইল :

"শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি।
ভক্তি কল্প বৃক্ষ রুইল সিঞ্চি ইচ্ছা পানি॥
জয় জয় মাধবপুরী কৃষ্ণ প্রেম পুর।
ভক্তি কল্প তরুর তিহোঁ প্রথম অঙ্কুর॥
শ্রী ঈশ্বরপুরী রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হইল।
আপনে চৈতন্য মালী স্কন্ধ উপজিল॥ ৪ ॥
পরমানন্দ পুরী আর কেশব ভারতী।
ব্রহ্মানন্দ পুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী॥
বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী পুরী কৃষ্ণানন্দ।
নৃসিংহানন্দ-তীর্থ আর পুরী সুখানন্দ॥ ৫ ॥
এই নব মূল নিকসিল বৃক্ষমূলে।
তার অষ্ট মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে॥
মধ্য মূল পরমানন্দ পুরী মহাধীর।
অষ্ট দিকে অষ্ট জড় বৃক্ষ কৈল স্থির॥
স্কন্ধের উপরে বহু শাখা নিকশিল।
উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল॥ ৬ ॥" *

বন্দীপুর

বন্দীপুর হুগলীর একটি প্রসিদ্ধ পল্লীগ্রাম। ইহার নামে পরগণা প্রচলিত; এখানে উচ্চ ডাকঘর, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং বহু লোক ও জাতির বাস। বন্দিপুরের ঘটক (বন্দোপাধ্যায়) জমিদারগণ একসময় বিখ্যাত ছিলেন। বন্দিপুরের

* শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—আদিলীলা, নবম পরিচ্ছেদ।

ঝাইতি জাতি মাদুর শিল্পে একসময় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এখন তাহারা প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছে। বন্দীপুরের ঘোষেরাও বিখ্যাত। তাহাদের মধ্যে বার মাসে তের পার্ব্বন এখনও প্রচলিত আছে।

বন্দীপুর হরিপাল রাজার আদি নিবাস ছিল বলিয়া কথিত হয়। পার্শ্বেই উক্ত রাজার চিত্রশালার জন্য প্রসিদ্ধ চিত্রশালি গ্রাম অবস্থিত।

বন্দীপুরের গৌরব ছিলেন স্বর্গীয় নীলকমল মিত্র ; রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "এলাহাবাদ বা প্রয়াগ" নামক ইংরাজী গ্রন্থে নীলকমল সম্বন্ধে বহু কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বন্দীপুর অপেক্ষা এলাহাবাদে তাঁহার প্রচুর কীর্ত্তি রহিয়াছে। "দেবগণের মর্ত্তে আগমন" গ্রন্থে তাঁহার ভূয়সী সুখ্যাতি এবং নীলকমল পার্কের কথা উল্লিখিত আছে। তাঁহার জীবিত কালে যে কোন বাঙ্গালী ভারতের যে কোন স্থানে হইতে এলাহাবাদে যাইতেন, তাহারাই মিত্র মহাশয়ের আতিথেয়তা লাভ করিয়া ধন্য হইতেন। তিনি মিলিটারীতে রসদ সংগ্রহ করিয়া দিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তথায় তাঁহার নির্ম্মিত **Bandstand in Alfred Park**এর ছবি রামানন্দবাবুর গ্রন্থে মুদ্রিত আছে। তারকেশ্বর রেল পথটী জনাই-এর ভিতর দিয়া যাইবে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। নীলকমল মিত্র তাহা শুনিয়া তাড়াতাড়ি তদানীন্তন বাংলার ছোটলাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বন্দীপুরের পার্শ্ব দিয়া উক্ত রেলপথ লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। বহু অর্থব্যয়ে মাতার গ্রামে আসিয়া তিনি দানসাগর শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার খ্যাতি আজও শোনা যায়। দেশে তাহার বিরাট অট্টালিকা এখনও বিদ্যমান। তাহাতে স্কুলের ছাত্রাবাস, পোষ্টাফিস, লাইব্রেরী প্রভৃতি রহিয়াছে। গ্রামের পার্শ্ব দিয়া কানানদী প্রবাহিতা। ইহার উপর দিয়া তিনি একটি লোহার পুল নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তাহা নীলকমল মিত্রের নামে আজও তাঁহার হিতৈষণার সাক্ষ্য দিতেছে। তাহার পুত্র চারুচন্দ্র মিত্রও কীর্ত্তিমান ব্যক্তি

নীলকমল মিত্র

ছিলেন। ইহার কন্যা সরোজিনী দেবীর সহিত সিভিলিয়ান কিরণচন্দ্র দের বিবাহ হয়। চারুচন্দ্র মিত্রের পুত্র ফণী মিত্র ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বন্দীপুর হাই স্কুল নির্ম্মাণকালে জমি ও ইষ্টক দান করিয়া স্কুল নির্ম্মাণ কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করেন।

বন্দীপুরে ধর্ম্মঠাকুর শ্যাম রায় প্রসিদ্ধ। বুদ্ধদেবই বঙ্গদেশে ধর্ম্মঠাকুর নামে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের দ্বারা পূজিত হইতেছেন। সমগ্র বঙ্গদেশে অগণিত ধর্ম্মঠাকুরের মধ্যে বন্দীপুরের শ্যাম রায় এবং বাঁকুড়ার যাত্রাসিদ্ধি রায়ই প্রসিদ্ধ। শ্যাম রায়ের পূজারিরা জেলে জাতীয়, উপাধি পণ্ডিত। ইহারা শ্যামরায়ের নামে জলপড়া ও নানা রোগের ঔষধ দেন। এই স্থানে নদীগর্ভে বুদ্ধদেবের কয়েকটি মূর্ত্তিও পাওয়া যায়।

ডন সোসাইটির স্থাপয়িতা স্বদেশীযুগের অগ্নিমন্ত্রের সাধক **Dawn Magazine**এর সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক চন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এই গ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন, এই গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মোদক, কিঙ্করবাটী গ্রামের ধরণীধর কয়াল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত নালিকুল গ্রামের মন্মথ রায় কর্ম্মকার ব্যবসার দ্বারা প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

পার্শ্ববর্ত্তী গজা গ্রামের ভট্টাচার্য্য জমিদারগণ এককালে প্রসিদ্ধ ছিলেন তাহাদের বিশাল জমিদারী মোহালের মধ্যে বন্দীপুরের নাম প্রজাদের ন্যায় আজও প্রচলিত। চিত্রশালার সিংহ বংশীয় কায়স্থগণও প্রসিদ্ধ। বন্দীপুরের নিকটেই বড়গাছিয়া গ্রাম। এই গ্রামের সিংহ বংশীয় কায়স্থগণ এক সময়ে জমিদার ছিলেন। তাঁহাদের অতিথিশালায় নিত্য বহুদূর হইতে অতিথি সমাগম হইত; নানা দেবকীর্তি আজও এই স্থানে বিদ্যমান।

কঙ্কালীচরণ বিদ্যালঙ্কার বন্দীপুরের স্বনামধন্য দশকর্ম্মান্বিত পণ্ডিত ছিলেন। পরিণত বয়সে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। রাসেশ্বর বিদ্যারত্ন

প্রমুখ তাঁহার পুত্রগণ সকলেই কৃতী ছিলেন। রাসেশ্বর কলিকাতা গৌরী-বাড়ী লেনে অনেকগুলি ইষ্টক নির্ম্মিত আবাস ভবন নির্ম্মাণ করেন। জ্যোতিষ চর্চ্চা করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন।

বন্দীপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশও প্রসিদ্ধ; এই বংশের রামনাথ চট্টোপাধ্যায় আলমবাজারে আসিয়া বাস করেন। আলমবাজারে ইহাদের বাড়ী "থামওয়ালা চাটুয্যেদের বাড়ী" বলিয়া খ্যাত। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই ভবনে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায় বংশের স্বর্গীয় নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত পান্নালাল চট্টোপাধ্যায় স্বনামখ্যাত ব্যক্তি।

বড়গাছিয়া গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ নানা এষ্টেটের নায়েবী কার্য্য করিয়া একদা প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি পরোপকারী মুক্তহস্ত এবং শত বর্ষ জীবিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র সারদাপ্রসাদের পুত্র ভোলানাথ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিয়া এই অঞ্চলে যশস্বী হইয়াছিল। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় নানা প্রবন্ধ প্রকাশ ও হোমিওপ্যাথিক সমাচারের সম্পাদনা করিয়া তিনি যশস্বী হন। তাঁহার লিখিত "শ্রীশ্রীঅমিয় নিতাই চরিত" ও "শ্রীনিবাস আচার্য্য তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজ যখন যুগপৎ "ভক্তি" "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয় গৌরাঙ্গ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে, তখন বৈষ্ণব সমাজের সর্ব্বস্থান হইতেই তিনি আশীর্ব্বাদ লাভ করেন। ১৩২৮ বঙ্গাব্দে তিনি শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের জীবনী লিখিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

এই গ্রামের ঘোষাল বংশ প্রসিদ্ধ। ৺ ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষাল, মহেন্দ্রনাথ ঘোষাল ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথের বাংলা ইংরাজী অভিধান একদা প্রসিদ্ধ ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঘোষাল শ্রীরামপুরে চিকিৎসাকার্য্যে ব্রতী হইয়া যশস্বী হন। তাঁহার পুত্র সাংবাদিক যতীন্দ্রনাথ ও উকিল

মনীন্দ্রনাথও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সিংহ বংশের যোগেন্দ্রনাথ আমেরিকা হইতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হইয়া আসিয়া সুখ্যাতির সহিত তাহাদের কলিকাতা আবাস ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা করিতে-ছিলেন। তিনি এম্ ডি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শশীভূষণ এল্ এম এস ও মধ্যম ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ ব্যারিষ্টার ছিলেন।

পার্শ্ববর্ত্তী নওপাড়া গ্রামের ডাঃ সারদাচরণ দাস এল্ এম্ এফ, ধাত্রী-বিদ্যায় খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার দাদা কুঞ্জ বিহারী শ্রীগৌরাঙ্গ পদাশ্রিত ছিলেন। ইহারা মাহিষ্য জাতীয়।

এই স্থানে অবান্তর হইলেও সাহিত্যক্ষেত্র হইতে বিযুক্ত-স্মৃতি চুঁচুড়া কাঁকশিয়ালীর মজুমদার বাটির ৺শ্যামনাথ মজুমদারের নাম আমরা উল্লেখ করিব। তাঁহার তত্ত্বকুসুম প্রভৃতি বহু উচ্চাঙ্গের কবিতা গ্রন্থ বসন্ত প্রভৃতি উপন্যাস একদা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তিনি চিরদরিদ্র ছিলেন। গুণগ্রাহী বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র, তাঁহাকে তাহার এরিয়ান ইনষ্টিটিউশনে চাকরী দিয়া তাঁহাকে প্রতিপালন করেন।

ইংরাজ আমলের প্রথমাংশে সার্ভে কার্য্যের সুবিধার জন্য নানা সুউচ্চ গম্বুজ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বড়গাছিয়া গ্রামের পার্শ্বে ভোলাগ্রামে এইরূপ একটি সুউচ্চ গম্বুজ আজও বিদ্যমান। 'দেবগণের মর্ত্তে আগমন' গ্রন্থে ভুলক্রমে উহাকে ভোলার গির্জ্জা বলা হইয়াছে। ডাক্তার ক্রফোর্ড সাহেব তাঁহার **Hughly Medical Gazetters** নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন:

"The only thing of interest near the line is the great Trigonometrical Survey tower at Bhola, which is within a few yards of the line on the north side, halfway between Singur and Nalikul station."

এই স্থানে বড়গাছিয়া গ্রামের সীমানায় তারকেশ্বর সেওড়াফুলি রাস্তার উত্তর পার্শ্বে বহু চটি বা যাত্রী নিবাসের কথা উল্লিখিত আছে। তারকেশ্বর রেলপথ নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে এই সকল চটি লোক সমাগমে পূর্ণ থাকিত

এবং বহু ঘোড়ার গাড়ী যাত্রী বহনের জন্য এই স্থানে বিদ্যমান থাকিত। উহার সুবিস্তার বর্ণনা উক্ত গ্রন্থে আছে। এক্ষণে তাহার চিহ্নও নাই।

পার্শ্ববর্ত্তী পার-গোপালনগর গ্রামের মিত্রগণ সুবিখ্যাত। শশীভূষণ মিত্র কলিকাতা সহরে ব্যবসায়ের দ্বারা প্রভূত ধনোপার্জ্জন করেন। তাঁহার জ্যৈষ্ঠ পুত্র বটকৃষ্ণ ও ২য় পুত্র ধনকৃষ্ণ ও অন্যান্য পুত্রগণও ব্যবসায়ী। ইহাদের পরোপকারিতা প্রসিদ্ধ। ইহারা পাঁচ ভ্রাতাই বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার আজীবন সভ্য। তিনি স্বগ্রামে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি বহু জনহিতকর কার্য্যে আত্ম নিয়োগ করিয়াছেন।

অখিলচন্দ্র পালিত এন্‌ট্রান্স পাশ করিয়া কুচবিহারে দারোগাগিরি করেন; মহারাজার আদেশে তথায় ব্যবহারজীবীর কার্য্য করিয়া যশস্বী হন। তিনি সুকবি সুলেখক ও বহুভাষাবিৎ ছিলেন। ইংরাজী বাঙ্গলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অসামান্য পারদর্শিতা ও পাণ্ডিত্য ছিল। সমসাময়িক বহু প্রথম শ্রেণীর ইংরাজী, বাংলা মাসিক, দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার প্রথম বয়সের হৃদয় শাখা ১ম ২য় ভাগ, মেঘদূতের সুললিত পদ্যানুবাদ একদা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার লিখিত বিবিধ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত অসংখ্য প্রবন্ধ আজও অমুদ্রিত রহিয়াছে।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন হুগলী জেলার বন্দীপুর গ্রামে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮২ হইতে ১৮৮৫ সাল পর্য্যন্ত তাহার স্কুল কলেজের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ দুই বৎসরে বড়, আচার্য্য স্যার ব্রজেন্দ্রলাল শীল ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মাত্র এক বৎসরের ছোট ছিলেন। ইহাদের সকলেরই আজীবন বন্ধুপ্রীতি ছিল।

আনুমানিক ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে সতীশ মুখোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুরে এক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদলাভ করিয়া মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সহিত পরিচিত হন; তখন মহারাজা তরুণ যুবক। এই সময় মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই পরিবেশের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ও ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে। ইহারা সকলেই তাঁহার গুরুভাই ছিলেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্রের দলের সহিত পরিচিত হন। মিত্র মহাশয় ভাগবৎ চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠাতা। এই প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত সাহিত্য, উপনিষদ, গীতা ও হিন্দু দর্শনের আলোচনা হইত। এখানেই পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থের সহিত তাহার আন্তরিক সখ্য স্থাপিত হয়। পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুদের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ প্রচারকল্পে মাসিক পত্রিকা "ডন" প্রকাশ করা হয়। এই বৎসরেই স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে রামকৃষ্ণদেবও ভারতের ধর্ম্মমত প্রচার করেন। স্বামীজীর প্রচারকার্য্যে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় অনুপ্রাণিত হইয়া সাংবাদিকতায় ও বিশ্ববাসীর নিকট ভারতের সংস্কৃতি প্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন। গত শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি বিচারক শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতবাজার পত্রিকার শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ ও শ্রীমতিলাল ঘোষের সহিত পরিচিত হন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে উপরোক্ত দুইটি দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় তীব্র সমালোচনা করেন। শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করিয়া শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় 'ডন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। সোসাইটির উদ্দেশ্য—প্রথমতঃ কলিকাতার কলেজের তরুণ ছাত্রদিগকে স্বদেশভক্তি, আত্মত্যাগ, সর্ব্বপ্রকার সমাজ-সেবা শিক্ষা দেওয়া এবং দ্বিতীয়তঃ কলেজ ছাত্রদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি

বিধানকল্পে বাঙ্গলা ভাষায় সাপ্তাহিক গীতা পাঠ ও আলোচনা। তখনকার মেট্রোপলিটান কলেজ অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজের একটি ঘরে "ডন সোসাইটির" সভা হইত। বরং ইহাকে সভা না বলিয়া পাঠচক্র বলা যাইতে পারে। 'নেশন' পত্রিকার সম্পাদক অধ্যক্ষ নগেন্দ্রনাথ সেনের উপর ছিল কলেজের পরিচালনার ভার।

'ডন সোসাইটির' সঙ্গে সঙ্গে মুখোপাধ্যায় মহাশয় উহার মুখপত্র 'ডন' পত্রিকা প্রকাশ করেন। পুরাতন মাসিক পত্রিকা 'ডনের'ই ইহা পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ; এই নূতন পত্রিকায় ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার সংবাদ ও সমালোচনা এবং তৎকালীন সাহিত্য ও ভাষার আলোচনা স্থান পাইল। ভারতের নানা তথ্য ও বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্রদের পত্র প্রকাশ করিয়া 'ডন সোসাইটির' সদস্যদিগকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত।

সোসাইটির উদ্যোগে কলিকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের তৈয়ারী ধুতি গেঞ্জী ও অন্যান্য জিনিষ বিক্রয়ের জন্য স্বদেশী ভাণ্ডার খোলা হইল। সোসাইটির সদস্যদিগকে তত্ত্বাবধান ও জিনিষপত্র বিক্রয় শিক্ষা দিতে আরম্ভ করা হইল। দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ভগিনী নিবেদিতা, দীনেশচন্দ্র সেন, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সহযোগিতা করিতেন। সতীশ মুখোপাধ্যায় সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবোধ সম্বন্ধে নিয়মিত বক্তৃতা দিতেন। সপ্তাহে দুইবার ক্লাস লওয়া হইত। চার বৎসর ধরিয়া সোসাইটির কাজ চলে। এই সময়ে কলিকাতার প্রায় ৫ শত তরুণ তাঁহার সংস্পর্শে আসে। বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, আসাম ও বিভক্ত বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক জেলা হইতেই তরুণেরা এখানে আসিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছে। এই সকল অঞ্চলের গত যুগের আইনব্যবসায়ী, চিকিৎসক, শিক্ষক প্রভৃতি স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে যে অসাধারণ ত্যাগ ও জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন

তাহার প্রথম পাঠ সমস্তই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতেই গ্রহণ করা হয়।

তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, শ্রীসন্তোষকুমার বসু, স্বর্গীয় প্রফুল্লকুমার সরকার ও স্বর্গীয় রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও 'ডন সোসাইটির' সহকর্ম্মিগণ স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ ও পরিচালনা করেন। বিদেশী পণ্য বর্জ্জন ও স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য লইয়া এই শক্তিশালী আন্দোলন গড়িয়া উঠে; সোসাইটির কর্ম্মীরা জেলায় জেলায় আন্দোলন ছড়াইয়া দিয়া নেতা হইয়া উঠিলেন।

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের সহকর্ম্মীরাই আবার জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রবর্ত্তক। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে জাতীয় শিক্ষা পরিষদে এই আন্দোলনের বাস্তবরূপ প্রকাশ পায়। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ যাদবপুরের ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজে পরিণত হইয়াছে। ন্যাশনাল কলেজের প্রথম সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় আর প্রথম অধ্যক্ষ শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। জাতীয় শিক্ষা পরিযদ প্রতিষ্ঠার পর 'ডন সোসাইটি' বিপুপ্ত হইল বটে, কিন্তু সোসাইটির মুখপত্র পূর্ব্বেকার ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে হইতে ১৯০৯ সাল পর্য্যন্ত সতীশ মুখোপাধ্যায় প্রথম ন্যাশনাল কলেজ ও বঙ্গীয় টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটের প্রথম ডিরেক্টরূর্সের কাজ করিয়াছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ হইতে ভারতের ইতিহাসে গান্ধীযুগের সূত্রপাত। ১৯১৯ হইতে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গান্ধীজীর সহিত শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের যুগে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কয়েকজন কর্ম্মী গান্ধীজীর একনিষ্ঠ ভক্ত হইয়া উঠেন। তিনিও রচনার মধ্য দিয়া গান্ধীজীর বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি অবসর জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করেন। গত ২৫ বৎসর ধরিয়া বাহিরের লোক তাহার কোন সংবাদ রাখে নাই। বাঙ্গালার বিপ্লবের তিনি ছিলেন অন্যতম স্রষ্টা এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল তারিখে কাশীধামে তিনি দেহত্যাগ করেন।

জেজুর হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর মহাকুমার একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। পূর্ব্বে এই গ্রামের নাম ছিল, 'কসবা' এবং জনশ্রুতি আছে

জেজুর

যে, ১০৫০ সালে গোবিরাম মিত্র এই গ্রামের 'জেজুর' নামকরণ করেন। কিংবদন্তী এইরূপ যে, পুরাকালে এই গ্রাম 'নাগর' নামক এক রাজার রাজধানী ছিল। বর্ত্তমানে যে-স্থানে জেজুরের শ্মশান অবস্থিত, তথায় রাজপ্রাসাদ ছিল বলিয়া প্রকাশ। ময়ূরভঞ্জের ভূতপূর্ব্ব প্রত্নতত্ত্ববিদ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্মশানের নিকটে একটি পাথরের মূর্ত্তি আবিষ্কার করেন। তাঁহার অভিমত এই যে, জেজুর পূর্ব্বে একটি নগর ছিল। শ্মশানটিকে গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ বর্ত্তমানে 'নাগর-গাছি' বলেন। জেজুর গ্রামের উত্তরে 'মোগলপুর' ও 'ময়নাপাতা' নামক দুইখানি গ্রাম, পশ্চিমে 'নৃসিংহ আডডি রোড' নামক ডিষ্ট্রিক্ট, বোর্ডের রাস্তা; দক্ষিণে 'নারায়ণপুর,' ও 'মান্নাপাড়া' এবং পূর্ব্বে 'বন্দীপুর' নামক গ্রাম। এই গ্রামের মধ্য দিয়া একটি নদী প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। 'নাগর-গাছি' নামক শ্মশানের উত্তরে 'রানীয়া' নামক একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। উহার চারিপাশে সুন্দর ফুলের বাগান এবং বহু বাঁধান ঘাট ছিল বলিয়া প্রকাশ। বর্ত্তমানে ঘাটগুলি নষ্ট হইয়া গেলেও, তাহাদের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। কিংবদন্তী এইরূপ যে, রাজার মহিষীগণ ঐ পুষ্করিণীতে স্নান করিতেন বলিয়া উহার নাম 'রাণীয়া' হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পুষ্করিণীটির পঙ্কোদ্ধার কালে উহা হইতে বহু বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং শিবমূর্ত্তি বাহির হয়। পূর্ব্বে

নগরটি শৈব প্রধান ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রবাদ এইরূপ যে, কালাপাহাড় আসিয়া যুদ্ধে 'নাগর' রাজাকে পরাস্ত করিয়া শেষে তাঁহার রাজধানীর সমুদয় দেব-দেবীর মূর্ত্তি 'রাণীয়া' পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দেন। বর্ত্তমানে এই গ্রামের মধ্যে একটী ভীষণ মাঠ দেখা যায়; উহাকে



কবি রাধামাধব মিত্র

গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ 'গড়ের মাঠ' বলেন। প্রবাদ এইরূপ যে, রাজার এই-স্থানে 'গড়' ছিল। 'নাগর' রাজার পূর্ব্ব সমৃদ্ধির বহু পরিচয় সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণাদি পাওয়া যায় না।

জেজুরের পার্শ্বস্থিত গ্রাম সমূহের নামকরণ 'নাগর' রাজার সূত্র হইতে হইয়াছে বলিয়া গ্রামবাসিগণের বিশ্বাস। যেমন, বন্দীগণকে যে স্থানে রাখা হইত, তাহার নাম 'বন্দীপুর', রাজার ধনদৌলত যেখানে থাকিত, তাহার নাম ভাণ্ডারহাটী প্রভৃতি। এ-সমস্ত কথার সত্যতা নিশ্চয় করিয়া বলা একপ্রকার-অসম্ভব, তবে বহু পুরাকাল হইতে এই সমস্ত লোকমুখে চলিয়া আসিতেছে। 'নাগর' রাজার বহুপরে, কুচপালের নবাব বংশের এক নবাবও এখানে থাকিতেন বলিয়া শুনা যায়। তাঁহাকে সকলে মোগল-শা বলিত। কিংবদন্তী এইরূপ যে, তাঁহার নাম হইতে জেজুরের পার্শ্বে 'মোগলপুর' গ্রামের সৃষ্টি হইয়াছে।

জেজুরের ঘোষ, বসু এবং মিত্রবংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ; ঘোষ বংশে গোপাল ঘোষ ও বগল ঘোষ হিন্দু ধর্ম্মোক্ত ক্রিয়া কলাপাদি করিয়া খুব সুনাম অর্জ্জন করেন। মিত্র বংশে বিশ্বম্ভর মিত্রও অনুরূপ কার্য্য করিয়া যশস্বী হন। এই বংশে জয়রাম মিত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নামানুসারে কলিকাতায় "জয় মিত্র ষ্ট্রীট" বলিয়া একটি রাস্তা আছে। এতদ্ভিন্ন কবি রাধামাধব মিত্র * এবং আশুতোষ মিত্র এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বিপ্লবী দেবব্রত বসু এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা প্রিয়ব্রত বসুও এই অঞ্চলে বিশেষ খ্যাত ছিলেন। ভারতীয়গণের মধ্যে মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম "ডক্টর" উপাধি প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত অচ্যুত কুমার মিত্র জেজুরে জন্মগ্রহণ করেন। মিত্র বংশে বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিস্তারিত বিবরণ "জেজুরের মিত্র বংশ" নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। এই গ্রামের ঘোষাল বংশও খুব প্রাচীন বংশ বলিয়া খ্যাত।

* রাধামাধবের কাব্য গ্রন্থমালা—শ্রীসুধীরকুমার মিত্র (বঙ্গশ্রী—১৩৫৩)

চণ্ডীতলা

চণ্ডীতলা হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্ভূক্ত একটি প্রাচীন স্থান; শ্রীমন্ত সওদাগর প্রতিদিন যে চণ্ডীদেবীর পূজা করিতেন, সেই দেবী অদ্যাপি এইস্থানে বিদ্যমান আছেন এবং ঐতিহাসিকগণ উক্ত চণ্ডীদেবী হইতেই এই স্থানের চণ্ডীতলা নামকরণ হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুদূর অতীত কাল হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সপ্তগ্রাম ভারতের প্রসিদ্ধ শহর ও ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের প্রধানতম বন্দর এবং সরস্বতী নদী তৎকালে সমুদ্র-যাত্রার একমাত্র পথ ছিল। সরস্বতী-তীরবর্ত্তী এই প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানটি বর্ত্তমানে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিলেও ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামগুলির অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ইউরোপীয় উপনিবেশকারিগণ ভাগীরথীতীরে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত শিয়াখালা, জনাই-বাক্‌সা, বেগমপুর এবং বড় তাজপুর, ফুরফুরা শরীফ, গুড়গুড়ি পোতা প্রভৃতি মুসলমান প্রধান স্থানগুলি ধনাঢ্য, সুসভ্য ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের লীলাভূমি ছিল। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব ৩য় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস ওয়াজিদ আলি বড় তাজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে হোসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন; সেই সময় শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশে এক নবযুগের প্রবর্ত্তন করেন। তিনি মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও হিন্দুদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার সাহায্যে সংস্কৃত-সাহিত্য ও দর্শনাদির নানারূপ গবেষণা হয়। তাঁহার উজীর গোপীনাথ বসু ওরফে পুরন্দর খাঁ এই স্থানের শিয়াখালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গোপীনাথ প্রথম জীবনে বঙ্গেশ্বরের অধীনে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন এবং নিজ বীরত্বে নবাবকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহার সেনাপতি হন। পরে পুরন্দর নামক স্থানে নবাবের হইয়া যুদ্ধ করিয়া জয়ী হন বলিয়া তিনি গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে "পুরন্দর খাঁ" উপাধি প্রাপ্ত হন।

এই সম্বন্ধে স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র তাঁহার "পুরন্দর খাঁ" নামক পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল :



আকুটরাম মিত্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাক্‌সা গ্রামে শ্রীশ্রীরঘুনাথ জীউর মন্দির

"পুরন্দর খাঁ হোসেন শাহের একজন প্রধান মন্ত্রী এবং রূপ ও সনাতন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। পুরন্দর দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ বংশোদ্ভব ও মাহীনগর সমাজের বসু বংশের সমুজ্জ্বল রত্ন। বর্ত্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত চণ্ডীতলা থানার অধীন কৌশিকী-নদী সনাথ শেয়াখালা গ্রাম পুরন্দরের জন্মস্থান। এক্ষণে কৌশিকীর অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র আছে।

যে নদীপথ দ্বারা কবিকঙ্কণ চণ্ডীর শ্রীমন্ত সওদাগর পোতে গমন করিয়া মগরায় মহাঝড় ও বৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন এবং অবশেষে সমুদ্রপথ দ্বারা সিংহলে গিয়াছিলেন, সে নদীর এক্ষণে চিহ্নমাত্র নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান ভাগীরথী, কালীঘাট উত্তীর্ণ হইয়া অনতিদূরে টালীর নালায় বিলুপ্ত হইয়াছে। সরস্বতী ও রূপনারায়ণের খাঁড়ী এক্ষণে ভাগীরথীর পরিদৃশ্যমান মুখ এবং তাহা ইংরাজ বাহাদুর কর্ত্তৃক হুগলী নামে অভিহিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা ভাগীরথীর মুখ নহে। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে খিদিরপুর হইতে সাঁখরাল পর্য্যন্ত নদীর চিহ্নমাত্র ছিল না। ভাগীরথীর সহিত সরস্বতীর যোগ প্রথমতঃ একটি খাল কাটিয়া সম্পাদিত হয়। জলপ্রবাহে 'কাটিগঙ্গা' এক্ষণে হুগলীর একাংশ।"

পুরন্দর অত্যন্ত মেধাবী, দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দুই ভ্রাতা গোবিন্দ বসু ও প্রাণবল্লভ বসু, উভয়েই নবাবের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন এবং নবাব তাঁহাদিগকে "গন্ধর্ব্ব খাঁ" এবং "নবাব খাঁ" উপাধি দেন। সংস্কৃত ও পারস্য ভাষার তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বঙ্গভাষায় বহু রচনা অদ্যাপি তাঁহার সাহিত্যানুরাগের পরিচয় দিতেছে। নবাব হোসেন শাহ তাহার রচনায় মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে 'যশরাজ খান' উপাধি দেন বলিয়া, নগেন্দ্রনাথ বসু 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। পুরন্দরের জ্ঞাতি ভ্রাতা মালাধর বসু ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" নামক অমূল্য কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করায় নবাবের নিকট হইতে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি প্রাপ্ত হন। মালাধর বসুর পৌত্র রায় রামানন্দের

নাম বৈষ্ণব-জগতে সুপরিচিত। ইনি দ্বারকা নগরী হইতে নীলাচল পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর সহিত পর্য্যটন করেন এবং মহাপ্রভু ইহাকে 'মিত্র' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। রায় রামানন্দ উড়িষ্যার প্রতাপরুদ্রের একজন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ছিলেন এবং 'জগন্নাথ-বল্লভ' নামক নাটক রচনা করেন।

পুরন্দর খাঁ "শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল" নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন, নিম্নে উক্ত পুস্তক হইতে দুই লাইন উদ্ধৃত হইল; এই ভনিতা হইতে তিনি যে "যশরাজ খান" উপাধি পাইয়াছিলেন, তাহাও দৃষ্ট হয়:

"শ্রীযুত হুসেন জগতভূষণ সোহ এ রসজান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর ভনে যশরাজ খান॥"

পুরন্দরের অন্যতম জ্ঞাতি পরমানন্দ বসু, চন্দ্রদ্বীপের রাজা হইয়া নিজ বাহুবলে সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গের অধিপতি হইয়াছিলেন। "বসুবংশ ছত্রধারী, চন্দ্রদ্বীপের অধিকারী" এই প্রবাদবাক্য আজও সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 'মধ্যযুগে বাঙ্গলা' শীর্ষক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি:

"হোসেন শার পূর্ব্বে গৌড়ের রাজ সরকারে উচ্চতর বিস্তর রাজকার্য্যে হিন্দুর নিয়োগের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। খ্যাতনামা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ গোপীনাথ বসু হোসেন সার উজীর ছিলেন। ইনি পুরন্দর খাঁ উপাধি লাভ করেন। বর্ত্তমান হুগলী জেলার শেয়াখালা গ্রাম পুরন্দর খাঁর জন্মস্থান। অদ্যাপি তথায় পুরন্দরনগর বিদ্যমান আছে। পুরন্দর খাঁর পিতামহও গৌড় সরকারে চাকুরী করিয়া সুবুদ্ধি খাঁ উপাধি পাইয়াছিলেন। পুরন্দর খাঁ দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের সংস্কার সাধন করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।"

গৌড়েশ্বর হোসেন শাহ বাল্যকালে পুরন্দরের পিতামহ সুবুদ্ধি খাঁর অধীনে চাকুরী করিতেন এবং সুবুদ্ধি খাঁর চেষ্টায় হুসেন রাজ সরকারে

নিযুক্ত হন। উত্তরকালে, স্বীয় সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি-প্রভাবে তিনি বঙ্গের রাজ সিংহাসন পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হন। এই সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, তাঁহার **History of India** নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

"Hussen had been in early life the servant of a Kayastha officer of the state named Subudhi Khan. He entertained great respect for the Hindoos, two of whom Rup and Sanatan had high offices under him." *

শিয়াখালায় 'পুরন্দর-গড়' ব্যতীত পুরন্দরের স্মৃতিচিহ্ন কিছু না থাকিলেও, বহু প্রাচীন মন্দির শিয়াখালার পূর্ব্ব-গৌরব আজও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। শিয়াখালার উত্তর বাহিনী দেবীর মন্দির হুগলী জেলায় বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। স্থানীয় চৌধুরী-বংশ এই বিগ্রহের সেবায়েত; বর্ত্তমান প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর মূর্ত্তিটি ডাঃ যামিনীকান্ত বলের চেষ্টায় নির্ম্মিত হয়। উত্তর-বাহিনী জাগ্রতা দেবী এবং দেশদেশান্তর হইতে বহু নরনারী উঁহার পূজা দিবার জন্য এইস্থানে সমবেত হন। প্রাচীন মন্দির ভগ্ন হইয়া যাইলে, স্থানীয় জনসাধারণের চেষ্টায় বর্ত্তমান গৃহটী নির্ম্মিত হইয়াছে। দেবীর প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি এই অঞ্চলের একটি বিশেষ দর্শনীয় বস্তু।

শিয়াখলার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম মশাটও এক সময় সমৃদ্ধ জনপদ ছিল এবং এইস্থানের মিত্রবংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। এইস্থানের স্বর্গীয় কৃষ্ণকমল মিত্র বিশ্বেশ্বরের মন্দির সংস্কারার্থে এবং একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে বহু অর্থ ব্যয় করেন। রমানাথপুরের স্বর্গীয় সত্যপ্রিয় পাল এবং তাহার ভ্রাতা কুমিরমোড়া ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ পাল, স্বর্গীয় আশুতোষ পাল এবং ননীলাল পালের স্মৃতি রক্ষার্থে কুমিরমোড়া

* হোসেন শাহ বাল্যকালে সুবুদ্ধি খাঁর চাকর ছিলেন, ইহা আমরা বিশ্বাসযোগ্য মনে করি না।

গ্রামে "আশুতোষ ননীলাল উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শিয়াখালা, গরলগাছা এবং জনাই গ্রামেও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় বহুদিন



শিয়াখালায় উত্তরবাহিনীর বিগ্রহ

যাবৎ আছে; তন্মধ্যে জনাই গ্রামের বিদ্যালয়টি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন— ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।

চণ্ডীতলার নিকট গরলগাছা গ্রামে হাইকোর্টের বিচারপতি এবং বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতি স্বর্গীয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ

করেন। ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেক্টার মিঃ এস, এন, ব্যানার্জ্জীও এইস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ পি, সি, কুমার তাঁহার স্বর্গত পিতৃদেব শ্যামাচরণ কুমারের স্মৃতিরক্ষার্থে চণ্ডীতলায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া একটি দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে উক্ত দাতব্য-চিকিৎসালয়ের স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় কর্ত্তৃক উদ্বোধন হয়। হুগলী জেলা-বোর্ড বর্ত্তমানে ইহার তত্ত্বাবধান করেন।

সরস্বতী তীরবর্ত্তী বুইতা গ্রামে বেহুলা লখীন্দরের ঘট-স্থাপিত চণ্ডীদেবী একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষমুলে এরূপভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, বৃক্ষের শিকড়গুলি ঘটটিকে আবৃত করিয়া যেন একটি গৃহমধ্যে রাখিয়া দিয়াছে। দেবীর সেবার জন্য বহু জমিজমা ছিল। পরবর্ত্তী কালে পৃথক্ ভাবে ব্রাহ্মণের উক্ত বৃক্ষমূলে উঠিয়া পূজা করিতে অসুবিধা হওয়ায় বর্ত্তমান গৃহে ঘটস্থাপিত চণ্ডীদেবীকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

চণ্ডীতলার নিকটবর্ত্তী জনাই এবং বাকৃসা গ্রাম বহু সম্ভ্রান্ত বংশ এবং অসংখ্য দেবালয়ে সুশোভিত; জনাই-বাকৃসার মধ্য দিয়া সরস্বতী মগরার নিকটবর্ত্তী ত্রিবেণী হইতে উদ্ভূত হইয়া রাজগঞ্জ অবধি অতি বৃহৎ ছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জনাই গ্রামের মুখোপাধ্যায় এবং বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ এবং বাকৃসা গ্রামের মিত্র, চৌধুরী ও সিংহ বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। সুপ্রসিদ্ধ মহাভারত অনুবাদক মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের আদি নিবাস বাকৃসা গ্রামে; পাটনার চীফ্ মিঃ মিডল্‌টন ও স্যার টমাস রামবোল্ডের দেওয়ান শান্তিরাম সিংহ এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা।

জনাই মুখোপাধ্যায়-বংশের কীর্ত্তি-কলাপ, এই অঞ্চলে বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ; এই বংশের ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে মুৎসুদ্দির কার্য্য করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং হিন্দু-ধর্ম্মোক্ত বিবিধ ক্রিয়াকলাপাদি দ্বারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার পুত্র

রামজয় ওরফে কালীবাবু চাতরায় একটি ঘাট এবং কাশীতে একটি মঠ এবং শিব স্থাপনা করেন। তাঁহার ভ্রাতা জগন্নাথ, চণ্ডীতলা হইতে



বড়-তাজপুরের বড় মসজিদ

জনাই পর্য্যন্ত এই চার মাইল রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া বেহুলা-লখীন্দরের চণ্ডীর দেউল দেখিবার পথ সুগম করিয়া দেন। কলিকাতায় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, এই পরিবারের পুর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জনাই গ্রামে

নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্বন্ধে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' (১৬ই জুন) পত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত হইল:

"২৯শে মে ১৮৫৮ সালে জনায়ের জমিদার বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে ও ব্যয়ে তাঁহার নিজ বাটীতে "শকুন্তলা" নাটক অভিনীত হয়। ১৮৫৭ সালে কলিকাতায় নূতন থিয়েটারগুলি দেখা দিবার পর বৎসরই তিনি জনাই গ্রামে তাঁর নিজ বাটীতে একটি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন।" *

এই বংশের রামরত্ন মুখোপাধ্যায় ১২৪৯ সালে পরলোকগমন করিলে 'সমাচার-দর্পণ' পত্রে (১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১২৪০) বিশেষ ভাবে শোক প্রকাশ করা হয়। উক্ত পত্রে লিখিত হয় যে, "তাঁহার রূপ, গুণ, দয়া-ধর্ম্মাদি স্মরণ হওয়াতে নয়ননীরে পত্র আর্দ্র হইতে লাগিল। শীলতা ও লোকলৌকিকতায় কি পর্য্যন্ত লোককে তিনি সন্তুষ্ট করিতেন; তাহা যাঁহার সহিত একবার আলাপ হইয়াছে, তিনিই জানেন।" সুপ্রসিদ্ধ পার্ব্বতী মুখোপাধ্যায় এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

জনায়ের গঙ্গোপাধ্যায় বংশের রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় হাজারিবাগ জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তাহার পৌত্র কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় **Reis & Rayet** পত্রের সহকারী সম্পাদক ছিলেন এবং বর্দ্ধমানের মহারাজা কর্ত্তৃক প্রকাশিত মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া 'সাহিত্যরথী' বলিয়া প্রসিদ্ধ হন ও ভারত সরকার হইতে অতিরিক্ত মাসিক পঞ্চাশ টাকা করিয়া বৃত্তি পান। ইহার পুত্র হরিচরণ শাস্ত্রী রিপণ কলেজের হিন্দু আইনের অধ্যাপনা করেন এবং রঘুবংশ ও ভট্টির কলেজ-সংস্করণ প্রকাশ করেন।

---

* জনায়ের নাট্যশালার বিষয়, ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লিখিত Indian Stage Vol, 1, নামক গ্রন্থে লিখিত আছে।

এই স্থানের 'মনোহরা' সন্দেশ বঙ্গবিখ্যাত, কলিকাতার প্রসিদ্ধ ভীমনাগের আদি নিবাস এই জনাই গ্রামে। কলিকাতায় ইংরাজ রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর, তাহার পিতা পরাণচন্দ্র নাগ কলিকাতায় বৌবাজার অঞ্চলে প্রথম ব্যবসা আরম্ভ করেন। ভীম নাগের পুত্র আশুতোষ মোদক-সমাজকে একত্রে সম্মিলিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন।

বাক্‌সা চৌধুরী পরিবারের স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ এ্যাডভোকেট এবং বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী সমাজের অন্যতম নেতা ছিলেন। পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তি-কলাপাদি রক্ষাকল্পে প্রতি বৎসর গ্রামে আসিয়া তিনি বস্ত্র বিতরণাদি করিতেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চৌধুরী, তাঁহার স্বর্গত পিতা শ্যামাপদ চৌধুরীর স্মৃতিরক্ষার্থে এই স্থানে "শ্যামাপদ দাতব্য চিকিৎসালয়" স্থাপন করিয়াছেন এবং তিনি ইহার তত্ত্বাবধান করেন।* বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং দোল-দুর্গোৎসবাদি প্রাচীন কালের ন্যায় অদ্যাপি এই বংশে সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

সিংহ পরিবারের পূর্ব্বপুরুষ দেওয়ান শান্তিরাম সিংহ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। জোড়াসাঁকোতে পরবর্ত্তী কালে তিনি বসবাস করেন এবং হিন্দুধর্ম্মোক্ত ক্রিয়াকলাপাদি পূর্ব্বের ন্যায় এই বংশেও অনুষ্ঠিত হয়। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ এই পরিবারে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ ভবনে বিদ্যোৎসাহিনী-সভার প্রতিষ্ঠা তাঁহার সাহিত্যানুরাগের পরিচায়ক। বঙ্গদেশে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার তিনি অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন এবং মালতীমাধব, বিক্রমোর্ব্বশী প্রভৃতি নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন। হুতোম পেঁচার নক্সা রচনা করিয়া বাঙ্গালী সমাজের দূষিত চিত্র দেখাইয়া তৎকালে সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। এতদ্ব্যতীত

* সম্প্রতি এই দাতব্য চিকিৎসালয়টি প্রবোধ বসু বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

পরিদর্শক ও হিন্দু পেট্রিয়ট নামক দুইখানি দৈনিক সংবাদপত্র পরিচালনা করেন। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বঙ্গের তৎকালীন পণ্ডিতবর্গের সাহায্যে তিনি মহাভারতের বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া বিনামূল্যে তাহা বিতরণ করেন। বঙ্গভাষার প্রতি তাঁহার বিশেষ দরদ ছিল এবং ইহার প্রসারকল্পে তিনি অজস্র অর্থব্যয় করেন।



বাক্‌সা গ্রামের 'দ্বাদশ শিবমন্দিরে'র প্রথম ছয়টি মন্দির

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরলোকগমন করিলে তিনি তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে কয়েক সহস্র মুদ্রা ব্যয় করেন এবং তাঁহার দুঃস্থ পরিবারবর্গের ভরণপোষনের ব্যবস্থা করেন। স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকা লিখিয়া দেওয়ায়, রেভারেণ্ড লং সাহেবের একমাস কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড হয়। কালীপ্রসন্ন উক্ত অর্থদণ্ড প্রদান করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করিলে তিনি নিজ বাটিতে

সভা আহ্বান করিয়া, অমর কবিকে এক অভিনন্দন ও রৌপ্যনির্ম্মিত পানপাত্র প্রদান করেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজ বাটীতে 'বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় বাবু, বেণী সংহার, ভানুমতী, বিক্রমোর্ব্বশী, রাজা পুরূরবা প্রভৃতি নাটকগুলি অভিনয় করান এবং স্বয়ং প্রধান ভূমিকায় লক্ষাধিক



বাকসা গ্রামের দ্বাদশ শিবমন্দিরের দ্বিতীয় ছয়টি মন্দির

টাকার বহুমূল্য পোষাক পরিয়া অবতীর্ণ হন। সংস্কৃত, বাঙ্গলা ও ইংরাজী ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বল্প জীবনকাল সাহিত্যসেবা ও জ্ঞানানুসন্ধানে অতিবাহিত করিয়া মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি লোকান্তরিত হন।

বাক্‌সা সিংহ পরিবারের স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র সিংহ এবং তাঁহার দুই পুত্র স্বর্গীয় গুরুদাস সিংহ এবং স্বর্গীয় রামচন্দ্র সিংহ দয়াদাক্ষিণ্যের জন্য এই অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠিত শীতলা দেবীর মন্দির অদ্যাপি এই স্থানে দৃষ্ট হয় এবং দোল-দুর্গোৎসবাদি

হিন্দুধর্ম্মোক্ত ক্রিয়াকলাপ দেওয়ান শান্তিরামের আমলে যে ভাবে হইত, অদ্যাপি সেইরূপ ভাবেই মহাসমারোহের সহিত এই স্থানে অনুষ্ঠিত হয়।

চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত এই সমস্ত প্রাচীন বংশগুলিতে বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি আছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান ম্যালেরিয়ার প্রকোপে অন্তঃকরণ বিষাদিত হইয়া উঠে। পুরাকালের দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে প্রতি বাড়ীতে অদ্যাপি দুর্গোৎসব হইয়া থাকে; বঙ্গের কোন থানায় এত অধিক দুর্গোৎসব হইতে দেখা যায় না। কিন্তু দুর্গোৎসব হইলে কি হইবে, সরস্বতী নদী মজিয়া যাওয়ায় পূর্ব্বের সে শ্রী যেন চিরদিনের মত নষ্ট হইয়া গিয়াছে; ভবিষ্যতে সরস্বতী কাটাইয়া জল নিকাশের সুব্যবস্থা না করিলে এই অঞ্চলের গৌরব-রবি যে পুনরায় উদিত হইবে না, তাহা সুনিশ্চিত।

জনাই গ্রামের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে বাকৃসা গ্রামের শ্রীশ্রীরঘুনাথ জীউর নবরত্নের সুবৃহৎ মন্দির বঙ্গের প্রাচীন মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম। বাকৃসার মিত্রবংশোদ্ভব দেওয়ান ভবানীচরণ মিত্র ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে দ্বাদশ শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রত্যেকটি মন্দির ষাট ফুট উচ্চ এবং প্রতি বৎসর এই স্থানে চৈত্র মাসের সংক্রান্তি দিবসে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রায় লক্ষাধিক লোক উহাতে যোগদান করেন। সরকারী গ্রন্থে দ্বাদশ মন্দির সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:

"The monument consists of twelve temples built all in a line on the bank of the Saraswati river. They are all of the same size and in height nearly sixty feet. Adjoining the temples there is a large tank with a magnificient masonary ghat with seats all round. They are all dedicated to Siva named Isanesvar. They were built by Bhabani Charan Mitra in 1187 B. S. corresponding to

A. D. 1780. In honour of the Siva an annual fair or mela is held on the ground adjoining those temples on the last date of the Bengal year which is resorted to numerously by the people of the neighbouring villages."

বাক্‌সার রঘুনাথজীউর রথের ন্যায় সুবৃহৎ নবরত্নের মন্দির স্থাপত্য-শিল্পের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এইরূপ মন্দির বঙ্গদেশে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ভ্রূকুটরাম মিত্র এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার দৈনিক সেবার জন্য তিনি তিনি জমি দান করিয়া যান। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব তাহার **Statistical Account of Bengal** নামক গ্রন্থে এই মন্দির সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে **List of Ancient Monuments in Bengal** নামক সরকারী গ্রন্থে রঘুনাথজীউর মন্দির সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহা উদ্ধৃত হইল :

Temple of Raghunath—This is a big temple with nine pinnacles of the present car fashion dedicated to the God Raghunathji. It was built by Bhurkut Ram Mitra in the Bengali year 1199, corresponding to A. D. 1792.

দেওয়ান ভবাণীচরণ মিত্র পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ শিবমন্দির ব্যতীত গ্রামের মধ্যে আরও ছয়টি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দুইটি করিয়া তিনটি বিভিন্ন স্থানে উক্ত মন্দিরগুলি বিদ্যমান আছে। চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত বহু গ্রামে প্রায় শতাধিক শিবের প্রাচীন মন্দির অদ্যাপি দৃষ্ট হয় ইহা হইতে এই অঞ্চলে বহু প্রাচীনকাল হইতে শৈব ধর্ম্মের যে প্রতিপত্তি ছিল, তাহা সুনিশ্চিত। মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা সুদূর অতীত কাল হইতে এই স্থানে প্রচলিত থাকিলেও, সেন রাজাগণের সময় হইতেই শৈব ধর্ম্মের এইস্থানে প্রাদুর্ভাব হয়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার চণ্ডীকাব্যে শিবপূজা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, পর পৃষ্ঠায় তাহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল :

"যেই জন চন্দনে করয়ে শিবপূজা।
কত জন্ম অবনীমণ্ডলে হয় রাজা॥
শিবের মন্দিরে যেবা করে শঙ্খধ্বনি।
অভিপ্রায় বুঝি তার শিব হয় ঋণী॥
চামর ঢুলায় যেবা হরি সন্নিধানে।
স্বর্গালোকে চলি যায় চড়িয়া বিমানে॥"

বাক্‌সা গ্রামে সরস্বতী নদীতীরস্থ শ্মশানের পাকাঘর স্বর্গীয় যদুনাথ মিত্রের পুত্র স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র মিত্র ১৩১৭ সালে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। শ্মশানের আচ্ছাদন-গৃহের গাত্রে প্রস্তরফলকে নিম্নোক্ত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে:

"পূজ্যপাদ পিতৃদেব ৺যদুনাথ মিত্রের পরলোকগত স্মৃতিতে এই আচ্ছাদন প্রতিষ্ঠা করিলাম। ইতি তাং ২২শে মাঘ, সন ১৩৪৭ সাল। সেবক—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মিত্র।" বাক্‌সা গ্রামের উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাটি স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত চৌধুরী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (W. C. Bonnerjee) বাগাণ্ডা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম গিরিশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এবং মাতার নাম সরস্বতী দেবী। ত্রিবেণীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বংশে তাঁহার মাতার জন্ম হয়। তিনি মাতৃকূল ও পিতৃকূল এই উভয় বংশের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়।

বাগাণ্ডা

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে একটি বৃত্তি সংগ্রহ করিয়া তিনি পিতার বিনানুমতিতে ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন এবং তথায় যাইয়া 'লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি' নামক একটি সমিতি স্থাপন করেন। ১৮৬৭

খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষের সহিত তিনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান, স্বদেশ সেবায় প্রবল উৎসাহ এবং সত্য ও স্বাধীনতার জন্য তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। পরে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে



উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশনে, তিনি পুনরায় সভাপতি হইয়াছিলেন এবং কিছুকাল তিনি কংগ্রেসের সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজ-

নীতিক জ্ঞানের গভীরতা ও স্বদেশপ্রেমের আন্তরিকতায় তিনি অনন্য-সাধারণ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না।

তিনি বিলাতে (ক্রয়ডন) বাটী নির্ম্মাণ করিয়া উহার "খিদিরপুর-হাউস" নাম দিয়াছিলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া প্রিভিকাউন্সিলের বিচারালয়ে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন এবং দাদাভাই নৌরজী ও মিঃ ডিগবি প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধুর সহায়তায় ভারত শাসন সংস্কার বিষয়ে ইংরাজগণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার জন্য তথায় একটি রাজনৈতিক সভার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বৌবাজারের মতিলাল বংশের নীলমণি মতিলালের কন্যা হেমাঙ্গিনী দেবীকে বিবাহ করেন এবং পতিব্রতা, উদারতা আতিথেয়তা প্রভৃতি নানা সদগুণের অধিকারিণী হইলেও, তিনি খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছিলেন, কিন্তু উমেশচন্দ্র তাঁহার পৈত্রিক হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই। বিলাতে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুলাই তাঁহার দেহান্ত হয়; কিন্তু তিনি তাঁহার শব দাহ করিবার নির্দ্দেশ দিয়া যান। তাঁহার শব দাহ করিয়া চিতাভস্ম ক্রয়ডনে প্রোথিত করা হয়। তাঁহার সমাধিস্তম্ভে এই কথা লিখিত আছে:

"Here iies Woomes Chandra Bonnerjee a Hindu Brahmin who on his way to native country fell a victim to Brights disease."

রঞ্জপুর

হুগলী জেলার রঞ্জপুর একটি ক্ষুদ্র গ্রাম হইলেও বহু পণ্ডিত লোকের বসবাসের জন্য এই স্থান পূর্ব্বে খুব প্রসিদ্ধ ছিল। পণ্ডিত শালগ্রাম ভট্টাচার্য্য একজন প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন এবং চতুষ্পার্শ্বস্থিত গ্রামসমূহের ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার পুত্র এবং পৌত্র কাশীনাথ সার্ব্বভৌম এবং রামকুমার বিদ্যারত্ন পিতা ও পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সুযশ অর্জ্জন করেন। রামকুমারের পুত্র পণ্ডিত ভূতনাথ ভট্টাচার্য্য প্রায় শত-

বৎসর পূর্ব্বে কালীঘাট অঞ্চলে বসবাস করেন এবং স্বীয় পাণ্ডিত্যের জন্য বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত হন। তাঁহার ছয় পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অনুকূল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য পাণ্ডিত্য, পরোপকার ও দানধ্যানাদির জন্য খ্যাত ছিলেন।

উত্তরপাড়া-কোন্নগর

বালি একটি প্রাচীন স্থান; বর্ত্তমানে ইহার কিয়দংশ হুগলী জেলা এবং কতকাংশ হাওড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হইলেও প্রাচীন কালে ইহা কোতরং বালি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বালির উত্তরদিকে অবস্থিত উত্তরপাড়া ও কোন্নগর নামক প্রসিদ্ধ স্থানদ্বয়ও বালির মধ্যে ছিল বলিয়া জানা যায়। প্রাচীন কুলগ্রন্থে এই সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে নিম্নে, তাহা উল্লিখিত হইল:

"কোতরঙ্গ-বালি আর কোট মৌড়েশ্বর।
ডাক পাল নবকুল ইহার ভিতর॥" *

ভোলানাথ চন্দ্র তাঁহার Travels of a Hindu নামক গ্রন্থে, এই স্থান অতি প্রাচীন এবং গোঁড়া ব্যক্তিগণের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল বলিয়া লিখিয়াছেন "It is a very old and orthodox place"? বর্ত্তমানে বালিখালের দক্ষিণ দিকের মাত্র তিন বর্গ মাইল স্থান প্রাচীন বালীর সাক্ষ্য দিতেছে এবং উত্তর দিকের উত্তরপাড়া ও কোন্নগর হুগলী জেলার মধ্যে থাকায়, এই স্থান বর্ত্তমানে ভিন্ন জেলা ও ভিন্ন মিউনিসিপালিটির মধ্যে অবস্থিত এবং বালি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। বালিতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের একটি প্রাচীন সমাজ ছিল এবং এই স্থানের পণ্ডিত পঞ্চানন আচার্য্য সম্পাদিত 'পঞ্জিকা' বঙ্গের পণ্ডিত সমাজে বিশেষ আদৃত ছিল। শ্রীচরণ বিদ্যানিধি বালির শেষ পঞ্জিকা কারক।

বালি

---

* গ্রহবিপ্রকুলবিচার।

বালিখাল গঙ্গা হইতে বাহির হইয়া সেওড়াফুলির খালে গিয়া মিশিয়াছে; প্রাচীনকালে এই খালের উপর কোন সেতু ছিল না। উত্তরপাড়ায় যাইতে হইলে খেয়া নৌকা করিয়া পার হইতে হইত এবং এই স্থানের ঘাটটি সদর-ঘাট বলিয়া খ্যাত ছিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন গুডউইনের তত্বাবধানে এই খালের উপর একটি ঝুলানপুল (Hanging bridge) নির্ম্মিত হয় এবং তৎকালে এই পুলটি একটি প্রধান দ্রষ্টব্য জিনিষ বলিয়া প্রখ্যাত ছিল। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত পুল ভাঙ্গিয়া বর্ত্তমান সুবৃহৎ পুলটি নির্ম্মিত হইয়াছে। সেওড়াফুলি রাজবংশের কোন ব্যক্তি তাঁহার জমিদারির সীমা নির্দ্দেশ কল্পে, এই খাল খনন করিয়াছিলেন। উত্তরপাড়ার প্রথিতযশা জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বালিখালের উপর পুল নির্ম্মাণের জন্য গভর্ণমেণ্টকে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। উত্তরপাড়ার জমিদার মুখোপাধ্যায় বংশের গৌরবে এই স্থান গৌরবান্বিত; উত্তরপাড়া কলেজ এবং উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী এই বংশের অন্যতম প্রধান কীর্ত্তি। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা' শীর্ষক একখানি পত্রিকা এই স্থান হইতে প্রকাশ করেন। 'উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা' সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "বাংলা সাময়িক পত্র (পৃষ্ঠা ২৩১-২৩২) নামক পুস্তকে লিখিত আছে।

কোন্নগর একটি প্রাচীন স্থান; পূর্ব্বে সামুদ্রিক জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য এই স্থান সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতেও কোন্নগরের ডকে জাহাজ নির্ম্মিত হইত দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার ক্রফোর্ড লিখিয়াছেন " Early in the 19th century there was a dock at Konnagar where ships were built" * উক্ত স্থানে এণ্ডারসন

* Hooghly Medical Gazetteer

রাইট এণ্ড কোম্পানীর হাড়িফুল অয়েল মিল ও পরে বাটা কোম্পানীর জুতার কারখানা হইয়াছিল ; বর্ত্তমানে ফুলচাঁদ ভকতের ক্যানাল অয়েল মিল স্থাপিত হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে মিঃ জি, ম্যাকনেয়ার (Mr. G. Macnair) নামক এক সাহেব এই স্থানে মদের কারখানা স্থাপন করেন।

কোন্নগর মিত্র-বংশীয় কায়স্থগণের একটি প্রসিদ্ধ সমাজ বলিয়া খ্যাত। রাজা দিগম্বর মিত্র, ডক্টর ত্রৈলক্যনাথ মিত্র প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্বে কোন্নগরে কোন রেলওয়ে ষ্টেশন বা পোষ্ট অফিস ছিল না ; স্থানীয় ব্যক্তিগণকে তিন মাইল হাঁটিয়া বালি ষ্টেশনে ট্রেণ ধরিতে হইত। কিন্তু সাধু শিবচন্দ্র দেব বহু চেষ্টা করিয়া এই স্থানে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কোন্নগর রেল ষ্টেশন এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পোষ্ট-অফিস স্থাপিত করাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহারই চেষ্টায় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১লা মে কোন্নগর ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ; ইহা তৎকালে কলিকাতার হেয়ার ও হিন্দু স্কুলের সমকক্ষ ছিল। কোন্নগর ব্রাহ্ম সমাজ তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। এতদ্ব্যতীত পাঠাগার ও বালিকা বিদ্যালয়ও তিনি স্থাপন করেন। কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের তিনি প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও পরে সভাপতি হন ; তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় কোন্নগরের যে উন্নতি হইয়াছে তাহা এই স্থানের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার "সুরধনী কাব্যে" কোন্নগর ও শিবচন্দ্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

"কায়স্থ নিবাস কোন্নগর বিশাল,
স্থিত যথা শিবচন্দ্র পুণ্যের প্রবাল,
শিশুপালনের পিতা, প্রশান্ত স্বভাব,
সুশিক্ষিতা ছয় মেয়ে ভারতীয় ভাব।"

১২১৮ সালের ৬ই শ্রাবণ শিবচন্দ্র কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পিতা ব্রজকিশোর তৎকালে কোন্নগরের একজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী ছিলেন এবং সৈন্য বিভাগে কার্য্য করিয়া মধ্যবিত্ত গৃহস্থরূপে দিনাতিপাত করেন। তাঁহার ন্যায় চরিত্রবান ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু তৎকালে খুব অল্পই ছিল। তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে শিবচন্দ্র সর্ব্বকনিষ্ঠ; গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষা আরম্ভ করেন, পরে কলিকাতায় আসিয়া হাটখোলায় রীড সাহেবের স্কুলে প্রবিষ্ট হন। অতঃপর তিনি হিন্দু কলেজে বিদ্যাভ্যাস করেন। হিন্দু কলেজে পঠদ্দশাতেই হুগলী জেলার অন্তর্গত গোপালনগর নিবাসী বৈদ্যনাথ ঘোষের কন্যা অম্বিকা দেবীর সহিত তাঁহার (বৈশাখ ১২৩৩) বিবাহ হয়।

বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর তিনি ত্রিকোণমিতিক জরীপের (Trigonometrical Survey) একজন গণনাকারী নিযুক্ত হন; পরে তিনি নিজ কর্ম্মকুশলতায় ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বালেশ্বরের ডেপুটি কালেক্টার পদে উন্নীত হন এবং বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়া ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি কোন্নগর হিতৈষিণী সভা স্থাপন করিয়া পথ সংস্কার, পুল নির্ম্মাণ, দরিদ্র ব্যক্তিগণকে সাহায্য দান প্রভৃতি বহু কল্যাণ-কার্য্য করেন। কোন্নগরের ব্রাহ্ম সমাজও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আরব্য উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ এবং শিশুপালন বিষয়ক কোন পুস্তক এই দেশে না থাকায় 'শিশুপালন' শীর্ষক একখানি সুন্দর গ্রন্থ দুই খণ্ডে রচনা করেন। 'অধ্যাত্ম বিজ্ঞান" নামক প্রেততত্ত্ব বিষয়ক পুস্তকও তিনি রচনা করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

রাজা দিগম্বর মিত্র এই স্থানে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন; ইহার পিতামহ রামচন্দ্র মিত্র কলিকাতার তৎকালীন সওদাগর টয়লার

কোম্পানীর খাজাঞ্চি ছিলেন এবং উক্ত কার্য্যে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। দিগম্বরের পিতার নাম শিবচন্দ্র মিত্র। তিনি হেয়ার সাহেবের স্কুলে ও পরে

রাজা দিগম্বর মিত্র

হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কলেজে শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি মুর্শিদাবাদ নিজামত স্কুলের শিক্ষকতা করেন এবং দুই বৎসর পর মুর্শিদাবাদের তহশীলদার ও আমীন নিযুক্ত হন; অতঃপর কাশীমবাজার রাজবংশের ম্যানেজার হইয়া তাঁহাদের জমিদারীর বহু উন্নতি করিয়া দেন বলিয়া রাজা কৃষ্ণনাথ নন্দী তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা দান করেন। উক্ত টাকা লইয়া তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মুর্শিদাবাদে রেশম ও নীলের ব্যবসা করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে জমিদারী ক্রয় করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন স্থাপিত হইলে, তিনি উহার সভ্য হন, পরে উক্ত এসোসিয়েসনের সম্পাদক এবং সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে যে ম্যালেরিয়া মহামারী রূপে দেখা দেয়, তাহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য সরকার হইতে এক কমিশন (Fever Commission) গঠিত হয় এবং তিনি উক্ত কমিশনের অন্যতম সভ্য হিসাবে রেলপথ কর্ত্তৃক মাঠের স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালী অবরুদ্ধ হওয়ায় ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে তাঁহার অভিমত প্রকাশিত হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে বহু অর্থ সাহায্য করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার 'সেরিফ' পদ প্রাপ্ত হন; তাহার পূর্ব্বে এই সম্মানসূচক পদ কোন ভারতবাসী প্রাপ্ত হন নাই। লর্ড লিটন মুদ্রাযন্ত্র আইন বিধিবদ্ধ করিলে, তিনি উহার প্রতিবাদকল্পে ভীষণ আন্দোলন করেন। তাঁহার বাড়িতে, তিনি একশত দরিদ্র ছাত্রকে ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন এবং বহু ছাত্র তাঁহার বাড়িতে থাকিয়া শিক্ষালাভ করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত

হন এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তদনির্ম্মিত ঝামাপুকুর রাজ-বাটীতে তিনি পরোলোকগমন করেন। তাঁহার পুত্র গিরিশচন্দ্র তাঁহার জীবদ্দশাতেই অকালে ঘোটক হইতে পড়িয়া দেহত্যাগ করেন; তাঁহার



শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

দুই পুত্র স্বর্গীয় কুমার মন্মথনাথ, এবং কুমার নরেন্দ্রনাথ বঙ্গদেশে দানধ্যানের জন্য প্রসিদ্ধ। মন্মথনাথও বহু অর্থ পিতামহের ন্যায় দান করেন। মন্মথনাথের পুত্র শরৎচন্দ্র বহু বর্ষ যাবৎ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন।

এই স্থানে আর একজন কৃতি ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন তাঁহার নাম ডক্টর ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২রা মে কোন্নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তাহার পিতার নাম জয়গোপাল মিত্র। বাল্যকাল হইতেই তিনি শ্রমশীল, অধ্যবসায়ী ও স্বাবলম্বী ছিলেন। তিনি এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন পরীক্ষা দেন এবং উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে ডি-এল উপাধি দান করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি হুগলীতে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন এবং এক বৎসরের মধ্যে হুগলীর শ্রেষ্ঠ উকীলরূপে পরিণত হন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে প্রাকৃটিস সুরু করিয়া খুব প্রসার প্রতিপত্তি করেন। পরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও ল-লেকচারার নিযুক্ত হন। শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটীর তিনি দশ বৎসর চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল তিনি পরলোকগমন করেন।

ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র

কোন্নগর আর একজন মহাপুরুষের আদি নিবাস বলিয়া খ্যাত। তিনি হইতেছেন শ্রীঅরবিন্দ। হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত রূপেন্দ্র কুমার মিত্রও এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

গঙ্গাতীরে কোন্নগরের দ্বাদশ শিব মন্দির একটি দর্শনীয় বস্তু; ইহা হাটখোলার দত্ত বংশীয় স্বর্গীয় হরসুন্দর দত্ত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। গঙ্গার ঘাটে চাঁদনীতে মন্দির নির্ম্মাতার নাম এবং তারিখ উৎকীর্ণ আছে।

ষোড়শ অধ্যায়

তীর্থস্থানের বিবরণ

তারকেশ্বর শৈব-তীর্থ বলিয়া বঙ্গদেশের একটি প্রসিদ্ধ পবিত্র পুণ্যস্থান; হুগলী জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত ২২° ৫৩' উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৮° ৪' পূর্ব্বে অবস্থিত। ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে (৭।৮) এই লিঙ্গের উল্লেখ থাকিলেও তারকেশ্বরের উৎপত্তি আধুনিক বলিয়া ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন। প্রাচীন পুরাণ বা তন্ত্রাদিতেও তারকেশ্বরের কোন বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না; রেনেলের ১৭৭৯—১৭৮১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বঙ্গদেশের মানচিত্রে তারকেশ্বরের অস্তিত্ব নাই। তবে ১৮৩০—১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা সরকার বঙ্গদেশের যে জরীপ করাইয়াছিলেন, তাহাতে 'তারেশ্বরী' নামক একটি স্থানের উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

তারকেশ্বর

ষোড়শ শতাব্দীতে তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তি দামুন্যা গ্রামে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন; তল্লিখিত চণ্ডীকাব্যে বঙ্গদেশের যাবতীয় তীর্থক্ষেত্রের উল্লেখ আছে, এমন কি দামুন্যায় চক্রাদিত্য শিবের বিষয় তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তারকেশ্বরের বিষয় উক্ত চণ্ডীতে কোন উল্লেখ নাই বলিয়া পণ্ডিতগণ কালীঘাটের নকুলেশ্বরের ন্যায় তারকেশ্বরের উৎপত্তি আধুনিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমাদের বিশ্বাস এই যে, ষোড়শ শতাব্দীতে তারকেশ্বর প্রকটিত না হইলেও উক্ত স্থানেই তিনি ছিলেন, কিন্তু স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল বলিয়া উহা সর্ব্বসাধারণের অগোচরে ছিল।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত জেলা

জৌনপুরের ডোভী পরগণার গোমতী তীরস্থ হরিহরপুর নামক স্থানে রাজা বিষ্ণুদাস নামে এক ক্ষত্রিয় ভূস্বামী ছিলেন। তিনি মুসলমানদের আধিপত্য অস্বীকার পূর্ব্বক প্রায় পাঁচশত অনুচর ও কান্যকুব্জ হইতে



যাত্রীদের বিশ্রামাগার : অদূরে ক্রশচিহ্নিত স্থানে মন্দির দেখা যাইতেছে

একশত ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপালের নিকট রামনগর নামক স্থানে আসিয়া বসবাস করেন। তাঁহার বিস্তর লোকজন

অস্ত্রশস্ত্র দেখিয়া স্থানীয় হরিপালের অধিবাসীবৃন্দ উহাদিগকে দস্যু মনে করিয়া বিশেষ ভয় পায় এবং তাহাদের বিরুদ্ধে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট অভিযোগ করে। নবাব সমক্ষে রাজা বিষ্ণুদাস যাবতীয় বৃত্তান্ত বলিয়া, তাঁহার কথা যে সত্য, তাহা প্রমাণার্থে তৎকালীন প্রথামত হস্ত-মধ্যে জলন্ত লৌহ শাবল ধারণ পূর্ব্বক অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ; নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বঙ্গদেশে বাসের অনুমতি প্রদান করেন এবং বর্ত্তমান তারকেশ্বরের চার ক্রোশ দূরে রামনগর নামক স্থানে বসবাসের জন্য প্রায় দেড় হাজার বিঘা জমি (তৎকালীন পাঁচশত বিঘা) প্রদান করেন।

এই সম্বন্ধে সরকারী গ্রন্থ **List of Ancient Monuments in Bengal** নামক গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

"The supremacy of the Mahomedans, who invaded having deprived his residence of safety and comfort the Raja came away and took up his abodc in a jungle two miles from Tarakeswar, the side of village Ramnagar or Balagar in Thana Haripal. 500 peoples of his own caste and 100 Brahmins of Kanuj came and settled with him but the inhabitants of the neighbourhood who suspected them of being robbers informed the Nawab of Bengal at Murshidabad of the arrival of persons in the ocality ; they were sent for and the Raja presented himself before the Nawab and declared that they were perfectly harmless people who wanted only some land to settle. The tradition says that as a proof of his innocence, Vishnu Das held in his hands a red hot iron bar without being injured in the least. His success in thus passing through the ordeal of fire not only led to his acquital but also procured for him from the Nawab a grant of 500 bighas of land in Bahirgora."

রাজা বিষ্ণুদাসের দেশত্যাগের কারণ সম্বন্ধে সরকারী গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। রাজা বিষ্ণুদাসের স্বদেশে (নবাব সাদৎ আলির) মুসলমানদের আধিপত্য অস্বীকার করিয়া বঙ্গদেশে নবাব মুর্শিদকলী খাঁর অধীনে বাস করিবার কারণ কি ? এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মনোমোহন সিংহ-রায় মহাশয়ের অভিমত যে, কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহের সহিত সঙ্ঘর্ষের জন্যই রাজা বিষ্ণুদাস দেশত্যাগ করেন। আমরাও তাঁহার অভিমত গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি। তিনি এই সম্বন্ধে স্বর্গীয় দেওয়ান হরিনাথ রায়ের সহিত অনুসন্ধান করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার মর্ম্মার্থ সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল :

অযোধ্যার নবাব সাদৎ আলি বেনারস প্রভৃতি পিরানব্বইটি পরগণা তাঁহার বন্ধু মীর রোস্তম আলীকে বন্দোবস্ত করিয়া উক্ত প্রদেশের শাসনভার তাহার উপর অর্পণ করেন। রোস্তম আলী অলস ও রাজ-কার্য্যে অপটু ছিলেন বলিয়া, নবাব তাহাকে অপসৃত করিয়া ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাপুরের জমিদার মনসারাম সিংহকে তৎপদে নিযুক্ত করেন। * তিনি *বিচক্ষণ ও দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন এবং তাহার পুত্র বলবন্ত সিংহের জন্য* তিনি দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের নিকট হইতে 'রাজা' উপাধি অনুমোদিত করাইয়া লইয়া অযোধ্যার নবাবের অধীনতা অস্বীকার পূর্ব্বক স্বাধীন হইলেন এবং তাহার রাজ্য সুরক্ষিত করিবার জন্য কাশীর মধ্যে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। অতঃপর রাজা বলবন্ত সিংহ স্থানীয় সর্দ্দারগণকে স্ববশে আনিবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই উপলক্ষে ডোভী পরগণার অন্তর্গত হরিহরপুরের রাজা বিষ্ণুদাসের সহিত তাহার সঙ্ঘর্ষ হয় এবং কথিত আছে যে, হিয়াতী সিংহ নামক জনৈক ব্যক্তি ফৈজাবাদের পথে মনসারামকে নিহত করেন এবং তাহার ছিন্নমুণ্ড রাজা

* এই সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ মল্লিখিত তীর্থ-সপ্তক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে।

বলবন্ত সিংহের নিকট উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া দেন। ইহার পর ঘোরতর যুদ্ধ হয়, কিন্তু ডোভীর রঘুবংশীয়দের পরাজিত করিতে না পারিয়া তিনি পানীয় জলের কূপমধ্যে বিষ দিয়া তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে বিরক্ত হইয়া রাজা বিষ্ণুদাস দেশত্যাগ করেন এবং হরিপালের নিকটবর্ত্তী রামনগরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ডোভী রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে হরিহরপুর গ্রাম মাত্র দুই মাইল দূরে অবস্থিত এবং অদ্যাপি হরিহরপুরে 'সতীকূপ' রহিয়াছে ; রাজা বিষ্ণুদাসের জ্ঞাতিগণ বিবাহকালে উক্ত কূপের তটে ভোজন করিয়া অতীতে যাহারা বিষমিশ্রিত জল পান করিয়া দেহত্যাগ করে, তাহাদের স্মৃতি স্মরণ করে এবং বর্ত্তমানে এইরূপ ভোজন তাহাদের বিবাহের কুলাচাররূপে পরিগণিত হইয়াছে।

যাহা হউক রাজা বিষ্ণুদাস রামনগরে বাস করিতে লাগিলেন, তাঁহার ভারমল্ল নামে এক সংসার ত্যাগী ভ্রাতা ছিলেন ; তিনি জঙ্গলে যোগ সাধনা করিতেন। রাজার গুড়ে-ভাটা গ্রামের মুকুন্দরাম ঘোষ নামক একজন গো-রক্ষক ছিল এবং রাজবাটীর যাবতীয় গাভীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহার উপর ন্যস্ত ছিল। কিংবদন্তী এইরূপ যে, কয়েকটি গাভী গভীর অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি শিলাস্তম্ভের উপর তাহাদের বাঁট হইতে দুগ্ধ শূন্য করিয়া ফিরিয়া আসিত। মুকুন্দরাম গাভীদিগের শিলাখণ্ডের উপর দুগ্ধ দেওয়ার বিষয় রাজার ভ্রাতা ভারামল্লকে জ্ঞাপন করিলে, তিনিও উক্ত স্থানে যাইয়া গাভীদিগের পশ্চাদনুসরণ করিয়া দেখিতে পান যে, এক শিলার মস্তকে গাভীগণ বাঁটের দুধ ঢালিয়া দিতেছে। এই সম্বন্ধে সরকারী গ্রন্থে এবং তারকনাথ মাহাত্ম্যে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

"It is said that while temporarily residing in the woods of Tarakeswar, then known by the name of Jote

Savaram, he observed that several kine entered deep into the jungle with udders full of milk but returned with empty ones. Anxious to discover the same, one day followed a kine and saw it discharging its milk at a stone having a hole on the surface."

একদা কপিলা যায় চরিবারে বন ।
তার পিছে পিছে করে মুকুন্দ গমন ॥
কপিলা ক্রমেতে যায় বনের ভিতর ।
ধীরে ধীরে উপনীত যেখানে পাথর ॥
আড়ালে মুকুন্দ থাকি করে দরশন ।
পাথরের কাছে করে কপিলা গমন ॥
বাঁট হৈতে দুগ্ধ ধারা পাথর উপরে ।
কপিলা ফেলিছে তাহা অনগলি ধারে ॥
বুঝিল মুকুন্দ ইহা, পাথর ত নয় ।
নিশ্চয় অনাদি লিঙ্গ শিব দয়াময় ॥

ভারামল্ল রাজা বিষ্ণুদাসকে উক্ত শিলার সম্বন্ধে বলিলে তিনি রামনগরে উহাকে তুলিয়া আনিবার বন্দোবস্ত করেন এবং একদিন পঞ্চাশ হাত খনন করিয়া উহার মূল প্রাপ্ত না হওয়ায় খননকার্য্য পরদিনের জন্য স্থগিত থাকে। সেই রাত্রে রাজা বিষ্ণুদাস স্বপ্নে দেখিলেন যে, তারকনাথ যেন তাহাকে বলিতেছেন যে, আমি তারকেশ্বর শিব, কেহ আমাকে তুলিতে পারিবে না; কারণ গয়া গঙ্গা কাশী পর্য্যন্ত আমার প্রসার আছে। তুমি আমায় তুলিবার চেষ্টা করিও না, বরং এই স্থানেই আমার মন্দির তারকেশ্বরের মন্দির বলিয়া নির্ম্মাণ করিয়া দাও। অতঃপর উভয় ভ্রাতা তারকেশ্বরে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন, পরবর্ত্তীকালে মন্দির ভগ্ন হইলে বর্দ্ধমানের মহারাজা মন্দিরটি পুনঃনির্ম্মাণ করিয়া দেন।

এই সম্বন্ধে সহদেব গোস্বামী ‘ধর্ম্মমঙ্গল’ কাব্যে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল :

তারকেশ্বর শিব আমি কাননে বসতি।
অবনী ভেদিয়া বাছা আমার উৎপত্তি ॥
অকারণ দুঃখ পায়া মোরে কেন খোঁড়।
গয়া গঙ্গা বারাণসী আদি মোর জড় ॥

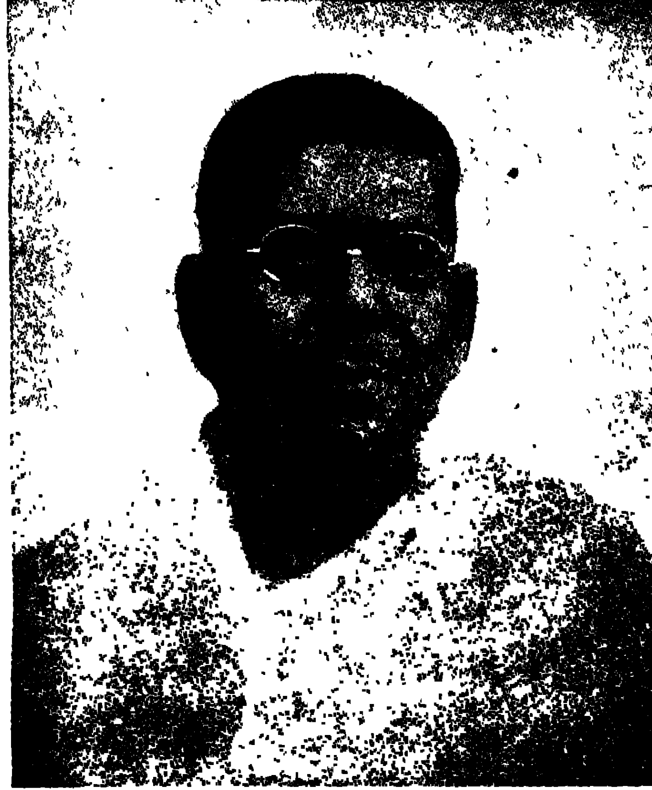
ভারামল্ল দেবতার সেবার জন্য এক হাজার তেইশ বিঘা জমি অর্পণ করেন এবং মুকুন্দরাম ঘোষের উপর যাবতীয় সেবার ভার অর্পিত হয়। মুকুন্দরাম তারকেশ্বরের প্রথম মোহান্ত; অনেকে ভারামল্লকে প্রথম মোহান্ত বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহা ভ্রমাত্মক। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যের মধ্যে যোগ সাধনা করিতেন বলিয়া মুকুন্দের উপর দেব সেবা এবং মন্দির পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়। মুকুন্দরাম ইহার অল্পদিন পরেই দেহত্যাগ করেন এবং তাঁহার ভৌতিক দেহ মন্দিরের পূর্ব্বদিকে সমাহিত করা হয়। ভারামল্লের জীবদ্দশাতেই মুকুন্দ গতাসু হন এবং নূতন মোহান্ত তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে নিযুক্ত হন। ভারামল্ল প্রথম মোহান্ত হইলে, মুকুন্দের দেহরক্ষার পর তিনিই মোহান্ত থাকিতেন; নূতন মোহান্তের তখন আর কোন প্রয়োজন হইত না।

Vishnu Das had a brother who having given up all worldly things, wandered about as a beggar near Vishnu Das's Palace. *

তারকেশ্বরের আবির্ভাব সংবাদ সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচারিত হইল এবং বঙ্গের নানা স্থান হইতে যাত্রিগণ জোত-সভারাম নামক স্থানে সমাগত হইতে লাগিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই এই স্থান তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল। তারকেশ্বর জাগ্রত দেবতা বলিয়া খ্যাত এবং শত সহস্র নরনারী

* Hunter's Statistical Account of the Hooghly District.

এই স্থানে 'হত্যা' দিয়া দুঃসাধ্য ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। অদ্যাপি বঙ্গবাসী ইহার নামে ভীত হইয়া থাকেন।



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

প্রাচীনকালে যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা ছিল এবং যাত্রিগণকে বৈদ্যবাটী হইতে হাঁটিয়া যাইতে হইত বলিয়া বৈদ্যবাটীতে একটি বাংলো নির্ম্মিত হয় এবং ইহাই বঙ্গের অন্যতম প্রাচীনতম বাংলো। * কলিকাতা হইতে তারকেশ্বরের দূরত্ব মাত্র ছত্রিশ মাইল; এই পথ হাঁটিয়া যাইবার সময় বহু যাত্রী পূর্ব্বে দুর্দ্দান্ত দস্যুদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইত। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে শেওড়াফুলি হইতে তারকেশ্বর পর্য্যন্ত নূতন রেলপথ স্বর্গীয় নীলকমল মিত্রের চেষ্টায় নির্ম্মিত হওয়ায় যাত্রিগণের দুঃখের লাঘব হইয়াছে।

---

* Rural Annals of Bengal

তারকেশ্বরের দুঃসাধ্য রোগীর আরোগ্যলাভ সম্বন্ধে সরকারী গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইল :

As time went on this temple fell into decay and over it the present one was built at the expense of the Burdwan Raja. People of all classes excepting the Mahomedans have from the very earliest days of the temple resorted to it for the cure of their diseases and lay prostrate before the devine image with a view to die of starvation at his feet if no remedy is suggested to them.

তারকেশ্বরের মন্দিরের পার্শ্বে পুষ্করিণীতে যে যাহা মনে করিয়া স্নান করিবে, তাহার সেই মনস্কামনা সিদ্ধ হয় বলিয়া খ্যাত। মুকুন্দ ঘোষের পর জগন্নাথ গিরি তারকেশ্বরের মোহান্ত পদে বৃত হন; তিনি চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ তীর্থে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে শুনিতে পাইলেন যে, রামনগরে অনাদি লিঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছে। চন্দ্রনাথও শৈবতীর্থ, তথায় যাইবার পূর্ব্বে তিনি এই লিঙ্গের পূজা সমাপন করিয়া যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া তাহাকে যাইতে নিষেধ করেন এবং বৈশাখী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তাহাকে তারকেশ্বরে থাকিতে অনুরোধ করেন। বৃদ্ধের কথামত তিনি এই স্থানে থাকিয়া যান এবং বৈশাখী পূর্ণিমায় মুকুন্দরাম দেহরক্ষা করেন। অতঃপর ভারামল্লের নির্দ্দেশানুযায়ী তিনি দেব-সেবক নিযুক্ত হন। তিনিই তারকেশ্বরে মোহান্তদের পদ্ধতিতে সর্ব্বপ্রথম পূজার প্রবর্ত্তন করেন।

হুগলী জেলার শেয়াখালার অন্তর্গত পাতুল-সন্ধিপুর নিবাসী গোবর্দ্ধন রক্ষিত বর্ত্তমান তারকেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মন্দিরটি ছোট ছিল বলিয়া যাত্রিগণের বিশেষ অসুবিধা হইত; গোবর্দ্ধন রক্ষিত ছোট মন্দিরের উপর বর্ত্তমান বৃহৎ

মন্দিরটি নির্ম্মাণ করেন। মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলে দুইটি মন্দিরই দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে বালিগড়ের মহারাজা চিন্তামণি দে, দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইয়া মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাধর সেন 'সিদ্ধপুকুরের' ঘাট বাঁধাইয়া দেন এবং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত চিন্তামণি দে, তারকেশ্বরের বাজার এবং রাস্তাঘাট পাথর দিয়া বাঁধাইয়া দেন। বর্ত্তমানে মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ও যাত্রীদের সুবিধার জন্য কয়েকটি যাত্রি-নিবাস তারকেশ্বরে নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

রাজা ভারামল্ল রায় প্রদত্ত তারকেশ্বরের সেবার জন্য ছাড়পত্রটি তারকেশ্বরের মোহান্তের প্রসিদ্ধ মামলার পেপার-বুক হইতে শ্রীজহরলাল বসু, তাঁহার "বাঙলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে" প্রথম বাঙলা গদ্যের নমুনা হিসাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন, নিম্নে উক্ত ছাড়পত্রটি হুবহু উদ্ধৃত হইল :

"শ্রীশ্রীরাম"

স্বস্তি সকল মঙ্গলময় শ্রীশ্রী৺তারকেশ্বর ঠাকুর চরণ যুগলেষু—

দেবদত্ত জমি পত্রহ মিদং কার্য্যনঞ্চাগে পরগণে বালিগড়ি ও সেনাবাগ দীঃ গ্রাম জোৎশমস, ভঞ্জপুর, জমি শালিশুনা হর্দ্দা মহত্বদ দৌড় জাত জোত করিতে পার তাহা জোত করিবে—সেবাৎ শ্রীযুত মায়াগিরি ধুম্রপান মোহন্তীকে নিযুক্ত থাকিয়া জুতিয়া যোতায়া শ্রীশ্রীসেবা করহ এ সকল জমির রাজস্ব সহিত দায় নাস্তি। ইতি সন ৭৮৫ সাল, ১০ই চৈত্র।

(স্বাক্ষর) শ্রীরাজা ভারামল্ল রায়"

(নাগরীতে)

তারকেশ্বরের মোহান্তগণ দশনামা সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীরূপে দেবসেবা করিবেন ইহাই ভারামল্ল নির্দ্দেশ দিয়া যান। তাহারা বিবাহ করিয়া সংসার করিতে পারিবেন না এবং মোহান্ত গতায়ু হইলে, তাহার প্রধান

শিষ্য মোহান্তপদে অভিষিক্ত হইবেন, ইহাই চিরাচরিত প্রথা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বহু মোহান্ত সন্ন্যাসধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া স্ত্রী সংসর্গের দ্বারা কদাচারে নিযুক্ত হইয়া উক্ত পদের অমর্য্যাদা করেন। ধর্ম্মের আবরণে মোহান্তগণ যে অধর্ম্মের খেলা খেলিতেন, দরিদ্র প্রজাগণ সে অনাচারের প্রতিকারের চেষ্টা করিতে কোন দিন সাহসী হয় নাই। ১৩৩১ সালে স্বামী বিশ্বানন্দ নামক এক সন্ন্যাসী সর্ব্বপ্রথম এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া প্রহৃত হন, কিন্তু তিনি তাহাতে ভীত না হইয়া স্বামী সচ্চিদানন্দের সহযোগিতায় দ্বিগুণ উৎসাহে ইহা লইয়া আন্দোলন করেন। অতঃপর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় তারকেশ্বরের যাবতীয় ব্যাপার নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সহযোগে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন; ফলে তারকেশ্বরের সম্পত্তি সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি বলিয়া আদালত হইতে সিদ্ধান্ত হয় এবং মোহান্তের 'গদি' তাহাদের শিষ্যগণ প্রাপ্ত হইবেন, এই প্রথার বিলোপসাধন হয়।

পূর্ব্ব প্রথানুযায়ী এযাবৎ চতুর্দ্দশ জন ব্যক্তি তারকেশ্বরের মোহান্ত হইয়াছিলেন; নিম্নে তাহাদের নাম লিখিত হইল:

(১) মুকুন্দরাম ঘোষ, (২) জগন্নাথ গিরি, (৩) কমললোচন গিরি, (৪) শম্ভুচন্দ্র গিরি, (৫) গোপালচন্দ্র গিরি, (৬) রাধাকান্ত গিরি, (৭) গঙ্গাধর গিরি, (৮) প্রসাদচন্দ্র গিরি, (৯) পরশুরাম গিরি, (১০) শ্রীমন্ত গিরি, (১১) রঘুচন্দ্র গিরি, (১২) মাধবচন্দ্র গিরি, (১৩) সতীশচন্দ্র গিরি, (১৪) প্রভাতচন্দ্র গিরি।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তারকেশ্বরের মোহান্ত শ্রীমন্ত গিরির ফাঁসি হয়; এই সম্বন্ধে 'সমাচার দর্পণ' পত্রে যে দুইটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, পর পৃষ্ঠায় তাহা উদ্ধৃত হইল:

"তারকেশ্বরের মোহান্তের পুণ্য প্রকাশ—শুনা গেল যে তারকেশ্বর নিবাসী শ্রীমন্ত গিরি সন্ন্যাসী স্বীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম সংস্থাপনার্থ এক বেশ্যা রাখিয়াছিলেন, তাহাতে জগন্নাথপুর নিবাসী রামসুন্দর নামক এক ব্যক্তি গোপের ব্রাহ্মণ ঐ বেশ্যার সহিত কি প্রকারে প্রসক্তি করিয়া ছদ্মভাবে গমনাগমন করিত। পরে সন্ন্যাসী জানিতে পারিয়া ২ চৈত্র [১২৩০] শনিবার রাত্রিযোগে সন্ধানপূর্ব্বক হঠাৎ যাইয়া বেশ্যাকে কহিল যে একটু পানীয় জল আন আমার বড় পিপাসা হইয়াছে, তাহাতে বেশ্যা জল আনিতে গেলে সন্ন্যাসী সময় পাইয়া ঐ ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থলের উপর উঠিয়া তাহার উদরে এমত এক ছোরার আঘাত করিল যে, তাহাতে তাহার মঙ্গলবারে প্রাণ-বিয়োগ হইল পরে তথাকার দারোগা এই সমাচার শুনিয়া ঐ সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে এইমাত্র শুনা গিয়াছে। (১৬ই চৈত্র ১২৩০)

ফাঁসি—পূর্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছিল যে, তারকেশ্বরের শ্রীমন্তরাম গিরি এক বেশ্যার উপপতিকে খুন করিয়া ধরা পড়িয়াছিলেন, তাহাতে জিলা হুগলীর বিচারকর্ত্তারা তাহাকে বিচারস্থলে আনাইয়া বারংবার জিজ্ঞাসা করাতে প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তিনবার অস্বীকার করিলেন কিন্তু সূক্ষ্মা গতিপ্রযুক্ত চতুর্থবারে স্বীকার করাতে শ্রীযুক্তেরা বহুতর আক্ষেপ পূর্ব্বক ফাঁসি হুকুম দিলেন তাহাতে ১৩ ভাদ্র তারিখে রিত্যনুসারে তাহার ফাঁসি হইয়া কর্ম্মোপযুক্ত ফলপ্রাপ্তি হইয়াছে। (২৮শে ভাদ্র ১২৩১)"

ইহার পর মোহান্ত মাধব গিরি এলোকেশী নামক এক মহিলার সতীত্বনাশের অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করেন; তাহার কারাবাসকালে, তদীয় শিষ্য শ্যাম গিরি তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি কারাগার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মোহান্তের গদীতে পুনরায় বসিতে চেষ্টা করিলে, শ্যাম গিরি আপত্তি করেন এবং উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায়গণও মাধব গিরির

মোহান্ত হওয়াতে আপত্তি করেন, কিন্তু তিনি মোহান্তের গদি লইয়া মামলা করেন এবং নিজ পক্ষ সমর্থনকালে আদালতে বলেন, "যেহেতু আমি দশনামা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত, সেইহেতু আমার পরনারী গমনে কোন বাধা নাই, আমি ফৌজদারী জেল খাটিয়া আসিয়াছি, এইজন্য আমার মোহান্তপদে পুনরায় বসিতে কোন বাধা নাই।" এই মামলায় মাধব গিরি জয়ী হন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও বলাগড়ের রাজা স্বাধীন ছিলেন; কিন্তু ১৭০২ খৃষ্টাব্দে মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্র রায় তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া মুসলমান রাজ্যের অন্তর্গত করেন। এই সম্বন্ধে পেটারসন সাহেব লিখিয়াছেন—**"He (Kirti Chandra Rai) also seized the estates of the Raja of Balagar situated near the celebrated Shrine of Tarakeswar in Hoogly"***

মোহান্ত মাধব গিরির আচরণের কথা সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচারিত হয় কিন্তু দুঃখের বিষয় পুণ্যতীর্থে কুলবধূর সতীত্বনাশের পরও বঙ্গবাসী লম্পট মোহান্তকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয় নাই। তৎকালে এই ব্যাপার লইয়া বহু নাটক উপন্যাস এবং গান রচিত হয়। নিম্নে একটি গান উদ্ধৃত হইল :

"মোহান্তের তেল নিবি যদি আয়।
ঐ তেল তৈয়ার হচ্ছে, হুগলীর জেলখানায়॥
যার পতি বিদেশে
তেল নিলে সে এক শিশে,
তেলের গুণে, মনের টানে,
পতি তার ঘরে ফিরে আসে॥

*** Burdwan District Gazetteers By J. C. K. Paterson, page 28.**

স্বর্গীয় দুর্গাচরণ রায় লিখিয়াছেন যে, তারকেশ্বরের সন্নিকটে কুমরুল নামক একটি পল্লীগ্রাম আছে। ঐ গ্রামে নীলকমল মুখোপাধ্যায় নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিত। নীলকমলের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম এলোকেশী। এলোকেশীর নবীন নামক এক যুবার সহিত বিবাহ হয়। নবীনের আত্মীয় স্বজন কেহ না থাকায়, স্ত্রীকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিত এবং মাস মাস খরচ পাঠাইত। নীলকমলের প্রথমা স্ত্রী গত হইলে, দ্বিতীয় পক্ষে যে স্ত্রীর পানিগ্রহণ করে, সেই স্ত্রীর সহিত মোহান্তের বিশেষ ভালবাসা ছিল। মোহান্ত একদিন যুবতী এলোকেশীকে দেখিয়া উন্মত্ত হয় এবং তাহার বিমাতাকে প্রলোভনে বশ করিয়া দূতীর কাজে নিযুক্ত করে। ঐ বিমাতা নিজ পতি নীলকমলকে 'রাজার শ্বশুর হবে, মোহান্ত বিষয় করিয়া দেবে' ইত্যাদি প্রলোভন বাক্যে বশীভূত করিয়া মেয়েটিকে মোহান্তের করে সমর্পণ করিবার পরামর্শ দেয়। স্ত্রী পুরুষের পরামর্শ স্থির হইলে, বিমাতা মেয়েকে তারকেশ্বরে ছেলে হইবার ঔষধ খাওয়াইতে লইয়া যায়। মোহান্ত প্রথম দিন বালিকা এলোকেশীকে সন্তান হইবার ঔষধ খাওয়ানোর ছলে মাদক দ্রব্য সেবনে অচৈতন্য করিয়া তাহার সতীত্ব নাশ করে। পরে নানারূপ সোনারূপার গহণা পাইয়া এলোকেশীর মন ক্রমশঃ মোহান্তের প্রতি অনুরক্ত হয়। সে সর্ব্বক্ষণ মোহান্তের ভবনে স্ত্রী পুরুষের ন্যায় বাস করিতে থাকে। ক্রমে এই কথা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইল, নবীনের কানেও সেই কথা কিছু কিছু উঠিল। নবীন সন্দিগ্ধচিত্তে শ্বশুরালয়ে আসিয়া এলোকেশীকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলে, এলোকেশী কোন কথা গোপন না করিয়া সমস্ত বিষয় তাহাকে খুলিয়া বলিল। সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে নবীনের ইচ্ছা হইল না; সে বলিল "এলোকেশী, তুমি আমায় যথার্থ কথা বলায় তোমাকে ক্ষমা করিলাম, চল তোমাকে কলিকাতায় লইয়া যাই।" ইহা বলিয়া পাল্কি বেহারার অনুসন্ধান করিতে যায়। মোহান্ত দেখিল, এলোকেশী

হাত ছাড়া হইতেছে; সে ছিনাইয়া লইবার জন্য ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে পাহারা বসাইল। নবীন দেখিল যে স্ত্রীকে লইয়া যাওয়া দুর্ঘট, মোহান্ত এতকাল ভোগ দখল করিয়া, এখনও এলোকেশীকে ছাড়িতে চায় না, তখন উভয়কেই নিরাশ করি। এই স্থির করিয়া সে স্ত্রীকে আঁশবঁটিতে কাটিয়া পুলিশে গিয়া উপস্থিত হইল। দেশে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। রাস্তায় রাস্তায় এই কথা, এই গান, এই সম্বন্ধে বহু পুস্তক বাহির হইতে লাগিল। দেশের কত ধনী লোকে অর্থ দিয়া নবীনকে খালাস করিবার জন্য মোকর্দ্দমা করিতে লাগিলেন। গোলযোগে মোহান্ত ধরা পড়িল। রাজবিচারে ইহার নাকে দড়ি দিয়া জেলঘানিতে জুতে খাঁটি সরিষার তৈল বাহির করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। *

মোহান্ত মাধব গিরি হরিপাল থানার অন্তর্গত কুমরুল গ্রামে এলেকেশী নামক এক সুন্দরী যুবতীর সতীত্ব নাশের অপরাধে ধৃত হন এবং কারাবাস করেন। এলোকেশী তাহার স্বামী নবীনচন্দ্রকে মোহান্তের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলে, নবীন তাহাকে মোহান্তের কামানলে আহুতি না দিয়া স্বহস্তে একখানি আঁশবটি দিয়া হত্যা পূর্ব্বক থানায় যাইয়া, সমস্ত বৃত্তান্ত বলেন। বিচারে মোহান্তের জেল এবং নবীনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়, পরে নবীনকে খালাস করিয়া দেওয়া হয়।

এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া কলিকাতা 'বেঙ্গল থিয়েটারে' ইস্-মোহান্তের-এ-কী-কাজ নামক একখানি নাটক ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর হইতে অভিনয় হয় ও বাবু বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় মোহান্তের ভূমিকায় অভিনয় করিয়া বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন এবং বেঙ্গল থিয়েটারও এই অভিনয়ের দ্বারা বহু অর্থ প্রাপ্ত হন। এই নাটকের সাফল্য দেখিয়া ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে' এলোকেশীর ঘটনা সম্বলিত 'আমি তো উন্মাদিনী' নামক একখানি নাটিকা

* দেবগণের মর্ত্তে আগমন, পৃষ্ঠা ৪৩৬-৪৩৭

অভিনয় হয় এবং রসরাজ অমৃতলাল বসু এলোকেশীর পিতা নীলকমল মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকায় অভিনয় করিয়া দর্শক বৃন্দকে বিমোহিত করেন।

এই অভিনয় সম্বন্ধে ডক্টর শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন: "This was the most sensational play at that time, which drew crowds into the Theatre as the tale of the day was Mohanta and Elokeshi. History, however repeated itself and more than half a century later, the affairs relating to the Mohanta also became the talk of the day, and the people not meekly submitting to the villainies of the head of a sacred place, and awakened to a sense of self-respect brought against the powers and riches of an unscrupulous Mohanta and at last forced him to come to his knees and submit to popular demands in September 1924, and the leader of the struggle was no other person than the great and illustrious leader of the country, Deshabandhu Chittaranjan Das." *

মোহান্ত সতীশ গিরির সময়ে, তাহার অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া অনাচারী মোহান্তকে বিদূরিত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথম স্বামী বিশ্বানন্দ এবং পণ্ডিত ধরানাথ ভট্টাচার্য্য আন্দোলন করেন। তারকেশ্বর মন্দির দেশবাসীর সম্পত্তি, মোহান্তের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে; সুতরাং তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য সত্যাগ্রহ করা স্থির হয় এবং স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নিকট কংগ্রেস যাহাতে সত্যাগ্রহের যাবতীয় ভার গ্রহণ করে, তদ্বিষয়ে আবেদন করেন। তারকেশ্বরের ব্যাপার অনুসন্ধান করিবার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি একটি অনুসন্ধান সমিতি' গঠন করেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, ডাঃ জে এম দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়, পণ্ডিত ধরানাথ

*The Indian Stage (2nd Edition) vol. 11, Pages 235-236.

ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মৌলানা আক্রাম খাঁ উক্ত সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ১৩৩১ সালে সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সে কংগ্রেস সত্যাগ্রহের ভার গ্রহণ করে এবং মৌলানা আক্রাম খাঁ কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায়ের উপর কংগ্রেসের পক্ষে যাবতীয় ভার প্রদান করা হয়।

স্বামী সচ্চিদানন্দ, স্বামী বিশ্বানন্দ, চিররঞ্জন দাশ, প্রভৃতি শতসহস্র যুবক তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ করিয়া কারাবরণ করেন। ২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ সাল হইতে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে চারিমাস যাবৎ এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলিবার পর পরিশেষে মোহান্ত সতীশ গিরি গদিতে বসেন। শ্রীযুক্ত ধরণীধর সিংহরায় প্রমুখ সাতজন ব্যক্তি মোহান্তের বিরুদ্ধে এক মামলা উপস্থিত করেন; কিন্তু মোহান্তের ভয়ে তাহার বিরুদ্ধে কেহই সাক্ষ্য দিতে রাজী হন নাই। শ্রীপতি হাজরা ও উমাপদ মোদক সর্ব্বাগ্রে মোহান্তের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন এবং তীর্থবাসী সিংহরায়ের নিকট হইতে মোহান্ত তাহার স্ত্রীকে চান বলিয়া তিনিও সাক্ষ্য দেন। পরিশেষে সত্যের জয় হয় এবং তারকেশ্বরের সম্পত্তি দেশবাসীর হস্তে আসে। বর্ত্তমানে একটি কমিটি কর্ত্তৃক মন্দির পরিচালিত হয় এবং মোহান্তের যোগ্যতা দেখিয়া হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় শ্রীযুক্ত দণ্ডিস্বামীকে মোহান্ত নিযুক্ত করিয়াছেন। সম্পত্তি পরিচালনের জন্য পরিচালক সমিতি যে ব্যবস্থা করিবেন মোহান্ত তাহাই মানিয়া লইবেন এবং মোহান্তের পরিচালনে বা প্রজাবর্গের উপর যদি কোন অত্যাচার হয়; তাহা হইলে পরিচালন সমিতি যথাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে তাহারা নূতন মোহান্তও নিয়োগ করিতে পারিবেন। *

---

* বর্ত্তমানে রায় বাহাদুর কালীপদ মৈত্র তারকেশ্বরের সম্পত্তির ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন; পূর্ব্বে ইনি কলিকাতার অতিরিক্ত চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

ভারামল্ল তারকনাথের সেবার জন্য যে বৃহৎ জমিদারী দিয়া যান, তাহার বার্ষিক আয় প্রায় দেড় লক্ষ টাকা; এতদ্ভিন্ন স্থাবর সম্পত্তি হইতে কুড়ি হাজার টাকা এবং যাত্রীদের দেয় প্রণামী হইতে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকার উপর আয় হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ বিশ বৎসর যাবৎ নব-পরিচালনায় তারকেশ্বরের রাস্তাঘাটের বা ষ্টেশন হইতে মন্দির পর্য্যন্ত দুই পার্শ্বের কুটিরগুলির কোন উন্নতি হয় নাই। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তারকেশ্বরের যে অবস্থা ছিল, আজও ঠিক সেইরূপই আছে। দেবতার সেবার জন্য পূর্ব্বে পাঁচ হাজার টাকা মাসিক ব্যয় হইত, বর্ত্তমানে উক্ত ব্যয় কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে সংস্কৃত টোল এবং একটি হাসপাতাল পরিচালনা করা হয়। পল্লীসংস্কার দেশবন্ধুর শেষ জীবনের কামনা ছিল, কিন্তু অকালে লোকান্তরিত হওয়ায়, তাহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। হয়ত দেশবন্ধু আরও কিছুদিন জীবিত থাকিলে আমরা তারকেশ্বরের অন্যরূপ দেখিতাম। যাহার ঐকান্তিক চেষ্টায় তারকেশ্বরের পরিচালনভার হস্তান্তরিত হইয়াছে, তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনায় যদি পরিচালকগণ এবং মোহান্ত মহারাজ তারকেশ্বরকে একটি আদর্শ পল্লীগ্রামে পরিণত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার আশীষ পাইয়া দেশবাসী ধন্য ও কৃতার্থ হইবে।

পরিশেষে মহালিঙ্গার্চ্চন নামক গ্রন্থে বঙ্গদেশের শৈবতীর্থ এবং তারকেশ্বরের সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা উল্লেখ করিয়া তারকেশ্বর প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথো বক্রেশ্বরস্তথৈবচ
বীরভূমৌ সিদ্ধিনাথো রাঢ়ে চ তারকেশ্বর॥
ঘণ্টেশ্বরশ্চ দেবেশি রত্নাকর নদীতটে।
ভাগীরথী নদীতীরে কপালেশ্বর পরিত॥
ভদ্রেশ্বরশ্চ দেবেশি কল্যানেশ্বর এবহি।
নকুলেশ্বর কালীঘাটে শ্রীহট্টে হাটকেশ্বর॥

হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার যশাড় গ্রাম একটি নগন্য স্থান হইলেও ১২৫২ সালে হাজি সেখ সবিরুদ্দিন এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র পনের বৎসর বয়সে ব্যবসা করিবার জন্য গ্রাম ত্যাগ করিয়া আসামে যান এবং তথায় ব্যবসা করিয়া প্রভূত অর্থ অর্জ্জন করেন। দান ও দয়া দাক্ষিণ্যের জন্য ইনি স্বগ্রামে ও গৌহাটীতে খ্যাত হন। ইনি যশাড় ও হেয়াতপুর গ্রামে দুইটি মসজিদ স্থাপন করেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত 'সেখ ব্রাদার্স' অদ্যাপি গৌহাটিতে বিদ্যমান আছে। কবিরুদ্দিন ও ইব্রাহিম নামে তাহার দুইটি সহোদর ভাই ছিল—উক্ত ভ্রাতৃগণকে তিনি ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ১৩৩৩ সালে নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করেন।

যশাড়

আশুতোষ মিত্র

আশুতোষ ১২৭৫ সালের ৬ই বৈশাখ জেজুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন—ইঁহার পিতার নাম রাধামাধব মিত্র। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ডাফ কলেজ হইতে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, সাংসারিক দারিদ্রতাবশতঃ চাকুরীতে প্রবেশ করেন এবং স্বীয় কর্ম্মদক্ষতা ও বিচক্ষণতার জন্য পরে হেড-ক্লার্কের পদে উন্নীত হন। অফিসে চাকুরী করিবার সময় সহজে গুণ-ভাগ করিবার জন্য 'রেডি-রেকোনার' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার বহু প্রবন্ধ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি বিনয়ী ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার চেষ্টায় স্বগ্রামে লোকাল বোর্ডের রাস্তা, হরিসভা, অনাথ ভাণ্ডার, বিদ্যালয়, পোষ্টাফিস প্রভৃতি স্থাপিত হয়। ১৩৫০ সালের ২২শে ভাদ্র তারিখে তিনি পরলোকগমন করেন। 'হুগলী জেলার ইতিহাস' লেখক শ্রীসুধীর কুমার মিত্র ইঁহার একমাত্র পুত্র। *

---

* কায়স্থ-পত্রিকা, আশ্বিন ১৩৫০, দ্রষ্টব্য

সপ্তদশ অধ্যায়

বঙ্গে ডাকাতি : ডুমুরদহ

ডুমুরদহ হুগলী জেলার বলাগড় থানার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম হইলেও ইহা এক সময় ডাকাতির জন্য বঙ্গদেশ বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিল। ভাগীরথীর পশ্চিম দিকে নয়াসরায়ের উত্তরে এই গ্রামখানি অবস্থিত। রাজা হরিপালের ভ্রাতা অহিপাল মাহেশ ছাড়িয়া ডমুরদহে বাস করেন এবং পরবর্ত্তীকালে তিনি সপ্তগ্রামের রাজা হইয়াছিলেন বলিয়া 'দ্বিগ্বিজয়-প্রকাশের' কিংকিলা বিবরণে লিখিত আছে। এই স্থানটি পূর্ব্বে একটি দ্বীপের ন্যায় ছিল, সেইজন্য ইহা 'ডুমুর দ্বীপ' চলিয়া প্রখ্যাত হয়।

"অহিপালো মাহেশে চ রাজ্য ত্যক্ত্বা চ পশ্চিমে।
ত্রিবেণী সন্নিধানে চ চক্রদ্বীপস্থ সন্নিধৌ॥
ডুমুরদ্বীপ মধ্যে চ বসতিং কৃতবান মুদা।" ৬৮১

গঙ্গার নিকটে দ্বীপ বলিয়া নৌকা করিয়া এই স্থান হইতে ডাকাতি করিবার বিশেষ সুবিধা হইত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে এই স্থানের বিশ্বনাথবাবু বলিয়া এক ব্যক্তি ডাকাতির জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন, এবং তাহাকে ধরিবার জন্য ইংরাজ সরকারকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। বঙ্গদেশে তিনিই বিশে ডাকাত বলিয়া খ্যাত।

ডুমুরদহের রায়বংশ বিশেষ সম্ভ্রান্ত বংশ বলিয়া তৎকালে খ্যাত ছিল। বঙ্গের বহু প্রাচীন বনিয়াদী বংশের সহিত তাহারা আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ ; কিন্তু দুঃখের বিষয় নৌকা করিয়া রাত্রে গঙ্গাবক্ষে ইহাদের লোক-জন ডাকাতি করিয়া বেড়াইত। কোন অতিথি ইহাদের বাড়িতে একবার আশ্রয় লইলে, আর তিনি ফিরিয়া যাইতেন না। ডুমুদহের কেশব রায় ও

গুমান রায়ের ভয়েও কেহ নৌকা করিয়া এই স্থান দিয়া যাইতে পারিত না; নৌকার সাহায্যে ডাকাতির তাহারাই সৃষ্টিকর্ত্তা।

স্বর্গীয় যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী ১২৬২ সালে ভারতের তীর্থগুলি ভ্রমণ করিয়া 'তীর্থভ্রমণ' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি ডুমুরদহের সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:

"এই বাজারের নিকটের চড়াতে আহারাদি করিয়া পশ্চিমপাড় শিজে-ডুমুরদহ, সেখানে কেশব রায়, গুমান রায়ের বাটি; যাহাদের ভয়ে নৌকাপথে কেহ স্থির থাকিতে পারিত না, নৌকায় ডাকাতির তাহারা সৃষ্টিকর্ত্তা। কলিকাতা বাগবাজারের ঘাট পর্য্যন্ত তাহাদের বোম্বেটের নৌকা বেড়াইত।"

ডুমুরদহের রায় বংশের বিশ্বনাথ বাবুর নাম জানেন না এইরূপ লোক বঙ্গদেশে বিরল। 'বিশে ডাকাত' বলিয়া তিনি খ্যাত ছিলেন এবং তাঁহার নাম শুনিলে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা ভয়ে কাঁপিতে থাকিত। নদী মাতৃক বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র তাঁহার গতিবিধি ছিল এবং কিম্বদন্তি যে, পূর্ব্বাহ্নে খবর দিয়া তবে তিনি ডাকাতি করিতে যাইতেন। তিনি উপস্থিত হইলে, তাহার প্রাপ্য গণ্ডা যদি কেহ বুঝাইয়া দিত, তাহা হইলে আর কোন গণ্ডগোলই হইত না। কিন্তু যাহারা পুলিশে খবর দিয়া পুলিশের সাহায্যে তাহাকে ধরাইবার চেষ্টা করিত তাহাদের সহিত বিশ্বনাথ বাবুর লড়াই হইত এবং বলা বাহুল্য তাহারাই ধনে প্রাণে মারা যাইতেন।

একবার বিশ্বনাথবাবু যশোহরে কোন ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে যাইবেন বলিয়া খবর দিয়াছিলেন। কিন্তু গৃহস্বামী তাহার ভয়ে ধন-রত্ন, শিশু ও মহিলাগণকে লইয়া কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে পলাইয়া যান, এবং দূর সম্পর্কীয়া এক দরিদ্র মহিলাকে তথায় রাখিয়া যান। মহিলাটির ভূ-সম্পত্তি তাহার জ্ঞাতিবর্গ ভোগ দখল করিতেছিলেন এবং তাহাকে তাহারা বাড়ী হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন। যথা সময়ে বিশ্বনাথবাবু যশোহরে উপস্থিত হইয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বড়ই বিরক্ত হন। কিন্তু

মহিলাটি ইহারা যে ডাকাত তাহা জানিতেন না, তিনি গৃহস্বামীর কোন আত্মীয় আসিয়াছেন ভাবিয়া, তাহার জন্য ভাল খাবার আনিয়া তাহাকে হাতমুখ ধুইয়া খাবার খাইতে অনুরোধ করেন এবং বলেন যে, বিশে ডাকাতের ভয়ে তিনি পলাইয়া গিয়াছেন। তিনি আরো বলেন যে "তুমি বাবা যখন আসিয়াছ তখন আজ রাত্রে আর যাইও না, আমি বড় ভয় পাইয়াছি।"

বিশ্বনাথবাবু সরলা বৃদ্ধা মহিলার কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন "আমিই যে বিশে ডাকাত।" বৃদ্ধা তাহার কথা কোন মতেই বিশ্বাস করিল না, বলিল "তোমার মত সুন্দর ছেলে কখনও ডাকাত হইতে পারে না। আমারও তোমার মত একটি ছেলে ছিল, গত বৎসর সে মারা গিয়াছে, তাই আমি ইহাদের বাড়ীতে রান্না করিতে আসিয়াছি।" এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধা পুত্রশোকে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

বিশ্বনাথ বাবু অন্যস্থান হইতে ডাকাতি করিয়া যে সমস্ত অর্থ পাইয়াছিল, তাহা বৃদ্ধাকে দিয়া কতকটা তাহাকে সান্ত্বনা করাইল এবং তাহার দেবর ও জ্ঞাতিগণের নাম ধাম লইয়া পরে সেই সমস্ত সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া সেই মহিলাকে দিয়াছিলেন। এইরূপ বহু গল্প তাহার সম্বন্ধে প্রচলিত আছে।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এক ডাকাতি করিতে গিয়া তিনি ধরা পড়েন এবং হুগলী জেলের মধ্যে তাঁহার ফাঁসী হয়। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের "সমাচার দর্পণ" পত্রে এই সম্বন্ধে একটি সংবাদ বাহির হইয়াছিল ; নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। এই সংবাদটি হইতে তৎকালে এই অঞ্চলে যে প্রত্যহ প্রায়ই ডাকাতি হইত, তাহা জানিতে পারা যায়।।

"ডাকাতি। এই এক বৎসবের মধ্যে কলিকাতার চতুর্দ্দিকে ডাকাতি প্রায় মধ্যে মধ্যে হয় এমন শুনিতে পাইতেছি, এমত রাত্রি প্রায় নাই যে তাহাতে ডাকাতি হয় না কিন্তু এমত থাকিবে না পূর্ব্বে এই অঞ্চলে এমত চোর ডাকাতির ভয় ছিল যে পথিক লোক পাঁচ সাতজন একত্র না

হইয়া পথে চলিতে পারিত না এবং মোং কৃষ্ণনগর জিলাতে অনেক ডাকাত জমা হইয়াছিল তাহাদের সর্দ্দার বিশ্বনাথ বাবু নামে এক দুরন্ত ডাকাত ছিল তাহার হুকুমে দিন ও রাত্রি ডাকাতি হইত অনেক দিবস হইল তাহার ফাঁসি হইয়াছে। এই অঞ্চলে এমত অনেক লোক যে তাহারা পূর্ব্বে দস্যুবৃত্তি দ্বারা ধন সঞ্চয় করিয়া এখন ভাগ্যবান হইয়া ভালো মানুষ হইয়াছে।" *

দুর্গাচরণ রায় ডুমুরদহ ও বিশ্বনাথ বাবু সম্বন্ধে যাহা তাঁহার 'দেবগণের মর্ত্তে আগমন' নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম ঃ

"বাম দিকে দেখা যাইতেছে ডাকাইত প্রধান স্থান ডুমুরদহ। এক সময় ঐ স্থানের বালক বৃদ্ধ সকলেই ডাকাইত ছিল। ঐ গ্রামের লোকেরা বাটীতে অতিথিদিগকে বাসা দিয়া রজনীতে প্রাণ সংহার করিত। দিবসে মৎস্যজীবীরা মৎস্য ধরিত এবং রজনীতে নৌকায় বোম্বেটেগিরি করিত। ফলতঃ সে সময়ে কি জলপথ কি স্থলপথ, কোন পথেই ডুমুরদহের নিকট দিয়া টাকা কড়ি সহ কেহ যাইলে নিস্তার থাকিত না। প্রায় ৬০ বৎসর অতীত হইল, বিখ্যাত ডাকাইত বিশ্বনাথ বাবু এই স্থানে বাস করিতেন। ইহার অধীনে ডাকাইতেরা নৌকাযোগে যশোহর পর্য্যন্ত ডাকাইতি করিয়া বেড়াইত। একবার মত্ত অবস্থায় কতিপয় সঙ্গীর সহিত ধৃত হন ও তাঁহার ফাঁসি হয়। যে বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন, উহা গঙ্গাতীরের সন্নিকটস্থ একটি দোতালা কোঠা। ঐ বাড়ীর ছাদ হইতে গঙ্গার বহুদূর পর্য্যন্ত কোথায় কে আছে দেখিতে পাওয়া যাইত।"

বিশ্বনাথ বাবু যে সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময় বঙ্গদেশের বহু জমিদার এইরূপ ডাকাতি করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন। কেহ

* সমাচার দর্পণ ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

স্বয়ং করিতেন; কেহ বা পরোক্ষে এইরূপ ডাকাতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকন্তু তৎকালে পুলিশ বিভাগের কার্য্যও অতিশয় নিন্দনীয় ছিল; কারণ গ্রামের চৌকিদার হইতে আরম্ভ করিয়া ফাঁড়িদার, দারোগা পর্য্যন্ত এই কার্য্যের সহায়ক ছিল। তাহারা দোষী ব্যক্তিকে ধরাইবার কোন চেষ্টাই করিত না, এমন কি বহু স্থলে ডাকাতির অভিযোগে কেহ ধরা পড়িলে, তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্যই তাহারা আপ্রাণ চেষ্টা করিত। তৎকালে রাস্তাঘাটের বিশেষ সুব্যবস্থা ছিল না, সেইজন্য গভর্ণমেণ্টকে ইহা দমন করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

ডাকাতগণের দৌরাত্মে সেই সময় ধনপ্রাণ লইয়া শান্তিতে বসবাস করা এবং জলপথে ও স্থলপথে যাতায়াত যে কিরূপ বিপজ্জনক ছিল তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। গভর্ণমেণ্ট এই ডাকাতি দমন করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় নিরীহ ও ভীরু শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসিগণ ডাকাত আসিয়াছে শুনিলেই কোন প্রকার বাধা দেওয়া দূরের কথা, অগ্রে গ্রাম ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যাইত। বহুক্ষেত্রে ডাকাতগণ পূর্ব্বে পত্র দিয়া ডাকাতি করিতে যাইত; সেই সকল স্থানে গৃহস্বামী টাকা লইয়া ডাকাতদিগকে দিবার জন্য অপেক্ষা করিত।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাসে ডাকাতদের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্রশেখরের চতুর্থ খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে তিনি যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

"প্রতাপ জমিদার এবং প্রতাপ দস্যু। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে অনেক জমিদারই দস্যু ছিলেন। ডারুইন বলেন, মানবজাতি বানরদিগের প্রপৌত্র। একথায় যদি কেহ রাগ না করিয়া থাকেন, তবে পূর্ব্বপুরুষ এই অখ্যাতি শুনিয়া, বোধ হয় কোন জমিদার আমাদের উপর রাগ করিবেন না। বাস্তবিক দস্যুবংশে জন্ম অগৌরবের কথা বলিয়া বোধ হয় না। কেননা, অন্যত্র দেখিতে পাই অনেক দস্যুবংশ-

জাতই গৌরবে প্রধান। তৈমুরলঙ্গ নামে বিখ্যাত দস্যুর পরপুরুষেরাই বংশমর্য্যাদায় পৃথিবী মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে যাঁহারা বংশ-মর্য্যাদার বিশেষ গর্ব্ব করিতে চাহেন, তাঁহারা নর্ম্মান্ বা স্কন্দনেবীয় নাবিক দস্যুদিগের বংশোদ্ভব বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। প্রাচীন ভারতে কুরুবংশেরই বিশেষ মর্য্যাদা ছিল। তাঁহারা গোচোর, বিরাটের উত্তর গোগৃহে গোরু চুরি করিতে গিয়াছিলেন। দুই এক বাঙ্গালি জমিদারের এরূপ কিঞ্চিৎ বংশমর্য্যাদা আছে।"

বঙ্কিচন্দ্রের এই মতবাদ ঐতহাসিক সত্য। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর রণাঙ্গনে যুদ্ধের নামমাত্র অভিনয়ে যখন সিরাজদ্দৌলার পতন হইল, তাহার পর হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্য্যন্ত কোম্পানীর যে রাজত্বকাল চলিয়াছিল তখন দেশের সর্ব্বত্র প্রবলভাবে চলিতেছিল স্বার্থপরতা, অর্থশোষণনীতি এবং অত্যাচার ও নিপীড়ন। "ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাধাম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্যকুলকলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গলা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরাজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌পাচ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।"

তখনকার দিনের কোম্পানীর যিনি ইউরোপীয় কর্ম্মচারী থাকিতেন তাহার প্রধান কার্য্যই ছিল রাজস্ব আদায় এবং ডাকাত ধরিয়া ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ্দ করা—ঐ সব ধৃত ডাকাতদের বিচার হইত নায়েব নাজিমের অধীনস্থ ফৌজদারি আদালতে। দেশের শাসন-সংরক্ষণ দস্যু ডাকাতি দমন সে সকলের দিকে কোম্পানী কোন কিছুই লক্ষ্য করিতেন না। তাঁহাদের স্বার্থ, তাঁহাদের অর্থ নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতা পৌছিলেই তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতেন।

বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সে সময়ে ডাকাত ছিল। তাহারা জলপথে ও স্থলপথে দস্যুবৃত্তি করিয়া ফিরিত। হুগলী, বর্দ্ধমান, নদীয়া, চন্দননগর, হাওড়া, যশোহর, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, রঙ্গপুর, বগুড়া, রাজসাহী, পাবনা, চব্বিশ পরগণা, ঢাকা, বারাসত, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, মেদিনীপুর, কটক, পুরী, বালেশ্বর, মেদিনীপুর, পুর্ণিয়া, মালদহ, দিনাজপুর, কোচবিহার, মুঙ্গের, ভাগলপুর, ত্রিহুত, চম্পারণ, সারণ, সাহাবাদ, পাটনা, বিহার এ সকল স্থানের ডাকাত ও দস্যুরা বাঙ্গলার সর্ব্বত্র যাতায়াত করিত। ১৮৫১, ১৮৫২, ১৮৫৩ এই তিন বৎসরের গভর্ণমেণ্টের বিবরণী (**Statement showing the number of Dacoity and attempts to commit Dacoity**) বিবরণী হইতে দেখা যায়, হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলায়ই সর্ব্বাপেক্ষা ডাকাতের সংখ্যা বেশী ছিল।

The Bengal Administration Report for 1859-60 হইতে জানা যায় যে, ডাকাতেরা লোহার মুগুর, বল্লম, লাঠি, শর্কী' শাল প্রভৃতি সহকারে ডাকাতি করিয়া ফিরিত। তাহাদের অত্যাচার ও নিপীড়ন ছিল কল্পনাতীত। নৌকারোহীদের প্রতি অতর্কিত আক্রমণকারী একদল জলদস্যু পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদের ন্যায় নৌকাযাত্রীদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক কয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াই নিবৃত্ত হইত না, বৃহদাকারের খড়্গের আঘাতে তাহাদের মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিত। গভর্ণমেণ্ট এই ডাকাতি দমনের জন্য বাঙ্গালাদেশে ও বিহারে **Suppression of Dacoity** নামে একটি বিভাগের প্রতিষ্ঠা করেন।

'কপালকুণ্ডলার' প্রথম পরিচ্ছেদেই দেখিতে পাই :

"প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন মাঘ মাসের শেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পর্ত্তুগীজ ও অন্যান্য নাবিক দস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই

তৎকালে প্রথা ছিল।" নাবিকদস্যু বলিতে তিনি Pirate বা বাঙ্গলার River Dacoitsদিগকে উল্লেখ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে আমাদের মতিবিবির সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ

"এখানে কেহ জীবিত ব্যক্তি আছে?"

নবকুমার কহিলেন, "কে তুমি?"

উত্তর হইল, "তুমি কে?" নবকুমারের কর্ণে স্বর স্ত্রী কণ্ঠজাত বোধ হইল। ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কপালকুণ্ডলা নাকি?"

স্ত্রীলোক কহিল, 'কপালকুণ্ডলা কে তা জানিনা। আমি পথিক, আপাততঃ দস্যুহস্তে নিস্কুন্তলা হইয়াছি।'

ব্যঙ্গ শুনিয়া নবকুমার ঈষৎ প্রসন্ন হইলেন। জিজ্ঞাসিলেন, "কি হইয়াছে?"

উত্তরকারিণী কহিলেন, "দস্যুতে আমার পাল্কী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, আর সকলে পলাইয়া গিয়াছে। দস্যুরা আমার অঙ্গের অলঙ্কার সকল লইয়া আমাকে পাল্কীতে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে।"

এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি যে, কপালকুণ্ডলার আখ্যানভাগের বিষয়বস্তু—জাহাঙ্গীরের অর্থাৎ মোগল রাজত্বকালের। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইউরোপীয় বণিকগণ ভারতবর্ষে বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। পর্ত্তুগীজেরা তখন বাঙ্গলার প্রধান প্রধান নগরে ও বন্দরে বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া সগৌরবে ব্যবসায় পরিচালনা করিতেছিলেন। সপ্তগ্রাম, হুগলী, চাটগাঁ, বাকলা, শ্রীপুর প্রভৃতি সর্ব্বত্র তাহাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি ছিল। বঙ্কিম সেজন্য প্রথমেই পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তৎকালে পর্ত্তুগীজ বা ফিরিঙ্গি দস্যুগণের উৎপাতে দেশ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

'আনন্দমঠে' দস্যুদের কাহিনী উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয়, তৃতীয় পরিচ্ছেদেই

উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই দস্যু কাহারা? যাহারা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে অনাহারে শীর্ণ 'মনুষ্যাকৃতি বোধ হয়' কিন্তু মনুষ্যও বোধ হয় না অতিশুষ্ক, শীর্ণ, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ, বিকটাকার ইত্যাদি। কিন্তু এই গ্রন্থের মূল আখ্যান বাংলার সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ঘটনা অবলম্বনে বিরচিত। বাঙ্গলার নবাব আলীবর্দ্দি খাঁর সময় হইতে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের উপদ্রব বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করে। নবাব আলীবর্দ্দি খাঁর রাজত্বকালে (১৭৪০—১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ) হিন্দু সন্ন্যাসী ও ফকিরেরা বাঙ্গলাদেশ সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ফকিরদের অন্যতম দলপতি মজনুসার অত্যাচার বিবরণ সর্ব্বজনবিদিত। সন্ন্যাসীদের মধ্যে সশস্ত্র নাগা সন্ন্যাসীর দল নিঃসঙ্কোচে নানাস্থানে দস্যুবৃত্তি করিয়া ফিরিত। ইহারা শৈব নাগা বৈরাগী নাগা, দাদুপন্থী নাগা প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে নবাব মীরকাসিম বাঙ্গলার মসনদ পুনরধিকারের নিমিত্ত নাগা সন্ন্যাসীদের তাঁহার সৈন্যদলের অন্তর্ভূক্ত করিয়াছিলেন।

"আনন্দমঠ" সম্বন্ধে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্র তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন "এবার পরিশিষ্টে বাঙ্গলার সন্ন্যাসিবিদ্রোহের যথার্থ ইতিহাস ইংরাজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।" আনন্দ-মঠের পরিশিষ্টে মূল ইংরেজী হইতে **History of the Sannyasi Ribellion** উদ্ধৃত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ঘটনা অবলম্বনে ভক্তিবিহ্বলচিত্তে দেশমাতৃকাকে দেবত্ব আরোপ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা আনন্দমঠের সন্ন্যাসীদের প্রকৃত ইতিহাস জানিতে চাহেন, তাঁহারা রায় সাহেব যামিনীমোহন ঘোষ সঙ্কলিত **Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal** নামক গ্রন্থ পড়িয়া দেখিতে পারেন। ১৭৭০—১৭৭২ খৃষ্টাব্দ এই দুই বৎসর কাল—বাঙ্গলাদেশে সন্ন্যাসীদের অত্যাচার অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

'ইন্দিরা' উপন্যাসের কালদীঘির কথা মনে করুন। 'ইন্দিরা উনিশ বৎসর

বয়সে ভরা যৌবনে স্বামী সন্দর্শনে যাইতেছে, পথে পড়িল কালদীঘি। দীঘির ঘাটে বটতলায় তাহার পাল্কী নামান হইল। বাহকেরা কেহ দূরে বিশ্রাম করিতেছে, কেহ জলে নামিয়াছে, কেহ নিকটে নাই।......এমত সময়ে পাল্কীর অপর পার্শ্বে কি একটা শব্দ হইল। যেন উপরিস্থ বটবৃক্ষের শাখা হইতে কিছু গুরু পদার্থ পড়িল। আমি সেদিকের কপাট অল্প খুলিয়া দেখিলাম যে, একদল কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকায় মনুষ্য। ভয়ে দ্বার বন্ধ করিলাম; কিন্তু তখনই বুঝিলাম যে এ সময়ে দ্বার খুলিয়া রাখাই ভাল। কিন্তু আমি পুনশ্চ দ্বার খুলিবার পূর্ব্বেই আর একজন মানুষ গাছের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে আর একজন, আবার একজন! এইরূপ চারিজন প্রায় এককালেই গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পাল্কী কাঁধে করিয়া উঠাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।'

হুগলী জেলায় ডাকাতি নিবারণ করিবার জন্য সরকার হইতে বহু প্রকারের চেষ্টা করা হয়; কিন্তু কোন ফলই হয় নাই। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে রাধা চঙ্গ নামক এক প্রসিদ্ধ ডাকাত তিন চারিটি ডাকাতি করিবার অভি-যোগে গ্রেপ্তার হয়, কিন্তু কাছারী হইতে সে পলায়ন করিয়া পুনরায় শত শত স্থানে ডাকাতি করা সত্ত্বেও তাহাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। আঠার বৎসর পরে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে রাধা চঙ্গ গ্রেপ্তার হয়, এবং সেই বৎসর ২৫শে আগষ্ট তারিখে তাহার ফাঁসি হয়। সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে তাহার ফাঁসি হইয়াছিল এবং উক্ত ফাঁসি দেখিবার জন্য হুগলীতে যেরূপ জনসমাগম হইয়াছিল, সেরূপ জনসমাগম ত্রিবেণীতে বারুণীর স্নানের সময়ও হয় না বলিয়া প্রাচীন সংবাদপত্রে লিখিত আছে।

হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট এই স্থান হইতে ডাকাতি বন্ধ করিবার জন্য সেই সময় কিরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন তাহা ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের 'সমাচার দর্পণ' পত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

নবীন নিয়ম।—জেলা হুগলীর অন্তঃপাতি গ্রাম সকলে কয়েকবার

ডাকাইতির ঘটনা হইবাতে তন্নিবারণার্থে তত্রস্থ শ্রীযুত বিচারকর্ত্তা কর্ত্তৃক নানাবিধ সদুপায় সাধন সত্ত্বেও দুর্বৃত্তেরা অত্যাচারে ক্ষান্ত না হইবাতে সম্প্রতি তিনি এই এক নবীন নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন যে তাঁহার বশীভূত স্থান সকলে দশ দশ গ্রামে এক এক ফাঁড়িদার নিযুক্ত হইবেক আর ঐ দশ গ্রামের প্রত্যেক কর্ম্মচারী ও গ্রাম্য প্রহরীদের নিকট হইতে এইমত অঙ্গীকৃত পত্র লওয়া যাইবেক যে তাহারা পরস্পর প্রত্যেক গ্রামের মঙ্গলামঙ্গলের দায়ী হইবেক। (১১ই জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬)

বিচার কর্ত্তার নূতন নিয়ম।—সংপ্রতি শুনা গেল যে জিলা হুগলীর বিচারকর্ত্তা শ্রীলশ্রীযুত স্মিত সাহেব সকল গ্রামে এই নূতন নিয়ম করিয়াছেন যে নীচ জাতীরা সকলে একত্র হইয়া মিলিয়া রাত্রিকালে যষ্টি হস্তে করিয়া গ্রামের ভিতরে চৌকি দিবেক এই হুকুম দিয়াছেন কারণ ডাকাতি কিম্বা কোন হাঙ্গামা উপস্থিত হইলে সকলে জনরব করিবে তাহাতে গ্রামের পাইক পেয়াদা এবং মণ্ডল ও অবশিষ্ট রাইয়ত লোক প্রভৃতি সকলে একত্র হইয়া যাহাতে তাহা নিবারণ হয় তাহা করিবেক অন্যথা বিচারকর্ত্তার নিকট যথাবিধি শাস্তি প্রাপ্ত হইবেক। (১লা আষাঢ় ১২৩৬)

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই পাঁচ বৎসর হুগলী জেলায় অনুষ্ঠিত ডাকাতির একটি তালিকা সঙ্কলন করিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বৎসর	ডাকাতির সংখ্যা	ডাকাতের সংখ্যা	অপহৃত দ্রব্যের পরিমাণ	কয়টি ডাকাতিতে সাজা হইয়াছিল	কয়জনের সাজা হইয়াছিল	সম্পত্তি উদ্ধার
১৮৩৮	১৪	২৯২	৬,৬২৯ টাকা	৬	৯	১৬৯৲
১৮৩৯	১৩	২০৮	২,৮১৯ "	২	৫	৭২৲
১৮৪০	২০	২২৪	১০,২৯৯ "	২	৯	৭৪৲
১৮৪১	১৫	২৩৮	৮,৬৯৮ "	২	৬	১৪৩৲
১৮৪২	২৯	৩৭০	১৯,৫২৫ "	৭	২৯	৫৪৭৲
মোট	৯১	১৩৩২	৩৭,৯৭০ টাকা	১৯	৫৮	১০০৫৲

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে স্যার ফ্রেডরিক হ্যালিডে বঙ্গের প্রথম ছোট লাট মনোনীত হন; এবং তিনি বঙ্গদেশ হইতে ডাকাতি দমন করিবার জন্য বিশেষভাবে বদ্ধপরিকর হন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি হুগলী জেলার জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন; কেবল হুগলী জেলা নয়, বঙ্গদেশের অন্যান্য জেলায়ও তিনি কর্ম্ম করিয়া ইহা দমন করিতে না পারিলে যে, বঙ্গবাসীর শান্তি হইবে না তাহা মনে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন। সেই সময় ইহা দমন করিবার জন্য 'ডাকাতি দমন বিভাগ' বলিয়া একটি নূতন দপ্তর খোলা হয় এবং তাহার কমিশনারের (The Commissioneer for the Suppression of Dacoity) হস্তে ইহা নিবারণ করিবার জন্য যাবতীয় ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

এ সম্বন্ধে Sir John Strachey যাহা লিখিয়াছেন (India Edition 1894) তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্মানুবাদ এইরূপ—"তখনকার দিনে ভাল রাস্তাঘাট ছিল না, বিদ্যালয়াদিও বড় একটা ছিল না, লোকের ধনসম্পত্তি এবং জীবনের নিরাপত্তার বিশেষ কোন সুবন্দোবস্তও ছিল না। পুলিশের অকর্ম্মণ্যতার ফলে কলিকাতার উপকণ্ঠেই সশস্ত্র ডাকাতদল কর্ত্তৃক ডাকাতি এবং অন্যান্য গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হইত। একজন ছোটলাট নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই অবস্থার বেশ একটু পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয় এবং তখন হইতেই অবস্থা স্থায়ী উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।"

হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, নদীয়া, যশোহর, খুলনা, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলাগুলি ডাকাতদের প্রধানকেন্দ্র ছিল এবং ডাকাতগণ নদীবহুল স্থান দিয়া ডাকাতি করিয়া এমন ভাবে পলায়ন করিত যে, তাহাদিগকে ধরা একপ্রকার অসাধ্য ছিল বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। ১৮৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দের 'বেঙ্গল এডমিনিষ্ট্রেশান রিপোর্টে' এই সমস্ত ডাকাতির বিষয় সবিস্তারে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। স্থলপথে ডাকাতি দমন করিবার পর জল পথে ডাকাতি দমন করিতে সরকারকে যে কিরূপ বেগ পাইতে হইয়াছিল, তাহা উক্ত রিপোর্ট এবং 'Selections from

the records of the Bengal Government' নামক গ্রন্থ পাঠ না করিলে সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে না। নিম্নে পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে **The Bengal Administration Report (1859-60)** হইতে অংশ বিশেষের ভাবানুবাদ প্রদত্ত হইল : ...

"ভারতীয় অপরাধের মধ্যে দলবদ্ধভাবে লুটতরাজ বা ডাকাতি করা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল, কিন্তু ইহা বিভিন্ন জেলায় বিভিন্নরূপে অনুষ্ঠিত হইত। আরাকান, চট্টগ্রাম এবং ত্রিপুরায় যে সমস্ত ডাকাতি হইত, সেখানে সাধারণতঃ অসভ্য পার্ব্বত্যজাতিরা অতর্কিতভাবে আক্রমণ ও লুটতরাজ করিত। দুর্গম পর্ব্বতশ্রেণী ও গভীর অরণ্য ছিল তাহাদের আশ্রয়স্থল, এবং তাহাদের কার্য্যের প্রতিকারের কোন উপায়ই ছিল না।

কিন্তু এই সমস্ত পার্ব্বত্য উপজাতিদের সঙ্গে বাংলাদেশের ডাকাতদের কোনরূপ সাদৃশ্য ছিলনা। লাঠি, তরবারি এবং মশাল লইয়া ইহারা কোন অসহায় পরিবার, বা জলপথে নৌকা আক্রমণ করিত। ইহারা নিতান্ত ভীরু ছিল এবং সামান্য বাধা পাইলেই পলাইয়া যাইত।

এক শ্রেণীর ডাকাতের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান এখনও পর্য্যন্ত ফলপ্রসূ হয় নাই—তাহারা হইতেছে জলদস্যু। নদীবহুল বাংলাদেশে চলাচলের পক্ষে নদী পথই প্রশস্ত এবং লুটতরাজ করিবার পক্ষে ইহা তাহাদের খুবই অনুকূল। এই সমস্ত ডাকাতদের খুঁজিয়া বাহির করিতে অনেক বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। স্থলদেশে তাহাদের পশ্চাদানুসরণ করা সহজ কিন্তু জলপথে তাহা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার।"

যাহা হউক 'ডাকাতি দমন বিভাগের' কমিশনারের চেষ্টায় পূর্ব্বোক্ত জেলাগুলি হইতে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ হইতে ডাকাতির সংখ্যা যে অনেক হ্রাস পায়, তাহা পর পৃষ্ঠার তালিকাটি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে।

বৎসর		ডাকাতির সংখ্যা
১৮৫২	...	৫২০
১৮৫৬	...	২৯২
১৮৫৮	...	১৯০
১৮৫৯	...	১৭১

বহু চেষ্টার পর, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে জলপথে এবং স্থলপথে ডাকাতি আস্তে আস্তে এক প্রকার বন্ধ হইয়া যায়; বঙ্গের বহু প্রসিদ্ধ ডাকাত ধরা পড়ে এবং বহু ধনী ব্যক্তি ও জমিদার অতঃপর 'ভদ্র' সাজিয়া সমাজে শান্ত হইয়া পূর্ব্ব অর্জিত লুণ্ঠিত দ্রব্য ভোগ করিতে লাগিলেন, দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিল; বঙ্গবাসীর ধন প্রাণ সরকারের দয়ায় নিরাপদ হইল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেশের কি ইহাতে মঙ্গল হইয়াছে? সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতির মধ্যে এক-শ্রেণীর দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি এইরূপ দুর্দ্দমনীয় কার্য্য চিরকাল করিয়া থাকে; শান্তিপ্রিয় কোন সমাজ বা রাষ্ট্র তাহা পছন্দ করেন না। কিন্তু স্বাধীন দেশ এই সমস্ত দুর্দ্দান্ত ব্যক্তিগণকে নানাবিধ প্রলোভন দেখাইয়া চাকুরী দিয়া সৈন্য বিভাগে ঢুকাইবার চেষ্টা করেন এবং তাহারাই দেশরক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া থাকে, যুদ্ধ বিগ্রহের সময় হাসিমুখে মরণ বরণ করিয়া বীর (martyr) বলিয়া আখ্যাত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরাধীন বঙ্গদেশে বাঙ্গালী জাতিকে সুখে শান্তিতে বসবাস করাইবার জন্য বিদেশী সরকার ডাকাতি দমন করিয়া আপাতঃ দৃষ্টিতে দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হইলেও, বাঙ্গালী জাতির যে মেরুদণ্ড সেই সময় হইতেই সরকার বাহাদুর ভঙ্গ করিয়া দিয়াছেন, তাহা কে অস্বীকার করিবে? আমেরিকার চতুষ্পার্শ্বের জলদস্যুগণকে যুক্তরাষ্ট্র যে ভাবে রাষ্ট্রের কাজে লাগাইয়াছেন, আজ যদি বঙ্গের সেই সমস্ত বীর সাহসী সন্তানগণকে, যাঁহারা বহু বৎসর ধরিয়া ইংরাজ পক্ষের সশস্ত্র সিপাহীগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া ছিল, তাহাদিগকে প্রকৃত দেশের কাজে

লাগান যাইত, তাহা হইলে বঙ্গদেশের রূপ অন্যরকম হইত এবং বাঙ্গালী জাতিও আজ একটি 'সামরিক জাতি'তে পরিগণিত হইতে পারিত। কিন্তু বাঙ্গলার ক্ষাত্রশক্তিকে বেয়নেটের দ্বারা পঙ্গু করাতে বঙ্গদেশ হইতে ডাকাতি চিরতরে বন্ধ হইয়াছে বটে; কিন্তু দেশের তাহাতে প্রকৃত কল্যাণ হইয়াছে কি-না, তাহা আজ আমরা ঠিক বুঝিতে পারিব না; আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ এই গুরুতর বিষয়টির মীমাংসা করিবেন।

হুগলী জেলার অন্তর্গত তারকেশ্বর থানার অধীন কোটালপুর গ্রাম নিবাসী স্বামী উত্তমানন্দ এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। গৃহাশ্রমে তিনি ছেত্রী জাতীয় ছিলেন, পরে সংসার ত্যাগ করিয়া ডুমুরদহে তিনি "উত্তম আশ্রম" প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমানে এই আশ্রমের অধীনে একটি টোল, চিকিৎসালয় এবং যাত্রীনিবাস আছে।

উত্তম আশ্রম

গঙ্গার তীরে এই আশ্রমটি অতি মনোরম এবং ভারতের বহু স্থান হইতে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ ইহা দর্শন করিতে আসেন। স্বামী উত্তমানন্দের দেহ-রক্ষার পর তাঁহার নশ্বরদেহ যে স্থানে সমাহিত করা হয়, তথায় একটি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহাও ডুমুরদহের দর্শনীয় বস্তু। স্বামী উত্তমানন্দের পর স্বামী ধ্রুবানন্দ প্রধান আচার্য্য পদে ব্রতী হন; সম্প্রতি তিনিও লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার সমাধির উপরও একটি মন্দির হইয়াছে।

বর্ত্তমান আচার্য্যের নাম স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। পূর্ব্বে এই স্থানের নিকট-বর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেশনটির নাম খামরাগাছি ছিল, বর্ত্তমানে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের চেষ্টায় ডুমুরদহে একটি রেলওয়ে ষ্টেশন হইয়াছে। তাঁহার চেষ্টায় ডুমুরদহে পোষ্টাফিস এবং একটি উচ্চ বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে।

প্রাতে পূজা, হোম, যাগ-যজ্ঞ এবং সন্ধ্যায় আরতির পর গীতা পাঠের বৈশিষ্ট আছে। আশ্রমবাসীগণ প্রত্যেকে আরতির পর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া সমস্বরে গীতা পাঠ করেন। বঙ্গের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উত্তম আশ্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন প্রত্যেক বাঙ্গালীর এই আশ্রমটি দর্শনীয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বঙ্গসাহিত্যে হুগলী জেলার স্থান

মানব সমাজকে বিমোহিত করিবার শ্রেষ্ঠ উপকরণ কবিতা—সেইজন্য জগতের সকল সাহিত্যের প্রথম উৎপত্তি কাব্যে হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। সুদূর অতীতকাল হইতে কাব্যই ছিল আমাদের এই দেশে রচনার একমাত্র বাহন; ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, স্থাপত্য এমন কি চিকিৎসা ও অঙ্কশাস্ত্রও তৎকালে কাব্যে রচিত হইত। আর্য্যজাতির প্রথম ভাষা বেদে, তারপর রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলির ভাষা সংস্কৃত, সংস্কৃতের পর বৌদ্ধদিগের পালি ও গাথা প্রভৃতি প্রাকৃত। প্রাকৃত হইতেই আধুনিক বঙ্গভাষার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বঙ্গভাষার ক্রম বিকাশ ও পরিণতির ইতিহাস আলোচনা করিলে, সেই দিনের অসম্পূর্ণ ও অগঠিত সদ্য উদ্গত অঙ্কুর কি ভাবে পূর্ণাঙ্গ ও সুগঠিত বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। যাঁহারা এই ভাষাকে ঋদ্ধিমতী করিয়া অপরূপ রূপমাধুর্য্যে বিকশিত করিয়াছেন—তাঁহারা আমাদের বরণীয় স্মরণীয় ও প্রণম্য। হুগলী জেলার বিশেষ সৌভাগ্য যে, এই স্থানেই আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের সর্ব্ব প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে বঙ্গভাষা পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার মধ্যে পঞ্চম, বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় এবং ভারতের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। বঙ্গভাষার ন্যায় ঐশ্বর্য্য, আন্তর্জ্জাতিক স্বীকৃতি, অসাম্প্রদায়িকতা সহজবোধ্যতা এবং সংখ্যাধিক্য ভারতের আর কোন ভাষার নাই।

ভাষাবিদ্গণের অভিমত যে, বঙ্গভাষা প্রাকৃত হইতে উৎপত্তি লাভ

করিয়াছে। 'বঙ্গ' শব্দের প্রাচীনতম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ঐতরেয় আরণ্যকে। জাতিতত্ত্বে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন যে, যাযাবর 'বঙ্গ' নামক জাতি হইতে দেশবাচক বঙ্গ নামের উৎপত্তি হইয়াছে। উক্ত যাযাবর বঙ্গ-জাতি পূর্ব্বদিকে হটিতে হটিতে পূর্ব্ব-বঙ্গে স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন এবং তাহাদের নামানুসারেই এই দেশের নাম বঙ্গদেশ হইয়াছিল। বঙ্গদেশ অনার্য্যদিগের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল বলিয়া, এই দেশে আগমন ও বসতি আর্য্য-দিগের নিষিদ্ধ ছিল। বঙ্গদেশে আর্য্যদিগের প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয় বরেন্দ্র ভূমিতে। ব্যাপকভাবে উপনিবেশ স্থাপন মৌর্য্যযুগে আরম্ভ হয় এবং যাহারা উপনিবিষ্ঠ হন তাহারা সকলেই জৈন মতাবলম্বী ছিলেন। জৈনধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথম প্রবেশলাভ করিলেও এই ধর্ম্ম এ দেশে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই, কারণ বঙ্গদেশে তখন অসভ্য জাতির প্রাধান্য ছিল। জৈন ধর্ম্মের পর বৌদ্ধধর্ম্ম এবং পরিশেষে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, ধীরে ধীরে এই স্থানে প্রাধান্য লাভ করিল।

বঙ্গদেশের আসল বাসিন্দারা দ্রাবিড় বা অস্ট্রিক শাখার অন্তর্গত ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিত। অঙ্গ ও মগধ বঙ্গদেশের নিকটতম প্রদেশ সুতরাং ঐ দেশের উপনিবেশকারিগণ ক্রমশঃ বঙ্গদেশে আসিয়া স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহাদের দ্বারাই আর্য্যভাষা বঙ্গদেশে আনীত হয়। গুপ্ত সম্রাটদিগের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে আর্য্যভাষী হইয়া গিয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ্ বঙ্গদেশ পরিভ্রমণের সময় গৌড়-বঙ্গ-কামরূপ-রাঢ়ে এক ভাষা বলিতে শুনিয়াছিলেন। সুতরাং ঐ সময়ে অনার্য্য ভাষাগুলি যে দূরীভূত হইয়া গিয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত।

উপনিষদের ভাষা ভাঙ্গিয়া যে ভাষা সর্ব্বপ্রথম উৎপত্তি লাভ করে তাহা পালি ভাষা। এই পালি ভাষা হইতে চারি প্রকার প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব হয়—যথা মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, পৈশাচী ও মাগধী। বঙ্গদেশে মগধ হইতে

অধিকাংশ উপনিবেশকারী আসিয়াছিল বলিয়া তাহারা যে প্রাকৃত ভাষায় কথা-বার্ত্তা বলিত তাহাকে মাগধী-প্রাকৃত বা পূর্ব্ব-প্রাকৃত বলা হইত। আনুমানিক ৯৫০ খৃষ্টাব্দে উক্ত মাগধী প্রাকৃতের ধ্বনি অবলম্বনে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট লইয়া বঙ্গভাষার উৎপত্তি হইল।

বঙ্গভাষা নবকলেবরে রূপান্তরিত হইবার পর দশম শতাব্দীতে কানু ভট্ট বাঙ্গলা ভাষায় প্রথম গ্রন্থ 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' রচনা করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের নব প্রভাতের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। তারপর একহাজার বৎসরের অধিক-কাল ধরিয়া শত-সহস্র শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক যে ভাবে এই ভাষাকে সজীব, স্নিগ্ধ ও ঋদ্ধিমতী করিয়াছেন, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনা না করিয়া কেবলমাত্র কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্বর্গীয় এণ্ডারসন সাহেব "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে দুইটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য আছে—প্রথমটী ইংরাজী আর দ্বিতীয়টী বাঙ্গলা" বলিয়া যাহা বিলাতের 'টাইমস' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখ করিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে।

পঞ্চম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাচীনতম বাঙ্গলা ভাষার নমুনা কয়েকটি শিলা লিপি ও প্রাচীন পুস্তকে ব্যবহৃত কয়েকটি স্থানের নাম ব্যতীত আর কিছু দৃষ্ট হয় না। ইহার পরেই **চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন' ও রমাই পণ্ডিতের 'শূণ্য পুরাণ'** বঙ্গভাষার নমুনা হিসাবে প্রথমে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থগুলি চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'ও দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গভাষা হইতে সংস্কৃতে রূপান্তরিত হয় বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

পরবর্ত্তীকালে মহাপ্রভুর কৃপা কটাক্ষে বঙ্গভাষা তাঁহার অসংখ্য প্রেমিক ভক্ত কর্ত্তৃক নানা অলঙ্কারে সুশোভিত হইয়া বর্ত্তমান কমনীয় রূপ ধারণ করিয়াছে। মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ **শ্রীমদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী** সপ্তগ্রামের অধিপতি গোবর্দ্ধন দাসের একমাত্র পুত্র; তিনিও বুদ্ধদেবের ন্যায় স্ত্রী, রাজ্য, পিতামাতা ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করেন এবং বহু গ্রন্থ

প্রণয়ন করেন। তাঁহার নিকট হইতেই শ্রবণ করিয়া ঝামটপুর নিবাসী **কৃষ্ণদাস কবিরাজ** বৈষ্ণবদিগের অমূল্য গ্রন্থ **'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'** রচনা করেন। নিম্নে সপ্তগ্রামের রাজপুত্র শ্রীমদ রঘুনাথ দাস রচিত একটি 'পদ' উদ্ধৃত হইল। রঘুনাথ দাস সম্বন্ধে পৃষ্ঠায় বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে বলিয়া এস্থলে আর তাহার পুনরুল্লেখ করা হইল না।

"আর এক কহি কথা সহোদর বন্ধু সখা দুই চারি জন মোর আছে।
কহি শুন তার কথা পাছে হেট কর মাথা ননী চুরি কর যার কাছে॥
যত সব গোপ নারী লইয়া দধির পসারি মথুরার দিকে যায় তারা।
পথ আগোরিয়া রও দধি দুগ্ধ কাড়ি খাও একি তোমার অনুচিত ধারা॥
নারীগণ স্নান করে বসন রাখিয়া তীরে চুরি করি রহ লুকাইয়া।
বাজাইয়া মোহন বাঁশী কুলবধূ কর দাসী কথা কহ হাসিয়া হাসিয়া॥
খাওয়াব পরের খন্দ এখনি করিব বন্দ লইয়া যাব কংসের গোচরে।
দাস রঘুনাথ কয় শুনিতে লাগএ ভয় চমকিত হইল যদুবীরে॥"

এই সম্বন্ধে রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন :

"'With the advent of Chaitanya Dev, this literature at once shook off all its coarse elements and flourished in all the genuine wealth of true poetry and learning. Scholars reputed far and wide for their learning in Sanskrit began to write books in Bengali and Bengali poems were found of such merit and elegance that learned Pandits came forward to annotate them in Sanskrit" *

Sir George Grierson লিখিয়াছেন—"They became great favourites of the more modern Vaisnava reformer of Bengal—Chaitanya, and through him songs purporting to be by Vidyapati have become as well known in Bengali households as the Bible is in an English one."

* Vanga Sahitya Parichaya.

প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মের প্রবল বন্যায় লৌকিক পূজা-পদ্ধতির মহিমা সমন্বিত কাব্যগ্রন্থগুলি সাময়িকভাবে বিলুপ্ত হইলেও, পরে রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডীর গান, মনসার ভাসান প্রভৃতি পুস্তকগুলি সুসংস্কৃত হইয়া প্রকাশিত হয়। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গ সাহিত্যের এই যুগকে 'সংস্কার যুগ' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। বঙ্গ সাহিত্যে সংস্কার যুগের তিন জন প্রধান ব্যক্তি কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, কাশীরাম দাস, ও ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তারকেশ্বরের অনতিদূরে দামুন্যা গ্রামে খৃষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে জন্ম গ্রহণ করেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ সাত পুরুষ যাবৎ উক্তস্থানে বসবাস করিতেছিলেন, কিন্তু মামুদ সরিফ নামক এক ডিহি-দারের অত্যাচারে তিনি তাঁহার প্রিয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর জেলার আড়রা গ্রামের জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে তাহার চণ্ডী কাব্য রচনা শেষ হয়। মুকুন্দরাম বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ও সুপ্রসিদ্ধ কবি এবং তাঁহাষ 'চণ্ডীকাব্যে' ভগবতীর পৃথিবীতে পূজা প্রচারার্থে কালকেতু ব্যাধের ও শ্রীমন্ত সওদাগরের দুইটি বৃহৎ উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের নানা নদ নদী, গ্রাম, নগর, ও অরণ্য প্রভৃতির সুন্দর বর্ণনা এবং নানা লোকের বিভিন্ন প্রকারের স্বভাব, কবি এই কাব্যে সুললিত ভাষায় চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার এই কাব্য হইতে তৎ-কালীন সমাজের ও প্রসিদ্ধ স্থানের বহু বিচরণ অবগত হওয়া যায় এবং ঐতিহাসিকগণ তাঁহার এই কাব্যের সাহায্যে বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। যতদিন বঙ্গসাহিত্য থাকিবে ততদিন মুকুন্দরামের নাম অমর হইয়া থাকিবে।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ই, বি, কাউয়েল কবিকঙ্কন মুকুন্দ-রামের চণ্ডীর ভক্ত ছিলেন এবং তিনি উক্ত চণ্ডীর অংশ বিশেষ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং কোন ভদ্রলোক তাঁহার নিকট যাইলে, তিনি

উহা মুখস্ত বলিতেন। তিনি মুকুন্দরামকে বিলাতের কবি চসার(Chaucer) এবং ক্রেবের (Crabbe) সহিত তুলনা করিতেন।*

কাশীরাম দাস ১০০০ সালে বঙ্গভাষায় মহাভারত রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং ১০১১ সালে মহাভারতের বিরাট পর্ব্বখানি শেষ করেন। পণ্ডিত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ১৩০৭ সালের 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়' কাশীরাম দাসের বিরাট পর্ব্বের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে "চন্দ্রবান পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়" অর্থাৎ ১৫২৬ শকে (১০১১ সালে) বিরাট পর্ব্ব সমাপ্ত হয় বলিয়া জানা যায়। বিরাট পর্ব্ব রচনা করিয়া ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আহত হইয়া তিনি পরলোকগমন করেন। পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর ও ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম এবং আত্মীয় ভৃগুরাম এই তিন জনে মিলিত হইয়া মহাভারতের অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন।

তাঁহার মহাভারতে বিরাট পর্ব্বের শেষে লিখিত আছে :

আদি, সভা, বন, বিরাট, রচিয়া, পাঁচালী।
যাহা শুনি সর্ব্বলোকে অতি কুতূহলী॥
পূর্ব্বে তেঁই আরম্ভিয়া ছিল এই পুঁথি।
কাল বশে মৃত্যু তাঁর হৈল দৈবগতি॥"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কাশীরামের মহাভারত এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণকে জাতির মনের খাদ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন"মহানদী যেমন সকল দেশে নাই তেমনই মহাকাব্য পৃথিবীর অতি অল্প জাতির ভাগ্যেই জুটিয়াছে। আবার যে দেশের মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত সে দেশের সৌভাগ্যের আর অন্ত নাই।"

কবির জন্মস্থান লইয়া বর্ত্তমানে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু কবির জন্মস্থান হুগলী জেলার 'সিদ্ধি' গ্রাম

---

* Literature of Bengal—By R. C. Dutta. P IV (1895)

বলিয়া লিখিয়াছেন; কিন্তু কেহ কেহ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত 'সিদ্ধি' গ্রাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কবি যে সময় জন্মগ্রহণ করেন সে সময় হুগলী জেলা বলিয়া কোন জেলা হয় নাই—১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া হুগলী জেলা গঠিত হয় এবং বর্দ্ধমান জেলা দুই ভাগে বিভক্ত হয়। বর্দ্ধমান জেলার উত্তর ভাগ বর্দ্ধমান এবং দক্ষিণ ভাগ হুগলী বলিয়া তদবধি কথিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং 'চুল-চিরিয়া' তাহার জন্মস্থান কোন জেলায় তাহা নির্ণয় করা বর্ত্তমানে সম্ভব নয়। তবে তিনি যে দক্ষিণ রাঢ়ে (এই নামে তৎকালে হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই।

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর হুগলী জেলার ভুরসুট পরগণায় ১৬৩৪ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ভুরসুট পরগণা সেই সময় বর্দ্ধমানের মহারাজা কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইলে, তিনি দেবানন্দপুর গ্রামের জমিদার দত্তমুন্সী মহাশয়গণের আশ্রয়ে থাকিয়া পারসী ভাষা অধ্যয়ন করেন; পরে নদীয়াধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় সভাপণ্ডিত হন। অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, রসমঞ্জরী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি 'রায়গুণাকর' উপাধি প্রাপ্ত হন।

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত ভারতচন্দ্র রায় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

"Bharat is a close immitator of Mukunda Ram. In character painting, however, Bharatchandra can not be compaired with the great master whom he has imitated."

কবি ভারতচন্দ্র ১৬৮২ শকাব্দে মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে গতাসু হইলেও, তাঁহার কাব্যগ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে তাহাকে অমর করিয়া রাখিবে। বাঙ্গলা নাটক রচনার তিনি পথ প্রদর্শক; চণ্ডী তাঁহার প্রথম নাটক। এই সম্বন্ধে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত হইল:

প্রথম বাঙ্গলা নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি দেবানন্দপুরবাসী ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। "চণ্ডী"ই তাহার প্রথম প্রচেষ্টার সুফল। কিন্তু ইহা একখানি বিমিশ্র নাটক। ইহাতে বাঙ্গলার ভাগ খুবই কম। ইহার চরিত্রগুলি চণ্ডী, মহিষাসুর ও প্রজাগণ। তাহারা কথা বলে বাঙ্গলা ভাষায় কিন্তু তাহা অতি দুর্ব্বোধ্য। সংস্কৃত, ফারসী, প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষারও অবতারণা আছে। ভারতচন্দ্র ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। সূত্রধর বলে সংস্কৃত ভাষায়, নটী বলে বাঙ্গলা ও প্রাকৃতে। সূত্রধরের স্তব এইরূপ :

"সা দুর্গা দশদিক্ষু
বঃ কলয়াতু শ্রেয়াংসি
নঃ শ্রয়সে—"

অতঃপর সূত্রধর "রাজ্ঞোহস্য প্রমিতামহো নরপতী রুদ্রোহভবাদ্রাঘব" প্রভৃতি কথায় কৃষ্ণচন্দ্রের বংশপরিচয় ও ভারতচন্দ্রের প্রতি রাজানুগ্রহের পরিচয় দেন। নটী বলিতেছে বাঙ্গলা কথায় :

"শুন শুন ঠাকুর, নৃত্য বিশারদ
সভাসদ সারী চতুরী
নূতন নাটক নূতন কবিকৃত
হাম তোঁহি নূতন নারী।"

চণ্ডীর প্রতি উল্লেখ করিয়া মহিষাসুর বলিতেছে :

"ভাগেগা দেবদেবী পাখর পাখর ইন্দ্রকো বাঁধ আগে।
নৈঋতকে রীত দেনা যমঘর যমকো আগকে আগলাগে" ॥

তারপরে আবার মহিষাসুর প্রজাগণকে বলিতেছে :

"শোন্‌রে গোঁয়ার লোগ, ছোড়দে উপাস রোগ,
মানহোঁ আনন্দ ভোগ ভৈঁষরাজ যোগমে।

আগ্‌মে লাগাও ঘীউ, কাহেকো জলাও জীউ,
এক রোজ প্যার পিউ, ভোগ এহি লোগ মে।
আপ কো লাগাও ভোগ, কাম্‌কো জাগাও যোগ,
ছোড় দেও যোগ ভোগ, মোক্ষ এহি লোগ্‌মে।
ক্যা এগান ক্যা বেগান, অর্থ নার আর জান,
এহি ধ্যান এহি জ্ঞান, আর সর্ব্ব রোগ মে॥"

তাহাতে চণ্ডীর ক্রোধ ও হাস্য; তাঁহার কথা এইরূপ:

"—কমঠ করটট, ফণী ফণা ফলটট
দিগ্‌গজ উলটট ঝগটট ভ্যায়রে।
বসুমতী কম্পত গিরিগণ নম্রত
জলনিধি কম্পত বাড়ব ময়রে"। *

'চৈতন্যমঙ্গল' রচয়িতা জয়ানন্দ তাঁহার গ্রন্থে বঙ্গ সাহিত্যের একটি সুন্দর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, উহা পাঠ করিলে তৎকালীন ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের সাহিত্যের বিষয় অনেক কথা অবগত হওয়া যায়। নিম্নে উক্ত কবিতাটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল:

"চৈতন্য অনন্তরূপ অনন্তাবতার।
অনন্ত কবীন্দ্র গায়ে মহিমা যাঁহার॥
রামায়ণ করিল বাল্মিকী মহাকবি।
পাঁচালী করিল কৃত্তিবাস অনুভবি॥
শ্রীভাগবত করিল ব্যাস মহাশয়।
গুণরাজ খাঁন কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয়॥

* বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত—ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পৃষ্ঠা—৩-৪

জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র তারা করিল প্রকাশ ॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ব্যাস অবতার।
চৈতন্য চরিত্র আগে করিল প্রকাশ ॥
চৈতন্য সহস্রনাম শ্লোক প্রবন্ধে।
সার্ব্বভৌম রচিল কেবল প্রেমানন্দে ॥
শ্রীপরমানন্দপুরী গোসাঞিমহাশয়ে।
সংক্ষেপে করিল তিঁহ গোবিন্দ বিজয়ে ॥
আদি খণ্ড মধ্য খণ্ড শেষ খণ্ড করি।
শ্রীবৃন্দাবন দাস রচিল সর্ব্বোপরি ॥
গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী।
সংগীত প্রবন্ধ তার পদে পদে ধ্বনি ॥
সংক্ষেপে করিলেন তিনি পরমানন্দ গুপ্ত।
গৌরাঙ্গ বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত ॥
গোপাল বসু করিলেন সংগীত প্রবন্ধে।
চৈতন্য মঙ্গল তার চামর বিচ্ছন্দে ॥
ইবে শব্দ চামর সংগীত বাদ্য বসে।
জয়ানন্দ চৈতন্য মঙ্গল গাত্র শেষে ॥

মহাপ্রভূর পর নদীয়াধিপতি বিদ্যোৎসাহী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের যত্নে বঙ্গভাষায় বহুশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হইবে না। কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় দুইটি রত্ন ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ স্বীয় জ্যোতিঃ বিকিরণ করিয়া যে ভাবে ভাষা জননীকে উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহাদের সময়ে বঙ্গভাষা হইতে গ্রাম্যভাব বিদূরিত হইয়া ইহা রসাশ্রিত অলঙ্কারবহুল

সুললিত ভাবময় এক মধুর ভাষায় পরিণত হয়। ইহাদের পর দাশরথি রায় পাঁচালী রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন।

বঙ্গসাহিত্যের এই নয় শত বৎসরের ইতিহাসে গদ্যের স্থান নাই; গদ্যে পদ্যে মিশ্রিত কিছু রচনা প্রাচীন গ্রন্থাদিতে লিখিত আছে এবং ঐগুলিকেই বাঙ্গলা গদ্যের আদিমতম নমুনা বলিয়া ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নগেন্দ্র নাথ বসু সপ্তদশ শতাব্দীর একখানি পুথি হইতে সম্পাদনা করিয়া, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে 'শূন্যপুরাণে'র যে মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ভাঙ্গা গদ্যকেই বঙ্গভাষার প্রথম গদ্য বলিতে হয়; নিম্নে প্রথম গদ্যের নমুনা শূন্যপুরাণ হইতে উদ্ধৃত হইল :

"কোন মাসে কোন রাসি। চৈত্র মাসে মীন রাসি। হে কালিন্দিজল বার ভাই বার আদিও। হস্তপাতি লহ সেবকর অর্ঘ পুষ্পপানি। সেবক হব সুখি আমনি ধামাৎ কন্নি। গুরু পণ্ডিত দেউল্যা দানপতি। সারস্বর ভোক্তা অমনি।"

মুদ্রাযন্ত্রের সহিত সাহিত্যিক উন্নতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে; ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরা বঙ্গদেশের আধিপত্য লাভ করিয়া এই দেশের দেওয়ানী ভার গ্রহণ করেন। সেই সময় কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের বঙ্গভাষা না জানায় বিশেষ অসুবিধা হয়। এমন কি দেশীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ থাকায় কটকের তৎকালীন সভাপতি মিঃ ব্রিষ্টোকে (**Mr Bristow**) অপসারিত করা হইয়াছিল বলিয়া অপ্রকাশিত সরকারী রেকর্ডে (**No 355—Cousultations, July 3**) লিখিত আছে।* সেই জন্য কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্রান্সিস গ্লাডউইন, নাথানিয়েল হালহেড এবং চার্ল্স উইলকিন্স

---

* **Selections from Unpublished Records of the Government. Vol I, Page. 146.**

প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস তাহাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। প্রগাঢ় অভিনিবেশের ফলে হুগলীর তৎকালীন সিভিল কর্ম্মচারী হালহেড সাহেব অল্প দিনের মধ্যে এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করেন যে, ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংরাজদের শিক্ষার নিমিত্ত একখানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন; এই ব্যাকরণ খানিই বাঙ্গলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। ইহাতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, ভারত চন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের অংশ বিশেষ বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রিত হয়। কিন্তু তিনি কোন গদ্য সাহিত্যের উদাহরণ দিতে পারেন নাই বলিয়া গদ্যের নিদর্শন স্বরূপ "জগতধির রায়" লিখিত (১১ই শ্রাবণ ১১৮৫) একখানি পত্র উদ্ধৃত করেন।

বঙ্গ সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি উক্ত ব্যাকরণের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন 'থিউসিডাইডের পূর্ব্বে গ্রীস দেশের সাহিত্যের যে দশা ছিল, বঙ্গীয় সাহিত্যেরও এখন সেই দশা। গ্রন্থকারগণ কেবল পদ্যেই পুস্তক রচনা করিয়া আসিতেছেন। গদ্য রচনা এ দেশের সাহিত্যে একবারেই অপ্রাপ্য। বিষয় কার্য্যের চিঠি পত্র, আবেদন এবং বিজ্ঞাপনী (ইস্তাহার) প্রভৃতি অবশ্য পদ্যে লিখিত হয় না, কিন্তু এই সকল রচনাতেও গদ্যের কোন নিয়ম নাই, ব্যাকরণ সঙ্গত বাক্য গ্রন্থনের কোন প্রণালী নাই। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মতত্ত্ব বল, ইতিহাস বল, নীতি কথা বল, সে সকল বিষয়ে পুস্তক রচনা করিলে গ্রন্থকারগণের নাম চিরস্মরণীয় হয়, তৎ সমস্তই পদ্যে লিখিত হইয়া আসিতেছে।"

হালহেড কৃত "A Grammer of the Bengal Langnage" হুগলী হইতে এণ্ড্রুস নামক জনৈক ইংরাজের দ্বারা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। চার্লস উইলকিন্স উক্ত পুস্তকের জন্য কাষ্ঠখণ্ডে অক্ষর খোদাই করিয়া দেন। পরে তিনি বড়া নিবাসী পঞ্চানন কর্ম্মকারকে অক্ষর খোদাই করিবার প্রণালী শিখাইয়া দেন।

উইলকিন্স সাহেব (যিনি পরে সার চার্লস উইলকিন্স নামে খ্যাত হন) নিজ হস্তে প্রথমে বাঙ্গলা মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করেন। তৎপর পঞ্চানন কর্ম্মকার নামক এক ব্যক্তিকে ছেনী প্রস্তুত করিবার পন্থা শিখাইয়া দেন। ১৭৮৫ অব্দে ইলাইজা ইম্পের সংগৃহীত ইংরেজী ব্যবস্থা সকল জোনাথন ডনকেন সাহেব কর্ত্তৃক বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া কোম্পানীর যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। কিন্তু বাঙ্গলা মুদ্রাক্ষর সৃষ্টির দিবস হইতে সাত বৎসর কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা মুদ্রাক্ষরের কিঞ্চিত মাত্র উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয় নাই।" *

ইংরাজদিগের শিক্ষার জন্য হালহেড সাহেবের ব্যাকরণ কিরূপ প্রণালীতে লিখিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার একটী নিদর্শন উদ্ধৃত হইল :

"আর বান এড়ে বীর পূরিয়া সন্ধান।
দুশ্বাসনের অঙ্গ কাটি করে খান খান ॥"

Aar baan are beer pooreeyaa sondhan,
Dhooshwaasonan unga kaatee kare khaan khaan. (f.s)

"The hero having well pointed his aim shot another arrow cutting the body of Dooshwaason hewed it in pieces. In this Distich the word বান baan, সন্ধান Sondhaan, অঙ্গ ungo, and খান খান khaan khaan are in the passive or subjective case." †

বাঙ্গলা গদ্যের প্রথম মুদ্রিত নমুনা হালহেড সাহেবের ব্যাকরণে যাহা আছে, তাহাও এই স্থলে উল্লিখিত হইল ; ইহা হইতে তৎকালীন বাঙ্গলা গদ্যের রীতি ও প্রকৃতি দেখা যাইবে। পত্রখানি বাঙ্গলায় লিখিত হইলেও আরবি ও ফারসী শব্দের বাহুল্যে ইহার মর্ম্ম অনুধাবন করা অসম্ভব।

"৭ শ্রী রাম—

গরিবনেওয়াজ শেলামত—

আমার জমিদারী পরগণে কাকজোল তাহার দুই গ্রাম দরিয়াশী কিশতী

* 'নববার্ষিকী' ১২৮৪ সাল, পৃষ্ঠা ১৪৪-১৪৫, প্রথম বর্ষ।

† A Grammer of the Bengal Language. Page-57.

হইয়াছে শেই দুই গ্রাম পয়শ্‌তি হইয়াছে চাকলে একবরপুরের শ্রীহরেকৃষ্ণ চৌধুরি আজ রায় জবরদস্তী দখল করিয়া ভোগ করিতেছে আমি মাল গুজারির শরবরাহতে মারা পড়িতেছি উমেদওয়ার যে সরকার হইতে আমিন ও এক চোপদার সরজমিনেতে পহুছিয়া তোরফেনকে তলব দিয়া লইয়া আদালত করিয়া হকদারের হক দেয়ালা দেন ইতি শন ১১৮৫ শাল তারিখ ১১।

ফিদবি

জগতিধর রায়"

হালহেড সাহেব রচিত ব্যাকরণ সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় 'হুগলী' নামক অধ্যায়ে 'বঙ্গভাষায় প্রথম মুদ্রিত পুস্তক' শিরোনামায় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রথম বাঙ্গলা অক্ষরের মুদ্রিত প্রতিলিপি

১৬৯২ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত একটি পুস্তকে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা অক্ষরের প্রতিলিপি মুদ্রিত হয় এবং ফাদার হষ্টেন ইহার প্রথম উল্লেখ করেন। **"2 maps and 1 plate containing the characters of the people of Bengala and Baramas."** * শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস লিখিয়াছেন বাঙ্গলা অক্ষরের দ্বিতীয় নমুনা পাওয়া যায় ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে লাটিন ভাষায় '**Aurenk Szeb**' নামক পুস্তকে; এই পুস্তকের ৪৮ পৃষ্ঠাতে ১ হইতে ১১ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সংখ্যা এবং ৫১ পৃষ্ঠায় বাঙ্গলা ব্যঞ্জনবর্ণ ও একটি জার্ম্মান নাম "শ্রী সরজন্ত বলপকাং মাএর" (**Sergeant Wolffgang Meyer**) বাঙ্গলা অক্ষরে ছাপা আছে। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দের পরে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে হলাঙ্গের লাইডেন নগর হইতে ডেভিড মিল লাটিন ভাষায় একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। উক্ত পুস্তকের শেষে হিন্দুস্থানী ভাষায় একটি

---

* **Bengal Past & Present, vol IX. Part-1, Page-40.**

ব্যাকরণ আছে; এই ব্যাকরণ অংশে বাঙ্গলা ও দেবনাগরী বর্ণমালার প্রতিলিপি মুদ্রিত আছে। সজনী বাবু তাঁহার বাংলা গদ্যের ইতিহাস নামক গ্রন্থে উক্ত প্লেটগুলি পুনঃমুদ্রিত করিয়াছেন।

ডেভিড মিল পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"আমি আরও দুইটি বর্ণমালা তাম্রফলকে খোদাই করিয়াছি—ব্রাহ্মণদিগের বর্ণমালার পরিচয় হিসাবে এখানি মূল্যবান বিবেচিত হইবে ··টেবল III Bতে যে ব্রাহ্মণ বর্ণমালা (Alphabetum Brahm. 111 B) অর্থাৎ বাঙ্গলা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সমগ্র ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যায় ব্যবহৃত হয়।" †

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে হালহেড সাহেব অনুদিত A Code of Gentoo Laws কনাম পুস্তকেও বাঙ্গলা ও হিন্দী বর্ণমালা মুদ্রিত আছে। পরে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে বাঙ্গলা হরফের জন্ম হয় এবং সেই সময় হইতেই বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের উন্নতি সুরু হয়।

"The first books in which Bengalee types were used was Halhed's Bengalee Grammer printed at Hooghly, at the press established by Mr. Andrews, a bookseller, in 1778.' *

প্রাচীনকালে বাঙ্গলা মুদ্রাক্ষর বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইত বলিয়া ডেভিড মিল লিখিয়াছেন। এই বিষয় অনুসন্ধান প্রয়োজন। বঙ্গদেশে মুদ্রাযন্ত্রের জন্য বাঙ্গলা ছাপার হরফ ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম নির্ম্মিত হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী দশ বৎসরের মধ্যে উহার কোন উন্নতি হয় নাই। স্যার চার্লস উইলকিন্স প্রাচীন পুথির অক্ষর এবং হুগলী

* বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস—শ্রী সজনীকান্ত দাস, পৃঃ ২০-২১

† The Life and times of Carey, Marshman and Ward Vol. 1. Page 159.

নিবাসী খুসমৎ মুন্সীর হস্তাক্ষর দেখিয়া অক্ষর প্রস্তুত কার্য্যে ব্রতী হন; পরে কালীকুমার রায় নামক এক ব্যক্তির সুন্দর হস্তাক্ষর দেখিয়া বর্ত্তমান মুদ্রাক্ষরের ছাঁচ সর্ব্ব প্রথম প্রস্তুত হয়।

"বাঙ্গলা মুদ্রাক্ষর সৃষ্টির দিবস হইতে সাত বৎসরকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা মুদ্রাক্ষরের কিঞ্চিৎমাত্র উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অতঃপর ফষ্টর সাহেব কর্ণওয়ালিসের ১৭৯৩ অব্দের ব্যবস্থা যখন সরল ও চলিত ভাষায় অনুবাদ করিয়া মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হন, তখন যে অক্ষরের প্রয়োজন হয়, পঞ্চানন কর্ম্মকার নূতন এক সেট তাঁমা নির্ম্মাণ করিয়া প্রস্তুত করেন। এই মুদ্রাক্ষর উৎকৃষ্ট বলিয়া তৎকালে বিশেস আদৃত হইয়াছিল। কালীকুমার রায় নামক এক ব্যক্তি সুছাঁদ লিখিতেন, তাহারই দেখিয়া বর্ত্তমান মুদ্রাক্ষরের ছাঁদ হইয়াছে। বাঙ্গলা মুদ্রাক্ষরের যাহা কিছু উন্নতি তাহা শ্রীরামপুরে সংসিদ্ধ হইয়াছে।" *

১২৩৭ সালে হালহেড সাহেবের মৃত্যু সংবাদ 'সমাচার দর্পণ' পত্রে প্রকাশিত হয়; নিম্নে উক্ত সংবাদটি উদ্ধৃত হইল, ইহা হইতেও প্রথম অক্ষর নির্ম্মাণের বহু বিয়য় অবগত হওয়া যাইবে।

"অপর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বাসকারি অন্য এক জন সাহেবের মৃত্যুর সংবাদ আমারদের প্রকাশ্য হইয়াছে বিশেষতঃ ইংলণ্ডদেশাগত সংবাদপত্রে লেখেন যে হালহেড সাহেব অতিবৃদ্ধ হইয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অনুমান হয় যে উক্ত সাহেব ইংলণ্ডীয়েরদের মধ্যে প্রথমেই বাঙ্গলা ভাষা সুশিক্ষিত হন এবং ঐ ভাষায় যে প্রথম গ্রামার হয় তাহা তিনিই প্রথমে প্রস্তুত করিয়া হুগলী নগরে ১৭৭৮ সালে মুদ্রিত করেন। এবং সেই পুস্তক যে বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত তাহা ভারতবর্ষে প্রথম প্রস্তুত অক্ষরেতে হয়। অনুমান হয় যে সেই অক্ষরের ছেনী উলকিন্স সাহেব আপন হস্তে প্রস্তুত করেন। এই অক্ষর অতি বৃহৎ বটে যেহেতুক তাহা এই

* 'নববার্ষিকী'—প্রথম বর্ষ, ১২৮৪ সাল, পৃষ্ঠা ১৪৪-১৪৫

সম্বাদ পত্রে মুদ্রাঙ্কিতাপেক্ষা তিন গুণ বড় কিন্তু তদনন্তর যে হরপ প্রস্তুত হইয়া গবর্ণমেণ্টের ১৭৯৩ সালের আইন মুদ্রিত হয় তদপেক্ষা তাহা উৎকৃষ্ট। সেই অক্ষর কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রস্তুত হয় তাহা আমরা নিশ্চয় করিতে অক্ষম। কিন্তু উলকিন্স সাহেব পঞ্চানন নামক এক ব্যক্তিকে শিক্ষা করান ইহা জ্ঞাত আছি অতএব ঐ অক্ষর দ্বারা প্রস্তুত হয় এমত অনুমান হইতে পারে।" †

ঊনবিংশ শতাব্দী বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের নবজাগরণের যুগ; এই নব যুগের অবতারণা করেন **শ্রীরামপুর মিশনের অধ্যক্ষ ডক্টর কেরী।** ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভ হইতেই বঙ্গবাসীগণের হৃদয়ে নানা বিষয়ে কর্ম্মনিষ্ঠার ভাব সঞ্চারিত হয়, কিন্তু সুযোগ ও সুবিধার অভাবে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। মুদ্রাযন্ত্রের সহিত সাহিত্যের উন্নতির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট; সেই মুদ্রাযন্ত্র হুগলীতে প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পরেই খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে একদল মিশনারী কলিকাতায় আগমন করেন। কিন্তু কলিকাতায় ইংরাজগণ তাহাদের আশ্রয় না দেওয়ায়, তাঁহারা দিনেমার শাসিত শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী কেরী সাহেব শ্রীরামপুরে আগমন করেন এবং শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা হয়। ২৫শে মে চুঁচুড়া নিবাসী রামরাম বসু এই মিশনে যোগদান করেন এবং এই মিশন হইতেই পরবর্ত্তী কালে গদ্য সাহিত্যের উদ্বোধন ও বিকাশ হইয়াছিল বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হইবে না।

"Serampore continued down till 1860 to be the principal Oriental type foundry of the East."*

বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে

† 'সমাচার দর্পণ', ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৩০

* The Life of William Carey by George Smith. Page 192.

পারে। বাঙ্গলা গদ্যের গোড়াপত্তন হইতে প্রাথমিক ইতিহাস পর্য্যন্ত 'প্রথমযুগ'; গদ্য সাহিত্যের গঠনকার্য্য 'মধ্যযুগ' এবং নবভাবে নূতন ছাঁচে বর্ত্তমান রূপ 'নবযুগ'। এই প্রথমযুগে কেরী সাহেব বঙ্গভাষকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া, গদ্য রচনার সৌকর্য্য সাধনে যে ভাবে চল্লিশ বৎসর যাবৎ তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে এবং বঙ্গবাসী চিরদিন কৃতজ্ঞচিতে তাহা স্মরণ করিবে; বঙ্গদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া বঙ্গবাসীগণকে খৃষ্টান করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেও, বঙ্গভাষার প্রতি প্রীতির জন্য, শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য করিতে পারেন নাই এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সেই জন্য তাঁহার হাত দিয়াই বঙ্গভাষার বিকাশ হইয়াছিল। তিনি নিজে শুধু যে ব্যাকরণ, অভিধান ও পাঠ্যপুস্তক প্রনয়ণ এবং সঙ্কলন করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি বাঙ্গালী পণ্ডিত ও তৎকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কেন্দ্র স্বরূপ ছিলেন এবং তাঁহারই প্ররোচনায় ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া একদল বাঙ্গালী লেখক গদ্যে লেখনী চালনা করিতে সুরু করেন।

তৎকালে বঙ্গদেশে শিক্ষার অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল এবং দেশে কোন উচ্চাঙ্গের বিদ্যালয় পর্য্যন্ত ছিল না। লর্ড ওয়েলেসলি দেশীয় ব্যক্তিগণের অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' স্থাপন করেন এবং কেরী সাহেব উক্ত কলেজের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই কলেজকে কেন্দ্র করিয়া কেরী সাহেবের যথার্থ সাধনা আরম্ভ হয়। দেওয়ান রামকমল সেন এই সম্বন্ধে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন:

In 1800 the College of Fort William was instituted and the study of the Bengalee language was made inperative on young civilions. Persons versed in the language were

invited by Government and employed in the instruction of the young writers, From this time forward writting Bengalee correctly may be said to have begun in Calcutta; a number of books were supplied by the Serampore Press which set the example of printing works in this and other eastern language...I must acknowledge here that whatever has been done towards the revival of the Bengalee Language its improvement. and in fact the establishing it as a language must be attributed to the excellent man Dr. Carey and his collegues, by whose liberality and great exertions many works have been carried through the press and the general tone of the language of this province so greatly raised. *

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে নিযুক্ত হইয়া কেরী সাহেব বাঙ্গলা পাঠ্য পুস্তকের জন্য বিশেষ অসুবিধায় পড়েন এবং তাহার চেষ্টায় দেশীয় পণ্ডিতগণের পুস্তক রচনায় সাহায্য করিবার জন্য কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ কতিপয় পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। কলেজ অধিবেশনের কার্য্য বিবরণে প্রকাশ:

RESOLVED that premiums shall be propsed to the learned native for encouraging literary works in the native language. †

১৮০১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে কলেজের বিভিন্ন বিভাগে পণ্ডিত, মৌলবী প্রভৃতির নিয়োগ মঞ্জুর হয় এবং কেরী সাহেবের অধীনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কলেজে নিযুক্ত হন।

প্রধান পণ্ডিত—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—বেতন	২০০৲	টাকা
দ্বিতীয় পণ্ডিত—রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি	"	১০০৲	টাকা
সহকারী পণ্ডিত—শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়	"	৪০৲	টাকা

* A Dictionary in English and Bengalee (1834)-Page 14.

† Home Department, Miscellaneous No 559, Page 6.

সহকারী পণ্ডিত	আনন্দচন্দ্র	বেতন	৪০৲ টাকা
	রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	”	৪০৲ টাকা
	কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়	”	৪০৲ টাকা
	পদ্মলোচন চূড়ামণি	”	৪০৲ টাকা
	রামরাম বসু	”	৪০৲ টাকা

হুগলীর অন্যতম সুসন্তান শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত" শীর্ষক পুস্তকে এই সমস্ত পণ্ডিতগণের সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন; অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ উক্ত পুস্তকখানি পাঠ করিলে অনেক বিষয় অবগত হইবেন। *

যাহা হউক কেরী সাহেব বাঙ্গলা শিক্ষা দিবার কোন পুস্তক নাই বলিয়া স্বয়ং ব্যাকরণ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং **রামরাম বসুকে** দিয়া **'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'** নামক একখানি গদ্যগ্রন্থ লেখাইয়া ১৮০১ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে প্রকাশ করেন। ইহাই বঙ্গভাষায় বাঙ্গালী কর্ত্তৃক লিখিত প্রথম গদ্যগ্রন্থ বলিয়া খ্যাত। এই গ্রন্থ রচনা করিয়া রামরাম বসু তিনশত টাকা পুরস্কার পান। গ্রন্থখানিতে ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষায় দুইটি আখ্যাপত্র আছে; আখ্যাপত্র দুইটি এইরূপ:

The History of Raja Pratapaditya. By Ram Ram Boshoo, one of the Pundits in the College of Fort William. Searmpore, Printed at the Mission Press. 1802

রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র যিনি বাস করিলেন যশহরের ধুমঘাটে একব্বর বাদসাহের আমলে। রামরাম বসুর রচিত। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ১৮০১।

মারাঠা পাঠ্য পুস্তকের অভাবে এই পুস্তকখানি পণ্ডিত বৈদ্যনাথ

* সাহিত্য সাধক চরিতমালা—১৪, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত।

কর্ত্তৃক মারাঠী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। এই পুস্তক সম্বন্ধে মার্শম্যান সাহেব লিখিয়াছেন :

"He therefore employed Ram-bosoo...to compile a history of King Protapaditya, an edition of which was published in the Bengalee language."*

রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রের রচনার নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হইল : "রাজা প্রতাপাদিত্য মহারাজা হইলেন। তাহার রাণী মহারাণী। বঙ্গভূমি অধিকার সমস্তই তাহারি করতলে। এই মত বৈভবে কতক কাল গত হয়। রাজা প্রতাপাদিত্য মনে বিচার করেন আমি ছত্রী রাজা হইব এ দেশের মধ্যে কিন্তু খুড়া মহাশয় হইতে পারে না। ইহার মরণের পরে ইহার সন্তানদিগকে দূর করিয়া দিব। তবেই আমার একাধিপত্য হইল। এখন কিছুকাল ধৈর্য্য অবলম্বন কর্ত্তব্য। এই মতে ঐশ্বর্য্য পর ২ বৃদ্ধি হইতেছে। নিকটবর্ত্তি আর ২ পট্টিদার যে ২ ছিল সমস্তকেই উৎখ্যাত করিয়া দিয়া আপনিই সর্ব্বাধ্যক্ষ হইল। কোন ক্রমে আর হ্রাস নাই পর পর বৃদ্ধি।"

রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রথম গদ্যগ্রন্থ বলিয়া খ্যাত হইলেও সম্প্রতি এই নগন্য লেখক শ্রীরামপুর হইতে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ধর্ম্মপুস্তক' নামে একখানি আটশত পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সুবৃহৎ গ্রন্থ আবিস্কার করিয়া ১৮ই শ্রাবণ ১৩৫৩ সালের 'দেশ' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন ; উক্ত প্রবন্ধটি ৫৪৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

১৮০২ খৃষ্টাব্দের রামরাম বসুর 'লিপিমালা' নামক আর একখানি পুস্তক শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন তিনি খ্রীষ্ট বিষয়ক বহু সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তিনি চুঁচুড়ায় ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন

*The Life and Times of Carey, Marshman & Ward Pp. 159-160.

এবং ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তিনি পরলোকগমন করিলে তাঁহার পুত্র নরোত্তম বসু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙ্গলা বিভাগের একজন পণ্ডিত নিযুক্ত হন।

১৮০১ খৃষ্টাব্দের কেরী সাহেবের 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রকাশিত হয়; খ্রীষ্টধর্মবিষয়ক পুস্তকগুলি বাদ দিলে ইহাই তাহার বাঙ্গলা ভাষা সম্বন্ধে প্রথম পুস্তক। এই পুস্তকের ভূমিকায় তিনি বাঙ্গলা ভাষার মহিমা যে ভাবে কীর্তন করিয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। নিম্নে বাঙ্গলা ব্যাকরণের ভূমিকার অংশ বিশেষে উদ্ধৃত হইল:

"Bengalee a language which is spoken from the Bay of Bengal in the south, to the mountains of Bootan in the north, and from the borders Ramgar to Irakan.

It has been supposed by some, that a knowledge of the Hindoosthanee language is sufficient for every purpose of business in any part of India. This idea is very far from correct ; for though it be admitted, that persons may be sound in every part of India who speak that language, yet Hidoosthanee is almost as much a foreign language, in all the countries of India, except those to the north-west of Bengal, which may be called Hindoosthan proper, as the French is in the other countries of Europe.

The Bengalee may be considered as more nearly allied to the Sungskrita than any of the other languages of India ...four fifth of the words in the language are pure Sungskrita. Words may be compounded with such facility, and to great an extent in Bengalee, as to convey ideas with the utmost precision, a circumstance which adds much to its copiousness. On these and many other accounts, it may be esteemed one of the most expreseive and elegant languages of the east."

১৮০১ খৃষ্টাব্দে **"কথোপকথন"** নামে তাঁহার আর একখানি পুস্তক শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। ইহা কেরী সাহেবের একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ; বাঙ্গলা চলতি ভাষায় তিনি কিরূপ আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, এই পুস্তকখানিই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। রামরাম বসু রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' এই পুস্তকখানির মাত্র একমাস পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানির আখ্যাপত্র এইরূপ :

"Dialogues | intended | to facilitate the acquiring | of | The Bengalee language | Searmpore | printed at the Mission Press | 1801."

কেরী সাহেবের এই পুস্তকখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার ত্রয়োদশ সংখ্যক পুস্তক হিসাবে মুদ্রিত হইয়াছে; নিম্নে উক্ত পুস্তকের রচনার নিদর্শন উদ্ধৃত হইল :

মজুরের কথাবার্ত্তা

ফলনা কায়েতের বাড়ী মুই কাজ করিতে গিয়াছিনু তার বাড়ী অনেক কায আছে। তুই যাবি।

না ভাই। মুই সে বাড়ীতে কায করিতে যাব না তারা বড় ঢেঁটা মুই আর বছর তার বাড়ী কায করিয়াছিলাম মোর দুদিনের কড়ি হারামজাদগি করিয়া দিলে না মুই সে বেটার বাড়ী আর যাব না।

কেন ভাই। মুইত দেখিলাম সে মানুষ বড় খারা মোকে আগু এক টাকা দিয়াছে আর কহিয়াছে তুই আর লোক নিয়া আসিস মুই আগাম টাকা দিব তোকে।

আচ্ছা ভাই। যদি তুই মোকে সে বাড়ী নিয়া যাবি তবে মুই তোর ঠাঁই মোর খাটনি নিব।

এতদ্ভিন্ন কেরী সাহেব ১৮০২ খৃষ্টাব্দে পাঁচ খণ্ডে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও চার খণ্ডে কাশীরাম দাসের মহাভারত মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। ইতিহাস-মালা, ইংরেজী অভিধান, বাইবেলের বঙ্গানুবাদ, প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন বা সম্পাদনা করিয়া তিনি প্রকাশ করেন।

কেরী, ম্যার্শম্যান ও ওয়ার্ডের অপর কীর্ত্তি বঙ্গদেশ হইতে প্রথম শ্রীরামপুর হইতে 'দিগদর্শন' নামে একখানি মাসিক সাময়িক পত্র বাহির করা। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জোসুয়া মার্শম্যানের পুত্র ক্লার্ক মার্শম্যান ইহা সম্পাদনা করেন এবং শ্রীরামপুর মিশন হইতে ইহা প্রকাশিত হয়। ইহার এক মাস পর—১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে বঙ্গদেশের প্রথম সংবাদ পত্র "সমাচার দর্পণ" প্রতি সপ্তাহে জে, সি মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। প্রায় তেত্রিশ বৎসর যাবৎ এই পত্র সমগ্র বাঙ্গলা দেশে গদ্য সাহিত্য প্রচারে ও জ্ঞান বিস্তারে সহায়তা করিয়াছিল। 'শ্রীরামপুর' শীর্ষক অধ্যায়ে এই পত্র দুইটি সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। 'সমাচার দর্পণে' মুদ্রিত ও জ্ঞাতব্য সংবাদগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" ১ম ও ২য় খণ্ড গ্রন্থে সুন্দর ভাবে লিখিত আছে।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' সংবাদ পত্রের ইতিহাস প্রকাশ করেন। উক্ত ইতিহাসে তিনি **গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য** কর্ত্তৃক প্রকাশিত "বাঙ্গাল গেজেটি" নামক পত্রকে বঙ্গদেশের প্রথম সংবাদপত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া এই বিষয় লইয়া পণ্ডিতগণ আলোচনা করিয়া ঈশ্বর গুপ্ত কথিত নামটি 'গঙ্গাধর' নয় 'গঙ্গা কিশোর' হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গাল গেজেটি' অদ্যাপি কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এই বিষয় লইয়া বহু আলোচনা করিয়াছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়। গঙ্গাকিশোর হুগলী জেলাস্থ শ্রীরামপুরের অনতিদূরে বহড়া

(বড়া ?) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং 'অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থও প্রকাশ করেন। তাঁহার সংবাদ পত্র আবিষ্কৃত হইলে বঙ্গদেশে প্রথম সাংবাদিকের গৌরবময় পদের অধিকারী তিনিই যে হইবেন, তাহা সুনিশ্চিত। শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানায় তাহার প্রথম হাতে খড়ি হয়, পরে স্বাধীন ভাবে পুস্তক প্রকাশের ব্যবসায়ের জন্য তিনি কলিকাতায় আগমন করেন।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট উইলিয়ম কেরী নর্দামটনশায়ারের পলার্স-পিউরি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন; তাঁহার পিতার নাম এডমণ্ড কেরী। তিনি তন্তুবায়ের কার্য্য করিতেন, পরে একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না বলিয়া, অল্প বয়সেই কেরীকে উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হয় এবং কিছু দিন তিনি জুতা সেলায়ের কার্য্যও করিয়াছিলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন তিনি বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা করিয়া ১১ই নভেম্বর কলিকাতায় পদার্পণ করেন এবং একচল্লিশ বৎসর যাবৎ বঙ্গদেশে বহুবিধ কার্য্য করিয়া ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন পরলোকগমন করেন। অক্লান্ত অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠতার গুণে বঙ্গভাষার তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস "উইলিয়ম কেরী ও বাংলা সাহিত্য" সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিয়া, তাঁহার উদ্দেশ্যে হুগলী জেলার শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করিতেছি।

বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের উদ্বোধনের সময় হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে আর একজন মনীষীর আবির্ভাব হইয়াছিল; তিনি পুরুষসিংহ **মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।** বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশে রাম মোহনের কীর্ত্তি অসামান্য এবং প্রকৃত গদ্য সাহিত্যের প্রবর্ত্তক হিসাবে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। রামমোহন ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রণালী" নামক প্রথম গদ্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, কিন্তু উহা এখনও

আবিষ্কৃত হয় নাই। তিনি বাঙ্গলা ভাষায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু পুস্তক ও এক-খানি ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। তৎকালে বাঙ্গলা গদ্যে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য থাকায় সাধারণ লোকের তাহা বুঝিবার বিশেষ অসুবিধা হইত বলিয়া, তিনি এই রীতির বিরোধী ছিলেন। তাঁহার শাস্ত্র বিচার ও বিবাদ মূলক রচনার দ্বারা তিনি বঙ্গ সাহিত্যকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেন।

রামমোহন ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ দেশের উন্নতি কল্পে ও শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে জীবন উৎসর্গ করেন। লোক শিক্ষা প্রচার করিতে হইলে মাতৃভাষার সাহায্য ব্যতীত তাহা হইতে পারে না, ইহা তিনি মনে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে 'সংবাদ কৌমুদী' নামক একখানি পত্রিকা প্রচার করেন। তিনি বেদান্ত গ্রন্থ, বেদান্ত সার, ঈশোপনিষৎ, ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার, পথ্যপ্রদান, কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার, ব্রহ্মো-পাষণা, ব্রহ্মসঙ্গীত, প্রভৃতি প্রায় ত্রিশখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের অশেষ উন্নতি সাধন করিয়া যান। ইতিহাস, ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বহু বিষয়ের তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন।

১৮২১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রামমোহন "ব্রাহ্মণ সেবধি—ব্রাহ্মণ ও মিসিনারি সম্পাদ" **Brahmunical Magazine & The Missionary & the Brahmun No 1.** নামক একখানি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। ইহার এক পৃষ্ঠায় বাঙ্গলা ও অপর পৃষ্ঠায় তাহার ইংরাজী অনুবাদ থাকিত। শিবপ্রসাদ শর্ম্মার নামে ইহা প্রকাশিত হইত। খ্রীষ্টান মিশনরীগণের হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিবার জন্যই ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

'ব্রাহ্মণ সেবধি' হইতে রাজা রামমোহনের ইংরাজী ও বাঙ্গলা রচনার নমুনা উদ্ধৃত হইল :

"Wise and good men always feeldisinclined to hurt

those that are of much less strength than themselves and if such weak creatures be dependent on them and subject to their authority they can never attempt even in thought to mortify their feelings.

We have been subjected to such insults for about nine centuries, and the cause of such degradation has been our excess in civilization and abstinence from the slaughter even of animals ; as well as our division into casts which has been the source of want of unity among us."

"শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্ম্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তি রূপে তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রীষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকারে এই যে নানা বিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্ম্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকারে এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্ম্মের ঔৎকর্য্য ও অন্যের ধর্ম্মের অপকৃষ্টতা সূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোন কারণে খ্রীষ্টান হয় তাহাদিগের কর্ম্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে যদ্যপিও যিশু খ্রীষ্টের শিষ্যেরা ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্ম্মের ঔৎকর্য্যের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা জানা

কর্ত্তব্য যে সে সকল দেশ তাহাদের অধিকারে ছিল না সেই রূপ মিসনরিরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশে যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয় এরূপ ধর্ম্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে ধর্ম্মার্থে নির্ভর ও আপন আচার্য্যের যথার্থ অনুগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন কিন্তু বাঙ্গলা দেশে যেথানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্ব্বল ও দীন ও ভয়ার্ত্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্ম্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্ম্মত কি লোকত প্রশংস-নীয় হয় না, যেহেতু বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা দুর্ব্বলের মনঃপীড়াতে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হয়েন তাহাতে যদি সেই দুর্ব্বল তাঁহাদের অধীন হয় তবে তাহার মর্ম্মান্তিক কোন মতে অন্তঃকরণেও করেন না। এই তিরস্কারের ভাগী আমরা প্রায় নয়শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমাদের অতিশয় শিষ্টতা ও হিংসা ত্যাগকে ধর্ম্ম জানা ও আমাদের জাতিভেদ যাহা সর্ব্বপ্রকারে অনৈক্যতার মূল হয়।" (ব্রাহ্মণ সেবধি-সং ১)

রাজা রামমোহনের উপরোক্ত উদ্ধৃতি হইতে তৎকালে মিসনরিদের খৃষ্টানদের করিবার কয়েকটি পন্থা অবগত হওয়া যায়। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার-কল্পে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে **Baptist Auxilary Missionary Society** "গস্‌পেল ম্যাগাজিন" (The Gospel Magazine) নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন ; ইহা দ্বিভাষিক ছিল অর্থাৎ ইহার প্রতি পৃষ্ঠার দুইটি স্তম্ভে বাম দিকে ইংরাজী ও দক্ষিণ দিকে উক্ত ইংরাজীর বঙ্গানুবাদ থাকিত। মিসনরিগণের হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিবার জন্যই 'ব্রাহ্মণ সেবধি' প্রকাশিত হয় এবং বলা বাহুল্য রাজা রাম-মোহন সেই সময় ইহার প্রতিরোধ না করিলে, বঙ্গদেশের বহু হিন্দু খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন।

ইংরাজী রচনায়ও তাঁহার অসীম ক্ষমতা ছিল। বিলাতে অবস্থান-কালে তিনি কয়েকখানি ইংরাজী পুস্তক পুনঃ মুদ্রিত করেন এবং অনেকগুলি

নূতন পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তিনি সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন ; নিম্নে তাঁহার কাব্য রচনার নিদর্শন স্বরূপ একটি কবিতা উদ্ধৃত হইল :

"অজ্ঞানে জ্ঞান হারাইয়ে কর এ কি অনুষ্ঠান।
পরাৎপর করি পর, অপরে পরম জ্ঞান ॥
জল ভ্রমে মরীচিকা আশা মাত্র সার,
অলভ্য বাণিজ্যে তাহে না দেখি সুসার,
অবিবেক ত্যজি তত্ত্ব, ততত্ত্বে যথার্থ জ্ঞান।"

রাজা রামমোহনের পর মদনমোহন তর্কালঙ্কার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করেন। তাঁহার 'পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল' জানেন না এরূপ বাঙ্গালী কে আছেন? ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে বঙ্গসাহিত্য গগনে যে সমস্ত উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আবির্ভূত হইয়া, তাঁহাদের বিমল প্রভায় কেবল বঙ্গদেশ নয় সমগ্র ভারতবর্ষকে আলোকিত করিয়া দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হুগলী জেলার বীরসিংহ গ্রামের (বর্ত্তমানে এই গ্রাম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে) **পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর** মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মের দুই মাস বার দিন পূর্ব্বে হুগলী জেলার সন্নিহিত বর্দ্ধমানের অন্তর্গত চুপী গ্রামে বঙ্গের আর এক সুসন্তান মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাকে সুবর্ণ যুগ বা সৌভাগ্যের দিন বলা যায়। কারণ একই সময়ে বিধাতা এই দুই জনকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের গঠন কার্য্যে প্রাণ সঞ্চারণ করেন। রামরাম বসু, উইলিয়ম কেরী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায়ের মধ্য দিয়া যে সর্ব্বাঙ্গীনতা বঙ্গভাষা অনুভব করিতেছিল তাহা বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের মধ্য দিয়া চরিতার্থ হয়। আজ যে সুমধুর সুললিত ভাষা বঙ্গবাসীর কর্ণে অমৃত সিঞ্চন করিতেছে, যে ভাষার সৌন্দর্য্য পরিপাটি দেখিয়া বাঙ্গালী মাত্রেই গৌরবান্বিত

যে ভাষার বহুমুখি প্রতিভাতে আজ ভারতবাসী ঈর্ষান্বিত, যে ভাষায় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দেমাতরম' মহামন্ত্র রচনা করিয়া ভারতের আকাশ বাতাস মুখরিত করেন, যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা করিয়া 'বিশ্বকবি' বলিয়া প্রখ্যাত হন, সেই ভাষায় বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজের শোনিত বিন্দু পাত করিয়া গঠন করেন এবং তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন তৎকালীন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণ।

বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য লেখক। তাহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গলা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এমন কি, বাঙ্গলা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটির নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য্য ভাষা। আর একটির নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্যে ভাষা। এস্থানে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে।······

এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্ব্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গলা গদ্য লিখিতে পারে নাই এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুমুখী প্রতিভার বিষয় জানে না এরূপ শিক্ষিত বাঙ্গালী বোধ হয় এ দেশে কেহই নাই। তাঁহার বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহা উল্লিখিত হইল:

বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্ব্বে

বাঙ্গলায় গদ্য সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল কিন্তু তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গলা গদ্যে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণা করেন। বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা গদ্য-ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাঁহাকে সহজ গতি এবং কার্য্যকুশলতা দান করিয়াছেন—এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া নব নব ক্ষেত্র আবিস্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন—কিন্তু যিনি এই সৈনানীর রচনাকর্ত্তা যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।...বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা লেখায় সর্ব্বপ্রথমে কমা, সেমিকোলন্ প্রভৃতি ছেদচিহ্নগুলি প্রচলিত করেন। বাস্তবিক একাকার সমভূমি বাঙ্গলা রচনার মধ্যে এই ছেদ আনয়ন একটা নবযুগের প্রবর্ত্তন। এতদ্দ্বারা যাহা জড় ছিল তাহা গতিপ্রাপ্ত হইয়াছে। *

এই সময় **কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের** নামও উল্লেখযোগ্য; তিনি অধিকাংশ গ্রন্থ পদ্যে রচনা করিলেও তাঁহার সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' গদ্য সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিল। উক্ত পত্রে সাহিত্য, ধর্ম্ম, সমাজ প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের আলোচনা হইত ও সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, এই পত্রের সাহায্যে একটি 'লেখক-গোষ্ঠী' তৈয়ারী হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, কবি রঙ্গলাল, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, কাঙ্গাল হরিনাথ, কবি রাধামাধব মিত্র প্রভৃতি বহু যশস্বী লেখক প্রভাকর লেখক গোষ্ঠী হইতেই বাহির হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার 'সংবাদ প্রভাকরে' বহু খ্যাতনামা বাঙ্গালী কবির জীবনচরিত ও তাঁহাদের গীতাবলী প্রকাশ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গদ্য রচনার নিদর্শন 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে প্রাচীনকালের গদ্য রচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত জানা যাইবে।

* বিদ্যাসাগর চরিত—সাধনা-ভাদ্র, ১৩০২ সাল।

অধুনা বঙ্গভাষায় গদ্য রচনার যদ্রূপ সুপদ্ধতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, ইহার ৪০ বৎসর পূর্ব্বে এতদ্রূপ ছিল না, কেবল মৃত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয় রচনার এক নূতন সূচনা করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, ইহার পূর্ব্বে সাধুভাষায় কিরূপে শব্দ সংযোগ করিতে হয় তাহা বড় বড় পণ্ডিতেরাও জানিতেন না; সচরাচর পত্র লিখিতে হইলে "যাতায়াতে তথাকার মঙ্গলাদি সমাচার লিখিতে আজ্ঞা হইবেক। আমরা ভাল আছি তাহাতে ভাবিত নহিবেন" ইত্যাদি। বিষয়ি লোকেরা কতক হিন্দি, কতক বাঙ্গলা, কতক পার্সি মিশ্রিত করিয়া পত্র লিখিতেন, যথা "বাপা হে, তুমি একবার খবরটা লও না, আজ্ সাত রোজ হল প্রাণাধিক বাবাজির ব্যাম হয়েছে, কবিরাজ তিন ওক্ত তিকিচ্ছে করূছেন, এখানে দাওয়াই ভাল নাই, তুমি একটু বিষ্ণু তোল পাঠাবা" ইত্যাদি। গদ্য রচনার এইরূপ শ্রী ছিল, নতুবা প্রায় হেয়ালী দ্বারা তাবৎ ব্যাপার সম্পন্ন হইত, যথা "সদানন্দ আনন্দ পাইয়া যার দল" "পর্ব্বত শিখর পরে গঙ্গার তরঙ্গ" তথা "আগা ঝম্‌ঝম্ গোড়া মোও" ইত্যাদি। দুঃখের কথা কি কহিব, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, যিনি অতি সুপণ্ডিত ও সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন তিনি নানা শাস্ত্রাধ্যাপক বহুবিধ পণ্ডিত কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়াও ভাষা লেখনের ব্যবহারে শুদ্ধ প্রহেলিকা দ্বারা আমোদ প্রকাশ করিতেন। ফলতঃ তৎকালীন সংস্কৃত ভাষার কিঞ্চিৎ সমাদর ছিল; রাজা রামমোহন রায় সমাচার পত্র প্রকাশ ও পুস্তক রচনা দ্বারা স্বাভিমত ব্যক্ত করণে প্রবৃত্ত হইলে মহানুভব বিদ্যাতৎপর ৺ নন্দলাল ঠাকুর মহাশয় তদ্বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলেন, তৎকালে উভয় দলে অনেক সাহায্যকারি পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন, উভয় পক্ষের বিবাদে ভাষার বিস্তর উন্নতি হয়। *

---

* সংবাদ প্রভাকর, ১৩ মার্চ্চ ১৮৫৪।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে সময় 'সংবাদ প্রভাকরে'র সাহায্যে 'লেখক গোষ্ঠী' তৈয়ার করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে এবং **অক্ষয়কুমার দত্তের** সম্পাদনায় **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার** আবির্ভাব হয়। এই পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দেশের হিতকর বস্তুতত্ত্বের নির্ণায়ক ও সমাজ সংশোধক সুচিন্তিত প্রবন্ধাদির দ্বারা বঙ্গ সাহিত্যের সমৃদ্ধির সহায়তা করেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মহাভারতের অনুবাদ এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঋগ্বেদ-সংহিতার অনুবাদ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে ইহা জনসাধারণের এত মনোরঞ্জন করিয়াছিল যে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভারতীয় ভাষায় তাহা অনুদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। তৎকালে কলেজের শিক্ষিত যুবকগণ বঙ্গভাষা পাঠ করিতে ঘৃণা বোধ করিতেন, কিন্তু অক্ষয়কুমারের রচনা প্রকাশিত হইলে উক্ত শিক্ষিত যুবকগণ ও পণ্ডিতবর্গ আগ্রহের সহিত তাহা পাঠ করিতেন। সেই সময় পণ্ডিতগণ বঙ্গভাষাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন বলিয়া, কেহ সাহস করিয়া বাঙ্গলা পুস্তক পড়িতেন না—পড়িলেও গোপনে পড়িতেন। কোন শিক্ষিত ব্যক্তি বাঙ্গলা পুস্তক পড়িতেছেন যদি কেহ দেখিতে পাইত, তাহা হইলে তিনি এমন লজ্জিত ও মর্ম্মাহত হইতেন, যে সুরা পান করিয়া বারবণিতার গৃহে যাইতেছেন দেখিলেও, বোধ হয় তিনি ততটা লজ্জিত হইতেন না। এই সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র 'লোকরহস্যে' স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন উপলক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন :

"স্বামী—তোমরা ছাইভস্ম বাঙ্গলাগুলো পড় কেন ? সব **immoral obscene, filthy.**

স্ত্রী—পড়িলে কি হয় ?

স্বামী—**demoralize** হয়—কি না, চরিত্র মন্দ হয়।

স্ত্রী—আপনি বোতল বোতল ব্রাণ্ডী মারেন, যাদের সঙ্গে বসিয়া কাজ করা হয়, তারা এমনই কুচরিত্রের লোক, যে তাদের মুখ দেখিলেও

পাপ হয়। আপনার বন্ধুগণ ডিনারের পর যে ভাষায় কথাবার্ত্তা ক'ন, শুনিতে পাইলে খানসামারাও কানে আঙ্গুল দেয়। আপনি যাদের বাড়ী মুরগী-মটনের শ্রাদ্ধ করিয়া আসেন, পৃথিবীতে এমন কুকাজ নেই যে তারা ভিতরে ভিতরে করে না। তাহাতে আপনার চরিত্রের জন্য কোন ভয় নাই—আর আমি গরীবের মেয়ে একখানা বাঙ্গলা বই পড়লেই গোল্লায় যাব?

স্বামী—আরে না-না; ও সব ছুঁয়ে হাত ময়লা করো না।"

কিন্তু অক্ষয় কুমারের রচনা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এত মনোরঞ্জন করিত যে, পাঠকগণ তাহা পাঠ কবিবার জন্য ব্যগ্রভাবে পত্রিকা প্রকাশের দিনটির জন্য প্রতীক্ষা করিত। তাঁহার চারুপাঠ, ধর্ম্মনীতি ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পুস্তকগুলি সেইজন্য উক্ত পত্রে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার সরল মধুর জ্ঞানপ্রদ রচনাগুলি বাঙ্গলা গদ্যসাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল এবং এক 'চারুপাঠই' তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে।

বঙ্গসাহিত্যে মধ্যযুগের সাহিত্যস্রষ্টাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তকে এই যুগের শেষ বলা যায়, কারণ তাঁহারা গদ্য সাহিত্যের যে আদর্শ স্থাপন করেন তাহাই পরিগৃহীত হয়। মাইকেল মধুসূদন হইতে নবযুগের সূত্রপাত হয়; মধ্যযুগ ও নবযুগের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তাহা হুগলী জেলার সাগরদিয়ার **কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়** পূরণ করিয়া যশস্বী হন। রঙ্গলালের গদ্য অপেক্ষা পদ্য রচনাই সাধারণের প্রীতিপদ ছিল। তিনি পদ্মিনী উপাখ্যান, কর্ম্মদেবী, সুরসুন্দরী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন এবং তাহার রচনায় প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয় ভাবের সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' স্বাধীনতার বাণী বঙ্গদেশে তিনিই সর্ব্বপ্রথম উচ্চারণ করেন। এই সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন:

"আমাদের সৌভাগ্যক্রমে ইংরাজের সঙ্গে আমাদের জাতি বৈরী ঘটিয়াছে ; এই জাতি-বৈর ভাব হেমচন্দ্রের পূর্ব্বে রঙ্গলালই সর্ব্বপ্রথম প্রচার করিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা উপাসনার মঙ্গলঘট তিনিই সর্ব্ব-প্রথম স্থাপন করেন।"

'পদ্মিনী উপাখ্যানে' রঙ্গলাল স্বাধীনতার যে বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল :

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায় ?
কোটী কল্প দাস থাকা নরকের প্রাহ হে
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-সুখ তায় হে
স্বর্গ-সুখ তায়।"

ঐতিহাসিক কাহিনী লইয়া মহাকাব্য রচনায় রঙ্গলাল অগ্রণী হন এবং বাঙ্গলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি অমর হইয়া থাকিবেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'ঋতুদর্পণ' সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন "অধুনাতন বঙ্গীয় কবিবৃন্দ মধ্যে শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন।" ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মাতুলালয় বাকুলিয়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং কাব্য গ্রন্থ ব্যতীত তিনি 'সংবাদ সাগর' 'এডুকেশন গেজেট' 'উৎকল দর্পণ' (উড়িয়া ভাষায়) প্রভৃতি কয়েকখানি সাময়িক পত্র সম্পাদনা করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিনি পরলোক গমন করেন।

১৩৩০ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের নৈহাটী অধিবেশনে, সাহিত্য

শাখার সভাপতি রসরাজ অমৃতলাল বসু রঙ্গলাল * সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

ঈশ্বর গুপ্তের 'মিউটিনী' প্রভৃতি পদ্যে উদ্দীপনা থাকিলেও, যিনি নব্য বঙ্গের হৃদয়ক্ষেত্রে উদ্দীপনার রসে সিঞ্চিত করিয়া দেশ হিতৈষণার বীজ বপন করেন, তাঁহার নাম রঙ্গলাল। তাঁহার "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে—কে বাঁচিতে চায়?" আবৃত্তি করিয়া বাঁখারী ঘুরাইয়া আমি একদিন ছেলে বেলায় খেলা করিয়াছি। জাহাজ মেরামত করার ডকের জন্য খিদিরপুর প্রসিদ্ধ ; কিন্তু এইখানে এক সময় বড় বড় কয়খানি জাহাজ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাদের প্রধান তিনখানির নাম—রঙ্গলাল, মধুসূদন ও হেমচন্দ্র। ঐ তিনখানি জাহাজই যে ছোট বড় তরঙ্গ তুলিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার আন্দোলনে আজিও সমগ্র বঙ্গদেশ দুলিতেছে।

বঙ্গসাহিত্যে নবযুগের উদ্বোধন করেন হুগলী জেলার পাণিশেওলার অধিবাসী প্যারিচাঁদ মিত্র ওরফে **টেকচাঁদ ঠাকুর**। ইতিপূর্ব্বে সাধারণের ধারণা ছিল যে, কথিত ভাষায় কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করা যায় না, কিন্তু প্যারীচাঁদ কথিত ভাষাকে বঙ্গভাষার সর্ব্ববিধ রচনার বাহন করিবার প্রথম ব্যাপক চেষ্টা করেন বলিয়া পরবর্ত্তীকালে তাঁহারই অনুকরণ করিয়া বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরাজীর আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল। তিনি এই সাহস প্রদর্শন না করিলে—বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তে আমরা বঙ্গ সাহিত্যের এইরূপ উন্নতি আশা করিতে পারিতাম না। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভাষায় তাঁহার প্রথম সামাজিক উপন্যাস **'আলালের ঘরের দুলাল'** প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে সমাজের রুচি ও আবহাওয়া অনুযায়ী ভাষা কিরূপ চিরাচরিত সংস্কৃতানুরাগিনী না হইয়া পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা দেখিলে বিস্মিত

* শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ রচিত 'রঙ্গলাল' পুস্তকে ও সাহিত্য সাধক চরিতমালা—৩৭ সংখ্যায় রঙ্গলালের জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে।

হইয়া যাইতে হয়। আলালের ঘরে তুলাল গ্রন্থের আখ্যাপত্র ও রচনার নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

আলালের ঘরের তুলাল/শ্রীযুক্ত টেকচাঁদ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিরচিত/কলিকাতা/রোজরিও কোম্পানীর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত/সন ১২৬৪/Calcutta :— Printed by D'Rozario and Co/8, Tank-Square./

"বেচারাম! বাবুরাম! ভাল তুধ কলা দিয়া কাল সাপ পুষিয়াছিলে। তোমাকে পুনঃ ২ বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম আমার কথা গ্রাহ্য কর নাই—ছেলে হতে ইহকালও গেল—পরকালও গেল। মতি দেদার মদ খায়—জোয়া খেলে—অখাদ্য আহার করে। জোয়া খেলিতে খেলিতে ধরা পড়িয়া চৌকিদারকে নির্ঘাত মারিয়াছে। হলা, গদা ও আর ২ ছোঁড়ারা তাহার সঙ্গে ছিল। আমার ছেলে পুলে নাই। মনে করিয়াছিলাম হলা ও গদা এক গণ্ডুষ জল দিবে এখন সে গুড়ে বালি পড়িল! ছোঁড়াদের কথা আর কি বলিব? তুর ২।"

প্যারীচাঁদ মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়, রামারঞ্জিকা, অভেদী, আধ্যাত্মিকা, বামাতোষিণী, যৎকিঞ্চিৎ প্রভৃতি এগার খানি বাঙ্গলা পুস্তক এবং আট খানি ইংরাজী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইংরাজী গ্রন্থগুলির মধ্যে Life of Dewan Ramcomal Sen এবং Agriculture in Bengal পুস্তক তুইটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত তিনি ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে রাধানাথ সিকদারের সহযোগীতার মহিলাদের উপযোগী 'মাসিক পত্রিকা' নামে একখানি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পেকটেটার' পত্রের পরিচালন ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই পত্রিকাগুলিতে তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র 'লুপ্তরত্নোদ্ধার বা ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলী'তে বাঙ্গলা

সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, নিম্নে উক্ত প্রবন্ধের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল ঃ

বাঙ্গলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যের এবং বাঙ্গলা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক।···প্রাচীন কালে অর্থাৎ এ দেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গলায় সচরাচর পুস্তক রচনা সংস্কৃতের ন্যায় পদ্যেই হইত। গদ্য রচনা যে ছিল না এমন কথা বলা যায় না, কেন না হস্ত লিখিত গদ্য গ্রন্থের কথা শুনা যায়। আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগের যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃত ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না—' 'খদির' বলিতেন; 'চিনি' বলিতেন না —'শর্করা' বলিতেন। পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গলাভাষা, আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা বলা বাহুল্য।

এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। কিন্তু প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গলা সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক 'আলালের ঘরের দুলাল' নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। 'আলালের ঘরের দুলাল' বাঙ্গলা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু 'আলোর ঘরের দুলাল' দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে আর কোন বাঙ্গলা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কিনা

সন্দেহ।……অতএব বাঙ্গলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ।"

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ব্যতীত সেকালের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তিনি উহার সেবা করেন। তাঁহার মৃত্যুতে 'Hindoo Patriot' পত্র লিখিয়াছিলেন :

"In him the country loses a literary veteran, a devoted worker a distinguished author, a clever wit, an earnest patriot, and an enthusiastic spritual enquirer." *

সেই সময় আলালী ভাষার অনুকরণে অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল ; তন্মধ্যে প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিক-পরাজয়' উল্লেখযোগ্য।

প্যারীচাঁদ মিত্রের সমসাময়িক, বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের আর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক **মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়** হুগলী জেলায় আত্ম প্রকাশ করেন। ইহার 'পারিবারিক প্রবন্ধ, গদ্য সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব জিনিষ বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। তিনি বহু গদ্য পুস্তক রচনা করেন, তন্মধ্যে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' তাঁহার অভিনব সৃষ্টি—ইহা সফল স্বপ্ন ও অঙ্গুরীয় বিনিময় এই দুই ভাগে বিভক্ত। পরবর্ত্তী লেখকগণ তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ, দর্শন, জ্যোতিষ প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ে তাঁহার ন্যায় এত অধিক প্রবন্ধ বঙ্গভাষায় আর কেহ লেখেন নাই। এই গদ্য রচনা তাঁহাকে বঙ্গ সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে। 'সামাজিক প্রবন্ধ' হইতে ভূদেব বাবুর রচনার একটি নমুনা উদ্ধৃত হইল :

"প্রত্যেক বিষয়ে ইংরাজের অন্ধ অনুকরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে ; ইংরাজের প্রকৃতির একতা নাই। ইংরেজ কার্য্যকুশল, অহঙ্কারী ও লোভী হিন্দু শ্রমশীল সুবোধ, নম্র স্বভাব ও সন্তুষ্টচিত্ত। ইংরেজের নিকট হিন্দুকে

---

* The Hindoo Patriot. Dated 20th November 1883.

কেবল কার্য্যকুশলতা শিখিতে হইবে ; আর কিছু শিখিবার প্রয়োজন হয় না। ভারতবাসীকে সর্ব্বোতভাবে স্বজাতি বিদ্বেষরূপ মহাপাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইবে এবং স্বজাতির সহানুভূতিকেই পরমধন ভাবিয়া ভোগ করিতে হইবে।”

তিনি এডুকেশন গেজেটের যাবতীয় ভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সম্পাদনা কালে এই পত্র সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে সমাদৃত হইয়াছিল। পরে তিনি ‘শিক্ষাদর্পণ’ নামে আর একখানি মাসিক পত্র বাহির করেন। তাঁহার প্রবন্ধগুলি উক্ত পত্রিকাগুলিতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

তিনি পরলোককগমন করিলে ‘সাহিত্য’ সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখিয়াছিলেন—“ভূদেব চরিত্রের মূল সূত্র তাঁহার মৌলিকতা। তিনি ইউরোপীয় সাহিত্য ও সভ্যতার পূর্ণ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও আত্মবিসর্জ্জন দিয়া পাশ্চাত্য পথের পথিক হন নাই। স্বদেশের ধর্ম্মে, শাস্ত্রে, সমাজে, সংস্কারে, সাহিত্যে তাঁহার প্রভূত আস্থা, অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস কখনও তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই।

ভূদেব না ভাবিয়া কিছু করিতেন না। নিজের চিন্তা ও বিচার শক্তির সাহায্যে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, প্রাণপণে তাহা পালন করিতেন। তাঁহার পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার ক্রবন্ধ, পুষ্পাঞ্জলী—কেবল সাহিত্য হিসাবে দেখিলে চলিবে না, এই সকল গ্রন্থে তিনি নিজের হৃদয়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

বদান্য ভূদেবের দানশীলতা বাঙ্গালীর আদর্শ হইয়া থাকুক। ভূদেবের জীবনতত্ত্বের অনুশীলনে ও অনুসরণে, বাঙ্গালীর সঙ্কীর্ণ জীবন প্রশস্ত ও পবিত্র হউক।”

এই সময় অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক এক ধনী সন্তান বঙ্গভাষার উন্নতি কল্পে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন—ইনি **মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ**। যে যে সময়ে ধনী সন্তানগণ বিলাসে, ইংরেজের অনুকরণে জীবন কাটাইবার জন্য

ব্যগ্র হইত, ঠিক সেই সময়ে কালী প্রসন্নের আবির্ভাব যেন বিধাতা প্রেরিত বলিয়াই মনে হয়। মাত্র ত্রিশ বর্ষ তিনি জীবিত ছিলেন—কিন্তু এই স্বল্প-কালের মধ্যে তিনি যে সমস্ত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহা অনন্যসাধারণ ও অলৌকিক বলিয়া মনে হয় এবং মনুষ্য সমাজে দুর্ল্লভ বলিলেও চলে। কেবল মহাভারতের বঙ্গানুবাদ বা হুতোম পেঁচার নক্সা রচনার জন্য নয় তিনি বাঙ্গালীর সামাজিক বহুবিধ সংস্কার ও উন্নতির জন্য যেভাবে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন—তাহাতে মহাত্মা কালীপ্রসন্নের নাম বাঙ্গালী হৃদয়ে চিরকাল খোদিত থাকিবে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"তরুণ যুবক কালীপ্রসন্নের অমর কীর্ত্তি এই মহাভারত। এই একখানি গ্রন্থে তাঁহার নাম বঙ্গবাসীর চিরস্মরণীয় রহিবে। এই অপূর্ব্ব জিনিষ আজ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে শোভা পাইতেছে। রাশি রাশি বাঙ্গলা পুস্তক পাঠ করিয়া যে জ্ঞানলাভ না হয়, একমাত্র সিংহমহাশয়ের 'মহাভারত' পাঠ করিলে তাহা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানলাভ করা যায় ইহা আমি স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি। সহস্রখানি 'রাবিশ' গ্রন্থ পাঠ করা অপেক্ষা একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ করা শ্রেয়ঃ নয় কি?"

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী কালীপ্রসন্ন তাঁহার ভবনে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে অমৃতাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তনের জন্য সম্বর্দ্ধনা সভায় অভিনন্দন প্রদান করেন। উক্ত সভায় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। তিনি মধুসূদনের প্রকৃত গুণগ্রাহী ছিলেন এবং 'মেঘনাদবধ-কাব্য' বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছিলেন—"বাঙ্গালী সাহিত্যে এবম্প্রকার কাব্য উদিত হইবে বোধ হয়, সরস্বতীও স্বপ্নে জানিতেন না।" মাইকেলের এই নূতন ছন্দ তিনি বড় পছন্দ করিতেন এবং মাইকেলের পর কালীপ্রসন্নই প্রথম অমৃতাক্ষর ছন্দে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র (১ম ও ২য় ভাগ) প্রথমে

একটি কবিতা রচনা করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। কবিতাটি এইরূপ :

প্রথম ভাগ

হে শারদে! কোন দোষে দুষি দাসী ও চরণতলে?
কোন্ অপরাধে ছলিলে দাসীরে দিয়ে এ সন্তান?
এ কুৎসিতে! কোন্ লাজে সপত্নী সমাজে পাঠাইব,
হেরিলে মা এ কুরূপে—দুষিবে জগৎ—হাসিবে
সতিনী পোড়া; অপমানে উভরায়ে কাঁদিবে
কুমার—সে সময়ে মনে য্যান থাকে; চির অনুগত লেখনীরে!

দ্বিতীয় ভাগ

হে সজ্জন! স্বভাবের সুনির্ম্মল পটে,
রহস্য রসের রঙ্গে,
চিত্রিনু চরিত্র—দেবী সরস্বতী বরে।
কৃপা চক্ষে হের একবার; শেষে বিবেচনা মতে
যার যা অধিক আছে 'তিরস্কার' কিম্বা 'পুরস্কার'
দিও তাহা মোরে—বহু মানে লব শির পাতি।

'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় তৎকালীন সমাজের দূষিত চিত্র দেখাইয়া তিনি বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। নিম্নে উক্ত পুস্তকের রচনার নমুনা উল্লিখিত হইল :

"দুর্গোৎসব বাঙ্গালা দেশের পরব, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এর নাম গন্ধও নাই; বোধ হয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল হতেই বাঙ্গলায় দুর্গোৎসবের প্রাদুর্ভাব বাড়ে। পূর্ব্বে রাজা-রাজরা ও বনেদী বড় মানুষদের বাড়ীতেই কেবল দুর্গোৎসব হতো, কিন্তু আজ কাল পুঁটে তেলীকেও প্রতিমা আনতে দেখা যায়; পূর্ব্বকার দুর্গোৎসব ও এখনকার দুর্গোৎসবে অনেক ভিন্ন।"

কালী প্রসন্ন 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' 'সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও 'পরিদর্শক' প্রভৃতি কয়েকখানি সাময়িক পত্র সম্পাদনা করেন এবং ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত **Mookerjees Magazine** ও ফার্সি ভাষায় প্রকাশিত 'দূরবীণ' পত্র পরিচালনে যথেষ্ট সাহায্য করেন। এতদ্ভিন্ন বাবু, বিক্রমোর্ব্বশী, সাবিত্রী সত্যবান, মালতী মাধব প্রভৃতি কয়েকখানি নাটকও প্রণয়ন করেন। মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন এবং লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তিনি পুরস্কার ঘোষণা করিতেন। বহু দুঃস্থ সাহিত্যিক তাঁহার দানে বঙ্গভারতীর সেবা করিতে সমর্থ হইয়াছিল; তিনি কোন কারণে, বাঙ্গালী জাতির ব্যবহারে বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হইয়া 'পরিদর্শক' নামে দৈনিক পত্রখানি বন্ধ করিয়া দেন। পত্রিকাখানি বন্ধ হইলে ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন—"আমরা সম্পাদকের একটী সক্ষোভ অনুচিত প্রতিজ্ঞা দেখিয়া যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইলাম। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, বাঙ্গালী সমাজের এরূপ অবস্থা থাকিতে তিনি আর বাঙ্গালীদিগের উপকার করিবেন না।"

কালীপ্রসন্নের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এবং স্বীয় জন্মভূমির প্রতি কিরূপ প্রীতি ছিল, তাহা তাঁহার মহাভারতের উপসংহারে খুব সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে; নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:

"জগদীশ্বর সমীপে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, দেশীয় ক্ষমতাশালী ধনবান ব্যক্তিরা কায়মনে জন্মভূমির উন্নতি সাধনে নিযুক্ত হইয়া ধনের সার্থকতা সম্পাদন পূর্ব্বক অবিনশ্বর সৎ কীর্ত্তি লাভ করুন। তাঁহাদিগের যশঃ সৌরভে ভূমণ্ডল পরিপূরিত হউক। বিদ্যার বিমল জ্যোতি সাধনের হৃদয়-নিহিত মোহান্ধকার দূর করুক। দীর্ঘ কাল মলিনা ভারতবর্ষের

* বিবিধার্থ সংগ্রহ, আষাঢ় ১৭৮৩ শক, পৃষ্ঠা —৫২

সৌভাগ্য দিন দিন নবোদিত শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি হউক। সহৃদয় সাধু-জনেরা নিরাপদে চিরদিন স্বদেশীয় সাহিত্য রসাস্বাদনে কালাতিপাত করুন এবং শত শত অনুবাদক, গ্রন্থকার ও কবিবরেরা জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক ভাষা-দেবীকে অনুপম অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া সাধু সমাজের মনোরঞ্জন করত অমরতা লাভ করুন।"

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বঙ্গ সাহিত্যের তিনজন প্রতিভা-শালী ব্যক্তি তিনটি বিভাগে বিংশ শতাব্দীর পট ভূমিকা রচনা করেন; সেই তিনজন হইতেছেন—কাব্য-সাহিত্যে কবিবর মাইকেল মধুস্থদন দত্ত, গদ্য-সাহিত্যে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং নাট্য-সাহিত্যে মহাকবি নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ। মধুস্থদন যশোহরে জন্মগ্রহণ করিলেও, হুগলী জেলার সাহিত্যের ইতিহাসকে—বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হইবে না। কারণ প্রথম মুদ্রাযন্ত্র, প্রথম মুদ্রিত পুস্তক প্রথম গদ্য পুস্তক, প্রথম উপন্যাস, প্রথম সংবাদপত্র প্রভৃতি সাহিত্যের যাবতীয় উপকরণ এই জেলা হইতেই সর্ব্বপ্রথম বাহির হয়। তারপর বঙ্গভাষার বর্ত্তমান রূপদাতাগণ প্রায় প্রত্যেকেই এই জেলায় জন্মগ্রহণ করায় এই জেলা বঙ্গভাষার পূজারীগণের নিকট তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। আজ সেই তীর্থক্ষেত্রের ইতিহাসে কাব্য সাহিত্যের প্রতিভাশালী কবি মাইকেল মধুস্থদন দত্তের কাব্য সম্বন্ধে কিছু না বলিলে এই ইতিহাস অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। তাই হুগলী জেলার শ্রদ্ধাঞ্জলী তাঁহার উদ্দেশ্যে আমরা অর্পণ করিতেছি।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত নব্যতন্ত্রী হইলেও মধ্যযুগের তিনি শেষ কবি। তাঁহার পরলোকগমনের পর **মধুসূদন** কাব্য জগতে অপ্রতিহত প্রভাবে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। 'মেঘনাথ বধ' ও 'তিলোত্তমা-সম্ভব' অমৃতা-ক্ষর ছন্দে রচনা করিয়া কাব্যসাহিত্যে তিনি যুগান্তর আনয়ন করেন। তাহার রচনা দেখিয়া তৎকালীন সুধী সমাজ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া যায়।

মধুসূদনের পরিচয় মেঘনাথ বধ মহাকাব্য; তিনি যদি আর অন্য কোন গ্রন্থ রচনা না করিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে কাব্য জগতের সম্রাট বলিতে, কেহই বোধ হয় আপত্তি করিতেন না। অমৃতাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক হিসাবে বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কাব্যগ্রন্থ ব্যতীত কৃষ্ণকুমারী, পদ্মাবতী, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেঁায়া প্রভৃতি নাটক এবং হেক্টর-বধ নামে একখানি গদ্য কাব্যও রচনা করেন। মধুসূদন সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী নাটকের অনুকরণে বাঙ্গলা নাটক রচনা করেন, ইহাও তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি।

তারপর **বঙ্কিমচন্দ্র** বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া এক নূতন সরল সুমধুর ভাষার সৃষ্টি করিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে হুগলী কলেজে পাঠকালে তিনি "ললিতা পুরাকালিক গল্প তথা মানস" রচনা করেন। সেই সময় কবি ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইত। তাহার পর 'দুর্গেশনন্দিনী' তাঁহার নবসৃষ্ট ভাষায় নবচিন্তা, নবচিত্র, নবভাব ও নবশক্তির আদর্শ লইয়া আবির্ভূত হইলে বঙ্গ সাহিত্যে এক নবযুগের সৃষ্টি হইল। এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন ঃ

বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদপদ্ম সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল। পূর্ব্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য! বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত "সমাগতো রাজ বদুন্নতধ্বনিঃ" এবং মুষল ধারে ভাব বর্ষণে বঙ্গ-সাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ

পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত-কলরবে মুখরিত করিয়া

তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল। *

'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে Indian Field নামক সাপ্তাহিক পত্রে তাঁহার ইংরাজী উপন্যাস 'Rajmohon's Wife' প্রকাশিত হয়। তখন বঙ্গদেশে পাশ্চাত্ত্য ভাবের বন্যায় শিক্ষিত সম্প্রদায় হাবুডুবু খাইতেছেন—ইংরাজীতে তাঁহারা স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এই মোহ কাটিয়া যায় এবং বোধ হয় মাইকেল মধুসূদনের মত তিনিও বলিয়াছিলেন—

"হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন—
তা' সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি'
পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।"

"বঙ্গদর্শনের" অনুষ্ঠানপত্রে তাই তিনি লিখিয়াছিলেন—"আমরা যত ইংরাজী পড়ি, যত ইংরাজী কহি বা যত ইংরাজী লিখি না কেন, ইংরাজী কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্ম স্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময় ধরা পড়িব।"

বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু রমেশচন্দ্র দত্ত 'দুর্গেশনন্দিনী' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: "যখন 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটি নূতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকচ্ছটায় চমকিত হইল, সে বলার্ক কিরণে প্রফুল্ল হইল, সে দীপ্তিতে স্নাত হইয়া স্তুতিগান করিল। কলিকাতা ও ঢাকা এবং পশ্চিম ও পূর্ব্বদেশ হইতে আনন্দ রব উত্থিত হইল, বঙ্গবাসীগণ বুঝিল সাহিত্যে একটি নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে। †

* আধুনিক সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা ২

† সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—১৩০১ সাল, শ্রাবণ, পৃষ্ঠা ৪

ক্রমে কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, যুগলাঙ্গুরীয়, বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, কমলাকান্তের দপ্তর, রাজসিংহ, রজনী, সীতারাম প্রভৃতি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান বাঙ্গলাভাষা ও বাঙ্গালীর ভাবধারা যে আকার ধারণ করিয়াছে তাহা যে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্যই হইয়াছে, তাহা সুনিশ্চিত। বঙ্কিমচন্দ্রের আকর্ষণে আরও কয়েকজন ব্যক্তি বঙ্গবাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন—তন্মধ্যে হুগলী জেলার অক্ষয়চন্দ্র সরকারের নাম উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা স্পর্শমণির ন্যায় যাহাকে স্পর্শ করিয়াছে—তাহাই যেন ঠিক সোনা হইয়া গিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন—"যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে অগম্য কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম।" বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, সমালোচক, ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও দার্শনিক এবং তিনি নিজে সাহিত্যের সকল পথ খুলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, সেনাপতির ন্যায় সেই সমস্ত পথে যে বিচরণ করিয়াছিলেন, তাহা আজ আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় দেওয়া আমার ন্যায় নগণ্য লেখকের পক্ষে অসম্ভব, তবে হুগলী জেলার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য এবং নাড়ীর যোগ আছে বলিলেও কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি হইবে না। তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা এবং লীলাভূমি ছিল এই হুগলী জেলা—এই স্থানের চুঁচুড়ায় জোড়াঘাটের বাড়ীতে অবস্থানকালে তাঁহার রজনী (১৮৭৭) উপকথা (ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয় ও রাধারাণী একত্রে, (১৮৭৭) কবিতা পুস্তক (১৮৭৮) কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৯) প্রবন্ধ পুস্তক (১৮৭৮) সাম্য (১৮৭৯) প্রভৃতি পুস্তকগুলি প্রকাশিত হয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই

জুলাই তারিখে তিনি চুঁচুড়া হইতে নবীনচন্দ্র সেনকে পত্র লিখেন, তাহা হইতে এই স্থানে বসিয়া তিনি 'আনন্দমঠ' ও ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করিতেছিলেন, এই কথা তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন। সেই আনন্দমঠের প্রাণস্বরূপ আমাদের জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম' তাঁহার হৃদয়কন্দর হইতে বহির্গত হইয়া ভারতবর্ষে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল; সেই ঝঙ্কারে সমগ্র দেশ মুখরিত, ভারতবাসী তাঁহারই সেই নবমন্ত্রে আজ দীক্ষিত।

তিনি কাঁটালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করিলেও, তাঁহার পৈত্রিক আদি নিবাস ছিল হুগলী জেলার দেশমুখো গ্রামে; তাঁহাদের জ্ঞাতিবর্গ অদ্যাপি উক্ত স্থানে বসবাস করেন। এই সম্বন্ধে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে "সঞ্জীবনী-সুধা" নাম দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অনুজ সঞ্জীবচন্দ্রের যে রচনা সঙ্কলন করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল, ইহা হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের বংশপরিচয় পাওয়া যাইবে। "অবসতি গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেণীর ফুলিয়া কুলীনদিগের পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার বাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতি দেশমুখো। তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ কাঁটালপাড়া গ্রাম নিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায় * মাতামহের বিষয় প্রাপ্ত হইয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলেন। সেই অবধি রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় সকলেই কাঁটালপাড়ায় বাস করিতেছিলেন।"

কাব্য-জগতের একচ্ছত্র সম্রাট মাইকেল মধুসূদনের ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথমে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই অন্তবর্ত্তী কালে দুইজন কবি দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে রাজত্ব করেন। একজন কবি **হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** আর

---

* বঙ্কিমচন্দ্র রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র

একজন কবি নবীনচন্দ্র সেন। ইহাদের মধ্যে কবি হেমচন্দ্র উত্তরপাড়ার আদি অধিবাসী হইলেও, তাঁহার মাতুলালয় হুগলী জেলার গুলিটা রাজবল্লভহাটে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল এবং পরবর্ত্তীকালে মধুসূদনের সহিত ঘনিষ্ট পরিচয়ে কাব্য রচনার দিকে তাঁহার ঝোঁক হয় এবং ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চিন্তাতরঙ্গিনী' প্রকাশিত হয়। পরে 'বীরবাহুকাব্য', কবিতাবলি, প্রভৃতি কয়েক খানি কাব্যগ্রন্থ প্রনয়ণ করেন। হেমচন্দ্র তাঁহার কাব্যে ও কবিতায় জাতীয়তা বোধ উদ্বুদ্ধ করেন।

"অসভ্য চীন অসভ্য জাপান।
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

প্রভৃতি কবিতা বঙ্গে সুপরিচিত। তাঁহার 'বীরবাহু কাব্যে'র আখ্যা-পত্রে একটি সুন্দর কবিতা আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

"আর কি সেদিন হবে জগত জুড়িয়া যবে
ভারতের জয়কেতু মহাতেজে উড়িত।
যবে কবি কালিদাস, শুনায়ে মধুর ভাষ,
ভারতবাসীর মন জানা রসে তুষিত॥
যবে দেব অবতংশ, রঘু কুরু পাণ্ডুবংশ,
যবনে করিয়া ধ্বংস ধরাতল শাসিত।
ভারতের পুনর্ব্বার সে শোভা হবে কি আর
অযোধ্যা হস্তিনা পাটে বিন্দু যবে বসিত॥"

মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রকে বাঙ্গলার

কাব্য-সিংলাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উল্লিখিত হইল :

"কিন্তু বঙ্গ-কবি-সিংহাসন শূন্য হয় নাই। এ দুঃখ সাগরে সেইটি বাঙ্গালীর সৌভাগ্য-নক্ষত্র, মধুস্থদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক! বঙ্গকবির সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি অনন্তধামে যাত্রা করিয়াছেন—কিন্তু হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গ-মাতার ক্রোড় স্থকবিশূন্য বলিয়া আমরা কখন রোদন করিব না।" *

তিনি বৃত্রসংহার, আশাকানন, দশমহাবিদ্যা, হুতোম প্যাঁচার গান চিত্তবিকাশ, রোমিও জুলিয়েত প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এবং নলীনী বসন্ত নাটক রচনা করিয়া সেই সময়কার শিক্ষিত বাঙ্গালীকে ভেরী ও সিঙ্গা রবে মাতাইয়া ছিলেন।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের মর্ম্ম সেই সময় কেহই বুঝিতে পারেন নাই এবং সাহিত্যিকগণের মধ্যে একমাত্র কবি হেমচন্দ্র ও নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্র ব্যতীত কেহই বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত সঙ্গীত গ্রহণ করেন নাই। কবি হেমচন্দ্র, বন্দেমাতরম্‌কে জাতীয় সঙ্গীত রূপে প্রচলিত করিবার জন্য 'রাখিবন্ধন' কবিতা রচনা পূর্ব্বক তন্মধ্যে বন্দেমাতরমের কয়েক পংক্তি সন্নিবেশিত করেন এবং তাহাই জাতীয় সঙ্গীতরূপে সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশে গীত হয়। নিম্নে উক্ত গীতটি উদ্ধৃত হইল :

ভারত জননী জাগিল।
পূরব বাঙ্গলা মগধ বিহার
দেরাইসমাইল হিমাদ্রির ধার
করাচি মান্দ্রাজ সহর বোম্বাই
স্থরাট গুজরাটী মারহাটী ভাই
চৌদিকে মায়েরে ঘেরিল।

* বঙ্গদর্শন, ভাদ্র—১২৮০

প্রেম আলিঙ্গনে করে রাখি কর
খুলে গেছে হৃদি হৃদি পরস্পর
এক প্রাণ সবে এক কণ্ঠস্বর
সুখে জয়ধ্বনি করিল।

প্রণয় বিহ্বলে ধরে গলে গলে
গাহিল সকলে মধুর কাকলে
গাহিল 'বন্দেমাতরম্'
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনিং
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনিং
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিনীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্—
বহুবলধারিনীং নমামি তারিনীং,
রিপুদল বারিনীং বন্দে মাতরম্'।

উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে
তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জয়স্বরে
ভারত জগত মাতিল।
আনন্দ উচ্ছ্বাস ফুটেছে বদনে
মায়েরে বসায়ে হৃদি সিংহাসনে,
চরণ যুগল ধরি জনে জনে
একতার হার পরিল।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন—"কীর্ত্তিই জীবন। মহাপুরুষগণের কীর্ত্তি-কীর্ত্তনই তাঁহাদের প্রকৃত জীবনী। কবির কবিত্ব-কীর্ত্তনই কবির জীবনী।"

এই সম্বন্ধে ডক্টর হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন "বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম'-ই জাতীয় মহাসম্মিলনীর জাতীয় মহাসঙ্গীত; কিন্তু তখনও বন্দেমাতরমের মর্ম্ম কেহ বুঝেন নাই। সহযোগী সাহিত্যিকেরাও ইহা পছন্দ করিতেন না। বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়া নেতৃবৃন্দ আনন্দধ্বনি (cheers) বিদেশীর অনুকরণে করিতেন। বন্দেমাতরম তখন তাঁহারা ভাবিতে আরম্ভ করেন নাই। কিন্তু অল্পদিন মধ্যে চাকুরী করিতে করিতে বঙ্কিমচন্দ্র শুনিলেন যে, তাঁহারই বন্ধু হেম তাঁহারই স্বরে স্বর মিলাইয়া তাহারই সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি করিয়া এই উৎসব উপলক্ষে 'রাখিবন্ধন' কবিতা রচনা করিয়া উদাত্ত কণ্ঠে গাহিতেছেন।······কবীর সঙ্গীতে বাঙ্গলা উদ্দীপিত হইল।" *

হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা **ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** 'যোগেশ কাব্য' রচনা করিয়া বঙ্গীয় পাঠক সমাজে সমধিক পরিচিত হন। চিত্ত মুকুর তাহার প্রথম পদ্য গ্রন্থ, তারপর বাসন্তী ও চিন্তা নামে গীতি কাব্য দুইখানি প্রকাশিত হয়।

ঈশানচন্দ্রের উদ্যোগে বাঁশবেড়িয়া হইতে 'পূর্ণিমা' নামে ১৩০০ বঙ্গাব্দে একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। কাব্য জগতে তাঁহার প্রতিষ্ঠা কিরূপ ছিল, তাহা 'যোগেশ কাব্য' পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি আত্মহত্যা করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দেন। তিনি 'সুধাময়ী' নামক একখানি উপন্যাস রচনা করিতেছিলেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। গদ্য রচনায়ও তিনি সিদ্ধ হস্ত ছিলেন—তন্মধ্যে পূর্ণিমায় প্রকাশিত বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী উল্লেখযোগ্য

* ভারতের জাতীয় কংগ্রেস—১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৯৩

'বাসন্তী' হইতে তাঁহার কবিতা কয়েক লাইন উল্লিখিত হইল :

"সুখশূন্য মরুপ্রায় তবে কি সংসার ?
জীবন কি কিছু নয়, শুধু যন্ত্রণাময়
এত ক্লেশ এত শ্রম সব কি মিছার ?
এই দেহপিণ্ড লয়ে, এ অনন্ত দুঃখ সয়ে
পার্থিব জীবন ফিরে বিড়ম্বনা সার ?
নরভাগ্যে জীবনে কি নাহি পুরস্কার ?"

এই সময়ে হুগলী জেলায় জেজুর গ্রামে কবি **রাধামাধব মিত্র** এবং বড়া গ্রামে পল্লীকবি রসিকচন্দ্র রায় তাঁহাদের রচনায় কাব্য সাহিত্যকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেন। রাধামাধব কবি ঈশ্বর গুপ্তের প্রিয় শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর 'সংবাদ প্রভাকর' মাসিক সংস্করণ, গুরুর ধারা বজায় রাখিয়া আট বৎসর যাবৎ সম্পাদনা করেন। এতদ্ব্যতীত রসার্ণব, সুধাকর সুজন রঞ্জন, বঙ্গরঙ্গ, দ্বিজরাজ প্রভৃতি কয়েকখানি সাময়িক পত্রও তিনি সম্পাদনা করেন। সেই কবিতার যুগে অজস্র কবিতা ও কয়েকখানি কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি যশস্বী হন। তাঁহার কাব্যগুলির মধ্যে কবিতাবলী (পাঁচ খণ্ড) বোধেন্দুদয়, স্ত্রীলোকের দর্প চূর্ণ, বিধবা মনোরঞ্জন নাটক, বণিতামরণ খেদের কারণ, স্ত্রী-পুরুষে দ্বন্দ্ব, শারদীয় মহোৎসব, ভাবলহরী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। *

রাধামাধবের রচনার নিদর্শন এইরূপ :

"পরোক্ষে লোকের নিন্দা যে মানব করে।
লোকের অনিষ্ট চেষ্টা, করে, করে করে ॥
অধম তাহার মত কেহ নাই আর।
অত্যন্ত জঘন্য হয়, স্বভাব তাহার ॥

* "বঙ্গশ্রী" ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৫৩, পৃষ্ঠা ২২৫-২৩০, ১০৫-১১২।

ডক্টর সুকুমার সেন কবি রাধামাধব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

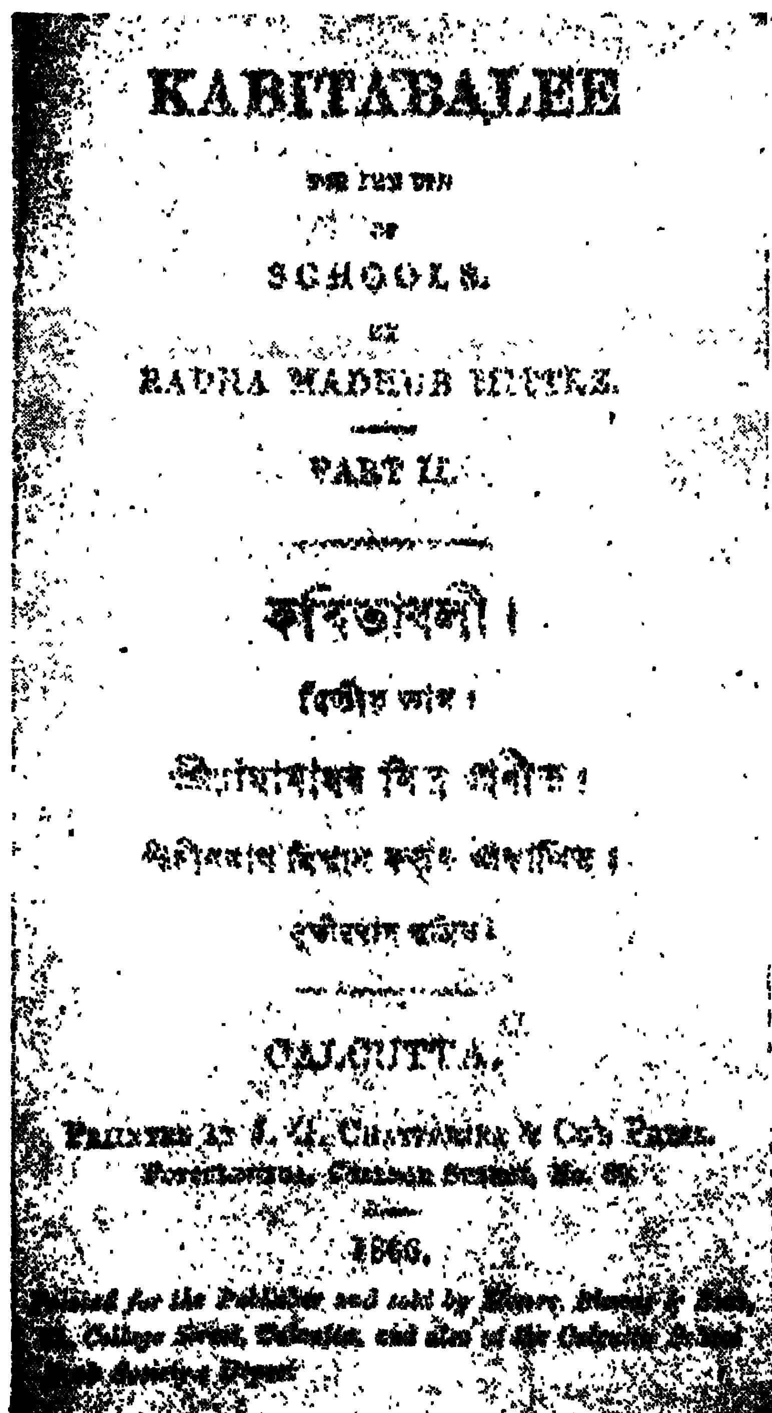
"জেজুর নিবাসী রাধামাধব মিত্র ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য। রাধামাধব কিছু কাল মাসিক প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদনা করিয়াছিলেন। তাহাতে ইঁহার অনেক কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল রাধামাধব শীলস্ ফ্রী কলেজের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। ইঁহার কবিতা গ্রন্থের মধ্যে 'বোধেন্দুদয়' (১৮৬৩) এবং পাঁচখণ্ড 'কবিতাবলী' (১৮৬৮-৭৩) পাঠ্য পুস্তক হিসাবে লেখা হইয়াছিল। আলোক নাথ ন্যায়ভূষণের সহযোগিতায় রাধামাধব আরব্য উপন্যাসের গদ্য অনুবাদ করিয়াছিলেন (১৮৭৬)। 'স্ত্রীলোকের দর্পচূর্ণ' (১৮৬৩)প্রণয়ঘটিত আখ্যায়িকা কাব্য। ইঁহার প্রথম গ্রন্থ হইতেছে বিধবা বিবাহের সমর্থনে রচিত' 'বিধবা মনোরঞ্জন নাটক' (১৮৫৬, দ্বি-স ১৮৭৭)। রাধামাধব মিত্র দীর্ঘজীবী ছিলেন (১৮২৫—১৯২১)।" *

সুকুমার বাবু রাধামাধবের 'কবিতাবলী' পাঁচখণ্ডের প্রকাশ কাল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক। তাঁহার 'কবিতাবলী' ২য় ভাগ (তৃতীয় সংস্করণ) একখণ্ড আমার নিকট আছে, উহার ভূমিকা হইতে ২য় ভাগের প্রকাশকাল "২৭শে শ্রাবণ ১২৬৮" বলিয়া লেখা আছে দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলা ১২৬৮ সাল ইংরেজী "১৮৬১ খৃষ্টাব্দ" হইবে। প্রথম ভাগ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নিশ্চয়ই প্রকাশিত হইয়াছিল। 'কবিতাবলী' ২য় ভাগের আখ্যা পত্রের (Title Page) প্রতিলিপি পাঠকগণের অবগতির জন্য পর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল।

রসিকচন্দ্র মাত্র দশ বৎসর বয়সে ছড়ার মত কবিতা বলিতে পারিতেন এবং সেই সময় হইতেই তাঁহার কবি প্রতিভার বিকাশ হয়। 'জীবনতারা' কবির প্রথম কাব্য গ্রন্থ ; হাস্যকরুণ ও আদিরসের সমবায়ে

---

* বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, শ্রীসুকুমার সেন, পৃষ্ঠা ১৮৬-১৮৭।


KABITABALEE

SCHOOLS.

PART II.

কবিতাবলী।

দ্বিতীয় ভাগ।

CALCUTTA.

1866.

কবিতাবলীর (২য় খণ্ড) আখ্যাপত্র

এই গ্রন্থ পাঠকের মনে আনন্দরসের সৃষ্টি করিলেও ইহার মধ্যে অশ্লীল অংশ থাকায় সরকার হইতে ইহার প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। পরে 'নব জীবনতারা' নামে আপত্তিকর অংশ বাদ দিয়া ইহা পুনঃ মুদ্রিত হয়। তাঁহার রচনার মধ্যে পদ্যসূত্র (দুই খণ্ড) শ্রীকৃষ্ণ প্রেমাঙ্কুর, হরিভক্তি চন্দ্রিকা, পদাঙ্কদূত, দশমহাবিদ্যা, শকুন্তলা বিহার, বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়, কুলীন কুলাচার প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি গোবিন্দ অধিকারী, রাধাকৃষ্ণ, নবীন শুঁই, মহেশ চক্রবর্ত্তী, প্রভৃতি যাত্রাওয়ালাদের যাত্রার গান এবং সোনা পটুয়া, শশী চক্রবর্ত্তী, ত্রিপুরা বিশ্বাসকে পাঁচালীর গান ও ছড়া রচনা করিয়া দেন। রবীন্দ্রনাথের অত্যুজ্জ্বল আলোকে এই সমস্ত কবি বর্ত্তমানে ম্লান হইয়া যাইলেও তৎকালের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের নিকট, ইহারা সাহিত্য স্রষ্টারূপে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিলেন।

নিম্নে রসিকচন্দ্রের রচনা হইতে কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল :

এ জগতে দোষ নাহি চুরির সমান।
মন যায় ধন যায় আর যায় প্রাণ ॥
দেশে অপবাদ অপরাধ কত।
সবার ঘৃণিত কাজ নিন্দা শত শত ॥
একে পাপ যোগাযোগ তায় অনুযোগ।
কখনও চোরের দ্রব্য নাহি হয় ভোগ ॥

হুগলী জেলায় আর একজন সু-সাহিত্যিক ও সমালোচক জন্মগ্রহণ করেন; তিনি হইতেছেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার। তাঁহার পিতা গঙ্গাচরণ সরকারও একজন সাহিত্যিক ছিলেন এবং ঋতুবর্ণন, হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা এবং বাঙ্গলা সাহিত্য ও বঙ্গভাষা প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার পুত্র সম্পাদিত 'সাধারণী' ও

'নবজীবনে' গঙ্গাচরণের অনেক সুলিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছিলেন—"আমাদের শেষ পয়ার-প্রিয় ছিলেন অক্ষয় ভায়ার সর্ব্বজন সম্মানিত পিতা রসসাগর গঙ্গাচরণ। তাঁহার কবিতা পড়িলে মনে হয়, আমাদের ঘরের লোকের দ্বারা লিখিত আমাদের ঘরের ও মরমের কথা পড়িতেছি।" * বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষয়চন্দ্রের সহাধ্যায়ী ছিলেন; সুতরাং উত্তরাধিকার সূত্রে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আকর্ষণে তিনিও একজন সুসাহিত্যিক বলিয়া বঙ্গদেশে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন।

যে সময়ে কথা বলিতেছি, সেই সময় বহরমপুর বিদ্বজ্জনমণ্ডলী দ্বারা পূর্ণ ছিল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডক্টর রামদাস সেনের বাটী বহরমপুর; তাঁহার গ্রন্থাগার বহু ইংরাজী, বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পুস্তকে পূর্ণ থাকিত। হুগলী জেলার পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন সেই সময় বহরমপুর কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। বাঙ্গলার ইতিহাস লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বহরমপুরে ওকালতী করিতেন। প্রসিদ্ধ ব্যাকরণকার লোহারাম শিরোরত্ন মহাশয় বহরমপুর নর্ম্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন, সেই সময় গঙ্গাচরণ সরকার বহরমপুরে মুন্সেফ, দীনবন্ধু মিত্র পোষ্টাল ইনস্পেক্টার, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার বহরমপুরের উকিল। এই সাহিত্যিকগণের একত্র সমাবেশের ফলে তথায় বাঙ্গলা ভাষা চর্চ্চার এক মহেন্দ্রযোগ উপস্থিত হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তীকালে ইহার অপূর্ব্ব পরিণতি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' (১লা বৈশাখ ১২৭৯) এবং অক্ষয়চন্দ্রের 'সাধারণী'র (১১ই কার্ত্তিক ১২৮০) আবির্ভাব।

অক্ষয়চন্দ্র 'সাধারণী' সম্পাদনা করিতেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত একযোগে 'বঙ্গদর্শনে' লিখিতেন। তাঁহার 'গ্রাবু', 'দশমহাবিদ্যা' প্রভৃতি

* পৃথিবীর সুখ দুঃখ—চন্দ্রনাথ বসু, পৃষ্ঠা—৫৭

প্রবন্ধগুলি 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"বঙ্গদর্শনের অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ তাঁহারই প্রণীত; সেই সকল প্রবন্ধগুলির সবিশেষ আলোচনা করিলে, অনেকেই স্বীকার করিবেন যে অক্ষয় বাবুর ন্যায় প্রতিভাশালী গদ্যলেখক অল্পই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।"

বঙ্গ সাহিত্যে অক্ষয়চন্দ্রের একদিন অমিত প্রতাপ ছিল এবং বঙ্কিম পরিমণ্ডলের অন্যতম জ্যোতিষ্ক বলিয়া তিনি প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সাদরে তাহার 'চন্দ্রালোকে'প্রবন্ধটিকে কমলাকান্তের দপ্তরে স্থান দিয়া অক্ষয়চন্দ্রকে সম্মানিত করিয়া গিয়াছেন। অক্ষয়চন্দ্রের প্রত্যেক রচনার মধ্যে তাঁহার অকৃত্রিম দেশাত্মবোধ ও স্বদেশপ্রীতি পরিস্ফুট হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার 'দশমহাবিদ্যা' নামক প্রবন্ধ 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হইবার বহু পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল; উক্ত প্রবন্ধে ভারতমাতার দশদশা বর্ণনা প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছিলেন:

"আমার বোধ হয় যে এই ভারতবর্ষের দশ দশাই দশমহাবিদ্যা। এক্ষণে সপ্তমী দশা চলিতেছে, সেই দশার প্রতিমূর্ত্তিই ধূমাবতী মূর্ত্তি। কিন্তু তাহার পর মাতা আবার বগলা মূর্ত্তিতে দেখা দিবেন। ভারত মাতা আবার রত্ন সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হইবেন, ভারত মাতা আবার স্বভূষণে ভূষিতা হইবেন। এমন দিন হইবে······ইহার পরেই ভারতের মাতঙ্গী মূর্ত্তি। ভারতমাতা আপনার চির পরিচিত দয়ায় বশবর্ত্তিনী হইয়া সেই করকবলিত শত্রুকে বিমুক্ত করিয়াছেন; আত্মরক্ষার্থ খড়্গচর্ম্ম ধারণ করিয়াছেন; শাসনাস্ত্রে পাশাঙ্কুশ পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়াছেন; রত্নপদ্মাসনে রক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া বিরাজ করিতেছেন। ইহার পর মা 'মহালক্ষ্মী' রূপে ভবে দেখা দিবেন······ভারতমাতার যুগ যুগান্তরের মল রাশি শ্বেত হস্তি-শুণ্ড অমৃতবারি সেচনে বিধৌত করিয়া দিতেছে। ভারতমাতা অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন; পদ্মাসনে পদ্মাসনা পদ্মহস্তে জগতে অভয় দান;

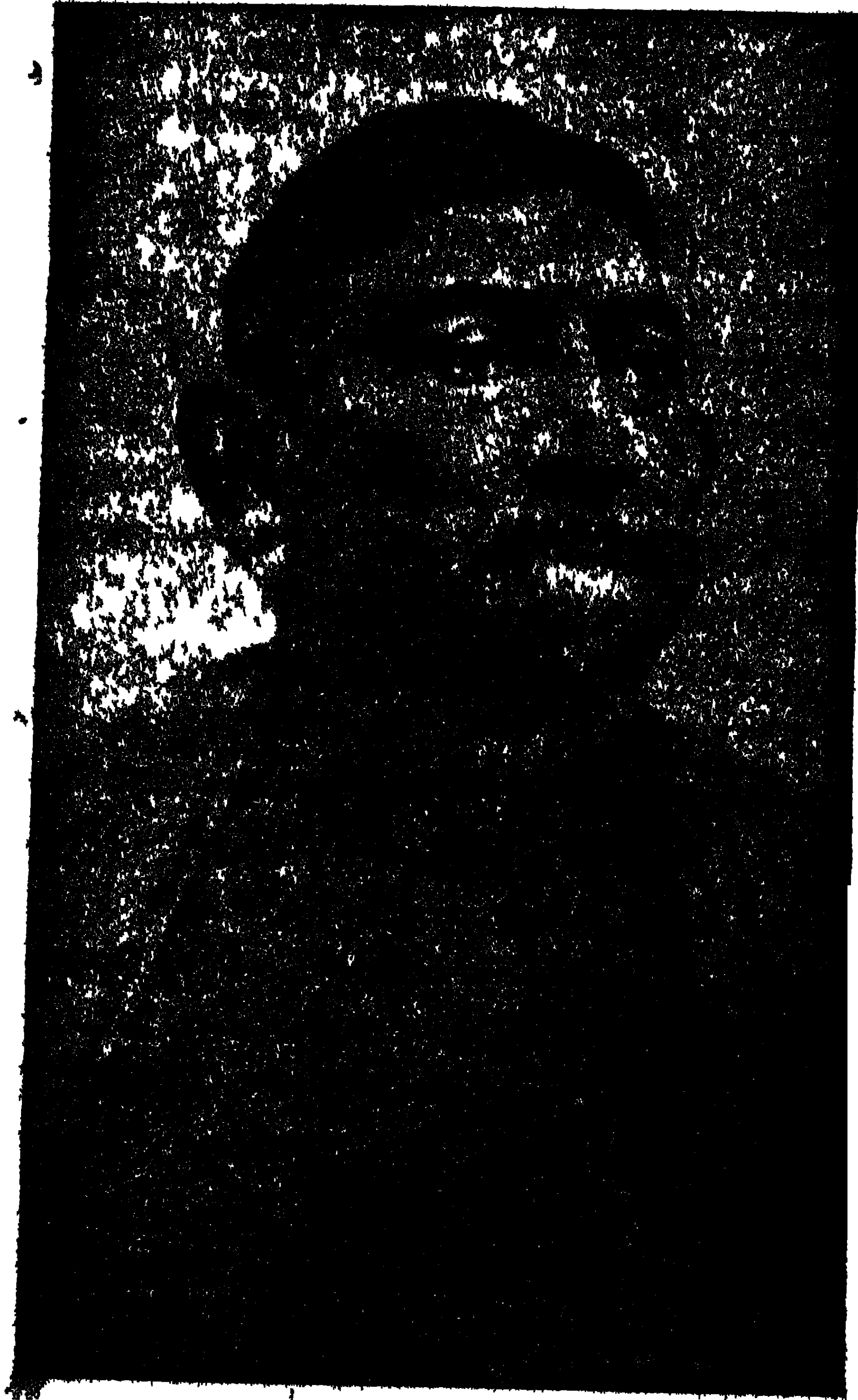
করিতেছে। আহা কি শুভ দিন! শরীর রোমাঞ্চ হয়। সকলে একবার আনন্দধ্বনি কর। ভারতমাতার অভিষেক হইতেছে। মাতা যোগিনী মূর্ত্তি, রাজ্ঞী মূর্ত্তি, এমন যে ভুবনে অতুলা ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি—মাতা তাহা গ্রহণ করেন নাই। মা এখন মহালক্ষ্মীভাবে শোভা পাইতেছেন—সকলে জয়ধ্বনি কর।" এই জয়ধ্বনি "বন্দেমাতরম্"--ইহার সহিত আনন্দমঠের মাতৃমূর্ত্তি তুলনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে।

অক্ষয়চন্দ্রের রচিত ও সম্পাদিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উল্লেখযোগ্য। তাঁহার অধিকাংশ রচনা পুস্তকাকারে সংগৃহীত হয় নাই। শিক্ষানবিশের পদ্য, প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ, সমাজ সমালোচনা, গোচারণের মাঠ, হাতে হাতে ফল, সংক্ষিপ্ত রামায়ণ, আলোচনা, সনাতনী, কবি হেমচন্দ্র, মোতী কুমারী মহাপূজা, রূপক ও রহস্য, সাহিত্য-সাধনা এবং সাহিত্য পাঠ।

তিনি 'সাধারণী' ব্যতীত 'নবজীবন' নামে আর একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ তাঁহার হস্তে রাজ্যভার দিয়া প্রায় বিদায় গ্রহণ করেন। এই নবজীবন ও প্রচার পত্রিকায় বঙ্কিম-চন্দ্র ধর্ম্মতত্ত্ব ও অনুশীলনের ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করেন। অক্ষয়চন্দ্রের রচনার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাহা ক্ষুদ্র হইলেও সহজ, সরস ও সুন্দর হইত। তাই বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয়চন্দ্রের রচনা অন্যতম আদর্শ হইয়া থাকিবে। তিনি উকিলের মত যুক্তি দিয়া তাঁহার বক্তব্য পাঠকের হৃদয়ে গাঁথিয়া দিতে পারিতেন, ইহাই তাঁহার রচনার একটি বিশেষত্ব ছিল।

এই সময় নাট্য সাহিত্যে হরিপালের আদি-অধিবাসী মহাকবি গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করে। "বাঙ্গলা সাহিত্যের গঠন ও ক্রমবিকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের যে স্থান, বাংলার নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের ঠিক অনুরূপ স্থান। তাঁহার ভাব ও ভাষা, তাঁহার ছন্দ ও উচ্চারণ বর্ত্তমান নাট্য সাহিত্যের ছাঁদ ঠিক করিয়া দিয়াছে।" *

* বর্ত্তমান বাঙলা সাহিত্য—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৫০০



গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের স্রষ্টা। গিরিশচন্দ্র অভিনয়োপযোগী বঙ্গভাষায় নাটকের অভাব দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম নাটকান্তরিত করিয়া অভিনয় করেন। বঙ্কিমচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের নাট্যরূপ দেখিয়া বিশেষ প্রীত হন এবং পরবর্ত্তীকালে সাহিত্যসম্রাটের যাবতীয় উপন্যাস গিরিশচন্দ্রই নাটকে রূপান্তরিত করেন। পরে তিনি স্বয়ং নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক নাটক প্রায় পঁচাত্তরখানি রচনা করিয়া অভিনয় করেন। তাঁহার 'চৈতন্যলীলা' নাটকের অভিনয়ের খ্যাতি শুনিয়া যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব পর্য্যন্ত অভিনয় দর্শন করেন ও অভিনয় দেখিয়া রঙ্গালয়ের মধ্যেই তিনি সমাধিস্থ হইয়া যান।

তাঁহারা জাতীয়তামূলক সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, ছত্রপতি শিবাজী প্রভৃতি নাটকগুলি তাঁহার দেশাত্মবোধের পরিচায়ক। লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁহার সিরাজদ্দৌলা নাটকের অভিনয় দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যান এবং বলেন যে, আমরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য সহস্র বক্তৃতা মঞ্চ হইতে যাহা করিতে অসমর্থ; গিরিশচন্দ্র একটি অভিনয়ের মধ্য দিয়া বঙ্গদেশের তদপেক্ষা সহস্রগুণ উপকার করিতে সমর্থ হইতেছেন এ কথা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।

গিরিশচন্দ্র একাকী যত নাটক রচনা করিয়াছেন, পৃথিবীর কোথাও কোন নাট্যকার এতগুলি নাটক রচনা করিতে সমর্থ হন নাই; নাটক রচনায় ইহা তাঁহার 'রেকর্ড' বলিতে পারা যায়। ইংরাজী ভাষা হইতে তাঁহার ন্যায় অনুবাদ কেহই করিতে পারিতেন না। সেক্সপিয়ারের 'ম্যাকবেথে'র অনুবাদ ফরাসী ভাষায় সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া কথিত; কিন্তু গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক 'ম্যাকবেথে'র অনুবাদ ফরাসী ভাষাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া মিঃ এন, এন, ঘোষ প্রমুখ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার এক বন্ধু ম্যাকবেথের উইচ (witch) বঙ্গভাষায় অনুবাদ করা সম্ভব নয় বলায়, তিনি উক্ত নাটকের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন।

গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ যে কিরূপ প্রকৃষ্ট ছিল, দুই একটি স্থান হইতে তাহার পরিচয় দিতেছি :

Where shall we three meet again
In thunder lightening and rain ?
When the hurly, burly done
When the battle's lost or won

গিরিশচন্দ্র ইহার অনুবাদ করেন :

দিদিলো বল্‌না আবার মিলব কবে তিন বোনে.
যখন ঝরবে মেঘা ঝুপুর ঝুপুর
চক্ চকাচক্ হান্‌বে চিকুর
কড় কড়াকড়্ কড়াৎ কড়াৎ
ডাকবে যখন ঝন্‌ঝনে ?
যখন বাধবে মাতবে, হারবে
জিন্‌বে থাম্‌বে লড়াই রণরণে

1st witch—Where to meet ?
2nd witch—Upon the heath
3rd witch—There to meet Macbeth.

১ম—কোন্‌খানে বোন কোন্‌খানে
ঠিকঠাক বলে দেলো যেতে হবে কোন্‌খানে ?
২য়—ভূষণো র্ঁাড়ীর মাঠে যাব
৩য়—ম্যাকবেথেরে দেখা দেবো ঝাপটি মেরে এককোণে৷

ম্যাকবেথে আর এক স্থানে আছে :

A sailor's wife had chestnuts in her lap
And she munch'd and munch'd and munch'd.

এলো চুলে মালার মেয়ে ব'সে উদোম গায়
ভোর কোঁচড়ে ছেঁচা বাদাম চাকুম চুকুম্ খায়।

ম্যাক্‌বেথ ডাক্তারেব কাছে তাহাব স্ত্রীর অসুখের কথা শুনিয়া নিজের কথা এইরূপ বলিতেছে :

Canst thou not minister to a mind diseased
Pluck from the memory a rooted sorrow ;
Raze out the written troubles of the brain
And, with some sweet oblivious antidote
Cleanse the stuff'd bossom of that perilous stuff
Which weighs upon the heart ?
Doctor—There-in the patient must minister to himself

গিরিশচন্দ্রের বঙ্গানুবাদ :

পার নাকি মনো'ব্যাধি করিতে মোচন
স্মৃতি হ'তে উখাড়িতে নহে কি হে তুমি
দুরন্ত সন্তাপ বদ্ধমূল ?
অগ্নিবর্ণে—থরে থরে মস্তিষ্ক মাঝারে
লেখা অনুতাপ লিপি—
আছে কি কৌশল তব মুছিবারে তায় ?
অন্তর সরল যাব প্রবল পীড়নে !
ব্যথিত হৃদয়াগার—
বিস্মৃতি অমৃতবারি করি দান
ধৌত কর—পারো যদি—।
ডাক্তার—এ ভীষণ রোগে মাত্র রোগীই ভিষক্

সংস্কৃত ভাষার প্রতি গিরিশচন্দ্রের অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল এবং বঙ্গ-

ভাষায় সেই জন্য কোন দৈন্য হইবে না বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন।* তিনি লিখিয়াছিলেন :

"দেব ভাষা পৃষ্ঠে যার, কিসের অভাব তার
কোন ভাবে বাক্যে ভাবে হেন সংযোজন।
মধুর গুঞ্জরে অলি, বিকাশে কমলে কলি
কোন ভাবে কুঞ্জবনে কোকিল কুহরে,
কালের করাল হাসি, দলকে দামিনী রাশি
নিবিড় জলদ জাল ঢাকে বা অম্বরে।"

জাতীয়তার মূলমন্ত্র যে স্বার্থত্যাগ, তাহা তিনি তাঁহার বহু নাটকে লিখিয়া গিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার 'চণ্ড' নাটক হইতে কয়েক লাইন উল্লিখিত হইল :

অন্তরের গূঢ়স্থান কর অন্বেষণ
মন। পশি' অভ্যন্তরে গুহ্যতম স্তরে
হের কোথা স্বার্থ লুক্কায়িত। উচ্চ-আশ
উন্নতি প্রয়াস, আছে কি গোপনে ধরি
স্বদেশ-বৎসল ভাব? অধিপত্য লিপ্সা
কিম্বা চিতোরের হিতে চালিত অন্তর?
সত্যতত্ত্ব কর নিরুপণ। দেখ মন,
স্বার্থশূন্য নহে কি অন্তর?

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশায়' সহজ অমৃতাক্ষর ছন্দের কয়েক লাইন দেখিয়া তিনিই প্রথম নাটকের মধ্যে উক্ত ছন্দ

* অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গিরিশচন্দ্র' ডক্টর হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্তের 'গিরিশ প্রতিভা' এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গিরিশ বক্তৃতামালার' মহাকবির সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত আছে।

প্রচলন করেন। মহাকবি গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যাহা বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

গিরিশচন্দ্রকে আমি মহাকবি বলি কেন? যাঁর কবিতায় ধর্ম্ম নাই প্রাণ নাই, সে কবি অধিক দিন বাঁচে না! মহাকবি বলি কাকে? যাঁর কবিতায়, গানে, রচনায়, ধর্ম্ম আছে, জাতীয়তা আছে, জাতির বৈশিষ্ট্য আছে, তাহাকেই বলি মহাকবি। আমি আমার 'নারায়ণ' পত্রে দেখাইয়াছি—কবিতার মধ্যে জাতীয়তার কতবার উত্থান পতন হইযাছে। চণ্ডীদাসের পব মহাপ্রভুর সময়ে এইভাব বিশেষরূপে জাগিযা উঠিযাছিল। তাহার পর আবার ভারতচন্দ্রের সময় অনেকটা মলিন হইয়া যায়, পরে রামপ্রসাদে তাহা জাগিয়া উঠে, আবার মলিন হইযা গিবিশ ঘোষে তাহা জাগিয়া উঠিযাছিল। গিরিশবাবুর কবিতায়, নাটকে ও গানে আমরা জাতীয়তা পাই, আর ধর্ম্ম ও জাতীয়তার দিকে প্রকৃষ্ট পথ খুঁজিয়া পাই।

ইউরোপীয় শিক্ষার আদর্শে আমার আস্থা নাই। কলা কলাই ইহার অপর উদ্দেশ্য নাই এই যাহাদের অভিমত—তাঁহারা ঘোর জড়বাদী, ; ভারতবর্ষের কালচার সম্বন্ধে তাহাদের বলিবার অধিকার নাই। ধর্ম্ম ও জীবন অচ্ছেদ্য – যিনি একের সহিত অপরের পার্থক্য করেন, তিনি উভয় দিকেই হারাইয়া ফেলেন। এই বৈশিষ্ট্যেই গিরিশচন্দ্রকে যশের অন্বেষণে ইউরোপ, আমেরিকা বা সমুদ্রের পরপারে যাইতে হয় নাই। তিনি দেশবাসীর যথার্থ পরিচয় পাইয়া দেশীয়ভাবে, খাঁটি দেশের ভাষায় —বাঙ্গলা দেশে বসিয়াই দেশমাতৃকার সেবা করিয়াছেন। এই জন্যই গিরিশ মহাকবি—দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। বেশী দেরী নাই, এমন দিন আসিবে যখন পাশ্চাত্য জাতি এই বাঙ্গলায় আসিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রের ন্যায় আমাদের ধর্ম্ম, সাহিত্য, কাব্য ও নাটক আলোচনা করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ ও গৌরবান্বিত মনে করিবে। তখনই তাহারা গিরিশচন্দ্রের প্রকৃত পরিচয় পাইবে—বুঝিতে পারিবে, তিনি কত বড়।

এইবার বর্ত্তমান যুগের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কল্পস্রষ্টা ও কথাশিল্পী ডক্টর শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ নিবেদন করিয়া বর্ত্তমান অধ্যায়ের উপসংহার করিব। হুগলী জেলার সাহিত্যের ধারা বজায় রাখিয়া তিনি বর্ত্তমান শতাব্দীতে বঙ্গ সাহিত্যের উদয় শিখরে স্বীয় কিরণজ্যোতি বিকিরণ করিয়া হুগলী জেলাকে ধন্য ও পবিত্র করিয়াছেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের পর তাহার ন্যায় শক্তিমান লেখক বঙ্গসাহিত্যে যে, আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, এ কথা আমরা নিসংশয়ে বলিতে পারি। অবশ্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে আমরা ধরিব না—কারণ তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠকবি এবং তাঁহার প্রতিভাও বহুমুখী। বঙ্গভাষাকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন দিবার জন্য যা কিছু কৃতিত্ব তা সমস্তই যে বিশ্বকবির প্রাপ্য, তাহাকে আজ আর কে অস্বীকার করিবে?

শরৎ সাহিত্যে দুর্নীতি ও অশ্লীলতা আছে বলিয়া একদল লোক শরৎ সাহিত্য আজও বিশেষ পছন্দ করেন না; কিন্তু আমরা তাহা বিশ্বাস করিনা। শরৎচন্দ্রের পর নবীন সাহিত্যিকগণ বর্ত্তমানে যে ভাবে নগ্নভাবে অশ্লীল রচনা দ্বারা বঙ্গ সাহিত্যকে কলুষিত করিতেছেন, তাহাদের তুলনায় শরৎচন্দ্র যে কত সংযত ছিলেন, তাহাই আজ আমাদের যাচাই করিবার সময় আসিয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের উত্তরে তিনি স্বয়ং এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতেই শরৎচন্দ্রের বক্তব্য বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

"আধুনিক ঔপন্যাসিকদের বিরুদ্ধে এই নালিশ যে, ইহারা বঙ্কিমের ভাষা, ভাব, ধরণ-ধারণ, চরিত্র সৃষ্টি কিছুই আর অনুসরণ করিতেছে না। অতএব অপরাধ ইহাদের অমার্জ্জনীয়; ইহার জবাব দেওয়া একটা প্রয়োজন। অভিযোগ ইহাদের সত্য, আমি তাহা অকপটে স্বীকার করিতেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা আমাদের কাহারও অপেক্ষা কম নয়, এবং সেই শ্রদ্ধার জোরেই আমরা তাঁহার ভাষা, ভাব পরিত্যাগ

করিয়া আগে চলিতে দ্বিধা বোধ করি নাই। মিথ্যা ভক্তির মোহে আমরা যদি তাঁহার সেই ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার বস্তুই শুধু ধরিয়া পড়িয়া থাকিতাম, ত কেবলমাত্র গতির অভাবেই বাঙ্গলা সাহিত্য আজ মরিত। দেশের কল্যাণে একদিন তিনি নিজে প্রচলিত ভাষা ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া পা বাড়াইতে ইতস্ততঃ করেন নাই ; তাঁহার সেই নির্ভিক কর্ত্তব্য-বোধের দৃষ্টান্তকেই আজ যদি আমরা তাঁহার প্রবর্ত্তিত সাহিত্য সৃষ্টির চেয়েও বড় করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি ত সে তাহার মর্য্যাদা হানি করা নয়। এবং সত্যই যদি তাঁহার ভাষা, ধরণ-ধারণ চরিত্র সৃষ্টি প্রভৃতি সমস্তই আজ ত্যাগ করিয়া গিয়া থাকি ত দুঃখ করিবারও কিছু নাই।"

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি বঙ্গভাষার সম্পদ ; নানা ভাষায় তাহা অনুদিত হইয়াছে। থিয়েটার ও সিনেমায় তাঁহার গল্প ও উপন্যাসগুলি প্রায় সমস্তই রূপান্তরিত হইয়া প্রদর্শিত হইতেছে। তাঁহার রচনার পাঠকের সংখ্যা বঙ্গদেশে সর্ব্বাধিক বলিলে বোধ হয় বেশী বলা হইবে না। সুতরাং তাঁহার রচনার সম্পূর্ণ তালিকা না দিয়া কেবল তাঁহার প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস 'বড়দিদি' ও শেষ অসম্পূর্ণ উপন্যাস 'শেষের পরিচয়' এই দুইটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করিলাম।

দেবানন্দপুরে খ্যাতনামা সাংবাদিক কালীকৃষ্ণ সেন ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বি-এ পাস করিয়া তিনি 'বেঙ্গলী' পত্রে যোগদান করেন এবং তাহার মধ্যে যে প্রতিভা লুক্কায়িত ছিল, তাহা সুরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহার নির্ভিক, স্বাধীন দেশহিতৈষণাপূর্ণ লেখাগুলি তৎকালীন জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিত। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি 'এডভান্স' পত্রের সম্পাদক রূপে যোগদান করেন এবং ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি উক্ত পত্রেই কার্য্য করেন।

কালীকৃষ্ণ সেন

উনবিংশ অধ্যায়

ব্যবসা বাণিজ্যে হুগলী জেলা

(১)

সুদূর প্রাচীনকাল হইতে হুগলী জেলাস্থ সপ্তগ্রাম ভারতের সর্ব্ব প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্লিনী লিখিয়া গিয়াছেন যে 'বাণিজ্যার্থে আগত বৈদেশিক জাহাজ সমূহ কেপ-পালিমারাস হইতে কলতার অপরদিকে টেনিনগেল হইয়া ত্রিবেণীতে যাইত এবং তথা হইতে পরে পাটনায় যাইত।"

ষোড়শ শতাব্দীতে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, তাঁহার চণ্ডীকাব্যে লিখিয়াছেন :

"এই সব সহরে যত সৈদাগর বৈসে।
কত ডিঙ্গা লয়্যা তারা বাণিজ্যায় আইসে ॥
সপ্তগ্রামের বণিক কেথায় না যায়।
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায় ॥"

এই স্থানের কার্পাস সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং নানা প্রকারের ছিট, ইউরোপের বিভিন্ন বাজারে লইয়া গিয়া তাহারা বিক্রয় করিতেন এবং রোমের রাণীগণ পর্য্যন্ত বঙ্গের এই সমস্ত সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতে গৌরব অনুভব করিতেন। বিদেশীয় বণিকগণ হুগলী হইতে সোরা, নীল, লাক্ষা, তৈল (Oil of Zerzeline) প্রভৃতি বহু দ্রব্য বিভিন্ন স্থানে লইয়া যাইত এবং বৈদেশিক দ্রব্যাদি এই স্থানে বিক্রয়ার্থ লইয়া আসিত। সপ্তগ্রামের তৎকালীন বাণিজ্যের অবস্থা 'সপ্তগ্রাম' শীর্ষক অধ্যায়ে বিশদ ভাবে লিখিত হইয়াছে।

ইউরোপীয় বণিকগণের মধ্যে পোর্ত্তুগীজগণ সর্ব্বপ্রথম বাণিজ্য করিতে

এই দেশে আসেন বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে শেতাঙ্গ ব্যবসায়ীবৃন্দ কর্ত্তৃক এই জেলার গঙ্গাতীরস্থ স্থানগুলিই অধ্যুষিত ছিল। তন্মধ্যে ইংরাজদের প্রাধান্য হুগলীতে, পোর্ত্তুগীজদিগের ব্যাণ্ডেল,গ্রীকদিগের রিষড়ায়, জার্ম্মানদিগের ভদ্রেশ্বরে, কোন্নগরে অষ্ট্রিলিয়ানদের, চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদিগের এবং শ্রীরামপুরে দিনেমারদের অধিষ্ঠান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে র‍্যালফ ফিচ (Ralph Fitch) নামক একজন ইংরাজ বাগদাদ্ ও এপলো হইয়া প্রথম .ব্যবসাযেব জন্য ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন; তিনি হুগলীতে আসিয়া এই অঞ্চলের ব্যবসায়াদি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যান এবং ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বাঞ্চলে তাঁহাদের বাণিজ্যের সুন্দর ভবিষ্যতের কথা বলিয়া লণ্ডনবাসীদিগকে বিস্মিত করিয়া দেন। (thrilled 'London in 1591 with the magnificient possibilities of Eastern Commerce.). ফিচের পূর্ব্বে ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে টমাস্ ষ্টিফেন্স ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তিনিই ইংরাজদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ভারতে আগমন করেন; তাঁহার পূর্ব্বে ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে হিউ উইলোবি ভারতে আসিবার চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি অকৃতকার্য্য হন। *

ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের ব্যবসায়ের মূল কারণ বিলাতে মরিচের দর বৃদ্ধি। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে মরিচের দর তিন শিলিং হইতে ছয় শিলিং আট পেন্সে বৃদ্ধি হওয়ায় বিলাতের বণিকগণ এক সভা করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করেন। ব্যবসায়ীবৃন্দ ভারতবর্ষে ব্যবসা করিবার জন্য চাঁদা তুলিয়া ৫০ হাজার ১শত ৩৩ পাউণ্ড সংগ্রহ করেন এবং বিলাতের তৎকালীন সম্রাজ্ঞী রাণী এলিজাবেথের নিকট হইতে পনের বৎসরের

* Historians History of the World. Vol XXII.

জন্য ভারতবর্ষে ব্যবসায়ের অনুমতি প্রাপ্ত হন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম ১২৫ জন অংশীদার ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

ইংরাজ বণিকগণ প্রথম বালেশ্বরে ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং তথায় 'ফ্যালকন' নামক জাহাজে চল্লিশ হাজার পাউণ্ডের অধিক মাল আসে। প্রধানতঃ ইংরাজগণ লৌহ, টিন, কাঁচ, বস্ত্র, পারদ, ও বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র এই দেশে বিক্রয়ার্থ লইয়া আসিতেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালে স্যার টমাসরো ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিনিধি রূপে তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইয়া, বিবিধ সৌখীন বিলাতী সামগ্রী উপহার দিয়া বাদশাহের প্রসাদ লাভে যে সমর্থ হন, ইতিহাসজ্ঞ পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। তাঁহার প্রদত্ত সনন্দবলে ইংরাজগণ বঙ্গদেশ ও বিহারে বাণিজ্য-কুঠি নির্ম্মাণের অধিকার লাভ করেন। ইহার পর সম্রাট সাজাহানের শাসনকালে ইংরাজ ডাক্তার গোব্রিয়েল ব্রাউটন সম্রাটের অগ্নিদগ্ধা কন্যাকে সুচিকিৎসায় আরোগ্য করায় সাজাহান তাঁহাকে পুরস্কৃত করিতে চান। ডাঃ ব্রাউটন পুরস্কারের পরিবর্ত্তে, তাঁহার স্বজাতি-বৃন্দকে বঙ্গদেশ ও বিহারে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার অনুমতি দিবার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। শাহাজাদা সুজা সেই সময় বঙ্গের সুবেদার ছিলেন। ডাঃ ব্রাউটন তাঁহার সহিত রাজমহলে সাক্ষাৎ করিয়া সম্রাটের সনন্দ প্রদর্শন করিলে, সুজা ডাক্তারকে সাদরে গ্রহণ করিয়া পিপলী, বালেশ্বর ও হুগলীতে ইংরাজ বণিকগণকে বাণিজ্য-কুঠি নির্ম্মাণের অনুমতি প্রদান করেন।

১৬৫০ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ব্রুকহাভেন (Capt Brookhaven) মান্দ্রাজ হইতে হুগলীতে কুঠি নির্ম্মাণের জন্য প্রেরিত হন। তিনি হুগলীতে কুঠি নির্ম্মাণ করিবার পর কোম্পানীর মান্দ্রাজস্থিত প্রধান অফিস হইতে ৩১শে ডিসেম্বর ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে হুগলী কুঠির কর্ম্মচারিগণকে হুগলী হইতে সূক্ষ্ম বস্ত্র, লক্ষা, সিল্ক, কাটা কাপড়ের ছিট, প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার

নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ বঙ্গদেশে সেই সময় মাদ্রাজে অবস্থিত প্রধান অফিসের অধীনে বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিতেন বলিয়া মাদ্রাজ হইতে তাহাদের যাবতীয় নির্দ্দেশ পত্র আসিত।

নিম্নে তাহাদের নির্দ্দেশ পত্রখানি উল্লিখিত হইল :

"On the 31st December 1657, the Madras Factory issued instructions to the Council in "the Bay' to procure at HUGHLY Cotton yarne, Silt Peeters, Bengala Silke, SAMOES ADATAY (piece goods) Cynomon, Taffaties, BOUGEES (cowries, Portuguese BUZIES) Turmerick and Gumlack' *

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে কাশিমবাজাব কুঠির অধ্যক্ষ জন কেন্ (John Kenn) হুগলী হইতে কোন মাসে কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার সুবিধা হয় তাহা লিখিয়াছিলেন। নিম্নে তাহার প্রদত্ত বিপোর্ট উদ্ধৃত হইল, এই রিপোর্ট হইতে হুগলী জেলায় উৎপন্ন কোন কোন জিনিষের বিশেষ প্রাচুর্য্য ছিল তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে।

হুগলী হইতে নিম্নলিখিত মাসে, তৎপার্শ্বে লিখিত জিনিষগুলি ক্রয় করিলে বিশেষ সুবিধা হইবে।

মার্চ্চ ও এপ্রিল মাস—গম, চট এবং চিনি।

মে ও জুন মাস—মাখন, ডোরাকাটা বস্ত্র, সাদা কাপড এবং নানাপ্রকারের ছিট, ছাতা।

জুলাই ও আগষ্ট মাস—চাউল, লাগলাইন দডি, তিসিগাছের সূক্ষ্ম অংশের সুতায় প্রস্তুত কাপড।

ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাস—পিপুল, তৈল এবং দ্বিতীয়বার উৎপন্ন চাউল।"

* Hedges Diary, Vol III, Pages 184—188.

"সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে যাবতীয় দ্রব্য খুব মহার্ঘ্য হয়; এবং উক্ত সময়ে আমাদের ক্রীত দ্রব্যাদি যাহা পূর্ব্বোক্ত মাসগুলিতে, পূর্ব্বাহ্নে টাকা দিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা রপ্তানী করা হয়" *

"Hughly the best time to buy goods in this place is as followeth, vizt—

In March and April—Wheat, Gunneyes and Sugar.

In May and June—Butter, Ginghams' White cloths and several sorts of striped stuffs.

In July and August—Rice, Hemp, Flax.

In December and January—Long pepper, oyle, and rice of the second growwth.

In September, October and November—all things are very dear, being the time of shipping, and in which we receive in those goods for which money was given but in the months aforewritten."

বেনস্ সাহেবের বিবরণী হইতে হুগলী জেলা বস্ত্র শিল্পে যে কত সমৃদ্ধ ছিল, তাহা জানিতে পারা যায় এবং বস্ত্র যে কত প্রকারের এই অঞ্চলে প্রস্তুত হইত তাহার ইয়ত্তা নাই। ডোরা-কাটা বস্ত্র (Ginghams) সাদা কাপড় (White cloth), বহুবিধ ছিটের কাপড় (Several sorts of striped stuffs) ও তিসি গাছের সূক্ষ্ম অংশের সুতায় প্রস্তুত (Flax) একপ্রকার সুন্দর কাপড় হুগলী জেলা হইতে রপ্তানি হইত। তুলাজাত সূতা প্রস্তুতে এই স্থানের অধিবাসীগণ অসাধারণ নিপুণতা দেখাইতেন এবং তাঁহাদের প্রস্তুত সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি মানুষের দ্বারা তৈয়ারী তাহা মন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চায় না বলিয়া বেনস সাহেব বলিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কলকব্জার নিপুণতম

* Wilson's Early Annals, Vol. 1. Page 377—378.

কারিগরও ঐ বস্ত্র তৈয়ারী করিতে পারেন না। তাহার আরো মনে হয় যে, উহা যেন কোন কীট বা পরীর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

পিটের ডেসপ্যাচ হইতে জানা যায় যে ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বণিকগণ বাঙ্গলাদেশে পশম ও সিল্কের জিনিস লইয়া আসিত এবং বঙ্গদেশ হইতে কোটী কোটী টাকার সুতার কাপড় লইয়া গিয়া তাহাদের লজ্জা নিবারণ করিত। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে ২ কোটী ৪২ লক্ষ ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানী হয়। ভারতীয় এই বস্ত্র শিল্প কি ভাবে ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়, সেই সম্বন্ধে কোম্পানীর সুরাটের-কুঠির তত্ত্বাবধায়ক রিচার্ডসন সাহেব বলিয়াছেন যে, তাঁতিদের প্রতি অত্যন্ত নৃশংস অত্যাচারের ফলে তাহারা জাত ব্যবসা ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিল।

কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ কাপড় পাইবার জন্য অগ্রিম তাঁতিদের দাদন দিয়া রাখিত এবং তাহারা কত জোড়া কাপড় দিবে, তাহাও মুচলেখায় সহি করিয়া রাখিত। সর্ত্ত অনুসারে মাল দিতে না পারিলে, কিম্বা উৎপন্ন মাল অন্যকে বিক্রয় করিলে কোম্পানীর পাইকরা তাহাদিগকে শৃঙ্খলিত করিয়া চাবুক মারিত এবং অত্যন্ত হেয় উপায়ে তাহাদের ও অন্যান্য পরিবারবর্গকে হেয় উপায়ে জাতি নষ্ট করিত। এই অত্যাচারের হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্য সেইজন্য বঙ্গদেশের বহু তাঁতি আঙ্গুল পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলিত, যাহাতে আর তাহাকে কাপড় বুনিতে ও দাদন লইতে না হয়।

হুগলী জেলায় তাঁতিগণ কিভাবে বস্ত্র বয়ন করিতেন এবং কোম্পানী কি ভাবে তাহা আদায় করিয়া অন্যত্র রপ্তানী করিতেন তাহা **Accompt of the Trade of Hugly"** গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল :

"About Hugley there live many weavers who weave cotton cloth and cotton and Tesser or Herba of several sorts, and from the parts thereabout there is brought

silk, sugar, opium, rice wheat, oyle, butter. course, hempe, gunnyes, and many other commodities. The way of procuring these is to agree upon musters with the merchants of HUGLY, or to send Bannians who can give security, to buy them, on our accounts in the places where they are made or procurable at cheapest hands,and whether we use one way or other we give passes in the ENGLISH name for the bringing those goods free of custome, and all those places have so great a convenience that most of the goods are brought by water, unless from the places near unto HUGLY which lye thwart the country.

The goods we sell in Hugly by merchants there are upon time, or ready money, but which way soever it is that we sell them we give passes and send them out in our names to avoid the merchants paying custome, which otherwise they would not doe and we are forced to abate in the price proportionate. *

হুগলী জেলার দক্ষ শিল্পীকুল কালক্রমে অন্তর্হিত হইলেও, আজও সিমুলিয়া, ফরাসডাঙ্গার ধুতি কাপড় বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত এই জেলার হরিপাল, কৈকালা, চন্দননগর, খানাকুল, রাজবলহাট, দারহাট্টা, বেগমপুর, আঁটপুর, খরসরাই, জয়নগর, গৌরহাটী, বালি দেওয়ানগঞ্জ, বদনগঞ্জ, বাবনান, তারকেশ্বর প্রভৃতি স্থানে সুন্দর সুন্দর বস্ত্র উৎপন্ন হয়। এই তাঁতশিল্পের প্রতি দেশের জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে, বঙ্গদেশের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। বস্ত্র শিল্প সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে এই সম্বন্ধে আর এই স্থলে কিছু লিখিত হইল না।

---

* Hedges' Diary, Vol II

(২)

সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সুজার পতনের পর মীরজুমলা বঙ্গের সুবেদার নিযুক্ত হন; তাহার শাসনকালে হুগলীর ফৌজদার ইংরাজ-বণিকগণের বাণিজ্যের উপর বার্ষিক তিন হাজার মুদ্রা শুল্ক ধার্য্য করেন। কিন্তু ভূতপূর্ব্ব সম্রাট সাহজাহানের সনন্দ অধিকারে ইংরাজ বণিকগণ শুল্ক প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে মীরজুমলা ইংরাজদের সোরা বোঝাই কয়েকখানি নৌকা আটক করেন। ইহাতে ইংরাজগণ উত্তেজিত হইয়া মীরজুমলার একখানি নৌকা অবরোধ করে, ফলে তিনি বঙ্গদেশ হইতে ইংরাজ বণিকগণের উচ্ছেদ সাধনে বদ্ধপরিকর হন; কিন্তু চতুর বণিকগণ প্রমাদ গুনিয়া পোত প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করায় মীরজুমলা তাহাদিগকে মার্জ্জনা করেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দেন।

অতঃপর হুগলীর ফৌজদার ইংরাজ বণিকদের উপর যে শুল্ক নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহা বহাল রাখিলেন এবং ভবিষ্যতে ইংরাজদের কোন নৌকা প্রবেশ করিতে পারিবে না বলিয়া নির্দ্দেশ দেন। মীরজুমলার পর সায়েস্তা খাঁ বঙ্গের সুবেদার হন; তাঁহার শাসনকালে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী পুনরায় গঙ্গায় পোত চালাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। সায়েস্তা খাঁ ইংরাজ বণিকগণকে বাণিজ্য সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধা প্রদান করিলেও তিনি শুল্ক হইতে তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দেন নাই। তাহার শাসনকালে ফরাসী ও দিনেমারগণ বঙ্গদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সায়েস্তা খাঁর পর আজিম খাঁ বঙ্গের ভাগ্যবিধাতা হন। দিনেমারগণ সেই সময় উপদ্রব আরম্ভ করায়, সম্রাট তাহাদের বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ দেন। দিনেমারদের উচ্ছেদ সূত্রে আজিম খাঁ ইংরাজদের গঙ্গাবক্ষে স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন। এক বৎসর পর আজিম খাঁ

আকস্মিক মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় দেওয়ান মুফি খাঁ বাঙ্গলার শাসনভার গ্রহণ করেন। ইনি ইংরাজদের পরম শত্রু ছিলেন এবং শাসনভার গ্রহণ করিয়াই আদেশ দিলেন যে, সুরাটে ইংরাজদের নিকট হইতে শতকরা সাড়ে তিন টাকা হারে যেরূপ শুল্ক আদায় করা হইয়াছিল; বঙ্গদেশেও তাহাদিগকে অতঃপর উক্ত হারে শুল্ক প্রদান করিতে হইবে।

বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য সংশ্রবে এই সকল অসুবিধার নিবারণ কল্পে ইংরাজ বণিকগণ এইবার সরাসরি সম্রাটের নিকট অভিযোগ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। এই সময় ওয়ালটার ক্লাভেল নামক জনৈক ইংরাজ আলমগীরের দরবারে, সম্রাট সাজাহানের সনন্দ পেশ করিয়া শুল্ক প্রদান হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য আবেদন উপস্থাপিত করেন। সম্রাট তাঁহার আবেদন মঞ্জুর করিয়া ১৬৬২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে নিম্নোক্ত আদেশ পত্র প্রচার করেন:

"প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহ শাজাহান ও শাহজাদা সুলতান সা-সুজা প্রদত্ত আদেশ পত্র অনুসারে ইংরাজ কোম্পানীর আমদানীক্রীত বিক্রীত কোনও পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক গৃহীত হইত না। সুতরাং এতদ্দ্বারা আমিও উক্ত হুকুমনামা দুইটি বলবৎ রাখিয়া আমার আদেশ প্রচার করিতেছি, যে আমার সাম্রাজ্যের মধ্যে ইহারা যে সকল পণ্য আমদানী করিবেন অথবা আমার সাম্রাজ্য হইতে ইহারা সোরা বা অন্যান্য যে সকল সামগ্রী সমুদ্রপথে রপ্তানী করিবেন, যে সকল দ্রব্যের উপর শুল্ক গৃহীত হইবে না।

প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা এ সম্বন্ধে কোনরূপ বাধা বা উদ্বেগের সৃষ্টি না করিয়া অবাধে ইহাদের জন্য সামগ্রী ছাড়িয়া দিবেন। যদ্যপি আমার রাজ্যের কোনও প্রজা প্রকৃতপক্ষে এই ইংরাজ কোম্পানীর নিকট ঋণ গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই ঋণ যাহাতে আদায় হইতে পারে, সে বিষয়ে শাসনকর্ত্তারা অবহিত হইবেন। সম্প্রতি দিনেমারগণ আমার রাজ্যে গর্হিত আচরণ করায় আমি তাহাদের বাণিজ্য বন্ধ করিবার আদেশ

প্রদান করিয়াছি এবং আমার উক্ত আদেশের সুযোগ গ্রহণ করিয়া এই সূত্রে প্রাদেশিক কর্ম্মচারিগণ ইংরাজ কোম্পানীর বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদের সমূহ ক্ষতিসাধন করিয়াছেন। কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, দিনেমারদের ব্যবসায়ের সহিত ইংরাজের ব্যবসায়ও আমি বন্ধ করিবার আদেশ দিই নাই এবং তাহার প্রয়োজনও হয় নাই। কেন না ইংরাজরা আমার সাম্রাজ্যের মধ্যে কোনও গর্হিত আচরণ করে নাই। অতএব এখন হইতে তাহাদের বাণিজ্য বিষয়ে কেহ যেন কোনও রূপ অসুবিধা বা ব্যাঘাত উপস্থিত না করে। অতঃপর আমরা কর্ম্মচারিগণের বিরুদ্ধে এই ইংরাজ বণিকগণ কোনরূপ অভিযোগ উপস্থাপিত না করিলেই আমি সুখী হইব। আমরা এই আদেশ যেন বর্ণে, বর্ণে, পালিত হয়।"

বাদশাহের সনন্দ লইয়া কোম্পানীর এজেণ্ট ওয়ালটার ক্লাভেল যে দিন হুগলী বন্দরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, সেই দিন ইংরাজ বণিকগণ তোপধ্বনি সহকারে বাদশাহের পূর্ব্বোক্ত ফারমান গ্রহণ করেন। এই সময় ১৬৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নবাব সায়েস্তা খাঁ দ্বিতীয় বার বঙ্গের শাসন ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার আনুকূল্যে কেবল হুগলী জেলায় নয়, সমগ্র বঙ্গদেশে ইংরাজ বণিকদিগের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রভাব প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর ইংরাজদিগের সহিত নবাব সৈন্যের প্রথম যুদ্ধ হুগলীর রাজপথে সংঘটিত হয়; তাহার বিবরণ 'হুগলী' অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এই যুদ্ধে ইংরাজগণ পরাজিত হয় এবং হুগলীর পণ্যরাশিপূর্ণ কুঠি ভস্মীভূত হওয়ায়, তাহাদের পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়।

নবাব শায়েস্তা খাঁ ইংরাজদিগের যাবতীয় কুঠি অধিকার করিবার আদেশ দেন এবং নবাবের কর্ম্মচারীগণ কুঠিসমূহ কাড়িয়া লয় এবং কুঠির

কর্ম্মচারীদিগকে বন্দী করে। ইহাতে বণিকদিগের চৈতন্য হয় এবং তাহারা বঙ্গের নবাব ও ভারতের সম্রাটের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও জরিমানা দণ্ড দিবার প্রস্তাবসহ দরখাস্ত পেশ করেন। ইংরাজ বণিকগণের সৌভাগ্য ক্রমে তাহাদের দরখাস্ত মঞ্জুর হয়; এই সম্বন্ধে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে আলমগীর যে ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত হইল। কেবল হুগলী জেলায় ইংরাজ বণিকগণের ব্যবসার জন্য নহে, সমগ্র বঙ্গদেশের ব্যবসায়ের জন্য ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

"ইংরাজগণ অতি বিনীতভাবে অবনত মস্তকে বাদশাহ সমীপে দরখাস্ত করিয়া প্রার্থনা জানাইতেছে, যে তাহাদের সকল অপরাধ মার্জ্জনা পূর্ব্বক ফারমান বা আদেশ প্রদানে তাহাদিগকে এই মার্জ্জনার কথা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন করা হয়। এই জন্য তাহারা জগন্মান্য বাদশাহের দরবারে তাঁহাদের উকিলকে প্রেরণ করিয়াছেন। বাদশাহের অনুগ্রহলাভ করাই উকিলের উদ্দেশ্য। অধিকন্তু সুরাটের শাসনকর্ত্তা এত্তিমাদ খাঁ দরখাস্তে জানাইলেন যে, ইংরাজগণ বাদশাহের সমীপে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিতে প্রস্তুত আছেন। উপরন্তু তাহারা অন্যান্য বণিকগণের নিকট হইতে হাঙ্গামার সময় যে সকল পণ্যদ্রব্য বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছেন, তাহা বণিকগণকে প্রত্যর্পণ করিবেন। ভবিষ্যতে আর কখনও তাহারা এরূপ গর্হিত কার্য্যে লিপ্ত হইবেন না এবং বন্দর সংক্রান্ত বিধি ব্যবস্থা ঠিক ভাবে মানিয়া চলিবেন। বাদশাহ ও তাঁহার স্বাভাবিক উদারতাবশে ইংরাজদের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন। ইংরাজগণ পুনরায় বন্দরের উন্নতি বিধানের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বতন নিয়মাধীনে বাণিজ্য করিতে পারিবেন। এই গর্হিত কার্য্যের ইংরাজ নায়কগণ দেশ হইতে বিতাড়িত হইবে।"

সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে বঙ্গদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তিন জায়গায় উপনিবেশ (settlement) ছিল; যথা হুগলী, বালেশ্বর এবং

কাশিমবাজার। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে মিঃ ষ্ট্রেসাম মাষ্টার (**Mr. Streynsham Master**) মাদ্রাজের গভর্ণর হইয়া সুরাট হইতে তথায় যান। উক্ত বৎসরের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি হুগলীতে আসেন। কারণ কর্ত্তৃপক্ষ বিলাত হইতে বঙ্গদেশের কোন স্থান প্রধান কেন্দ্র হইবে তদ্বিষয়ে তাহার মতামত চান। তিনি কাউন্সিলের অন্যান্য সভ্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া হুগলীতেই প্রধান স্থান নির্ব্বাচন করিয়া বিলাতের কোর্ট-অফ-ডিরেক্টারদের ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর তারিখে যে অভিমত প্রেরণ করেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

"The Council having taken into consideration and debate which of the places, HUGHLY or BALLASORE, might be most proper and convenient for the residence of the Chiefe and Councell in the Bay. Did resolve and conclude that Hugly was the most fitting place, notwithstanding the Europe ships doe unloade and take in their ladeing in BALLASORE roade, HUGLY being the key or scale of Bengala, where all goods pass in and out to and from all parts, and being near the center of the Company's business is more commodious for receiving of advices from and issueing of orders to, all subordinate factoryes.

"Wherefore it is thought convenient that the Chief and Councell of the Bay doe reside at HUGLY, and upon the dispatch of the Europe ships, the chief and the councell, or some of them (as shall be thought convenient) doe yearly goe downe to BALLASORE soe well to expedite the dispatch of the ships as to make inspection into the affairs of BALLASORE factory. And the Councill did likewise conclude that it was requisite a like inspection should be yearly made into the factory at CASSIM-

BAZAR the Hon'ble Company's principall concerns of sales and investments in the Bay lyeing in these two places, and the expence of such visitation will be very small, by reason of conveniency of travelling in these countreys by land or water." *

মর্ম্মার্থ—কাউন্সিলের সভার অধিবেশনে বঙ্গদেশের মধ্যে কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ বা সভাপতি মহোদয়ের বসবাসের জন্য হুগলী কিম্বা বালেশ্বরের মধ্যে কোন স্থানটি সর্ব্ববিষয়ে সুবিধাজনক, তাহা লইয়া আলোচনা হয়। কারণ ইউরোপ হইতে আগত যাবতীয় মালপত্র এই স্থানেই খালাস করা হয় এবং হুগলী হইতে পরে বালেশ্বরে উহা স্থলপথে লইয়া যাওয়া হয়।

হুগলীকে বঙ্গদেশের চাবিকাটি বলা হয়, কারণ বঙ্গদেশের যাবতীয় দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানী এই স্থান হইতেই হইয়া থাকে; এবং হুগলী কোম্পানীর বাণিজ্য-কেন্দ্রের মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়ায়, এই স্থানে কোম্পানীর প্রধান কেন্দ্র ও বসবাসের ব্যবস্থা করিলে বাণিজ্য-বিষয়ক আদেশপত্র এই স্থান হইতে দেওয়ার বিশেষ সুবিধা হইবে।

সভায় আরো স্থির হয়, যে কাউন্সিলের সভাপতি বা সভ্যবৃন্দ হুগলীতে বসবাস করিলেও, ইউরোপ হইতে বাণিজ্যতরী আসিবার সংবাদ পাইলে, তাঁহারা বৎসরে অন্ততঃ একবার বালেশ্বরে যাইয়া তথাকার কুঠিতে কি কি মাল পৌছান আবশ্যক তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন। এইরূপ অনুসন্ধান কাশিমবাজার কুঠিতেও করিতে হইবে; বালেশ্বর ও কাশিমবাজার স্থলপথে বা জলপথে ভ্রমণের এই দেশে বিশেষ ব্যয় হয় না। সুতরাং উক্ত কুঠিতে বিক্রয়ার্থ যে সকল প্রধান প্রধান দ্রব্য রাখা হইয়াছে, তাহাতে ভ্রমণ বাবদ খরচায় লোকসান হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

হুগলী জেলায় প্রাচীনকালে অহিফেন, রেশম, নীল, দড়ি ও চিনির

* Hedges Diary, Vol. II, Page 236.

কারবার প্রচলিত ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ হুগলী জেলা হইতে কোন কোন জিনিস লইয়া যাইতেন, তাহা নিম্নোক্ত কয়েকটি লাইন হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে।

"The Dutch carry home rice, oyle, Butter, hempe. cordage, saile cloth, raw silk, silk wrought, saltpetre, opium, Turminck, Neelas, Ginghams, Tapits, Browles or slave cloutes, **achee Beagues,** Sugar, long pepper and Bees wax, as much as they can gett." *

পূর্ব্বে বলাগড়ে নৌ-শিল্পের বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল; এই স্থানের কত শত তরণী যে যুদ্ধজয় ও জলদস্যু বিতাড়ন করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কোন্নগরে জাহাজ প্রস্তুতের একটি কারখানা ছিল বলিয়া ক্রফোর্ড সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন।

হুগলী জেলায় বহু প্রাচীন কাল হইতে কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। সপ্তগ্রাম, মহানাদ, পাণ্ডুয়া, কোলশা, দেওয়ানগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের তুলট কাগজ বঙ্গদেশের কাগজের অভাব মিটাইত। বর্ত্তমানে বালির কাগজ বলিয়া যে কাগজ প্রসিদ্ধ তাহা এই জেলার বালি গ্রামে প্রস্তুত হইত বলিয়া বালির কাগজ বলিয়া খ্যাত। কাগজ শিল্প বর্ত্তমানে এই জেলা হইতে এক প্রকার অন্তর্হিত হইয়াছে, দশঘরা, ভেয়াদাণ্ড প্রভৃতি স্থানে কয়েকঘর কাগজী মুসলমান আজও দেশী তুলট কাগজ প্রস্তুত করে।

হুগলীতে সর্ব্বপ্রথম বরফ কল তৈয়ারী হয় এবং যে স্থানে উক্ত কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল উহা অদ্যাপি বরফতোলার মাঠ বলিয়া খ্যাত। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সাহেবদের এক নাচের মজলিসে সর্ব্বপ্রথম বরফ আসিয়াছিল; উহাতে কলিকাতা গেজেটে লিখিত হইয়াছিল, যে

* Accompt of the Trade in Hugly in 1676.

সম্ভবতঃ এই বরফ হুগলীর প্রসিদ্ধ বরফের কারখানা হইতে আসিয়াছিল ; কারণ হুগলী ব্যতীত তখন নিম্নবঙ্গে আর কোথাও বরফের কল ছিল না।

"The ice it is presumed, must have come from the well known ice-field at Hooghly the only one known to have existed in the lower provinces." *

হুগলী জেলার মগরা, পাণ্ডুয়া ও হরিপালের বালি বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন ভাল ইট বালিখালের ধারে, বৈদ্যবাটী ও বাঁশবেড়িয়াতে খুব সুন্দরভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কোতরং গ্রামে পূর্ব্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের ইটখোলা ছিল। ভাল গৃহ নির্ম্মাণের জন্য সুরকিও এই অঞ্চলের খ্যাত। মাটির খেলনা ও অন্যান্য জিনিস উত্তরপাড়ায় বহুকাল যাবৎ নির্ম্মাণ হইয়া থাকে। পাণ্ডুয়া ও তারকেশ্বরের কুঁজা হাড়ি ও জালা, এই জেলার অন্যতম খ্যাতনামা জিনিস। মাকলায় ফাঁপা টালি নির্ম্মাণের একটি কারখানা আছে ; ইহা কিলবার্ণ কোম্পানী কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। বালিই হুগলী জেলার একমাত্র খণিজ দ্রব্য। এই সম্বন্ধে ক্রফোর্ড সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

"The only article of trade or export in the Hughli district which may be called a mineral product is Magra sand. This is a very fine sand which occurs in extreme beds near Magra, having been deposited there in former times by the Damoder river, before it changed its course to its present bed......Both Bricks and Surkis are manufactured in large quantities over the district especially in the towns." †

পূর্ব্বে পিতলের বাসন এই জেলার কাঁসারীগণ, খুব সুন্দর ভাবে

* Calcutta Gazette. 15th November. 1787

† Hughly Medical Gazetteers, Page 24.

প্রস্তুত করিত। কুমারগঞ্জ, বৈঁচী, খামারপাড়া, খোলসারা, বংশবাটী, মেয়ারহাট, মাহেশ প্রভৃতি গ্রামগুলি পিতলের বাসনের জন্য খ্যাত ছিল এবং এই বাসন দেশ দেশান্তরে রপ্তানী হইত। বর্ত্তমানে এই শিল্পটিও একপ্রকার লুপ্তপ্রায়। চাপাডাঙ্গার পানদানি পূর্ব্বে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইত। বর্ত্তমানে হাট বসন্তপুর, বালি-দেওয়ানগঞ্জ, কুমারগঞ্জ, বেলুণ্ডি ও মাহেশে কিছু কিছু পিতলের বাসন প্রস্তুত হইতে দেখা যায়।

বেতের ও চিকনের কাজ এই জেলার সর্ব্বত্র পূর্ব্বে দেখা যাইত। মায়াপুর, বন্দীপুর, শ্রীরামপুর, জনাই-বাকসা, ধনিয়াখালি, চণ্ডীতলা, নারায়ণপুর প্রভৃতি গ্রামে এই কার্য্য বিশেষ ভাবে হইত। বর্ত্তমানেও কিছু কিছু হইয়া থাকে।

চিকনের কাজ এই জেলার মুসলমান রমণীগণ অদ্যাপি করিয়া থাকেন এবং তাহা আমেরিকায় ও ফ্রান্সে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়। পালকি নির্ম্মাণ বহুদিন যাবৎ এই জেলায় হইয়া থাকে; বর্ত্তমানে বেলুণ্ডী গ্রামে কিছু পালকী প্রতি বৎসর নির্ম্মিত হয়।

মাছ ধরিবার হুইল এবং বঁটি ও কাটারী প্রস্তুতের জন্য জনাই ও বাকসা গ্রাম প্রসিদ্ধ ছিল, এখনও ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ধনিয়াখালি ও গুড়সুরা গ্রামে মৎস্য ধরিবার সুন্দর সুন্দর সরু সূতা এবং বড়শি তৈয়ারী অদ্যাপি হইয়া থাকে। শিংয়ের সুন্দর সুন্দর কৌটা মাকলা গ্রামে এবং শাঁকের দ্রব্য সেনহাটি ও বদনগঞ্জে বর্ত্তমানেও কিছু কিছু প্রস্তুত হয় দেখিতে পাওয়া যায়।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় একটি সিগার প্রস্তুতের কারখানা ছিল বলিয়া টয়েনবি সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন।

হুগলী জেলায় প্রস্তুত চটের থলে, লাগলাইন দড়ি, বহু প্রাচীনকাল হইতে ইউরোপীয় বণিকগণ লইয়া যাইত তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। পাটের কল এই জেলার একটি প্রধান বিশেষত্ব হইলেও, বিদেশীগণ কর্ত্তৃক

ইহা পরিচালিত হওয়ায় ইহার দ্বারা জেলার কিছুই উন্নতি হয় নাই।
বঙ্গদেশের প্রথম পাটকল চাঁপদানীতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়।

The Jute Mill at Champadni is one of the oldest in the Provinces having been built in 1872. *

বঙ্গের প্রতি অঞ্চলেরই এক একটি মিষ্টান্ন খাবারের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে, যেমন বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, নাটোরের কাঁচাগোল্লা, জয়নগরের মোয়া, কৃষ্ণনগরের সরভাজা প্রভৃতি। বঙ্গবাসীর কেবল 'মাছখোর' নয়; 'মিষ্টিখোর' বলিয়াও একটা প্রসিদ্ধি আছে।

"The Bengalees are inordinately fond of sweets and 'Sandeshes'. It is a national trait." †

হুগলী জেলার মিষ্টান্নশিল্পের মধ্যে জনাইয়ের 'মনোহরা' ধনিয়াখালির 'খইচুর', গুপ্তিপাড়ার সন্দেশ, জাঙ্গিপাড়ার 'পান্তুয়া' খানাকুলের 'করকণ্ড' কামারপুকুরের 'জিলাপি', গৌরহাটীর 'রসকরা' ও শ্রীরামপুরের 'গুঁপো' সন্দেশ বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি বহু জিনিস বিলুপ্ত হইলেও হুগলী জেলার মিষ্টান্নগুলির খ্যাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। কলিকাতার প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক "ভীম নাগ" এবং "নবীন ময়রা" (রসগোল্লার আবিষ্কারক) এই জেলার অধিবাসী ছিলেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—"সন্দেশে বাংলাদেশ বাজিমাৎ করেছে; যা ছিল শুধু খবর, বাংলাদেশ তাকেই সাকার বানিয়ে করে দিল খাবার। সেখানকার সন্দেশও খবর-খাব'রের অর্থাৎ সাকার নিরাকারের শিব-শক্তি মিলন।" §

---

* Hughly District Gazetteers. Page. 248.

† Indian Cameos—By W. S. Caine. Page 41.

§ বাংলার সাধনা—পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, পৃষ্ঠা ৮

আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত হরাদিত্য একটি নগণ্য গ্রাম হইলেও বর্ত্তমানে ইহা কথা সাহিত্যিক শ্রীশশধর দত্তের বাসস্থান বলিয়া সুপরিচিত।

হরাদিত্য

তিনি মোহন সিরিজ ও অন্যান্য উপন্যাস লিখিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান গ্রন্থ সংখ্যায় প্রায় দুইশত হইবে। তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস 'শেষ উত্তর' সিনেমায় প্রদর্শিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে 'যুগের দাবি' ও 'এ যুগের মেয়ে' নামক দুইখানি উপন্যাসের ছায়া ছবি প্রস্তুতির পক্ষে অগ্রসর হইতেছে।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ

চন্দননগর তথা হুগলী জেলার গৌরব প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ আজ বাংলা তথা নিখিল ভারতে সুপরিচিত। লোক-সেবায়তন বা ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট স্থানাধিকার করিয়াছে। বস্তুতঃ ভারতীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করিয়া নিষ্কাম সংগঠন-মূলক কর্ম্মবৈচিত্র্যে ও স্বাবলম্বনের সাধনায় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘকে অগ্রণী ও পথ-প্রদর্শক বলা যাইতে পারে। এই হিসাবে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ সত্য সত্যই প্রবর্ত্তক। সঙ্ঘের মূলকেন্দ্র চন্দননগর সংগঠনযজ্ঞে ভারতের ঐতিহাসিক পীঠস্থান বলিয়া পরিগণ্য হইতে পারে।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ একটি যুগোপযোগী সামগ্রিক ভাবের বিকাশ। এই ভাবের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা শ্রীমতিলাল রায়। শ্রীযুত রায়ের সর্ব্বমানবকল্যাণ-

সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল রায়

মূলক বিশিষ্ট ভারতীয় ভাবধারাসম্মত যে জাতি-গঠনের স্বপ্ন তাহা রূপায়িত হইয়াছে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে। সঙ্ঘ ও সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা অবিচ্ছেদ্য। বস্তুতঃ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতার জীবনেতিহাসই সঙ্ঘের ইতিহাস। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী তারিখে শ্রীমতিলাল রায় জন্মগ্রহণ করেন। এই রায় পরিবার চৌহান বংশীয় ছেত্রী রাজপুত। তাঁহার পিতামহ ৺গোলকচন্দ্র রায়

যুক্ত প্রদেশের ময়নাপুর জেলা হইতে প্রথম বাংলায় আসিয়া ফরাসডাঙ্গায় বাস স্থাপন করেন। ৺গোলক রায়ের পুত্র ৺বিহারীলাল। ৺বিহারী লালের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমতিলাল রায়। পিতামহের মৃত্যুর পর যৎপরোনাস্তি সাংসারিক দুরবস্থার সময়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে পিতা বিহারীলালও সাংঘাতিক রোগে পীড়িত হন। ইহা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ ভাবিয়া মাতা প্রসবান্তে সদ্যজাত শিশুকে ভস্মস্তূপের মধ্যে নিতান্ত অযত্নের সহিত ফেলিয়া রাখেন। কিন্তু পরে অকস্মাৎ স্বামীর পুনর্জীবন লাভের সংবাদ পাইয়া মাতা মৃতবৎ শিশুটিকে ভস্মস্তূপ হইতে উদ্ধার করেন। শৈশবে ছয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অতিশয় দুঃখ কষ্টের মধ্যে মতিলাল প্রতিপালিত হন। বালক মতিলাল কলিকাতা ফ্রী চার্চ্চ ইনষ্টিটিউশনে পাঠারম্ভ করেন। কিন্তু ইহার কিছুকাল পরেই তিনি দারুণ টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হন। একচল্লিশ দিন রোগভোগের পর সকলেই তাঁর জীবনের আশা ছাড়িয়া দেন। এই সময়ে একটি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনায় বালক মতিলালের জীবনের মোড় চিরকালের মত ফিরাইয়া দেয়। এক সৌমকান্তি, প্রসন্নমূর্ত্তি কাঞ্চনবর্ণ মহাপুরুষ স্বপ্নে আবির্ভাব হইয়া মুমূর্ষ বালকের কণ্ঠে অমৃতবারি সিঞ্চন করিয়া তাহাকে নব জীবন দান করেন। সেই স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষের সঙ্কেত মত সেই দিনই তিনি অন্নপথ্যও করেন। এই সময় হইতেই বালকের সুকুমার হৃদয়ে দেবতা ও ধর্ম্মে যে গভীর অনুরাগ জাগিয়া উঠে তাহা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া তাঁহাকে সিদ্ধির পথে আগাইয়া লইয়া যায়। শিশুকাল হইতেই তাঁর অসাধারণ পাঠানুরাগ দৃষ্ট হয়। চৈতন্য লাইব্রেরীর সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইয়া দুই তিন বৎসরের মধ্যেই গ্রন্থাগারের সমস্ত পুস্তক পড়িয়া শেষ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্ব্বে দারুণ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় এখানেই তাঁর পাঠ সমাপ্ত হয় এবং সাংসারিক অস্বচ্ছলতার কারণ তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়।

শ্রীযুত রায়ের অসাধারণ প্রাণ-প্রাচুর্য্য ও হৃদয়াবেগ বয়সের সহিত বরাবরই বেতাল হইয়া চলিতে দেখা যায়। ১৫ বৎসর বয়সেই



শ্রীমতিলাল রায়

চুঁচুড়ার সমগোত্রীয় ৺হরিনারায়ণ সিংহের নবম বর্ষীয় কন্যা রাধারাণী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের পর একটিমাত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া এক বৎসরের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ঘটনা তাঁর

দাম্পত্য জীবনের পুনশ্চ মোড় পরিবর্তন করিয়া স্বল্পস্থায়ী প্রাকৃত ভোগ-জীবনের অবসান আনে। তিনি পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করেন। সাধ্বী পত্নীও স্বেচ্ছায় সম্মতিদান করেন এবং অকুণ্ঠচিত্তে আমরণ নারী জীবনের সকল সাধ-আহ্লাদ, ভোগ-বিলাস বিসর্জ্জন দিয়া পতির ব্রত-পূরণে সহায়তা করেন। যৌবনে যোগিনী সাজিয়া চিরতপস্বিনী এই নারী স্বামীর সত্যকার সহধর্ম্মিনীরূপে শুধু নিজের জীবন নয়, পতিদেবতার জীবনও পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ পবিত্রতা ও সংযমের বিগ্রহরূপিনী মহাশক্তির আধার রাধারাণী দেবীর দিব্য মাতৃত্বের মহিমা একদল সর্ব্বোৎসর্গাকৃত সন্তানগোষ্ঠীকে অপূর্য্যমান স্নেহে লালন-পালনের মধ্য দিয়া মণ্ডলীবদ্ধ করিয়া সঙ্ঘের জন্ম ও পুষ্টি দান করে।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের পর বাঙালী রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আদর্শানুপ্রাণিত হইয়া নিষ্কাম কর্ম্ম ও দরিদ্রনারায়ণের সেবায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। পল্লীতে-পল্লীতে নগরে-নগরে এই সময়ে বহু সেবা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। ইহার পূর্ব্বেই চন্দননগরে শ্রীমতিলাল রায় একটি রবীবাসরীয় শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতিবেশী তরুণ-প্রাণে নিষ্কাম কর্ম্ম ও সেবার প্রেরণা সঞ্চার করিবার চেষ্টা করেন। তারপর সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায় গঠন করিয়া তরুণ জীবনে এই মহনীয় অনুপ্রেরণা অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবে তাঁর এই সৎকর্ম্ম বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। এই সময় হইতেই তিনি গীতার 'মানুষ' তৈরীর প্রয়োজন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেন। শুধু সাময়িক সেবা বা সঙ্কটত্রাণের দ্বারা জাতির সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধান হইতে পারে না, ইহা তিনি বুঝিয়া স্থায়ী স্বাবলম্বনমূলক সংগঠনের ভিত্তি স্থাপনে উদ্যোগী হন। জাতীয়তাবোধের যে প্রখর-প্রাচুর্য্য তাঁর প্রাথমিক জীবনে সমস্ত দেশ সেবার আয়োজনকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তাহাই পরবর্ত্তী বিপ্লব যুগে পরিপুষ্ট ও রূপান্তরিত হইয়া তাঁহার জীবনে স্বপ্রকাশ হইয়া উঠে।

১৯০৬ হইতে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত বাংলায় যে স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল অগ্নিবন্যা বহিয়া যায় তাহারও তিনি অন্যতম ধারক, বাহক ও আশ্রয় হইয়া এই আন্দোলনকে সাফল্যের পথে অগ্রসর করিয়া লইয়া চলেন। স্বদেশী আন্দোলনের আগাগোড়া খাঁটি ইতিহাস লেখার মত এখনও নেতৃস্থানীয় যে স্বল্প কয়েকজন বর্ত্তমান তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত রায়ের কুটির প্রাঙ্গনে শ্রীঅরবিন্দের অজ্ঞাত অযাচিত ও রহস্যাবৃত আবির্ভাব বাংলার রাষ্ট্র-সাধনোতিহাসের এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এই মিলনের মর্ম্ম সবখানি প্রকাশ না পাইলেও, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, এই মহামিলনের মধ্য দিয়াই বাঙালীর জাতীয় জীবনের রাষ্ট্রসাধনার মূলধারা ধ্বংসের পথ হইতে গঠনের পথে মুখ ফিরাইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মযোগ ও জাতীয়তার নব দৃষ্টিভঙ্গী শ্রীযুত রায়ের অনুকূল চিত্তক্ষেত্রে অভিনব যুগান্তর আনে। তাছাড়া তাঁহার সহকর্ম্মী স্বদেশী আন্দোলনকারিদের কাহার কাহার ব্যক্তিগত নৈতিক ও চারিত্রিক দুর্ব্বলতাও সত্যকার ধার্ম্মিক মানুষ-গঠনের প্রতি শ্রীযুত রায়ের দৃষ্টি খুলিয়া দেয়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম প্রবর্ত্তক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং এই পত্রিকা মারফৎ তিনি তাঁর গঠনমূলক ভাব ও আদর্শ অভিনব ভাষা ও ভঙ্গীতে পরিবেশন করিতে সুরু করেন। সমসাময়িক যুগের রাষ্ট্রনৈতিক সংশয় ও অস্পষ্টতার মাঝে তরুণ-প্রাণ প্রবর্ত্তকের পৃষ্ঠায় দেশাত্মবোধ ও দেশ-সেবার একটা নূতন সঙ্কেতের যেন সন্ধান পাইল। প্রবর্ত্তকের বাণী অব্যর্থ মন্ত্রবীর্য্যের শক্তি ও সম্ভাবনা লইয়া বাংলার উদীয়মান তরুণকে সেদিন দীক্ষা দেয়। অশ্বিনী বাবুর ভক্তিযোগ, মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রা-গান, আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণের সাধনা এবং সর্ব্বোপরি স্বামী বিবেকানন্দের সেবা ও অধ্যাত্ম জাতীয়তামূলক অগ্নিপ্রেরণা যুগচিত্তকে প্রস্তুত করিয়াই রাখিয়াছিল। প্রবর্ত্তকের নির্ম্মাণ পরিকল্পনা সেই প্রেরণাকে ভাবজগৎ হইতে বাস্তবের কঠিন মাটিতে যেন

নামাইয়া আনিল। তরুণ মন জীবনের ভাবকে অনুবাদ করার পথের সন্ধান যেন খুঁজিয়া পাইল। এই সময় হইতেই একে একে বাংলার বিদ্রোহী যুবশক্তি শ্রীযুত রায়কে কেন্দ্র করিয়া মিলিত হইতে লাগিল।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুত রায়ের পিতৃবিয়োগ ঘটায় সংসারিক জীবনেও এক বিপর্য্যয় ঘটিল। তিনি সমস্ত পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করিয়া সহধর্ম্মিনী ও একজন অনুরাগী-ভক্তকে লইয়া একটি নূতন সংসার রচনা করিলেন। ঘরকে পর, আর পরকে আপন করাই ছিল এই সংসারের উদ্দেশ্য। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ভগবানে উৎসর্গীকৃত নিষ্কাম পবিত্র ও স্বাবলম্বী জীবনের সমষ্টি লইয়া এই পরিবারের দ্বার উন্মুক্ত হইল সমগ্র দেশ ও জাতি-সেবকের সম্মুখে। ভাবীকালের বিশাল সম্ভাবনা অলক্ষ্যে বুকে ধরিয়া সঙ্ঘের বীজ এই সময়ে রোপিত হয়। এই উদ্দাম সঙ্ঘ-প্রেরণার উদ্গাতা ছিলেন শ্রীযুত রায় এবং অসীম মাতৃস্নেহে ইহার ধারিকা ও বাহিকা ছিলেন তাঁহারই সহধর্ম্মিনী রাধারাণী দেবী। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এই সঙ্ঘবীজে প্রাণবারি সিঞ্চন করিল মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলন। জাতিসাধনায় মহাত্মাজীর ত্যাগ ও তপস্যার আহ্বানে দলে দলে তরুণ ঘর ছাড়িল। এই বৎসরেই বাণী পূজার পুণ্য দিনে প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থিভবনের পত্তন হয়। বিদ্যার্থি ভবনের অবশ্য সে সময়ে কোন ভবন ছিল না— আশ্রমের শান্ত শীতল স্নিগ্ধ বৃক্ষছায়ায় পঠন-পাঠন চালিত। শ্রীযুত রায় জীবনকে শুদ্ধ পবিত্র ভাগবৎ করিয়া তুলিয়া দেবজন্মের অপূর্ব্ব আলেখ্য আঁকিয়া অনর্গল অনুপ্রেরণা দিতে লাগিলেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের পৌষ মাস সঙ্ঘজীবনের একটি স্মরণীয় কাল। এই সময়ে একটি বিরাট দীক্ষা যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। সমস্ত অতীতকে বিসর্জ্জন দিয়া শিক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষার্থীগণ দীক্ষাগ্রহনান্তের ব্রহ্মগোত্রান্তরিত হইয়া সঙ্ঘজীবন গ্রহণ করে। আধ্যাত্ম-দীক্ষিত পূর্ব্ব-সঙ্ঘ-সন্তানগণের সহিত মিলিত হইয়া পরে ইঁহারাই সঙ্ঘের পরিপূর্ণ রূপ দান করে। এখন হইতে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবন-

সাধনার ভাগবৎ কেন্দ্র হিসাবে শ্রীযুত রায় সঙ্ঘগুরুরূপে এবং মাতৃশক্তি-স্বরূপিনী রাধারাণী দেবী সঙ্ঘজননীরূপে সঙ্ঘচক্রে সম্পূজ্য হইয়া উঠেন। সঙ্ঘ-সন্তানগণের নিকট একদিন যে ভাগবৎ সম্বন্ধ-তত্ত্ব ছিল ভাব-কল্পিত তাহাই রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে মানুষী মাধ্যমে হইয়া উঠিল সুস্পষ্ট ও অকল্পিত। কিন্তু সঙ্ঘ এই প্রত্যক্ষ মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হইল ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে—সতী-লক্ষ্মী সঙ্ঘজননী রাধারাণী দেবীর অন্তর্দ্ধানে। বিদেহী মাতৃশক্তি সঙ্ঘগুরুর মধ্যে সংহৃত হইয়া তাঁহাকে আরও গুণান্বিত ও আপূর্য্যমান করিয়া তুলিল। আধ্যাত্মদৃষ্টিসম্পন্ন মহাত্মা গান্ধীজীর সান্ত্বনা-বাক্য—"**You have not lost but gained your wife. Being disembodied, she will claim greater affection.**"—সত্য প্রমাণিত হইয়াছিল সঙ্ঘগুরু তথা সঙ্ঘের পরবর্ত্তী বিচিত্র জীবন-বিকাশের ধারায়। সত্য যেখানে গভীর, নিবিড় ও ব্যাপক, বাধাও সেখানে বিপুল। এই হিমালয় প্রমাণ বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়াই অতঃপর সঙ্ঘকে ধর্ম্ম, সমাজ, অর্থ, রাষ্ট্র সর্ব্ব-ক্ষেত্রেই জয়যাত্রায় পথ চলিয়া সিদ্ধির পথে আগাইতে হইয়াছে।

সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল একাধারে স্বাপ্নিক ও স্রষ্টা। রাজপুতের বলিষ্ঠ দেহ ও সবল প্রাণ সরস বাংলার হৃদয় ও বুদ্ধির সহিত সংযুক্ত হইয়া শ্রীযুত রায়ের মধ্যে যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। নাতিদীর্ঘ অবয়ব—স্বর্ণকান্তি সুপুরুষ। বাংলার প্রতি তাঁর ঐকান্তিক ভালবাসা তাঁকে বাঙালীর সহিত একাকার করিয়া ফেলিয়াছে। পশ্চিম ভারতীয় বেদানুগ বায়বীয় ঈশ্বর-তত্ত্ব বাংলার জীবনে রসানুবাদ হইয়াছে। শ্রীযুত রায়ের সাধনায় ছায়া যেন কায়া পরিগ্রহ করিয়াছে। ঈশ্বর তাঁর কাছে শুধু 'কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং'-ই নহে, 'রসঃ বৈ সঃ'-ও বটে। তাই বাস্তব সৃষ্টির ক্ষেত্রেও যেমন তাঁর বৈচিত্র্য তেমনি মননশীলতা ও বড় প্রকাশেও তাঁর বিচিত্রতা দৃষ্ট হয়। সাহিত্য সাধনায়ও তিনি বহুবর্ণের রামধনু রচনা করিয়াছেন। রচনা, কাব্য, নাট্য, কথা-সাহিত্যে শ্রীযুত রায়ের বিপুল ও বিচিত্র অবদান বাঙালীর

জীবন-সাধনাকে পরিস্ফুট ও বিচিত্রায়িত করিয়া তুলিয়াছে। সর্বোপরি তাঁর গভীর অনুভূতিসম্মত যুগোপযোগী বিশিষ্ট ভারতীয় জাতিগঠনানুকূল শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রীযুত রায়কে অমর করিয়া ধরিয়াছে। এখানে তিনি তাঁর বস্তু-সৃষ্টির চেয়েও বড়।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের তত্ত্ব, আদর্শ ও লক্ষ্য

এই সঙ্ঘের সৃষ্টি কোন পূর্ব্ব-পরিকল্পনা প্রসূত নয়। বুদ্ধির অপেক্ষা 'বোধ' (intuition)-এর অনুগামী হইয়া সঙ্ঘের সৃজন-ধারা বিকশিত। সঙ্ঘ-স্রষ্টা স্বতোৎভাসিত সঙ্ঘ-স্বপ্ন তাঁর হৃদয় আলোড়িত করিয়া ব্যষ্টি তথা সমষ্টি জীবনের বহুমুখী বিকাশে আজ সার্থকমন্ত্র। সঙ্ঘের সাধনা আত্মসমর্পণ যোগ। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমাহার এই যোগে। ভারতের শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায়ের উপর সঙ্ঘের সাধনা প্রতিষ্ঠিত। উহারই প্রতীক গুরু, মন্ত্র, প্রতীমা সাধনার আশ্রয়। প্রাচীন বৈদিক ভারতের যে ভাগবৎ জীবনবাদ বুদ্ধোত্তর যুগের ইহবিমুখ নৈষ্কর্ম্ম ও নির্ব্বাণবাদের আওতায় ম্লান হইয়া পড়ে, তাহাই পুনশ্চ পরাধীন ভারতের পৌরাণিক যুগে মোক্ষবাদে রূপান্তর লাভ করিয়া এ জাতিকে পঙ্গু করিয়া ফেলে। এই ত্যাগ বৈরাগ্যের ও উৎসর্গের মুখ ফিরাইয়া এবং ধর্ম্মবিষয়ক গতানুগতিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ এক বীর্য্যবন্ত পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব ও ভারতীয় মৌলিক দর্শনের উপর এ জাতির বনিয়াদ রচনা করিতে উদ্বুদ্ধ। অন্তরে সর্ব্ব ব্যাপক চৈতন্যময় বিশ্বাত্মার ভৌম সত্তার অনুভব এবং বাহিরে তাঁরই লীলাবৈচিত্র্য-দর্শন। এই পরিপূর্ণ ভাগবৎ চেতনার উপর সঙ্ঘের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের প্রতিষ্ঠা এবং ভাগবৎ কেন্দ্রের আনুগত্যে প্রেম ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সাধনা সঙ্ঘের সাধক-সাধিকাগণ করিয়া চলিয়াছে। সঙ্ঘচক্রে উৎসর্গীকৃত সাধকমণ্ডলীর এই সিদ্ধি ব্যাপকতর রূপ পরিগ্রহ করিয়া একদিন বিশুদ্ধ ভাগবৎ জাতিতে পরিণত

হইবে, এই আশা সঙ্ঘ স্রষ্টা পোষণ করেন। সঙ্ঘের সমন্বয়ী সাধন-দৃষ্টিতে জাতি ও সমাজে বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু বিভেদ নাই। যেহেতু, এই ভারতীয় অন্বয়ী দৃষ্টির পরিপেক্ষিতে বহু বহুভাবে প্রতিফলিত হয় না—একেকে বহুরূপে দেখা; এই দর্শনের মাঝেই অখণ্ড আত্মীয়তা ও সামাজিক কল্যাণ নিহিত।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ এই সমুচ্চ লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া দীর্ঘদিন পথ চলিয়াছে; ইহা ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান। ধর্ম্ম জীবনের সার্ব্বাঙ্গীন অখণ্ড প্রকাশ, তাই বিশুদ্ধ ভাগবৎ জীবনই ধর্ম্মের মূর্ত্তি। এইরূপ জীবন শুধু স্বার্থকেন্দ্রিক ব্যক্তিগত জীবন নয়, পরন্তু নিষ্কাম সমষ্টিগত তথা জাতিগত জীবন। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অভিনবত্ব এইখানে যে, সঙ্ঘ কর্ম্ম ও পরিবেশকে পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক জীবনকে নিষ্কর্ম্ম ও পঙ্গু করিতে চাহে না। ত্যাগ কর্ম্ম বা বস্তু নয়—কর্ম্মফল বা কর্ম্মাসক্তি এবং বিষয়-লিপ্ততা। সঙ্ঘজীবনে আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম সাধনা। তাই প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ বেদান্ত-প্রচার বা নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মতই শিক্ষা ও অর্থ-সাধনাকেও ধর্ম্মাঙ্গ মনে করে। আত্ম-প্রয়োজন মিটাইতে পর-নির্ভরতারূপ নির্ব্বির্য্যতা এই সঙ্ঘ ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে না। পরার্থে তথা ঈশ্বর-প্রীত্যর্থে স্বাবলম্বী ও সৃষ্টিধর হইয়া ধার্ম্মিক জীবনের বিকাশ কিরূপে সম্ভব, তাহা প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ স্বকীয় সাধনা ও বিচিত্র সৃষ্টির দ্বারা প্রমাণ করিয়াছে। সঙ্ঘ সাধনা করিতে গিয়া যে বিশ্বজোড়া বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাও ধর্ম্মমূলক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অভূতপূর্ব্ব। সর্ব্বপ্রকার ভোগক্ষেত্র হইতে দূরে পলাইয়া নয়, আকণ্ঠ ভোগ-উপকরণের মধ্যে থাকিয়াও আত্ম-জীবনে নিষ্কাম, নিরাসক্তি ও অসংগ্রহের সাধনা করিয়া সঙ্ঘ-সভ্যেরা চলিয়াছে। শিক্ষা, অর্থ, ধর্ম্ম, সমাজ—জাতীয় জীবন-বিকাশের সর্ব্বক্ষেত্রেই সঙ্ঘ যে সৃষ্টির শতদল ফুটাইয়া তুলিয়াছে তাহা স্বাধীন ভারতের স্বকীয় জাতীয়তারই পুষ্টিবিধান করিতেছে। এইখানেই প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য এবং এই সৃষ্টিকরী বিশিষ্টতা সঙ্ঘকে সমগ্র অতীত ও

বর্ত্তমানের ধর্ম্ম-সংস্থা সমূহের অগ্রণী ও দিগদর্শক হিসাবে যুগচিহ্নিত করিয়াছে।

সঙ্ঘের আদর্শ ও লক্ষ্য : প্রেম ও ঐক্য মন্ত্রে সিদ্ধ জাতিগঠন। ভাগবৎ চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত মানুষের মধ্যে প্রেম ও ঐক্যের সংহতি-গঠন। এই আদর্শ লক্ষ্যে রাখিয়া দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষামূলক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান।

ভাগবৎ চেতনাকে জাগ্রত রাখিবার জন্য সঙ্ঘে পাঁচ বার নিয়মিত উপাসনা ও স্বাধ্যায় বাধ্যতামূলকভাবে প্রবর্ত্তিত। ইহা ছাড়া নৈমিত্তিক ব্রত ও উৎসবের ব্যবস্থাও আছে। যে চতুর্ব্বিধ মূলনীতির উপর সঙ্ঘ-জীবন প্রতিষ্ঠিত তাহা এই : কেন্দ্রে (গুরু) নির্ব্বিচার আনুগত্য, অখণ্ড অর্থভাণ্ডার, অখণ্ড অন্নক্ষেত্র এবং উপাসনা। কর্ম্ম-বৈচিত্র্য বা অর্থ-বৈষম্যে এখানে কোন বিভেদ নাই। স্বতন্ত্র কর্ম্মক্ষেত্র সত্ত্বেও উৎসর্গীকৃত নারী-পুরুষের এখানে সর্ব্ব বিষয়ে সমানাধিকার। সঙ্ঘে দাবী নাই, আছে সেবা ও সমর্পণ।

অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব প্রবর্ত্তক সঙ্ঘেরই জন্মোৎসব বলা চলে এই জন্য যে, এই পূণ্য তিথিতেই প্রথম প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের বীজাঙ্কুর হয়। বিগত ২৬ বৎসর ধরিয়া এই উৎসব চন্দননগর সঙ্ঘের শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। এই অনুষ্ঠান ক্রমশঃ ব্যাপকতর রূপ পরিগ্রহ করিয়া জাতীয় উৎসবে পরিণত হইয়াছে। সঙ্ঘের আদর্শে আজ বাংলার বহু স্থানে অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের প্রচলন দৃষ্ট হয়।

অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব

অক্ষয় তৃতীয়া হইতে বৌদ্ধ পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ দিবস প্রদর্শনী ক্ষেত্রে স্বদেশী শিল্পের প্রচার, মূর্ত্তিতে, প্রাচীর-চিত্রে ও লেখনীতে এবং মণীষিবর্গের বক্তৃতায় জাতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও জীবন-বিকাশের আলেখ্য দেশ ও দশের সামনে পরিবেশিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই ধরণের শিক্ষাপ্রদ উৎসব ও প্রদর্শনীর প্রবর্ত্তক, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘকে বলা যাইতে পারে।

বর্ত্তমানে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের চন্দননগরস্থিত মূল কেন্দ্রের অনুমোদিত নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলি পরিচালিত হইতেছে : বিভাগীয় কেন্দ্র—চট্টগ্রাম : চট্টল সহরের উপকণ্ঠে গোলপাহাড়ের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত।

সঙ্ঘের শাখা, শিক্ষা ও সংগঠন

শাখা কেন্দ্র : (১) ময়মনসিংহ (২) মেলান্দহ (ময়মনসিংহ) (৩) দফরপুর (হাওড়া) (৪) রায়না (বর্দ্ধমান) (৫) ফ্রেজারগঞ্জ (২৪ পরগণা) (৬) বলাগড় (হুগলী) (৭) দেরাদুন (ইউ পি) (৮) বাগেরহাট (খুলনা) (৯) কারশিয়াং। (দার্জ্জিলিং)।

চন্দননগর কেন্দ্র : প্রবর্ত্তক কলেজ অব্ কালচার। প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থি ভবন (বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়)। প্রবর্ত্তক নারী বিদ্যা-মন্দির (বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত মহিলাদের উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়)। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ লাইব্রেরী এবং প্রবর্ত্তক মহিলা সদন (নিরাশ্রয়া মহিলাদের আবাস; কারুশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়)।

চট্টল কেন্দ্র—প্রবর্ত্তক বিদ্যাপীঠ (উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়)। প্রবর্ত্তক শিশু-সদন (অনাথ বালক বালিকাদের আশ্রয় ও শিক্ষাকেন্দ্র) এবং প্রবর্ত্তক লাইব্রেরী।

ময়মনসিংহ কেন্দ্র—প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থি ভবন (ময়মনসিংহ : উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়)। প্রবর্ত্তক এম, ই, স্কুল (মেলান্দহ)।

ইহা ছাড়া চন্দননগর, চট্টগ্রাম, ২৪ পরগণা, হাওড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি কেন্দ্রে অনেকগুলি সুপরিচালিত অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় বিদ্যমান আছে।

সঙ্ঘের মুখপত্র—প্রবর্ত্তক (মাসিক : ৩৩শ বর্ষ চলিতেছে)।
নবসঙ্ঘ (সাপ্তাহিক : ২৭শ বর্ষ চলিতেছে)।

সঙ্ঘের স্বাবলম্বন সাধনার অত্যন্ত ক্ষুদ্রারম্ভ আজ বিচিত্র ও ব্যাপক অর্থ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। মুষ্টিমেয় সঙ্ঘ-সন্তান ভিক্ষা বা অন্যের

অর্থে দেশ-সেবা শ্রেয়ঃ না করিয়া স্বীয় প্রতিভা ও শ্রমকে অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেন।

সঙ্ঘের ব্যবসা ও বাণিজ্য

প্রবর্ত্তক পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া প্রথম মুদ্রণ প্রেসের সৃষ্টি। তারপর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘগুরু ৯৲ সুদে একলক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন কিন্তু বৈষয়িক অনভিজ্ঞতার ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই ঋণকৃত অর্থ নিঃশেষ হইয়া যায়। কিন্তু সঙ্ঘের খাঁটি বিশ্বাসের মানুষ যারা, তাদের অদম্য শ্রম, শক্তি ও সহযোগিতায় সঙ্ঘ পরে এই ঋণ মুক্ত হয়।

সঙ্ঘের এই অর্থ সাধনার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বাধা আসে বৃটিশ ও ফরাসী গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে। ঈশ্বরেচ্ছায় এই বিঘ্ন আশীর্ব্বাদের মতই হয়। অলক্ষ্যে এক তৃতীয় শক্তি সঙ্ঘের কর্ম্মক্ষেত্র স্বল্পপরিসর চন্দননগর হইতে বৃহত্তর মহানগরী কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিতে যেন বাধ্য করে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে একমাত্র তৃতীয় শক্তির উপর নির্ভর করিয়া নিঃসম্বল অবস্থায় প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কের সৃষ্টি। ব্যাঙ্ককে মধ্যমণি করিয়া অতঃপর বিবিধ ব্যবসার প্রসার ঘটে। এই সময়ে ব্যক্তিগত উদ্যমকে ক্রমশঃ কেন্দ্রীকৃত করিয়া বিভিন্ন অর্থ-প্রতিষ্ঠানগুলিকে সঙ্ঘগত করা হয়। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট লিমিটেডের প্রতিষ্ঠা। সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতৃ সভ্যগণ কর্ত্তৃক মনোনীত একটি ডিরেক্টর বোর্ড কর্ত্তৃক এই সব অর্থ-প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত। ইহার মূল কেন্দ্র-অফিস ৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সঙ্ঘের অর্থ প্রতিষ্ঠান সমূহ :

প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট লিমিটেড্, প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেড্, প্রবর্ত্তক জুট মিলস্ লিমিটেড্, প্রবর্ত্তক ফার্ণিশার্স লিমিটেড্, প্রবর্ত্তক কমার্সিয়াল করর্পোরেশন লিঃ, প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিঃ, প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, প্রবর্ত্তক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, প্রবর্ত্তক কৃষি বিভাগ, প্রবর্ত্তক খাদি বিভাগ, প্রবর্ত্তক কুটির শিল্প বিভাগ, নব-সঙ্ঘ প্রেস, আর-ডি-জি (ক্যাবিনেট মেকার্স) ঃ

বহু মনীষী, ধর্ম্মবীর ও শিক্ষাবিদের জন্ম ও কর্ম্মে হুগলী জেলা গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে প্রতিষ্ঠান-হিসাবে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সর্ব্বাঙ্গীন অগ্রগামীশীলতা সেই গৌরব আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। মহাত্মা-গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, মালব্যজী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রায় সব মনীষিগণ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে পদার্পণ করিয়া সঙ্ঘের ভাব ধারার সহিত সপ্রশংস পরিচয়ের মধ্য দিয়া চন্দননগর তথা হুগলী জেলাকে ধন্য করিয়াছে।

উপসংহার

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

হুগলী ব্যাঙ্ক হুগলী জেলার গৌরব; প্রথমে উত্তরপাড়ায় শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমানে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে এবং হুগলী জেলার বহু স্থানে ইহার একুশটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা ভারতের প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে অন্যতম। ইহা বর্ত্তমানে একটি সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক রূপে কার্য্য করিতেছে এবং সকল প্রকারের ব্যাঙ্কিং কার্য্য ইহাদের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। কলিকাতায় ইহার নিজস্ব ভবন বর্ত্তমানে নির্ম্মিত হইতেছে।

উত্তরপাড়ায় পানের দোকানের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র ঘরে হুগলী ব্যাঙ্কার্স ও ট্রেডার্স লিঃ এই নাম দিয়া ইহার কার্য্য সুরু হয় এবং ইহার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে উত্তরপাড়া রাজ বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহারই ঐকান্তিক যত্নে ইহা বর্ত্তমানে একটি প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ইহার আদি নাম পরিবর্ত্তন করিয়া হুগলী ব্যাঙ্ক রূপে ইহা প্রখ্যাত হয়।

বিংশ অধ্যায়

গ্রন্থকারদিগের নাম ও তাঁহাদিগের গ্রন্থ

(বর্ণানুক্রমিক)

অ

অভয়াচরণ সিংহ—চুঁচুড়া, কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ। অধরচন্দ্র তারণ—মথুরাবাটী, হুগলী, ডাকের কথা। অমৃতলাল পাল—শিবপুর, শ্রীশ্রীবক্কেশ্বর চরিত। অনুকূলচন্দ্র ঘোষ—হুগলী, **General Directory of Howrah and its suberbs (1901)**। অতুল্য ঘোষ—জেজুর, নোয়াখালিতে গান্ধী। অতুলচন্দ্র বসু—শিবপুর, শিবপুর কলেজ পত্রিকা। অন্নদাচরণ ব্যানার্জ্জি—শ্রীরামপুর, চিন্তার বিকাশ। অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—তেলেনীপাড়া, **Against Idolatry,** প্রশ্ন চতুষ্টয়। অমৃতলাল সরকার—**Medical Journal.** অমৃতলাল বিশ্বাস—হুগলী, গানের মাদল। অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল—পাতুল, হুগলী, জন্মেজয়ের নাগযজ্ঞ (১৯০৭), কার্ত্তবীর্য্য সংহার, (১৯০৭), অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ (১৩২৫), বভ্রুবাহনের যুদ্ধ, শ্রীদাম উদ্ধার। অক্ষয়কুমার দত্ত—বালি, বিদ্যাদর্শন। অক্ষয়কুমার গোস্বামী—শ্রীরামপুর, জয়শ্রী। অম্বিকাচরণ গুপ্ত—তাজামোড়া, পরলোকের পত্র (১৩২১), আমার চিন্তা (১২৮৭), ছোটবউ (১২৮৮), চিন্তা (মাসিক পত্র), শান্তিরাম (১৮৮৫), জয়কৃষ্ণ চরিত (১৯০১), কল্যানী. সুবারাম, বুকোলা বালা, পুরান কাগজ, মহারাণী ভিক্টোরিয়া, ধর্ম্মতত্ত্ব সূক্ষ্মগতি, রত্নাঞ্জলি, হুগলী (১৩২১) জজ্ দিগম্বর বিশ্বাস, কোম্পানীর রাজত্বে বাঙ্গলা সাহিত্য। অক্ষয়চন্দ্র সরকার—চুঁচুড়া, পূর্ণিমা (মাসিক পত্র), সাধারণী (সাপ্তাহিক

পত্র), সাধারণী (সাপ্তাহিক পত্র), নবজীবন (মাসিক পত্র), গোচারণের মাঠ, শিক্ষানবীশের বাস্ত, হেমচন্দ্র, গোবিন্দ দাস (১২৮৫), প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ, মোতি কুমারী, কবিকঙ্কন চণ্ডী (১৮৭৮) বিদ্যাপতি (১২৬৩), সমাজ, সমালোচনা, তারকসংহার কাব্য, শব্দসাগর, উদ্দীপনা, বাঙ্গালীর বৈষ্ণব ধর্ম্ম, রূপক ও রহস্য, সংক্ষিপ্ত রামায়ণ, আলোচনা, হাতে হাতে ফল, পিতাপুত্র, মহাপূজা, সাহিত্য পাঠ, সাহিত্য সাধনা। অনুরূপা দেবী—চুঁচুড়া, প্রতিশোধ, বিস্মৃতি, স্মৃতি, আংটি, ধূমকেতু, মৃন্ময়ী, কনে দেখা মথুরায়, পোষ্যপুত্র, বাগদত্তা, মন্ত্রশক্তি, চিত্রদ্বীপ, স্বানিশা, লঘুক্রিয়া, গৃহ, প্রহরী, জমক ও যজ্ঞবল্ক্য, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মজ্ঞান, রামগড়, সনুমল্লী, রাঙ্গাশাঁখা, জ্যোতিহারা, উল্কা, দান, দেবদূত ও অরিষ্টজননী, নারীমঙ্গল, ত্রিপুরেশ্বরী, সোনার খনি (১) মা, বিদ্যারণ্য, ভূদেব চরিত, চক্র, পথহারা, হারানো খাতা, গরীবের মেয়ে হিমাদ্রি, প্রাণের পরশ, ত্রিবেণী, উত্তরায়ণ, কুমারিল ভট্ট, সোনার খনি, (২) মহানিশা, মুক্তি, কৃতজ্ঞ, মিলন, দেবদাসী, হার, ভুলভাঙ্গা, প্রবন্ধমালা, সাজসী, লীলা পুরস্কার বক্তৃতা, গুরুদক্ষিণা, পরাজয়, বন্ধু, অযাচিত, স্বর্গচ্যুত, পথের সাথী, সর্ব্বানী। অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া, উত্তরপাড়া বিবরণী (১৩২০)। অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া, বংশ পরিচয় (১৩১৭)। অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীরামপুর, দেশাচার (১৮৭২)। অমরনাথ মিত্র—ভদ্রেশ্বর, রেণুকা (১৩১৯)। অবিনাশচন্দ্র ঘোষ—আরামবাগ, এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা (১৯০৭)। অমৃতলাল কুণ্ডু—শালিকা, সর্ব্বজন সুহৃদ (মাসিকপত্র ১৯০৮)। অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য—কংসবধ (১৯০৮) অবলাবালা দাসী, বাঁশবেড়িয়া, পূর্ণিমা (মাসিক পত্র)। অঘোরনাথ ঘোষ—খামারগাছি, Interpretation of Indian Statutes (1904). অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়—The Original Abode of The Indo-Aryan Races. অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ—

নারায়ণপুর, চাণক্য-শ্লোক, ধাতুবিবেক, সাবিত্রী, রচনা-প্রণালী, বঙ্গীয় সাহিত্য সমালোচনা। অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়—চুঁচুড়া, সুধা (১৩৩৬), মরণোল্লাস (১৩৩৭)।

অরবিন্দ ঘোষ—The mother. The yoga and its objects. Yogic Sadhan, Essays on the Gita, Isha Upanishad, Ideal and Progresss, The Uperman, Evolution, Thoughts and glimpses, Ideals of the Karmayogin, War and self determination. The Renaissance of India, The Brain of India,, A system of National Education, The National value of art, The need in Nationalism, Rishi Bankim Chandra, Uttarpara speech, Songs to Myrtilla, Love and Death, Outway of Life, Baji Prabhon, The Ideal of Human Unity, The age of Kalidasa, Kalidasa's Season, Dayanad and ite Veda, Katha Upanishad, Speeches, Apana, Urvasie, Hero and the Nymph, ধর্ম্ম ও জাতীয়তা, গীতার ভূমিকা, কারা কাহিনী, অরবিন্দের পত্র, জগন্নাথের রথ।

অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—চন্দননগর, মোহন মাধুরী (১৯১৭), রাজেন্দ্র-জীবনী ১ম ভাগ (১৯৩৪)। অরুণচন্দ্র দত্ত—চন্দননগর, Spiritual communism (1922), অরবিন্দ মন্দিরে (১৩২৯) উক্তি ও উৎসর্গ গীতা (১৩২৫), প্রাচ্যের জাগরণ, যুগের বাংলা (১৩৪০)। অবিনাশচন্দ্র দত্ত—চন্দননগর, ভাগ্য পরীক্ষায় বীর, ব্রহ্মবিজ্ঞান (মাসিক-পত্র)। অঘোরানন্দ স্বামী—চন্দননগর, তত্ত্বজ্ঞানামৃত (১৩৩৩)। অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—বারাসত, চন্দননগর; স্বাস্থ্য-বিধান (১২৯৪), গোপিকা-প্রেম (১৩০৩), বস্ত্র-হরণ (১৩০৩), রাসলীলা (১৩০৩), কুসুম লতিকা (১২৯৪), নিকুঞ্জলীলা (১২৯৯), ব্রজলীলা অবসান (১৩০৩), রাই উন্মাদিনী (১৩০৩), সাধক-সবু-মাধুরী (১৩০৭), প্রভাস-মিলন (১৩০৮)। অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—

চন্দননগর, What is Hinduism (1935). অভিরাম দাস গোস্বামী—খানাকুল, গোবিন্দ বিজয়, কৃষ্ণমঙ্গল। অমরেন্দ্রনাথ রায়—সুখড়িয়া ; হিন্দুমহিলা, বীরবালা কাব্য, বসন্তরোগ চিকিৎসা। অমূল্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া, স্কুলপাঠ্য কয়েকখানি পুস্তক ও ব্যাখ্যা। অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়—চুঁচুড়া, আহুতি, শিশুর খাদ্য ও পরিচর্য্যা। অমূল্য চরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ—বঙ্গীয় মহাকোষ। অখিলচন্দ্র পালিত—বড়গাছিয়া, নালিকুল ; হৃদয় গাথা (১ম ও ২য় ভাগ) মেঘদূত, বাজিপ্রভু, স্নেহলতা। আত্মনাথ তর্কবাগীশ ও বেদান্তনাথ তর্কবাগীশ—শ্রীরামপুর শব্দার্থ সংগ্রহ। আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়—কনকশালী, চুঁচুড়া, ইংরাজী কাব্য গাঁথা। আউলিয়া মনোহর দাস—বদনগঞ্জ, দীনমনী চন্দ্রোদয়, পদ সমুদ্র, নির্য্যাসতত্ত্ব সংগ্রহ ; অনুরাগবল্লী। আশুতোষ ব্যানার্জ্জি—স্বদেশী সঙ্গীত। আশুতোষ মিত্র—জেজুর, Ready Reckoner. (1903)।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—জনাই, Position of Women in Ancient India. আভাদেবী মিত্র—জেজুর, আমার-কবিতা (১ম খণ্ড)। আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়—চন্দননগর। Essays on Humour and Genius (1921), The Model Primer (1930), Choice Readings from English Literature (1933). আশুতোষ ভট্টাচার্য্য—জনাই, কমলা। আমীর আলি (সৈয়দ)—চুঁচুড়া Critical Examination of the Llife and Teachings of Mohamad, Spirit of Islam, Ethics of Islam, a short history of Saracens, Personal Law of the Mohamadans. Mohammadan Law, Law of the Evidence applicable, Students hand book of Mahamadan Law, Civil Procedure in Britsh India, A Comentary of the Bengal Tenancy Act.

আশুতোষ মিত্র—কোন্নগর, শরীর বিজ্ঞান। আশুতোষ

মুখোপাধ্যায়—বগাগড়, **Geometry of Conics, Law of Prepetuities in British India.** আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—চন্দননগর; অবকাশ বন্ধু মাসিক পত্র (১৮৬৭)

ই

ইন্দিরা দেবী—চুঁচুড়া, কেতকী, সৌর রহস্য, ফুলের তোড়া, স্পর্শমণি, নির্মাল্য, পরাজিতা, মাতৃহীন, স্রোতের গতি, আমার খাতা, শেষদান, প্রত্যাবর্ত্তন। ইন্দিরাসুন্দরী দাসী—স্মরণ। ইন্দ্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়—অর্শ চিকিৎসা। ইন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায়—চন্দননগর, বঙ্গভাষার মানচিত্র।

ঈ

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া (গুলিটা) যোগেশ কাব্য (১২৮৭) চিত্তমুকুর (১২৮৫), চিন্তা (১২৯৪), সুধাময়ী কাব্য। বাসন্তী (১২৮৭) ঈশানচন্দ্র বসু—হুগলী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন বৃত্তান্ত স্বপ্ন করিয়া (১৯০২)। ঈশানচন্দ্র সামন্ত—বাগনান অথবা আসমান গুজব শুনে আক্কেল গুড়ুম (১৯০৬)। ঈশানচন্দ্র ঘোষ—হুগলী, শিশুপাঠ্য বাঙ্গলার ইতিহাস (১৯০২) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বীরসিংহ, বাসুদেব রচিত, বেতাল পঞ্চবিংশতি, বাঙ্গলার ইতিহাস, কথামালা, শিশুশিক্ষা, উপক্রমণিকা, ঋজুপাঠ (৩ ভাগ), সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত-সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব, ব্যাকরণ কৌমুদী-(৪ ভাগ), শকুন্তলা, বর্ণপরিচয় (২ ভাগ), বিধবা বিবাহ (২ ভাগ) **Marriage of Hindu Widows,** চরিতাবলী, পাঠশালা, মহাভারত (উপক্রমণিকা ১ম ভাগ) সীতার বনবাস, আখ্যানমঞ্জরী (৩ ভাগ), প্রভাবতী সম্ভাষণ, রামের রাজ্যাভিষেক, মেঘদূত, ভ্রান্তিবিলাস, শ্লোক মঞ্জরী, ভূগোল খগোল বর্ণনম্, বাল্মীকীর রামায়ণ, শব্দ সংগ্রহ, বিরিতাৰ্জ্জনীয় রঘুবংশ; শিশুপাল বধ, কুমার সম্ভব, উত্তর চরিত, অভিজ্ঞান শকুন্তলা হর্ষচরিত, কাদম্বরী, মানসিংহ, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, **Selections from the**

Writings of Goldsmith, Selections from English, Selections from English Literature, Poetical Selections.

উ

উমাচরণ ভট্টাচার্য্য—হুগলী, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের জীবন বৃত্তান্ত। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীরামপুর, সুরা পিশাচী (১৮৭৬)। Burkes Reflections on the Revolution in France. উপেন্দ্র নাথ মৈত্র—শ্রীরামপুর; Notes on Deserted Village (1901) Notes on Paradise Lost Book II, (1902). উমেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি—উত্তরপাড়া, সমাচার চন্দ্রিকা (সংবাদপত্র)। উমেশ চন্দ্র বটব্যাল—রামনগর, বৈদিক যুগে গোহত্যা, আর্য্যদর্শন, বাঙ্গলার প্রাচীন ইতিহাস, বেদ প্রকাশিকা, গৌরাঙ্গ চরিত, বৈদিক প্রবন্ধাবলী। উমেশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—অনুবাদ রত্নাকর (১৯০৮)। উপেন্দ্রনাথ গোস্বামী—চন্দননগর, ভাষা, ৺হরিসভার আচার্য্য ৩ খণ্ড (১২৮৭-৮৮-৯০), বৈষ্ণব ব্রত ভবন (১২৯৬)। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—চন্দননগর; জাতের বিড়ম্বনা (১৩২৯), বর্ত্তমান সমস্যা, নির্ব্বাসিতের আত্মকথা, ধর্ম্ম ও বর্ম্ম, ঊনপঞ্চাশী (১৩২৯), সিনথিন, Memoirs of a Revolutionary, স্বাধীন মানুষ (১৩২০) পথের সন্ধান। উপেন্দ্রনাথ পাড়ুই—চন্দননগর, জাতির কথা। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মালিপাড়া, আকর্ষণ, জীবন রহস্য। উমাচরণ মুখোপাধ্যায়—মহানাদ।

এ

এন্টনী ফিরিঙ্গী—গৌরহাটি, ফরাশডাঙ্গা, কবির গান রচয়িতা।

ও

ওয়াট (রেভারেণ্ড)—সাহিত্য ইতিহাস ও পুরাণ (১৮১১), কৃষ্ণদাস পালের জীবনী। ওয়ার্ড মিশনের কার্য্যে কতিপয় পুস্তক প্রনয়ণ করেন। ওয়াজেদ আলী—বড় তাজপুর; ভবিষ্যতের বাঙ্গালী।

ক

কালীদাস তর্কসিদ্ধান্ত, ৺শ্রীশ্রীরাম শতকং, কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী শ্রীশ্রী৺অভিরাম লীলামৃত, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়—চুঁচুড়া, অভিজ্ঞান শকুন্তলা। কেশবচন্দ্র রায়—আদর্শ জমিদার। কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় Aryan Traits। কাঞ্চনমালা দেবী—উত্তরপাড়া; গুচ্ছ (১৩২১), স্তবক, রসির ডায়েরী (১৩২৪)। কিরণধন চট্টোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া, নূতন খাতা। ক্ষেত্রনাথ রায়চৌধুরী—উত্তরপাড়া। পদার্থ গুণমালা (১২৬৪) উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্র (১৮৪৯)। কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় বিশ্বভ্রাতা। কালীদাস মৈত্র—মানবদেহ তত্ত্ব (১৮৫৯), ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ (১২৬২), খপোত বিবরণ, গার্হস্থ্য বাঙ্গালা (১৮৫৯) বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে (১২৬২) কেশবচন্দ্র কর্ম্মকার ব্রজবিহার (১২৬৯), তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ, পরমার্থ বিজ্ঞান। কনাদ তর্কবাগীশ—খানাকুল, ভাষারত্ন, মণিব্যাখ্যা, তত্ত্ব চিন্তামণির টীকা। কৃষ্ণচন্দ্র বসু মল্লিক—শ্রীরামপুর; মনস্তাপ (১৯০৭)। কানাইলাল ভট্টাচার্য্য—বাকুলিয়া। পুণ্যের আলো। কালীপদ মুখোপাধ্যায়—পোলবা। রসসিন্ধু প্রেম বিলাস (১২৫৯)। কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়—তেলিনাপাড়া। স্বপ্নতত্ত্ব, প্রজ্ঞাপারাসিতা সূত্র। কেশবচন্দ্র কুণ্ডু—খামারপাড়া, কবিতা। কৃষ্ণানন্দ স্বামী—গুপ্তিপাড়া, নীতিরত্নমালা ঈশ, স্বপ্নদর্শন, পঞ্চামৃত, পরিব্রাজকের বক্তৃতা, শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলী, পরিব্রাজকের সঙ্গীত, যোগ ও যোগী বিচার প্রকাশ, বলিদানের শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত, রামগীতা, শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতা। কুসুমেশকুমার মিত্র—কোন্নগর, হুগলী, বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনয় (১৯০০)। কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়—হুগলী, উচিত বক্তা (১৯০১)। কৃপাশরণ ভিক্ষু—কৈকালা, হুগলী, বুদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার কার্য্য বিবরণী (১৯০১)। কালীপ্রসন্ন পাইন—হরিদাস নাটক। কুমুদবন্ধু বসু—হুগলী, English

Spelling Book (১৯০২)। কিশোরীচাঁদ মিত্র—Raja Rammohan Raya in the Calcutta Review for 1842. কালীপদ মিত্র—কৈকালা, হুগলী; হিন্দুসখা (১৯৯৮), নিশীথ-চিন্তা। কুঞ্জবিহারী গাঙ্গুলী—মাতৃপূজা (১৯০৮)। কৈলাশচন্দ্র মুখার্জ্জি—পিপুলপাতি, হুগলী, A few Sayings and Opinions of Bankim Chandra Chatterji (1908). ক্ষেত্রকালী রায় কবিরত্ন—সাহাগঞ্জ, হুগলী, অদ্বৈত তত্ব (১৯০৮)। কে, সি, দে—হাওড়া, Washington, Irving's Rip Van Winkle, The Legend of Sleepy Hells with notes. কামাখ্যাচরণ গুপ্ত—ভাঙ্গামোড়া, হুগলী, Six years in Burmah. কুঞ্জবিহারী কাব্যতীর্থ—দাঁড়পুর, হুগলী, ধন্বন্তরি (সাময়িক পত্র) ১৩০৪-১৩০৫, পরাশরের কৃষি সংগ্রহের বঙ্গানুবাদ, কতকগুলি আয়ুর্ব্বেদ ও সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। কিশোরীমোহন গাঙ্গুলী—A Brief History of the Andul Raj (1910). কুঞ্জবিহারী মল্লিক—ঘুটিয়াবাজার, হুগলী, সুবর্ণ বণিক। কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য—শ্রীরামপুর, Opium Act, Six System of Hindu Philosophy, Meadiaval Philosophy। কে, সি, রায়—স্বর্ণগ্রাম, Montorial Geography. কালীপ্রসন্ন বটব্যাল—গোপালপুর, জাতি বিজ্ঞান (১৯০১)। কার্ত্তিকচন্দ্র পাল—আমেদপুর, হুগলী, সংসার সঙ্গিনী (১৯০১)। ডাক্তার কেরি (রেভারেণ্ড)—শ্রীরামপুর, কথোপকথন, হিতোপদেশ, অমরকোষ, ছেলেদের দশকুমার চরিত, বাঙ্গলা অভিধান (১৮১৮), Colloquies, Bengali Grammer (1805) উদ্ভিজ্যাবলীর তালিকা, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, বরাহ নৃসিংহ পুরাণ, Letter Da Lasear, Missionaries address to Hindus, Bible Translation, Bengali translation of Goldsmith's History of England, ইতিহাস, ভাব প্রকাশ, ভারতের পুণ্যরাশি,

ভারত বিষয়ক ইতিহাস, ছত্রিশটী ভাষার বাইবেল। রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ, কবিপুরাণ। কেরি (এফ্)—শ্রীরামপুর, Pilgrim's Progress, History of England. বিদ্যাহারাবলি, (১৮১৭) কিমির বিদ্যা (১৮১৮)। কালীময় ঘটক—হুগলী, চরিতাষ্টক। ক্রফোর্ড—হুগলী A Brief History of the Hugly District, Medical Gazetter of the Hugly District. ক্ষেত্রমণি দেবী—সংগ্রামপুর, অপূর্ব্ব মিলন। কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায় (রেভারেণ্ড)—শিবপুর; বিদ্যা-কল্পদ্রুম্। ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত বিদ্যারত্ন—বৈকুণ্ঠপুর (ত্রিবেনী) হুগলী, শিক্ষা ও উপদেশ, প্রদীপ, প্রবোধ প্রকাশ, মদন মোহন, আর্য্যদর্শন, প্রভাত সমীর, নব বিভাকের, সাধারণ, প্রভাতী প্রজাবন্ধু, বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্রিকার কিছু দিনের জন্য সম্পাদক ছিলেন। কুমুদলাল দে—Law family of Calcutta. কালীপ্রসন্ন কুমার—চুঁচুড়া; A guide to Sanitary Science (1902) কেশবলাল সরকার—হুগলী, শিশুপাঠ ভুগোল বিবরণের প্রশ্নোত্তর (১৯০৩)। ক্ষিরোদ বাসিনী দাসী—উলুবেড়ে, হাওড়া, প্রবোধ বিয়োগ (১৯০৩)। কালীচরণ বন্দোপাধ্যায়—কোন্নগর, হুগলী, আমার পরিচয় (১৯০৩)। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ—বাকসা, হুগলী, মহাভারত, হুতোম প্যাঁচার নক্সা। কৃষ্ণচৈতন্য বসু—ত্রিবেণী, হুগলী, জ্ঞান রত্নাকর। কৃষ্ণচন্দ্র রায়—হুগলী, অপরাধ সূত্র। কালীপ্রসন্ন রায়—হুগলী, A Criticism of the Meghnad Badh. কান্তিনাথ রায়—সুগন্ধা, হুগলী, মন্মথ মঞ্জুরী (১৮৫১)। কেশবচন্দ্র কর্ম্মকার—শ্রীরামপুর। Fables for Student. কালিদাস মুখোপাধ্যায় (কালী মির্জ্জা)—গুপ্তিপাড়া হুগলী; গীত লহরী। কামিনীসুন্দরী দেবী—শালিখা, হাওড়া, গুরুপূজা, কাশী, পাগলামী, (১৯০৭)। কেতক দাস—মনসার ভাসান। কাশীপ্রসাদ ঘোষ—পাঁইতাল, হাওড়া, A Poem, Commentry on Mill's History of India,

The Young poets first attempt, The Hindu Festival. Poems in Calcutta Literary Gazette, The Boatmans Song to Ganga, The Memoris of Indian Dynasties, On Bengali Poetry, On Bengali Works and Writers, The Vision, Tal-Man-Sangat with 300 Songs, The Shair, Selection From British Poets. The Hindu Intelligencer (Weekly Journal).

কাশীদাস মুস্তোফি (মিত্র)—সুখড়িয়া, হুগলী, অঞ্জন শলাকা, আত্মানুভূতি, কাশীকা, গুপ্তলীলা, শক্তিতত্ত্বসার, প্রয়াগ মাহাত্ম্য, বিবেক রত্নাবলী, বিচার দীপিকা, জ্ঞান রসায়ন, তত্ত্বপ্রকাশ, বিচার তরঙ্গিনী, প্রেমানন্দ লহরী, স্বজনরঞ্জন, শঙ্কর বিজয় জয়ন্তী। কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য,—চুঁচুড়া, অদ্বৈত তত্ত্ব। ক্ষেত্রকালী রায় কবিরত্ন—সাহাগঞ্জ, হুগলী, বিবিধ কথা (১৯০৬)। কেদারনাথ সরকার—শ্রীরামপুর, কার্পাস তুলার ইতিহাস ও শিল্প বিবরণ। কৃষ্ণানন্দ শর্ম্মা—হাওড়া, হীরাবাঈ। কিশোরীলাল সান্যাল—শ্রীরামপুর—A Criticism of Political Economy (1906) কৈলাসচন্দ্র বসু—হাওড়া, The Universal Pocket Diary for 1907. কাশীরাম দাস—সিদ্ধি, (কাটোয়ার সন্নিকট) মহাভারতের বঙ্গানুবাদ। কৃষ্ণধন ভট্টাচার্য্য—জ্ঞান বিকাশ, Julias Ceasar, Tempest, East India Co. পারিজাত ভ্রংশ। ক্ষেত্র মোহন সেনগুপ্ত—বৈদ্যবাটী, বাল্যবৈসজ্য (১২৯৩)। কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—চাতরা, রামপ্রসাদ। কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—Studies in Vedantaism. কিশোরীমোহন ঘোষাল—কোন্নগর, পারের গান। ক্ষেত্রলাল স্মৃতিরত্ন—গুপ্তিপাড়া, রাধাকান্ত চম্পূ। কৃষ্ণমোহন মল্লিক—চন্দননগর—A Brief History of Bengal Commerce from the year 1840-1870 with a short sketch of Indian Finance Part I & Part II (1871-72).. *

---

* ভোলানাথ চন্দ্রের জীবনীতে ইহার ৩ খণ্ড আছে বলিয়া উল্লেখ আছে।

কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—চন্দননগর, কুমদ্বতী (১২৯১) সুপর্ণা (১২৯১) কৃষ্ণদাস সুর—চন্দননগর ; বিদ্যুৎখালিনী ২য় খণ্ড (১৮৭৮)। কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় চন্দননগর, কৃষ্ণচরিত কাব্য, ১ম খণ্ড (১২৯৩)। বরেন্দ্রকুমার দত্ত—চন্দননগর, স্মৃতি সুধা (১৯২৮)। কালীনাথ ঘোষ—চন্দননগর, আত্মদান, নামসুধা, অনুষ্ঠান সঙ্গীত ১ম ভাগ (১৩২৫) অনুষ্ঠান সঙ্গীত ২য় ভাগ, ব্রাহ্ম সঙ্গীত ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ভাগ ১৮১৬ শকাব্দ, ১৯০০, ১৯০১, ১৩০১। কেশবচন্দ্র সাধু—চন্দননগর, স্পর্শানন্দা (১২৭৬), কল্পনা প্রসূন (১২৯১)। কালীপ্রসন্ন বসু—চন্দননগর, Important Questions on the Citizen of India with full Answers, A Guide to **History of England.** (1905) কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—চন্দননগর, মাণিকজোড়। কে, সি, দেবধাড়া (চন্দননগর) ও ইউ, এন, ভট্টাচার্য্য, আর্য্যলিপি ধারাপাত (১৩৩১)। কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী—চন্দননগর, ধর্ম্মঘট। কৃষ্ণকমল গোস্বামী—নবদ্বীপ (চুঁচুড়া) নিমাই সন্ন্যাস, স্বপ্নবিলাস, রাই উন্মাদিনী, বিচিত্র বিলাস, সুবল সংবাদ, নন্দহরণ, ভারত মিলন, বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে। ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী—হঠযোগ ৪ ভাগ। কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়—জনাই, হুগলী ; চরক-সংহিতা (ইংরাজি), মহাভারত (ইংরাজি), হালিসহর পত্রিকা ও ন্যাশনাল ম্যাগাজিন।

গ

গোবিন্দচন্দ্র বসু—জয়নগর (জেজুর), গিরি শিখোরা-পরিভ্রমণ। গোবিন্দ অধিকারী—খানাকুল কৃষ্ণনগর, জাঙ্গীপাড়া, গীত, কালীয়দমন যাত্রার পালা, সুখ-সারির পালা, পাঁচালী, মান, কলঙ্কভঞ্জন, মাথুর, চাঁদধরা, ননীচুরি, গোষ্ঠবিহার, যোগীমিলন, সুবল মিলন। গঙ্গাচরণ সরকার—চুঁচুড়া ; যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ, সীতাবিলাপ, বিবিধ-সঙ্গীত ও কবিতা ; ঋতু বর্ণন, হিন্দু ধর্ম্ম, দুর্গোৎসব, পাঁচালী—বিরহ শত্রু নিন্দুক

বধ, শিবের বিবাহ, আগমনা; গীত—ব্রহ্মসঙ্গীত, কালীকৃষ্ণ, টপ্পা; বঙ্গসাহিত্য ও ভাষা, ধরমচাঁদ কি চানাচুর। গিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া; রত্নপ্রদীপ (১৩১৬), পুনর্ম্মিলন (১৩১৬), আত্মদেবতা, মাতৃভক্তি বিষয়ক প্রবন্ধ (১৩১৮), বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—মেটাফিজিক্যাল্ ট্রুথ্। গিরীশ চন্দ্র চূড়ামণি—কোন্নগর; পার্ব্বতী পরিণয় নাটক। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য—বড়া, শ্রীরামপুর; বেঙ্গল গেজেট (১৮১৬), অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর (ভারতচন্দ্র)। গুণময় গঙ্গোপাধ্যায়—শক্তিলীলা নাটক। গিরীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র বা গিরীন্দ্রকুমার মিত্র—আকনা, ম্যালেরিয়া ও বঙ্গদেশ, **Scheme to combat Malaria, Scheme of Pimary Compulsary Education.** গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়—হাওড়া; **Notes on Inorganic Chemistry.** জি, এ, কাউলে (কুমারী)—হাওড়া; **Dictionary of Bengalee Colloqual Words. (1901)** গঙ্গাদাস বসু—মহানাদ, কায়স্থ-কারিকা। গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—জিরাট, মাতৃশিক্ষা। গিরিশচন্দ্র ঘোষ—হরিপাল, ৭ম খানি নাটক রচয়িতা। গোপালচন্দ্র দে—দিনমনী (সাময়িক পত্র ১৮২৮)। গদাধর—নসরাই, হুগলী; রসেন্দ্র চিন্তামণি। গোপালচন্দ্র গুপ্ত—হুগলী, সরল পাঠ। গঙ্গাগোবিন্দ—মহানাদ, পঞ্জিকা। গোবিন্দ দাস—চন্দননগর, সতী-রঞ্জন। গোবিন্দচন্দ্র বসু—বঁইচি। **Laws Relating to Munsiffs.** গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—শ্রীরামপুর পঞ্জিকা। জি, মিত্র (রেভারেণ্ড)—হুগলী; পার্ব্বত্য উপদেশ। গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—দাদপুর, হুগলী, হোমারের ইলিয়ড্ (অনুবাদ)। গঙ্গাধর সিংহরায়—হরিপাল, সমাজশাসন। গুরুপ্রসাদ বল্লভ—চন্দননগর চণ্ডীযাত্রা। গোকুলদাস অধিকারী—হুগলী, কীর্ত্তন ও গীত। গণেশ চন্দ্র ঘোষ—হুগলী, মার্কণ্ডেয় পুরাণ। গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—চুঁচুড়া

ভারতের ইতিহাস। গিরীজাভূষণ মিত্র—ইলছোবা। Key to Jennings, Notes on Mahomedan Law, Notes on Hindu Law. গোপালচন্দ্র রায়—হাওড়া, শিবপুর কলেজ পত্রিকা। গঙ্গানারায়ণ মুখার্জ্জি—অরুণোদয় সাময়িক পত্র (১৮৩৯)। গুরুদাস রায়—বলাগড়; সাধনা, উদর চিন্তা, মহাত্মা গান্ধী, আভিজাত্যের অত্যাচার, বাঙ্গালীর বীরত্বের ইতিহাস, After the War, Non-co-operation in Egypt, The Russian Students, Needs of the Hour, The Non-violent Non-co-operation and the Students. অস্পৃশ্যের মর্ম্মবেদনা। গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—চন্দননগর; নির্ব্বাণ কানন (১৩০১), জ্ঞান ও জগতের সহিত মানবের সম্বন্ধ (১৩০৩)। গণেশ চূড়ামণি—সিংহপুর, তত্ত্বচিন্তামণি। জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী, চন্দননগর। আহ্নিকন (১৫১৬), উদ্দাসাঃ (১৩১৮) লক্ষ্মীরাণী (১৩১৯), লোকালোক (১৩১৯), মধ্যলীলা (১৩২৩), শিবাজী (১৩২৪), Agricultural Insurance (১৯২০) Solutions of differential Equations (১৯১০). গুরুদাস ভড়—চন্দননগর, Geometrical Construction for the Limiting Centre of a Cubic, Genralisations of Certain Theorems in the Hyperbolic Geometry of the Triangle (শেষোক্তখানি শ্যামদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত একত্র রচনা করেন)। গিরীন্দ্রনাথ দত্ত—চন্দননগর, কবিতা বল্লরী (১৩১০), The Brahmans and Kayasthas of Bengal (১৯০৬), অবসর মোদিনী, সংক্ষিপ্ত মাতৃজীবন, History of the Hatwa Raj. গৌরকিশোর কর—চন্দননগর, প্রাকৃতিক ভূ-বিবরণ (১২৮৮), কথাবলী ১ম খণ্ড (১৩০২), বলিদান (১৩০৫)। গৌরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়—চন্দননগর, সন্ধ্যাতারা। গোঁসাইদাস সরকার—মণ্ডলাই; সংক্ষিপ্ত রামায়ণ, সতী কি অসতী। গোবিন্দচন্দ্র

গোস্বামী—কায়স্থ সদ্গোপ সংহিতা। গোপালকৃষ্ণ ঘোষ—হুগলী, কুসুমমালা, ব্রহ্মচারী। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বলাগড়, দোটানা, মুক্তিস্নান, পরগাছা, হেরফের, বিয়ের ফুল, দুইতার, হাইফেন, স্রোতের ফুল, সর্ব্বনাশের নেশা, চোরকাঁটা, পঙ্কতিলক, যা নয় তাই, পঙ্কদলী, ধোঁকার টাটি, রূপের ফাঁদ, লঘুগুরু ১ম খণ্ড, আগুনের ফুলকী, সওগাত যমুনা পুলিনের ভিখারিনী, মন না মতি, চাঁদমালা, জোড় বিজোড়, নোঙর ছেঁড়া, নৌকা, মনিমঞ্জুষা, অদর্শনা, আলোকলতা, রাবেয়া, রবিনসন্ ক্রুসো, ভাড়ের জন্মকথা, পারস্য উপন্যাস, বিষ্ণুপুরাণ, পারণ, নষ্টচন্দ্র, রোমন্থন, শ্রীমতী—১ম খণ্ড। চন্দ্রনাথ বসু—কৈকালা; হিন্দুত্ব, ত্রিধারা, ভারত রত্নমালা, শকুন্তলা তত্ত্ব, ফুল ও ফল, বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রকৃতি, নরসিংহ পুরাণ, সংযম শিক্ষা, পৃথিবীর সুখ দুঃখ, হরিবংশ, যোগবিশিষ্ট রামায়ণ, সাবিত্রী তত্ত্ব, কঃ পন্থা, Review on Bbhigyan Sakuntala. Review on Bankim Babus Krishnakantas Will. Review on English and Bengalee Books in the Calcutta Review, On the Life and Character of Oliver Cromewell.

চ

চিন্তাহরণ বিশ্বাস—বাগনান, হুগলী, বিজলী (১৯০১)। চুনীলাল মুখার্জ্জি—উত্তর বাঁটরা, হাওড়া, ইংরাজী শিক্ষা (১৯০১)। চারুচন্দ্র রায়—চন্দননগর; কালনিদ্রা। চন্দ্রশেখর—কোন্নগর; জ্ঞানোদয় (সাময়িক পত্র ১৮৫১)। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—হুগলী, দেবগণের ভারত ভ্রমণ (১৯০৬)। চন্দ্রশেখর কর—চুঁচুড়া; পাপের পরিণাম (১৯০৭)। চণ্ডীচরণ ন্যায়রত্ন—বৈদ্যবাটী; গীতাবাদ রহস্যচণ্ডী। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় উদ্ভ্রান্ত প্রেম, স্ত্রীচরিত্র, কুন্তলতার মনের কথা। চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য—গুপ্তিপাড়া; বিদ্বোন্মাদ তরঙ্গিনী, বৃত্ত রত্নাবলী, মাধব চম্পূ।

চণ্ডিচরণ স্মৃতিরত্ন—কৈকালা ; শ্রাদ্ধ তত্ত্ব। চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী—চন্দননগর, ভাষা পাতাচান ১ম, ২য়, ৩য়, ভাগ, দেড়শত হাসির কথা, আর একটা, ফাউ, পাঁচ ফুলের সাজি।

জ

জে, মার্শম্যান্—শ্রীরামপুর ; দিগদর্শন (১৮১৮ সাময়িক পত্র) সমাচার দর্পণ (১৮১৮–৪০ সংবাদ পত্র) Rules and Constructions of Acts, Govt. Gazette, Agricultural Transactions, Daroga's Manual, History of Bengal, History of India, Brief Survey of History, Bengalee Dictionary, Guide to Civil Law Aesop's Fables, Transaction of Murry's Grammer, Ancedotes of Virtue and Valour, Life of Marshman and Ward. (ইহার মধ্যে কয়েকখানি বঙ্গভাষায় রচিত।)

জগন্নাথ মল্লিক—আন্দুল, হাওড়া ; রামনবমী ব্রত। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন—ত্রিবেনী, অষ্টাদশ বিবাদের বিচার, বিবাদ ভঙ্গার্ণব, রামচরিত বর্ণনা, হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা, ন্যায়শাস্ত্র বিষয়ক রচনা। জ্ঞানচন্দ্র মিত্র, জ্ঞানোদয়। জ্ঞানানন্দ দেব—হুগলী, নিত্যগীতা। জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়—চুঁচুড়া ; কুসুমাঞ্জলী, হাল ফ্যাসান, হস্তলিপি। জটাধারী শর্ম্মা—প্রবন্ধ রত্ন। জন্ মেণ্ডিস্—জনসন্স ডিকসনরি। জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া, গো, গঙ্গা ও গায়ত্রী (১৩১৯), ভীষ্ম মহাদর্শন (১৩১৫), মৃত্যুপথ (১৩২১), সবিতা, মহাশক্তি, আর্য্যদর্শন। জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক—শব্দ কল্পলতিকা (১৮৩২)। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার—পারসিক অভিধান (১৮৮৩)। জে, লং—শ্রীরামপুর, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনী। জ্ঞান চৌধুরী—নীতি। জে, সি, গিবন—হাওড়া **A Manual of Medical Jurisprudence for India** (1904). জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ—চুঁচুড়া ; **Life Work of Sri Aurobindo.** জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া, সিংহল

বিজয়। জীব গোস্বামী—হরিনামামৃত ব্যাকরণ, ভাগবৎ সন্দর্ভ, গোপাল বন্ধু। জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী—মালিপাড়া; বৈষ্ণব পত্রিকা।

ট

টয়েনবি—হুগলী A Sketch of the Administrations of the Hoogly District.

ঠ

ঠাকুরদাস সরকার হুগলী, পাঁচালী। ঠাকুরদাস দত্ত—ব্যাঁটরা, বিদ্যাসুন্দর, লক্ষ্মণ বর্জ্জন, হরিশ্চন্দ্র, শ্রীমন্তের মশান। ঠাকুরনারায়ণ মুখোপাধ্যায়—খানাকুল, স্মৃতি-সর্ব্বস্ব, সারাবলি, ধাতুরত্নাকর, শুদ্ধি কালিকা, বেদান্তবাদ, সবতন নির্ব্বাচন, স্মৃতি সর্ব্বস্ব।

ত

তিনকড়ি স্মৃতিরত্ন—শিবপুর, আশাতত্ব নিরূপণ (১৯০১)। তারকচন্দ্র চূড়ামনি—উত্তরপাড়া হুগলী। রত্নাবলী (১২১৩), সাহিত্য দর্পণ, সপত্নী নাটক ১ম ভাগ (১২৬৪)। তারাচাঁদ দত্ত—বাঁশবেড়িয়া, জ্ঞানাঞ্জন, মনোরঞ্জন ইতিহাস। তারকনাথ শর্ম্মা—উত্তরপাড়া, হুগলী, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, মুগ্ধবোধ সার, চন্দ্রোদয়। তারকনাথ সুর—চন্দননগর, Observation on 3 Cases of Actinno Mycosis in Man (Thesis for M. D. 1918). Observation on Cases of Influenza (1920), On Bronchc-Moniliasis (1921), On B. Coli Infection, Observation on Actinomy Colic Mycetoma (1929), Actionomy Cosis Hominis (1921). তিনকড়ি বিশ্বাস—হুগলী, প্রভাস খণ্ড, বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, বৃহৎ নারদ পুরাণ,

পদ্মপুরাণ, মনসা-মঙ্গল, বৃহৎ তর্জ্জার লড়াই, তর্জ্জার লড়াই, হাপ আখড়াই কবি পাঁচালী ও গান। তারক পাল—হুগলী, তর্জ্জা। তুলসীদাস কর—শিবপুর কলেজ পত্রিকা। তারকনাথ বিশ্বাস—বদনগঞ্জ, হুগলী; বিরজা, কমলা, মহামায়া, কুসুম কুমারী, তরুবালা, সরোজকানন, কুসুমিকা, সাগরযাত্রী, গিরীজা, বিজয় সিংহ, প্রেম পরিণাম, আদরিনী (সাময়িক পত্র) নৈশ-বিহার, সুহাসিনী, কমলকুমারী, রমণী, প্রবন্ধ লতিকা, নারীসঙ্গীত, চন্দ্রপ্রভা, অমলা, পরলোক, রাঙ্গা বৌ, চঞ্চলা, কাকাবাবু, সরোজবালা, মেহেরজান, বসন্তবালা, অভিষেক, ক্ষান্তমনী, সাহেবের কুটীর, আমি তোমারি, পরিণাম, নিতাই বাবু, আর্য্য ও অনার্য্য, রাণা প্রতাপ সিং, নিশিকান্তের গল্প, চোর, আইনবাজ, নাচ, জ্যোৎস্না, রাজি বাগ্দিনী, অভিষেক নীতি, প্রতিবিম্ব, বীণাপাণি, দেবতা ও দানব, স্বামী স্মৃতি, প্রায়শ্চিত্ত, ধর্ম্মের জয়, নবযুগ, গঙ্গাবাঈজীর গল্প, জাহ্নবী জাকব, হীরামতী, ডাক্তার বাবু, কাল বিড়াল, পরপারে, লিলি, রোজা মহারাণী ভিক্টোরিয়া চরিত, গুরুবালা, উপন্যাস লহরী, গোয়েন্দার গল্প, The Reference Book for Registering Officers, Notes on the Registration Act, The Registration Guide, The Registration Act with Notes. The Indian Stamp Act with Notes. The Index and Abstract of Circular Orders, রেজেষ্টারি কার্য্যবিধি, ভারতবর্ষীয় ষ্ট্যাম্প আইন, Emperor George and Emperess Mary, ইন্দুর বর, ভাই বোন, শেষ সম্রাট, পরলোক তত্ত্ব, অদ্ভুত নিরুদ্দেশ, স্বর্ণ-কুমারী, সুশীলাসুন্দরী, সাত জুতো, আনার কলি, মডেল ভ্রাতা, রস-সংগ্রহ, রত্নাবলী, বঙ্গীয় মহিলা, বঙ্গীয় রহস্য, The Registration Journal. তারাপদ চট্টোপাধ্যায়—ইলছোবা, হুগলী, তারা (সাময়িক পত্র) টাউন্‌সেণ্ড্‌ এস্—শ্রীরামপুর, নীতিকথা। তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—রামপুর, আমার অশ্রুকণা। তরঙ্গিনী দাসী—

বনফুলহার। ত্রিপুরাচরণ সরকার—বাঁশবেড়িয়া. গণিতাঙ্ক কোষ (১৩০৩)। তারকনাথ মুখোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া, Writings and Speeches of Rajah Pearymohan Mukherjee. তারিনীপ্রসাদ জ্যোতিষী—উত্তরপাড়া; সপ্তম এডোয়ার্ডের স্বর্গারোহণ, পঞ্চম জর্জ্জের সিংহাসনারোহণ। তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—চন্দননগর, ফরাসী আইন অনুবাদ (১৮৮৬), শিশু মহাভারত (১৯১৬), গুরু গোবিন্দ সিং (১৩২৫), পদ্য-ব্যাকরণ (১৩২৫), প্রজাবন্ধু (সাপ্তাহিক পত্র), শিশু চৈতন্য।

দ

দীননাথ বসু—কোন্নগর, Hints on Domestic Practice of Homoepathy. দাশুরথী রায়—হরিপাল, পাঁচালী। দীননাথ মুখার্জ্জি—হুগলী, জমিদারী বিজ্ঞান। দৈবকিনন্দন কবিবল্লভ—বৈদ্যপুর, শীতলা মঙ্গল। দুর্গাচরণ ন্যায়লঙ্কার—সিজা। প্রাচীন ও নব্য ন্যায়ের টীকা, কাদম্বরীর টীকা। দেবনাথ বরদালই—হুগলী, বৈদেহি বিচ্ছেদ। দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন—শ্রীমদ্ভাগতম, ভক্তি (সাময়িক) দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়—হুগলী, আমার ঘুম, বোকার কাণ্ড, চাণক্য; সেকেন্দরের কথা, ঋষি টলষ্টয়, টলষ্টয়ের গল্প, সিপাহী যুদ্ধ, রূপ সনাতন, শিবাজী মহারাজ, মহারাজ নন্দকুমার, এ যুগের দাসত্ব। দীননাথ ধর বি, এল্—চুঁচুড়া, ত্রিশূল (১৮৮৩), কংশ বিনাশ কাব্য (১৮৬১), প্রসুতি বিয়োগে তন্তসুত (১৮৬৫), বল্লালচরিত (১৯০২), উদ্ধারণ দত্ত (১৯০৩), দীনের দু কথা, উষা চরিত্র, কৌতুককণা, মাতৃ-বিয়োগ, কংশ বধ। দুর্গাচরণ বাচস্পতি—উত্তরপাড়া, রাম লীলোদয়ম। দেবেন্দ্র বিজয় বসু এম-এ, বি-এল্—দেবানন্দপুর, সমাজ ও তাহার আদর্শ (১৯০৮)। দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—খানাকুল, ইউরোপে তিনমাস,

দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্যকাহিনী, স্মৃতিরেখা, প্যারিচাঁদ মিত্র, সঙ্গীত লহরী। দুর্গাচরণ রায়—গুপ্তিপাড়া, দুখনিশি অবসান, দেবগণের মর্ত্তে আগমন। দ্বারকানাথ দাস—পদার্থ তত্ত্ব। দেকস্তা (Fortune Decosta)—চন্দননগর, Vocabulary of French English and Bengali words in every day use Part I (1900). দয়ালচন্দ্র সোম—চুঁচুড়া, Manual of Medicine for Midwives. দ্বিজ ভগীরথ—মহানাদ. পদ্মপুরাণ, তুলসী চরিত। দ্বিজ মাধবানন্দ—আমুলিয়া, দণ্ডীকাব্য। দেবকিনন্দন—মহানাদ; গোপালচরিত, কীর্ত্তনামৃত, গোপালগুচ্ছ। দেবেন্দ্রনাথ সেন—অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা, অশোক গুচ্ছ, অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা, অপূর্ব্ব নৈবেদ্য, অপূর্ব্ব শিশুমঙ্গল, দগ্ধকচু, হাসিমঙ্গল, গোলাপ গুচ্ছ, পারিজাত গুচ্ছ, সেফালী গুচ্ছ। দিক্রুজ্ ডি—শ্রীরামপুর, একখানি ইতিহাসের বাঙ্গালা তর্জ্জমা (১৮২৪)। দ্বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বলাগড়, সংসারচিত্র। দীননাথ মুখোপাধ্যায়—চুঁচুড়া; চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ (সাপ্তাহিক)।

ধ

ধর্ম্মদাস বসু—চন্দননগর; স্বাস্থ্যরক্ষা ও সাধারণ স্বাস্থ্যতত্ত্ব, পারিবারিক প্রার্থনা (১৩১০), ধর্ম্মজীবন। ধর্ম্মদাস সুর—চন্দননগর, তিনখানি চিকিৎসা গ্রন্থ। ধীরাজ—তেলেনীপাড়া, কৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত রচয়িতা।

ন

নরেন্দ্রনাথ লাহা—চুঁচুড়া, সুবর্ণ বণিক কথা ও কীর্ত্তি (১ম হইতে ৪র্থ খণ্ড)। নন্দলাল সিংহ—বাকসা, অতি আধুনিক (মাসিক)। নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব—বিশ্বকোষ (বঙ্গ ও হিন্দী-ভাষায়), কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয়, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—১ম হইতে ১২শ খণ্ড, Social History of

Kamrup, কায়স্থ পত্রিকা(মাসিক)নাম আছে মায়ার অধিকার, জেল ফেরৎ, ব্রহ্মশাপ, ঠাকুরের মূল্য, বৈরাগী, আকালের মা, উত্তরাধিকারী, ত্যাজ্য পুত্র, নববোধন, কথাকুঞ্জ, দুর্ব্বাসা ঠাকুর, কণ্ঠীবদল, গুরুমশাই, মানকের মা, একঘরে, স্নেহের জয়, কাল বৌ, বারবেলা, রাঁধুনী বামুন, মনের বোঝা, পূজা, মেয়ের বাপ, বন্ধন মোচন, য়াঙ্গ রাগড়ের মূল্য, প্রায়শ্চিত্ত, সঙ্গীহারা, বিধবা, প্রতিদান, পরের ছেলে, গঙ্গারাম, পতিতা, গ্রহের ফের, নিরাশ প্রণয়, সতীন-পো, পূজার আমোদ। নিশাপতি চট্টোপাধ্যায়—গরলগাছা; নবজীবন, দুলালী, পতিতার প্রায়শ্চিত্ত, তথাকার ঘটনাবলী। নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—কৃষ্ণনগর; কর্ম্মভোগ, কলা-বৌ, ডিক্রীধারী, ত্যাজ্যপুত্র, নাস্তিক, নিষ্পত্তি, গাঁটছড়া, কালোমেয়ে, যুগল মিলন, স্বামীর পরাজয়, বিন্দুর বিয়ে, বন্ধুর বিয়ে, ভবঘুরে, মনির বর, ভিটা, সোনার পদক, লক্ষ্মীহারা, প্রেমিকা, পরাধীনা, মানরক্ষা, রূপহীনা, লক্ষ্মীর কৌটা, শেষ রক্ষা, সুরমার বিয়ে বাড়ী, সুদের সুদ, কুল পুরোহিত, মতিভ্রম, বিলাত ফেরত, হিসাব নিকাশ, নিষ্কর্ম্মা, স্বামীর ঘর, গরীবের মেয়ে, অনুরাগ, অপবাদ, অভিমান, অপরাধী, সতী সাবিত্রী, সুখের মিলন, সংস্কারক, ঘরজামাই, দাদামহাশয়। নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কৃষ্ণনগর, ব্যাকরণ, ধাতু-রত্নাবলী, শুদ্ধি কবিতা, স্মৃতি-সর্ব্বস্ব। নন্দলাল দে—চুঁচুড়া। Geographical Dictionary of Ancient and Medivial of India (1900), Civilisation in Ancient India and Several Articles, রসাতল। নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী—হুগলী, পালড়া (ভদ্রেশ্বরের নিকট) দানব নির্ব্বাণ, চামেলী, প্রেম গাথা, ব্রজগাথা (১৯০৩), নারীধর্ম্ম, গৃহস্থধর্ম্ম, অমিয় গাথা, বিভো মঙ্গল, কুসুম গাথা, ধবলেশ্বর, মর্ম্মগাথা, বসন্ত গাথা, শিশু মঙ্গল, উষা পরিণয়, নিত্য মঙ্গল। নিমাইচাঁদ শীল—চুঁচুড়া; যামিনী যাপন বা কামিনী কাঞ্চন, ধ্রুব চরিত্র, এরাই আবার বড়লোক, চন্দ্রাবতী নাটক, তীর্থ মহিমা, সুবর্ণ-বণিক ও

নিরূপমা দেবী—চুঁচুড়া; দিদি, শ্যামলী, অষ্টক, আলেয়া, অন্নপূর্ণার মন্দির, অদৃষ্ট লিপি, উচ্ছৃঙ্খল, ধূপ, বন্ধু। নিমাইচাঁদ শীল—চুঁচুড়া, ত্রিপান্থ, আশ্রমে, মেঘদূত, ইলাবতী, শিখণ্ডী বাহন, শোকগুলী, লহরী (৪ খণ্ড) জীবন সঙ্গীত, শ্রীগৌরাঙ্গ। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—চুঁচুড়া, রজনীকান্ত, রামেন্দ্রসুন্দর, শরতের ফুল। নৃসিংহরাম মুখোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া; আর্য্যনারীর গৃহধর্ম্ম (১৩১৮), জ্ঞানমুকুল (১৯০০), সংস্কৃত ব্যাকরণসার, সোপান, সাহিত্য প্রসূন (১৯০১), সাহিত্য দর্পণ (১৯০৭)। নৃত্যগোপাল মুখার্জ্জি—শিবপুর, Handbook of Indian Agriculture (1901), নীহাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া; স্কুল-পাঠ্য কয়েকখানি ইংরাজী পুস্তক। নূরন্নেচ্ছা খাতুন—স্বপ্নদৃষ্টা, জানকী বাঈ। নারায়ণচন্দ্র চট্টোরাজ (শর্ম্মা)—মনুসংহিতার অনুবাদ, পুত্রীকরণ মীমাংসা, কৃষ্ণলীলা, রসোদয় (১৮৫৫), কলি কুতূহল, মনুসংহিতা। নিত্যানন্দ শীল—আর কেহ যেন না করে (১৮৭৪)। নিত্যকৃষ্ণ বসু—কোন্নগর, সাহিত্য সেবকের ডায়েরী। নারায়ণচন্দ্র গুপ্ত মজুমদার—নিত্য সুখানুরঞ্জিনী (১৮৯৪)। নীলকান্ত গোস্বামী—বৈঁচি; কল্কিপুরাণ শূলের অনুবাদ, আমি তোমারি ১ম খণ্ড, পঞ্চরত্ন, শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত, আমার গৌর, কৈবল্যশতম, পতিব্রতা, গৌর শতকম (১৩২৫); পিতৃস্তোত্র, সত্যমেব জয়তি, শ্রীশ্রীগীতা, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা, শ্রীশ্রীবংশী বিকাশ। নরসিং দাস বসু—কোন্নগর। Evidence Act, Civil Court Hand Book, Criminal Court Hand Book, Succession Act, Imperial Acts. নিতাইদাস (নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী)—চন্দননগর, কবি গান। নীলকণ্ঠ শর্ম্মা—শ্লোক সংগ্রহ, হনুমান নাটক, মনুসংহিতা, তত্ত্ব দর্শন, শঙ্করের ক্ষুদ্র গ্রন্থাবলী। নারায়ণচন্দ্র দাস—চাতরা; নীতি পদ্যাবলী (১৯০০)। নগেন্দ্রনাথ সোম—সরিষা। মধুস্মৃতি, চতুর্দ্দশপদী কবিতা। নরোত্তম দাস—শ্রামকৃষ্ণপুর। গীত গোবিন্দ, প্রার্থনা, পাষণ্ড

দপন, বৈষ্ণব বন্দনা, প্রেম ভক্তি, কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নাম। নীলমনী বরাট—ত্রিবেণী ; তীর্থ কৈবল্য। নীলমণি পাল—রত্নাবলী। নগেন্দ্রবালা সরস্বতী—সুখড়িয়া ; মর্ম্মগাথা, প্রেমগাথা নারী ধর্ম্ম, অমিয় গাথা, ব্রজ গাথা, বসন্ত গাথা, কুসুম গাথা। নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়—বৈঁচি ; শ্যামা সঙ্গীত। নৃশিংহ দেব রায় মহাশয়—বংশবাটী ; শ্যামা সঙ্গীত, ইয়াদ দস্ত, কাশী খণ্ড, মহাভারতের আংশিক অনুবাদ। নগেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ, বি এল—বাঁশবেড়িয়া, Comparative Administrative Law, Culture in the Mahabharat and the Ramayan, Law and Morals, Introduction to the Civil Procedure Code. এন, চ্যাটার্জ্জি বি, এ—হাওড়া ; An Introduction to Science (1907). নফরচন্দ্র দত্ত—শালিখা ও পূর্ণচন্দ্র মুখার্জ্জী, সর্ব্বজন সুহৃদ। নিতাইচাঁদ মুখার্জ্জী—চুঁচুড়া ; বালগঙ্গাধর তিলক (১৯০৮), গায়ত্রী (১৩৩৬)। নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়—বাঁশবেড়িয়া ; রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত্র, ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা। নীহাররঞ্জন দাস—চাতরা, শ্রীরামপুর ; অরুণার বিয়ে। নির্ম্মল দেব—ছিন্নতার। নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ডুমুরদহ ; প্রাকৃত তত্ত্ব বিবেক, জ্ঞানাঙ্কুর (২ ভাগ)। নন্দকুমার রায়—হুগলী ; ব্যাকরণ দর্পণ, অভিজ্ঞান শকুন্তলার বঙ্গানুবাদ। নীরদা মিত্র—হুগলী ; অমিয় সঙ্গীত (১৩১৯), সঙ্গীত কুসুম (১২১৭)। নীলরত্ন হালদার—চুঁচুড়া ; বঙ্গদর্শন, শ্রুতিগান রত্ন, পার্ব্বতী গীতারত্ন, গীতা, গীত রত্ন। নরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী—সাতনদী। নিবারণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ—তারকেশ্বর ; তারকেশ্বরে হত্যাদান বিধি। নন্দলাল বসু—চন্দননগর। clef de La Mithode de Lecture (1874). বাঙ্গালা ভাষায় ফারসী বর্ণ পরিচয়, ফরাসী ব্যাকরণ। নীলমণি দত্ত—চন্দননগর ; যুগল নায়িকা। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—খলিসানী, চন্দননগর ; গৃহহারা (১৩১২), মনীষা (১৩১৬), বুদ্ধ (১৩১৭), কাকলি (১৩৩১)। নারায়ণচন্দ্র দে—চন্দন-

নগর। The Red Reader (1913) ননীলাল দে—চন্দননগর, কোরক। নগেন্দ্রনাথ চন্দ্র—চন্দননগর। Chandidasa les amours de Radha et du Krishna (1917) নকুলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—আকনা; ব্যাকরণ, পদ্যমালা, ইতিহাস। নলীনাক্ষ সিংহ—আকনা; কামিনী ও কাঞ্চন। নারায়ণচন্দ্র চৌধুরী—উত্তরপাড়া, ব্রতকথা। নিত্যসখা মুখোপাধ্যায়—উৎপল।

প

পি, কে, লাহিড়ী—সাঁতরাগাছি, হাওড়া। Notes on Black's Life of Goldsmith (1900), Notes on Pattison's Life of Milton. পি, সি, সেন—শ্রীরামপুর; Ejectment Suits, Hindu Law, A Summary of Holland's Jurisprudence 1900, Law of Benami 1900, Legal Companion 1900, The Art of Public Speaking 1901, Speeches 1901, History of the Law and Constitution of Br. India 1903. প্রসন্নকুমার সেন—কোন্নগর, বর্ণমালা। প্রিয়নাথ মল্লিক—রামকৃষ্ণপুর, গরিবের গান ১৯০০। প্রতাপচন্দ্র চোল—শ্রীপুর, হুগলী। Cholena (1901). পরমেশ্বর শিরোমনি—হুগলী, সংস্কৃত শিক্ষা সোপান (১৯০১)। প্রিয়নাথ কারার—শ্রীরামপুর, যুগকাল বিচার (১৯০২)। পি, ঘোষ—চন্দননগর, Euclid's Elements of Geometry (1902). পাটিগণিত ও শুভঙ্করী (১৯০২)। প্রমথনাথ দত্ত—উলুবেড়িয়া, পতিতোদ্ধার (১৯০৩)। পিতাম্বর মুখার্জ্জী—উত্তরপাড়া, শব্দসিন্ধু (১৮০৯)। প্রসন্নকুমার মুখার্জ্জি—Practice of Medicine. পরমানন্দ গোস্বামী—বসন্তপুর, জ্ঞানাঙ্কুর। পিয়ার্সন—হুগলী, কাব্যাবলী। প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়—বালি-উত্তরপাড়া, অন্ধ বিলাপ, পঞ্চম বেদ, দেবযানী, শকুন্তলা, তোমারি, সোনার স্বপন, সংসার চক্র, মহাভারত, নাট্যকাব্য।

পঞ্চানন নিয়োগী—Iron in Ancient Bengal, Practical Inorganic Chemistry, আয়ুর্ব্বেদ ও নব্যরসায়ণ, বৈজ্ঞানিক জীবনী, তুফান। প্যারিচাঁদ মিত্র—পানিশেওলা, হুগলী, Life of David Hare, Life of Ramkamal Sen, On Religion. আলালের ঘরের দুলাল, যৎকিঞ্চিৎ, আমাত্বিকা, অভেদি, গীতাঙ্কুর, এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা, বামাতোষিনী, কৃষিবোধ, মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়, রামা রঞ্জিকা, রস্তমজী কাওয়াসজীর জীবনী, "মাসিক পত্রিকা'। প্যারিমোহন কবিরত্ন—হোয়েরা, গীতাবলী। প্রভাসচন্দ্র মিত্র—কোন্নগর, লেখা। পুলীনবিহারী কর—চুঁচুড়া, তাম্বুলি সমাজ। পূর্ণচন্দ্র কর্ম্মকার—শ্রীনগর, হুগলী, ভজনমালা। পার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য—শালিখা, প্রণয়পত্র। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—বেলুড়, পরমহংস রামকৃষ্ণ। পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—শালিখা, Hints on Zamindary, সর্ব্বজন সুহৃদ। প্রমথনাথ দাস—হাওড়া, বিষ চিকিৎসা। প্যারিচরণ সরকার—ফুল্লরা। প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী—কৃষ্ণনগর, পাটীগণিত, বীজগণিত (১২৭০)। প্রবোধচন্দ্র পাত্র—কর্ত্তব্য। প্রসাদচন্দ্র ঘোষ—ভারতের শেষবীর। পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া, Off to the Western Himalaya to the Golden Times and Back. পূর্ণচন্দ্র দে—ভদ্রকালী, প্রবন্ধ পাঠ (১২৯৭), উদ্ভট কবিতা, উদ্ভট শ্লোকমালা। প্যারীমোহন সোম—উত্তরপাড়া, স্কুল পাঠ্য পুস্তক। প্রসাদদাস গোস্বামী—শ্রীরামপুর, বৃত্তি পরিচয়, আমাদের সমাজ, অভিমন্যু বধ, গীতা, গীতার তান্ত্রিক ব্যাখ্যা, গীতায় বৈষ্ণব তোষিনী, সাঙ্খ্যযোগ, গৌড়রাজ ভাষ্য, আত্মবোধ, দীর্ঘজীবন কিসে হয়, পাতঞ্জল যোগসূত্র। প্রসাদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—মাধবাচার্য্য, তুলসী প্রতিভা, কাব্য-প্রসূন। প্রাণকৃষ্ণ বসু—ইংরাজ গুণ বর্ণনা (১৮৭১)। প্রফুল্লচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সাদালসা। প্রাণনাথ ঘোষ—বাঁশবেড়িয়া ভাত ও তাঁত, শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত। প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—গুপ্তিপাড়া ; গ্রীক ও হিন্দু। প্রকাশচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীরামপুর, বর্ণচোরা, অশ্বশৃঙ্গ, নিয়তির খেলা, মরণের পথে, নিবৃত্তি, মোহমুক্তি। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—কোন্নগর, History of Hindu Music (1880). প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—বাঁশবেড়িয়া, Four Round the World, স্ত্রী চরিত্র গাঁথা, Faith and Progress of the Brahmy Samaj, Life and Teachings of Keshab Chandra Sen, Heart Beats, Spirits of God, English Translation of the Mahabharat, আশীষ। প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী—হুগলী, আমিষ ও নিরামিষ আহার (১৯০৭)। প্যারীমোহন সেনগুপ্ত—বৈঁচবাটী, অরুণিমা, হালুমবুড়ো, বেদবানী, জেলে, মহাত্মা গান্ধী, কাফ্রিদের দেশে আফ্রিকায়, মেঘদূত অনুবাদ। পঞ্চানন সিংহ—জুলিয়াস্ সিজার। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—গুপ্তিপাড়া; ষোড়শী, রত্নদীপ, সিন্দুর কৌটা, জীবনের মূল্য, নবীন সন্ন্যাসী, অদল বদল, গল্পাঞ্জলী, গহনার বাক্স, পত্রপুষ্প, দেশী ও বিলাতি, সতীর পতি, রমাসুন্দরী, মনের মানুষ, নবদুর্গা, আরতি, সত্যবালা, গরীব স্বামী, হতাশ প্রেমিক, বিলাসিনী, গল্পবীথি, নব-কথা, যুবকের প্রেম, নূতন বৌ। পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—হরিপাল, বাঙ্গলার পুরাবৃত্ত। প্রেমানন্দ ভারতী—গরলগাছা; Sri Krishna, Days News (daily). প্যারীচরণ সরকার—আঁটপুর, First Book of Reading, Second Book of Reading, হিতসাধক ও এডুকেশন গেজেট (সপ্তাহিক)। প্রসাদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—জনাই; প্রমোদ-মিলন (নাটক) প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী—চন্দননগর, On the Necessity of Learning French by the Educated Natives of India (1884). প্রমথ নাথ মিত্র—চন্দননগর, মহম্মদ মহসীনের জীবন চরিত (১৮৮০), ভারতবর্ষীয় ভক্তকবি। পঞ্চানন শর্মা—চন্দননগর; বশীকরণ বিদ্যা শিক্ষা, Indian Charms (১৯২৮) Details of Indian Charms (১৯৩৬), বশীকরণ বিদ্যার বিবরণ, The Vedic Institution. বশীকরণ। প্রাণকৃষ্ণ সরকার—চন্দননগর; সীতা

কি অসতী, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—মহানাদ; গোজীবন সাঁওতাল ভাষা, মহানাদ ১ম ও ২য় খণ্ড। প্রসন্নকুমার গোস্বামী—খানাকুল; রামদাসের অভিরাম লীলামৃত। প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বালী; বালীর ইতিহাসের ভূমিকা (১৩৪৩)।

ফ

ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ—চুঁচুড়া; কবিতা, ভারত ভিক্ষা, শক্তিকণা, রসাঙ্কুর ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—পাণিত্রাস, হাওড়া; Magistrates Court Manual.

ব

বিজয়রত্ন মজুমদার—জিরাট; স্ত্রীর চিঠি, মহাতীর্থ, ১৯৫০, আবহাওয়া, সন্ন্যাসী, পল্লী চলো, আমাদের বাঙ্গলা, ফলন্ত, আজাদ হিন্দ ফৌজের অঙ্কুর। বিজয় রক্ষিত—গুপ্তিপাড়া; নিদান টীকাকার। ব্রজমোহন মল্লিক—হুগলী; ইউক্লীডের জ্যামিতি (১৯০১), জ্যামিতির অনুশীলনী সমাধান ১৯০২, রঞ্জিত সিংহের জীবনী, ত্রিকোণমিতি (১৮৩২)। ব্রজনাথ সাহা—চুঁচুড়া; সচিত্র সরল বর্ণজ্ঞান। রেভারেণ্ড ব্রজগোপাল নিয়োগী—উলুবেড়িয়া; ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিও না (১৯০২)। বিশ্বনাথ তর্কালঙ্কার—হরিনাভি; কৃষ্ণকালী। ব্রজনাথ দাস—হুগলী; সন্ধি সংগ্রহ। বালকনাথ দত্ত—অর্থ ব্যবহারের প্রশ্নোত্তর। বামন জয়াদিত্য—মহানাদ; কাশিকা বৃত্তি। বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়—চুঁচুড়া; School boy. বিহারীলাল সরকার—আন্দুল; শকুন্তলা রহস্য তত্ত্ব, ইংরাজের জয়, বিদ্যাসাগরের জীবন চরিত, তিতুমির, সঙ্গীতাবলী, সংকীর্ত্তন। বদন অধিকারী—শালকিয়া; যাত্রাভিনয়ের কয়েকখানি নাটক। বসন্ত রায়—ভুরসুট; ধর্ম্ম সঙ্গীত, বসন্ত সুকুমার কাব্য। বামদেব দত্ত—বৈঁচি; বঙ্গনিবাসী (সংবাদ পত্র) দৈনিক

(সংবাদ পত্র)। বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়—বাঁশবেড়িয়া; পূর্ণিমা (মাসিক পত্র)। বামাচরণ বসু—চুঁচুড়া; সুরোজী সন্ন্যাসী। বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়—শিবপুর; বিরাম সঙ্গীত (১৯০৮)। বিপিনকৃষ্ণ দত্ত-চৌধুরী—আন্দুল; পথিক (সাময়িক পত্র)। ব্রহ্মমোহন রায়—জিরাট বলাগড়; অভিমন্যু বধ, রামাভিষেক, কংসবধ, তারকাসুর বধ, দানব বিজয়, যাত্রা সঙ্গীত, শিব বিবাহ, আগমনী, লক্ষ্মণবর্জ্জন, সাবিত্রী-সত্যবান, লক্ষণের শক্তিশেল, শতস্কন্ধ রাবণ বধ। বাণীনাথ নন্দী—শ্রীরামপুর; পঞ্চাশ স্তোত্র, কালপরিণয়, গুরুগোবিন্দ সিংহ, দারোগার দপ্তর, ব্রহ্মবিদ্যা—অলৌকিক রহস্য। স্বামী বিবেকানন্দ—বেলুড় মঠ, হাওড়া; Addresses at the Chicago Parliament of Religions, Karma Jog, Religion of Love, My Master. পাহাড়ী বাবা। বিশ্বেশ্বর সিংহ—মান্দারণ; সত্যনারায়ণের পুঁথি। বণিকচন্দ্র দত্ত—চুঁচুড়া; History of India. বিষ্ণুপদ চীনা—ভাঙ্গামোড়া; কলেরার চিকিৎসা। বঙ্কুবিহারী বিশ্বাস—অপূর্ব্ব স্বপ্ন; বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া; স্বর্ণ স্তম্ভ। বিনোদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া (হুগলী), গীতানুবাদ (১৮৮৮)। বিজয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কনক। বরেন্দ্রবালা সিংহ—অশ্রুকণা। বিপিনমোহন সেন-গুপ্ত—সোমড়া; চাঁদরাণী, হিন্দু মহিলা নাটক। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—হিন্দুনারী। ব্রহ্মর্ষি ভাই ব্রহ্মানন্দ—তেলিনীপাড়া; রামায়ণে ঠুকোঠুকি (১৯২৩) রাম অবজরে অপকীর্ত্তি (১৯১৯) The Bhagwat Gita, Part I 1926, গীতার গলদ, বুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধি (১৯২৭)। বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য—আঁটপুর; হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস, বঙ্গবীর রঞ্জিত রায়, বঙ্গবীরাঙ্গনা বা রায় বাঘিনী। বলরাম মল্লিক—হুগলী; শ্রীকৃষ্ণ Sri Chaitanya and His followers of Nityananda. বৈকুণ্ঠনাথ সর্ব্বাধিকারী—খানাকুল; ঊষাহরণ। বসন্তকুমার বসু—শ্রীরামপুর;

নির্ম্মাল্য (মাসিক পত্র), শান্তিময়ীর গল্প, বুদ্ধির বজরা, নেপাল রাজ্য, শ্রীরামপুর মহকুমার ইতিহাস, কায়স্থ পরিচয়, মুন্সিপাল লীলা। বেচারাম রায়—শ্রীরামপুর; মনুষ্যের পতন। বিরজাচরণ গুপ্ত (বিরাজ-মোহন গুপ্ত)—ভাঙ্গামোড়া; বনৌষধি দর্পণ, ভৈষজ্যতত্ত্ব। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর—রামকৃষ্ণপুর; শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ। বার্ণ এণ্ড কোং—হাওড়া; Burns Monthly Magazine (1908)। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বেগম সমরু, কেল্লাফতে, জাহানারা, রাজাবাদশা, রণডঙ্কা, মোগল যুগে স্ত্রী শিক্ষা, মোগল বিদূষী, বাঙ্গালার বেগম, সংবাদপত্রে সেকালের কথা ৩য় খণ্ড, দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ১ম খণ্ড, বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ। বিশ্বম্ভর দাস—(বাবা দামোদর) কৃষ্ণনগর; জগন্নাথ মঙ্গল।* বিশ্বম্ভর পাইন—কৃষ্ণনগর (সেনহাট); সঙ্গীত মাধব, জগন্নাথ মঙ্গল, কন্দর্প কৌমুদী, প্রেম সম্পুট, ভক্তরত্নমালা, বৃন্দাবন প্রাপ্ত্যুপায়, কৃষ্ণলীলার্ণব। বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা, শিবের বুকে শ্যামা নাচে, মা আমার কাল কেন? বিজয়বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—সেওড়াফুলি; সমাধি। বঙ্কিমবিহারী মল্লিক—বলাগড়; সেটেলমেণ্ট কার্য্যবিধি। বিপিনচন্দ্র দে—চুঁচুড়া; নৈশ্যবাসিনী কাব্য। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—গুপ্তিপাড়া; মন্দিরা, সপ্তস্বরা, খঞ্জনী, মীরাবাঈ, পত্রচিত্র, পঞ্চপাত্র, শাপমুক্তি, রবীন্দ্রনাথের ছন্দ, সুন্দরী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন স্মৃতি। বাণেশ্বর তর্কালঙ্কার (বিদ্যালঙ্কার)—গুপ্তিপাড়া; চিত্র চম্পূ, জগন্নাথ মঙ্গল। বিপিনবিহারী ঘোষাল—হরিপাল; মুক্তি ও তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশ, হিন্দু শাস্ত্র জ্ঞান কাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড, সঙ্গীত, প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম কি? ব্রহ্ম শতকম, প্রকৃত বিবেক, কর্ম্মকাণ্ড

* বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রণীত এবং বিশ্বম্ভর পাইন প্রণীত এই নামে একখানি পুস্তক আছে বলিয়া শুনিয়াছি।

সমূহের চরম উদ্দেশ্য কি ও তাহা কিরূপে সাধিত হয়, সাকার ও নিরাকার সম্বন্ধে শাক্ত ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের চূড়ান্ত মীমাংসা, উপাস্য ও উপাসনা, হিন্দুর জাতিভেদ, বিবাদাতীত হিন্দুধর্ম্ম, স্বদেশবাসী শিক্ষিত জনগণের প্রতি নিবেদন, ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মোপাসক প্রকৃত হিন্দুর পক্ষে বিদ্বেষের বস্তু হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মের নিম্ন ও উচ্চ ভূমি, ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মকে জানায় কি লাভ ও না জানায় কি ক্ষতি। ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি—চন্দননগর; স্বাস্থ্যতত্ত্ব ১ম ভাগ ২য় ভাগ Shillong and its Environs স্বাস্থ্য (মাসিকপত্র)। বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী—চন্দননগর; হিন্দী সাহিত্য সংগ্রহ, (১৮৮৬), স্বাস্থ্য সাধন, গণিত বিষয়ক পাঠ্য পুস্তক, কোলদিগের ইতিহাস, ইংরাজিতে ভাগবদগীতার ভক্তকবি। বি, সি, মুখার্জ্জী—চন্দননগর। Theses Presentees a la Faculte Des Sciences de L'universite de Strasbourg. (1925). বসন্তলাল মিত্র—চন্দননগর; সঙ্গীত রত্নাকর (১৮৭৯), সঙ্গীত পরিজাত (১৮৭৯) গন্ধর্ব্ব সংহিতা ১-ম ভাগ, বিবাহ বা উদ্বাহতত্ত্বের গূঢ় রহস্য (১৩১৬)। বসন্তরঞ্জন রায়—চন্দননগর; শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ২-য় সংস্করণ (১৩৪২)। বিশ্বেশ্বর ভাগবতাচার্য্য—চন্দননগর; শ্রীশ্রীকৃষ্ণ গীতা ১ম খণ্ড (১৩০৩)। বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—চন্দননগর; গুরুগোবিন্দ সিংহ, ঘর ও বার, ব্যক্তি ও সমাজ (১৩২৯), স্বরাজ সাধনা বা রাষ্ট্র পরিচয় (১৩২৮), সরলা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভক্তিকণা, সতী সাধনা, ভারতের মেয়ে, সরল হিন্দী শিক্ষা। বামাচরণ বসু—চন্দননগর; আরণ্য-প্রসূন (১২৭৮), সুরোযে সন্ন্যাসী বা অষ্টাহ (১৩১১), বিজলী বা নারী ভাগ্য (১৯০৪), জয়চাঁদের চিঠি ১ম ও ২য় স্তবক (১৩১২)। ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—চন্দননগর; বিধির বিধান (১৩২৫), নিয়তির চক্র। বিষ্ণুরাম তর্কসিদ্ধান্ত—চুঁচুড়া; বিষ্ণুসার ব্যাকরণ। ব্রজবল্লভ রায়—চুঁচুড়া; পিতৃতর্পণ (১২৯৬), সন্তপ্ত সহোদর (১৩০৪),

কল্পতরু (১৩০৭) উষামঙ্গল (১৩০৯), চূয়া ও চন্দন (১৩০৯), প্রেম ও পত্নী (১৩১৮), আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস (১৩২০), রাজর্ষি সংসার চন্দ্র সেন (১৩২২)। বিজয় বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—চন্দননগর; সমাধি। বিশ্বনাথ জঙ্গীপাড়া, খানাকুল; শ্রীরাধিকার মান, কলঙ্ক ভঞ্জন, মান, মাথুর, প্রভাস। ব্রাউন্ (P. Brown)—শ্রীরামপুর; William Carey. বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়—আকনা; Popular tales. ব্রজপতি বন্দ্যোপাধ্যায় —ইলছোবা; সহজ পরিমিতি, মানযাঙ্ক। বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব··রবি সিদ্ধান্ত মঞ্জরী, বিদগ্ধ তোষিনী। ভারতচন্দ্র রায় (রায় গুণাকর)—দোগাছিয়া (পেঁড়োগ্রাম) অন্নদা মঙ্গল, (১৮৩৮), চোর পঞ্চাশৎ, বিদ্যা-সুন্দর ১৮৫৭, সংস্কৃত পার্শী হিন্দি কবিতাবলী রসমঞ্জরী কালীকা মঙ্গল, কালীপুরাণ, মানসিংহ, সত্যপীর, নাযাষ্টক, ঋতু বর্ণনা, কবিতাবলী, কৌতুক বিলাস, গঙ্গাষ্টকম, চণ্ডী ফর্দ্দরফৎ, বলিরাজা, রাধাকৃষ্ণের প্রেমালাপ, কবিতাবলী ও টন্ন, হিন্দু কবিতাবলী। ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় —চুঁচুড়া; ঐতিহাসিক উপন্যাস, অঙ্গুরীয় বিনিময়, পুষ্পাঞ্জলী, ক্ষেত্রতত্ত্ব, (১২৬৫) পারিবারিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ স্বপ্নলব্ধ ভারতের ইতিহাস, গ্রীসের ইতিহাস, বাঙ্গালীর ইতিহাস, ইংলণ্ডের ইতিহাস, বিবিধ প্রবন্ধ, রোমের ইতিহাস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, (১৮৫৯) শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব, সামাজিক প্রবন্ধ, শিক্ষাদর্পণ (১৮৬৪,) এডুকেশন গেজেট, বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ, পুরাবৃত্তসার। ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—উত্তর-পাড়া; বংশাবলী গ্রন্থ (১২৬৩)। ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া; বিদ্যাসুন্দর, সংশোধন সভ্য, ধর্ম্ম বিশ্লেষণ। ভূপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—সোমড়া শুখড়ে; বিনকাশিম, গুরুকন্যা, কোরক, বৃন্ত, বিধির খেলা, প্রসূন। ভূপতি চরণ স্মৃতিতীর্থ—গুপ্তিপাড়া; রত্নাকর, রাজ্যশ্রী নাটক। ভৈরব কাব্যতীর্থ—হরিপাল; সংস্কৃত কম্পোজিসন। ভোলানাথ দত্ত—মথুরাবাটী, খানাকুল; ডাকের কথা ১ম খণ্ড।

ভুবনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কোন্নগর; পাটীগণিতাঙ্কুর। ভৈরবচন্দ্র দত্ত—শালকিয়া। Introduction, to the Mohamadan law of inheritance Municipal act With Notes. ভোলানাথ বড়াল—দুর্গাষ্টক। ভবানী চট্টোপাধ্যায়—জ্ঞানদীপিকা। ভুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—শুখড়ে (সোমড়া) বিলাতি চিত্র। ভগরথচন্দ্র বিশারদ—হুগলী। সারসংগ্রহ, বঙ্গভাষা সাধুভাষা ব্যাকরণ। ভৈরবনাথ কাব্যতীর্থ—সিঙ্গুর; রত্নাকর, পুণ্যব্যাথা, বিক্রমাদিত্য কাহিনী, সংস্কৃত কুসুম মালা, সাহিত্য রত্নমালা, সরল সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অনুবাদ শিক্ষা, Matriculation Sanskrit Composition and Translation. ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী—চন্দননগর; জাতিতত্ত্ব নিরূপণ (১৩১৪), প্রেমদর্পণ, সমাজ রহস্য, বিশ্বভানু, পূর্ণেন্দু বিকাশ, বসন্ত চিকিৎসা। ভূতনাথ সুর—চন্দননগর; সতীসিন্ধু নাটক। ভোলানাথ দাস—চন্দননগর; দুর্গাচরণ রক্ষিত (১২৪২)। ভবানন্দ—ছিনা আকনা; হরিবংশ। ভানু দত্ত—মহানাদ; রসমঞ্জরী। ভরত মল্লিক—গুপ্তিপাড়া; অমর কোষাভিধানের টীকাকার।

ম

মহম্মদ ইসমাইল সিদ্দিক—গোবিন্দপুর; নিম্ন প্রাথমিক অঙ্কাবলী। মহেশচন্দ্র ঘোষ—কৌস্তুভ কিরণ (সংবাদ পত্র) কৌস্তুভ। মাধবচন্দ্র ঘোষ—রত্নবর্ষণ। মার্শম্যান (রেভারেণ্ড ডাক্তার)—শ্রীরামপুর; সংস্কৃত রামায়ণ, চীনাপুরাণ, চীন প্রভৃতি ভাষায় বাইবেল অনুবাদ, History of Bengal (1853), History of India, The Works of Confusions, Aesop's Fables, Translation of Murry's Grammar, Geography, মার্শম্যানের অভিধান, ম্যাক্ (রেভারেণ্ড জে)—শ্রীরামপুর; কীমিয় বিদ্যাসার। মহেশচন্দ্র ঘোষ—হুগলী; কলেরা চিকিৎসা। মন্মথনাথ

মিত্র—চাতরা, শ্রীরামপুর ; Revival of Religion or Love of God in the reign of Lord Curzon. মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়—বাঁশবেড়িয়া ; হুগলী কাহিনী, বারাণসী ও সারনাথ, বংশবাটী, সপ্তগ্রাম, পাণ্ডুয়া, ত্রিবেণী, ব্যাণ্ডেল, Delhi Past and Present, সিংহল, Decadance of Rural Bengal, History made by ruins, Mathura and Brindaban, গ্রন্থাগার। মহিমচন্দ্র সরকার—Half yearly Gradation List, Code of Civil Procedure with Notes. মনীন্দ্রনাথ দে—হুগলী ; শিশুরঞ্জন পাটীগণিতের সুচারু সমাধান। মধুসূদন দাস অধিকারী—হুগলী ; শ্রীভাবৈষ্ণব সঙ্গিনী (সাময়িক পত্র), বৈরাগ্য নির্ণয় (১৯০৭) মহম্মদ আবদুল হাই—হুগলী ; ডাহিদ নামা। মন্মথনাথ কারক—চন্দননগর ; কহিনুর। মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র—হুগলী ; Specific Relief Act I of 1877 with Notes. মতিলাল দে—চুঁচুড়া ; শ্রীগৌরাঙ্গ। মাখনলাল ঘোষ—বাঁশবেড়িয়া ; পুর্ণিমা (মাসিক পত্র)। মুকুন্দ দেব মুখোপাধ্যায়—চুঁচুড়া ; ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আবার প্রবন্ধ, সদালাপ ১-৫ ভাগ, আমার দেখালোক, ভূদেব চরিত ১ম,২য়, ৩য় ভাগ। মাধবাচার্য্য—ত্রিবেণী ; দুর্গা মহাত্ম্য চণ্ডী। মহানন্দ বরাট—চুঁচুড়া ; প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৭)। মতিলাল সান্যাল—কাঁকড়দা ; তত্ত্বসাধন গীতা (১৯০৭), বেদান্ত দর্শন—সঠিক অনুবাদ। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—কৃষ্ণনগর (রাধানগর) স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের জীবনী, আর্য্যরমণী, সন্দর্ভ সংগ্রহ, খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজের ইতিহাস, অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনী নাট্যশালা ও সাময়িক পত্রের ইতিহাস (১২৯২)। মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—কৃষ্ণনগর ; নবীনের সংসার, দেশের বড়দা, মানসকুঞ্জ, প্রবাসীর প্রত্যাগমন, শিক্ষা বিস্তার, মানস সরোবর, মুরল মুরলী, জল প্লাবন, শুভেন্দুর কলঙ্ক। মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া ; কবির বাঁধনদার। মৃত্যুঞ্জয় বসু—হুগলী ; যাত্রাদলের গান ও পালা। মথুরামোহন দত্ত—চুঁচুড়া ; মুগ্ধবোধের

বঙ্গানুবাদ (১৮১৯)। মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়—মানদা, অপরাজিতা, পূর্ণিমা, অশ্রুকুমার, পঞ্চক, মোক্ষদা, স্বপ্নময়ী, সুকুমারী। মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া ; ভক্তিরত্নাবলী (১৩১৮)। মৃত্যুঞ্জয় তর্কলঙ্কার —শ্রীরামপুর ; প্রবোধচন্দ্রিকা, রাজরাণী, বত্রিশ সিংহাসন, পুরুষ পরীক্ষা—অনুবাদ। মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—মহানাদ ; সংক্ষিপ্ত ভৈষজ্যরত্ন, হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সম্বন্ধ নির্ণয় ও প্রতিকার, ধর্ম্মের তিনটী পথ, প্লেগ চিকিৎসা, বৃহৎ নিউমোনিয়া সন্দর্ভ, টাইফয়েড বিচার চিকিৎসা, ওলাউঠা, বিজয়, পকেট ভৈষজ্য সোপান, প্রসূতি সহায়, পকেট রিপার্টারি, চিকিৎসাসেতু, বসন্ত ও হাম, বানযুদ্ধ, মোহ মুদ্গর, আত্মনাত্ম বিবেক, স্ত্রীর প্রতি উপদেশ, বিদ্যালয়। মতীলাল পলসাঁই—চন্দননগর ; সঙ্গীত রচয়িতা। মদন মাষ্টার (মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়)—চন্দননগর ; দক্ষযজ্ঞ, সীতা অন্বেষণ, প্রহ্লাদ চরিত্র, ধ্রুব চরিত্র, দুর্গামঙ্গল, গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী, রাম বনবাস, হরিশ্চন্দ্র। মধু পাত্র—চন্দননগর ; যাত্রা ও পাঁচালীর গান। মে সাহেব—চুঁচুড়া ; ধারাপাত। মধুসূদন বাচস্পতি—পাতুল ; বৈষ্ণবতত্ত্ব দীপিকা, মৃচ্ছকটিকের বঙ্গানুবাদ, বসন্তসেনা। মৃত্যুঞ্জয় বরাট—বৈদ্যবাটী ; খাটিয়া কাব্য, মণিমালা। মনোরমা দেবী—ধ্রুব। মাধবী—মহানাদ ; ঐতিহাসিক তত্ত্বপূর্ণ বৈষ্ণব পদাবলী। মন্মথধন বন্দ্যোপাধ্যায়—বৃটিশ চন্দননগর ; শিক্ষাকোষ ১ম ভাগ। মোহিনীমোহন দত্ত—দেবানন্দপুর ; Poems. মনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—Life of Justice Aukul Chandra Mukherjee. মোহিতলাল মজুমদার—বলাগড় ; স্বপন পসারী বিস্মরণী বঙ্গদর্শন (মাসিক)। মিহিরমোহন মুখোপাধ্যায়—দিগসুই ; পারের ডাক। মধুমাধব চট্টোপাধ্যায়—চন্দননগর ; রহস্য পাঁচালী, প্রবাদ পদ্মিনী ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড, হেমোপাখ্যান, যাত্রা ও পাঁচালী সঙ্গীত। মতিলাল রায়—চন্দননগর উদ্বোধন (১৩২৬), সাধনা (১৩২৬), যুগবার্ত্তা (১৩২৭), যৌগিক সাধনা (১৩২৮), কর্ম্মের ধারা (১৩২৮), লীলা (১৩২৯), কানাইলাল (১৩৩০),

শতবর্ষের বাংলা, চণ্ডীদাস (১৩৩১), কাঙ্গালিনী, নারীমঙ্গল, যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, পতিব্রতা (১৩১৩), আত্ম সমর্পণ যোগ (১৩৩৬), শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পত্য জীবন (১৩৩৬), ভারতীর মন্দির (১৩৩৭), স্বদেশী যুগের স্মৃতি (১৩৩৮), ভারতলক্ষ্মী (১৩৩৮), মুক্তিমন্ত্র (১৩৪০), অনশনে মহিলা (১৩৩৯), ভারতীয় সঙ্ঘতত্ত্ব (১৩৩৯), যুগগুরু (১৩৪০), হিন্দুত্বের পুনরুত্থান ব্রহ্মচর্য্য (১৩৪১), যুক্ত বেনী, চন্দননগর মিউনিসিপ্যালিটী হইতে প্রকাশিত। Reglement de Police de la commure de Chandernagore (1928), মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—চন্দননগর; শিবপূজা পদ্ধতি। মারিয়া গেরে (Father J. F. M. Guerin)—চন্দননগর। কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ (২-য় সংস্করণ) ১৮৩৬। মতিলাল লাহা—চন্দননগর; বয়ন শিক্ষা, কার্পাস (১৯২০)*। মার্কণ্ডেয় প্রসাদ ভট্টাচার্য্য—জামগ্রাম; হিন্দুর কর্ত্তব্য কি? ১ম-খণ্ড (১৩১৩)। মতিলাল দাস—বলরামবাটী সিঙ্গুর; সুহাসিনী। মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার—গুপ্তিপাড়া; শ্রীশ্যামকল্প লতিকা। মহেন্দ্রনাথ নন্দী—চন্দননগর; A French—Bengali—English Dictionary. (অসমাপ্ত)। মতিলাল দাস—চন্দননগর; বুন্দেলা বালা বা নূতন বৌ। †

য

যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী—কৃষ্ণনগর; তীর্থ ভ্রমণ, সঙ্গীত লহরী। যদুনাথ মুখোপাধ্যায়—চুঁচুড়া; চিকিৎসাদর্পণ (মাসিক), শরীর পালন, ভৈষজ্য প্রকাশ, উদ্ভিদ বিচার, পল্লীগ্রাম, সরল স্বর চিকিৎসা, উদ্ভিদ তত্ত্ব, সরল রোগ নির্ণয়, ধাত্রী শিক্ষা ও প্রসূতি শিক্ষা, কুইনাইন, বিসূচিকা চিকিৎসা, চিকিৎসার কল্পদ্রুম, বাঙ্গালীর মেয়ের নীতিশিক্ষা। যোগেন্দ্র

---

* বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত একযোগে লিখিত।

† ভাঙ্গামোড়া নিবাসী অম্বিকাচরণ গুপ্তর 'বুন্দেলাবালা' নামে একখানি পুস্তক আছে।

নারায়ণ রায়—হুগলী ; বঙ্গমহিলা। যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া ; নীতিপ্রভা (১৮৫৭), হতভাগ্য মুরাদ (১৮৬১), বিধবা বিলাস (১৮৬৪)। যাদবচন্দ্র বিদ্যারত্ন—উত্তরপাড়া ; নলচরিত কাব্য (১৭৮৭ শক)। যদু গোপাল চট্টোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া ; চপল চিত্ত চাপল্য নাটক। যগেশ্বর ঘোষ—খামারপাড়া ; Theory of R-nt System of Land Revenue in England, Higher Education the Bengal. যজ্ঞেশ্বর বেদান্ততীর্থ—চুঁচুড়া ; নীতিমঞ্জরী। যাদবচন্দ্র গোস্বামী—হুগলী ; সুখপাঠ। যদুনাথ পাল—রসরত্নাকর (১৮৫৯)—সাময়িক পত্র। যোগেন্দ্রনাথ রায় জ্যোতীশ শাস্ত্রী—নন্দনপুর ; জ্যোতি বিজ্ঞান, কল্পলতিকা, নারীযাতক বা নারী লক্ষণ, উৎকলের পঞ্চতীর্থ, মণিরত্ন বিজ্ঞান, অনন্ত গড়ুড় রহস্য, গায়ত্রী উপাসনা, বৃদ্ধবোধ বর্ণপবিচয়, জথপত্রিকা পুস্তক, শিবপূজা পদ্ধতি, দেবদেবী ও ঋষি বংশাবলী, গীতায় সৃষ্টিতত্ত্ব, চতুর্ব্বেদীয় পুরুষসুক্ত। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রামজীবনপুর ; শ্মশানভূম। যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—হুগলী ; Specimens of Types. যতীন্দ্রনাথ মিত্র—শ্রীরামপুর ; ভারতের আর্থিক অবস্থা, পণ্ডিতের সংজ্ঞা। A Lost Nation, World Peace, National System of Indian Economics. যদুনাথ মুখোপাধ্যায়—চন্দননগর ; চিত্তরঞ্জন উপন্যাস (১৩১০)। যোগেন্দ্রনাথ বসু—চন্দননগর ; Original Works of Poor Jogendra Lal Bose., যোগেন্দ্রনাথ দে—চন্দননগর ; নগনন্দিনী। যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়—চন্দননগর ; আগন্তুক (১৩১৩), জামাই জাঙ্গাল (১৩১০), শ্রীমন্ত সওদাগর (১৩১৭), বৃদ্ধের বয়স ১ম খণ্ড (১৩২৫), অমিয় উৎস (১৩২৬)। যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—খলিসানী, চন্দননগর ; অজাতশত্রু (১৩৩৩)। যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়—পদ্যপাঠ ৩ ভাগ, ভারতবর্ষের ইতিহাস, সেক্সপিয়ারেরর গল্প। যদুনাথ কাঞ্জিলাল—সীতাচরিত। যোগেশচন্দ্র রায়—দিয়াড়া ; সরল পদার্থ বিজ্ঞান, সরল প্রাকৃত ভূগোল,

সরল রসায়ন, বিজ্ঞান কলিকা, পত্রালী, সিদ্ধান্তদর্পণ, আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ, রত্ন পরীক্ষা, বাঙ্গলা ভাষা রাঢ়ের ভাষা, শকু নির্ম্মাণ, Hindu Astronomy, A Primer of Physiography. Hindu Reform. যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—চুঁচুড়া; প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা।

র

রামমোহন রায় (রাজা)—রাধানগর, খানাকুল কৃষ্ণনগর; বেদান্ত গ্রন্থ (১৭৩৭ শক), বেদান্ত সার (১৭৩৮ শক), ঈশ উপনিষদ (১৭৩৭ শক), সহমরণ বিষয় ১ম খণ্ড (১৭৪১) ২য়, ৩য় খণ্ড (১৭৫১), চারি প্রশ্নের উত্তর (১৭৪৪), প্রথাপ্রদান (১৭৪৫), ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ (১৭৪৮), কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার, বজ্রসূচী (১৭৪৯), কুলার্ণব তন্ত্র (১৭৪৯), গায়ত্র্যা পরমোপাসনা বিধানং (১৭৪৯), অনুষ্ঠান (১৭৫১), সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার, প্রার্থনাপত্র, আত্মানাত্মবিবেক, ব্রাহ্মণ সেবধি (মাসিক), পাদরী ও শিষ্য সংবাদ, ব্রহ্ম সঙ্গীত, বেদান্ত ও উপনিষদের বঙ্গানুবাদ, ব্রহ্মোপাসনা, গায়ত্রীর অর্থ (১৭৪০), কঠোপনিষদ (১৭৩৯), মণ্ডুকোপরিষদ, সম্বাদ কৌমুদী, কবিতাকারের সহিত দরবার, গোস্বামীর সহিত বিচার, ভট্টাচার্য্যের বিচার, গৌড়ীয় ব্যাকরণ, দণ্ডাদণ্ডী বিচার, পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রণালী, ভূগোল, গায়ত্রীর অর্থ, তোহম তুল মোহদীন, Bengalee Grammer in the English Language. রামতারক কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ: বৈদ্যবাটী; সংস্কৃত কথা কৌমুদী। রামচন্দ্র দত্ত—উত্তরপাড়া; সঙ্গীত। রাম রাম তর্কালঙ্কার—দায় কৌমুদী, দত্তক কৌমুদী, ব্যবস্থা সংগ্রহ। আর, বসু—কোন্নগর; Rhetoric and Prosody. রঘুনাথ দাস গোস্বামী উপদেশমৃত, শ্রীচৈতন্য স্তব কল্প বৃক্ষ, সংস্কৃত বিলাপ কুসুমাঞ্জলী, মনঃ শিক্ষা,

মুক্তাচরিত্র, স্তবাবলী। রূপ গোস্বামী—সপ্তগ্রাম; ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, বিদগ্ধ মাধব, ললিত মাধব, উজ্জ্বল নীলমণি, দানকেলি কৌমুদী, উৎকলিকা বল্লরী, অষ্টাদশ লীলাচ্ছন্দ, নাটক চন্দ্রিকা, হংস দূত, উদ্ধব সন্দেশ, মুক্তা চরিত্র, মথুরা মাহাত্ম্য। রাধিকাপ্রসাদ শেঠ চৌধুরী—ভাঙ্গামোড়া, হুগলী; বরপণ ও ক্ষতি (১৩৩৪)। রাজকুমার বেদস্মৃতি কাব্যতীর্থ—কৈকালা; তারকেশ্বর তত্ত্ব, প্রবন্ধ পুষ্পাঞ্জলি, কাব্যমালা, নারীচরিত্র, উপন্যাস কুঞ্জ, গীতি কুঞ্জ, গ্রাম্য শব্দকোষ, প্রায়শ্চিত্ত পঞ্চালিকা, সামবেদ সংহিতা, কুমার সম্ভবম, ভাষা দর্পণ, সন্দর্ভহার। রামচন্দ্র বসু—চন্দননগর; চেতন কৌমুদী। রামরত্ন দাস সরকার—চন্দননগর; রসিক রতন, মানব দেহ রতন (১৭৮৬ শকাব্দ), পদার্থ সুধাসিন্ধু (১৭৮৬ শকাব্দ), চিকিৎসা রঞ্জন। রামনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দননগর; Dictionaire Francais Bengali Vol. I (১৮৮০)। রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—চন্দননগর; নিসর্গাভিনয়ম্ (সংস্কৃত ১৮৯০)। রাধারাণী দেবী—চন্দননগর; প্রেমের পূজা (১৩৩৫)। রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—চন্দননগর; যুগল মিলন ১৯২৪। রাজকুমারী দে—চন্দননগর; তীর্থ চরণে কুসুমাঞ্জলী (১৩২২), একটী কথা (১৩৩২)। রামদেব দত্ত—বৈঁচি; বঙ্গনিবাসী (সংবাদ পত্র)।

রাজারাম যোগী—কুচপালা; বাউল সঙ্গীত। রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী—রাধানগর; ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী, Jatakdari System of Oudh. রাজকুমার মুখোপাধ্যায়—চন্দননগর Suphurations and Newralgia (অনুবাদ ১৯১৬), Difficult and Backward Children (অনুবাদ ১৯৩৭)। রামতারক তর্করত্ন—কৃষ্ণনগর শ্রীশ্রীকালীতত্ত্ব কথা। রঞ্জনীকান্ত শেঠ চৌধুরী—ভাঙ্গামোড়া; শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈত। রামযদু রক্ষিত—সন্ধিপুর; ধর্ম্মসুহৃদ। রাধামাধব মিত্র—জেজুর; বোধেন্দুদয়,

* রামদেব দত্তও হইতে পারে।

(১২৭০) কবিতাগুলি ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ৫ম ভাগ, স্ত্রী পুরুষে দ্বন্দ্ব, শারদীয়া মহোৎসব, আরব্য উপন্যাস। রজনীকান্ত ভাদুড়ী—বৃটিশ চন্দননগর, শ্রীকান্ত ভাদুড়ী। রামরাম বসু—চুঁচুড়া; প্রতাপাদিত্য চরিত, লিপিমালা, খৃষ্টচরিত। রামরূপ ভট্টাচার্য্য—চুঁচুড়া; চরিত্র, ষণ্ডেশ্বর মাহাত্ম্য। রসিকচন্দ্র রায়—হরিপাল পরে বড়া, হরিভক্তি চন্দ্রিকা, পাঁচালী, ১১ খণ্ড, কৃষ্ণ প্রেমাঙ্কুর, বাদ্যসূত্র, শ্যামাসঙ্গীত, জীবনতারা, বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়, বৈষ্ণব নব মনোরঞ্জন, কুলীন কুলাচার, গঞ্জিকা দূত, শকুন্তলা-বিহার, দশমহাবিদ্যাসাধন, নবরসাঙ্কুর, পদাঙ্কদূত, নব্যজীবনতারা। রাজকুমার বেদান্ততীর্থ ও কালীপদ মিত্র—কৈকালা; হিন্দু সখা (সাময়িক পত্র ১৯০৮)। রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়—বাঙ্গালা ফরাসী Word Book (১৮৯৭)। রামনারায়ণ রায়চৌধুরী—সত্য নারায়ণ ব্রতকথা, অষ্টাদশ স্তোত্রাদির শেষ ভাগ। রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া; যোগদর্শন, পাতঞ্জল সূত্র, ফরাসী দর্শনের ইংরাজী অনুবাদ, ব্যাস ভাষ্য, বাচস্পতি মিশ্রের টীকা, Dialogue of Philosophic Argument. রামকমল সেন—শ্রীরামপুর; ইংরাজী ও বাঙ্গালা অভিধান, জনসন ডিকসিয়ানারির বঙ্গানুবাদ। রাজকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী—স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি (১৮৭০)। রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)—ত্রিবেণী (চাপতা) টপ্পাসঙ্গীত। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলী; কুমার-সম্ভব, কর্ম্মদেবী, সুরসুন্দরী, কাঞ্চিকাবেরী, পদ্মিনী উপাখ্যান, নীতি কুসুমাঞ্জলি। রামগতি ন্যায়রত্ন ইলছোবা—মণ্ডলাই; বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, রোমাবতী, কলিকাতার দুর্গ ও অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস, দময়ন্তী, বাঙ্গলা ব্যাকরণ, বাঙ্গলার ইতিহাস, ১ম ভাগ কুপিত কৌশিক বা হরিশ্চন্দ্র নাটক, রামচরিত, বস্তু বিচার, ঋজুব্যাখ্যান, ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, গোষ্ঠী কথা, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর বঙ্গানুবাদ, ইলছোবার কথা, নীতিকথা, শিশুপাঠ। রাস্থ—নৃসিংহ চন্দননগর;

কবিগান, সখি সংবাদ। রবিনসন্ সাহেব প্রচলিত বিধানের সার সংগ্রহ। (১৮৬৪) রবিনসন সাহেবের পুত্র রবিনসন—Atlas (1858). আর, এম, চট্টোপাধ্যায়—চুঁচুড়া, নিত্যানন্দপুর; Homœpathic Treatment of Cholora (1900). রাধানাথ সেন রায় বাহাদুর—দেবানন্দপুর; কালীদাস আর, রায়—উপনিষদ, চাণক্য শ্লোক, হিতোপদেশ, পঞ্জিকা। রা মশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—গোপালপুর, হুগলী; জ্ঞানকৌমুদী। রাজেন্দ্রলাল মিত্র—হুগলী; শিল্পী দর্শন। রামচন্দ্র বসু—গোন্দলপাড়া, চন্দননগর; চেতন কৌমুদী। রামচন্দ্র সেন (সুর) উত্তরপাড়া; পঞ্জিকা। রামতারক রায় নন্দনপুর; মহাভাগবত পুরাণ (বঙ্গানুবাদ)। রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মালিপাড়া অন্যমতে শ্রীরামপুর জ্যোতীষ সংগ্রহ (১৮১৬)। রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া; ফরাসী শিক্ষার ওয়ার্ডবুক্। রথফোড্ (এম্, বি) হুগলী। Police Guide. রামচন্দ্র রায়—শ্রীরামপুর; শব্দাবলী (১৮১৮)। রামশঙ্কর ঘোষ বসন্তপুর; রামায়ণ-অরণ্যকাণ্ড। রামজয় গুপ্ত—মঙ্গলপুর; রামায়ণ-লঙ্কাকাণ্ড। রজনী-কান্ত বিদ্যাবিনোদ—বাঘ আঁচড়া, হুগলী; বঙ্গীয় শব্দসিন্ধু (১৯০৮)। রামচন্দ্র নাগ—জিরাট বলাগড়। রসিকলাল দাস—শ্রীরামপুর; শিশুবোধ, শিশুবোধের ব্যাখ্যা। রামতারক রায়—চুঁচুড়া আথবা নন্দনপুর। সদর দেওয়ানী আইন বিধি, মহাভাগবৎ পুরাণ বঙ্গানুবাদ, রামহরি—শ্রীরামপুর; বাঙ্গলা পঞ্জিকা (প্রথম মুদ্রিত পঞ্জিকা ১৮১৮) রজনীকান্ত দে—পাহাড়পুর, হুগলী; হোমিওপ্যাথি ব্যবস্থাতত্ত্ব (১৯০৩)। রামেশ্বর সেন—হুগলী; শুদ্ধরূপে নাম লিখিবার নিয়মাদি।

ল

লক্ষ্মীনারায়ণ শর্ম্মা শ্রীরামপুর; দত্তকৌমুদী, দত্তক প্রকরণ। লিডেন্ ব্রহ্মবার্গ শ্রীরামপুর; ভারতবর্ষীয় উদ্ভিজ্জাবলী। ললিতমোহন

ঘোষ—অচলবাসিনী (১৮৭৫)। ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় সেওড়া-ফুলি ; লীলা লহরী। লরি সাহেব (W. F. B. Lauri)—শ্রীরামপুর ; The French in India (1847)। লালমোহন বিদ্যানিধি হুগলী ; সম্বন্ধ নির্ণয় (১৯০১), কাব্যনির্ণয়, আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা, পত্র প্রবন্ধ, চারুপ্রবন্ধ, সংস্কৃত মেঘদূত, মেঘদূতের ইংরাজী অনুবাদ। লক্ষ্মীনারায়ণ রায়—ন-পাড়া ; ধ্রুব চরিত। লক্ষ্মীনারায়ণ শাস্ত্রী—রামকৃষ্ণ পুর ; সজ্জন চরিত। লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস—কাপাশডাঙ্গা, হুগলী ; অপূর্ব্ব জ্ঞানযোগ। লালবিহারী দে (রেভারেণ্ড)—Folk Tales of Bengal, Bengal Peasant Life or Gobinda Samanto. ললিতমোহন কর—মহানাদ ; পার্ব্বতী পরিণয়। ললিতমোহন কর ও চারুচন্দ্র বসু—চন্দননগর ; অশোক অনুশাসনের অনুবাদ (১৩২২)।

শ

শ্রীশচন্দ্র বসু—চন্দননগর, (গোন্দল পাড়া) লীলা (১২৯৫) প্রতাপ। শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়—চন্দননগর ; সরল ললিত পঞ্জিকা। শঙ্করানন্দ ব্রহ্মচারী—চন্দনগর ; The Grandeur of Vedas (১৯১৯), মহারাজ জন্মেজয়ের সর্পসত্র (১৮৪ শকাব্দ), জীবের সাধ্য ও সাধনা (১৮৩১ শক) চণ্ডীদাসের জন্মস্থান নানুর গ্রামের প্রাচীনত্ব, পুরাতত্ত্বের আবিষ্কার। শ্রীশচন্দ্র বসু—ফটকগোড়া, চন্দননগর ; বুদ্ধ, মালতি মাধব (১৯২৬), পুণ্ডরীক (১৩২৭), Nala and Damayanti (১৯১৯)। শিবকৃষ্ণ মিত্র—চন্দননগর ; বসন্তলাল মিত্র মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী (১৩১৬)। শরৎকুমারী দেবী—চন্দননগর ; উত্তরায়ণে গঙ্গাস্নান (১৩২৮)। শ্রীশচন্দ্র সুর—চন্দননগর ; মোগল পতন (১৩১৯), বরের বাপ (১৩২১)। শ্রীপদ বিদ্যাবিলাস—চন্দননগর ; বাঙ্গালীর আত্মপ্রতিষ্ঠা (১৩২৭)। শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়—

উত্তরপাড়া। Early Poems(1942), Life of Joykrishna Mukerjee. শিবচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—উত্তরপাড়া; মুগ্ধবোধব্যাকরণ (বঙ্গানুবাদ সহ)। শিবচন্দ্র সোম—চুঁচুড়া; উড়িষ্যার ইতিহাস। শরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী—হুগলী; সুশাসন, ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান, পাটটীকা, পাঠ দান, পাঠ সমালোচনা, স্বাস্থ্য ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান। শ্যামলাল মজুমদার—কনকশালী; দেবী না মানবী, প্রভা, সুরবালা। শম্ভুনাথ দে—বি, এল, হুগলী; Hooghly Past and Present. The Bansberia Raj Family. শ্রীকণ্ঠ মল্লিক—বাগচ্ছবি (১৮৬১)। শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়—শ্রীরামপুর; বৈদ্যুতিক পাখা, ইলেকট্রিক মেসিন ও তাহাদের দোষ ও প্রতিকার। শিবচন্দ্র দেব—কোন্নগর; আরব্য উপন্যাস, আধ্যাত্ম বিজ্ঞান, আত্মশিক্ষা, মহাপুরুষ, শিশুপালন (১৭৭৯শক), জীবনের লক্ষ্য কি? আধ্যাত্মিক দশ আদেশ ও কর্তব্যের দশ বিধি, থিয়েটার পার্কারের কর্ম্মবিষয়ক মত, Autobiography. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—দেবানন্দপুর; শ্রীকান্ত ১ম-পর্ব্ব, ৫ম-পর্ব্ব, পল্লী-সমাজ (১৩২৭), দেবদাস, ছবি (১৩২৭) পরিণীতা (১৯.৪) নিস্কৃতি, বিরাজ বৌ, বিন্দুর ছেলে, অভাগীর স্বর্গ বামুনের মেয়ে (১২২৭) দত্তা, অরক্ষণীয়া, বৈকুণ্ঠের উইল, নববিধান, গৃহদাহ, চরিত্রহীন, দেনা-পাওনা, পথের দাবী, বড়দিদি, মেজদিদি, ষোড়শী, পণ্ডিত মশাই, শেষ প্রশ্ন সামলার ফল, একাদশী বৈরাগী, দর্পচূর্ণ, স্বামী, পণ্ডিত অনুরাধা সতী ও পণ্ডিত, আঁধারে আলো, বিলাসী, নারীর মূল্য, মহেশ, স্বদেশী, কাশীনাথ, হরিলক্ষ্মী, বিপ্রদাস। শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—নবরমণী নাটক (১২৬৮)। শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ—মহাভাগবত পুরাণ ১ম খণ্ড (১২৮০)। শ্রীপতি কবিরত্ন—গুপ্তিপাড়া; শ্যামাকল্পলতিকা। শ্যামাচরণ ঘোষ—চুঁচুড়া; ড্রিল শিক্ষা। শশধর সেন—হুগলী; The Lower Reader, শক্তিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত—সোমড়া; সাহিত্য রত্ন। শিবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ—উত্তরপাড়া। মুগ্ধবোধ ব্যাকারণ। শ্রীরাম

চন্দ্র তর্কালঙ্কার—ইলছোবা; কাব্যার্চ্চনা বিধি। শ্রীনাথচন্দ্র ঘোষ—কোন্নগর; বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম্ম, ভাষাবিজ্ঞান। শরৎচন্দ্র বিশ্বাস—চন্দননগর; গল্প বা ইতিহাস। শ্রীহরি ঘোষ—খন্নান; পুরুষোত্তম ক্ষেত্র, বোধ গয়া। শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ভারতবন্ধু। শ্রীধর কথক—বাঁশবেড়িয়া; ধর্ম্ম সঙ্গীত, টপ্পা গান। শরৎচন্দ্র চৌধুরী—বেগমপুর; বর্ণশিক্ষা পরিশিষ্ট। শচীন্দ্রনাথ সিংহ—ব্যাথার ব্যথী। শরৎচন্দ্র ঘোষ বি-এল—হুগলী; Succession Certificate Act 1889 with Notes and Commentary (1864), গৃহস্থ সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, জাতিতত্ত্ব কল্পদ্রুম, সদেগাপ জাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, হিন্দুপঞ্জিকা সংস্কার। শশিভূষণ কাব্যতীর্থ—চাতরা; দুর্ভিক্ষ বিক্রম। শিশির কুমার মৈত্রেয়—Philosophical Currents of the Present day. শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়—বৈদ্যবাটি; বিপ্লবের পর রুষিয়া। শিবচন্দ্র শীল—চুঁচুড়া; গোবিন্দচন্দ্র গীত (১৩০৮)। শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—হরিপাল; স্বর্গীয় কবি রসিকচন্দ্র রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী। শশিভূষণ ধাড়া—জনাই; মহামুক্তি নাটক। শ্রীধর আচার্য্য—বংশবাটী; তত্ত্বসংবাদিনী অভয় সিদ্ধি। শিবচন্দ্র দাস—শিশুপালন (১৭৭৯ শক)। শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়—বাল্য বিবাহ নাটক। শ্রীরামতর্কবাগীশ—শ্রীরামপুর; প্রাচীন পদাবলী (১৮২৩)। শূলপাণি—বিবেকগ্রন্থ ১২ খানি।

স

সন্তোষকুমার দত্ত—লাল পতাকা, রঙ্গের গোলাম, কেরাণী মহল (মাসিকপত্র)। সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—চুঁচুড়া; হায়দার আলি, প্রমীলা, কয়েকটী গান। সত্যচরণ শাস্ত্রী—মাহেশ; জালিয়াত ক্লাইভ, ছত্রপতি শিবাজী, হিমালয় ভ্রমণ, মহারাজ নন্দকুমার, মানস সরোবর, ভারতে আলিকসন্দর, কৈলাস যাত্রা, প্রতাপাদিত্যের জীবন চরিত, প্রাচী

ভ্রমণ। সৌদামিনী সিংহ—নারী চরিত (১৮৬১)। সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী—কুলদেবী, বঙ্গবধু, হরপার্ব্বতী, ভক্তির ডোর, সংযুক্তা, সোনার চাঁদ, বামনের দেশ, সিন্ধবাদ, আর্য্যকীর্ত্তি গ্রন্থাবলী। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাকুলিয়া; মোগল পাঠান, হিন্দুবীর, আলেকজাণ্ডার, কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ। সতীশচন্দ্র গিরি—তারকেশ্বর; তারকেশ্বর শিবতত্ত্ব। সতীন্দ্র দেব রায় মহাশয়—বাঁশবেড়িয়া; পূর্ণিমা (মাসিক পত্র), Sudramony Rajarsi (1903) সতীশচন্দ্র ঘোষ—চুঁচুড়া (খামারগাছি।) The Indian Mechanic (Journal) 1896-98 সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী—শ্রীরামপুর; অশ্রুকণা। সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ—বাঁশবেড়িয়া; শিবপুর কলেজ পত্রিকা। সুরেশচন্দ্র দে—শ্রীরামপুর; তান্ত্রিক ও আয়ুর্ব্বেদ গৃহ চিকিৎসা, গো চিকিৎসা। সৈয়দ আলি নবাব—হুগলী। The First Centennial Celebration of the Mohshin Endowment. সুশীলচন্দ্র ঘোষ—দাদপুর; Police Officers Pocket Note Book, Court Sub-Inspectorship Examination Questions & Answers, Police Officer's Pocket Manual Law & Procedure. সিদ্ধেশ্বর শর্ম্মা—হুগলী; বঙ্গভাস্কর (১৯০৮)। সুধীরচন্দ্র ঘোষ—Settlement Mannual, শীকার ফল, গুরুদেব, মিলন। স্কিপ্ উইথ্—হুগলী; Magistrates Guide. সারদাচরণ মিত্র এম-এ, বি-এল,—পানিশেওলা (হুগলী)। পুরন্দর খাঁ, উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, বিদ্যাপতি, পদাবলী, Land Tennure of Bengal. সচ্চিদানন্দ দাস—স্বর্গভূমি পরিক্রমণ। সুরেন্দ্রনাথ মিত্র—শ্রীরামপুর; রামায়ণ যুগের ভারত। সুশীলকুমার মৈত্র—Ethics of the Hindus. সিদ্ধমোহন মিত্র—কোন্নগর; নয়টী প্রবন্ধ। সনাতন গোস্বামী—সপ্তগ্রাম; হরিভক্তি বিলাস, বৈষ্ণব তোষিণী, ভাগবতামৃত। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-জনাই; জাপান, চিত্রকথা,

নাসিকো, বনস্পতির অভিশাপ। সত্যেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—চন্দননগর; ভক্তিপুষ্প। সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—চন্দননগর; সাধনাষ্টক, নবসম্ভব শতক ১ম খণ্ড (১৩০২)। সাগরচন্দ্র কুণ্ডু—চন্দননগর; জলকষ্টাদির কাহিনী ও বৃষ্টিতত্ত্ব (১৩০১), দুগ্ধ কি বস্তু দেখুন (১৩১৩), অগ্নিব্রহ্মের তত্ত্ব ও আহুতি প্রকরণ (১৩৩৪), অগ্নি ব্রহ্মের স্তুতি ও মহিমা বর্ণনা, সূর্য্যনারায়ণ তত্ত্ব ও ভ্রাতৃপ্রেম শিক্ষা (১৩৪২) চন্দননগরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী। সন্তোষনাথ শেঠ—চন্দননগর। মহাজন সখা, (১৩২৭), মোকামে বাণিজ্য তত্ত্ব ১ম ও ২য় ভাগ (১৩২৭-১৩২৯), Book Keeping in Bengal etc. (১৩২৮), প্রাথমিক ব্যবসা শিক্ষা (১৩২৯), বিজ্ঞাপন তত্ত্ব ও ক্যানভাসিং (১৩৩০), অর্থোপার্জ্জনের সহজ উপায় (১৩২৮), বঙ্গের চাল তত্ত্ব (১৩৩২), Setts Guide to Commercial Places (১৯২১), Traders Friend (১৯২২), সুধীরকুমার মিত্র—জেজুর; জেজুরের মিত্র বংশ (১৩৪০), ভারতের রাষ্ট্রভাষা, India's National Language আশুতোষ মিত্রের জীবনী, নয়া-বাঙ্গলা, তীর্থ সপ্তক, মহাবিপ্লবী রাসবিহারী, মৃত্যুঞ্জয়ী কানাই, বাঘা যতীন, বরণীয় বাঙ্গালী, কায়স্থ পত্রিকা (সাময়িক পত্র); সুলেখা দেবী—চন্দননগর; আকস্মিক বিপদ আপদ (১৩৪০), Outlines of Grammar, প্রশ্নমালা। সন্তোষ কুমার ভড়—চন্দননগর; On the Zeros of Non-Differentiable Functions of Darboux's Type, On some Remarkable Points on the "Graph" of Dinis' Non-Differentiable Function. সতীশচন্দ্র মিত্র—চন্দননগর; শতদল। সদানন্দ ঠাকুর—চন্দননগর। বিবেকবন্ধু (১৩৩৯), ব্রজপ্রাপ্তি রসতত্ত্ব (১৩৩৯)। সত্যেন্দ্রকুমার পাইন—সেনহাট; কণ্ঠহার। সহদেব চক্রবর্ত্তী—রাধানগর; ধর্ম্ম মঙ্গল। সূর্য্যকুমার ধর—সহজ শ্রীমদ্ভাগবত। সৃষ্টিধর

চক্রবর্ত্তী—মহানাদ; ভাষা বৃত্তিয়ার্থ বিকৃতি। এফ, সি, চাটার্জ্জি—শ্রীরামপুর। Beginner's History of India, Model Questions on the English Entrance Course (1901). এফ, এম, গোস্বামী—শ্রীরামপুর; Beginner's Geography, Beginners Word Book, Complete Key to New Orient Reader No. 2. (1901), Notes on Webb's Selections from Wordsworth (1903), Notes on Practical English Reader No. III (1908).

হ

হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতাপপুর, হুগলী; অজামিল চরিত, ধর্ম্মাঙ্কুর, কল্যাণী (১৯০৮)। হরচন্দ্র ঘোষ হুগলী, ঘোলঘাট; সুখ্যাতি পত্র, ভানুমতী চিত্ত বিলাস, কৌরব বিয়োগ নাটক, চারুমুখ চিত্তহারা, রজত গিরী নন্দিনী, রাজ তপস্বিনী, বারুণী বরণ, স্বপত্নী ঘর, ভদ্রার্জ্জুন। হেমচন্দ্র মুখার্জ্জি জনাই; Summary of Criminal Law. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যার গুলিটা, হুগলী; চিন্তা তরঙ্গিনী, বীরবাহু কাব্য, বৃত্র সংহার, মায়া কানন, ছায়াময়ী (১২৮৬), চিত্তবিকাশ, দশ মহাবিদ্যা (১৮৮২), ভারত সঙ্গীত, রহস্য কবিতাবলী, অপূর্ব্ব কবিতাবলী, বিবিধ কবিতাবলী, নলিনী বসন্ত, রাখী বন্ধন, রোমিও জুলিয়েট, পদ্মিনী উপাখ্যান, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন বৃত্তান্ত। হরিদাস সাহা—হুগলী; A Hand Book of Chemistry. হরিপদ ভট্টাচার্য্য শ্রীরামপুর; বাল্য কাহিনী। হেমশশী সোম চুঁচুড়া; Select Poetical Pieces. হরনাথ বসু—কৈকালা, স্বর্ণহার, ভক্ত কবীর, ময়ূর সিংহাসন, বেহুলা, বীরপূজা, চক্রে ডাকা। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়—সেনেট, সঙ্গীত

তরঙ্গ, বঙ্গভাষার লেখক, দাশুরায়ের পাঁচালী, সধবা দিদি, ভঙ্গহরি সর্দ্দার, নকুড়বাবু, স্বদেশী সামগ্রী, শিবাজীর ভবানী পূজা। হেমেন্দ্রকুমার রায়—বৈদ্যবাটী, পসরা, যৌবনের গান। হৃষীকেশ সেন—বাংলার কৃষকের কথা, সমানাধিকারবাদ, বেকার সমস্যা, হালহেড এন, বি—হুগলী। ব্যাকরণ (১৭৭৮, ইহা বাঙ্গলার প্রথম মুদ্রিত পুস্তক) হিরন্ময়ী দাসী—বাঁশবেড়িয়া, পূর্ণিমা (মাসিক পত্র)। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—জাঙ্গীপাড়া, দুর্গাসুর, বাঘিনী, মান, জয়দেব, রাণী জয়মতী, প্রবীর পতন, শ্রীগৌরাঙ্গ, প্রহ্লাদ চরিত্র,রুক্মাঙ্গদ, পঞ্চরাত্র, তারা বা বালিবধ,বিদুর, দীনবন্ধু,মেঘনাদ, কালাপাহাড়, সজ্ঞার স্বয়ম্বর, চাণক্য, ক্ষণাদেবী, কালকেতু, ভক্তের ভগবান, জয়লক্ষ্মী, অতিথি সংকার,তাম্রধ্বজ,যোগমায়া। হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—ভদ্রকালী ; সভ্যতা, সভ্যতা (হিন্দী সংস্করণ) বলির কীর্ত্তি, অনাথ চরিত, কল্কিদর্শন, শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, যোগোপনিষৎ, কল্কি উপনিষদ পাতঞ্জল দর্শন, ঈশোপনিষদ, অল্লোপনিষদ, কবীর দোতাবলী, কালমাহাত্ম্য, Gospel of St. John, Parmacepase of Life, Science of Living, Journey of Life Peace. হরিদাস ঘোষ—চন্দননগর, কাদম্বিনী, শরতের পূর্ণচন্দ্র, কুসুম কল্পনা, মহাভারত। হারাধন বক্সি—চন্দননগর, লড়ায়ের নূতন কায়দা (১৩৩২)। হরিহর শেঠ—চন্দননগর, অভিশাপ (১৩১৫), প্রসাদ (১৩১৬), অদ্ভুত গুপ্তলিপি ও অমৃতে গরল (১৩১৬), প্রতিভা (১৩২৮) স্রোতের ঢেউ (১৩২৯), ঘরের কথা (১৩৩১), পুরাতনী (১৩৩৫) চন্দননগর পরিচয়, প্রাচীন কলিকাতা পরিচয় (১৩৪১) হেমলতা দেবী—লাঙ্গুলপাড়া, দুনিয়ার ছেলে, ভারতবর্ষের ইতিহাস, নেপালে বঙ্গনারী। হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—চুঁচুড়া, ইঙ্গিত, সন্দর্ভপাঠ। অবতারচন্দ্র লাহা—খরসরাই, বেগমপুর ; আনন্দলহরী, আমার ফটো।

হুগলী জেলার সাময়িক পত্রিকা উহার সম্পাদক ও প্রথম প্রকাশের সময়

এডুকেশন্ গেজেট—প্যারীচরণ সরকার, ১৮৫৬। সাধারণী—অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কনকশালী। নবজীবন—অক্ষয়চন্দ্র সরকার ১২৯১, মাসিক, চুঁচুড়া। দিগদর্শন—ক্লার্ক মার্শম্যান্, ১৮১৬, মাসিক, শ্রীরামপুর। সমাচার দর্পণ—উইলিয়ম কেরী, ১৮১৮, শ্রীরামপুর। ব্রাহ্মণ সেবধি—রাজা রামমোহন রায়, ১৮২১, শ্রীরামপুর। ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া—রেঃ মেজর মার্শম্যান, ১৮২০, শ্রীরামপুর। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট গেজেট—জন্ ক্লার্ক মার্শম্যান ১৮৪০, শ্রীরামপুর। জ্ঞানারুণোদয়—কেশবচন্দ্র কর্ম্মকার, ১৮৫১, শ্রীরামপুর (মতান্তরে কালিদাস মৈত্র ও যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়) ১২৫১। উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্র—ক্ষেত্রনাথ রায়চৌধুরী ১৮৫৬-৫৭. উত্তরপাড়া। প্রজাবন্ধু—তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮২, সাপ্তাহিক চন্দননগর। Le Petit Bengali—চার্লস্ ডুম্যান্, সাপ্তাহিক, চন্দননগর। জননী—প্রসাদদাস গাঙ্গুলী, চুঁচুড়া। দর্শক—পূর্ণচন্দ্র পাঠক সাপ্তাহিক। চিকিৎসা দর্পণ—যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ১২৭৮ সাল, মাসিক, হুগলী। ধূমকেতু—শ্রীশিবকৃষ্ণ মিত্র, ১২৯৩ সাল সাপ্তাহিক, চন্দননগর। সংবাদ শশধর—কালীদাস মিত্র ১২৫৯ সাল সাপ্তাহিক শ্রীরামপুর। সত্য প্রদীপ—এম, টাউনসেণ্ড ১২৫৭ সাল, শ্রীরামপুর। বঙ্গপ্রভা—বিপিনবিহারী কোলে, মাসিক, ১২৯৮, চন্দননগর। চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ—দীননাথ মুখোপাধ্যায়, চুঁচুড়া। হিতসাধিনী—নীরদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১২৯৮ চন্দননগর। The Bearer—শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, সাপ্তাহিক, চন্দননগর। কুমুদিনী—যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১২৮১। তারা—অন্নদাপ্রসাদ দত্ত, ১২৮৮, ইলছোবা। পূর্ণিমা—ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩০০, বাঁশবেড়িয়া। জ্ঞানোদয়—চন্দ্রশেখর, ১৮৫১, কোন্নগর। বাসনা—জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়।

১৩০১, মাসিক, চুঁচুড়া। Amatuer Workshop—শ্রীশচন্দ্র বসু ও কুসুম কুমার, চন্দননগর। সনাতন ধর্ম্মকথা—কালীকুমার দত্ত, চুঁচুড়া। শিক্ষা—বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়, ১৩০৪। বঙ্গবন্ধু—যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় সাপ্তাহিক, চন্দননগর। চন্দননগর প্রকাশ—এন, মুখোপাধ্যায় সাপ্তাহিক। এডুকেশন গেজেট—ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধায়; চুঁচুড়া। গ্রামবাসী—দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, সাপ্তাহিক, উত্তরপাড়া। সাবিতা—দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, মাসিক। সবিতা—ননীলাল দে, মাসিক, শ্রীরামপুর। হুজুগ—শ্রীরামপুর বান্ধব সমিতি। নির্ম্মাল্য—বসন্তকুমার বসু, ১৯১০, শ্রীরামপুর। কাব্যপ্রকাশ—কালীদাস মিত্র, শক, ১৭৮৫, শ্রীরামপুর। শ্রীরামপুর—বসন্তকুমার বসু, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক, ১৯১৩ শ্রীরামপুর। বৈদ্যবাটী পত্রিকা—বৈদ্যবাটী। নিত্যতন্ত্র—মাসিক, শ্রীরামপুর। শ্রীরামপুর ও আরামবাগ সম্মিলনী—জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ, ১৯০২ শ্রীরামপুর হিন্দুসখা—রামকুমার বেদতীর্থ, কৈকালা। মুকুলমালা—কেদারনাথ ঘোষাল, চন্দননগর। চন্দননগর পত্রিকা—অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, চন্দননগর। ভারত দর্পণ—অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, চন্দননগর। স্বাস্থ্যসখা—গগনচাঁদ নন্দী, মাসিক, চন্দননগর। প্রবর্ত্তক—মনীন্দ্রনাথ নায়ক ও যতীন্দ্রনাথ রায়, পাক্ষিক ও মাসিক চন্দননগর Standard Bearer—অরুণচন্দ্র দত্ত, সাপ্তাহিক ও মাসিক, চন্দননগর। নিবন্ধ—বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মাসিক, চন্দননগর। নবসঙ্ঘ সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক অরুণচন্দ্র দত্ত, চন্দননগর। তরুণ ভারত—বীরেন্দ্র সেন, চন্দননগর। শ্রীরামপুর পঞ্জিকা—কেশবচন্দ্র অথবা কৃষ্ণ কর্ম্মকার, বার্ষিক, শ্রীরামপুর। নাগরিক—বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দননগর। নাগরিক—বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দননগর। সেবক—মতিলাল লাহা, চন্দননগর। অবকাশ বন্ধু—আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১২৭৪, চন্দননগর কর্ম্মযোগিন—অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৩১৬, উত্তরপাড়া, সাপ্তাহিক।

খেয়াল—মাসিক পত্র, উত্তরপাড়া। মাতৃভূমি—রামলাল দাস, ও সুরেন্দ্রনাথ সেন, পাক্ষিকপত্র, চন্দননগর। বিকাশ স্বারস্বত সম্মিলন হইতে প্রকাশিত ১৩১৬ উত্তরপাড়া। অর্চ্চনা ও চয়ন—ছাত্রগণ পরিচালিত মাসিক ১৯১১-১২ উত্তরপাড়া। উত্তরপাড়া কলেজ ম্যাগাজিন—উত্তরপাড়া কলেজের ছাত্রগণ পরিচালিত মাসিক ১৯১৫ পত্র—শ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সাপ্তাহিক শ্রীরামপুর। হুগলী কলেজ ম্যাগাজিন্—হুগলী কলেজ, চুঁচুড়া। প্রজাশক্তি—নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরে সত্যচরণ বড়াল, চন্দননগর। চিন্তা—অম্বিকাচরণ গুপ্ত, ভাঙ্গামোড়া পূর্ণিমা—অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চুঁচুড়া, মাসিক। নবজীবন—অক্ষয় চন্দ্র সরকার, চুঁচুড়া, মাসিক। সর্ব্বজন সুহৃদ—অমৃতলাল কুণ্ডু, শালিখা। পূর্ণিমা—অচলাবালা দাসী, বাঁশবেড়িয়া। ব্রহ্মবিজ্ঞান—অবিনাশচন্দ্র দত্ত, চন্দননগর। সমাচার চন্দ্রিকা—উমেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি, উত্তরপাড়া সংবাদপত্র। ধন্বন্তরি—কুঞ্জবিহারী কাব্যতীর্থ, দাঁড়পুর, হুগলী। The Hindu Intelligencer—কাশীপ্রসাদ ঘোষ, হাওড়া। দিনমণি—গোপালচন্দ্র দে, ১৮৪৮। বেঙ্গল গেজেট—গঙ্গাচরণ ভট্টাচার্য্য বড়া শ্রীরামপুর। অরুণোদয়—গঙ্গানারায়ণ মুখার্জ্জি, ১৮৩৯। শিবপুর কলেজ পত্রিকা—তুলসীদাস কর, হাওড়া। আদরিণী—তারকনাথ বিশ্বাস, হুগলী। তারা—তারাপদ চট্টোপাধ্যায়, ইলছোবা মণ্ডলাই। হিতসাধক ও এডুকেন গেজেট—প্যারিচরণ সরকার। বঙ্গনিবাসী—বামদেব দত্ত, বৈঁচি সংবাদপত্র। পথিক—বিপিনকৃষ্ণ দত্তচৌধুরী, হুগলী। কেয়া—বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈদ্যবাটী। Burns Monthly Magazine ১৯০৮। স্বাস্থ্য—ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। কৌস্তভ বিবরণ—মহেশচন্দ্র ঘোষ, সংবাদপত্র। পূর্ণিমা—বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়, বাঁশ-বেড়িয়া, মাসিক পত্রিকা। অতি-আধুনিক—তরুণচন্দ্র সিংহ, বাকসা আলোচনা—যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হাওড়া, মাসিক শ্রীশ্রীবৈষ্ণব সঙ্গিনী

—মধুসূদন দাস অধিকারী, হুগলী, সাময়িক পত্রিকা। রসরত্নাকর—যদুনাথ পাল, সাময়িক পত্র, ১৮৪৯। হিন্দুসখা—রাজকুমার বেদান্ততীর্থ ও কালীপদ মিত্র, সাময়িক পত্র ১৯০৮। পথিক—শচীন ঘোষ, সাময়িক পত্র। হরিভক্ত—শ্যামাচরণ কবিরত্ন, শিবপুর, মাসিক। উদ্বোধন—শুদ্ধানন্দ স্বামী মাসিক। কেরাণীমহল—সন্তোষ কুমার দত্ত, মাসিক। ভক্তি—দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ হুগলী। মাসিক পত্রিকা—প্যারিচাঁদ মিত্র। পত্র—শ্রীরামপুর, সংবাদপত্র। নির্মোক—শ্রীরামপুর, সংবাদপত্র। স্বাধীনতা—গুইরাম নন্দী চন্দননগর, পাক্ষিক পত্রিকা।

হুগলী জেলার গ্রন্থাগার

অন্নপূর্ণা লাইব্রেরী—তেলিনীপাড়া ১৯১২। আর্য্য লাইব্রেরী—ঘুটিয়া বাজার, হুগলী। ইটাচোনা সাবিত্রী লাইব্রেরী—ইটাচোনা। যুবক সম্মিলনী উত্তরপাড়া। উত্তরপাড়া লাইব্রেরী,শেয়াখালা। উত্তরপাড়া পাবলিক লাইবেরী উত্তরপাড়া ১৮৫৯। কোন্নগর পাব্লিক লাইব্রেরী, কোন্নগর ১৮৫৮। গরলগাছা পাবলিক লাইব্রেরী—গরলগাছা ১৯১৩। গিরীশ লাইব্রেরী—আকনা ১৯২৪। চন্দননগর পুস্তকাগার—চন্দননগর ১৮৭৩। চাতরা রিডিংরুম—চাতরা, শ্রীরামপুর ১৯০৯। জনাই পাবলিক লাইব্রেরী, জনাই। নন্দী লাইব্রেরী—জামগ্রাম ১৮৯৩। পল্লী পাঠাগার বন্দীপুর ১৯১৭। পল্লী পাঠাগার—দেবানন্দপুর ১৯২০। প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী লাইব্রেরী, রাধানগর ১৯২৪। প্রগ্রেসিভ্ ইউনিয়ন্—বুড়াশিবতলা, চুঁচুড়া। ফ্রেণ্ডস্ লাইব্রেরী—হুগলী, বালি ১৯১৫। পাবলিক লাইব্রেরী—বলাগড় ১৯২৪। পাবলিক্ লাইব্রেরী—বল্লভপুর, শ্রীরামপুর। বীণাপাণি লাইব্রেরী বড়া, চন্দননগর ১৯২৪। বিশ্বেশ্বরী লাইব্রেরী, কৈকালা ১৮৯৭। বয়েজ ওন লাইব্রেরী শ্রীরামপুর। বান্ধব সম্মিলন, সোমড়া। ইয়ংম্যানস্ এসোসিয়েশন্ বৈদ্যবাটী ১৯০৮। পাবলিক লাইব্রেরী, বাঁশবেড়িয়া ১৮৭১। পাবলিক লাইব্রেরী, বৈঁচী ভিলেজ ইমপ্রুভমেণ্ট সোসাইটী লাইব্রেরী, গুপ্তিপাড়া। সাহিত্য সমিতি ভদ্রকালী কোত্তরং। পাব্লিক লাইব্রেরী, ভদ্রেশ্বর ১৯১০। পাল্লিক লাইব্রেরী মাহেশ। ফ্রি বিডিং রুম ১৯০৪। রামপ্রসাদ পাবলিক লাইব্রেরী কৃষ্ণনগর, খানাকুল ১৯২৪। রাজলক্ষ্মী লাইব্রেরী, চাতরা, শ্রীরামপুর। নিরঞ্জন লাইব্রেরী ভূঁপুর, বৈঁচি। কাশীপতি মেমোরিয়াল লাইব্রেরী, বৈঁচি। তিলক পাঠাগার ভাণ্ডারহাটী। দশঘরা এসোসিয়েসন্, দশঘরা ১৯১৭ দশভূজা সাহিত্য মন্দির মানকুণ্ডা, চন্দননগর ১৯১৭। নিউ রিডিং ক্লাব্ হুগলী ১৯১৮। মুক্তকেশী পাব্লিক্ লাইব্রেরী সিন্ধুবাজার, খামারগাছি ১৯১৮। পাবালিক্ লাইব্রেরী তেঘরা ১৯২৫। শিবশঙ্কর লাইব্রেরী চাঁপাতলা, চন্দননগর ১৯১৯। বেনাভোলেন্ট এ্যাসোসিয়েসন্, শ্রীপুর। সাহিত্য

সম্মিলন শ্রীরামপুর। শ্রীরামপুর পাব্লিক্ লাইব্রেরী, শ্রীরামপুর ১৮৯০। সন্তান সঙ্ঘ লাইব্রেরী, চন্দননগর। সাধনা সাহিত্য কুটীর দিগসুই ১৯১৬। সারস্বত পাঠাগার গোন্দলপাড়া। সাহাগঞ্জ পাব্লিক লাইব্রেরী, সাহাগঞ্জ ১৯২৫। সারস্বত সম্মিলন উত্তরপাড়া ১৯০৯। স্টার ইউনিয়ন লাইব্রেরী, উত্তরপাড়া ১৯০৯। হিতসাধন সমিতি লাইব্রেরী ত্রিবেণী, ১৯১৯। হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার রাজবলহাট ১৯২৪। হিন্দি শিক্ষা সর্ব্বস্ব পুস্তকালয়, মাখলা, উত্তরপাড়া ১৯১৫। হরিপাল পাব্লিক লাইব্রেরী, হরিপাল। হুগলী পাবলিক্ লাইব্রেরী চুঁচুড়া ১৮৫৪। পঞ্চানন লাইব্রেরী চাতরা, শ্রীরামপুর। মিশন লাইব্রেরী, শ্রীরামপুর কলেজ ১৮১৮। ফ্রি রিডিং রুম ও লাইব্রেরী, শ্রীরামপুর ১৯১৫। সাউলি বালক সঙ্ঘ—চন্দননগর। কোন্নগর পাঠচক্র—কোন্নগর। দেশবন্ধু পাঠাগার—চন্দনগর। পাবলিক লাইব্রেরী—তেলিনীপাড়া। পাবলিক লাইব্রেরী—মালপাড়া। বিবেকানন্দ স্মৃতি-সমিতি পাঠাগার—চন্দননগর। রবীন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার—চন্দননগর। গোন্দলপাড়া লাইব্রেরী—অম্বিকাচরণ স্মৃতি মন্দির, চন্দননগর। মনোরমা গ্রন্থাগার—মহানাদ ১৩৫২। আরামবাগ জ্ঞানানন্দ পাবলিক লাইব্রেরী, ১৯১১। আন্দু জলধর পাঠাগার, ১৯৩৭, গুপ্তিপাড়া। আশুতোষ স্মৃতিমন্দির, ১৯২৮ বলাগড়। বারিজহাটি পাবলিক লাইব্রেরী, ১৯৩০, চণ্ডীতলা। বেগমপুর ক্লাব লাইব্রেরী, ১৯৩১। ভদ্রকালী সাহিত্য সমিতি, ১৯২১, কোতরং। ভদ্রেশ্বর পাবলিক লাইব্রেরী, ১৯১০। শিবশঙ্কর পুস্তাকাগার, ১৩২৫, চন্দননগর। সরস্বতী লাইব্রেরী, ১৯০১ শ্রীপুর। সাধনা সাহিত্য কুটির, ১৯১৬, দিগসুই। রাধারমণ ক্লাব, ১৯১৪, ভুমুরদহ। ফ্রেণ্ডস ক্লাব, ১৯৩৯, গাজিনাদাসপুর। সারস্বত পাঠাগার, ১৯১৫, পারগোপালনগর। শিশির বাণীমন্দির, ১৯১৭, গুপ্তিপাড়া। শ্রীগৌরাঙ্গ পাঠাগার, গুটি। রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী, ১৯৩৬, কামারপুকুর।

সমাপ্ত

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র লিখিত অন্যান্য পুস্তক

●

মহাবিপ্লবী রাসবিহারী

জেজুরের মিত্র বংশ

ভারতের রাষ্ট্রভাষা

মৃত্যুঞ্জয়ী কানাই

আমাদের বাপুজী

বরণীয় বাঙ্গালী

নয়া-বাঙ্গলা

বাঘা যতীন

তীর্থ-সপ্তক

India's National Language.

●

নব-জাতীয়তার পুরোহিত শ্রীসুধীরকুমার মিত্র *

(লেখক শ্রীধ্যানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)

হুগলী জেলার ইতিহাসকে সংক্ষেপে আমাদের বাঙ্গলা দেশের প্রাণ-কেন্দ্রের ইতিহাস বলা হয়; সেইজন্য হুগলী জেলা মনীষার শ্রীক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, এইরূপ একটি সংস্কৃতিসম্পন্ন জেলার একখানি সুবিস্তৃত ও সুশৃঙ্খল ইতিহাস এ যাবৎ রচিত হয় নাই। স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ গুপ্ত ও স্বর্গীয় বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য হুগলী জেলার ইতিহাস রচনা করিতে আরম্ভ করেন এবং এক খণ্ড করিয়া উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর তাঁহাদের পরলোকগমনে প্রয়োজনীয় খণ্ডগুলি আর প্রকাশিত হয় নাই। ইহার পর ঐতিহাসিক স্বর্গীয় মুনীন্দ্রদেব রায়, স্বর্গীয় অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বর্গীয় গুরুদাস রায় প্রমুখ কয়েকজন হুগলী জেলার অধিবাসী, এই জেলার একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টাও ফলবতী হয় নাই।

সম্প্রতি আমাদের জেলার সুসন্তান, সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত, বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, তরুণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মিত্র বিদ্যাবিনোদ দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়া সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, দেড় শতাধিক চিত্র শোভিত, সর্ব্বজনবোধ্য ভাষায় একখানি সুন্দর জেলার ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া, হুগলী জেলার প্রত্যেক অধিবাসীকে তিনি চিরঋণী করিয়া রাখিলেন। এইরূপ বিরাট

---

* হুগলী জেলার প্রাচীনতম সাপ্তাহিক "চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ" সম্পাদক সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ধ্যানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক এই সংক্ষিপ্ত জীবনী (গ্রন্থকার ও তাঁহার পিতা-মাতার চিত্র সহ) লিখিত এবং ২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৫৬ সালের 'বার্ত্তাবহ' হইতে পুনর্মুদ্রিত।

ইতিহাস বঙ্গের কোন জেলার অত্তাপি বাহির হয় নাই। সুধীর বাবু বহু দিনের একটি অভাব মোচন করিয়া দিলেন। যতদিন বাঙ্গলা দেশ থাকিবে, ততদিন তাঁহার নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। তিনি একাকী এই অসাধ্য সাধন করিয়াছেন বলিয়া প্রবর্ত্তক সঙ্ঘগুরু শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয় সুধীর বাবুকে যথার্থই "নব-জাতীয়তার পুরোহিত" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন, "শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন সমগ্র ভারতের হৃদয়ভূমি বঙ্গদেশ, বাঙ্গলার হৃদয়-স্পন্দন ধ্বনিত হয় হুগলী জেলায়। সুধীর বাবুর এই গ্রন্থ (হুগলী জেলার ইতিহাস) পাঠ করিয়া আজ আমি সেই কথার প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়াছি।"

হুগলী জেলার এইরূপ সুসন্তানের পরিচয়, হুগলী জেলার তথা বাঙ্গলা দেশের প্রত্যেকের জানা উচিত বিবেচনা করিয়া তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস যতদূর আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা আমাদের পাঠকবর্গের নিকট উপহার দিব।

হুগলী জেলার গৌরব শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মিত্র জেজুরের মিত্র বংশোদ্ভূত স্বর্গীয় আশুতোষ মিত্রের একমাত্র পুত্র। এই বংশে সুপ্রসিদ্ধ "জয় মিত্র" জন্মগ্রহণ করেন। সুধীর বাবু তাঁহাদের পৈত্রিক বাটি কালী-ঘাটে ২নং কালী লেনস্থ ভবনে বাস করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মাতুলালয় বাক্‌সা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতামহ স্বর্গীয় গুরুদাস সিংহ বঙ্গভাষায় মহাভারত অনুবাদক মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র। সুধীর বাবুর মাতার নাম স্বর্গীয়া রাধারাণী দেবী। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তিনি দেহরক্ষা করেন।

সুধীর বাবু জন্মাইবার পর হইতে কলিকাতায় লালিত পালিত হইলেও জেলার প্রতি তাঁহার এই যে আন্তরিক দরদ তাহা তিনি তাঁহার পিতা স্বর্গীয় আশুতোষ মিত্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার পিতা

কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় বাস করিলেও, তিনি তাঁহার জন্মস্থানের কথা কখনও ভুলেন নাই ; এমন কি পুত্র যাহাতে কখনও দেশের সম্পর্ক ছেদন করিতে না পারে, তজ্জন্য তিনি মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া পুনরায় জেজুরে একটি প্রাসাদোপম সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। আশু বাবু পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং কলিকাতার এক বিখ্যাত সওদাগরী অফিসে হেড-ক্লার্কের কার্য্য করিতেন। পরের দুঃখে তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা দ্রবীভূত হইত এবং তিনি কত দরিদ্রের যে চাকুরীর ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাহাদের অন্ন সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কন্যাদায় ও পিতৃ-মাতৃদায়গ্রস্ত ব্যক্তিগণ তাহার সাহায্যলাভে কখনও বঞ্চিত হয় নাই। সাহিত্যে তাহার গভীর অনুরাগ ছিল এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহার বহু প্রবন্ধ তৎকালীন "বিষ্ণুপ্রিয়া" নামক কাগজে মুদ্রিত হইয়াছিল। এক কথায় আশু বাবুর ন্যায় দেবতুল্য, চরিত্রবান ব্যক্তি বর্ত্তমানে খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

সুধীর বাবুর মাতা রাধারাণী দেবী প্রসিদ্ধ "কালী সিংহের" বংশের কন্যা, সুতরাং তাহার দয়া-দাক্ষিণ্য, আতিথেয়তা, কোমলতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণ তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হন। তাহাদের একমাত্র পুত্র সুধীর বাবু কেবল পাণ্ডিত্য ও ঐতিহাসিক জ্ঞানে প্রবুদ্ধ হইয়া নয়, নিজ জেলার প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিবার জন্য একাকী পনের বৎসর যাবৎ হুগলী জেলার পথে ঘাটে ভ্রমণ করিয়া অক্লান্ত ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক হুগলী জেলার বিস্মৃতপ্রায় অমূল্য উপাদান সংগ্রহ করিয়া যে জনসমাজে প্রচার করিয়াছেন, তাহা তাহার পিতা মাতার যে শিক্ষার গুণেই সম্ভব হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

স্কটিশ চার্চ্চ স্কুলে সুধীর বাবুর শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ হইতে ইন্টার-

মিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি-এ পড়িবার সময় উক্ত কলেজে ছাত্রদের ধর্মঘট পরিচালনা করিবার জন্য তাহার পড়াশুনা বন্ধ হইয়া যায়, এবং তাঁহার পিতা সেই সময় এক সওদাগরী অফিসে একটি কেরাণীর কাজ করিয়া দেন। কিন্তু বেশীদিন তাহাকে আর কেরাণীর কাজ করিতে হয় নাই। সেই সময় লবণ সত্যাগ্রহ লইয়া দেশে খুব গোলমাল চলিতে ছিল; অফিসের জনৈক সাহেব ঐ জন্য ভারতীয়গণকে গালাগালি করায় সুধীর বাবুর সহিত উক্ত সাহেবের বচসা হয় এবং তিনি চাকুরী ছাড়িতে বাধ্য হন।

চাকুরী ছাড়িয়া সুধীর বাবু ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন এবং অবসর সময় দেশের অবস্থা লইয়া ইংরাজী ও বাঙ্গলা কাগজে প্রবন্ধ লিখতে সুরু করেন। এই সময় তিনি কংগ্রেসের সভ্য হন এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি জেজুর কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তথায় দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার জন্য তিনি একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেই সময় উত্তর কলিকাতায় অস্ত্র আমদানী করিবার জন্য যে প্রসিদ্ধ মামলার উদ্ভব হয়, তাহাতে সন্দেহক্রমে পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু প্রমাণাভাবে তিনি মুক্তি পান। তখন দত্তপুকুর নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষের কন্যা শ্রীমতী আভা দেবীর সহিত মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি 'বুভুক্ষা' নামক একখানি পাক্ষিক পত্রিকা পরিচালনা করেন ও ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ "জেজুরের মিত্র বংশ" প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকখানি তৎকালে সংবাদ-পত্রাদিতে উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। এই বৎসরে তিনি কালীঘাট ছাত্র সমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন এবং তাঁহার চেষ্টায় দক্ষিণ কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার সত্যচরণ ইনষ্টিটিউট ও অবৈতনিক পাঠাগার প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কালীঘাট পিপলস্ এসোসিয়েসনের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন এবং তখন সুধীর বাবু কালীঘাট পল্লীকে একটি পৃথক ওয়ার্ড করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। যাঁহাদের আপ্রাণ চেষ্টায় কালীঘাট ভবানীপুর পল্লী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, সুধীর বাবু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। এই সময় তিনি 'অতি আধুনিক' নামক একখানি প্রগতিমূলক মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করেন এবং নারী রক্ষা সমিতি ও কালীঘাট স্বাস্থ্য সমিতির অন্যতম সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি "কায়স্থ-পত্রিকা" নামক মাসিক পত্রের যুগ্মসম্পাদক মনোনীত হন এবং উক্ত বৎসরে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত অখিল ভারত কায়স্থ মহাসম্মেলনে প্রচার সম্পাদকের কার্য্য করেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভাষাকে রাষ্ট্রভাষা এবং বঙ্গভাষাভাষী স্থানগুলিকে বঙ্গদেশের সহিত যুক্ত করিবার জন্য তিনি সর্ব্বপ্রথম আন্দোলন করেন এবং তাঁহার চেষ্টায় বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সম্মেলনের উদ্বোধন-কালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সুধীর বাবুকে আশীর্ব্বাদ করেন এবং পরে মহাসমারোহে বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এই সম্মেলনের কয়েকটি অধিবেশন হয়; তন্মধ্যে কলিকাতা, চন্দননগর ও খুলনার অধিবেশন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্গভাষাই যে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার একমাত্র উপযুক্ত ভাষা সুধীর বাবু সেই সম্বন্ধে "ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা" নামক বাঙ্গলা ভাষায় ও India's National Language নামক ইংরাজী ভাষায় দুইখানি প্রামাণ্য পুস্তক রচনা করেন এবং তাহা ভারতের সর্ব্বত্র বিশেষভাবে আদৃত হয়।

এতদ্ভিন্ন তিনি নয়া-বাঙ্গলা, তীর্থ সপ্তক, মহাবিপ্লবী রাসবিহারী, আমাদের বাপুজী, মৃত্যুঞ্জয়ী কানাই, বাঘা যতীন, মৃত্যুঞ্জয়ী প্রফুল্ল, আমাদের নেতাজী, যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ, বরণীয় বাঙ্গালী, শ্রীরামকৃষ্ণ, রাণী রাসমণি

প্রভৃতি কুড়ি খানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশের বহু জনহিতকর ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সুধীর বাবু ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন; তন্মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা, রবি-বাসর, গিরিশ সংসদ দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়, কালীঘাট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, দেশবন্ধু শিল্প শিক্ষালয়, কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ, সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনী, কানাইলাল দত্ত স্মৃতি সমিতি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং তাঁহার মনোজ্ঞ অভিভাষণ সমস্ত সংবাদপত্রে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে তিনি অখিল ভারত কায়স্থ মহাসভার বঙ্গীয় শাখার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন এবং ভারতের প্রাচীনতম সামাজিক পত্র "কায়স্থ পত্রিকা" সম্পাদনের ভার প্রাপ্ত হন। লেখা এবং বক্তৃতা দেওয়া এই উভয় বিষয়েই তিনি পারদর্শী। ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বসুমতী, প্রবর্ত্তক, দেশ, বঙ্গশ্রী, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রভৃতি পত্রে তাঁহার বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে এবং সেইগুলি একত্রিত করিয়া প্রকাশ করিলে আরও ১০।১২ খানি পুস্তক হইতে পারে। এই বৎসর তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হয়; তাঁহার স্ত্রী আভা দেবীর "আমার কবিতা" নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ আছে। তাঁহার এক পুত্র নাম শ্রীপলাশ কুমার মিত্র।

সুধীর বাবু ভারতের বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং তিনি পেশা হিসাবে কখনও সাহিত্যচর্চ্চা করেন নাই। বর্ত্তমানে তিনি কলিকাতার এক সুবিখ্যাত সওদাগরী অফিসের একাউন্টেন্টের কার্য্য করেন এবং অবসর সময়ে চিত্তবিনোদনের জন্য সাহিত্যালোচনাই তাঁহার একমাত্র ব্রত। একটু একটু করিয়া অবসর সময়ে কার্য্য করিয়া তিনি যে, কিরূপে হুগলী জেলার ইতিহাসের মত বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ফেলিলেন, তাহা

ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এই গ্রন্থই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি; বঙ্গ সাহিত্যে এই একখানি গ্রন্থই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

সুধীর বাবুর সহিত যিনি একবার মিশিয়াছেন, তিনিই তাঁহার সরল আমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। এইরূপ প্রিয়দর্শন, সদালাপী, নিরহঙ্কারী যুবক বর্ত্তমানে খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সুধীর বাবুকে হুগলী জেলাবাসীর পক্ষ হইতে আমাদের জেলার ইতিহাস রচনা করিবার জন্য সতঃস্ফূর্ত্ত ধন্যবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং ভগবানের নিকট বর্ত্তমান সময়ের হুগলী জেলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুসন্তানের দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

হাজার পাতায় শতাধিক ছবি সহ এইরূপ ইতিহাস খুব কম দেখিয়াছি

আমরা শ্রীযুত সুধীর কুমার মিত্র প্রণীত হুগলী জেলার ইতিহাস পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। ইহাতে বহু তথ্য, বহু ছবি, বহু বিখ্যাত ব্যক্তির পরিচয় আছে। প্রায় হাজার পাতায় শতাধিক ছবি সহ এইরূপ জেলার ইতিহাস খুবই কম দেখিয়াছি। বইটির দাম দুর্মূল্যের বাজারে ১৫৲ টাকা বেশী নহে, কিন্তু এই দুর্দ্দিনে ১৫৲ টাকা দিয়া বই কিনিবার লোক খুব কম। গ্রন্থকারের অনুসন্ধিৎসা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। তাঁহাকে বাংলা সরকারের উৎসাহ দেওয়া উচিত মনে করি। সরকার যদি হুগলী জেলার প্রত্যেক স্কুলে ও লাইব্রেরীতে এই গ্রন্থ একখানি করিয়া উপহার দেন, তাহাতে লেখকের উৎসাহ বৃদ্ধি ও জেলার লোকের জেলার সহিত পরিচয় বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে করি।

(দৈনিক বসুমতী)

হুগলী জেলার মধ্যে এমন বিচিত্র ও বিপুল উপাদান আছে তাহা সাধারণের পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব

আলোচ্য গ্রন্থ হুগলী জেলার বিস্তৃত ইতিহাস। একটি জেলার মধ্যে ইতিহাস রচনার এমন বিচিত্র ও বিপুল পরিমাণে উপাদান থাকিতে পারে, এই গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে ইহা ধারণা করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব হইত। গ্রন্থকার দীর্ঘকালব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম এবং বহু ক্লেশ স্বীকারপূর্বক এই সকল বিস্মৃতপ্রায় অমূল্য উপাদান সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। গ্রন্থখানি হুগলী-জেলার কেবল ইতিহাসমাত্রই হয় নাই, ইহা হুগলীর শিক্ষা, সংস্কৃতি, লোকজন, প্রাকৃতিক সম্পদ, সাহিত্য, ভূগোল, পুরাতত্ত্ব সব কিছু লইয়া একখানি সুখপাঠ্য সাহিত্য-গ্রন্থে পরিণত হইয়াছে।

বাঙলার তথা ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির গোড়াপত্তন এই হুগলী জেলাতেই হইয়াছিল, ইহা আশা করি অত্যুক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবে না। শিক্ষায়, সাহিত্যে ও সভ্যতায় হুগলী দেশে নূতন আলোকপাত করিয়াছিল। এই জেলায় ইংরেজ আমলের প্রারম্ভে নব্য শিক্ষার গোড়াপত্তন হইয়াছিল। এই জেলা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, সাধকশ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর জন্মদান করিয়াছে। এক কথায় বাঙলার প্রাণকেন্দ্র জুড়িয়া এই জেলার অবস্থান। এইজন্য ইহার ইতিহাসকেও বাঙলাদেশের প্রাণ-কেন্দ্রের ইতিহাস বলা যাইতে পারে। গ্রন্থকার এই বিস্তৃত ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া বঙ্গবাসীকে বহু ঋণে আবদ্ধ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে প্রবুদ্ধ হইয়া বাঙলার অন্যান্য জেলাতেও অনুরূপ বিস্তৃত ইতিহাস প্রণীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাঙলাদেশ সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় সুবিস্তৃত ও সুশৃঙ্খল ইতিহাস গ্রন্থের অভাব খুবই অনুভূত হয়। অথচ এদেশে ইতিহাসের উপাদান প্রাচুর্যের অভাব নাই। বাঙলার শহর, পল্লী, নদী, দেবালয়, প্রাচীন

স্মৃতিচিহ্নাদি, পল্লীগীতিকা ও কিংবদন্তী প্রভৃতি জড়াইয়া যে বিপুল পরিমাণ উপাদান ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া রাশি রাশি গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। বর্তমান সময়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও বিগত শতাব্দীতে বাঙলাদেশে যত মনীষীর জন্ম হইয়াছে, কেবলমাত্র তাহাদের কর্মধারা আলোচনা করিয়াও রাশি রাশি সদ্‌গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। হুগলী জেলার ইতিহাস এবং বিক্রমপুরের ইতিহাস রচয়িতার অনুসরণে বাংলার প্রত্যেক জেলার বিস্তারিত ইতিহাস প্রণীত হইলে তাহা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া ভবিষ্যতে বাঙলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সম্ভবপর হইতে পারে। বর্তমানে বাঙলাদেশে দেশবিশ্রুত ঐতিহাসিকের অভাব নাই। তাঁহারা ঐতিহাসিক গবেষণায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অলোকসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু তাহা সত্বেও তাঁহাদের দ্বারা কিংবা তাঁহাদের প্রেরণায় অন্যের দ্বারা বাঙলাদেশের বড় ইতিহাস রচনা সম্ভব হয় নাই কেন, তাহার কারণ সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বাঙলার ইতিহাসের উপাদান গবেষকের গবেষণা-শালায় কতটা আছে জানি না, কিন্তু তাহা যে বাঙলার নগরে পল্লীতে, বনে জঙ্গলে এবং সাধারণ লোকজনের মধ্যে ছড়াইয়া রহিয়াছে একথা ঠিক। এই সকল উপাদান সংগ্রহ করিতে আজ গবেষকের যত প্রয়োজন, তার চাইতে বেশী প্রয়োজন শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীসুধীরকুমার মিত্রের ন্যায় অক্লান্ত পরিশ্রমীর, যাঁহারা কেবল পাণ্ডিত্যে ও ঐতিহাসিক জ্ঞানে প্রবুদ্ধ হইয়া নহে, কেবল দেশের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের অনির্বাণ কামনায় প্রবুদ্ধ হইয়া পল্লীর পথে ঘাটে হাটে বাজারে দেবালয়ে দিন রাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইতে পারেন এবং একটিমাত্র ঐতিহাসিক নিদর্শনের সন্ধান পাইলে মাইলের পর মাইল হাটিয়া যাইতে ক্লান্তি-বোধ করেন না।

পূর্বেই বলিয়াছি, আলোচ্য গ্রন্থটি হুগলী জেলার বিস্তৃত ইতিহাস।

গ্রন্থটি বহু দুষ্প্রাপ্য চিত্রাবলীতে সুসজ্জিত। জেলার অতীত ও বর্তমান নানা ঘটনার, নানা লোকজনের, নানা স্থানের হৃদয়গ্রাহী বিবরণীতে গ্রন্থটি সুসমৃদ্ধ। বইটি অন্যান্য জেলার লোকেরও অবশ্য পাঠ্য। তবে বিশেষ করিয়া হুগলী জেলার প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই উহার একখণ্ড সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। (দেশ)

হুগলী জেলার ইতিহাস বাংলার ইতিহাসের একখানি মূল্যবান দলিল স্বরূপ

হুগলী জেলা অতীত ও বর্ত্তমান বাংলার বহু মনীষী ও দেশপ্রেমিকের কীর্ত্তিগরিমা বক্ষে ধারণ করিয়া ইতিহাসে অমর হইয়াছে। সহস্র পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হুগলী জেলার এই বিরাট ইতিবৃত্ত প্রণয়ন করিয়া সুধীরবাবুও বাংলা সাহিত্যে অক্ষয় যশের অধিকারী হইলেন। ভৌগলিক সংস্থান, রাঢ়ভূমির প্রাচীন ইতিহাস, সামাজিক ও বানিজ্যিক বিবরণ এবং জেলার ধর্মস্থান সমূহের বিস্তারিত আলোচনা ইহাতে সন্নিবদ্ধ হওয়াতে ইহার গৌরব সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সিংহ ও সেন রাজগণের বংশাবলী, নবাব সিরাজদ্দৌলা এবং অপরাপর প্রখ্যাত হিন্দু ও মুসলমান ভূম্যধিকারিগণের বংশ-পরিচয় ও কীর্ত্তি-কাহিনী ইহার কলেবর গঠন করিয়াছে। বাঙ্গালী ও বঙ্গ-সাহিত্য পরিচিতিও ইহার অন্যতম-বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য সংকলন খানি বাংলার ইতিহাসের একখানি মূল্যবান দলিল স্বরূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুধীসমাজ ও গবেষকগণ ইহাতে বহু অমূল্য রত্নের সন্ধান পাইবেন। মুদ্রণ ও সংগঠন যথাযোগ্য ও মনোরম।

(আনন্দবাজার পত্রিকা)

হুগলীকে মনীষার শ্রীক্ষেত্র বলা যায়

সুধীর বাবু তথ্যসন্ধানী লেখক। ইতিহাসকে সর্ব্বজনবোধ্য ভাষায় সরল কাহিনীর মাধ্যমে বর্ণনার ভঙ্গীটি সুধীরবাবুর নিজস্ব। দীর্ঘকালের বহু তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণার কীর্ত্তি তাঁহার 'হুগলী জেলার ইতিহাস'। এই গ্রন্থের বহু ঘটনা ইতিপূর্ব্বে বঙ্গশ্রীতে প্রকাশিত হইয়াছে এবং পাঠক-সাধারণ তখনই ইহার সারবত্তা উপলব্ধি করিয়াছেন। অপূর্ণ কাহিনীতে বাংলার সামগ্রিক ইতিহাস আজও অবধি বিকলাঙ্গ হইয়া আছে। বিভিন্ন জেলার নির্ভুল ইতিহাসের মধ্য দিয়াই সেই পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক সামগ্রিকতা রক্ষা সম্ভব। স্বস্তির কথা এই যে, কয়েকজন উৎসাহী ও কৃতী ঐতিহাসিকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ পর্য্যন্ত কয়েকটি জেলার স্বয়ং-ইতিহাস রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সবগুলিকেই স্বয়ং-সম্পূর্ণ বলা যায় না। যেমন—গৌরীহর মিত্র প্রণীত 'বীরভূমের ইতিহাস'। গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়া পরবর্ত্তী প্রতিশ্রুত তথা অতিপ্রয়োজনীয় খণ্ডটি আর প্রকাশিত হয় নাই। উক্ত ঐতিহাসিক মহাশয়ও পরলোকগত হইয়াছেন। এই অসম্পূর্ণতা জাতির জীবনে যে কতখানি ক্ষতিকর, তাহা বোদ্ধা পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করিবেন। ইহার অবশ্য যথেষ্ট কারণও রহিয়াছে। প্রথমতঃ, এই জাতীয় গ্রন্থের উপযুক্ত প্রকাশক পাওয়া কঠিন; দ্বিতীয়তঃ, যদি বা বহু কষ্টে প্রকাশিত হইল, ভাল বিক্রী হইল না। এই সব অসুবিধার লক্ষণ বিচার করিয়া আলোচ্য গ্রন্থের শুধু লেখককেই নয়, প্রকাশককেও ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। বর্ত্তমান কাগজ সঙ্কটের দিনে বহু অর্থব্যয়ের সম্মুখীন হইয়াও প্রকাশক মহাশয়ের এই গ্রন্থ প্রকাশের দ্বারা তাঁহার সমাজ-সচেতন ও দেশ-দরদী হৃদয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়।

হুগলী জেলাকে শুধু তাহার ভৌগোলিক সংবেশের মধ্যে দেখিলে ভুল করা হইবে। হুগলীকে মনীষার শ্রীক্ষেত্র বলা যায়। ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি ও শিক্ষা সংস্কারক মহাত্মা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি এই হুগলী, যুগাবতার রামকৃষ্ণ দেবের লীলাভূমি কামারপুকুর, নির্ভীক ও আত্মত্যাগী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মস্থান পূর্ব্বে এই হুগলীই ছিল, মহাত্মা মহসীনের ট্রাষ্ট অর্থে যে হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার মাধ্যমেই সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র, জাষ্টিশ দ্বারকানাথ মিত্র, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি বিশেষ যশস্বিতা লাভ করেন। এইখানেই স্বরেন্দ্রনাথ মল্লিক সিঙ্গুরে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। মিশনারী সাহেবদের উদ্যোগে এইখানেই শ্রীরামপুর হইতে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র ও বাংলা অভিধান পরিচালিত ও প্রকাশিত হয়। নাট্যসম্রাট্ মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের পিতৃভূমি এইখানেই হরিপাল গ্রামে, কবি ভারতচন্দ্রের শিক্ষাভূমিও এই হুগলী। দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মস্থানও এইখানেই দেবানন্দপুরে। মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্গ-শার্দ্দূল আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সারদা মিত্র, প্রভৃতির বাড়ীও এই হুগলী জেলাতে। বাগ্মী রামগোপাল ঘোষের বাড়ীও এই স্থানে। আরও কত নাম করিব? বস্তুতঃ—দর্শন, কাব্য, সাহিত্য, ধর্ম্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সর্ব্বকেন্দ্রিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত মনীষী বাংলা তথা ভারতকে সমৃদ্ধশালী করিয়া দেশের বরণীয় সন্তানরূপে জনসাধারণের শ্রদ্ধার্ঘ্য পাইয়াছেন, তন্মধ্যে অনেকেরই জন্মস্থান এই হুগলী। আলোচ্য গ্রন্থে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ রহিয়াছে, এবং এমন কি বিভিন্ন রচনাকারের বিপুল গ্রন্থরাজির ধারাবাহিক নামপঞ্জীও গ্রন্থশেষে সংযোজিত হইয়াছে। বাংলার Cultured Society বা শিক্ষিত মহলে গ্রন্থখানি বিশেষভাবে কাজে আসিবে। লেখককে তাঁহার অসাধারণ শ্রম স্বীকার ও গবেষণার জন্ত স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রশংসা ও

ধন্যবাদ জানাইতে হয়। আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।—র

(বঙ্গশ্রী)

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘগুরু শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় বলেন :—

"হুগলী জেলার ইতিহাস" প্রণয়ন করিয়াছেন শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মিত্র বিদ্যাবিনোদ। গ্রন্থখানির পরিপূর্ণ পরিচয় গ্রন্থ শেষ করিয়া দিব। আমি গ্রন্থের কিছুটা পড়িয়াছি। আমার মনে হয়, স্বাধীন বাংলার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়-সমূহে এইরূপ পুস্তকের পঠন-পাঠন যদি না হয় দেশের ভবিষ্যৎ জাতি রক্ষা করিতে অসমর্থ হইবে। পুস্তকে ২০টী অধ্যায়ে হুগলী জেলার ইতিহাস আছে। সুদূর প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত হুগলী জেলার সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় সুধীরবাবুর পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থখানিকে কেবল ইতিহাস বলিলেই সব কথা বলা হয় না। গ্রন্থখানির ভাষা প্রাঞ্জল, উহাতে একাধারে সাহিত্য ও আত্মার খোরাক প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। বাঙ্গালীর পরিচয় এই গ্রন্থখানি পাঠ না করিলে মিলে না বলিয়াই আমি প্রত্যয় করি। শ্রীঅরবিন্দ আমায় বলিয়াছিলেন, সমগ্র ভারতের হৃদয়ভূমি বঙ্গদেশ, বাংলার হৃদয়-স্পন্দন ধ্বনিত হয় হুগলী জেলায়। সুধীর বাবুর গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া, আজ আমি সেই কথার প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়াছি। এমন গ্রন্থ রচনা করেন যিনি, তিনি নবজাতীয়তার একজন পুরোহিত বলিতেও আমার কুণ্ঠা হয় না। আমি হুগলী জেলার ইতিহাস অন্ততঃ হুগলী জেলার প্রতি বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তকরূপে গৃহীত হইলে অত্যন্ত সুখী হইব, এবং ইহা পড়িয়া ভবিষ্যৎ জাতি সে কৃতকৃতার্থ হইবে, এ কথা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। ১২ই আষাঢ়, ১৩৫৬

চন্দননগরের জননায়ক শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় বলেন :—

গ্রন্থখানিতে অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত জেলার সম্পর্কে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য বোধ হয় তাহার কিছুই বাদ পড়ে নাই। সামাজিক বিবরণ, জেলার সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণের কথা, তীর্থাদির কাহিনীর মধ্যে বাঙ্গালী মাত্রেরই জানিবার বহু জ্ঞাতব্য কথা আছে। গ্রন্থের ভাষা স্বচ্ছ ও সরল এবং পরিচ্ছদগুলি সুবিন্যস্ত। বহু চিত্র-শোভিত হইয়া ইহা আরও মূল্যবান হইয়াছে। ইহা প্রত্যেকের পাঠ করা উচিৎ।

হুগলী জেলার ইতিহাস সমগ্র বঙ্গদেশের ইতিহাস

হুগলী জেলার ইতিহাস—শ্রীসুধীরকুমার মিত্র বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, শিশির পাবলিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; পৃষ্ঠা—৯৯৭, মূল্য ১৫্ টাকা।

আলোচ্য পুস্তকটি হুগলী জেলার একটি বিস্তৃত ও বিরাট ইতিহাস। লেখক বহু পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও অনুরাগের সহিত নিজ জন্মভূমি হুগলী জেলার এই মহা ইতিহাস রচনা করিয়া বাংলা-সাহিত্যে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন। এত বড় বিরাট, দুরূহ ও দুঃসাহসিক কার্য্য তিনি যে প্রকার কৃতিত্বের সহিত সমাধা করিয়াছেন তাহাতে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়।

যাহা হুগলী জেলার ইতিহাস, সমগ্র বঙ্গদেশের ইতিহাস তাহাই। তৎকালীন সময়ের ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য প্রভৃতি বহু বিবরণ চমৎকার ও বিশদরূপে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীনকাল হইতে ইংরাজ রাজত্ব পর্য্যন্ত হুগলী জেলার মধ্যে যে সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস ইহাতে আছে। গ্রন্থকার এই সকল তথ্য আবিষ্কার করিতে বহু প্রাচীন দলিলাদি, পাণ্ডু-

লিপি, সরকারী কাগজপত্র ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সকল হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই হুগলী জেলায় ভারতবর্ষের মধ্যে যে সকল জিনিষের সর্ব্বপ্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল তাহার মধ্যে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র, প্রথম বাঙ্গলা হরপ, প্রথম মুদ্রিত পুস্তক, প্রথম ইংরাজী-বাংলা অভিধান, প্রথম বিশ্ব-বিদ্যালয়, প্রথম কাগজের কল, প্রথম সাময়িক পত্র, প্রথম সংবাদ পত্র, প্রথম উপন্যাস, প্রথম গদ্য পুস্তক, প্রথম বাংলা নাটক, প্রথম জাতীয় সঙ্গীত, প্রথম বরফ কল, প্রথম রেলওয়ে, প্রথম চটকল, প্রথম খৃষ্টান, প্রথম হাইকোর্টের জজ প্রভৃতি বহু বিষয়ের উল্লেখ ইহাতে আছে।

এতদ্ভিন্ন বাংলার বিখ্যাত মনীষী, দাতা ও পণ্ডিতগণের জন্ম ও বাস এই জেলাতেই। তন্মধ্যে রঘুনাথ দাস গোস্বামী, কাশীরাম দাস, মুকুন্দ-রাম চক্রবর্ত্তী, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, রামরাম বসু, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, টেকচাঁদ ঠাকুর, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রাণী রাসমণি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, শ্রীশ্রীসারদামণি দেবী, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহাকবি গিরিশচন্দ্র, হাজী মহম্মদ মহসীন, দাতা গৌরী সেন, ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিক, রাসবিহারী বসু, কানাইলাল দত্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র, শ্রীমতিলাল রায়, শ্রীঅরবিন্দ, বিচারপতি রূপেন্দ্রকুমার মিত্র, বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস, বিচারপতি নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই অমূল্য গ্রন্থটি রচনাকালে জেলার তথাকথিত শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে লেখক যে প্রকার ঈর্ষা, ঔদাসীন্য ও অসৌজন্য

প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা গভীর পরিতাপের বিষয়। সামান্য সহানুভূতি বা সাহায্য দূরে থাকুক, তাঁহাদের রূঢ় ব্যবহারে লেখক অনেক সময় এই রচনাকার্য্য পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। যাহা হউক তাহাতে নিরুৎসাহ না হইয়া তিনি যে অসীম দৃঢ়তার সহিত অবশেষে এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারিলেন, তাহাতে বঙ্গবাসী মাত্রেই চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

বাংলার প্রত্যেক শিক্ষিত নরনারীর এই পুস্তক পাঠ করা উচিৎ। দেশের ইতিহাস, জাতির উত্থান পতনের ইতিহাস, বাংলার ঐতিহ্য প্রত্যেকেরই জানা অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীদেবেন ঘোষ।

(হাওড়া মিউনিসিপ্যাল গেজেট)

ইহা একখানি সরস সুখপাঠ্য সাহিত্য গ্রন্থ

পৃথিবীর একাংশ এই ভারত—আর সেই ভারতের মাটিতে যারা জন্মায় তারা নাকি বহু জন্ম-জন্মান্তরের পূণ্যফলে। দেবতারাও এই ভারত-ভূমে অবতাররূপে যত বেশী আবির্ভূত হইয়াছেন, পৃথিবীর আর কোথাও তেমন হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নেই। এই ভারতভূমিতে যত তীর্থ, যত পীঠস্থান, যত সাধনা, যত অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে, পৃথিবীর আর কোন অংশে তেমন দেখা যায় না। অতীত গৌরবের যে জাতির পরিচয় নাই, ভবিষ্যতও গঠন করা সে জাতির পক্ষে সম্ভব নয়। বিদেশী সভ্যতার স্রোত আমাদের দেশে বহু দিন ধরিয়া প্রবাহিত হইলেও, আমরা তাহাতে ভাসিয়া যাই নাই। আমাদের নিজস্ব একটা বিশিষ্ট সংস্কৃতি আছে বলিয়াই এখনও আমরা বাঁচিয়া আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকিব।

ভারতের একাংশের একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ এই বাঙলা; যার গৌরব ও বীরত্বগাথা—চির উজ্জ্বল, চির ভাস্বর! সেই বাংলার প্রাণকেন্দ্র জুড়িয়া